ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

DHURJATIPRASAD RACHANAVALI
THIRD VOLUME

ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী

তীয় খণ্ড

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

নিবেদন

ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময়ে নিবেদনে বলেছিলাম আর দুটি খণ্ড যথাসম্ভব শীঘ্র বেরুবে এবং ধূর্জটিপ্রসাদের সমগ্র রচনা একত্র গ্রন্থিত হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু অনিবার্য কারণে বাকি দুটি খণ্ড প্রকাশিত হতে বেশ কিছু দেরি হয়ে গেল। তার কারণ, প্রথম খণ্ডে তিনখানা উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছ নির্দিষ্ট থাকার ফলে তার বিষয়বস্তু, আয়তন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য-সংগ্রহ শ্রমসাপেক্ষ হলেও তেমন কঠিন হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশকালে দেখা গেল, পরিস্থিতি ভিন্ন ও জটিলতর হয়ে পড়েছে। কারণ, ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধাবলী শুধু বহুচারী নয়, তাঁর মননধর্মী রচনাগুলি কেবল বহুমুখী নয়— তারা নানা জায়গায়, পত্র-পত্রিকায় এত বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে যে সেগুলিকে উদ্ধার করে একত্র সন্নিবিষ্ট করা সত্যিই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার কাজ। তাই দ্বিতীয় খণ্ডে ধূর্জটিপ্রসাদের যাবতীয় প্রবন্ধ নিবন্ধ খুঁজে বার করা, তারপর তাদের বিষয় ও প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধভাবে গ্রথিত করা এক ধৈর্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করা হল। তার প্রধান কারণ, দ্বিতীয় খণ্ডে অগ্রন্থিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক বেশি। যেগুলি নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সে তুলনায় এই তৃতীয় খণ্ডের কাজ অর্থাৎ রচনাগুলির প্রকৃতি ও পরিধি অনুসারে সাজিয়ে বার করা অনেকটা সহজ হয়েছে।

এই গ্রন্থের দুটি ভাগ— সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, অভিজ্ঞতা, সমালোচনা প্রভৃতি রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বেশ স্বতন্ত্র, সুচিহ্নিত। আর দ্বিতীয় পর্বে ধূর্জটিপ্রসাদের শেষ বয়সে লেখা দুটি ডায়েরি— 'মনে এলো' এবং 'ঝিলিমিলি' আর সেই সঙ্গে পুস্তক-সমালোচনাগুলির অধিকাংশই একত্র সংকলন করা হয়েছে। এখানে বলে রাখি, 'ডায়েরি'র মতো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা ছিল ধূর্জটিপ্রসাদের স্বভাবসিদ্ধ রীতি— যেমন তাঁর রুচিকর প্রিয় লিখনশৈলী ছিল সংলাপের ব্যবহার। এই অংশটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন প্রীতিভাজন ডঃ অশোক মিত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, এ জন্য তাঁর কাছে আমাদের অনেক ঋণ। তিনি

ধূর্জটিপ্রসাদের কাছের মানুষ ছিলেন, তাঁর মননশীলতা, পঠন-পাঠনে ও সরস কথনে তাঁর বহুচারিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাই এই ধরনের ভূমিকা লেখা নিকট সান্নিধ্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। ডঃ মিত্র কেবল রাজনীতিবিদ্ নন, তিনি নিজেও একজন সুলেখক ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন সাহিত্যপ্রেমী। এইসব কারণেই তিনি ধূর্জটিপ্রসাদের মননশক্তির সঙ্গে হৃদয়বত্তার সমন্বয় — এক কথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মানবিক সত্তার একটি উজ্জ্বল আন্তরিক পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছেন সাবলীল কথ্য ভাষার সুন্দর প্রয়োগে।

প্রথম সম্ভারে সংগীত অংশের পৃথক ভূমিকাটি লিখেছেন স্নেহভাজন অনন্ত কুমার চক্রবর্তী। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অর্থনীতির অধ্যাপনা ও কিছু রাজনীতির চর্চা করেও তাঁর সংগীতপ্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। সংগীতবোদ্ধা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তা ছাড়া, ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত-ভাবনা ও তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, উপরন্তু তাঁর একটি ইংরেজি নিবন্ধগ্রন্থের বাংলা অনুবাদও করেছেন। ভারতীয় সংগীতের উপক্রমণিকা। নিজেও একটি মূল্যবান সংগীতগ্রন্থের রচয়িতা। এই সব দিক থেকে তৃতীয় খণ্ডটি ধূর্জটিপ্রসাদের অনুরাগী পাঠকদের কাছে সমাদর পাবে বলে আশা করি। এখানে সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যকার ধূর্জটিপ্রসাদের দ্বিবিধ পরিচয় ধরা রইল।

এই ব্যাপারে প্রকাশকের তরফে স্নেহাস্পদ সুবীর ভট্টাচার্য যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা বইটির বিশিষ্টতাকে পরিস্ফুট করেছে। তাঁর সম্পাদনায় দৃষ্টিসম্পন্ন গবেষণার চিহ্ন রয়েছে। স্বেচ্ছায় সানন্দে এই গুরুভার দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে অনেক সাধুবাদ জানাই। রবীন্দ্র সংগীতজ্ঞ শ্রীসুভাষ চৌধুরীও আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন। তাঁর সৌজন্যে 'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা'র পুরানো অনেকগুলি সংখ্যা থেকে ধূর্জটিপ্রসাদের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর এই সহৃদয় সহযোগিতার জন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিই।

পরিশেষে বলি এই প্রকাশনার আনুষঙ্গিক অনেক কাজে আমার শিষ্য বিজন কুমার চট্টোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য করে চলেছেন। এর জন্য তাকে মৌখিক ধন্যবাদ জানাতে চাই না।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'সুর ও সংগতি' প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এবং রবীন্দ্রনাথ-ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রাবলী ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন রবীন্দ্রভবন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসুর সহৃদয় উৎসাহের কথা স্মরণ করে এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধূর্জটিপ্রসাদের দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থসংগ্রহে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রভবনের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক শ্রীসুপ্রিয়া রায়, অধ্যাপক শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ডঃ জাবেন্দ্র সিংহরায়, শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকমলা কাঞ্জিলাল। এঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীঅশোক মিত্র, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী, শ্রীদেবেশ রায়। শ্রীঅলোক রায়ের 'ধূর্জটিপ্রসাদ' গ্রন্থ এবং দেশ পত্রিকার ১৩৮০-র সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত রবীন্দ্রনাথ-ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রাবলী ব্যবহার করেছি। ভূমিকা দুটি লিখে দিয়েছেন অধ্যাপক অনন্তকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীঅশোক মিত্র। এই রচনাবলীর পরিকল্পনা, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সংগ্রহ, বিন্যাস এবং পরিশিষ্ট সংকলনে সাহায্য করেছেন শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য। এই সুযোগে এঁদের প্রত্যেককেই আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

প্রসঙ্গত নিবেদন করি ধূর্জটিপ্রসাদের শিরোনামহীন পুস্তক-পরিচয়গুলিই এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। সমস্ত প্রবন্ধের স্থান সংকুলান গেল না। প্রথম সম্ভারে সবুজপত্রে প্রকাশিত 'গানের কথা' প্রবন্ধ ছাপা হবার পর পাওয়ার ফলে ব্যবহার করতে পারি নি।

বিনীত—

সুধাংশুশেখর দে

সূচি

প্রথম সম্ভার

দ্বিতীয় সম্ভার

প্রথম সম্ভার

ধূর্জটিপ্রসাদ : সংগীত-প্রসঙ্গ

ক্লাইভ বেল যখন লেখেন যে ''সৃষ্টির চেয়ে সমালোচনাই বৈদগ্ধের সেরা নিদর্শন'', তখন তাকে অতিশয়োক্তি ভাবা সংগত হলেও এ-কথা ঠিক শিক্ষিত সমালোচনার মূল্য মোটেই সামান্য নয়, বিশেষত আমাদের দেশে, বিশেষ করে সংগীতের রাজ্যে, যেখানে 'বাহবা' অথবা 'ধুত্তোর' বলা ছাড়া শ্রোতার অন্য কর্তব্য আছে শ্রোতা নিজেই জানে না", অথবা যেখানে গান এমন সব কারণে ভালো লাগে যে-সব কারণ "সত্যকারের ভালো লাগার পক্ষে অবান্তর।" এ-রকম বিদগ্ধ সমালোচনার প্রয়োজন উন্নতির ধারাগুলিকে অক্ষুন্ন ও সজীব রাখার জন্যে, ওস্তাদের গুণপনায় ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার জন্যে, সাধারণ শ্রোতার প্রত্যাশাকে মার্জিত করে তোলার জন্যে। ধূর্জটি-প্রসাদের আদর্শ সংগীত-সমালোচক "রসিক পুরুষ, ভদ্র, শান্ত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, শাস্ত্রবিদ্, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং উদার। স্রষ্টা কিংবা ওস্তাদ হবার তাঁর কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই। তিনি specialist হবেন না। বিদ্যাকে যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র [না] ভেবে, সৃষ্টির শেষ কথা অর্থাৎ রস ও রূপ উপ-ভোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ থাকবে। আমার আদর্শ সংগীত সমালোচক গম্ভীর হবেন, কিন্তু তাঁর হাসবার ক্ষমতা থাকবে, নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে ঠাট্টা করার শক্তিও থাকবে।" কথাগুলি ধূর্জটিপ্রসাদের।

বাস্তবে perfection-এর হয়তো কোনো মানে নেই, তবু ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই সম্ভবত তাঁর নিজের আদর্শের নিকটতম প্রতিনিধি। একাধারে তিনি শিল্পী এবং শিল্পরসিক, অন্যান্য শিল্পের বিভিন্ন মহলে তাঁর অবাধ গতি-বিধি ও জিজ্ঞাসা। ইতিহাস ও সমাজের প্রেক্ষাপট বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন, দেশী-বিদেশী সংগীত বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞা অতি গভীর, বিশেষ করে এদেশের শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর অভিজ্ঞতা অতি ব্যাপক, উপলব্ধি নিবিড়, বিচারও অতি সূক্ষ্ম, অথচ নতুন সৃষ্টির স্বীকৃতি দিতে সর্বদা তিনি অকৃপণ। একদিকে ভাতখণ্ডেজী ও শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকারের সংস্পর্শ, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্য তাঁর সংগীত-রুচিকে সমৃদ্ধ ও সংস্কারমুক্ত করতে নানাভাবে সাহায্য করেছে। সেই সঙ্গে মিশেছে প্রখর বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিচার-

শক্তি, কৌতুকদীপ্ত প্রকাশভঙ্গি। হয়তো কখনো কখনো আক্ষেপ জাগে যে লেখাগুলো আর একটু ধরে লিখলে বক্তব্য আর একটু সম্পূর্ণতা পেত। কিন্তু এ-ও না মনে হয়ে পারে না যে সব সময় সিদ্ধান্ত টানাই তাঁর কাজ নয়, তাঁর লেখা তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অনুগামী, যে-ব্যক্তিত্ব সর্বদাই "চলতি হাওয়ার পন্থী"— অনেকটা আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের আলাপের মতো, revelation নয়, revealing।

উপন্যাস ও গল্পের মতো এবং সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও চিত্রালোচনা বিষয়ক অন্যান্য রচনার মতো ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত-বিষয়ক রচনাও পরিমাণের দিক থেকে বিপুল নয়, তবে সামান্য বা নগণ্য তা-ও নয়। 'সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'য় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ, Golden Book of Tagore ও 'জয়ন্তী উৎসর্গে' (১৯৩১ খৃঃ) তাঁর প্রবন্ধ, 'পরিচয়ে' (শ্রাবণ ১৩৪২) তাঁর প্রবন্ধ এবং এরই একটু আগে-পরে ১৯৩২ সালের অগস্ট থেকে ১৯৩৫-এর জুলাই পর্যন্ত ছড়ানো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ যা 'সুর ও সংগতি' গ্রন্থে সংকলিত— এগুলোই মোটামুটি বলতে গেলে তাঁর গোড়ার দিকের রচনা। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হলো তাঁর 'কথা ও সুর' ভাদ্র ১৩৪৫-এ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩৮ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বরে (রবীন্দ্রভারতী থেকে সম্প্রতি এর একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে)। এর পর সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ লেখা Ind.an Music : An Introduction (৩০. ৪. ৪৫) যার মধ্যে তিনি ভারতীয় সংগীতের গোটা প্রেক্ষাপট উদ্ঘাটিত করেছেন অতি উজ্জ্বল কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাষণে। রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ভাবনা বিধৃত আছে একদিকে তাঁর 'কথা ও সুর' গ্রন্থে, অন্যদিকে 'Tagore—A Study'-র মধ্যেও— তাছাড়া আরও বিক্ষিপ্ত নানা প্রবন্ধে। ১৯৫৫ সালে 'রেডিও সংগীত সম্মেলনে' প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ The Great Masters I have heard-এ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সংগীত-গুণীদের একটা চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জাকরুদ্দিন ও আলাবন্দের আলাপ, গোয়ালিয়র, রামপুর ও রাধিকা গোঁসাই-এর ঘরের ধ্রুপদ, ফৈয়াজ-করিমদের খেয়াল, মৌজুদ্দিনের ঠুংরি, রমজানের টপ্পা, সাধক বিষ্ণু দিগম্বরের কণ্ঠসম্পদ, এনায়েত-হাফিজ-আলাউদ্দিনের যন্ত্র-বাদনের ঐশ্বর্য— এ-সবের একটা সংক্ষিপ্ত অথচ হার্দ্য পরিচয়; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এ আক্ষেপও ধরা পড়ে যে পরবর্তী গুণীরা আসরে তাঁকে তৃপ্তি দিলেও আসরের বাইরে তাঁকে ভুলতে দেন না যে তিনি একজন অর্থনীতির অধ্যাপক। এছাড়াও আছে তাঁর নানা প্রবন্ধ ও মন্তব্য— বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায়। My Musical Memo-

irs (ইংরেজি পাণ্ডুলিপি) আজ বিস্মৃত, হয়তো লুপ্ত, কেবল তার আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' (পৌষ ১৩৭২) ও 'সাহিত্যপত্রে' (বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৩ ও আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪)— অনুবাদক শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ। বহু গায়ক-গায়িকা সম্বন্ধে সেখানে উদার মতামত পাই।

উপরে ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাবলীর যে সংক্ষিপ্ত (অসম্পূর্ণ) পরিচয় রাখা হলো তাতেই বোঝা যাচ্ছে সংগীতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ঔৎসুক্য কত বিচিত্র ও সংস্কারমুক্ত। তাঁর নিজের কথায়, "...সংগীতে যত পারদর্শী হলে সংগীত সংক্রান্ত মতামত মূর্খতা ও গোঁড়ামির নামান্তর হয়, ততটা ওস্তাদ আমি নই।" তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধিতে এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত রুচিও যেন কিছুটা গৌণ, কেননা তাঁর 'স্মৃতিচারণা'য় পাচ্ছি : "একথা ঠিক রবীন্দ্রসংগীতের চাইতেও আমার আজও ক্ল্যাসিকাল গানের দিকেই টান বেশি। কিন্তু কথাটা কম-বেশির নয়, এখনকার মতো প্রশ্ন, রবীন্দ্রসংগীত ভালো লাগে কেন?" উত্তরও তিনি নিজেই দিচ্ছেন, "সব আবর্জনা ইতরতা ও মামুলিয়ানার আবিলতা থেকে তা মুক্ত।...তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার চঞ্চল লীলার চাইতে বিচিত্রতর কোনও অনুভূতির নাগাল আমরা সহজে পাই না।" তাছাড়া অন্যত্র তিনি দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রসংগীতের সার্থকতা প্রধানত সৃষ্টির দিক থেকে, এবং এ-ব্যাপারে তাঁর মৌলিকত্ব অত্যন্ত উচ্চ স্তরের। তবু কেউ যদি বলেন যে রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ "এই দুইজন ছাড়া আর কেউ সংগীতে নতুন রূপ দিতে পারেনি কি পারবে না", তাহলে তাঁকেও ভদ্র সমালোচক বলতে তিনি কুণ্ঠিত। এইসব কারণেই তাঁর আলোচনা তথাকথিত ওস্তাদের জন্যে নয়। ওস্তাদ দু ধরনের— বড়ো আর ছোটো। সত্যিকার বড়ো ওস্তাদ যাঁরা তাঁদের ঔদার্য অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁদের কাছে নতুন কথা শোনাবার "ধৃষ্টতা" তাঁর নেই। অপরপক্ষে ছোটো ওস্তাদদের গোঁড়ামি দেখে তিনি হতাশ। তাঁর লেখা তাঁদেরই জন্যে যাঁদের ইতিহাসের যুক্তির ওপর বিশ্বাস আছে, যাঁরা তুলনামূলক বিচারে বুদ্ধি ও ঘটনাকেই প্রধান করে দেখেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত আলোচনার একটা বিশিষ্ট দিক হলো তাঁর সমাজ-তাত্ত্বিক ঝোঁক। তিনি স্পষ্ট কবুল করেন যে এর জন্যে তিনি লজ্জিত নন। এই কারণে তিনি তাঁর ইংরেজি 'উপক্রমণিকা' গ্রন্থের প্রথম বাক্যেই বলে বসেন, "ভারতীয় সংগীত যেহেতু সংগীত সেহেতু তা ধ্বনিসমূহের বিন্যাস-মাত্র, আর যেহেতু ভারতীয় সেহেতু নিঃসন্দেহে ভারতীয় ইতিহাসের ফসল।" কাজেই নিছক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ এদেশে মস্ত একটা অভাব পূরণ

করেছেন, আর এই অভাবেরই কারণে অধিকাংশ সংগীত-পুস্তক আমাদের দেশে সংগীতের প্রকরণ-শিক্ষার 'টেক্সট্ বুক' মাত্র। এমন কি সংগীতের ইতিহাস-গ্রন্থ নামে যেগুলো চলছে সেগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। অপর পক্ষে ধূর্জটি-প্রসাদের বিশেষত্ব হলো ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের মতি নির্ণয় করা।

সমাজ ও ইতিহাসের প্রতি এই আনুগত্য এবং সংগীত-প্রকরণের বিচার থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ ক্রমান্বয়ে কতকগুলো বড়ো প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রধান দুটি হলো : (১) ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্ব সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু অনন্য ঘটনা নয় ; এবং (২) হিন্দুস্থানি সুরপদ্ধতিই বাংলা অঞ্চলের ধ্রুবপদ্ধতির ভূমিকা। তাছাড়া এটাও তিনি বলতেন যে এ-দেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের পাশাপাশি রয়েছে লোকসংগীতের একটা প্রাণময় ধারা এবং কোনোটাই স্থাণু পদার্থ নয়। এসব বিষয় নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, ওঠাই উচিত, ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেও তর্কে খুব একটা পরাঙ্মুখ ছিলেন মনে হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা অনুধাবনে এ দুটি বা তিনটি প্রত্যয় যেন কিছুটা সূত্রের কাজ করে যদিও তাঁর নিজের চিন্তারও কিছুটা বিবর্তনের ইতিহাস আছে। তবু এটা বোঝা যায় যে ভারতীয় এবং বাঙালি হয়েও দেশাভিমান বা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় তিনি কোনোদিন ভোগেননি। এ ব্যাপারে দৃষ্টি তাঁর সম্পূর্ণ নির্মোহ।

ধূর্জটিপ্রসাদ দেখালেন যে ধ্বনিবিন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে এবং ইউরোপে মোটামুটি একই ধরনের ছিল যতদিন উভয় অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপট মোটামুটি ছিল এক। উভয় অঞ্চলেই ক্ল্যাসিকাল সংগীতের অপরিহার্য পটভূমি ছিল ধর্মসংগীত এবং লোকসংগীত। উভয় ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিকাল সংগীত সংকটের মুহূর্তে নবজীবন সঞ্চারের জন্য জনগণের সংগীত থেকে রসদ সংগ্রহ করছে, তারপর নিজেকে প্রসারিত ও পরিশুদ্ধ করেছে। সংগীত ছিল উভয় ক্ষেত্রেই সমবেত জীবন যাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। যতদিন রাজসভা, পুরোহিততন্ত্র আর দৃঢ়বদ্ধ সংঘ সংগঠনগুলো জীবনযাত্রার রীতিনীতিকে ধরে রেখেছে ততদিন ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংগীত একইভাবে 'মেলডি' ও 'হার্মনি'র পরিচয় চিহ্ন বহন করে এসেছে। পরিবর্তন এসেছে উভয় ভূখণ্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে। ভারতবর্ষে এটা এসেছিল ভক্তিমার্গ থেকে, ইউরোপে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ 'প্রোটেস্ট্যান্ট্' ও জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে। উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকায় ছিল সেখানকার ব্যবসায়ী শ্রেণী। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁদের ইউরোপীয় সমব্যবসায়ীদের মতো

নিজ অবস্থানে টিকে থাকতে পারেননি, ফলে বিরাট অভ্যুত্থান স্তিমিত হয়ে এল করুণ আত্মসমর্পণে। এদিকে মুসলমান শাসকরাও একটা সময়ে জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, সমস্ত ঝোঁকটা তাঁদের গিয়ে পড়ল সাজ-সজ্জা আর অলঙ্কারপ্রিয়তার দিকে। সংগীতেও নতুন নতুন কাঠামো গড়ে তোলার আগ্রহ হারিয়ে গেল অতিমার্জনার গোলকধাঁধায়।

ইউরোপে এই যুগসন্ধির সময় থেকেই 'হার্মনি'র ওপর জোর পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ভারতীয় সংগীতেও কি 'হার্মনি' সংক্রান্ত প্রকরণ একেবারে অনুপস্থিত? ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন যে তা নয়। কাজেই তফাৎটা নিছক 'মেলডি' বনাম 'হার্মনি'র নয়, তফাৎটা কেবল ঝোঁকের। ইউরোপীয় ঝোঁকের বিশিষ্টতার একটা বড়ো কারণ বিশেষ এক প্রযুক্তি-ঘটিত আবিষ্কার: 'টেম্পারড্ স্কেল'। দুই ধারার সংগীতের মধ্যে আজ যেটি সত্যিকার পার্থক্য তা হলো, ইউরোপে 'টেম্পারড্' গ্রামের ভিত্তিতে রচিত হচ্ছে স্বরবিন্যাস যাতে দুই পাশাপাশি পর্দার মাঝখানে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ব্যবধান বর্তমান, আর ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে কড়িকোমলযুক্ত গ্রামের ভিত্তিতে রচিত স্বরবিন্যাস-রীতি যাতে মীড়ের সাহায্যে এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় গড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে।

এখানে তর্কের কিছু অবকাশ থেকে যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের সিদ্ধান্ত অবশ্যই মান্য: পার্থক্যটা অবশ্যই ঝোঁকের। কেননা, ইউরোপীয় সংগীতে 'মেলডি' মোটেই অস্বীকৃত নয়, আর ভারতীয় সংগীতেও 'হার্মনি' কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত। কিন্তু ঝোঁকের এই পার্থক্য থেকে কি অভ্যাসের ও প্রতিক্রিয়ার এমন কোনো বড়ো প্রভেদ গড়ে ওঠে না যাকে বলতে পারি মৌলিক অথবা গুণগত? ভারতীয় সংগীত ইউরোপীয় কানে কেন এত একঘেয়ে ঠেকে, ভারতীয় কানেই বা ইউরোপীয় সংগীত প্রায়শ কেন মনে হয় কোলাহল? আমাদের সংগীতের সব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে সুর অর্থাৎ 'মেলডি'— মীড়ের প্রাধান্যও সুরেরই বিশিষ্ট বিন্যাস-প্রকরণ। আর রাগ-পদ্ধতি— সে তো ভারতীয় সুরবিন্যাসেরই অনন্য প্রণালীবদ্ধ রূপ, তার সঙ্গে তুলনীয় অন্যত্র কোথায় কী আছে? অপরপক্ষে প্রধানত 'হার্মনি'র ওপরেই আধুনিক ইউরোপের সংগীত-সৌধটি সমুচ্চ হয়েছে, একথা কি সত্য নয়? ভারতীয় সংগীতে 'হার্মনি'র প্রভাব দেখাতে ধূর্জটিপ্রসাদ যন্ত্র-সংগীতের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কণ্ঠ-সংগীতের প্রসঙ্গ বাদ দিলেন কেন? ধূর্জটিপ্রসাদ আজ জীবিত থাকলে প্রশ্নগুলি সবিনয়ে তাঁরই সামনে রাখা যেত, নিশ্চয়ই তিনি তাতে অখুশি হতেন না।

এর পরে আসে বাংলা সংস্কৃতি তথা বাংলা গানের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ একবার একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গায়কের কণ্ঠে সংযম ও রচনাপদ্ধতিতে সুসংগতির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন এবং দৃষ্টান্ত হিশেবে বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ৪ জুলাই, ১৯৩৫-এর চিঠিতে বললেন যে সংযমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন আছে সকল দেশেই, তার সঙ্গে বিশেষ করে বাংলা সংস্কৃতির সম্বন্ধ কী? "কোনো দেশ কিংবা জাতির বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করতে আমার সাহস হয় না।" তর্কের খাতিরে এই বৈশিষ্ট্য মেনে নিলেও "নতুন culture trait-কে নির্বাচন করে নিজের মতো রূপ দেবার জন্যে তাকে অন্তত জীবন্ত হতে হবে।" "ধরাই যাক— বাংলাদেশে যাত্রাগানে, কবির গানে, তর্জায়, জারি ভাটিয়ালি কীর্তন আগমনীতে, বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায় ও নিধুবাবুর টপ্পায় এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তের গানে কথারই ছিল প্রাধান্য— সুরের সীমা ছিল সুনির্দিষ্ট, তানে ছিল সংযম। কিন্তু, সে ধারাও তো শুকিয়েছে! কেন তার বদলে সর্বত্র জগাখিচুড়ির পরিবেশন হচ্ছে?" ধূর্জটিপ্রসাদ দেখালেন রবীন্দ্রনাথ যেমন সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এই নব্যতন্ত্রের রচয়িতারাও তেমনি। তবে কেন এদের হাতে এমন অদ্ভুত কাণ্ড হতে পারছে? তাছাড়া, পাঁচালির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের গানের, যাত্রার জুড়ির গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাসের, বিদ্যাসুন্দরি গানের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের সম্বন্ধ কী? আসলে, ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন, বাংলার সংগীত-অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। "হিন্দুস্থানি গায়কী পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় একদিনের নয়, পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। অথচ, এই ধারার সঙ্গে বাংলা দেশের সংস্কৃতির যোগ নেই, যোগ রইল যাত্রা-কীর্তন-ভাটিয়ালের সঙ্গে— এ কেমন করে হয় আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার মতে এই ধারাও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যের অন্য একটি দিক।" অতএব সিদ্ধান্ত হলো: "সুরে সংগতি রক্ষা ভদ্র মনেরই কাজ, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নয়।"

ধূর্জটিপ্রসাদের এই শেষের উক্তিটি অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু একথা কি বলা যায় না যে সাধারণভাবে ভদ্রতা এক বস্তু আর ভদ্রতা প্রকাশের দেশগত ভিন্নতা আর এক বস্তু? সুরে সংগতি রক্ষা সব সেরা সংগীতেরই সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু কীভাবে সেই সংগতি রক্ষিত হলো তার বিশিষ্ট চেহারাটা দেশে দেশে ভিন্ন হওয়াই তো স্বাভাবিক। নব্যতন্ত্রী রচয়িতারা আজ ছিন্নমূল, কোনো বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে তাঁরা দেশের ঐতিহ্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাই বলে কি সংস্কৃতির বিশিষ্টতাকেই

অস্বীকার করতে হবে? নাকি বলা উচিত, এই বিশিষ্টতা থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন— এটা তাঁদের 'ট্র্যাজেডি'! একটা দেশের সংস্কৃতি কিছু পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, তাকেও অর্জন করতে হয় অনেক ভালোবাসায় ও যত্নে, এবং এইখানেই অনুসন্ধান ও অনুশীলনের গুরুত্ব। একথা মানতে আপত্তি নেই বাংলার সংগীত-অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। কিন্তু বিভিন্ন ধারার দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধটিও ধূর্জটিপ্রসাদই আমাদের দেখিয়েছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের উপরিউক্ত মতামত ১৯৩৫ সালের ঘটনা। কিন্তু ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'কথা ও সুরে' এই মতের যেন কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি যাকে ঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত চিন্তার সম্প্রসারণ (extension)। যেমন তিনি লিখছেন, "আজ আবার নানা কারণে বাংলা-দেশ অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত। অনেকে বলবেন বিযুক্ত, কিন্তু বিরোধও একপ্রকার যোগ,...।" যে-কীর্তনকে বাংলার বিশেষত্ব বলে জাহির করা হয় তার মধ্যেও অবশ্য হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর ছাপ রয়েছে। কিন্তু "সমাসটি বহুব্রীহি হয়েছে বাংলাদেশে। তবে একদিনে, একজনের কৃপায়, একস্থানে হয়নি। নানা কারণে বাংলাদেশে হিন্দুস্থানি পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। বাঙালি বোধহয় কখনো অন্ধ অনুকরণ করতে পারেনি; স্বভাবের দোষে নয়, ইতিহাসেরই আশীর্বাদে।" এই সিদ্ধান্তই বোধহয় এক্ষেত্রে সার কথা। ধূর্জটিপ্রসাদের মতো 'ডায়ালেকটিক্‌স্'-এ বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী (১) বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির শুধু মিলটাই দেখবেন, অমিলটা দেখবেন না, (২) ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতিরও শুধু মিলটাই দেখবেন, অমিলটা দেখবেন না— এ যেন কিছুটা অপ্রত্যাশিত।

ধূর্জটিপ্রসাদ স্পষ্টই উপলব্ধি করেন যে ভারতীয় সংগীতের অন্তত একটা প্রবল ধারা আছে যেখানে সংগীত ধ্যানমুখী— পরিবেশন পর্বেও ব্যাপারটা তা-ই। এই কারণে ওস্তাদ আর শ্রোতা এই দুজন ধ্যানীর মিলন হওয়া চাই। তৃতীয় জন হলেন সংগতিয়া। কেবলমাত্র ধ্যানের সাহায্যে যাকে উপলব্ধি করা যায় সেই ধ্যানমূর্তি, অর্থাৎ সেই গান্ধর্ব, ঐশী বা আদিরূপের আধারকে আয়ত্ত করাই প্রত্যেক শিল্পীর পরম চেষ্টা। কাজেই সহৃদয় উপ-লব্ধির রস ও ভাবের দিকটার ওপর বিশেষভাবে জোর পড়ে। আঙ্গিকগত জটিলতা তো আছেই, কিন্তু তার বিপরীতক্রমে এই উপলব্ধির ঐক্য একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকের কাজ করেছে। শিল্পসৌন্দর্যের এই বিশেষ দিকটির কারণেই হয়তো অনেকের মধ্যে এ ধারণা চালু হয়েছে যে ভারতীয় সংগীত পুরোপুরি অমূর্ত, স্থাণু, অনৈতিহাসিক। কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নয়।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এ-দেশী শাস্ত্রীয় সংগীতেও গুরুতর পরিবর্তন এসেছে, রাগরূপেও ঘটেছে নানান পার্থক্য— অষ্টাদশ কানাড়ার অস্তিত্বেই তার প্রমাণ। নতুন দরবারি রীতি প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতির সমান মর্যাদা লাভ করেছে— উভয়ে হয়ে উঠেছে প্রায় সমার্থক। লৌকিক ও দরবারি সংগীতের জটিল আদান-প্রদান এদেশে বারবার প্রমাণিত। বিভিন্ন রীতি-নীতির সহাবস্থানের পিছনে যে শক্তি সর্বদা কাজ করেছে সেটা হলো প্রবল সামাজিক তাগিদ, একথা মোটেই বিস্মৃত হওয়ার নয়। "আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, দাদ্‌রা, টপ্পা— এ যেন এক শোভাযাত্রা বিমূর্ত আর ঐশ্বরিক থেকে যা মূর্ত আর মানবিক সেই দিকে ; সঙ্গে সঙ্গে কথার প্রাধান্যও ক্রম-বর্ধমান। কথার সাহায্যে সংগীত নতুন বিষয়বস্তু অর্জন করেছে, কথাও পেয়েছে পর্যাপ্ত সাংগীতিক সাজসজ্জা। বিভিন্ন রীতির মিলনে অতীতে নতুন সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে, যদিও সেই সৃষ্টি কিছুটা গৌণ ধরনের। বিভিন্ন রীতির আদান-প্রদান আজও চলেছে ; কেবল একদিকে নয়া-ক্ল্যাসিকাল রচনাগুলির মধ্যে দেখা দিচ্ছে স্বগোত্র মিলনের পরিচয়-চিহ্ন, অন্যদিকে আধুনিক পরীক্ষা-গুলোর মধ্যে ফুটে উঠছে নির্বিচার বাছাই-এর লক্ষণ। কাজেই, ধূর্জটি-প্রসাদের মতে, এতে সমাজের সেই দীর্ণ দশাই প্রকটিত যাকে দীর্ঘকাল আড়াল করে রাখা হয়েছে।

অতএব পরিবর্তনের স্বীকৃতি সত্ত্বেও স্থাণুত্বের অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়, যেহেতু সমাজের মৌল চেহারাটাই আজও আদিম, সামন্ততান্ত্রিক, জড়প্রকৃতির। ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন যে হয়তো একটা ধাক্কা খাওয়ার প্রয়োজন আছে যাতে জীবনের ও সংগীতের উৎসমুখ খুলে যায়। কিন্তু আপাতত যুগধর্মকে অস্বীকার করা কঠিন। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি বুর্জোয়া সংস্কৃতির সামনে বেমানান রকমে সংকুচিত। জীবনের ধারা যত দ্রুত ছুটবে সংগীতেও তত বিস্তারের জায়গায় আসবে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের ঝোঁক, রাগের বিমূর্ত রূপ ভেঙে গিয়ে দেখা দেবে যা বিশেষ, যা মূর্ত, যা মানবিক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল এরকম আধুনিক ঝোঁক। ক্ল্যাসিকাল সংগীতের অতিবিস্তার ও প্রদর্শন-বৃত্তি বিষয়ে তাঁর অসহিষ্ণুতা আজ এদেশে অতি পরিচিত ঘটনা।

ধূর্জটিপ্রসাদের গোটা সংগীত-চিন্তার পিছনে একটি বড় স্থান জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সময় সময় তাঁর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেও ধূর্জটি-প্রসাদের বাধেনি। কিন্তু সবার ওপর ছিল রবীন্দ্রসৃষ্টির মহত্ত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা, যেটি কোনক্রমেই ভক্তির নামান্তর নয়। আর ছিল

বিনম্র বিচার যার তুলনা আজ পর্যন্ত এদেশে দেখা যায় নি। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে রবীন্দ্রসংগীতের বিকাশের চারটি স্তর আছে। প্রথম যুগে ছিল ভালো ভালো খানদানি 'ঘরোয়ানা চীজে'র সুরের আশ্রয়, যদুভট্ট. রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতির মুখে শোনা উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ ও খেয়াল গান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরীক্ষা-মূলক সুরে কথা বসানো, শুদ্ধ তানমানলয়ে গান রচনা, যার অধিকাংশই ছিল ধ্রুপদ ধামার জাতীয়; কাঠামোও মূলত ধ্রুপদী। দ্বিতীয় যুগে কাঠামোটা পুরনোই রইল, কিন্তু তারই মধ্যে এল বিশেষ 'মুড্'; খেয়াল বা ভাবের প্রয়োজনে সুর ও তালে এল কিছু কিছু নতুনত্ব। এ অনেকটা যেন, ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায়, opposition within the constitution। হিন্দুস্থানি সংগীতের ইতিহাসে এরকম প্রক্রিয়া বারবার দেখা গেছে। দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে এল নতুন পরীক্ষা। এখন কবি সৃষ্টির এমন এক উৎসে ডুব দিলেন যা একেবারে মাটির অন্তস্তল থেকে উৎসারিত। শিলাইদহ-পর্ব বোধহয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের কাল। তাঁর গান রচনার এই তৃতীয় স্তরে ভাটিয়ালি বাউলের আগমন লক্ষ্য করি; মাঝে মাঝেই দেখা যায় দরবারি সুর-পদ্ধতির সঙ্গে ভাটিয়ালি বাউলের মিশ্রণ। এখন আর শুধু এদেশী ক্ল্যাসিকাল সংগীতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়, কাজটি তারও অতিরিক্ত। এ হলো সর্বদেশের গোটা সংগীতের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি, লোকসংগীতের প্রাণময় ধারায় অবগাহন করে সংকটের উত্তরণ। এর পর আছে চতুর্থ যুগ, সৃষ্টির দিক দিয়ে যা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ গানে সংযম এমন কঠোর, সৌন্দর্য এত গভীর, কথা ও সুরের মিলন এমন সুসমঞ্জস, তার আবেদন একসঙ্গে এত personal এবং impersonal, যে তা থেকে আনন্দ না পেয়ে থাকা যায় না। এই গানের আপাত-সারল্য বহু যত্নে লভ্য, তাই তাকে কোনক্রমেই লোকসংগীতে প্রত্যাবর্তন বলা যাবে না— সৃষ্টির নিয়মে তা অসম্ভব। "সাধারণত যা সরল আর যা পরিশীলিত— তারা চলে দুটি পাশাপাশি ধারায়, কিন্তু উৎসের জল যখন উপচে ওঠে তখন সৃষ্টির এক প্রবহমান বন্যায় সবকিছু একাকার।" (Tagore— a Study, পৃ ৯৩, অনুবাদ: ভূমিকা-লেখকের)। সন্দেহ নেই যে তাঁর সংগীতরীতি পূর্বতন আচার্যদের মতোই একদিকে সামাজিক পরিবর্তনের চাপ অন্যদিকে মূর্ত মানবিক ব্যক্তি-গত প্রভাবকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। তাই একদিকে তা শিল্পের গোটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, অন্যদিকে তা শিল্প বিকাশের নতুন স্তরে উত্তরণও।

এই নতুনত্বের স্বরূপ কি? ধূর্জটিপ্রসাদই স্পষ্টভাবে আমাদের দেখিয়ে দিলেন যে, "রবীন্দ্রসংগীতে প্রতিটি গান স্বতন্ত্র সত্তা, ফলে প্রতিটি সত্তা তার

নিজ নিজ রাজত্ব গড়ে তোলে, প্রতি রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন আর প্রতিটি শাসনের নিজস্ব নিয়মকানুন। একটি ছায়ানটের ভিতর ছায়ানটের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত রূপ গড়ে তোলার পরিবর্তে দেখা যায় অনেক রূপের অনেক ছায়ানট, যাদের প্রত্যেকটির চরিত্র গড়ে উঠেছে মূল ছায়ানটের স্বতন্ত্র গান অনুসারে। …ফলে একটা রাগ থেকে হলো অনেক গান, সকল গানেই রাগ-বিশেষের বিশেষ ধর্ম উপস্থিত। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমস্ত গীতি-কবিতার বিশেষ গুণ এই স্বকীয়তা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতির বিশেষত্ব তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপস্বাতন্ত্র্যে, তার মীড় গমকে, তার সংযত ও সহজ গতিভঙ্গিমায়। একথা ঠিক যে রাগের ক্ল্যাসিক বিকাশ দেখা যায় বিশিষ্ট ঠাটের চৌহদ্দির মধ্যে তার সমুদয় বা প্রায়-সমুদয় অলঙ্কারের বিস্তারে, কিন্তু গানরচনার দৃষ্টিতে দেখলে একটি গানের স্বতন্ত্র সত্তা মানেই হলো এক বিরাট পরিবর্তন, যার সত্যিকার অর্থ দাঁড়ায়, গানটাই হলো রাজা। কথা নিঃসন্দেহে পথ দেখায়, কিন্তু নিছক কথাই শাসন চালায় না।" ('Tagore's Music', Centenary Volume, pp. 182-83 ; অনুবাদ-ভূমিকা-লেখকের)।

এর পর স্বভাবতই আসে কথা ও সুরের মিলনের প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রসংগীত যার একটি চরম উদাহরণ। এ বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের বিশ্লেষণ (বিশেষত 'কথা ও সুর' দ্রষ্টব্য) তীক্ষ্ণতায় ও সূক্ষ্ম কৌতুকের ঔজ্জ্বল্যে অবিস্মরণীয়। তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত যে কথার নিয়ম-কানুন আলাদা, সুরের নিয়ম-কানুন আলাদা। তবু কবিতার যেমন "স্থায়ী ভাব" আছে, সুরেরও তেমনি "সংস্কারগত অনুভাব" আছে। অতএব উভয়ের মধ্যে রফা হওয়া সম্ভব, এবং সেটা উচিতও বটে, কেননা তাতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আনন্দানুভূতির পথ সুগম হয়। আর "তানসেন যেকালে পেরেছিলেন তখন ডেমোক্রেসির যুগে অন্য লোকের চেষ্টা করার নিশ্চয়ই অধিকার আছে।" কিন্তু তার জন্যে "সুরের সঙ্গে কথার সন্ধিসর্তগুলো ভালো করে draft করা চাই, না হলে alliance ভেঙে যায়।" কবিতায় অর্থের অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনা আছে, সুরস্রষ্টা সেই ব্যঞ্জনাকেই প্রকট করবেন, অর্থকে নয়। "যে শব্দ যত পরিমাণে অর্থ কিংবা বস্তুকে অতিক্রম করবার শক্তি ধারণ করে সেই শব্দ তত পরিমাণে গীতে সহায়ক, এবং সেই প্রকার শব্দবাহী, শব্দবিন্যস্ত কবিতাই ততটা পরিমাণে সুররচনার উপযুক্ত বাহন।" রবীন্দ্রনাথের গানে সুর ও কবিতা হরগৌরীর মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত, "সেখানে এমন একটি বিশেষ রস সৃষ্ট ও সঞ্চারিত হচ্ছে, যেটি না কেবল সুরের, না কেবল কবিতার, অথচ দুয়ের মিলনের একটি অতিরিক্ত ফল।" "এই গানে কোন্‌টি

কাকে ব্যক্ত করছে বলা শক্ত, কোন্‌টি রূপ আর কোনটি সত্তা ধরাই যায় না।” ধূর্জটিপ্রসাদ একেই বলেছেন ‘সংগীত’।

শেষ পর্যন্ত ধূর্জটিপ্রসাদের সিদ্ধান্ত এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতের সাহায্যে প্রকাশের নতুন প্রয়োজন মিটিয়েছেন। এটা তিনি মিটিয়েছেন “হিন্দুস্থানি সুর পদ্ধতির abstract nature-কে concrete করে, এক কথায় সুরকে humanise করে, অথচ তাকে আর্ট থেকে artifice-এর নিচু পংক্তিতে নামতে না দিয়ে। শুনেছি ও পড়েছি বিলেতে বীট্‌হোফেন্‌ এই কার্য করেছিলেন। যদি সত্য হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই সঙ্গে তুলনা করা চলে, আমাদের দেশে তাঁর সমতুল্য composer জন্মায়নি।”

রবীন্দ্রসংগীতের মহত্ত্বকে এভাবে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-আদর্শই যে সংগীতের একমাত্র আদর্শ একথা ধূর্জটিপ্রসাদ কোনদিন স্বীকার করেননি। এ ব্যাপারে এককালে তাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই একটা তীক্ষ্ণ ও মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, তাঁর সাহস ও সামর্থ্য বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন ছিল : সমস্ত শিল্পে একটা ঐক্য আছে, তার একটা পরিণতি আছে, চলার চেয়ে থামার মূল্য সেখানে কম নয়, কিন্তু ওস্তাদি গানে সেই থামার অনিবার্যতা নেই কেন ? একটা মেয়ে সব অলঙ্কার পরে সামনে এসে দাঁড়াবে— এতো উৎকট প্রদর্শন-বৃত্তি ! উত্তরে ধূর্জটিপ্রসাদ দেখালেন (২৫ মার্চ, ১৯৩৫), এদেশী ক্ল্যাসিকাল সংগীতে দুটো ভাগ আছে : আলাপ ও বন্দেশি। বন্দেশি গানে থাকে রূপের কাঠামোয় গতির সীমা। ধ্রুপদে, কিছু পাকা ঘরানার খেয়ালে এবং ঠুংরিতে এই বন্দেশি রচনার চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে যেখানে রচনা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথের গানকেও এই বন্দেশির কোঠায় ফেলা যায় ; তাঁর মতামতের মধ্যেও ঘটেছে তাঁর “নিজস্ব রচনা পদ্ধতির ছায়াপাত।” মতের গরমিল আলাপকে নিয়ে। “আলাপের গন্তব্য নেই, অথচ উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য বিকাশের মধ্যেই নিহিত। উদ্দেশ্য রাগিণীকে reveal করা···। বন্দেশি গানে শক্তির ব্যবহার রচনার সৌষ্ঠব রক্ষায় ; আলাপে শক্তির ব্যবহার রাগিনীর ক্রমিক বিকাশে, তার জ্ঞানকৃত বিবর্তনে। ···আমাদের আলাপ গতিশীল, তার প্রকৃতিই হলো procession। অতএব, ঠিক তার revelation হয় না, হয় এবং হওয়া চাই revealing।” ···“প্রত্যেক আর্টবস্তুর সময় যখন organic, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ, তখন একই নিয়মে সব আর্টের অনিবার্য পরিসমাপ্তি স্থিরীকৃত হবে কী করে ? ···‘চার অধ্যায়’ পাঁচ অধ্যায় হয় না যেমন, ‘গোরা’ও তেমনি চার অধ্যায়ে শেষ হয় না।” অন্যত্র

('উপক্রমণিকা', ১৯৪৫) তিনি আবার বললেন, ভারতীয় সংগীত নারীর মতোই, তবে সে-নারী বিশেষ এক ধরনের নারী— স্রোতস্বিনীর মতো— যার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূতে' উজ্জ্বলভাবে এঁকে গেছেন। ধূর্জটি-প্রসাদের তাই পাল্টা প্রশ্ন: "নদী কি কখনও তার স্রোতের প্রাচুর্যে লজ্জিত হয়?" শাস্ত্রীয় 'আলাপে'র এমন আধুনিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা এর আগে আর কোথাও দেখিনি। এই বিচার ও সিদ্ধান্ত তাঁর গভীর সংগীত আস্বাদনেরই ফল। তথাপি একথা সম্ভবত ঠিক যে "আজকের ভারতীয় শিল্পীরা যেন তাঁদের আধার-চেতনা (sense of form) হারিয়ে বসেছেন।" রবীন্দ্রসৃষ্টি ও রবীন্দ্রচিন্তা সে হিশেবে আমাদের কাছে একটা মূল্যবান প্রতিষেধক।

রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্যান্য সমসাময়িক গান সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের মনোভাব অত্যন্ত বিচারশীল ও সতর্ক, সঙ্গে সঙ্গে আশাবাদী। বর্তমান সংকলনে "আজকালকার গান" ('সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' শ্রাবণ ১৩৩৬) প্রবন্ধটির দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে যেখানে দিলীপকুমার, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুলের রচনা ও গায়নশৈলী সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট মতামত বিবৃত আছে। দিলীপকুমারের গলা ছিল চমৎকার, তাতে সব রকমের তান ও অলঙ্কার বজায় ছিল। আর ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। "তাঁর গান শুনে সেই মধুর স্বভাব, পবিত্রমনা, স্বাধীনতাপ্রিয় এবং কিঞ্চিৎ অবিমৃষ্য-কারী ব্যক্তির কথাই মনে হত।" কিন্তু "তাঁর ভুল হয়েছিল একটি সংজ্ঞায়। ধ্রুপদ ও খেয়ালের বাঁধাবাঁধি নিয়ম অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি ভাবলেন যে ঠুংরিতেই গায়কের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।" ঠুংরি গজলে কথার সৌন্দর্য, ভাব ও রস বজায় রেখে তান দিতে হয়। সেটা তানের বা তালের যথেচ্ছা-চার নয়, "সেখানে সুর মিশ্রণেরও একটা পদ্ধতি আছে।" রচনা হিশেবে অতুলপ্রসাদের ঠুংরিও পুরো ঠুংরি নয়, তবে তাঁর রচনায় ও সুরে "ঠুংরির গন্ধটুকু আছে।" ঠুংরি গজলের কাছে সম্পূর্ণ আত্মদান না করলেও "ঠুংরি গজলের মধু চুরি করে" তিনি দেশজাত সুরে, এমনকি ভাটিয়াল কীর্তনেও, নবজীবন সঞ্চার করেছেন। তাঁর গলায় ছিল চমৎকার ছোট ছোট তান, আর সেটাই তাঁর গান গাইবার জন্যে বিশেষ দরকার। অযথা তানের প্রাচুর্যে তাঁর রচনা ও সুরের মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়।

১৯২৯-৩০ সালের কাছাকাছি ধূর্জটিপ্রসাদ কলকাতায় এসে দেখলেন "কাজী নজরুলের গান দেশ ছেয়ে ফেলেছে।" কিন্তু "যা ছেয়ে ফেলে তাই ভালো", একথা স্বীকার করতে তিনি নারাজ। নজরুলের গানও ঠুংরি

গজল নয়। তাঁর দেওয়া অনেক সুর শুনতে ভালো লাগলেও "সুরসৃষ্টি হিসেবে তাঁর মূল্য খুব বেশি নয়।" পশ্চিমাঞ্চলের ঠুংরি গজল শোনবার, বিশেষত বাইজীর মুখে শোনবার, সৌভাগ্য যার ঘটেছে সে-ই বুঝবে "এই বাংলাদেশের অভিনব ঠুংরি"র সঙ্গে তার তফাৎ কোথায় এবং কতখানি। কাজীর গান কখনো কখনো বাজার-চল ঠুংরি গজলের অনুকরণ মাত্র। যেখানে তা অনুকরণ নয় "সেখানে তাঁর সুররচনা অত্যন্ত flat সাদামাঠা" ধরনের। ধূর্জটিপ্রসাদের বিশ্বাস এই হাল্‌কা সুরের জন্য তাঁর গলা এবং কবিতাই প্রধানত দায়ী। "তাঁর গলা মোড় খায় না, তাঁর গলায় তান নেই, মীড় নেই।" এই দুর্বলতার ক্ষতিপূরণের জন্যে তাঁর কবিতায় থাকে স্বরবর্ণের তুলনায় ব্যঞ্জনবর্ণের প্রাধান্য, সুরেও আসে তাল-প্রধান ঠুংরি গজলের ছাঁচ। এইসব মতামত ধূর্জটিপ্রসাদ কোনোদিন পরিবর্তন করেছেন আমাদের জানা নেই, বরং এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে তিনি নলিনীকান্ত সরকারের সমালোচনার 'উত্তরে' আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি বলেছেন যে "কাজীর দেওয়া সুরে অনেক স্থলে তবু মিষ্টত্ব আছে, তাঁর ছন্দ জ্ঞান আছে কিন্তু তাঁর শিষ্যবর্গের গান ও সুররচনা একেবারে অশ্রাব্য।" "দিলীপ, অতুলপ্রসাদ ও কাজীর নকলনবীশরা ঠুংরি গজলের শ্রাদ্ধ করছেন।" সান্ত্বনা এইটুকু যে রবীন্দ্রনাথের গানেরও ঐ একই দুর্দশা।

দেশে সংগীতের এই অবনতির জন্যে ধূর্জটিপ্রসাদ দায়ী করেন অংশত গ্রামোফোন কোম্পানিকে, বিশেষ করে তৎকালীন ব্রডকাস্টিং কোম্পানিকে। তাঁদের সামনে বাধাবিপত্তি অনেক, কিন্তু জনমতের শিক্ষার অভাব অজুহাত হিশেবে অচল। আসল প্রয়োজন আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা। "শিক্ষিত ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে হিন্দুস্থানি সংগীত শিখতে হবে, পাখি পড়ার মতন ভালো ভালো গান মুখস্থ করতে হবে। তারপর শিক্ষার্থীর আত্মরক্ষার কথা উঠবে।"

কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক কী রকম হবে? এক সময়ে বাংলাদেশের (অবিভক্ত) শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সংগীতশিক্ষা সম্বন্ধে সকলের মতামত চেয়েছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ যে মতামত জানান সেটি ধরা আছে 'সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র আর একটি প্রবন্ধে (আশ্বিন ১৩৩৪)। কিছু ওস্তাদ আছেন যাঁরা ইস্কুলের পদ্ধতিতে সংগীত শিক্ষার বিরোধী। এই বিরোধিতার যথেষ্ট কারণ আছে, যেহেতু এতে কুশিক্ষা ও কু-সমালোচনার সুযোগ তৈরি হয়, সরকারি হস্তক্ষেপেরও সম্ভাবনা থাকে। অপর পক্ষে, ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে শেখার যেমন গুণ আছে, তেমনি "ওস্তাদের [illegible] থেকে

আত্মরক্ষা করাও তরুণ শিক্ষার্থীর একান্ত কর্তব্য।" সেইজন্যে পুরনো পদ্ধতি নষ্ট না করে, তার আদর্শ গ্রহণ করেও নতুন পদ্ধতিতে, অর্থাৎ ইস্কুলে, সংগীত-শিক্ষা সম্ভব একথা ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন। এ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি নির্দেশ আছে যেগুলো আজও মূল্যবান। বিশেষ করে শাস্ত্রজ্ঞান, স্বরসাধনা ও তাল-লয় শিক্ষার ওপর তিনি অত্যন্ত বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি বরাবরই মনে করতেন, "শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানি পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হবে।" তা না হলে মৌলিকত্ব অর্জন করতেও পারব না, তার মূল্য দিতেও ব্যর্থ হব। উপযুক্ত শিক্ষার পরেই আসে স্বাধীনতার প্রশ্ন। "প্রতিভাশালী ছাত্রের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা আছে," এটা মানতে হবে।

বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সংগীতের ক্ষেত্রেও, ধূর্জটি-প্রসাদ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এমন কি রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক-গায়িকাদের মধ্যেও যাঁরা হিন্দুস্থানি পদ্ধতিতে শিক্ষিত তাঁদের তিনি তাল-লয় সম্পর্কে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। আধুনিক সংগীতে তিনি পরীক্ষা-মূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে নন, তাঁর অভিযোগ কেবল জনরুচিকে সেবা করার মুখোসধারী মুনাফাখোরী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে। "সংগীতে জনরুচির ইতরতা একটা কৃত্রিম বানানো গল্প, কায়দা করে চাপানো।" সংগীত তাঁর কাছে বেঁচে থাকারই অপরিহার্য অঙ্গ। বেঁচে থাকা মানে একসঙ্গে বাঁচা। এক-সঙ্গে বাঁচা একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। সত্যিকার কর্মিষ্ঠ সামাজিক প্রক্রিয়ার জন্যে চাই জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও আত্মৈষণার সক্রিয় বন্ধনমোচন। "সমস্ত প্রক্রিয়ার অঙ্গুলি নির্দেশ হচ্ছে সংগীত ও জনজীবনের মধ্যে সত্যিকার জীবন্ত সংযোগ রচনার প্রয়োজনীয়তার দিকে।" ভারতবর্ষে কিন্তু সকল ভবিতব্য এখনও কেবল সম্ভাবনার স্তরে, তাই দরকার একটা প্রচণ্ড আলোড়নের।

১৯/১, অভয় ঘোষ রোড,
পোঃ নৈহাটি, ২৪-পরগণা

—অনন্ত কুমার চক্রবর্তী

স্মর ও সঙ্গতি

অতুলপ্রসাদের
স্মরণে

ভূমিকা

এই পত্রাবলীর একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ১৯৩৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে All-Bengal Music Competition Conference-এর প্রথম অধিবেশন হয়, রবীন্দ্রনাথ তার উদ্বোধন করেন। সেই সময় আমি লক্ষ্ণৌ থেকে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় চলে আসি। বন্ধুদের আহ্বানে এবং লোভের বশে আমি অধিবেশনে যোগ দিই। রবীন্দ্রনাথ আসছেন শুনে আমি তাঁকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করবার অনুরোধ জানাই। তিনি সে-অনুরোধ রক্ষা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল দুটি, সংগীত ও জীবন নিবিড়ভাবে যুক্ত, অতএব, জীবনের বিকাশ যেমন রূপবৈচিত্র্যে সংসাধিত হয়, সংগীতেরও তেমনি অনুযায়ী অভিব্যক্তি নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতির যুগোপযোগী রূপপরিবর্তন যদি কল্পনার অতিরিক্ত হয় তবে বুঝতে হবে যে তার মৃত্যু হয়েছে। সংগীতের ইতিহাসে যাঁরা যুগপ্রবর্তক বিবেচিত হন তাঁরা কখনও গতানুগতিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের সৃজনী-শক্তিকে আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল বাংলা গানের বিশেষ রূপ সম্বন্ধে। বাংলা গানের একটি স্বকীয়তা আছে— সেটি সুরেরও নয়, কথারও নয়, সুর ও কথার প্রকৃষ্ট মিলনের। তার রস ভিন্ন, কারণ তার রূপ পৃথক। সুতরাং, বাংলা গানের ভবিষ্যৎ ওস্তাদের মুখের হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর অনুকরণের ওপর নির্ভর করছে না, পুনরাবৃত্তির ওপরও না। এই দুটি বক্তব্য তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে বক্তৃতাটি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।

জানুয়ারী মাসে লক্ষ্মৌ ফিরে গিয়েই তাঁকে সংগীত সম্বন্ধে অন্তত একটি পুস্তিকা লেখবার তাগিদ দিতে শুরু করি। স্বাস্থ্যের ও সময়ের অভাবে তিনি পুস্তিকা লিখতে পারেন নি। আমাকে চিঠি দিতেন, আমিও উত্তর দিতাম, প্রশ্ন করতাম। আমার সকল চিঠির নকল রাখিনি। তারপর লাহোর থেকে ফেরবার পথে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি লক্ষ্মৌ-এ তিন দিন অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত এবং শ্রীযুক্তা চিত্রলেখা দেবীর অতিথি হন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে মৌখিক আলোচনারও সুযোগ পাই। এক সন্ধ্যায় গানের জল্সা হয়। তখন তাঁর ১০২ ডিগ্রীর ওপর জ্বর। শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকার ছায়ানট, জয়জয়ন্তী ও পরজের খেয়াল গেয়েছিলেন—রাত্রি এগারটা পর্যন্ত তিনি প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে গান শুনলেন। শ্রীকৃষ্ণের গান তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। আসর ভাঙবার পর তিনি আমাকে বলেন, 'গান আমার খুবই ভাল লাগল। কিন্তু সেই ভাল-লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গোটাকয়েক প্রশ্ন উঠেছে— তোমাকে তার উত্তর দিতেই হবে। গায়কের মুখের গান থামবে কখন? প্রত্যেক রসসৃষ্টিতেই একটি থামবার ইঙ্গিত থাকে— ধ্রুপদে আছে, বাংলা গানে আছে, যদু ভট্টের, গোঁসাইয়ের গলায় ছিল, কিন্তু খেয়ালে থাকবে না কেন? একই গানে গায়ক তার সমগ্র কৃতিত্ব, তার সব ঐশ্বর্য ঢেলে দেবেন কেন? একটা ছায়ানটের স্থানে দশটা দশ রকম চালের ছায়ানট গাও, আমার অত্যন্ত ভাল লাগবে, কিন্তু একটি রচনায় ছায়ানটের সব রূপ দেখালে, তার সমগ্র বিভব ভ'রে দিলে, রচনার মর্যাদা, তার সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব রক্ষা হয় কি?' রাত বার'টা পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে কথা কন। তখন আমি উত্তর দিতে পারি নি, আমার দীর্ঘ পত্রে উত্তর দেবার প্রয়াস আছে। এই হল 'সুর ও সঙ্গতি'র ইতিহাস।

কিন্তু প্রশ্নগুলি সাংঘাতিক—তাদের উত্তরের ওপর সংগীতের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের সম্ভোগ ও সমালোচনার প্রকর্ষসাধন নির্ভর করছে। শরৎবাবুও দিলীপকুমারকে বলেছিলেন, 'ওস্তাদ গায় ভাল বলছ— কিন্তু থামতে জানে ত?' রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যখন উভয়েই থামতে জানার প্রয়োজন স্মরণ করাচ্ছেন, তখন বুঝতে হবে যে বিরাম চাওয়ার মধ্যে অধৈর্য নেই, আছে উপভোগের প্রকৃতিকে শুদ্ধ করবার উপদেশ, আছে সংগীতে সঙ্গতির সুনিশ্চিত ইঙ্গিত।

আমাদের দেশে সংগীত-সমালোচনা নেই বল্লেই হয়। তার নানা কারণ। হিন্দুস্থানী সংগীতের এমন মুমূর্ষু অবস্থা— তার উন্নতি অসম্ভব

ধারণাটাই তার চিহ্ন। যখন সৃষ্টি অর্থাৎ অভিনব-রূপের বিকাশ চলছে, তখনই সমালোচনা জীবন্ত হয়। নচেত, ভাল লাগা না লাগাতেই বিচারের শেষ। যে-যুগে সৃষ্টি সেই যুগেই সমালোচনা, মজুরী বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মঘট। আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রতি নতুন আগ্রহ জেগেছে— তাই এই সময় সমালোচনার প্রয়োজন উঠল। নতুন আগ্রহের একদিকে হল পুনরুদ্ধার ও পুনরাবৃত্তি, অন্যদিক হল নতুন ঢঙ্‌এর সৃষ্টি। ঐতিহ্যের প্রধান গুণ হল এই যে তাকে নতুনের বিচার-দণ্ড হিসেবেও ধরা যায়। এইখানেই পুনরুদ্ধারের আধুনিক প্রয়োজন। কিন্তু পুরাতন সংস্কৃতি নব্য-প্রয়াসে বিচারের জন্য ব্যবহৃত হল কি তাকে শাস্তি দেবার জন্য দণ্ড হিসেবে চালান হল বিচার করবে কে ?

সাহিত্য-সমালোচনায় যা হচ্ছে সংগীত-সমালোচনাতেও তাই হবে। বাংলা সাহিত্য আজকাল বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেণীতে ওঠবার প্রয়াসী, তাই যিনি লেখক ব'লে গণ্য হবার দাবী করেন তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যের পরিমাণে পরীক্ষিত হ'তে সদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। পরীক্ষকের স্বজাতি বলেই তিনি পার পাবেন না। কিন্তু আমাদের সংগীত এখনও বিশ্বের সাথে যুক্ত হয় নি। সেটা যে অন্য দেশের সংগীতের মতনই এক প্রকারের সংগীত, অতএব তার যথাবিহিত সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে, এটুকু আমরা অনেকটা হয়ত বুঝেছি যে বাঙালীও মানুষ, তার অনুষ্ঠান জাগতিক অনুষ্ঠানের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তার জীবন অন্য জাতির জীবনের সাথে যুক্ত। সাহিত্যে তাই আজকাল আমরা এখনও নিরালম্ব রয়েছি, তার বিশেষত্বে এবং চরম উৎকর্ষে আমরা এতই আস্থাবান যে তার ওপর সাধারণ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করি। অন্য সভ্য-সমাজে সংগীত আছে, সে দেশে সংগীতের নতুন রূপ তৈরি হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে সংগীত-সমালোচনা অনেক দূর এগিয়েছে জানলে বোধ হয় আমাদের অবস্থার আংশিক উন্নতি সম্ভব।

বলা বাহুল্য, বিদেশী সংগীতপদ্ধতির অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হলে আমাদের সংগীতের উন্নতি অসম্ভব। তবে পূর্ব-লিখিত দুটি কারণ ব্যতীত অন্যান্য যে-সব বিপত্তির জন্য আমাদের ধ্রুবপদ্ধতি লোপ পেতে বসেছে তাদের দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির দিকেও ঝোঁক দিতে হবে এবং সংগীতকে যে অন্যান্য কলাবিদ্যার মতন বিচার করতে হবে— এ কথা জোর করেই বলা যায়। অন্য কলাবিদ্যার আলোচনায় সৃষ্টির সমগ্র

রূপ, তার অন্তর্নিহিত অনিবার্য পরিণতির নীতি প্রথমেই বিচার্য। কবি তাই সংগীতের সীমা ও সঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বাংলা দেশের সংগীত সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই যে বাঙালী অনুকরণ করতে পারবে না, সে সৃষ্টি করবেই করবে, এবং তার সংস্কৃতি অনুসারে সে চলবেই চলবে। বাংলা দেশের সংগীতের ধারাই হল সুর ও কথার সমন্বয়-সাধনে সৃষ্টি।

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের এই মতামত সকলের প্রণিধান-যোগ্য। তাঁর বক্তব্য সংগীত নিয়ে, তাঁর নিজের রচনা নিয়ে নয়। সংগীত সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার তাঁর অধিকার আছে। তিনি হিন্দুস্থানী সুরে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারা আজন্ম পরিবৃত, নিজে ওস্তাদ না হয়েও হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর সঙ্গে পরিচিত, নানাপ্রকারের সংগীত তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যে অনেকগুলি শুদ্ধ, বাকীগুলি মিশ্রিত, এবং তিনি অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ সংগীত শুনেছেন। সব চেয়ে বড় কথা এই যে তিনি একজন সর্বোচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ও রসজ্ঞ। যাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা আমাদের নানা কলাবিদ্যাকে বিশ্বের দরবারে এনেছে তাঁর সংগীতের রূপ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতামত অতিশয় মূল্যবান। একমাত্র বিশেষজ্ঞের দাম্ভিকতাই তার সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে। যিনি রসসৃষ্টির অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে বিশ্বাস করেন তিনিই সশ্রদ্ধভাবে কবির মন্তব্য বিচার করবেন। গ্রহণ নয়, অনুকরণেও নয়, নির্বাচনে।

পত্র-বিনিময়ে আমার অংশ সামান্য। আমি কেবল তাঁকে চিঠি লিখতেই অনুরোধ করেছি। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তরফ থেকে যতটুকু বলা আমার পক্ষে শোভন ও সম্ভব আমি তাই বলেছি। আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি তাঁকে বিরক্ত করবার সুবিধা পাননি হয়ত, আমি সেই সুযোগ পেয়েছি— এইটুকুই আমার ভাগ্য। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আছে— এই খবরটুকু দেবার প্রয়োজন স্বীকারেই আমার লজ্জা।

বিশেষজ্ঞের প্রতি আমার প্রথম অনুরোধ— তাঁরা যেন ভোলেন না যে রবীন্দ্রনাথ অন্তত তাঁদের মতনও বুদ্ধিমান। এই বিশ্বাসটুকু থাকলে বিচারের ও সমালোচনার অগ্রসৃতি সম্ভব হবে। আমার দ্বিতীয় অনুরোধ— তাঁরা যেন এই পুস্তিকার বিচারে কবির সংগীত-রচনার বিচার না করে বসেন। আমি নিজে এই দোষ করেছি— কবি সাবধান করেও দিয়েছেন। কিন্তু কবি পত্রই লিখেছিলেন, আমিও ছাপাবার জন্য উত্তর দিইনি। তাঁর

পত্রের মৌলিক রস অক্ষুণ্ণ রাখাই আমার কর্তব্য— কে তাঁর মতো চিঠি লিখতে পারে! তাঁর চিঠির উত্তরে আমার প্রবন্ধ হতো তাঁর অপমান। তাই ভুল সংশোধন করতে মন চাইল না।

বাংলা অক্ষরে ইটালিক্স্ চলে না, তলায় দাগ দিলে পাঠ্যপুস্তকের মতো দেখায়। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক মতামত সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা মন থেকে চলে যাবে, এই আমার দুরাশা। শেষের চিঠিটার প্রতি আধুনিক রচয়িতার ও গায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁর ধ্রুপদ প্রীতিও লক্ষ করবার জিনিস।

তারিখ অনুযায়ী চিঠিগুলি সাজান নয়, যুক্তি অনুযায়ী।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার অধ্যাপকীয় চিত্তবৃত্তি আমার কাছে ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কুঁড়েমি জিনিসটার উপর তোমার কিছুমাত্র দয়ামায়া নেই। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাবেই এই তোমার কঠিন পণ। কিন্তু সম্প্রতি এমন মানুষের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া চলবে, যে চিরকাল ইস্কুল-পালানে, কুঁড়েমি যার সহজধর্ম। বাল্যকাল থেকে কত কর্তব্যের দাবি আমাকেই আক্রমণ করেছে, প্রতিহত হয়েছে বারবার। নইলে আজ তোমাদের মতো এম. এ. পাস ক'রে নাম করতে পারতুম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়ো উপাধি নিয়ে লজ্জা রক্ষা করতে হত না। তুমি বলছ সংগীত সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে আড়াইশো পাতা-ব্যাপী আনাড়িতত্ত্ব প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। সেটা যে ঘটবে না তার প্রথম ও প্রধান কারণ আমার সমুদ্ধত কুঁড়েমি। যারা কর্তব্যের তাড়া খেয়ে খেটে মরে তারা তো মজুর শ্রেণীর। তাদের কেউ বা বৈশ্যজাতীয়, কর্তব্যসাধনে যাদের মুনাফা আছে; কেউ বা পরের ফর্মাশে কর্তব্য করে, তারা শূদ্র; কেউ বা কর্তব্যটাকে গদাস্বরূপ ক'রে হন্যে হয়ে বেড়ায়, তারা ক্ষত্রিয়। আবার কেউ বা কর্তব্য করে না, কাজ করে— যে কাজে লোভ নেই, লাভ নেই, যে কাজে গুরুমশায়ের শাসন বা গুরুর অনুশাসন নেই; তাদের জাতই স্বতন্ত্র। যখন তুমি বৌদ্ধিক অর্থনীতি সম্বন্ধে বই লিখবে তখন আমার এই তত্ত্বকথাটা চুরি করে চালিয়ো, নালিশ করব না। যে-সব বই লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বই লিখিনি; সংগীত সম্বন্ধে আমার মাস্টারপীস্‌টা সেই অলিখিত রচনারত্নভাণ্ডাগারে রয়ে গেল। আমার সব মত যদি নিজেই স্পষ্ট করে লিখে দিয়ে যাব তবে যারা থীসিস্‌ লিখে খ্যাতি অর্জন করবে তাদের যে বঞ্চিত করা হবে। সেই সব অনাগতকালের থীসিস্‌-রচয়িতার কল্পচ্ছবি আমার মনের সামনে ভাসছে, তারা একাগ্রচিত্তে অতীতের আবর্জনাকুণ্ড থেকে জীর্ণ বাণীর ছিন্ন অংশ ঘেঁটে বের ক'রে তার ঘণ্ট

তৈরি করছে— যে অংশ পাওয়া যাচ্ছে না সেইটেতেই তাদের মহোল্লাস। আমি তাদের আশীর্বাদভাজন হতে চাই। ইতি মাঘ ১৩৪১

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ধূর্জটি, তোমাকে লেখা একটা পুরোনো চিঠির প্রতিলিপি আমি রেখে-দিয়েছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল। দেখতে পাচ্ছি তোমাকে নানা পত্রে গান সম্বন্ধে আমার মত জানিয়েছি। আবার নতুন করে আমাকে তাগিদের দ্বারা চিঠিয়ে তুলছ কেন? এ সম্বন্ধে আমার মত সর্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করলে বাঙালীর সংস্কৃতিসমুন্নতির সবিশেষ সহায়তা করবে ব'লে দুরাশা মনে রাখি নে। পত্রনিহিত মতগুলি সংগ্রহ করে বা তদ্দ্বারা কীটপালনে যদি তোমার আগ্রহ থাকে আমার অসম্মতি নেই। জীবনে অনেক কথাই বলেছি, কিন্তু অনুচ্চারিত রয়েছে ততোধিক পরিমাণে, হয়তো বা ভাবীকাল তাদের জন্যেই বেশি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...বাংলা দেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু, এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে প্রাণের দিকে; ভিতরে-ভিতরে রাগ-রাগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। বর্তমানে এর অনুরূপ আদর্শ দেখা যায় আমাদের বাংলা সাহিত্যে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এর আন্তরিক যোগ বিচ্ছিন্ন হলে এর স্রোত যাবে মরে; অথচ খাতটা এর নিজের, এর প্রধান কারবার নিজের দুই পারের ঘাটে ঘাটে। অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে, যেমন হয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে। কিন্তু, অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি, নিজের টিকি পর্যন্ত দেখা যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি। ওর আশ্রয় না ছাড়তে পারলে ঘরজামাইয়ের দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না। তাই ব'লে স্ত্রীকে বজায় না রাখলে ঘর-

চলে না। কিন্তু, স্বভাবে ব্যবহারে সে স্ত্রীর ঝোঁক হওয়া চাই পৈতৃকের চেয়ে শ্বাশুরিকের দিকে, তবেই সংসার হয় সুখের। আমাদের গানেও হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি— কিন্তু বাঙালীর ঘরে সে তো আতিথ্য দিতে আসবে না— সে নিজেকে দেবে, নইলে উভয়ের মিলন হবে না। যেখানে পাওয়াটা সম্পূর্ণ নয় সেখানে সে পাওয়াটা ঋণ! আসল পাওয়ায় ঋণের দায় ঘুচে যায়— যেমন স্ত্রী, তাকে নিয়ে দেনায় পাওনায় কাটাকাটি হয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা ঐ। তাকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদি করবার জন্যে নয়। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী বিধি বিশুদ্ধ ভাবে মিলছে না দেখে পণ্ডিতরা যখন বলেন সংগীতের অপকর্ষ ঘটছে, তখন তাঁরা পণ্ডিতী স্পর্ধা করেন— সেই স্পর্ধা সব চেয়ে দারুণ। বাংলায় হিন্দুস্থানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে; এ সৃষ্টি প্রাণবান, গতিবান, এ সৃষ্টি শৌখিন বিলাসীর নয়— কলাবিধাতার। বাংলায় সাহিত্যভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিতীর জয় হলে বাংলা ভাষা আজ সীতার বনবাসের চিতায় সহমরণ লাভ করত। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেছে ব'লেই বাংলা ভাষায় সৃষ্টির কার্য নব নব অধ্যবসায়ে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। বাংলা গানেও কি তারই সূচনা হয়নি? এই গান কি একদিন সৃষ্টির গৌরবে চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সংগীতকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে যাবে না? ইতি ১৩ই আগস্ট ১৯৩২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমি বারবার দেখেছি বর-ঠকানে প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে তোমার যেন একটা সিনিস্‌টর্‌ আনন্দ আছে। এবারে কিন্তু সময় খারাপ। ভিনগাঁয়ে যেতে হবে, লেকচার দেবার ডাক পড়েছে। মনের মধ্যে কথা বয়ন করবার যে তাঁতটা ছিল, এতকাল সে ফর্মাশ খেটেছে বিস্তর; এখন ঘনঘন টানা-পোড়েন আর সয় না, কথায় কথায় সুতো যায় ছিঁড়ে।

তুমি যে প্রশ্ন করেছ তার উত্তর সেদিনকার বকুনির * মধ্যে কোনো একটা জায়গায় ছিল বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয় যেন বলেছিলুম ঘরবাড়ি বালাখানা আপন-খেয়াল-মত বানানো চলে, কিন্তু যে ভূতলের উপর তাকে খাড়া করতে হবে সেই চিরকেলে আধারের সঙ্গে তার রক্ষা করাই চাই। তুমি জানো সংগীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলি নে। কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকালে শিশুবোধে দেখেছি প্রেয়সীকে পত্র লেখবার বিশেষ পাঠ ও রীতি বেঁধে দেওয়া ছিল, সেটাতে তখনকার কালের প্রবীণদের সম্মতি ছিল সন্দেহ নেই। তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাক, প্রেমলিপি লেখবার সেই ছাঁদ যথার্থই অত্যন্ত মনোহর— কিন্তু, কালান্তর ঘটতেই, অর্থাৎ যৌবনকাল উপস্থিত হতেই দেখা যায় সে ভাষায় কোনো পক্ষের মেজাজ সায় দেয় না। তখন স্বতই যে ভাষা দেখা দেয় তার মধ্যে পিতৃ-পিতামহদের অনুমোদিত ধ্রুবনির্দিষ্ট শব্দলালিত্য ও রচনানৈপুণ্য না থাকতে পারে, ব্যাকরণের বিশেষত বানানের ভুলচুক থাকাও অসম্ভব নয়, দুটো একটা ইংরেজি শব্দও তার মধ্যে হয়তো অগত্যা ঢুকে পড়ে, কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ত মুরুব্বিরা যাই বলুন না কেন তার মধ্যে যে সহজ রসসঞ্চার হয় তাকে অবজ্ঞা করা চলবে না। সেই মুরুব্বিরাই যদি ষোড়শী চতুর্থপক্ষীয়ার দিকে দুর্নিবার ধাক্কায় ঝুঁকে পড়েন, তবে হঠাৎ দেখা যাবে তাঁদের ভাষাও শিকল ছিঁড়েছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মূল ভাষাটা বাংলা, সেখানে সেকাল একালের নাড়ীর যোগ। এই ভাষা বহু শতাব্দীর বহু নরনারীর বিচিত্র ভাবনা কামনা ও বেদনার নিরন্তর অভিঘাতে বিশেষ ভাবে প্রাণময় চিন্ময় দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে, বিশেষভাবে বাঙালীর চিন্তা ও ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যেই তার সৃষ্টি। এই জন্যে, কোনো বাঙালীর যতই প্রতিভার জোর থাক্‌, বিদেশী ভাষার ভূমিতে সাহিত্যের কীর্তিস্তম্ভ সে স্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে পারে না। আমাদের বাংলা ভাষার রূপ বদল হচ্ছে নিয়তই, বদল হতে পারে এই তার মহৎ গুণ— কিন্তু, সমস্ত বদল হবে তার আদিপ্রকৃতির উপর ভর দিয়ে।

গান সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। ভারতবর্ষের বহু যুগের সৃষ্টি-করা যে সংগীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়? পশ্চিম

* First All Bengal Music Competition and Conference-এর (Senate House, December 1934) উদ্বোধন।

মহাদেশেও বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু সেখানে ভাড়াটে বাড়ির ভাড়া জোগাব কোথা থেকে? বাংলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত, তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষী-দল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ সহ দূর ভাবীশতাব্দীর প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না। হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন সেই ডিক্‌টেটাবৃন্দের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ তার স্থান নেই— ওইখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধা-সহকারে ঘোষণা করে থাকেন— তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম। সেই প্রতিবাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্তনকাররাও করে গেছেন। ইতি ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয় ধূর্জটি

কাল পর্যন্ত গেল বসন্ত-উৎসবের আয়োজনে। আগামী কাল চলেছি কলকাতায়। এরই মাঝখানে এক-টুকরো অবকাশ— সংক্ষেপে সারতে হবে তোমার ফর্মাশ। তোমাদের ওখানে গানের মজলিশে ছায়ানট গাওয়া হয়েছিল। ঘড়ি দেখি নি, কিন্তু অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে তাতে মনে হল একঘণ্টা পেরোলো বা। ছায়ানটের যত রূপরূপান্তর আছে, তান-কর্তব সারেগম, যত রকম লয়ে-বিলয়ে তাকে উল্‌টোনো পাল্‌টানো যেতে পারে তার কিছুই বাদ পড়ে নি। আমার অভিমত কী জানতে চাও? সময় খারাপ, বলতে সাহস করি নে! তোমাদের মেজাজ ভালো নয়। মতবিরোধ নিয়ে তোমরা যাকে যুক্তি বলো আমরা তাকে বলি গাল— ঘাঁটাতে ভয় করি। তা হোক, গীত-আলোচনায় যদি তোমার কানের সঙ্গে আমার কানের প্রভেদ দেখতে পাও তা হলে এই ব'লে তার কারণ নির্ণয় কোরো যে, তুমিই বিজ্ঞ, আমি অনভিজ্ঞ; তারো ঊর্ধ্বে উঠে

লোকবিশ্রুত উদারকর্ণসম্পন্ন জীবের উপমা ব্যবহার কোরো না— এরকম সাহিত্যরীতিতে আমরা অভ্যস্ত নই।

জানতে চেয়েছ ভালো লাগল কিনা। লেগেছে বইকি, কিন্তু ভালো লাগাই শেষ কথা নয়। বেঙ্গল ষ্টোর্সে গিয়ে যখন অসংখ্য রকম দামী কাপড় সারা প্রহর ধরে ঘেঁটে বেড়াই, ভালো লাগে, আরো ভালো লাগে, থেকে থেকে চমক লাগে, সংগ্রহের তারিফ করতে হয়। কিন্তু সুন্দরীর গায়ে যখন মানানসই একখানি মাত্র শাড়ি দেখি, বলি, বাস্! হয়েছে! বলি নে ক্রমাগত সব কটা শাড়ি ওর গায়ে চাপালে ভালোর মাত্রা বাড়তেই থাকবে। সব কাপড়গুলোই সমজদারের চোখে চমৎকার ঠেকতে পারে, যত সেগুলো উলটে-পালটে নেড়ে-চেড়ে দেখে ততই তারা বলে ওঠে! ক্যা তারিফ্! সোভান আল্লা! ঠিকঠাক্ বলতে পারে কোনটাতে কত ভরি সোনার জরি, আঁচলার কাজ কাশ্মীরের না মাদুরার। মাঝের থেকে চাপা পড়ে যায় স্বয়ং সুন্দরী। ইংরেজী ভাষায় বলতে পারি, যদি ক্ষমা করো: Art is never an exhibition but a revelation. exhibition-এর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelation-এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা ব'লে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরি। ওস্তাদী গানে সেই জরুরি নেই, সে কেন যে কখনোই থামে তার কোনো অনিবার্য কারণ দেখি নে। অথচ সকল আর্টেই সেই অনিবার্যতা আছে, এবং উপাদানপ্রয়োগে তার সংযম ও বাছাই আছে। বস্তুত ছায়ানটের ব্যাপক প্রদর্শনী আর্ট নয়— বিশেষ গানে বিশেষ সংযমে বিশেষ রূপের সীমাতেই ছায়ানট আর্ট হতে পারে। সে রূপটাকে তানে-কর্তবে তুলো ধুনে দিতে থাকলে বিশেষজ্ঞ-সম্প্রদায়ের সেটা যতই ভালো লাগুকনা, আমি তাকে আর্টের শ্রেণীতে গণ্যই করব না। স্যাকরার দোকানে ঢুকলে চোখ ঝল্-মলিয়ে যাবে; কিন্তু, দোহাই তোমাদের, প্রেয়সীকে দিয়ে স্যাকরার দোকানের সখ মিটিয়োনা— সেই প্রেয়সীই আর্ট্, সেই'ই সম্পূর্ণ, সেই'ই আত্মসমাহিত। প্রোফেশনালের চক্ষে প্রেয়সীকে দেখো না, দেখো প্রেমিকের চক্ষে। প্রোফেশনাল বড়োবাজারে খুঁজলে মেলে, প্রেমিক বাজারের তালিকায় পাই নে, তিনি থাকেন বাজারের বাইরে— 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।' এইবার গাল শুরু কর। আমি চললুম। ইতি ২১শে মার্চ [১৯৩৫]

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিঠিখানা পেয়েছ শুনে আরাম পেলুম। সামান্য কারণে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্য দূর হল।

কিন্তু, তুমি আমাকে সংগীতের তর্কে টেনে বিপদে ফেলতে চাও কেন? তোমার কী অনিষ্ট করেছি? এর পরেও যদি টিঁকে থাকি তাহলে হয়তো ছন্দের প্রশ্ন পাড়বে।

আমার যা বলবার ছিল সংক্ষেপে বলেছি। বিস্তারিত বললে শর-সন্ধানের লক্ষ্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া অত্যন্ত সহজ কথা কী করে বৃহদায়তন অত্যন্ত বাজে কথা করে তোলা যায় আমি জানি নে। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের বক্তৃপদ ছেড়ে দিয়েছি, বাক্-বাহুল্যের অভ্যাস বেশিদিন টিঁকল না।

বিষয়টা truism অর্থাৎ নেহাত-সত্যের অন্তর্গত। আমি তোমাকে আর্টের সর্বজনবিদিত লক্ষণের কথা বলেছি— বলেছি আকার নিয়ে, কলেবর নিয়ে তার ব্যবহার। তোমরা যদি বলো হিন্দুস্থানী সংগীত রাগরাগিণীর প্রটোপ্লাজ্‌ম্‌, অর্থাৎ ওর আয়তন আছে, অসম্ভব রকমের স্থিতিস্থাপক প্রাণও আছে, সে প্রাণ পরিবর্তনহীন আদিতম যুগেরও বটে, রস-রসায়নের বিশ্লেষণের দ্বারা ওর বিশেষ বিশেষ উপাদানেরও তালিকা বের করা যেতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো পরিমিত আকৃতির তত্ত্ব নেই, ও যথেচ্ছ ফুলে উঠতে পারে, লম্বা হতে পারে, চওড়া হতে পারে, চ্যাপ্টা হয়ে এগোতে এগোতে তিন চার পাঁচ ঘণ্টাকে আপনার তলায় সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে, তবে আমি তোমাদের কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হব, কারণ আমি ওস্তাদ নই— কিন্তু, বলব তাহলে ওটা আর্টের কোঠায় পড়ে না। তোমরা বলবে নাম নিয়ে মারামারি করে লাভ নেই, আমাদের ভালো লাগে এবং ভালো লাগে ব'লেই যত বেশি পাই ততই স্ফূর্তি লাগে। যখন দেখি যথেচ্ছ পরিমাণ পাওনা-বিস্তারে তেমাদের কোনো আপত্তি নেই তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের ভালো লাগার প্রকৃতি কী। তোমাদেরই মতো আমারও ভালো লাগে, সেটা লোভীর ভালো লাগা। আর্টিস্ট অলুব্ধ। সে স্বাদগ্রহণের উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ ক'রে ভালো লাগার অমিতাচারকে অশ্রদ্ধা করে। সোনা জিনিসটা উজ্জ্বল, তার সু-বর্ণটা মনোহর, দুর্লভ খনিজ বলে তার

দাম আছে। বসুন্ধরা আপন রত্ন বের করে দেওয়া সম্বন্ধে মিঞাসাহেবদের চেয়ে কম কৃপণ নন। এক তাল সোনা এনে ধরা হল, তুমি বল্‌লে 'বহুৎ আচ্ছা'। আর এক তাল এল, তুমি বল্‌লে সোভান আল্লা। সংগীতের যক্ষভাণ্ডার থেকে তালের পর তাল আসতে লাগল দুন চৌদুন বেগে, বাহবা দিতে দিতে তোমার গলা যায় ভেঙে। মূল্যের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; কিন্তু সে মূল্য যক্ষরাজের খাতাঞ্চিখানার। সে মূল্যের গাণিতিক অঙ্কে 'আরও' 'আরও' 'আরও' চাপিয়ে যাওয়া চলে। সরস্বতীর কমলবনে সোনার পদ্ম আছে; সেখানে লোভীর মতো 'encore' 'encore' করে চিৎকার চলে না। বেনের দল যতই দুঃখিত হোক, শতদলের উপর আর-একটা পাপড়ি চাপানো চলবেনা। সে আপন সম্পূর্ণতার মধ্যে থেমেচে ব'লেই সে অপরিসীম। ভাণ্ডারের ধনে আর ওর ফর্মাশ চলে কিন্তু আনন্দের ধনের দিকে তাকিয়ে বলে থাকি, 'নিমেষে শতেক যুগ বাসি।' রামচন্দ্র সোনার সীতা বানিয়েছিলেন। সোনার প্রাচুর্য নিয়ে যদি তার গৌরব হত তাহলে দশটা খনি উজাড় করে যে পিণ্ডটা তৈরি হত তার মতো সীতার শোকাবহ নির্বাসন আর-কিছু হতে পারত না। রামচন্দ্রকে 'থামো' বলতে হয়েছে। কিন্তু ছায়ানটের অক্লান্ত প্রগল্‌ভতার মুখে 'থামো' বলবার সাহস আমাদের জোগায় না, তাতে ভুজবলের প্রয়োজন হয়। এইবার এই তর্ক সম্বন্ধে 'থামো' বলবার সময় হয়েছে, অন্তত আমার তরফে। ইতি ১৬চৈত্র ১৩৪১

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরম পূজনীয়েষু,

আপনি লিখেছিলেন, 'আমি বারবার দেখেছি বর-ঠকানে প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে তোমার যেন একটা সিনিস্‌টিব্‌ আনন্দ আছে।' কিন্তু সে রাতের আদরের পর আমাকে আপনি যে-দুটি সাংঘাতিক প্রশ্ন করেছিলেন তাদের এবং এই চিঠিদুটির যথাযথ উত্তর দেবার অক্ষমতা লক্ষ্য করে আপনার ভাষাই আপনার ওপর নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন আমি বুঝলাম আপনি যে ব্যারিস্টার হন নি সেটা কেবল নৃপেন্দ্র সরকারের ভাগ্য জোরে, আপনার নিজের কৃতিত্ব তাতে বেশি নেই। আজ তিন চার সপ্তাহ ধরে কী উত্তর দেব ভাবছি। যা জুটেছে তাই গুছিয়ে লিখছি।

মনে হয়— কোথায় আমরা একমত প্রথমে জেনে রাখলে কোথায় এবং কতটুকু আমাদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে। আর্টের প্রকৃতি **revelation** এবং **revelation**'এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে এই মন্তব্যের পর আপনি লিখেছেন, 'সেই ঐক্যে থামা ব'লে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়।' এই বাক্য থেকে আপনি সংগীতে গতির আনন্দ বাদ দিতে চান না, উপভোগই করতে চান পরিষ্কার বোঝা যায়। সেদিনকার এবং আরো অন্যদিনের কথোপকথনে, উচ্চসংগীত শোনবার সময় আপনার আনন্দময় একাগ্রতায় এবং বিশেষত প্রথম চিঠির মারফত ধ্রুবপদ্ধতি সম্বন্ধে মতপ্রকাশে উচ্চসংগীতের প্রতি আপনার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা— তার মহিমা গাম্ভীর্য ও মাধুর্য ভোগ করবার আগ্রহ ও ক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। অতএব আমার সিদ্ধান্তই ঠিক। যে পথ চলাতেই আনন্দ পায় সে কখনও গতিকে উপেক্ষা করতে পারে না। যে চিরজীবন গতানুগতিকের স্থাণুতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করে এল তার পক্ষে রাগিণীর চলিষ্ণু রূপ-উদ্‌ঘাটনে অসহিষ্ণু হওয়া অসম্ভব। থামতে আপনার ধর্মে বাধে— তাই এই সেদিনও 'পুনশ্চ' ও 'চার অধ্যায়' লিখলেন। আমিও আপনার সমধর্মী, এইখানেই আমাদের যথার্থ মিল। মিলের জোরে আমরা উভয়েই হিন্দুস্থানী সংগীতের একান্ত ভক্ত হয়েও তার চিরাচরিত পদ্ধতির মুক্তি চাই। মুক্তি, মৃত্যু নয়। কারণ, বাঁচা মানেই চলা। অনুকৃতির শিকল প'য়ে বন্দীরাই খুঁড়িয়ে হাঁটে। স্বাধীন দেশের উপযুক্ত সংগীত মন্ত্র আওড়ানোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি মুক্তি চাই ব'লেই আপনার সংগীত-রচনার ঐতিহাসিক সার্থকতা ও অধিকার স্বীকার করি। সে মুক্তি আমাদেরই মুক্তি জানি ব'লে আপনার রচনাকে বিদেশী সংগীতের সঙ্গে তুলনা করি না; আমাদেরই পরিচিত অন্য সংগীতের পাশে বসাই, তারই সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজি। যখন নূতনের সঙ্গে পুরাতনের গরমিল দেখি তখন মাত্র গরমিলের জন্যই নূতনকে অবহেলা করি না; আমাদের সংগীতপদ্ধতির শ্রীক্ষেত্রে তাঁকে ঠাঁই দিই, হরিজন বলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করি না। আমার বিশ্বাস আপনার সংগীতকে সংগীতের হরিজন বললেও তার অপমান করা হয় না। ভারতীয় কৃষ্টিরক্ষার ভার যদি এতদিন কেবল পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতেই থাকত, তা হলে সংস্কৃতির ধারা এতদিন মরুতেই সারা হত। কিন্তু— হয় নি, হয় নি গো, হয় নি হারা। এই হরিজনেরাই পাণ্ডাপূজারীর হাতের বাইরে গিয়েই সৃষ্টির সামর্থ্য অর্জন করেছে। আমাদের সংস্কৃতির ধারা যদি এখনো নৌবাহ্য থাকে তো সে ওই হরিজনেরই কৃপায়। লোকসংগীতই মার্গ ও দরবারী সংগীতের কালান্তরে নিজের রক্ত দিয়ে প্রাণসঞ্চার করে এসেছে। পরে, অকৃতজ্ঞও হয়েছে সনাতনপন্থীরা। ইতিহাসেও

প্রমাণ আছে— আকবর-বাদশাহের দরবারে গোয়ালিয়র অঞ্চলের চাল, অর্থাৎ নবপ্রবর্তিত ধ্রুপদ শুনে আবুল ফজল আফশোষ জানিয়েছিলেন। সেকালের ধ্রুপদ নাকি হরিজন সংগীত— অর্থাৎ দরবারের অনুপযুক্ত বিবেচিত হত! মাদ্রাজের বড় বড় পণ্ডিত ও ওস্তাদ এখনো তানসেন প্রবর্তিত উত্তরভারতীয় গায়কি পদ্ধতিকে অহিন্দু যবনদুষ্ট ও ভ্রষ্ট বলে থাকেন, আমি নিজ কানে শুনেছি। বলা বাহুল্য আমরা উত্তরভারতীয়রা ওই মতে সায় দিই না। ডাঃ সুনীতিকুমারের মতো হিন্দুও তানসেন সম্বন্ধে প্রবাসীতে উচ্চপ্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন! আমাদের মধ্যে অনেকেই তানসেনকে সংগীতের অবতার গণ্য করেন। আপনি কয়েক শতাব্দী পরে ওই রকম পদে অধিষ্ঠিত না'ও হতে পারেন। কিন্তু, আপনার সংগীত-রচনায় ও সংগীতের মুক্তিদানের যুক্তির বিপক্ষে মন্তব্য কখনো কখনো ধ্রুপদের বিপক্ষে আবুল ফজলের আপত্তির পুনরুক্তি শোনায় ব'লেই সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার ও কর্তব্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত ও মুক্ত করতে পারি না। সংগীতের যদি প্রাণ থাকে তবে তার ইতিহাসও থাকবে, যদি তার ইতিহাস থাকে তবে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা— তার সাথে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নতুন রূপ দেবার দায়িত্ব— কখনো কোনো স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির ঘুচবে না; তাকে ভেঙে গড়ার কর্তব্য থেকে কোনো স্রষ্টাই অব্যাহতি পাবেন না। আমাদের দেশের বড় বড় রচয়িতা সস্তায় অব্যাহতি পেতে চান নি। আমাদের সংগীতের ইতিহাস অনু-করণের তমসায় আচ্ছন্ন নয়। সে যাই হোক— কোনো তুলনা না করে বলছি, আপনার সংগীতরচনায় এই দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাই।

আপনি নিজে, ভদ্রতাবশত, আপনার সংগীতের কোনো উল্লেখ করেন নি। ভালই করেছেন। আমি উল্লেখ করছি, কারণ, আমি বুঝেছি— মনের সঙ্গে লুকোচুরি করে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস যে, আপনি সংগীতরচয়িতা এবং আপনার রচনার সাংগীতিক মূল্যও আছে। কত বেশি কত কম, কার তুলনায়, এ সব আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তর্কের খাতিরে এবং আমার মজ্জাগত শান্তিপ্রিয়তার জন্য মেনে নিচ্ছি যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা নন। তা ছাড়া, আপনি যতই নিষ্কামভাবে আলোচনা করুন-না কেন, সংগীত সম্বন্ধে আপনার মতামতে আপনার নিজের রচনাপদ্ধতির ছায়াপাত হবেই হবে। উপরন্তু সেই মতামতকে এক হিসাবে আপনার সংগীতের ব্যাখ্যা ও সমর্থনও বলা চলে। সাহিত্যে অন্তত দেখেছি যে, আপনি নিজেই নিজের একজন উৎকৃষ্ট ভাষ্যকার।

অতএব মিল হল গতিপ্রিয়তায় এবং সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার-স্বীকারে। আর-একটি মিলনের ক্ষেত্র নির্দেশ করছি। আমিও রচনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা

দেখাবার স্বপক্ষে, কারণ আমি উৎকৃষ্ট ঘরানার গান শুনেছি। আমাদের সংগীতে অন্তত দুটি বিভাগ আছে। প্রথমত আলাপ, যাতে কথা নেই কিংবা ব্যবহৃত কথা সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং যার একমাত্র উদ্দেশ্য রাগিণীর বিকাশ-সাধন। দ্বিতীয়ত বন্দেশী, যাতে শব্দ আছে, শব্দের অর্থ আছে, যদিও রাগিণীর বিকাশ সেই অর্থের সা রি গা মা'য় অনুবাদ নয়। বন্দেশী গানে 'বন্দেশ' (composition) অর্থাৎ রচনার মেজাজটাই (temper : mood) স্থরের বিকাশকে ধারণ করে, তার রূপের কাঠামো জোগান দেয়, গতির সীমা নির্ধারণ করে। ধ্রুপদে এই বন্দেশী পদ্ধতির চমৎকার পরিচয় মেলে। কোনো ধ্রুপদিয়া (অনেক ধামারিও) গাইবার সময় তান বিস্তার করেন না। এমন-কি অযথা বাঁটোয়ারার দ্বারা রচনার সৌকর্যকে বিধ্বস্ত করাও ধ্রুপদে প্রশস্ত নয়। যাঁরা পাকা ঘরানার খেয়াল গান, তাঁরাও রচনার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝে তানের সাহায্যে রচনারই রূপ উদ্ঘাটিত করেন। ভীমপলশ্রীর দুটি বিখ্যাত খেয়াল আছে, 'অব তো স্থনলে' ও 'অবতো বঢ়ি বের'। কিন্তু দুটির গঠনসৌষ্ঠব পৃথক। যে খেয়ালিয়া বন্দেশের গঠনতারতম্য না স্বীকার ক'রে স্বকীয় প্রতিভারই জোরে ভীমপলশ্রীর ঐশ্বর্য দেখাতে তৎপর সে সাধারণ শ্রোতাকে চমক লাগাতে পারে, কিন্তু ওস্তাদের কাছে তার খাতির নেই। বালাজীবোয়া বিষ্ণুদিগম্বরের মুখে একটি খানদানী (হদ্দু খাঁনি) চালের গানের ওই প্রকার স্বাধীন বিকাশ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন বলে শুনেছি। এবং ব্যতিরেকের জন্য দুঃখপ্রকাশ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যে দেশে বেদের উচ্চারণ ভ্রষ্ট করলে মহাপাতকী হতে হয় সে দেশের বন্দেশী অক্ষরের স্থরগত সমাবেশ ভঙ্গ করতে লোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই পাড়ে কেন বুঝি না। তার পর, ঠুংরীতেও নায়ক-নায়িকা আছে, সেগুলি হল রচনার মূলভাব— যেমন কীর্তনে বিরহ মান প্রভৃতি। শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক-গায়িকা কত সাবধানে শব্দ উচ্চারণ করেন, কী রকম শ্রদ্ধার সহিত মূলভাবের ও রচনার মর্যাদা দেন যদি কেউ মন দিয়ে লক্ষ্য করে থাকেন তা হলে তিনি কখনো আমাদের গায়কিরীতিকে স্বাধীনতার নর্তনভূমি বলতে চাইবেন না। আমার বক্তব্য হল এই: আমাদের বন্দেশী গায়কিতে রচনাকে মর্যাদা দেওয়াই রীতি। এক আলাপিয়া ছাড়া অন্য সব ভাল ওস্তাদেই স্বীকার করেন যে, মর্যাদা কেবল শব্দেইর প্রাপ্য নয়, রাগিণীরও নয়, স্থর ও কথা মিলে যে রস জন্মায় কেবল তারই প্রাপ্য। আবার বলি, যখন কোনো ওস্তাদ রাগিণীরই বৈচিত্র্য দেখাতে রচনার রূপগত ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধানিদর্শনে কার্পণ্য করেন তখন তিনি প্রথাসংগত গায়ক নন। জোর তাঁকে আলাপিয়া নাম দেওয়া চলে। সেই সঙ্গে অবশ্য এ কথা বলবারও

অধিকার আমাদের আছে যে, তাঁর কোনো কথা ব্যবহার না করলেও বেশ চলত। অতএব রচনার স্বকীয়তার প্রতি গায়কের কাছে আপনি যে দরদ প্রত্যাশা করেন সেটি আপনার প্রাপ্য। আপনি নতুন-কিছু চাইছেন না। কেবল জন-কয়েক ওস্তাদকে তাদের গোটাকয়েক প্রথাবিরোধী বদ্ অভ্যাস ভাঙতে অনুরোধ করছেন, তাদেরকে আমাদেরই সংগীত-ইতিহাসের অতীত গৌরবই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখানেও আপনি ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট নন, বরঞ্চ আগাছা তুলে পুরাতন রাজপথকে পথগম্য করতে প্রয়াসী। এখানেও আমাদের মিল, আমি রাজপথে বেড়াতে ভালবাসি, সুবিধা অনুভব করি।

এইবার বোধ হয় আপনার সঙ্গে আমার গরমিলের ক্ষেত্র জরিপ করা সহজ হবে। ক্ষেত্রটি সংকীর্ণ; কিন্তু তার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেব না, যদিও তাই নিয়ে মোকদ্দমা করতে রাজি নই। বিশ্বাস আছে, আপনাকে বুঝিয়ে বললে সে জমি-টুকু স্ব-ইচ্ছায় ছেড়ে দেবেন। এবং প্রতিবেশী হিসেবে আমার বদনাম নেই।

আমার নিজের বক্তব্য হল এই: আলাপে যখন রচনার মতো কোনো সৌষ্ঠব-সম্পন্ন কথাবস্তুর দাবি স্বীকার করবার পূর্বোক্ত ধরনের বিশেষ ও জরুরি দায়িত্ব নেই, তখন আলাপের রীতি-নীতি রচনার গায়কি-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হবেই হবে। রচনা হল কথা ও সুরের মিশ্রণে এক নতুন রসসামগ্রী। আলাপ কিন্তু প্রাথমিক, রাগিণীর রূপবিকাশই তার একমাত্র কাজ, এখানে না আছে অর্থবাহী কথা, না আছে কথাবাহী অর্থ। আলাপের গন্তব্য নেই, অথচ উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য বিকাশের মধ্যেই নিহিত। উদ্দেশ্য রাগিণীকে reveal করা— উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বৈচিত্র্যের ঐক্যস্থাপনা। ঐশ্বর্য দেখানো কোনো আর্টিস্টের কাম্য হতে পারে না, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত। রচনায় পূর্ব হতেই ঐক্য দেওয়া আছে, সেটি রচয়িতার দান; আলাপে তাকে স্থাপনা করতে হবে এটি হবে গায়কের সৃষ্টি। সেজন্য তার একটি অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। আলাপিয়ার সুবিধাও রয়েছে, রচনার, বিশেষত কথার বাঁধন তাকে মানতে হচ্ছে না। ঐশ্বর্য দেখানোতে শক্তির অপচয় ঘটে, সেইজন্য নির্বাচন তাকে করতেই হবে। বন্দেশী গানে শক্তির ব্যবহার রচনার সৌষ্ঠবরক্ষায়; আলাপে শক্তির ব্যবহার রাগিণীর ক্রমিক বিকাশে, তার জ্ঞানকৃত বিবর্তনে। আলাপই আমাদের pure music। আপনি চিঠিতে আলাপকে বাদ দিয়েছেন। সংগীত বলতে আমি আলাপকেও বুঝি। আর্টের দিক থেকে বন্দেশী বড়ো কি আলাপ বড়ো এই প্রশ্নের উত্তর আর্টিস্টের কৃতিত্ব-সাপেক্ষ এবং শ্রোতার রুচি-সাপেক্ষ। অর্থাৎ, এ বিচার বিশেষের উপর নির্ভর করে ব'লেই তাকে কোনো সামান্য বাক্যে পরিণত

করা চলে না। কিন্তু আধিমৌলিক বিচারে, ontologically, আলাপকে প্রাধান্য দিতে হয়। সংগীতও একপ্রকার জ্ঞান ; প্রথমে কোনো জ্ঞানই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না— অথচ স্বাধীন না হলে তার বৃদ্ধি নেই। বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য জ্ঞানকে আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হয়, তবেই তার মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। তত্ত্ব-মূলের পাট করলে পরগাছা যায় মরে, গাছ তখন নিজের ফলফুলে শোভিত হয়ে স্বকীয়তার গৌরব অনুভব করে। জ্ঞানচর্চার এই হল স্বকীয়তাসাধন। পরের অধ্যায়ও অবশ্য আছে— কিন্তু সেটা গাছে অর্কিড ঝোলানোর মতনই। অতএব, আলাপের রীতিনীতি বাদ দেওয়া যায় না সংগীত-আলোচনা থেকে।

ধরুন, ছায়ানটের আলাপ হচ্ছে। ছায়ানটের আরোহী অবরোহী, তার বাদী সম্বাদী, তার বিশেষ 'পকড়' দেখিয়ে ছায়ানটের ঘটস্থাপনা হল। কিন্তু সেইখানে থামলেই কি ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল— তার প্রকৃতি ফুটল? এ যে সেই ভক্তের কথা যিনি প্রতিমার মুণ্ডু পরাবার পূর্বেই বলেছিলেন, 'আহা! মা যেন হাঁসছেন!' অন্য ভাষায় বলি— আমার আমিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নেতিবিচারের দ্বারা পার্থক্য-অনুভূতির কি কোনো প্রয়োজনই নেই? যেসব যোগীর পূর্ণ সমাধি হয় তাঁদের বেলা তাঁরা আছেন এই যথেষ্ট। সাহিত্যে যেমন, আপনার লেখায়, পরেশবাবু ও মাস্টার মশাই। তাঁরা সৎ, এবং এর বেশি তাঁদের সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজনই হয় না। এঁরা পূর্ণ, এঁরা রুদ্ধগতি, আত্মসমাহিত, আত্মস্থ, আমাদের নমস্য। এঁরা হলেন শেষের কবিতা। কিন্তু অন্যের পক্ষে 'বহুর্ভবামি' অস্তিত্বের বিকাশেচ্ছা নয় কি? আমি হব — বহু হব— এইটাই আর্টিস্টের প্রাণের কথা। আমি আছি— যেমন যোগীর। বহু হওয়াই যখন আর্টিস্টের ধর্ম, যখন সে যে-বস্তুর অন্তর উদ্‌ঘাটিত (reveal) করতে চায় তার প্রকৃতি বুঝতে কোনো substance কি গুপ্তসত্তা বোঝে না, process-ই বোঝে, তখন revelation-এর জন্যই mere statement করে নীরব থাকলে তার চলে না। অতিরিক্ত কর্তব্যের মধ্যে একটি হল— ক-বস্তু খ-বস্তু নয় প্রমাণ করা। যেটুকু না হলে নয় তারই আভাস দিয়ে মুখবন্ধ করলে আর্টিস্টের বহু হবার প্রবৃত্তিকে বঞ্চিত করা হয়। সাধারণের বেলাতেও— তাই সাধারণ শ্রোতাও যখন শুনছে তখন সে আর্টিস্টের সঙ্গে সঙ্গে বহু হচ্ছে। বহুলতাকে নয়, বহু হবার প্রবৃত্তিকে খাতির না করলে আর্ট্‌কে ঘৃণা করা হয়। বহুলতার মূলে আছে 'বহুর্ভবানি'র তাগিদ। বিশেষত আমাদের আলাপে। আমাদের আলাপ অবিরাম গতিশীল, তার প্রকৃতিই হল procession। অতএব ঠিক তার revelation হয় না, হয় এবং হওয়া চাই revealing।

এখন ছায়ানটের আলাপ চলুক। প্রথমেই সা'রে' গ'ম'প' 'পরে, গ'ম'রে' সা' নেওয়া হল, তারপর আরোহীতে সা'রে' রে'গা' গা'মা' মা'পা নিয়ে ধৈবত আন্দোলিত করে গলা ওপরের সুরে পৌঁছল, অবরোহীতে ঐ প্রকার শুদ্ধ স্বর-গুলি ব্যবহার ক'রে, পা'রে' গা'মা' পা' এই মিড়টি নিয়ে রিখাবে গলা থামল— কোনো স্বরই বিবাদী হল না। তবুও কি ছায়ানট রাগিণী গাওয়া হল? আমার মতে এখনও হল না, হল কেবল ছায়ানটের bule printটুকু, ডিজাইনটুকু। শ্রম-বিভাগের ফলে স্থপতিবিদ্যায় ডিজাইনের কদর বেড়েছে জানি, কিন্তু নীল রঙের কাগজে সাদা আঁচড় দেখে বসবাসের সুখভোগ কি স্বাভাবিক? আপনি বলবেন — কল্পনার উদ্রেক করানোই আর্টিস্টের কর্তব্য। কিন্তু কল্পনাও নানা জাতের, ডিজাইনারও নানা রকমের। সেইজন্য, নীচের ও ওপরের তলার, স্নানের ঘরের মায় সিঁড়িরও cross-section চাই, এলিভেশনের লোভ দেখিয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। তার ওপর চাই নির্মাণ, চাই গৃহ-প্রবেশ, চাই বসবাস— এ ঘরে বাসর, ও ঘরে মৃত্যু, এ জানলা দিয়ে লবঙ্গলতিকার উগ্রগন্ধ পাওয়া, ওটা দিয়ে নারকেল গাছের সোনালি ফুল থেকে গাঢ় সবুজ ডাবের পরিণতি দেখা, এ দেয়ালে সিঁদুরের দাগ, ওটায় খুকীর আঁচড়, এ পর্দা মেজদির, ওটা সেজ বৌমার তৈরি — সব চাই, তবেই না গৃহ! উপমা ছেড়ে দিই— শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্‌গীতা শোনাতে চাই না। ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা কথাটি ঠিক নয়, কারণ আলাপের প্রাণই হল গতি) বিস্তারের দ্বারা তাকে মুক্তি দিতে হবে।

আলাপবিস্তার অনেকটা ভারতসাম্রাজ্যের non-regulated area'র মতন। তার রীতিনীতি,— সুনির্দিষ্ট পন্থাও আছে, তবে সেটি বন্দেশীগানে রাগিণীর রূপ-প্রকাশের নয়। হয়তো আপনি ছাড়া আর কেউ সেই নিয়মকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। তবে পন্থা আছে জানি, কারণ শুনেছি। প্রথমে ধীরে, গমক ও মিড়ের সাহায্যে তান না দিয়ে, তার পর মধ্যলয়ে খুব ছোট তানের সঙ্গে মিড় মিশিয়ে, তার পর— সব রাগে নয়— গোটা কয়েক রাগে দ্রুত ও বিচিত্র কর্তবের দ্বারা আলাপ করা হয়। সাধারণত আলাপে খেয়াল ঠুংরী ও টপ্পার তান ব্যবহৃত হয় না। অন্য অলংকার, যেমন ছুট্ মূর্ছনা প্রভৃতির প্রয়োগ চলে। তার পর বাণী আছে। সেই বাণীর অবলম্বনেই বোল্‌-তান দেওয়া হয়। এই হল আলাপের পন্থা, যার প্রধান কথা— পরম্পরা। মিড়ের পরই, জমিন তৈরি হতে না হতেই, তানকর্তব চলে না। সবই আসতে পারে, আসবেও, তবে যথাসময়ে। এইখানেই নির্বাচনক্রিয়া। বড়ো আলাপিয়ার পদ্ধতি সুসংগত, তার নির্বাচন যথেচ্ছাচারিতা নয়। ভাল ঘরানায় পথটি পাকা। যদি কোনো ওস্তাদ প্রতিভার

জোরে আরো ভাল রাস্তা তৈরি করে তাহলে তাকে ও তার পথকে কদর করবই করব। আলাপে এইপ্রকার প্রতিভার সাক্ষাৎলাভ দুর্লভ, আলাবন্দে খাঁর ঘরানা ভিন্ন। তবে অন্য গানে আবুল করিমকে আমি খুব উচ্চস্থান দিই। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, যে আবুল করিম ফৈয়াজের মতন ঠিক ঘরানা গাইয়ে নয়। সে অনেক সময় বন্দেশ ভুলে যায়— কিংবা দু-একটি লাইন গায়, বড়ো ওস্তাদে তাকে সেজন্য ঠাট্টাও করে, হিন্দোলে শুদ্ধ মধ্যম দেয়, ভৈরবীতে শুদ্ধ পর্দা লাগায়, গায় নিজের মেজাজে। কিন্তু, সে মেজাজে কী মজা! এমদাদ হোসেন কি ঘরানা বাজিয়ে ছিলেন? কিন্তু এত রসিক সেতারী জন্মায় নি। এমদাদ্ খাঁ নিজেই ঘরসৃষ্টি করে গিয়েছেন— এখন সারা ভারতে এম্দাদী চালই চলছে। সেনীয়া সেতারীর বাজিয়ে হিসেবে খাতির কম।

আলাপে পরম্পরার রীতি ঘরানা হিসাবে ভিন্ন হলেও তার নীতি বোধ হয় এক ভিন্ন দুই নয়। প্রথম পদ দ্বিতীয়কে পথ দেখাবে, দ্বিতীয় তৃতীয়কে— এই চলবে। মূল অবশ্য ছায়ানট, অর্থাৎ অন্য রাগিণী নয়। মূলটাই ঐক্য-বিধায়ক। এখানে ঐক্যজ্ঞান শেষ জ্ঞান নয়, এখানে ঐক্য সম্পূর্ণতার নামান্তর নয়। মূলগত ঐক্য বিস্তারের মধ্যেই ওতপ্রোত রয়েছে। গতিশীল ক্রমবর্ধমান শ্রেণীর ঐক্য এই ধরনের হতে বাধ্য। যদি বৃত্ত হিসেবে ধরেন, তাহলে ক-বিন্দু থেকে বেরিয়ে সেই ক-বিন্দুতে ফিরে আসাই হবে গতির নিয়তি। কিন্তু গানের, বিশেষত আলাপের গতিকে বৃত্তাকারে যদি পরিণত করতেই হয়, তা হলে asymptote-এই করা ভালো। যে অসীম পথের যাত্রী তাকে ঘরের সীমানায় আবদ্ধ রাখলে কী ক্ষতি হয় আপনি নিজে জানেন। আপনিই না স্কুল পালাতেন? আপনিই না স্বাধীন দেশে বছরে অন্তত একবার ঘুরে আসেন? 'বনের হরিণ' গানটি আমার কানে ভেসে আসছে। গতিরাগের গানকে আপনি আলোছায়ার প্রাণ বলেছেন। আকাশে আজ হঠাৎ মেঘ করেছে, জোরে হাওয়া চলছে— মেঘ ও আলো ছক আঁকতে আঁকতে কোথায় যাচ্ছে কে জানে! এই তো আমাদের আলাপ!

লোকে অস্থায়ীকে (কথাটা স্থায়ী, উচ্চারণ বিভ্রাটে অস্থায়ী হয়েছে) একটু ভুল বোঝে। গানের কোনো দুটি চরণ (phrase) এক নয়। আলাপ যখন শুরু হয় তখনকার প্রথম চরণ, আর ঘুরে এসে যেখানে স্থিতি সেই 'প্রথম' চরণ, এক বস্তু নয়। এমন কি আরোহীর স্বর আর অবরোহীর স্বর এক নয়— মালকোষে ওঠবার সময় ধৈবত কোমলের একটু বেশি, নামবার সময় সত্যই কোমল। তেমনি জৌনপুরীর ধৈবত আরোহীতে কোমলের চেয়ে একটু চড়া, অবরোহীতে

কোমলই। ধ্রুপদের অস্থায়ী ও সঞ্চারী— অন্তরা ও আভোগী কি সমধর্মী? উঁচু অক্টেভের ছক কি নিচু অক্টেভের ছকের পুনরাবৃত্তি? কানাড়ার সা রে গা-কোমল কি মা পা ধা-কোমলের হুবহু নকল? অথচ মধ্যমকে স্বর করলে তাই হয়, অবশ্য tempered scale-এ— সেই জন্যই তো হিন্দুস্থানী গান হার্মনিয়মের সঙ্গে গাওয়া চলে না। গানে কেন, সর্বত্রই, যেখানে জীবন সেইখানেই এই প্রকার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। আপনি নিজেই লিখেছেন— জীবন মানেই নব নব রূপের প্রকাশ। অবশ্য, সৃষ্টির মধ্যে unity আছে, কেবলই বিবর্তন নয়, কিন্তু সেটি মূলের, পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাসে dialectic process বাধ্য হয়ে স্বীকার করি। জোর ক'রে রামরাজত্বে ফিরে যেতে পারি কি? চরখা ঘুরুলেই কি উপনিষদ লেখা হয় না মানুষে আপনা হতেই তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে ওঠে? A Yankee at King Arthur's Court হাঁসবার সামগ্রী।

আমার বক্তব্য হল এই— পরিশেষে ঐক্য চাইতে তিনিই পারেন যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অতীত। 'ইতিমধ্যে'র অধিবাসীরা যখন শেষের ঐক্য চান তখন জীবনের organic process-কে একটা মনগড়া অসীম উদ্দেশ্যের উপায় বিবেচনা করেন। আমার সন্দেহ যে, আপনি আলাপ সম্বন্ধে teleologically চিন্তা করেছেন। যে জিনিস চলছে, চলতে চলতে পথ কাটছে, চলিষ্ণু হয়েই পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে, তার আবার শেষ কোথায়?

আলাপের শুরু হল সীমার মাঝে। তার পর মূল বাঁচিয়ে, দু ধারের সীমার মধ্য দিয়ে তার গতি অসীমের দিকে। দিক্ কথাটি লেখা উচিত হল না, কারণ, অসীমের দিক নেই— organic process-এরও নেই। ব্যাপারটি সাদি কিন্তু অনন্ত। যাওয়াটাই তার মজা, তার adventure। এই শেষহীনতাই তার জীবন। তবে এ জীবনেরও ধর্ম আছে।

মূল বাঁচাবার পরই যাত্রা শুরু হল। ছায়নটের এই তানে দেখুন বিলাবল, আবার অন্য তানে শুনুন কল্যাণের অঙ্গ। একবার মাত্র তীব্র মধ্যম ছোঁয়া হল, বেশি নয়, সামান্য, আর-একবার পঞ্চম থেকে মিড় দিয়ে রিখাবে নামল, আবার তীব্র গান্ধার— এই হল কল্যাণের আভাস। অতএব কল্যাণ ঠাটের যত রকম রাগিণী আছে তার সঙ্গে ছায়ানটের সাদৃশ্য দেখানো চাই— কারণ, ছায়ানট কী নয় তাও দেখাবার প্রয়োজন আছে। সেই রকম বিলাবল ঠাটের রাগিণী, বিশেষত আলাহিয়ার সঙ্গে তার পার্থক্যও রয়েছে। অনেকটা endogamy ও exogamyর সম্বন্ধের মতন, যে জন্য সুপাত্র খুঁজতে বাজার উজাড় করতে হয়। ছায়ানটকে কত হাত থেকে বাঁচাতে হয় ভাবুন— কামোদ, শ্যাম, কেদার, হাম্বীর, গৌড়-সারঙ্গ

—সব গণ্ডীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ক এক একবার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে মিশল। কিন্তু, আবার ঘরে এল জাত বজায় রেখে। এই মেশার ভেতর স্বকীয়তা বজায় রাখা তান-কর্তবের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। রাগিণীর যত বন্ধু, বন্ধুদের সঙ্গে যতপ্রকার মেলামেশার উপায় আছে, তত প্রকারের তান সম্ভব। (এখন দেখছি, সতীনের উপমা দিলেও মন্দ হত না।)

তান-কর্তবের অন্য কাজও আছে, তার উল্লেখ মাত্র করছি। গম্‌কিতে গাম্ভীর্য, মিড় ও আশে মাধুর্য, মুড়কিতে অলংকার, জম্‌জমায় ঐশ্বর্য সূচিত হয়। তবে বুঝে তান ছাড়তে হবে— নির্বাচনের হাত থেকে রেহাই নেই। বন্দেশী গানে রচনার মেজাজ এবং আলাপে সুকুমার পারম্পর্যই হল নির্বাচনের principle। ঘরানায় নির্বাচনের দায়িত্ব সহজ করে দিয়েছে মাত্র। কিন্তু, নির্বাচনপ্রক্রিয়াটি কঠিন ব'লে তান বর্জন করাটা স্নানের টাবের জলের সঙ্গে খোকাকে নর্দমায় ফেলে দেবারই মতন।

আপনি সুন্দরীর সঙ্গে রাগিণীর তুলনা করেছেন, সেই হিসাবে তানকে অলংকার বলেছেন। প্রেয়সীকে দিয়ে স্যাক্‌রার শখ মেটাতে বারণ করেছেন। বেশ, মেটাব না। কিন্তু এই সংক্রান্তে আপনারই একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিই। আপনি মুখে বলেছিলেন, 'বেশ, সব অলংকারই চাই, কিন্তু একটি গানে কেন? আলাদা আলাদা গানে তার উপযোগী গহনা পরাও।' তা হলে, কী দাঁড়ালো দেখছেন! হিন্দুসমাজ যে ভেঙে যাবে! আত্মহত্যার হিড়িক পড়বে! কারণ একই সময় কোনো সুন্দরী তাঁর সিন্দুকের সব গহনা পরেন না, এবং একই সময় একটি সুন্দরীকে সব গহনা পরানও যায় না। বাঙালী-সমাজে সুন্দরীর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সত্য কথা এই, আলাপে ঐ প্রকার কোনো 'একই সময়' নেই, প্রত্যেক মুহূর্তই পিচ্ছিল।

ইতিপূর্বে পরম্পরা ও adventure কথা দুটি ব্যবহার করেছি। লিখতে লিখতে আরো অন্য কথা মনে হচ্ছে। ওই সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে চাই। আপনি লিখেছেন, 'ঘড়ি দেখি নি, কিন্তু অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে তাতে মনে হল এক ঘণ্টা পেরোল বা।' আমারও বিশ্বাস গান শোনবার সময় কলের ঘড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়। নাগরার মতন ঘড়ি বাইরে রেখে আসা উচিত। রক্তের দোলায় যে সময় দোলে সেই organic timeএর সঙ্গে গানের সম্বন্ধ আছে। অবশ্য, রক্তের দোলটাই গানের দোল ভাবলে ভুল করা হবে। আমি organic কথাটি biological অর্থে ব্যবহার করছি না। অনেকের পক্ষে সংগীত-উপভোগটা নিতান্তই জৈব। বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ-উপলক্ষে সংগীতকে appetiser হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শরীর অসুস্থ হলে সব

গানই দীর্ঘসূত্র, সুস্থ থাকলে সবই ক্ষণিকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। থিয়েটার-সিনেমার গান ভাবুন। সে গান শুনতে পারি না, একান্তই জৈব বলে। সেখানে নায়কের প্রত্যাখানের সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা কাঁদতে থাকেন, এবং তাঁর ফোঁশ্-ফোঁশানির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বেহাগ শুনতে হয়। কিন্তু, আমরা সকলে মিলে কী পাপ করেছিলাম?

আপনি নিশ্চয় 'রক্তের দোলা' ওই ভাবে লেখেন নি। আমি যে অর্থে organic time ব্যবহার করছি সেটি mechanical time-এর বিপরীত। এই দুটোর মধ্যে স্বতঃই একটা বিরোধ রয়েছে— আপনার 'কিন্তু' কথাটিতেই সেটি পরিস্ফুট। মানুষ ঘড়ি মানতে চায় না। খেয়ালের বশেই মানুষ সাধারণত সময় মাপে। utility-র রাজ্যে, কলেজে, ঘড়ি। বৃদ্ধারা বলেন, 'দাঁড়াও বাছা, বলছি কবে,— পুঁটু তখনও জন্মায়নি।' চাষাভুষোরা স্মরণীয় ঘটনা, ফসল বোনা, কাটা, প্লাবন ও জলকষ্ট দিয়েই সময় মাপে! ফ্যাক্টরি যে ফ্যাক্টরি, সেখানেও মজুররা যে তাই করে সকলেই জানেন, এবং এই সাধারণ জ্ঞানটি পণ্ডিতে অনেক অঙ্ক কষে ছক এঁকে উপলব্ধি করেছেন— প্রভুরা এখনও করেন নি। শ্রমিকের ক্লান্তি আসে আগ্রহের অভাবে। Mechanical time হল ঘড়ির কাঁটা মাপা ঘণ্টা, তার মাপ মিনিট ও সেকেণ্ডের যোগ-বিয়োগে। এবং যেখানে যোগ-বিয়োগই উপভোগের মাত্রা নির্ধারণ করে সেইখানেই 'গান থামবে কবে' প্রশ্নটি শ্রোতাকে উত্যক্ত করে। ক্লান্ত শ্রমিকরাই বিকেলের দিকে ছুটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু, সহজ আগ্রহ ও কালের হ্রাসবৃদ্ধির মাপ নেই, ছন্দ আছে। সে ছন্দ সংখ্যামূলক নয়, অর্থাৎ তার পিছনে matter কি motion-এর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নেই; আছে সেই সব ঘটনা ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, যার দরুণ বৃদ্ধির হার কমে বাড়ে, তার অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয়। এর তাগিদ থামবার নয়, বাড়বার। অবশ্য এই প্রকার কালাতিপাতকে development বলাই ভাল। বাংলায় কী প্রতিশব্দ? এক কথায়, mechanical time-এর স্বভাব হল পুনরাবর্তন, organic time-এর হল ঐতিহাসিক উদ্‌ঘাটন। প্রথমটি হল, succession of mathematically isolated instants; দ্বিতীয়টি accumulation of connected experiences, অতএব তার ক্রিয়া cumulative। প্রথমটি গোড়ায় ফিরে আসতে পারে— ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিলে daylight saving হয়— কিন্তু দ্বিতীয়টি চলছে নিজের গোঁ-ভরে, তার পরিণতি নেই। প্রথমটিতে যা হয়ে গিয়েছে সেটি গত, ভূত সত্যকারের ভূত, দ্বিতীয়টিতে যা হয়েছিল সেটি বর্তমানে রয়েছে, আবার ভূত ও বর্তমান মিলে ভবিষ্যৎকে তৈরি করবার জন্য সদাই প্রস্তুত। এগিয়ে চলবার খাতিরে, ভবিষ্যতের জন্য organic

time সব করতে পারে— নতুন, রবাহূত, অনাহূতকে বরণ করতেও সে রাজি। হিন্দুস্থানী সংগীতে আলাপের কাল organic— যে দেশে ঘড়ির dictatorship সে দেশের সংগীতের কাল mechanical হয়তো হতে পারে, ঠিক জানি না। ভাগ্যিস্ আমরা অসভ্য!

আমি বলছি— আলাপের কালকে ঘড়ির কাঁটা, এমন কি রক্তের যান্ত্রিক হ্রাসবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাণ করা যায় না। আলাপ যে বরফের গোলার মতন বাড়তে বাড়তে চলেছে। রাগিণীর রূপ যে কেবলই উন্মুক্ত হতে হতে চলেছে। আপনি বলছেন reveal করা চাই, খুব খাঁটি কথা, আলাপই ত রাগিণীর (রচনার কথা আলাদা) সত্যকারের unfolding— চীনেদের scroll-painting এর মতন— আলাপই সত্যকারের ইতিহাস— তাই প্রতিমুহূর্তের ইতিহাস। অবশ্য, রাগিণীরই ইতিহাস— গায়কের গলা সাধার ইতিহাস নয়। রাগিণী বলে পৃথক বস্তু নেই— প্রকাশেই তার অস্তিত্বস্ফূরণ।

এই ভাব থেকে আপনার ব্যবহৃত 'অনিবার্য' কথাটির বিচার চলে— তার তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। অন্য সব আর্টে অনিবার্য সমাপ্তি আছে ইঙ্গিত করেছেন। মানি। কিন্তু, প্রত্যেক আর্ট্‌বস্তুর সময় যখন organic, অর্থাৎ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ, তখন একই নিয়মে সব আর্টের অনিবার্য সমাপ্তি স্থিরীকৃত হবে কী করে? সাহিত্যই ধরা যাক— রামায়ণ ও রঘুবংশের সমাপ্তি কি এক নিয়ম মানে? Henry IV আর Macbeth-এর চাল কি এক কদমে? Bernard Shaw ও তাঁর দেশবাসী Sean O'Casey-র নাটক কি একই হারে একই স্থানে থামে? Brothers Karamazov একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, Fathers and Children-ও তাই। প্রথমটিতে একদিনের ঘটনাই ৪০০।৫০০ পৃষ্ঠা জুড়ে বসে আছে, তার পর গল্প দ্রুত চলল, শেষ বেশও ঠিক নেই; দ্বিতীয়টিতে একটি চমৎকার ছেদ রয়েছে। আজকালের নভেলিষ্ট (Preistley নয়) Proust ও Joyce-কে আপনার ভাল লাগে কিনা জানিনা— কিন্তু, তাঁদের লেখার সীমা কোথায়? দুজনের নভেলকে সংগীতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— যেন counterpointএর খেলা। উপমাটা উপযুক্ত; দুজনেই stream of consciousness নিয়ে ব্যস্ত, দুজনেরই কারবার স্মৃতির উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়া, কেউই exhibit করছেন না, reveal-ই করছেন। আপনারই 'গোরা' ও 'চার অধ্যায়' ধরুন, শেষেরটার লয় দ্রুত, যেন hectic hurry-তে, যেটি তার বিষয়বস্তুর নিতান্ত ও অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু 'গোরা'র চাল কি ভারী নয়? যেন গজগামিনী! আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি ভাল মন্দ বিচার করছি না— দেবী অশ্বেই আসুন, নৌকাতেই আর গজেই আসুন, দেবী হলে পুজো করব—

তাতে কোন ত্রুটি পাবেন না। আমি বলছি— এক সাহিত্যেই অনিবার্য সমাপ্তির সীমানা, রীতি-নীতি ভিন্ন। 'চার অধ্যায়' বাঁশি বাজিয়ে শেষ করলেন, আর 'গোরা' লিখতে তু'ভলুম লাগল— কেন? 'চার অধ্যায়' পাঁচ-অধ্যায় হয় না যেমন, 'গোরা'ও তেমনি চার অধ্যায়ে শেষ হয় না।

ছবি ধরুন— একখানা রাসলীলার ছবি আছে, রাজপুত কলমের। মধ্যে কৃষ্ণ-রাধা, চার ধারে গোপিনীর দল। যদি গোনা যায় তা হলে এক মুখ দেখে দেখে দর্শকের চোখে ও মনে সহজেই ক্লান্তি আসতে পারে। কিন্তু ছবিটার ধর্মই ভিন্ন, কৃষ্ণ-রাধা যুগ্ম সমাহিত, এই বিভোর ভাবটি সংখ্যার পারিপার্শ্বিকে ফুটে উঠেছে ভালো। ছক্ হল ডিমের আকারের— যার রেখা ধরে দেখলে চোখ পিছলে যায়, কারুর মুখ দেখবার জন্য দাঁড়ায় না, সোজাসুজি কেন্দ্রস্থ নায়ক-নায়িকায় অবস্থিত হয়। এখানে সংখ্যার উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখানো নয়, মধ্যকার চরিত্রকে অবকাশ দেওয়া। অবকাশ দেওয়া যায় ফাঁক রেখে, যেমন জাপানী চিত্রকর করেন; আবার অবকাশ দেখান চলে সংখ্যারও সাহায্যে, যেমন টিন্‌টরেটো একাধিক ছবিতে করেছেন। এখানে সংখ্যার মূল্য বহু নয়, statistical unity মাত্র। ব্যক্তিগত চরিত্রের অভাবে মধ্যস্থ রূপ বিকশিত করবার জন্য সংখ্যা তখন মুক্ত আকাশের সামিল। সংখ্যাও এক প্রকার relief। Grouping-এর সাহায্যেও এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। বলা বাহুল্য ছবির সঙ্গে গানের তুলনা করছি না, আমি কেবল রূপের সঙ্গে সংখ্যার ও সীমানার উদ্দেশ্য অনুযায়ী পার্থক্য প্রতিপন্ন করছি। মোদ্দা কথা— শেষ হবার অনিবার্যতা উদ্দেশ্যমূলক। আলাপের উদ্দেশ্যই যখন আলাদা (উদ্দেশ্য অর্থে ধৃতি বলছি) তখন বন্দেশী আর্টের অনিবার্যতার নিয়মাবলী কি এখানে প্রযোজ্য? তাই ব'লে নির্বাচনের দায়িত্ব নেই— একথা বলব না। পূর্বেই লিখেছি আমি dialectic process মানি। লেনিন এরই একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন (সংগীতে লেনিন! কেন নয়? তিনিও দার্শনিক ছিলেন, তিনিও দর্শন বলতে making history বুঝতেন, interpreting it নয়, তাঁরও মন গতিশীল ছিল)— তত্ত্বটি হল এই যে, quantity থেকেই quality-র পরিবর্তন হয়। বাস্তবিক পক্ষে, সংখ্যা আর গুণের মধ্যে বেশি ফারাক নেই। এই সম্পর্কে আপনার বন্ধু—Otto Kahn-এর একটি গল্প মনে পড়ল।

একবার Cecil de Mille, Otto Kahn-কে তাঁর আঁকা ছবি The King of Kings দেখাতে নিয়ে যান। কথোপকথনটি Beverley Nichols লিপিবদ্ধ করেছেন।

de Mille : এই দৃশ্যটিতে কত জন লোক আছে ভাবেন ?

Kahn : ধারণাই নেই।

M : আড়াই হাজার ভাবছেন কি !

K : কিছুই নয়।

M : আপনি highbrow.

K : Velasquez-এর Conquest of Bread দেখেছেন ? দেখলে মনে হবে পিছনে লাঠি সড়কির বন গজিয়েছে। যদি গোনেন, তবে টের পাবেন যে মোটে আঠারোটি···Velasquez was an artist.

গল্পটি আমার বিপক্ষে যাচ্ছে না। এই ছবিটারই একটি চমৎকার বিশ্লেষণ পড়েছিলাম— বোধ হয় Harold Speed-এর লেখায়। বইটাতে ওই ছবিটার রেখা-রচনা দেওয়া আছে। দেখে ও পড়ে বুঝেছিলাম যে সম্মুখের তেরছা রচনার relief দেবার জন্য ওই সরল সমান্তরাল রেখার বাহুল্য। এখানেও সংখ্যা, আবার de Mille-এর ছবিতে সংখ্যা। প্রথমটিতে সংখ্যা গুণ হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়টিতে হয়েছে ভার, ক্রুশেরও অধিক। অতএব সংখ্যার নিজের কোনো দোষগুণ নেই— বেশি হলেই থামবার তাগিদ নেই। এসব ক্ষেত্রে অনিবার্যতা উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং রীতির ওপর নির্ভর করছে। এখানে সীমা-নির্ধারণের কোনো natural law নেই। আমি কোনো natural law-ই মানি না।

একটি অনুরোধ ক'রে চিঠি শেষ করি। যে ভাল সাড়ি ও গহনা পরতে জানে তাকে একই সময় একের বেশী দুটি পরতে হয় না। কিন্তু রোজ রোজ একই সাড়ি গহনা পরলে সেই সুন্দরীকে কি ভাল দেখায় ? সুন্দরীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। আপনি যতই সৌন্দর্যের connoisseur হন-না কেন, নারীর সাজসজ্জা সম্বন্ধে নারীদের মতই শিরোধার্য। সে যাই হোক— আপনার অভিমতটি ছাপিয়ে দেব ? অনেকেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন— কেবল Bengal Stores-এর ছাড়া।

অনেক কিছু লিখলাম। পত্রটি সংগীতের আলাপের মতোই ধরে নেবেন। গান গাইতে জানি না, জানলে চিঠিটাও হয়ত ছোটো হত।

পত্রের উত্তর চাই। অনেক মিল আছে বলেই গরমিলটা সাহসী হয়ে প্রকাশ করলাম। আমি তর্ক করি নি, আপনাকে হারাতেও চেষ্টা করি নি। আপনার কথাবার্তায় ও চিঠিতে যে নতুন আভাস পেয়েছি তারই ফলে আমার চিন্তাধারা খুলে গিয়েছে। সে-ধারা আপনার সৃষ্টি হলেও তার দিক্‌নির্ণয় ও

বহুতার ওপর আপনার কোনো হাত নেই। ওটুকু আমার দোষ। ২৫ শে মার্চ, ১৯৩৫

প্রণত

ধূর্জটি

কল্যাণীয়েষু

অর্জুন পিতামহ ভীষ্মের প্রতি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে দরদ রেখে শরসন্ধান করেছিলেন। তুমিও আমার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সৌজন্য রেখে। তাই হার মানতে মনে আপত্তি থাকে না। কিন্তু, আমাদের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ চলছে তৎপ্রসঙ্গে হার-জিত শব্দটা ব্যবহার অসঙ্গত হবে। বলা যাক আলোচনা। উপসংহারে তোমার মত তোমারই থাকবে, আমারও থাকবে আমারই। তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা সংগীতটা সৃষ্টির ক্ষেত্র। যারা সৃষ্টি করবে তারা নিজের পন্থা নিজেই বেছে নেবে — পুরানো নতুনের সমন্বয় তাদের কাজের দ্বারাই, বাঁধা মতের দ্বারা নয়।

তুমি বলছ ভারতের ধ্রুপদী সংগীতসম্বন্ধে তোমার প্রধান মন্তব্য আলাপ নিয়ে। ও সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। আলাপের উপাদান-রূপে আছে বিশেষ রাগরাগিণী, সেগুলি গানের সীমার দ্বারা পূর্ব হতেই কোনো রচয়িতার হাতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নি। আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এ স্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই, যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিস্ট্ হিসাবে বলব ধন্য ; যিনি পারলেন না, কেবল উপাদানটাকে নিয়ে তুলো ধুনতে লাগলেন তাঁকে গীতবিদ্যাবিশারদ বল্‌তে পারি, কিন্তু আর্টিস্ট্ বলতে পারি নে— অর্থাৎ তাঁকে ওস্তাদ বলতে পারি, কিন্তু কালোয়াত বলতে পারব না। কালোয়াত, অর্থাৎ কলাবৎ। কলা শব্দের মধ্যেই আছে সীমাবদ্ধতার তত্ত্ব,—সেই সীমা, যেটা রূপেরই সীমা। সেই সীমা রূপের আপন আন্তরিক তাগিদেই অপরিহার্য। প্রদর্শনীতে সীমা অপরিহার্য নয়, সেটা কেবলমাত্র বাহিরের স্থানাভাব বা সময়াভাব -বশতই ঘটে। আলাপ যদি রাগিণীর প্রদর্শনীর দায়িত্ব নেয় তা হলে সেই দিক থেকে বিচার করে তাকে প্রশংসা করাও চলে। যে দুর্বলাত্মা পাণ্ডিত্যের ভারে অভিভূত হয় সে প্রশংসা করেও থাকে ; সে লুব্ধমুগ্ধভাবে মনে করে অনেক পাওয়া গেল। কিন্তু 'অনেক'-নামক ওজনওয়ালা পদার্থই কলাবিভাগের উপদ্রব, যথার্থ কলাবৎ তাকে তার মোটা অঙ্কের মূল্য সত্ত্বেও তুচ্ছ করেন। অতএব, আলাপের কথা যদি বলো তবে আমি বলব, আলাপের পদ্ধতি নিয়ে

কেউবা রূপ সৃষ্টি করতেও পারেন, কিন্তু রূপের পঞ্চত্বসাধন করাই অধিকাংশ বলবানের অভ্যাসগত। কারণ, জগতে কলাবৎ 'কোটিকে গুটিক মেলে,' বলবতের প্রাদুর্ভাব অপরিমিত। বহুসংখ্যক ফুল নিয়ে তোড়া বাঁধাও যায় আর তা নিয়ে দশ-পনেরোটা ঝুড়ি বোঝাই করাও চলে। তোড়া বাঁধতে গেলে তার সাজাই বাছাই আছে, বাদ দিতে হয় তার বিস্তর। তোড়ার খাতিরে ফুল বাদ দিতে গেলে যারা হাঁ হাঁ করে ওঠে ভগবানের কাছে তাদের পরিত্রাণ প্রার্থনা করি। অতএব, আলাপের দরাজ পথ বেয়ে কোন গায়ক সংগীতের প্রতি কী রকম ব্যবহার করলেন সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত নিয়েই বিচার চলে। আলাপ সম্বন্ধে আর্টের আদর্শে বিচার কঠিন; তার কারণ, দৌড়তে দৌড়তে বিচার করতে হয়, ক্ষণে ক্ষণে তাতে যে রস পাওয়া যায় সেইটে নিয়ে তারিফ করা চলে, কিন্তু সমগ্রকে সুনির্দিষ্ট করে দেখব কী উপায়ে? তানসেনের গান হোক, বা গোপাল নায়কেরই হোক, তারা তো নিরন্তরবিস্ফারিত মেঘের আড়ম্বর নয়; তারা রূপবান, তাদেরকে চার দিক থেকে দেখা যায়, বার বার বাজিয়ে নেওয়া যায়, নানা গায়কের কণ্ঠে তাদের অনিবার্য বৈচিত্র্য ঘটলেও তাদের যে মূল ঐক্য, যেটা কলার রূপ এবং কলার প্রাণ, মোটের উপরে সেটা থাকে মাথা তুলে। আলাপে সে সুবিধা পাই নে ব'লে তার সম্বন্ধে বিচার অত্যন্ত বেশি ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। যদি কোনো নালিশ ওঠে তবে সাক্ষীকে পাবার জো নেই।

আয়তনের বৃহত্ত্ব যে দোষের নয় এ সম্বন্ধে তুমি কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছ। না দিলেও চলত, কারণ আর্টে আয়তনটা গৌণ। রূপ বড়ো আয়তনেরও হতে পারে, ছোটো আয়তনেরও হতে পারে, এবং অরূপ বা বিরূপ ছোটোর মধ্যেও থাকে বড়োর মধ্যেও। বেটোফেনের 'সোনাটা' যথেষ্ট বহরওয়ালা জিনিস, কিন্তু বহরের কথাটাই যার সর্বোপরি মনে পড়ে, জীবে দয়ার খাতিরেই সভা থেকে তাকে যত্ন সহকারে দূরে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়। মহাভারতের উল্লেখ করতে পারতে, আমাদের দেশে ওকে ইতিহাস বলে, মহাকাব্য বলে না। ও একটি সাহিত্যিক galaxy। সাহিত্যবিশ্বে অতুলনীয়, ওর মধ্যে বিস্তর তারা আছে, তারা পরস্পর সুগ্রথিত নয়, অতি বৃহৎ নেব্যুলার জালে জালে তারা বাঁধা, আর্টের ঐক্যে নয়। এই জন্যই রামায়ণ হল মহাকাব্য, মহাভারতকে কোনো আলংকারিক মহাকাব্য বলে না। আলাপ যদি স্বতই সংগীতের মহাকাব্য হয়, তো হল, নইলে হল না।

আমার সঙ্গে যাদের মতের বা ভাবের মিল নেই, তারা সেই অনৈক্যকে আমার অপরাধ বলে গণ্য করে, তাদের দণ্ডবিধি আমার সম্বন্ধে নির্মম। তাদের নিজের বুদ্ধি ও রুচিকেই তারা বুদ্ধিমত্তার যদি একমাত্র আদর্শ মনে করে তাতে ক্ষতি হয়

না, কিন্তু সেটাকেই তারা যদি ন্যায় অন্যায়ের শাশ্বত আদর্শ মনে ক'রে দণ্ডবিধি বেঁধে দেয় তবে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র তাদের আয়ত্তগত হলে এদেশে আমার দানাপানি চলবে না। আমার বিচারকদের এই কঠোরতাই আমার চিরাভ্যস্ত, সেই কারণে তোমার ভাষাগত অনুকম্পায় আমি বিস্মিত। ভয় হয় পাছে এটা টেঁকসই না হয়, অন্তত আমি যে ক'দিন টিঁকি ততদিনের জন্যও। আশা করি, মতের অনৈক্য সত্ত্বেও আমার মান বাঁচিয়ে চলবে। ইতি ৯ই এপ্রেল ১৯৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে তার মধ্যে অসংলগ্নতা কিছু দেখিনি। বস্তুত প্রথম পড়েই মনে করেছিলুম বলি, 'মেনে নিলুম'। আমি অত্যন্ত কুঁড়ে, পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে প্রথমটা ইচ্ছে করে সম্মতি দিয়ে নীরবে আরাম-কেদারা আশ্রয় করি, পরক্ষণেই সাহিত্যিক শ্রেয়োবুদ্ধি ওঠে প্রবল হয়ে। হাঁ না করতে করতে অবশেষে হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে বলি, 'উচিত কথা বলতে ছাড়ব না।' উচিত বলার দুষ্প্রবৃত্তি মানুষের মস্ত একটা ব্যসন, উনিই হচ্ছেন যত-সব অনুচিত কথার পিতামহী।

৬

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে ফিরে আবার সেই কথাটাই উঠে পড়ল— 'ভালো তো লাগে'। সংগীতের কোনো-একটা বিশেষ বিকাশ সংযত সংহত সুসংলগ্ন সুপরিমিত মূর্তি না'ও যদি নেয়, তার মধ্যে বারে বারে পুনরাবৃত্তি ও সুদীর্ঘ কাল ধরে তান-কর্তবের বাধাহীন আন্দোলন যদি দৈহিক ক্লান্তি ও অবকাশের সসীমতা ছাড়া থামবার অন্য কোনো হেতু না'ও পায় তবুও তো দেখছি ভালো লাগে। ভালো লাগবার কারণ হচ্ছে এই যে, সংগীতের উপকরণের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর গুণ আছে, তার ফলে, সুসম্পূর্ণ কলারূপ গ্রহণ না করলেও সে আদর পেতে পারে। মাটির পিণ্ড যতক্ষণ না ঘট আকারে সুপরিণত হয় ততক্ষণ সে মাটি। বিশেষভাবে কলা-সাধনার গুণেই সে মহার্ঘ্য হয়। সোনার উজ্জ্বলতা প্রথম থেকেই চোখ জিতে নেয়। তার আপন বর্ণগুণেই সে পেয়েছে আভিজাত্য। অতএব তাল তাল সোনা যদি স্তূপাকার করা যায় তবে সে অভিভূত করবে মনকে। তখন লুব্ধ মন বলতে চায় না আর বেশি কাজ নেই। অথচ 'আর বেশি কাজ নেই' কথাটাই আর্টের

অন্তরের কথা। আর্টের খাতিরেই যথাস্থানে বলা চাই : বাস্, চুপ, আর এক বর্ণও না। সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান সম্পদ ধ্বনিগৌরব। সেই কারণে কোনো কৌশলী লেখক যদি পাঠকের কান অভিভূত ক'রে ধ্বনিমন্দ্রিত শব্দ বিস্তার ক'রে চলে তবে অনেক ক্ষেত্রে তার অপরিমিতি নিয়ে পাঠক নালিশ উপস্থিত করে না। তার একটি দৃষ্টান্ত কাদম্বরী। শূদ্রক রাজার অত্যুক্তিবহুল বর্ণনা চলল তিন-চার পাতা জুড়ে; লেখকের কলমটা হাঁপিয়ে উঠে থামল, বস্তুত থামবার কোনো কলাগত কারণ ছিল না। এ কথা ব'লে কোনো ফল হয় না যে এতে সমগ্র গল্পের পরিমাণসামঞ্জস্য নষ্ট হচ্ছে। কেননা, পাঠক থেকে থেকে বলে উঠছে, 'বাহবা বেশ লাগছে।' বেশ লাগছে ব'লেই বিপদ ঘটল, তাই বাণীর প্রগল্ভতায় বীণাপাণি হার মেনে চুপ করে গেলেন। তার পরে এলো ব্যাধের মেয়ে, শুকপাখির খাঁচা হাতে নিয়ে। বন্যা বইল বর্ণনার, তটের রেখা লুপ্ত হয়ে গেল, পাঠক বললে, 'বেশ লাগছে।' এই বেশ লাগা পরিমাণ মানে না। এমন স্থলে রচনার সমগ্রতাটা বাহন হয়ে দাসত্ব করে তার উপকরণের, সে আপন পূর্ণতার মাহাত্ম্যকে অকাতরে চাপা পড়তে দেয় আপন স্তূপাকার দ্রব্যসম্ভারের তলায়। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরীর ছাঁদে গল্পরচনা আর দুটি একটিমাত্র দৃষ্টান্ত লাভ করেছে ; ও আর চলল না। যেমন একদা মেগাথেরিয়ম, ডাইনসর প্রভৃতি অতিকায় জন্তু আপন অসংগত অতিকৃতির বোঝা অধিক দিন বইতে পারল না, গেল লুপ্ত হয়ে, এও তেমনি। সংস্কৃত সাহিত্য -অভিমানী কোনো দুঃসাহসিক আজ কাদম্বরীর অনুসরণে বাংলায় গল্প লেখবার চেষ্টা করবেই না— তার কারণ, ওর মধ্যে শিল্পের সদাচার নেই। কিন্তু, আমাদের সংগীতে আজও কাদম্বরীর পালা চলছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সংস্রবে এসেছে; তাই আমাদের এমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, এই সাহিত্যে কলাতত্ত্বের মূলগত ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব। কিন্তু, হিন্দুস্থানী গান ব্যবসায়ী গায়কদের গতানুগতিক রবার-নির্মিত ঝুলির মধ্যে রয়ে গেছে। বিশ্বজনীন আদর্শের সঙ্গে তার পার্থক্য ঘটলেও মন ও কানের অভ্যাসে বিরোধ ঘটবার সুযোগ হয় না। আজকালকার দিনে যাঁদের শিক্ষা ও রুচি বিশ্বচিত্তের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তাঁরা যখন স্বাধীন মন নিয়ে বহুল সংখ্যায় গানের চর্চায় প্রবৃত্ত হবেন, তখন সংগীতে কলার সম্মান পাণ্ডিত্যের দম্ভ ছাড়িয়ে যাবে। তখন কোন্ ভালো লাগা যথার্থ আর্টের এলাকার, অন্তত সমজদারের কাছে তা স্পষ্ট হতে পারবে। ইতি ১৫ই মে ১৯৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমপূজনীয়েষু

আপনার শেষ পত্রের উত্তরে আমি বলতে চাই যে, কোনো গায়ক, কোনো আলাপিয়াও, রূপসৃষ্টির দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। এ কথা আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু দুটি সন্দেহ রয়ে গেল।

প্রথমত, মানছি যে, ছোটোর মধ্যে রূপ ফুটতে পারে, বড়োর মধ্যেও। কিন্তু great music কিংবা great poetry কি ভিন্ন শ্রেণীর নয়? ঐশ্বর্য দেখানোটা বর্বরতা নিশ্চয়ই, কিন্তু চারপদী দরবারীকানাড়ার তানসেনী ধ্রুপদ ও খাম্বাজের ঠুংরীর মধ্যে পার্থক্য আছেই। যদি কোনো উৎকৃষ্ট গায়ক, অর্থাৎ আর্টিস্ট্, সেই দরবারী কানাড়ার ধ্রুপদকে বাহুল্যবর্জিত করে আপনাকে শোনান, তবে সেই গায়নের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তনের জন্যই কি ওই গানের ইঙ্গিত-আভাস স্থূল হয়ে উঠবে? আমার বক্তব্য, great হলেই তাকে ভোঁতা হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, যেমন ছোটো হলেই ইঙ্গিতমুখর হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বৃহতের মধ্যেও সূক্ষ্ম আভাস রয়েছে দেখেছি, যেমন জৌনপুরের মসজিদে। greatness-এর সংজ্ঞা দিতে পারছি না; সেটা শুদ্ধ নয়, খাদ-যুক্ত, তার সঙ্গে সংখ্যার ও আখ্যানবস্তুর আয়তনের সম্বন্ধ আছেই আছে— অন্তত পটভূমিতে তো রয়েইছে। আমাদের অলংকারশাস্ত্রে প্রাচুর্যকে প্রতিভার একটি নিদর্শন বলা হয়েছে।

একটা নতুন কথা তুলছি। এই অর্থে নতুন যে, পূর্বে আমি সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করি নি। ধরুন, আমি যদি বলি আমার দু ঘণ্টা ধরে ছায়ানটের কি পূরিয়ার আলাপ শুনতে ভালোই লাগে। নাহয় নাই হল কলা, হলই বা আমার ওস্তাদী বুদ্ধি? আমি জানি আমার কান অশিক্ষিত নয়, আমার কানে শ্রুতির তারতম্য পর্যন্ত সুস্পষ্ট। এই কানে যেটা ভালো লাগে সেইটাই হবে আর্ট্। দাম্ভিকতা দেখাচ্ছি না— সকলেই এই ভাবে, আমি কেবল খোলাখুলি লিখলাম। আমি জানি আপনারও ভাল লাগে সুরের বিকাশ। মার্জিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভালো লাগা না-লাগাই হবে বিচারে কষ্টিপাথর— নয় কি? এই ব্যক্তিগত রুচিকে বাদ দিলে সংগীতের ভবিষ্যৎ-নিরূপণের অন্য কি ব্যক্তি-সম্পর্কহীন পথনির্দেশক চিহ্ন থাকতে পারে? এই রূপসৃষ্টিটাই আমাদের সংগীতের একমাত্র ভবিষ্যৎ— আপনি কী হিসেবে বলতে পারেন?

ভালো লাগা না-লাগাকে বাদ দিতে পারি না— তাকে আপনি লোভই বলুন, আর আমি নিজে তাকে বর্বরতাই বলি-না কেন। সংগীতের ভবিষ্যৎ কি স্থাপত্যে? একটা কথা আছে; **architecture is frozen music**।

সংগীতের প্রাণ হল গতি, বরফ নিতান্তই স্থাণু।

প্রণত

কল্যাণীয়েষু

ভালো লাগা এবং না-লাগা নিয়ে বিরোধ অন্য সকল রকম বিরোধের চেয়ে দুঃসহ। অর্থনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে তুমি যে রকম ক'রে যা বোঝো আমি যদি সে রকম করে তা না বুঝি তা হলে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব নিশ্চয় বাধতে পারে, কিন্তু সেইটে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে। তখন পরস্পর পরস্পরকে মূর্খ ব'লে নির্বোধ ব'লে গাল দিতে পারি। সেটা শ্রুতিমধুর নয় বটে, কিন্তু মূর্খতা নির্বুদ্ধিতার একটা বাহ্য পরিমাপক পাওয়া যায়, যুক্তিশাস্ত্রের বাটখারা-যোগে তার ওজনের প্রমাণ দেওয়া চলে। কিন্তু যখন পরস্পরকে বলা যায় অরসিক, তখন তর্কে কুলোয় না। পৌঁছয় লাঠালাঠিতে। যেহেতু রস জিনিসটা অপ্রমেয়। বুদ্ধিগত বোঝা-বুঝির তফাত নিয়ে ঘর করা চলে সংসারে তার প্রমাণ আছে, কিন্তু আমার ভালো লাগে অথচ তোমার লাগে না এইটে নিয়েই ঘর ভাঙবার কথা। অতএব সংগীত সম্বন্ধে উক্ত সাংঘাতিক বিপদ্‌জনক কথাটার নিষ্পত্তি করে নেওয়া যাক। তোমাতে আমাতে ভেদ পার হবার একটা সেতু আছে— সে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার ভালো লাগার অমিল নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নালিশ রয়ে গেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরী আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস— ওর বহুল নৈহারিকতার মধ্যে মধ্যে রসের জ্যোতিষ্ক নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে। মনে আছে বহুকাল পূর্বে একদা আমার শ্রোত্রী সখীদের পড়ে শুনিয়েছি এবং থেকে থেকে চমকে উঠেছি আনন্দে। সেইজন্যই আমার বড়ো দুঃখের নালিশ এই যে, এর মধ্যে আর্টের সংহতি রইল না কেন? মুক্তোগুলো মেজের উপর ছড়িয়ে যায়, গড়িয়ে যায়, ওদের মূল্য উপেক্ষা করতে পারি নে ব'লেই বলি— সাতনলা হারে গাঁথা হল না কেন; তাহলে বুকে দুলিয়ে, মুকুটে জড়িয়ে, সম্পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যেত। রাগিণীর আলাপে থেকে থেকে রূপের বিকাশ দেখা যায়; মন বলে একটি অখণ্ড সৃষ্টির জগতেই এদের চরম গতি; এদের সম্মান করি ব'লেই এদের রাস্তায় দাঁড় করাতে চাই নে, উপযুক্ত সিংহাসনে বসালেই এদের মহিমা সম্পূর্ণ হত। সেই সিংহাসন চৌমাথাওয়ালা সদর রাস্তার চেয়ে সংহত, সংযত, পরিমিত, কিন্তু গৌরবে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

বড়ো আয়তনের সংগীতকে আমি নিন্দা করি এমন ভুল কোরো না। আয়তন

যতই আয়ত হোক তবু আর্টের অন্তর্নিহিত মাত্রার শাসনে তাকে সংযত হতে হবে, তবেই সে সৃষ্টির কোঠায় উঠবে। আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি— একদিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর-একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরও বিস্তীর্ণ হোক, আরও বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্রবৈচিত্র্য ঘটুক, তা হলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে। কীর্তনে গরানহাটি অঙ্গের যে সংগীত আছে আমার বিশ্বাস তার মধ্যে গানের সেই আত্মসংযত ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে।

এইখানে একটা কথা বলা কর্তব্য— গান-রচনায় আমি নিজে কী করেছি, কোন্ পথে গেছি, গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো-বড়ো-বাগান-ওয়ালাদের কীর্তির সঙ্গে তার তুলনা কোরো না। ইতি ১৬ই মে ১৯৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমপূজনীয়েষু

সেনেট হাউসের উৎসব-উপলক্ষে আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বাংলার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। গায়কের কণ্ঠে সংযম এবং রচনাপদ্ধতিতে সুসংগতির একটা প্রয়োজন আছে বলতে গিয়ে আপনি ঐ বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেন। এতদিন ধরে আমাদের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হল তাতে সংযমের প্রয়োজনটাই প্রমাণিত হচ্ছে। এই সংযমের সঙ্গে বাংলা দেশের সংস্কৃতির সম্পর্ক কি?

আপনার মুখেই অনেক কথা শুনেছি, তাই আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে থাকব না। কোনো দেশ কিংবা জাতির বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করতে আমার সাহস হয় না। এক-দল ঐতিহাসিক (তাঁরা আবার জার্মান) বলছেন— সে-জন্য চাই দিব্যানুভূতি। ও-বালাই আমার নেই। অতি-আধুনিক হয়ে হয়ত সমগ্রকে দেখবার ক্ষমতা আমার লোপ পেয়েছে। আপনার সে-শক্তি আছে, এবং আপনার অভিজ্ঞতা আরো গভীর ও ব্যাপক। আপনার শিক্ষাদীক্ষাও ভিন্ন, তাই আপনার মন্তব্য শুনতে ব্যগ্র।

আমার নিজের প্রথম প্রশ্ন হল এই : বৈশিষ্ট্য কিছু আছে কি না? বিশেষ বলতে আমি ব্যক্তির অতিরিক্তকে বিশ্বাস করতে চাই না। এমন কোন্ বস্তু আছে যার কৃপাতেই আমরা বাঙালী, যার প্রকাশ কি উন্মেষই হল বাংলা-পরিশীলনের ইতিহাস? আমার বিশ্বাস, ওই প্রকার বস্তুর অস্তিত্ব নেই, যেটি আছে সেটি কেবল মনঃকল্পিত সুবিধাবাচক ধরতাই বুলি, মন্ত্রমাত্র। মন্ত্রোচ্চারণে সোয়াস্তি আছে, যাঁরা করেন তাঁদের,— বাকি সকলের নির্যাতন। যে-কোনো ধর্মের ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

অর্থাৎ, আমি গণমন মানছি না। তাই ব'লে মহাজনতন্ত্রেও বিশ্বাসী হতে পারি না। স্বীকার করতে পারি না যে, বাংলার বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তবে সেটি এক কিংবা একাধিক অ-সাধারণ ব্যক্তির কর্মে ও ব্যবহারেই নিবদ্ধ। **'and above all, he was a Bengali'** হাসি পায় শুনতে ও পড়তে। যিনি যত বড় লোকই হোন্-না কেন, তিনি একাই আমাদের সকল সংস্কার তৈরি করেছেন, কিংবা তিনি সর্ববিধ সংস্কারের প্রতীক, প্রতিভূ, প্রতিনিধি এ কথা বললে জাতিকে, সমাজকে অপমান করা হয়। অপর পক্ষে, যে সাধারণ ব্যক্তি ভোট দিয়ে ও না দিয়েই নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তার ব্যবহারই কি **is equal to** বাংলার বৈশিষ্ট্য? মহাজন ও লোকজন উভয়েরই দান আছে, কিন্তু জাতির সংস্কার উভয়ের সমষ্টি ভিন্ন আরও কিছু। এই অতিরিক্ত অশরীরী বস্তুর গুণাবলীকেই বৈশিষ্ট্য বলা হয়। তার আবার শক্তি আছে, সে শক্তি আবার মহাজন লোকজনের সব প্রয়াসকে এক ছাঁচে ঢালতে পারে— এবং ঢালাই উচিত! অথাতো ভুদেবচন্দ্রস্য সমাজতত্ত্বম্— চিত্তরঞ্জন দাশস্য সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, বিপিন-চন্দ্রস্য ধর্মপরিচিতিঃ, লেনিন-হিটলার-মুসোলিনীনাম্ শাসনতন্ত্রম্।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য কিংবা মূলপ্রকৃতিকে কোনো বস্তুর, কোনো স্থাণুসত্তার, কোনো অচল সারপদার্থের প্রত্যয়ও যদি না ভাবি, তাকে যদি সামাজিক গতি ও বিবর্তনের বিবরণ হিসেবেই বুঝি, তাকে প'ড়ে পাওয়ার বদলে অর্জন করাই যদি মানুষের স্বভাবের দায়িত্ব হয়, তবে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় নিশ্চয়। কিন্তু অন্যদিক থেকে আবার ঘোরালো হয়ে ওঠে। ওই ভাবে দেখলে কোনো পরিশীলনেরই নিজের রূপ থাকে না, থাকে নব্যসংস্কৃতিরচনার গুরুভার, আবার সে গুরুভার পড়ে গিয়ে যে ব্যক্তিপুরুষ হতে চায় তারই স্কন্ধে। সংস্কৃতির স্বাধীন নিঃসম্পৃক্ত সত্তা রইল কোথায়? কেবল কি তাই? সংস্কৃতিকে কেবল গতি কিংবা বিবর্তন ভাবলে তার বিবৃতি কিংবা ইতিহাস লেখা ছাড়া আর কিছুই লেখা চলে না। অর্থাৎ, সে সম্বন্ধে কোনো সুধীজন-অনুমোদিত সিদ্ধান্তে

পৌঁছানো যায় না। আমারই ওপর যখন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবার ভার ও তাকে ভেঙে নতুন করে গড়বার দায়িত্ব পড়ল, তখন অন্যে সে ভার গ্রহণ করবে কেন? অন্যের ওপর চাপাতে আমি যাবই বা কেন? অতএব, তার সামাজিক শক্তি রইল না, এক কথায়, তার বৈশিষ্ট্য থাকল না, থাকল কেবল **history of adaptation and adjustment, active or passive**— নয় কি?

যদি কেউ ওই বিবরণীতে কোনো রীতিনীতির আবিষ্কার করতে পারে তো বহুত আচ্ছা! সেটুকু তার কৃতিত্ব, সে তাই নিয়ে তার নিজের প্রভাব বিস্তার করুক! সে কাজে তার কেরামতি তার বাহাদুরি। কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়ই মানতে হবে, সে রীতিনীতি কোনো সংস্কৃতিরই বৈশিষ্ট্য নয়; আপনি বলতে পারেন না যে, সে রীতিনীতি সংস্কৃতির অন্তরাল থেকে গোপনে নিজের উদ্দেশ্যসাধন করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যটি আবার যা হচ্ছে তাই। তার বেশি জানবার কোনো উপায় নেই। বলা বাহুল্য, সংস্কারকে অস্বীকার করবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু, সংস্কারও তো নির্বাচিত হতে হতে বর্তমানের আকার ধারণ করেছে?

এই হল আমার মূলে আপত্তি। বাংলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নিয়েই যদি কোনো ব্যক্তি সন্দিহান হয়, তবে সে ব্যক্তি তার দোহাই'এ মানবে না যে, ভবিষ্যতের বাংলা গান পুরাতন বাংলা গানের ধারাতেই চলবে। আপনি অবশ্য তা বলেন নি, বলেন না, বলতে পারেন না; কারণ এই— আপনার আপত্তি পুনরাবৃত্তিরই বিপক্ষে, হিন্দুস্থানী গানের পুনরাবৃত্তির বিপক্ষে নয়, কারণ, আপনার যুক্তি প্রাণধর্মের অনুযায়ী। কিন্তু, লোকে ভুল বোঝবার ও করবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে গোড়া থেকেই হত্যা করা ভালো। গ্রাম্য সংগীতের পুনরুদ্ধার চলছে, ঠুংরী গজলের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়ায় দেশে যা ছিল তাই ভাল ভাবতে লোকে শুরু করেছে— তাই আজ আপনার মন্তব্য পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলার বড়োই দরকার। প্রদেশাত্মবোধের যুগ এসে গিয়েছে।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি তর্কের খাতিরে নাহয় মানলুম। কিন্তু নতুন **culture trait**-কে নির্বাচন ক'রে নিজের মতো রূপ দেবার জন্য তাকে অন্তত জীবন্ত হতে হবে। মারহাট্টা অঞ্চলে ষাট বৎসর পূর্বে উত্তরভারতীয় গায়কিপদ্ধতির চলন ছিল না, অথচ এখন সেই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা মারহাট্টি। মারহাট্টিরা উত্তরভারতের ঢঙ নিলে কেন— এবং মাদ্রাজীরা নিলে না কেন? কারণ এ নয় —রহমৎ খাঁ, বালাজীবোয়া বোম্বাই-পুনাতে থাকতেন। কারণ, মারহাট্টি-সংস্কৃতি হয় ছিল না, নাহয় গিয়েছিল শুকিয়ে, এবং মাদ্রাজের একটা-কিছু ছিল। মারহাট্টি গায়ক অবশ্য দক্ষিণী অলংকার হিন্দুস্থানী রাগিণীর গায়ে পরান, কিন্তু গায়কি

উত্তরভারতীয়ই থাকে। মাদ্রাজী গায়ক অপেক্ষাকৃত বেশি রক্ষণশীল। বাঙালী গায়ককে কী বলবেন?

ধরাই যাক— বাংলা দেশে যাত্রাগানে, কবির গানে, তর্জায়, জারি ভাটিয়াল কীর্তন আগমনীতে, বিগ্যাস্থন্দর-যাত্রায় ও নিধুবাবুর টপ্পায় এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তের গানে কথারই ছিল প্রাধান্য, স্থরের সীমা ছিল স্থনির্দিষ্ট, তানে ছিল সংযম। কিন্তু সে ধারাও তো শুকিয়েছে? কেন তার বদলে সর্বত্র জগাখিচুড়ির পরিবেশন হচ্ছে? তাতে নেই কী? আপনার, অতুলপ্রসাদের, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাত-ডাল-তরকারি সবই আছে— পেঁয়াজ রস্থনও বাদ পড়েনি। কেন এ কাণ্ড হল? অথচ আপনারাও যেমন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী, নব্যতন্ত্রের রচয়িতারাও তাই। তাঁদের না হয় বাদ দিলাম— কিন্তু, পাঁচালির সঙ্গে যে শান্তিনিকেতনের গানের সম্বন্ধ নেই, যাত্রার জুড়ির গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাসের কোনো আত্মীয়তা নেই, বিগ্যাস্থন্দরি গানের সঙ্গে যে অতুলপ্রসাদের সংগীতের কোনো যোগসূত্র নেই— এটুকু আপনাকে মানতেই হবে। আজকালকার ট্রেড-ইউনিয়ন মধ্যযুগের গণ শ্রেণী পুগের বংশধর নয়।

তা হলে বুঝতে হবে বাংলার সংগীত পরিশীলন ও অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। অতএব, প্রশ্ন হল — বাংলার বৈশিষ্ট্য অর্থে কতদিনের কয় পুরুষের ঐতিহাসিক পলিমাটি বুঝব? ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কী ছিল সঠিক জানি না, কিন্তু গীতগোবিন্দে পদাবলীতে বাঘা-বাঘা রাগরাগিণীর নাম বসানো আছে। প্রবোধ বাগচী বলেন, আরও আগে ছিল। হয়তো নামকরণ পরে হয়েছে। গায়নও জানা নেই। কিন্তু, বিষ্ণুপুর বেথিয়া ঢাকা অঞ্চলে মুসলমান ওস্তাদ অনেকদিন থেকেই রয়েছেন। ইংরেজ-নবাব, জমিদার এবং নতুন শ্রেণীর বিত্তশালী মহাজনরাও হুঁকোর নল মুখে দিয়ে বাইজির গান শুনতেন। শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তনীয়ার সঙ্গে বাইজিরও ডাক পড়ত। তারপর ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে তো সকলেই যেতেন। গোবরডাঙ্গার গঙ্গানারায়ণ ভট্ট, হালিসহরের জামাই নবীনবাবু, পেনেটির মহেশবাবু, শ্রীরামপুরের মধুবাবু, বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট, কোলকাতার মুলোগোপাল প্রভৃতি ওস্তাদরা তো সকলেই হিন্দুস্থানী চালে গাইতেন। বড় বড় গ্রামের জমিদারবাড়িতে হিন্দু-মুসলমান ওস্তাদ বরাবরই থাকতো। পশ্চিমাঞ্চলের সব কালোয়াতই কোলকাতায় আসতেন। সেও আজ কতদিনের কথা। আপনিও সেই আবহাওয়ায় পুষ্ট। অতএব, হিন্দুস্থানী গায়কিপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় একদিনের নয়, পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। অথচ, এই ধারার সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতির যোগ নেই, যোগ রইল যাত্রা-কীর্তন-

ভাটিয়ালের সঙ্গে— এ কেমন করে হয় আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার মতে এই ধারাও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যের অন্য-একটি দিক।

সামাজিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার তথ্য কী, না জানলে বাংলা গানে ও বাঙালী গায়কের মুখের সংগীতে সংগতির বিধিনিয়ম আবিষ্কৃত হবে না। বাংলার বৈশিষ্ট্য কী আপনার কাছে শুনেছি, কিন্তু আজ আমাকে তার প্রক্রিয়ার বিবরণ শোনান। এ কাজ বাঙালী পারবে না, ও কাজ বাঙালী পারবে, কারণ বাঙালীর স্বভাবই তাই— যুক্তিটি বুদ্ধিস্পর্শী নয়, যদিও প্রাণস্পর্শী। আফিমে ঘুম আসে কেন? কারণ আফিমে ঘুম আনবার শক্তি আছে…বাঙালীর বাঙালিত্ব অনেকটা এই ধরণের।

আমার মত হল এই— সুরে সংগতি-রক্ষা ভদ্রমনেরই কাজ, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নয়। যে-কোনো দেশের ভদ্রলোকের কাছে আমি সংগীতকলা প্রত্যাশা করতে পারি। অবশ্য, ভদ্র এবং গানে শিক্ষিত। সুগায়ক হবার জন্য **general culture**-এরই নিতান্ত প্রয়োজন, বাঙালী হবার, কেবলমাত্র বাংলার ঐতিহ্য বহন করবার প্রয়োজন নেই। ৪ঠা জুলাই ১৯৩৫

প্রণত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

লাঠিয়াল যখন প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলানো কঠিন ব'লে বোঝে তখন সে মাটিতে বসে পড়ে দেহ সংকোচ করে, অর্থাৎ আঘাতের লক্ষ্যক্ষেত্রকে যথাসাধ্য সংকীর্ণ করতে চায়। তোমার এবারকার প্রশ্নবর্ষণ সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা সেই ধরণের। সংক্ষেপে উত্তর দিলে বিপদকেও সংক্ষিপ্ত করা যায়। দেখি কৃতকার্য হতে পারি কিনা। race অর্থাৎ গণজাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে কিনা এই তোমার প্রথম প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হয়। আকৃতির সহজাত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবার জো নেই। চৈনিকের চেহার'র সঙ্গে নিগ্রোর চেহারার তফাত নিয়ে তর্ক চলে না। আকৃতির ভেদ প্রকৃতির ভেদের কোনো সূচনা করে না এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। কাঁঠালের সঙ্গে তুলনায় সব

আমেই মূল রসবস্তুর ঐক্য মানতে হয়, কিন্তু ন্যাংড়া আম ও ফজলি আমের মধ্যে রসবৈশিষ্ট্যের যে ভেদ আছে, আকৃতিতে তার ইশারা এবং প্রকৃতিতে তার প্রমাণ যথেষ্ট। আল্‌ফন্সোর কৌলীন্য বাইরের চেহারার থেকে শুরু ক'রে ভিতরের আঁঠি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে পরিচয়ের যোগ আছে।

যাকে সংস্কৃতি ব'লে থাকি, অর্থাৎ কাল্‌চার্‌, সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে তা অনবচ্ছিন্ন। এই সংস্কৃতির বুদ্ধিক্ষেত্রে ওদের পরস্পরের সীমাচিহ্ন প্রায় মিলিয়ে গেছে। ওদের সায়ান্সের মধ্যে জাতিভেদ নেই, সমান হাটে ওদের বুদ্ধি-বৃত্তির দেনাপাওনা অবারিত। কিন্তু ওদের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে পংক্তিভেদ আছে। অনুভূতিতে ইটালীয় এবং নরবেজীয় এক নয়, ইংরেজ এবং ফরাসীর মধ্যেও প্রভেদ আছে। সে কেবলমাত্র ওদের রাষ্ট্রচালনায় নয়, ওদের শিল্পভাবনায় প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য জর্মান ও ফরাসীর চরিত্র ভিন্ন। জর্মানি ও ইটালির ভৌগোলিক দূরত্ব অল্পই। কিন্তু ইটালির সীমা পেরিয়ে জর্মানিতে প্রবেশ করবামাত্রই উভয় দেশের লোকের প্রকৃতিগত প্রভেদ সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এই প্রভেদটি কুলক্রমে রক্তমাংস অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে চলেছে অথবা বাইরের নানা ঐতিহাসিক কারণে এটা সংঘটিত, সে তর্ক আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অনাবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন গণজাতির মধ্যে চরিত্রগত হৃদয়গত প্রভেদ অন্তত দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এ কথা মানতেই হবে, চিরকাল চলবে কিনা সে আলোচনা অবান্তর।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের বুদ্ধির ক্ষেত্র সমভূমি না হলেও, এক মাটির। সেখানে চাষ করতে করতে ক্রমে অনুরূপ ফসল ফলানো যেতে পারে। তার প্রমাণ জাপান। সেখানকার মাটিতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সায়ান্স্‌ শিকড় চালিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য শস্যের ফলনে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। য়ুরোপের বৌদ্ধিক প্রকৃতিকে সাধনাদ্বারা আমরা অঙ্গীকৃত করতে পারি তার কিছু-কিছু প্রমাণ দেওয়া গেছে। কিন্তু, তার চরিত্রকে পাচ্ছি নে, নানা শোচনীয় ব্যর্থতায় সেটা প্রত্যহ সুস্পষ্ট হল।

চরিত্র কর্মসৃষ্টিতে এবং হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাশক্তি রসসৃষ্টিতে আপন পরিচয় দিয়ে থাকে। তাই য়ুরোপীয় সংগীতের কাঠামো এক হলেও ইটালীয় ও জর্মান সংগীতের রূপের ভেদ আপনিই ঘটেছে। ও দিকে রুশীয় সংগীতেরও বৈশিষ্ট্য রসজ্ঞেরা স্বীকার করেন।

হিন্দুস্থানীর সঙ্গে বাঙালীর প্রভেদ আছে, দেহে, মনে, হৃদয়ে, কল্পনায়। বুদ্ধির পার্থক্য হয়তো দূর করা যায় একজাতীয় শিক্ষার দ্বারা; কিন্তু স্বভাবের

যে দিকটা অন্তর্গূঢ় তার উপরে হাত চালানো সহজ নয়। আমাদের ধীশক্তিটা দারোয়ান ; কোন্ তথ্যটাকে রাখবে, কাকে খেদিয়ে দেবে, গোঁফে চাড়া দিয়ে সেটা ঠিক করতে থাকে, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কাজেও তার বাহাদুরি আছে। সে থাকে মনের দেউড়ি জুড়ে। কিন্তু অন্তঃপুরের কাজ আলাদা— সেইখানেই সাজসজ্জা, নাচগান, পূজা অর্চনা, সেবার নৈবেদ্য, মনোরঞ্জনের আয়োজন। কুচকাওয়াজ প্রভৃতি নানা উপায়ে দারোয়ানটার পালোয়ানির উৎকর্ষসাধনের একটা সাধারণ আদর্শ আমরা বৈজ্ঞানিক পাড়া থেকে আহরণ করতে পারি, কিন্তু অন্তঃপুরিকাদের এক ছাঁদে গড়তে গেলে হাই-হীল্ড্ জুতোর উপর দাঁড়িয়েও ভিতর থেকে তাদের ছাঁদ আলাদা হয়ে বেরিয়ে পড়ে, কেবল সেই অংশে মেলে যেটা তাদের স্বভাবের সঙ্গে স্বতই সংগত।।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, বাংলা সংস্কৃতির যদি অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য থাকেই তবে সেটা কি পুরাতনের পুনরাবৃত্তিরূপেই প্রকাশিত হতে থাকবে? কখনই না, কারণ অপরিবর্তনীয় পুনরাবৃত্তি তো প্রাণধর্মের বিরুদ্ধ। সেকেলে কবির গানে পাঁচালি প্রভৃতিতে বাঙালী রুচির একটা আদর্শ নিশ্চয়ই পাওয়া যায় ; কিন্তু কালক্রমে তার কোনো পরিণতি যদি না ঘটে তবে বলতে হবে সে আদর্শ মরেছে। শিশুকে বড়ো হতে হবে— সেই পরিবৃদ্ধির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্যসূত্র বরাবর থাকে কিন্তু অন্তরে বাইরে বদল হয় বিস্তর। তার সজীব কলেবরটা বাহিরের নানা উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে, নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে মিল ঘটিয়ে চলে, নতুন পাঠশালায় নতুন নতুন শিক্ষালাভ করে। তার প্রভূত পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু, মূল প্রাণের সূত্র যার দুর্বল, পুনরাবৃত্তি বই তার আর-কোনো গতি নেই। সেই পুনরাবৃত্তির অভাব দেখলেই প্রথার দোহাই পাড়তে থাকে যে বুদ্ধি, সে শবাসনা।

আমরা যাকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলি তার মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে গানের তত্ত্ব, আর একটা গানের সৃষ্টি। গানের তত্ত্বটি অবলম্বন ক'রে বড়ো বড়ো হিন্দুস্থানী গুণী গান সৃষ্টি করেছেন। যে যুগে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই বাদশাহী যুগের প্রভাব আছে তার মধ্যে। দেশকালপাত্রের সঙ্গে সংগতিক্রমে তাঁদের সেই সৃষ্টি সত্য, যেমন সত্য সেকেন্দ্রাবাদ প্রাসাদের স্থাপত্য। তাকে প্রশংসা করব, কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে নূতন দেশকালপাত্রে হুঁচট খেয়ে সেটা সত্য হারাবে।

বাঙালীর মধ্যে 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'-রূপে যে হিন্দুস্থানী গানের অনুশীলন দেখা যায় সেটা নিতান্তই ধনীর-আঁচল-ধরা পূর্বানুবৃত্তি। পূর্বকালীন সৃষ্টিকে ভোগ

করবার উদ্দেশে এই অনুবৃত্তির প্রয়োজন থাকতে পারে ; কিন্তু সেইখানেই আরম্ভ আর সেইখানেই যদি শেষ হয়, দুরশতাব্দীর বাদশাহী আমলের বাইরে আমরা যে আজও বেঁচে আছি সংগীতে তার যদি কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়, তা হলে এ নিয়ে গৌরব করতে পারব না। কেননা, গান সম্বন্ধে যে দরিদ্র এই অবস্থাতেই চিরবর্তমান তাকেই বলব— 'পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী '। তার চেয়ে নিজের শাকভাত এবং কুঁড়েঘরও শ্রেয়।

বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না— সে বন্ধন হোক-না সোনার, বাদশাহী হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করে নি। সে-সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।

প্রত্যেক যুগের মধ্যেই এই কান্নাটা আছে— 'সৃষ্টি চাই'। অন্য যুগের সৃষ্টিহীন প্রসাদভোগী হয়ে থাকার লজ্জা থেকে যে তাকে রক্ষা করবে, তাকে সে আহ্বান করছে।

আধুনিক বাংলাদেশে গান-সৃষ্টির উদ্যম সংগীতকে কোনো অসামান্য উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছে কিনা এবং সে উৎকর্ষ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের উৎকৃষ্ট আদর্শ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে কিনা সে কথাটা তত গুরুতর নয়, কিন্তু প্রকাশের চাঞ্চল্যমাত্রেই তার যে সজীবতার প্রমাণ পাই সেইটেই সবচেয়ে আশাজনক। নব্যবঙ্গের গানের কণ্ঠ গ্র্যামোফোনের চেয়ে অনেক কাঁচা হতে পারে, কিন্তু স্বরটি যদি তার 'মাস্টার্‌স ভইস্‌' না হয়, তাতে যদি তার নিজের স্থর খেলে, তাহলে সে বেঁচে আছে এই কথাটা সপ্রমাণ হবে। তবে তার বর্তমান যেমনি কচি হোক তার জোয়ান বয়সের ভবিষ্যৎ খুলবে আপন সিংহদ্বার। সে ভবিষ্যৎ নিরবধি।

বাঙালীর চিত্তবৃত্তি প্রধানত সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজের প্রতিভাও সাহিত্যপ্রবণ। তার মন আপন বড়ো বড়ো বাতি জ্বালিয়েছে সাহিত্যের মন্দিরে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় মিতব্যয়িতা দেখা যায়, শক্তির পরিবেশনে খুব হিসেব ক'রে ভাগবাটোয়ারা হয়ে থাকে। মাছকে প্রকৃতি শিখিয়েছেন খুব গভীর জলে ডুব সাঁতার কাটতে, আর উচ্চ আকাশে উধাও হতে শিখিয়েছেন পাখিকে। কখনো কখনো সামান্য পরিমাণে কিছু মিশোল ক'রেও থাকেন। পানকৌড়ি কিছুক্ষণের মতো জলে দেয় ডুব, উড়ুক্কু মাছ আকাশে

ওড়ার শখ মেটায়। ইংলণ্ডে সাহিত্যে জন্মেছেন শেক্‌স্‌পীয়র, জর্মানিতে সংগীতে জন্মেছেন বেটোফেন।

সত্যের খাতিরে একথা মানতেই হবে যে, বিশুদ্ধ সংগীতে হিন্দুস্থান বাংলাকে এগিয়ে গেছে। যন্ত্রসংগীতে তার প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায়। যন্ত্রসংগীত সম্পূর্ণই সাহিত্যনিরপেক্ষ। তা ছাড়া ঐ অঞ্চলে অর্থহীন তোম্‌-তা-না-না শব্দে তেলেনার বুলি ভাষাকে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না। বাংলাদেশে যন্ত্রসংগীত নিজের কোনো বিশেষত্ব উদ্ভাবন করে নি। সেতার, এসরাজ সরদ রবাব প্রভৃতি যন্ত্র হিন্দুস্থানের বানানো, তার চর্চাও হিন্দুস্থানেই প্রসিদ্ধ। 'ওরে রে লক্ষ্মণ, একি কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ' প্রভৃতি পাঁচালি-প্রচলিত গানে অর্থ স্বল্পই, অনুপ্রাসের ফেনিলতাই বেশি, অতএব প্রায় সে তেলেনার কাছ ঘেঁষে গেছে, কিন্তু তবু তোম্‌ তানানানা'র মতো অমন নিঃসংকোচে নিরর্থক নয়। পরজ রাগিণীতে একটা হিন্দি গান জানতুম, তার বাংলা তর্জমা এই— কালো কালো কম্বল, গুরুজি, আমাকে কিনে দে, রামজপনের মালা এনে দে, আর জল পান করবার তুম্বী। ঐ ফর্দে উদ্‌ধৃত ফর্মাশী জিনিসগুলিতে যে সুগভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা আছে পরজ রাগিণীই তা ব্যক্ত করবার ভার নিয়েছে। ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি। আমি বাঙালী, আমার স্কন্ধে নিতান্তই যদি বৈরাগ্য ভর করত, তবে লিখতুম —

গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা।
সম্পদ হোক্‌ জপের মালা
নামমণির-দীপ্তি-জ্বালা,
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়তৃষা।

কিন্তু এ গানে পরজ তার ডানা মেলতে বাধা পেত। পরজ হ'ত সাহিত্যের খাঁচার পাখি। হিন্দুস্থানী গাইয়ে তানপুরা নিয়ে বসলেন, বললেন— আমার এই চুনরিয়া লাল রঙ ক'রে দে, যেমন তোর ঐ পাগড়ি তেমনি আমার এই চুনরিয়া লাল রঙ ক'রে দে! বাস্‌, আর কিছু নয়, এই ক'টি কথার উপর কানাড়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব বিস্তার করলে। বাঙালী গাইলে—

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে।
আমার যে ভালোবাসা তোমা বই আর জানি নে।
হেরিলে ও মুখশশী আনন্দ সাগরে ভাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি— দেখা দিতে আসি নে।

যা-কিছু বলবার, আগেভাগে তা ভাষা দিয়েই ব'লে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজ রইল না।

বাঙালীর এই স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে। বললে চলবে না রাতের বেলাকার চক্রবাকদম্পতির মতো ভাষা পড়ে থাকবে নদীর পূর্বপারে আর গান থাকবে পশ্চিম পারে, 'and never the twain shall meet'। বাঙালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল— তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্ ম্যুজিক ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখান্বিত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।

বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সংগীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলনসাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে। একদিন বাংলার সংগীতে যখন বড়ো প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে ব'সে ব'সে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সংগীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে প্রতিধ্বনিত করবে না, আর আমাদের এখনকার কালের গ্র্যামোফোন-সঞ্চারী গীতপতঙ্গের দুর্বল গুঞ্জনকেও প্রশ্রয় দেবে না। তার সৃষ্টি অপূর্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহা-প্রাঙ্গণে। কিন্তু, গানসৃষ্টিতে আজ যেগুলিকে ছোটো দেখাচ্ছে, অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে তারা পূর্ব দিগন্তে খণ্ড ছিন্ন মেঘের দল, আষাঢ়ের আসন্ন রাজ্যাভিষেকে তারা নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ করতে এসেছে, দিগন্তের পরপারে রথচক্রনির্ঘোষ শোনা যায়। ইতি ৬ই জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— বাংলা যন্ত্রসংগীতসৃষ্টি কোন্ লক্ষ্যে পৌছবে তা বলা কঠিন, প্রতিভার লীলা অভাবনীয়। এক কালে থিয়েটারে কন্‌সার্ট নামে যে কদর্য অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা মরেছে এইটেই আশাজনক।

৬

কল্যাণীয়েষু

এই সূত্রে সংগীত সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখি। সংগীতের প্রসঙ্গে বাঙালীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা উঠেছিল। সেইটেকে আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

বাঙালীস্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে। হৃদয়োচ্ছ্বাসকে ছাড়া দিতে গিয়ে কাজের ক্ষতি করতেও বাঙালী প্রস্তুত। আমি জাপানে থাকতে এক জন জাপানী আমাকে বলেছিল, 'রাষ্ট্রবিপ্লবের আর্ট্ তোমাদের নয়, ওটাকে তোমরা হৃদয়ের উপভোগ্য করে তুলেছ, সিদ্ধিলাভের জন্য যে তেজকে, যে সংকল্পকে গোপনে আত্মসাৎ করে রাখতে হয়, গোড়া থেকেই তাকে ভাবাবেগের তাড়নায় বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করে দাও।' এই জাপানীর কথা ভাববার যোগ্য। সৃষ্টির কার্য যে-কোনো শ্রেণীর হোক, তার শক্তির উৎস নিভৃতে গভীরে, তাকে পরিপূর্ণতা দিতে গেলে ভাবসংযমের দরকার। যে উপাদানে উচ্চ অঙ্গের মূর্তি গড়ে তোলে তার মধ্যে প্রতিরোধের কঠোরতা থাকা চাই; ভেঙে ভেঙে কেটে কেটে তার সাধনা। জল দিয়ে গলিয়ে যে মৃৎপিণ্ডকে শিল্প-রূপ দেওয়া যায় তার আয়ু কম, তার কণ্ঠ ক্ষীণ। তাতে যে পুতুল গড়া যায়, সে নিধুবাবুর টপ্পার মতোই ভঙ্গুর।

উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহ্বল করা। তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা। সেখানকার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির মতোই; অর্থাৎ সেখানে রূপ কুরূপ হতেও সংকোচ করে না, কেননা তার মধ্যেও সত্যের শক্তি আছে, যেমন মরুভূমির উট, যেমন বর্ষার জঙ্গলে ব্যাঙ, যেমন রাত্রির আকাশে বাদুড়, যেমন রামায়ণের মন্থরা, মহাভারতের শকুনি, শেক্‌স্‌পীয়ারে ইয়াগো।

আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারকের হাতে সর্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাদের নিক্তি; সেই নিক্তিতে তারা এতটুকু কুঁচ চড়িয়ে দিয়ে দেখে তারা যাকে আদর্শ বলে তাতে কোথাও কিছুমাত্র কম পড়েছে কিনা। বঙ্কিমের যুগে প্রায় দেখতে পেতুম অত্যন্ত সূক্ষ্মবোধবান সমালোচকেরা নানা উদাহরণ দিয়ে তর্ক করতেন, ভ্রমরের চরিত্রে পতিপ্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ কোথায় একটুখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে আর সূর্যমুখীর ব্যবহারে সতীর কর্তব্যে কতটুকু খুঁত দেখা দিল। ভ্রমর সূর্যমুখী সকল অপরাধ সত্ত্বেও কতখানি সত্য আর্টে সেটাই মুখ্য, তারা কতখানি সতী সেটা গৌণ, এ কথার মূল্য তাদের কাছে নেই; তারা আদর্শের অতি-নিখুঁতত্বে ভাবে

বিগলিত হয়ে অশ্রুপাত করতে চায়। উপনিষৎ বলেছেন আত্মার মধ্যে পরম সত্যকে দেখবার উপায় 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা'। আর্টের সত্যকেও সমাহিত হয়ে দেখতে হয়, সেই দেখবার সাধনায় কঠিন শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

বাংলা দেশে সম্প্রতি সংগীতচর্চার একটা হাওয়া উঠেছে, সংগীতরচনাতেও আমার মতো অনেকেই প্রবৃত্ত। এই সময়ে প্রাচীন ক্লাসিকাল অর্থাৎ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের ঘনিষ্ট পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। এ কিন্তু অনুশীলনের জন্যে, অনুকরণের জন্যে নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিস্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্তা দরবারীতোড়ি দরবারীকানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তিমাত্র নয়। নূতন যুগে এই মনোভাব যা সৃষ্টি করবে সেই সৃষ্টি তাঁদের রচনার অনুরূপ হবে না, অনুরূপ না হতে দেওয়াই তাঁদের যথার্থ শিক্ষা, কেননা তারা ছিলেন নিজের উপমা নিজেই। বহুযুগ থেকে তাঁদের সৃষ্টির 'পরে আমরা দাগা বুলিয়ে এসেছি, সেটাই যথার্থত তাঁদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। এখনকার রচয়িতার গীতশিল্প তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে কিন্তু সেটা যদি এখনকার স্বকীয় অত্মপ্রকাশ হয় তাহলে তাতে করেই সেই-সকল গুণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হবে।

সব শেষে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মাঝে মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে পেয়েছে তখন আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি। আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম, কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্তি দেবার যে আনন্দ সে তার চেয়ে গভীর। সে গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু আপন সত্যতায় সে সমাদরের যোগ্য। নব নব যুগের মধ্যে দিয়ে এই আত্মসত্যপ্রকাশের আনন্দধারা যেন প্রবাহিত হতে থাকে এইটেই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। 'কেন বাজাও কাঁকণ কন কন কত ছলভরে'— এতে যা-প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা। ভাবপ্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, রূপপ্রকাশ অহৈতুক। মালকোষের

চৌতাল যখন শুনি তাতে কান্নাহাসির সম্পর্ক দেখি নে, তাতে দেখি গীতরূপের গম্ভীরতা। যে বিলাসীরা টপ্পা ঠুংরি বা মনোহরসাঞী কীর্তনের অশ্রুআর্দ্র অতিমিষ্টতায় চিত্তবিগলিত করতে চায় এ গান তাদের জন্য নয়। আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ— তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সংগীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, তোড়িতে, কল্যাণে, কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চশিখরে উঠতে পারুক বা না পারুক সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন। ইতি ১৩ই জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথা ও সুর

উৎসর্গ

মণ্টু,

একত্রে অনেক গান বাজনা শুনেছি। মতের পার্থক্য বহুবার ঘটেছে। তবু যেন কোথায় একটা মিল ছিল, এখনও রয়েছে। আশা করি, এই বইটার পাতা ওল্‌টাবার পরও থাকবে।

ধুকু

উপক্রমণিকা

সংগীতেও একটা ইতিহাসের দিক আছে। সেটা ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু দুঃখ এই যে আমরা ভুলতে বসেছি। আমার বিশ্বাস সংগীত সম্বন্ধে বিরুদ্ধে মতামত, মন কষাকষির প্রধান কারণ ঐ। আমি রবীন্দ্রসংগীতের দান বুঝতে চাই কালের প্রতিবেশে। সে-সম্বন্ধে সজ্ঞান হলে রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারব, এবং কীর্তন ও আধুনিক রচনার বিচার করতেও সক্ষম হব। সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির চলিষ্ণুতাও ধরা পড়বে।

বাঙালীর কান হিন্দুস্থানী, অর্থাৎ তথাকথিত অ-বাঙালী গায়ন পদ্ধতিতে অনেক দিন থেকেই অভ্যস্ত। আজ আবার নানা কারণে বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত। অনেকে বলবেন বিযুক্ত, কিন্তু বিরোধও একপ্রকার যোগ, অভিমান এবং দম্ভও একধরনের সম্বন্ধবোধ। আজকাল আবার কীর্তনের দাবি জোরগলায় জাহির হচ্ছে। যাঁরা অন্য প্রাদেশিক সংগীতের এক বর্ণও শোনেন নি তাঁরা বলছেন বাংলার বিশেষত্ব তার কীর্তনে। কিন্তু মাত্র সে-হিসেবে কীর্তন ম্যালেরিয়া ও পানাপুকুরের সমগোত্রের। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই কীর্তনেও কি হিন্দুস্থানী স্বরপদ্ধতির অন্তর্গত রাগরাগিণীর ছাপ নেই? অবশ্য সমাসটি বহুব্রীহি হয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু একদিনে, একজনের কৃপায়, একস্থানে হয় নি। লেগেছে বহুকাল, বহুজন, বহুস্থান, সমবেত কৃতিত্ব। তবেই কীর্তন হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। আধুনিক সংগীত সম্বন্ধেও এককথা। তাই উপক্রমণিকায় আমি পারিপার্শ্বিক দিতে চেষ্টা করলাম। বইয়ের মধ্যে ইতিহাসের মোটা ধারার বর্ণনা আছে, এখানে রইল আমার নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের, কারণ এই সময়ের মধ্যে কেবল যে ভারতবর্ষের সর্বত্র সংগীতের অবস্থান্তর ঘটেছে তা নয়, সে-বিষয়ে আমরা সজ্ঞান হয়েছি। একটা কথা বলে রাখি, উপক্রমণিকায় অনেক নাম আছে। কিন্তু পাঠকবর্গ সেজন্য আমাকে যেন দায়ী না করেন। তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের সংগীতে লেখাপড়ার বালাই নেই, তার বদলে আছে ঘরোয়ানা, অর্থাৎ শিষ্যপারম্পর্য। যাঁরা গানবাজনা শুনেছেন তাঁদের কাছে হদ্দু খাঁ কিংবা মসীদ খাঁ কেবল নাম নয়, এক-একটি বৃহৎ রাগমালার স্বরলিপি, রাগরাগিণীর এক-একটি ভঙ্গিময় প্রতিমা।

সাধারণভাবে বোধ হয় বলা চলে যে করদ-রাজ্যে ধ্রুবপদ্ধতি এখনো চলছে,

এবং ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশের ধ্রুবপদ্ধতির পাশে একটি নূতন গায়ন-পদ্ধতির সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বত্রই খানদানী কিংবা সত্যকারের পুরানো ঘরোয়ানা চাল লুপ্তপ্রায়। কিন্তু পরিবর্তন দুই প্রকারের। আজকাল অধিকাংশ রাজন্যবর্গের সংগীতপ্রীতি অন্যান্য আকর্ষণে শক্তিহীন। মাত্র অভ্যাসের খাতিরে ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁরা ওস্তাদ রাখেন। ব্যতিরেক অবশ্য আছে। পুরানো ঘরের গাইয়ে-বাজিয়ে করদরাজ্যে পাওয়া দুর্লভ, হয় তাঁরা নির্বংশ, নচেৎ তাঁরা শহরবাসী। সেনীয়া-বংশের গায়ক-গোষ্ঠীর কুলপতি গিধৌড়ের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ আলি খাঁ এবং বীনকার-গোষ্ঠীর প্রধান অধিনায়ক উজীর খাঁ আজ জীবিত নেই। সেনীয়ার একটি ঘর এখনো জয়পুরে আছেন, তাঁরা সেতারই বাজান। জাফরুদ্দীন, আলাবন্দে খাঁ এবং তাঁর পুত্র নসীরুদ্দীন এখন জনস্মৃতির মণিকোঠায়। রবাবী আর একজনও নেই। সরোদের পীঠস্থান রোহিলখণ্ডে, বিশেষত রামপুরে। সেখানকার বিখ্যাত সরোদিয়া ফিদা হোসেনের এবং মহীশূরের বিখ্যাত বীনকার শেষান্না ও রামপুরের বীনকার উজীর খাঁর মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক। পীঠাপুরম-এর সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কয়েক বৎসর পূর্বে নিজের বীণার পাশে দেহরক্ষা করেছেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা-বাজিয়ে নাইডু ভিজিয়ানাগ্রামে থাকেন, তিনি অন্ধ হয়ে আসছেন, দেওয়াসের রাজাব আলির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ইন্দোরের বিখ্যাত বীনকার মুরাদ আলি অল্পদিন হল মারা গেছেন, গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয় ধ্রুপদিয়া ওমরাও খাঁ, টিকলগড়ের মৃদঙ্গী হরচরণ লাল অশীতিপর বৃদ্ধ। গোয়া-লিয়রের রাজাভেইয়া, বরোদার ফৈয়াজ খাঁ, মৈহারের আলাউদ্দিন এখনো জীবিত —কিন্তু তাঁদের স্থান অধিকার করার যোগ্য ব্যক্তি নেই। করদ-রাজ্যের মধ্যে বরোদা, গোয়ালিয়র, ভিজিয়ানাগ্রাম, মহীশূরের সংগীত-শিক্ষালয়গুলি গর্বমেণ্টের কাছে অর্থসাহায্য পায়। সেগুলিতে ধ্রুবপদ্ধতির চলন আছে, যদিও শিক্ষাপদ্ধতি সনাতন নয়। আমাদের গায়কী যাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তাঁরা বলেন যে সংগীত শিক্ষালয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। বরোদা ও গোয়ালিয়রে ভাতখণ্ডেজীর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। গোয়ালিয়রে অন্য স্কুলও আছে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর মত এই যে তাঁর পদ্ধতির সাহায্যে পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভ করবার পর আরো পাঁচ বৎসর শিক্ষার্থীকে কোনো বড়ো ওস্তাদের শাগির্দি করতে হবে, তবে গলায় গায়কী আসবে। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকারকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে যাই হোক্— খুব কম রাজ্যেই সংগীত শিক্ষালয় আছে। দু-দিন পরে বলা চলবে না করদরাজ্যেই ধ্রুবপদ্ধতির পরিচয় মেলে। অন্যান্য বিখ্যাত ওস্তাদ আজকাল ইংরেজের শহরেই বাস করতে চান— সেখানে টাকা বেশি,

শ্রোতা বেশি, কদর বেশি। ইদানীং আবদুল করিম খাঁ বরোদা ছেড়ে শহরে শহরেই ঘুরতেন।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশে গত পঁচিশ বৎসরের সংগীতের পরিবর্তন ভিন্ন প্রকৃতির। তার মূলে অনাদর নেই, আছে ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্য। যদি প্রাচীন পদ্ধতি দু-জায়গায়ই নষ্ট হয়েছে কেউ বলেন তবু তার কারণ এক নয়। প্রদেশে ধর্মচ্যুতির কারণ সাধারণের মধ্যে সংগীতানুরাগের প্রসার। সংগীতে অনুরাগ দেশাত্মবোধের লক্ষণ। অনুরাগের প্রসার ঘটেছে প্রধানত রঙ্গমঞ্চ, গ্রামোফোন, রেডিয়ো, টকি এবং খবরের কাগজের জন্য। প্রসারের ফলে অনুরাগের বিষয়-বস্তুর রূপ বদলে যায়। এই রুচি পরিবর্তন কিংবা বিকারের (?) সঙ্গে সামাজিক অবস্থান্তরের নিগূঢ় সম্বন্ধ। করদ-রাজ্যের সাধারণ জীবন এখনো আংশিক ভাবে একান্ত। সম্বন্ধহীন জীবনের শক্তি নৈষ্ঠিক রক্ষণাবেক্ষণেই পরিশিষ্ট। পারিপার্শ্বিক অনুকূলই হোক, আর প্রতিকূলই হোক, যদি সেটি পরিবর্তনশীল হয় তবেই মানসিক জীবন ও পরিশীলন চলিষ্ণু হবে। অন্যান্য প্রদেশের সামাজিক জীবন করদ-রাজ্যের সামাজিক জীবনের চেয়ে গতিশীল এবং উন্মুক্ত। করদ-রাজ্যের মধ্যে যেগুলির সঙ্গে সন্নিকটস্থ প্রদেশের আদান-প্রদান চলে সেইগুলিতেই বিদ্যালয়ের মতন বিপ্লব-সাধক অনুষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, সেইগুলিতেই প্রথাসংগত শিক্ষাপদ্ধতি অর্থাৎ গুরুপরম্পরায় মৌখিক-শিক্ষা বিনষ্ট হচ্ছে। গোয়ালিয়র-বরোদার শিক্ষালয়ে ছেলে ধরে না, অথচ ওমরাও খাঁ, নসীরুদ্দীন, হাফেজের শিষ্যের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের বালাই নেই। ওস্তাদবৃন্দ শেখাতে চান না এইটাই তাঁদের আশ্রিত জীবনের লক্ষণ; তাঁদের দাম্ভিকতা সর্বসাধারণের অর্থহীন সংগীতস্পৃহার বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ। প্রাদেশিক শহরের প্রত্যেক ওস্তাদেরই সংগীত-বিদ্যালয় আছে—প্রতি ওস্তাদের শিষ্যবৃন্দের সংখ্যা অগুনতি। শহরের ওস্তাদ আজ আর শিক্ষাদানে কৃপণ হতে পারেন না।

অবশ্যই সব প্রদেশেই সংগীতের প্রতি অনুরাগ এক শ্রেণীর নয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে ধ্রুবপদ্ধতির প্রতি অনুরাগ উত্তর-ভারতের অপেক্ষা তীব্রতর। বোম্বাই-এর নাটকী-সংগীতও খেয়াল-ঘেঁষা, বাংলাদেশের নাটক সংগীত (সিনেমা-সংগীতও) সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর আসরে প্রকৃত শ্রোতার সংখ্যাও বোধহয় শতকরা এ অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। মাদ্রাজে বোধহয় সবচেয়ে বেশি। বাঙালী মহিলারা আজকাল অনেকেই গান-বাজনা করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে দুচারজন ছাড়া আর সকলেই নতুন ধরনের বাংলা গান গা'ন ও এস্‌রাজ বাজান। মাদ্রাজে অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়িতে

মহিলাদের মধ্যে এখনো বীণার প্রচলন রয়েছে। মাদ্রাজ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বীনকার একজন মহিলা— বীণা ধনম্মল, তাঁর বয়স প্রায় একশো বৎসর, দক্ষিণী সংগীতের কূট-তর্কের মীমাংসা এই মহিলাই করে দেন শুনেছি। তাঞ্জোর অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে একাধিক সংগীতে অশিক্ষিত ব্যক্তিও অতি সহজে দ্রুত তানের স্বরবিন্যাস বুঝতে পারেন, আমি নিজে দেখেছি। তা ছাড়া, মান্দ্রাজ ও আন্নামল্লী বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম সংগীতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও উপযুক্ত সংগীত-পুস্তক প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজী সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রুতি সম্বন্ধে যে-প্রকার কূটতর্ক শুনেছি ও পড়েছি তাতে আমি মূহ্যমান হয়েছি। একমাত্র ভাটপাড়া ও নবদ্বীপেই তা সম্ভব। কিন্তু এই কূটতর্কই মান্দ্রাজের রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। তার মানে নয় যে মান্দ্রাজ অঞ্চলের সংগীতে কোনো বিচ্যুতি ঘটে নি। ত্যাগরাজ গত শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। সংস্কৃতের বহুল প্রচার এবং বিন্ধ্যাচলের ওপারে অবস্থিত বলেই বোধহয় মান্দ্রাজের এই পরিবর্তন-বিমুখতা। মান্দ্রাজী সংগীতই একমাত্র হিন্দুসংগীত— তাতে মুসলমানের ছোঁয়াচ লাগে নি— এই বলে অনেক মান্দ্রাজী পণ্ডিত গৌরব অনুভব করেন। উত্তর-ভারতীয়েরা করেন না। মারহাট্টা দেশে মুসলমানী চালের প্রভাব এসেছে মাত্র ষাট-সত্তর বৎসর। ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় খেয়ালী আলাদিয়া বোম্বাইয়ে থাকেন; আবুল করিমের বাড়ি মিরাজে। আবুল করিম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে সমান অভিজ্ঞ ছিলেন। মারহাট্টা গায়কেরা দুই পদ্ধতির কাছেই ঋণী। মারহাট্টাদের মধ্যে ধ্রুবপদ্ধতির আদর থাকলেও তাঁরা পরিবর্তনের বিপক্ষে নন।

পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বেহার ও বাংলার সাংগীতিক ধারা মোটামুটি এক হলেও প্রাদেশিক কৃষ্টিবিভিন্নতার জন্য তার রূপ ভিন্ন। পঞ্জাবে ধ্রুপদ, টপ্পা ও ভজনের, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খেয়াল বিশেষত ঠুংরীর, বেহারের বেথিয়া, ভাগলপুর ও গয়া অঞ্চলে খেয়াল-টপ্পার, এবং বাংলাদেশে ধ্রুপদ-টপ্পার প্রচলনই বেশি ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও বাংলাদেশের গাইয়ে-বাজিয়ে মিষ্টতার জন্য রাগিণীর শুদ্ধতা বর্জন করতে কখনো পরাঙ্মুখ হন নি। অতএব বলা চলে যে উত্তর-ভারতের সংগীতের ইতিহাস পরিবর্তনের স্বপক্ষে। যে প্রদেশে যে চালের কদর বেশি, সেই প্রদেশে সেই চালের আনুষঙ্গিক বাজনারও চলতি। এইজন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সারেঙ্গী ও তবলা ও বাংলাদেশে পাখোয়াজ জনসাধারণের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাংলার পাখোয়াজ এখনো ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। বাংলায় এস্রাজের চলন হয় গয়া-নিবাসী কানাই ঢেঁড়ির কৃপায়। বাঙালী সরোদ ও বীণ গ্রহণ করে নি, তার বদলে

সেতারকেই বরণ করেছে। গোবরডাঙার গিরিজাবাবুই বোধহয় বাংলার একমাত্র বড়ো সুরবাহারী। পূর্ববঙ্গে তবলার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

বাংলাদেশে এই যুগের ঠিক পূর্বেকার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল না। রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের কৃপায় কলকাতা শহরে অনেক সুধীজনের সমাগম হতো এবং সংগীত সম্বন্ধে একাধিক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। দেশস্থ জমিদারবর্গও সংগীতে উৎসাহী ছিলেন। তখন এই শহরের নানা পল্লীতে সংগীত-সমাজ ছিল; যেটি প্রধানতম সেটি ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। সেখানে নাটোরের মহারাজা, আশু চৌধুরী, মন্মথ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই সভ্য ছিলেন। ময়মনসিংহের জমিদাররাও কলকাতায় ওস্তাদ নিয়ে আসতেন। এর পরে সংগীতসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যদুভট্ট ও রাধিকাপ্রসাদ থাকতেন। অঘোরবাবু উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী, এবং বিশ্বনাথ রাও ভালো ধামারী ছিলেন, লালচাঁদ বড়াল তাঁর শিষ্য। কেশব মিত্র, মুরারি গুপ্ত, ভূপতিবাবু, অবনীবাবুর শিষ্যের মধ্যে অনেকেই উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গী ও তবলিয়া হন। অঘোরবাবু, অনন্তনারায়ণ ও গোপেশ্বরবাবুর গোষ্ঠীর অনেকেই তখন কলকাতার বাইরে থাকতেন, কিন্তু প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। ভারতের সব বড়ো ওস্তাদই কলকাতায় এই সময়ে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ককুব খাঁ ও তাঁর ভাই কেরামৎউল্লা কলকাতাবাসী হন। এমদাদ্ খাঁ তারাপ্রসন্নবাবুর বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তাঁর পুত্র, এখনকার ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সেতারী এনায়েৎ খাঁ, তখন যুবক ছিলেন। কলকাতার তখনকারের বিখ্যাত খেয়ালিয়ার মধ্যে গোপালবাবু, (নুলো গোপাল) ও লছমীপ্রসাদের নাম করা যেতে পারে। শুনেছি, 'নুলো গোপাল' ধ্রুপদও গাইতেন, লছমীপ্রসাদ ভালো সেতার ও তবলা বাজাতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিবপ্রসাদ ও পশুপতি, কেরামৎউল্লার মতোই নেপালের চাকরি ছেড়ে পরে এই শহরে আসেন। বেহালার বামাচরণবাবু আলিবক্সের শিষ্য, তাঁর ধ্রুপদাঙ্গের খেয়াল লোকে শেখে নি। অঘোরবাবুও আলিবক্সের কাছে উচ্চাঙ্গের খেয়াল নেন। শরৎবাবু (অন্ধ) হিন্দীচালে বাংলা গান গাইতেন। বিখ্যাত টপ্পাবাজ রমজান ও ঠুংরী-গাইয়ে মৈজুদ্দিন তখন কলকাতার অধিবাসী। সোরীর টপ্পার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় হয় রমজানেরই কণ্ঠে। বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম সরোদিয়া হন রজনী রায়, লেখক রাজকৃষ্ণ রায়ের পুত্র। আরো পূর্বে বাঙালীদের মধ্যে ন্যাসতরঙ্গে কালীপ্রসন্ন ও সুরবাহার সেতারে জিতেনবাবুর পিতা বামাচরণবাবু, গিরিজাপ্রসন্নবাবু ও ভগবান দাস অদ্বিতীয় ছিলেন। অতএব এই যুগে বাংলাদেশে, কলকাতায় এবং গণ্ডগ্রামের

জমিদারবাড়িতে উচ্চ-সংগীতের আদর ছিল যথেষ্ট, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনো আদর ছিল না।

ত্রিশ বছর পূর্বে বাঙালী ঠুংরীর আদর করে নি। শ্যামলালবাবুর বাড়ি এবং দুলিচাঁদের বাগানে মৈজুদ্দিন গাইতেন এবং লচাও ঠুংরীর প্রবর্তক ভেইয়া সাহেব, গোয়ালিয়র মহারাজার ভাই গণপৎ রাও, তাঁর সঙ্গে এবং একলা হারমোনিয়মে ঠুংরী বাজাতেন। শ্যামলালবাবু এবং এঁদের কাছে ঠুংরী শিখেই গিরিজাবাবু আজ বাংলা কেন সমগ্র ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ঠুংরীগায়ক হয়েছেন। ১৯১০ সালের পূর্বে তিনি ছিলেন ধ্রুপদী, রাধিকাবাবুর প্রিয় শিষ্য। রাধিকাবাবু তখন থাকতেন কাশিমবাজারে। এই সময়ে পাখোয়াজীর মধ্যে দুর্লভবাবু ও নগেনবাবু সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা ছিল। বউবাজারের দীনবাবু, বৈকুণ্ঠবাবু ও উলুবেড়ের তারকবাবুরও পাখোয়াজ বাজনার সুখ্যাতি ছিল যথেষ্ট।

ঘরোয়ানা পদ্ধতির শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো প্রদেশে বিশেষত বাংলায় নবজীবনের সূত্রপাত হচ্ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে নবজীবনের সূচনা হয় রঙ্গমঞ্চে। সব প্রদেশেই নাটকী-সংগীতকে সংগীতজ্ঞেরা ঘৃণা করতেন। কিন্তু ইতিহাসে কিছুই ঘৃণ্য নয়। উচ্চ-সংগীতে অনভিজ্ঞ নব্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কলকাতার রঙ্গমঞ্চের জন্য সুর বসাতেন দেবকণ্ঠবাবু। রঙ্গমঞ্চের জন্য বিলাতী আদর্শে কনসার্ট তৈরি হল, সেখানে বিখ্যাত ক্লারিওনেট বাজিয়ে হাবু দত্ত, ননী নিয়োগী, অমৃতবাবু ও চণ্ডীবাবুর গৎ বাজানো হত। দক্ষিণাবাবুর তারের কনসার্টে বিদেশী সুর-পদ্ধতির আমেজ ছিল। যাত্রায় উচ্চ-সংগীত গাওয়া হত, কিন্তু যাত্রাও রঙ্গমঞ্চের টেকনিক দ্বারাই শীঘ্রই অপেরায় পরিণত হল, অর্থাৎ সেখানেও থিয়েটারি সংগীত প্রবেশ করলে। এই প্লাবন থেকে ওস্তাদবৃন্দ আত্মরক্ষা করলেন অভিমানের আচ্ছাদনে। কিন্তু বাংলায় পলিমাটি পড়ল। তার কারণও ছিল যথেষ্ট।

বাংলাদেশে বাংলাভাষায় সংগীতরচনা অনেকদিন থেকেই চলছিল। যাত্রাগানে টপ, পাঁচালী, তরজা ও কবির লড়াইয়ে বাংলা গান গাওয়া হত। তার ওপর ছিল কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল, জারি প্রভৃতি দেশীসংগীত। তাকে প্রাচীন ভাষায় অর্থসংগীত বলা চলে। এক কথায়, বাংলা গানের প্রাণ ছিল সাহিত্যের অর্থাৎ ভাবের, তার তান ছিল কথার অর্থাৎ আখরের। তার ওপর রামপ্রসাদ, নিধুবাবু প্রভৃতি জনকয়েক রচয়িতার রচনা আধ্যাত্মিক ও রসের গুণে নিজের স্থান অধিকার করে নেয়। আমাদের বাল্যকালে কয়েকজন উচ্চশ্রেণী রচয়িতার গানের প্রচার হয়। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির ও স্বদেশী গান, রজনীকান্তের আধ্যাত্মিক

গানগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের নানা প্রকারের গান বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। এঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সুরকে ভেঙে একাধিক কণ্ঠের উপযোগী করেন এবং দেশী ও হিন্দুস্থানী রাগিণী ওলট-পালট করে হাসির গানের উপযুক্ত আকস্মিকতা আনেন। রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন, যদিও তাঁর পূর্বেকার রচনায় বিদেশী হালকা সুরেরও সাক্ষাৎ মেলে।

কিন্তু আমাদের যুবা বয়সেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার ইতিহাসে কালান্তর ঘটে। গীতাঞ্জলির একাধিক কবিতা এই সময় লেখা হয়। তিনি আর অনুকরণে কিংবা বাহ্যিক সংস্কারে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, নিজের পথ কেটে চললেন। এইজন্য পুরাতনীরা রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচিত গানের অত ভক্ত। কিন্তু সৃষ্টির বীজ পূর্বেই লুকানো ছিল— গত পঁচিশ বৎসরে যেটি মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কথা, ভাব ও সুরের সংমিশ্রণে যে নূতন সংগীত-রূপের সন্ধান মেলে সে রূপ অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর পরিণতির পরিচয়, কিন্তু পরিশীলনের দিক থেকে সে-রূপ বাংলা গানের ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত ইঙ্গিত। অন্য রূপ সংস্কৃতির বেগভার সহ্য ও ধারণ করতে পারে না। পূর্বোক্ত মন্তব্য ভালো-না লাগার অতীত। হয়তো অন্য রচয়িতার কোনো কোনো গান রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানের চেয়ে শ্রুতিমধুর। কিন্তু ইতিহাসের তরফ থেকে তাঁর রচনার মূল্য এই যে সৃষ্টির দিক নির্ণয়ে তাতে কোনো ভুল নেই। সে রচনা সৃষ্টিতত্ত্বের মহিমায় সাকার।

সেদিন পর্যন্তও বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ কিন্তু এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো সচেতন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি। বোধ হয় কোনো মধ্যবিত্ত সমাজই করে না। অথচ আগ্রহ ছিল এবং দিলীপকুমার কয়েক বৎসর পরে সেই আগ্রহকে মুখর করলেন। সুকণ্ঠ ও সামাজিক গুণাবলীর সাহায্যে এবং বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো প্রকৃত শিল্পীর আদর্শ প্রভাবে তিনি 'হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে বাংলা গান গাওয়ার প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর সত্যকারের কৃতিত্ব হল মনের চাহিদাকে মুখর করা। তিনি ও তাঁর বন্ধুবর্গ রাগিণীর মূল রূপটি বজায় রেখে তানের পরীক্ষা করতেন এবং আদি রূপের উপর নানাবিধ অলংকার বসাতেন। হয়তো সব অলংকার সুকুমার হত না। সে যাই হোক, তিনি প্রধানত বাংলা গানেরই প্রবর্তক। বাংলা গান গাওয়ার মধ্যে প্রাচীন প্রথার অন্তরে যে বিরোধী তত্ত্ব সর্বদাই নিহিত থাকে সেই বিরোধের আশীর্বাদেই তিনি প্রকৃত বিদ্রোহী। তাঁকে প্রথাসংগত ওস্তাদ কেউ বলবে না।

পূর্ব থেকেই অতুলপ্রসাদ সংগীত রচনা করতেন। গত পনেরো বৎসরের মধ্যে তাঁর গান নিতান্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর স্বকুমার রচনায় আমরা ঠুংরী, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালের সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর স্বন্দর সমন্বয় উপভোগ করি। তাঁর সহজ কথা ও অপেক্ষাকৃত লঘু স্বর হৃদয়ের ভাবসম্পদে স্বগভীর। তাঁর সংগীত রচনা উচ্চশ্রেণীর। অতুলপ্রসাদের পর কাজি নজরুলের নাম করতে হয়। তাঁর একাধিক রচনা সত্যই মূল্যবান। অনেকেই আজ অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের ঢঙের সঙ্গে গজল বা অন্য কিছু চলতি স্বর মেশাচ্ছেন। গ্রামোফোন, রেডিয়ো, টকিতে এই চালের প্রচলন। কিন্তু তার সাংগীতিক মূল্য কম। পরীক্ষা হিসেবে তাকে অবহেলা করা যায় না— পরীক্ষা চলেছে, থামছে না— এইটাই প্রাণের লক্ষণ। ভুল করবার স্বাধীনতাও স্বাধীনতা।

কিন্তু কেবল বাজারে-ঠুংরী গজলই বাংলাদেশে চলেছে বলা নিতান্তই ভুল। গত তিন-চার বৎসরে যুবক-যুবতীর মধ্যে সংগীত-রুচির অন্যপ্রকার পরিবর্তন সকলেই লক্ষ করেছেন। বাঙালীর চালিত গ্রামফোন কোম্পানির রেকর্ডে ও রেডিয়োতে খেয়াল ধ্রুপদ শোনা যাচ্ছে। নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে— সংগীত আসরে ভীষণ ভিড় হচ্ছে এবং বাঙালী যুবক-যুবতী কষ্ট করে খেয়াল-ঠুংরী ও ধ্রুপদ, পাখোয়াজ এবং বাঁয়া-তবলা শিখছে। বাংলায় উচ্চসংগীত মরে নি, তার নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। কলকাতার আসরে একাধিক যুবক ভিন্ন শ্রেণীর মল্লারের পার্থক্য অনুভব করেন আমি প্রমাণ পেয়েছি। পঁচিশ বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ সমঝদারেরাই পারতেন। ধ্রুপদে বিষ্ণুপুরী ঢঙেই প্রায় সকলেই গাইছেন। হয়তো উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটেছে, কিন্তু বাঙালীর লয়ভঙ্গ হয় না। রাগিণীর শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। বাংলার বাহিরে এক অমৃতসর জলন্দরের দু-একটি ঘরোয়ানা এবং পাতিয়ালার চাঁদ খাঁ ওসমান খাঁ ব্যতীত অন্য কোনো যুবক ধ্রুপদ গান ব'লে আমার জানা নেই। কলকাতা শহরে যুবকদের মধ্যে অন্তত চার-পাঁচজন ধ্রুপদিয়া আছেন যাঁদের গান হারমোনিয়মের বিকট আওয়াজে না চাপা পড়লে শ্রোতব্য হত। স্বীকার করতেই হবে আজও যে এদেশে ধ্রুপদ জীবিত রয়েছে সেজন্য গোপেশ্বরবাবু ও তাঁর আত্মীয়স্বজন অঘোরবাবুর শিষ্য গোপালবাবু, রাধিকাবাবুর ও মহিমবাবুর শিষ্য ভূতনাথবাবু ও পুত্র ললিতবাবু, বিশ্বনাথ রাওয়ের শিষ্য দানিবাবু ও অমরবাবুর কাছে বাঙালী কৃতজ্ঞ। গোপেশ্বরবাবুর পুস্তকগুলি উচ্চ-সংগীতের সম্পত্তি রক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে। বাঙালী অবশ্য খেয়াল নতুন শিখছে। খেয়ালে মুসলমান-গায়কীর চলনই বেশি হচ্ছে। কারণ বোধহয় এই যে বাংলায় ন্থলো গোপাল ও যদু ভট্ট ব্যতীত অন্য কোনো বড়ো বাঙালী

খেয়ালিয়া ছিলেন না। যদুভট্টের কোনো খেয়ালিয়া শিষ্য ছিল কিনা জানি না। মুলো গোপালের শিষ্য সাতকড়ি বাবু। অঘোরবাবু ইদানীং কাশীতে থাকতেন। তাঁর খেয়ালের শিষ্য কেউ আছেন কিনা জানি না। সুরেন মজুমদার মহাশয় দেবীসিং-এর কাছে বেহারাঞ্চলে গান শেখেন। বামাচরণবাবু ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারের অদ্বিতীয় খেয়ালিয়া আলিবক্সের শিষ্য। তাঁর ঘর বাঙালীর নয়। আমাদের যুবা বয়সের পূর্বে বাঙালীর মুখে সদারঙ্গী খেয়াল শোনবার সৌভাগ্য জনসাধারণের ঘটে নি। পানিহাটির ভট্টাচার্য গোষ্ঠী, চন্দননগরের মহেশবাবু, শ্রীরামপুরের মধুবাবু ভালো খেয়ালিয়া ছিলেন শুনেছি—কিন্তু তাঁদের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল জানি না। কিন্তু আজ যে এই শহরে রুচি পরিবর্তন হয়েছে তার জন্য দায়ী খলিফা বাদল খাঁ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ। গিরিজাবাবু অবশ্য আরো অনেক বড়ো ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ খেয়াল শিখেছেন। বাদল খাঁর অন্য শিষ্যের মধ্যে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও শচীন দাস যে-কোনো আসর জমাতে পারেন। আনন্দের কথা এই যে আজকাল প্রায় সব সংগীত-শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। বাংলার বাইরে যে-সব যুবক গান শিখেছেন তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রলাল, প্রশান্ত, অম্বিকা, পাহাড়ী ও স্মরজিতের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার অন্য শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়া হলেন জ্ঞানেন্দ্র গোঁসাই, রাধিকাবাবুর ভাইপো। তাঁর গলা শ্রুতিশুদ্ধ এবং গায়কীও ভালো, গমকপ্রধান। আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে জ্ঞানেন্দ্র গোঁসাই ও ভীষ্মদেব ভিন্ন দিক থেকে ভারতের জীবিত শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়াদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তাঁদের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য আংশিকভাবে দায়ী বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাস।

বাঙালী যুবকদের মধ্যে আজকাল অনেকে খুব ভালো তবলা বাজান। হীরু গাঙ্গুলী ও রাইচাঁদ বড়াল আমাদের গৌরব। দুজনেই মুসলমান ওস্তাদের শিষ্য। যন্ত্রীর মধ্যে ধীরেন বসু ও তিমিরবরণ সুনাম অর্জন করেছেন সরোদ বাজিয়ে। যুবকদের মধ্যে রাধিকাপ্রসাদ চমৎকার বাজাচ্ছেন। এই প্রদেশে বাঙালীর মধ্যে উৎকৃষ্ট সেতারীর সংখ্যা বেশি নয়। সেতারী হরেন্দ্রনাথ শীল এবং জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে যুবক বলা যায় না। তাঁরাও আজ গত। কালীঘাট ও ভবানীপুর অঞ্চলে প্রমথবাবুর শিষ্যেরা খেয়াল গান, সে খেয়ালে যন্ত্রালাপের অংশই বেশি।

উচ্চসংগীত শোনবার জন্য সংগীত-বিদ্যালয় ভিন্ন আসর, স্মৃতিবাসর প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান উঠেছে। সংগীতবিষয়ে নানাবিধ পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে; একখানি মাসিক পত্রিকাও রয়েছে। পুস্তকের মধ্যে গোপেশ্বরবাবুর বইগুলি, দিলীপকুমারের ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা এবং রবীন্দ্রলাল রায়ের রাগ-নির্ণয়

মূল্যবান। স্বরলিপির পুস্তকের সংখ্যাও অনেক। বাংলাদেশ আকারমাত্রিকলিপি গ্রহণ করেছে। সুরেনবাবু ও দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপির চলনই বেশি।

আনন্দের কথা এই যে একদল যুবক কেবল বাংলা গানই গেয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে একশ্রেণী ঠুংরী, গজল প্রভৃতি তথাকথিত মুসলমানী চালের পক্ষপাতী —যদিও সে চাল নিতান্তই বাজারের, এবং সে কবিতা অত্যন্তই বাজে। অন্য শ্রেণী দেশী সংগীতের ভক্ত। তাঁদের রচনা ও চাল সব সময় উপভোগ্য নয়। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই সুকণ্ঠ এবং গানের অন্তত সাহিত্যিক ভাবটি প্রকাশ করতে যত্নবান। এঁদের মধ্যে অনেকে, বিশেষত কুমার শচীন দেববর্মণ বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতি বাংলা গান গেয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি লোক-সংগীত গান না। দেশী ও মার্গ পদ্ধতির রস মিশিয়ে তিনি পরমান্ন পরিবেশন করেন। কীর্তনের ওপরও আজকাল একটা ঝোঁক এসেছে। লোকসংগীতের প্রতি সাধারণের আগ্রহ নিতান্তই আশাপ্রদ। মাটির সঙ্গে সংস্রব ছাড়লে আর্ট মরে শুকিয়ে। নানা কারণে ধ্রুবপদ্ধতিতে ভাঙন ধরেছে। ভাঙনকে সৃষ্টির কার্যে পরিণত করার একটি উপায় হল লোকসংগীতে জ্ঞান ও অনুরাগ। লোকসংগীতের সাহায্যে সংগীতানুরাগের ও সংগীতের শ্রীবৃদ্ধির সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ অন্য প্রদেশ এখনো বাংলার মতন অতটা বোঝে নি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে বাঙালীর অনুরাগের পিছনে আজও কোনো জ্ঞানের সমর্থন নেই। এখনো বাংলাদেশে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল গান যথারীতি সংগ্রহ হচ্ছে না, এখনো বাংলাদেশে সমালোচনা কেবল ভালো লাগা, না লাগার অনুবাদমাত্র। তবে লেখকের বিশ্বাস, এদেশে শীঘ্রই জ্ঞানের সমর্থনে সংগীতানুরাগ সুদৃঢ় হবে। তখন হিন্দুস্থানী সংগীতের পুনর্জীবন কেবল পুনরাবৃত্তির নামান্তর হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গসরকারের সাহায্য এখানে নিতান্ত প্রয়োজন। সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের কল্পনার অভাব ঊনবিংশ শতাব্দীরই উপযুক্ত। বাঙালী যুবকদের নবজাগ্রত শক্তির অপচয় ঘটতে দেওয়া ঘোরতর অসামাজিকতা।

বাংলাদেশে যা ঘটছে অন্যদেশে তারই অনুকরণ হচ্ছে বললে ভুল হবে। বোধ-হয় ঘটনাগুলি একই ধরনের সামাজিক শক্তির প্রকাশ। তবে সংস্কারের পার্থক্যের জন্য প্রকাশের তারতম্য হবেই হবে। গ্রামফোন, রেডিয়ো, টকি ও থিয়েটারের প্রভাব একটি প্রদেশে আবদ্ধ নয়। কিন্তু নতুন ভাঙনের শক্তি কোন্ কাজে প্রয়োগ করা হবে তা অনেকটা ঠিক করেন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা। 'প্রদেশ' কথাটি এক্ষেত্রে ব্যবহার করছি একটি বিশেষ কারণে। প্রাণের কথা, সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায়ের কথা, রসের কথা, মাতৃভাষাতেই লেখা সম্ভব। ইংরেজিতে

আভাসই দেওয়া যায়। যে-সম্পূর্ণ প্রকাশের দ্বারা সৃষ্টি সম্ভব তার জন্য চাই মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ ও ভাতখণ্ডেজী গান সম্বন্ধে যা-কিছু লিখেছেন সবই বাংলায় ও মারহাট্টিতে। আমাদের সংগীত সম্বন্ধে ইংরাজিতে প্রবন্ধ লেখা যায় না, কারণ সংগীতে অনুবাদ চলে না। বোম্বাই প্রদেশেও অবশ্য সকলেই ভাতখণ্ডেজীর প্রভাব স্বীকার করেন না, যেমন বাংলাদেশে অনেকে রবীন্দ্রনাথের গান অবহেলা করেন। কিন্তু গ্রহণ না করাতেও তাঁদের প্রভাব স্বীকৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রধানত ভাঙনে ও সৃষ্টিতে; ভাতখণ্ডেজীর প্রধানত রক্ষায় ও প্রচারে। প্রধানত বলছি এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী পদ্ধতির একান্ত ভক্ত এবং ভাতখণ্ডেজী পুনরাবৃত্তির পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁকে কিছুতেই সনাতনী ভাবা যায় না। যে যে শক্তির জন্য বাংলাদেশের সংগীত সৃষ্টির অভিমুখী এবং বোম্বাই প্রদেশে উচ্চ-সংগীতের সমধিক প্রচলন, রবীন্দ্রনাথ ও ভাতখণ্ডেজী সেই-সব শক্তির প্রতিভূ, প্রতিনিধি ও প্রকাশ বললে তর্কের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ভাতখণ্ডেজীর দান নানাবিধ। তাঁকে লক্ষণ-সংগীতের রচয়িতা, উচ্চ শ্রেণীর সংগীত রচনার সংগ্রহকার, সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় লিখিত সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাশক, সংগীত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তক এবং অন্তত তিনটি সাংগীতিক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা যায়। মেল ও ঠাট নিরূপণে, রাগিণীর অঙ্গ-নির্ধারণে, শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় সন্ধিরাগ প্রভৃতি কূটতত্ত্বের বিচারে তাঁর স্বকীয়তা সর্ববাদিসম্মত। তবু তাঁর মতন উদারচেতা ব্যক্তি দুর্লভ। তাঁর কৃপায় আজ উত্তরভারতে উচ্চসংগীতের প্রতি অনুরাগ বেড়েছে নিশ্চয়, কিন্তু বড়ো বড়ো ওস্তাদ যে তাঁর ভীষণ বিপক্ষে এইটাই হল তাঁর যথার্থ পরিচয়। বোম্বাইয়ের বিষ্ণুদিগম্বর একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, অসাধারণ গায়ক ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দ পঞ্জাব, বোম্বাই এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বিশেষত এলাহাবাদে, শিক্ষা দিচ্ছেন। শেষ জীবনে তিনি ভজনই গাইতেন। তাঁর প্রবর্তিত কোনো বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি কিংবা নূতন মতের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। জ্ঞানী সমাজ, গান্ধর্ব বিদ্যালয় প্রভৃতি অনুষ্ঠান, মিরাজের মতন সংগীতশিক্ষার কেন্দ্র এবং আবুল করিম, আল্লাদিয়া, বিলায়েৎ হোসেন, মুঞ্জে খাঁ, কৈসর বাই প্রভৃতি বড়ো বড়ো ওস্তাদ থাকার দরুন বোম্বাইয়ের নাটকী, গ্রামোফোন ও টকি সংগীতের ধরনও বাংলাদেশের চেয়ে অনেক প্রাচীন পদ্ধতি ঘেঁষা।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগীতের আজ যে বিস্তার হচ্ছে তার জন্য প্রধানত দায়ী অন্য এক প্রকারের নতুন শক্তি, অর্থাৎ সেই রাজশক্তি এবং সেই পুরাতন সামাজিক আভিজাত্যবোধ। পশ্চিমাঞ্চলে বড়োলোকদের মধ্যে

বরাবরই সংগীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। আজ যে সেটি আবার জাগ্রত হয়েছে সেজন্য মন্ত্রী রাজেশ্বর বলী এবং তাঁর ভাই উমানাথ বলী, রাজা নবাব আলি, কাশীর রাজা মতিচাঁদ, কৃষ্ণদাস এবং সন্তবাবু, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাতখণ্ডেজী এবং লক্ষ্ণৌয়ের ম্যারিস্ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকারের নিকট সকলের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের মতো কোনো উচ্চ-শ্রেণীর সংগীত-রচয়িতা আজকালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নি। তাই সেখানে এখন জনসাধারণের মধ্যে অনুরাগ-বিস্তারের যুগ শুরু হয়েছে, এখনো, অনুকৃতির যুগ চলছে। এলাহাবাদের অনুষ্ঠানে বিষ্ণুদিগম্বরের এবং লক্ষ্ণৌয়ে ভাতখণ্ডেজীর প্রভাব। দুই শহরেরই ওস্তাদবৃন্দ মারহাট্টি। ভাতখণ্ডেজীর অনুষ্ঠানে গোয়ালিয়রের ঢঙ অর্থাৎ তান কর্তবের ব্যবহার বেশি ও মীড়ের প্রয়োগ কম। নতুন যেন লুকিয়ে রয়েছে এই প্রদেশে।

মান্দ্রাজ এখনো হিন্দুস্থানী পদ্ধতির প্রধান অলংকার অর্থাৎ মীড় পর্যন্ত গ্রহণ করে নি। যদিও একাধিক ওস্তাদ হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অন্যান্য অলংকার গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার জন্য পল্লব ও মীড়ের সংমিশ্রণ শীঘ্র সম্ভব কিনা বলা যায় না, তবে মান্দ্রাজী সংগীতজ্ঞের মধ্যে একদল সংমিশ্রণের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন শোনা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে চলতি কথার সাহিত্য তৈরি হচ্ছে শুনেছি— সেইসঙ্গে 'হরিকথা'র মারফত কথিত ভাষায় সংগীতরচনাও হওয়া সম্ভব।

অতএব, সমগ্র ভারতবর্ষে সংগীতের প্রতি অনুরাগের দুটি দিক চোখে পড়ে —পুনরুদ্ধার ও নতুন সৃষ্টি। এই দুটির আশ্রয়ে সংগীত সম্বন্ধে দুটি প্রধান মত তৈরি হচ্ছে। একদল বলছেন, পুরাতন পদ্ধতির এতই উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল যে তার বেশি উন্নতি অসম্ভব, অতএব পুরাতন পন্থায় চলতেই হবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বলছেন, প্রাদেশিক ভাষা ও কৃষ্টির অভাব অনুসারে নতুন রচনা হোক। বাংলাদেশে এই মতটারই প্রসার অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশি। রবীন্দ্রনাথ এই মত সমর্থন করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা উচ্চ-সংগীতে অভিজ্ঞ, তাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি বলেছেন যে খেয়ালের হিন্দুস্থানী ঢঙ বাংলাভাষায় আনা যাবে না, কারণ বাংলায় স্বরবর্ণ কম, ব্যঞ্জন ও যুক্তবর্ণ বেশি, সুতরাং তান দেওয়া বাংলাগানে অসম্ভব। রবীন্দ্রলাল রায়ের এই মত। দিলীপকুমার বলেন যে বাংলাগানে তান খুব চলবে এবং রচনায় তান দেবার স্বাধীনতা থাকা চাই। সংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্যপ্রদেশে কোনো আলোচনা হয় বলে আমার জানা নেই। যে যাই হোক্—নানা কারণে বাংলা

দেশে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। বাঙালী বোধহয় কখনো অন্ধ অনুকরণ করতে পারে নি; স্বাভাবের দোষে নয় ইতিহাসেরই আশীর্বাদে। তবে সংগীত আসরে স্ত্রীজাতির অভিযানের ফলে কী হবে বলা যায় না।

এই ভারতীয় প্রতিবেশে আমাদের কৃষ্টির আলোচনাই যথার্থ। এই পরিপার্শ্বিকেই রবীন্দ্রসংগীত বিচার্য এবং উপভোগ্য। কথা ও সুরের সম্বন্ধের বেলা তো কথাই নেই।

মতামত

আমি গান সম্বন্ধে যে লিখছি তার প্রধান কারণ আমার নিজের মতামত ঠিক করা। সংগীত বিষয়েও যে মতের প্রয়োজন আছে, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। বাহবা দিয়েই ক্ষান্ত হতে লজ্জা পাই। যা শুনে এসেছি এতকাল, কিংবা যে-ওস্তাদের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁর গানই সব চেয়ে ভালো বলতে অন্য রকমের শিক্ষায় বাধে। সংগীতে যত পারদর্শী হলে সংগীত সংক্রান্ত মতামত মূর্খতা ও গোঁড়ামির নামান্তর হয়, ততটা ওস্তাদ আমি নই। যতটুকু জানলে সংগীতের প্রাণের কথা খানিকটা বোঝা যায় ততটুকু জ্ঞান আমার আছে। চিরজীবনই উচ্চ-সংগীত শুনেছি, ছেলেবেলায় পিতার আজ্ঞায় ধ্রুপদ ভিন্ন খেয়াল শোনাও বারণ ছিল, ঠুংরী টপ্পা তো দূরের কথা! যাত্রা শোনায় কর্তাদের আপত্তি ছিল না। গত পনেরো-কুড়ি বছর ধ্রুপদ ভিন্ন অন্য উচ্চ-সংগীত ও দেশী-সংগীত শোনবার সুযোগ হয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু পড়েছি ও তার অনেক বেশি আলোচনা করেছি। ফলে, আমার মাথার মধ্যে দু-তিনটি বিরোধী মত বসবাস করেছে, সন্দেহ হয়। অবশ্য, বিরোধের মধ্য দিয়েই চিন্তার সমন্বয় সম্ভব। মানসিক পীড়াগ্রস্ত রোগী নিজে যদি রোগের প্রকৃত কারণ বুঝতে পারেন তবে তিনি নিজেই সুস্থ হতে পারেন। তাই আজ গান বাজনা অল্প জেনে, ওস্তাদ না হয়েও, বিরোধের নির্বাণ প্রাপ্তি ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সংগীত সম্বন্ধে লিখতে বসেছি। লেখা ছাপাবার উদ্দেশ্য এই যে, আমার মতন অনেক অর্ধমূর্খ, অর্ধপণ্ডিত সংগীতপ্রিয় লোক আছেন যাঁরা মার্গ, দেশী ও আধুনিক সংগীত সবই শুনতে চান ও ভালোবাসেন, অথচ যাঁদের মতামতকে সাজাবার, বিচার করবার, সমন্বিত করবার অধ্যাপকসুলভ অবকাশ ও সুযোগ নেই। তা ছাড়া, জনকয়েকের স্বভাবই হচ্ছে ভাবগুলিকে ভাসমান অবস্থায় না রেখে দানা বাঁধাতে চাওয়া।

একটি মত হল এই: গানে অর্থাৎ কবিতা চাই। সেই কবিতার ভাবার্থ নিয়ে সুর বসাতে হবে। কবিতায় যেখানে করুণভাবের বিকাশ হচ্ছে সেখানে কোমল পর্দা কিংবা কোমল স্বরের গুচ্ছটি লাগিয়ে সুরটিকে মোলায়েম করতে হবে। অথবা কবিতাটি যদি আদিরসাত্মক হয় তা হলে চটকদার সুরে (ও তালে) গাইতে হবে। 'মজাদার' কবিতা মালকোষ কিংবা ললিতের মতন ভারী রাগে গাওয়া চলবে না, তার জন্য পিলু বারোয়াঁ, কাফি প্রভৃতি রয়েছে; করুণ কবিতার জন্য

দেশ, পূরবী, আর গুরুগম্ভীর রচনার জন্য ভৈঁরো, কানাড়া ইত্যাদি। কেননা, সুরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতায় ভাবকে ফুটিয়ে তোলা। সেইমতো তাল ও লয়ও চলতে বাধ্য।

অন্য মত এই: সুর যদি কবিতার ভাব ফোটাতেই ব্যস্ত হয় তবে সুরের নিজস্বতা ও সার্থকতা কতটুকু রইল? অথচ সেটা রয়েছে আমরা সকলেই জানি। লোকে তান দেয় কেন, সেতার বাজায় কেন? সুর হয় সুর, না-হয় বে-সুর। সুরের একমাত্র কাজ নিজের তাগিদে বিকশিত হওয়া। কবিতা মনের এক ধরনের ভাব-সমাবেশের ভাষা, সুর অন্য স্তরের। প্রকাশ করবার প্রবৃত্তির ভিত্তি ছাড়া এ দুই ভাষার কোনো প্রাথমিক সম্পর্ক নেই। আর যদিও থাকে, তবে রাজকার্যে ব্যবস্থাপন, শাসন ও বিচার পদ্ধতি পৃথক করাই যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল কথা, তেমনই কবিতা ও সুরের সম্বন্ধটি বিচ্ছিন্ন করাই কবিতা ও সুরের স্বাধীন উন্মেষের পক্ষে সমীচীন। যেমন হিব্রু দিয়ে গ্রীক বোঝানো যায় না, তেমনি সুর দিয়ে কবিতা কিংবা কবিতা দিয়ে সুর বোঝানো যায় না। সুর কবিতার তরজমা নয়।

এ দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী, অথচ একই শুচিবাইগ্রস্থ মনোভাবপ্রসূত মতের মাঝামাঝি আর-একটি মত আছে। সেই মতানুসারে, যেখানে— যেমন রবীন্দ্রনাথ, কি অতুলপ্রসাদের গানে— সুর ও কবিতা হরগৌরীর মতন অঙ্গাঙ্গীভাবেই মিলিত রয়েছে, সেখানে এমন একটি বিশেষ রস সৃষ্টি ও সঞ্চারিত হচ্ছে, যেটি না-কেবল সুরের না-কেবল কবিতার, অথচ দুইয়ের মিলনের একটি অতিরিক্ত ফল। তার ভিন্ন নাম দেওয়াই ভালো— সংগীত।

আমার বিপদ এই যে, ভালো সুরে বসানো ভালো কবিতাও শুনতে ভালো লাগে, শুদ্ধ সুর শুনতেও ভালো লাগে, এবং সংগীত শুনলেও প্রাণটা উদাসী হয়, নেচে ওঠে। বুদ্ধির দিক থেকে মানি যে সুরের রস সাধারণত সাহিত্যের রস থেকে পৃথক। প্রতিভান্বিত ব্যক্তির পক্ষে সব মিলনই সম্ভব, তাও আমার অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। কিন্তু মোটামুটি বলা যায়, বাংলাদেশে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল, যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে সুরের যে ধারা এতদিন বয়ে এসেছে সেটি সাহিত্যের দ্বারাই পুষ্ট। সেখানে আবার ধর্মভাব সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করার দরুন সুর নিতান্তই লুকিয়েছিল। কীর্তনে যে ভারী সুর নেই, সুরতালের কেরামতি নেই বলছি না! তবে কীর্তনের প্রধান আবেদন সাহিত্যের ও ধর্মের এ কথা সুনিশ্চিত। ধ্রুপদ-খেয়ালে অভ্যস্ত কানে কীর্তনের সুর বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর স্মৃতি জাগ্রত করে বলেই আদর পায়। দেশী-সংগীতের নিজস্ব যেগুলি টান কী

খোচ কী ছন্দ আছে তার সাংগীতিক মূল্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বটে, তবু তুলনামূলক বিচারে অনেকেরই কাছে তার স্বরগত মূল্য কম।

অবশ্য সাহিত্যের, বিশেষত কবিতার দৌরাত্ম্য সব দেশের সব আর্টের ওপরই দেখা যায়, কারণ মুখের ভাষাটাই সবচেয়ে পুরাতন ও কর্মজীবনে ব্যাপক। য়ুরোপেও চিত্রকলা ভাস্কর্য স্থাপত্য ও স্বরকে সাহিত্যের অধীনে থাকতে হয়েছিল, আর এখনো কোনো আর্ট সাহিত্য থেকে ছাড়পত্র পায় নি। আজকাল মুক্তির চেষ্টা ভীষণ ভাবে চলছে, তাই অনেকে আধুনিক চারুকলা বুঝতে পারছেন না। ধর্মের আধিপত্য সম্বন্ধে বলা যায় যে ভগবানের কৃপায় এখন সব দেশেই তাঁর প্রতিনিধি পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কমে আসছে, এবং প্রত্যেক চারুকলাই পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের মতন নাস্তিক হয়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস, ধর্মের প্রভাব কমলে সাহিত্য, ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব কমলে চিত্রকলা, ধর্ম ও সাহিত্য ও চিত্রের প্রভুত্ব হ্রাসে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও স্বর ক্রমিকভাবে স্বাধীন হয়। সাবালক জমিদারপুত্র অল্প কয়েকদিন উচ্ছৃঙ্খল থাকে, পরে কেউ কেউ সামলে যায়, এবং তারাই হয় প্রকৃত জমিদার। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে চিরকাল থাকার চেয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতর দিয়ে স্বাধীন হবার আশা ও সম্ভাবনা বেশি। যখন প্রত্যেক আর্ট নিজের মৌরসী বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে সজ্ঞান তখনই সার্থকতা কিন্তু এইখানে আরেকটি কথা বলা দরকার। স্বাধীনতা অর্জনের পর পরিত্যক্ত সম্বন্ধের সাথে মৈত্রী স্থাপনের দিক আছে। সেটা চোখে পড়ে যখন 'বিশুদ্ধ' আর্ট জীবন থেকে বিযুক্ত হয়েছে লোকের ধারণা হয়।

এ-তো গেল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত। শ্রোতার প্রাণ সব সময় বুদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না সকলেই জানে। মস্তিষ্কের শিরাগুলো প্রায়ই ঝুলে পড়ে, যতই কেন সেই মস্তিষ্কের অধিকারী পণ্ডিত ব্যক্তি হোন না। আমি সাধারণ শ্রোতা, তাই, আমার মতন লোকের পক্ষে সাহিত্যের সাহায্য প্রায় চিরকালই নিতে হবে, অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সংগীত-অলংকারের নতুন ভাষা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সে ভাষা কথিত ভাষারই মতন স্বাভাবিক ও সহজবোধগম্য না হচ্ছে। তা এখনো হয় নি। অর্থাৎ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছি। তার মধ্যে আশা এই জ্ঞানটুকু যে স্বরের রস কবিতার রস থেকে বিভিন্ন হলেও মহারথীরা মিশিয়েছেন, এবং মধ্যে মধ্যে, যখন স্বরের রস শুকিয়ে গিয়েছে, তখন স্বরের প্রাণসঞ্চারের জন্য জীবনের সেই আদিম বিকাশবৃত্তির উৎস থেকেই জল নিয়েছেন। নবজীবন সঞ্চারের সময় আদিম অবস্থার সেই প্রাণময় অভিন্নতা স্বীকার করাই সকল সৃষ্টির ধর্ম।

জানি মহারথীদের রচনায় দুটি রস মিশেছে। এবং তানসেন যেকালে পেরেছিলেন তখন ডিমক্রেসির যুগে অন্য লোকের চেষ্টা করবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। এ দুটি কথা মানবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তর্কবুদ্ধি জেগে ওঠে। গায়ক, ও সুর-রচয়িতা কেন কবিতায় বর্ণিত করুণ ভাবের পায়ে কোমল পর্দার বেড়ি ও বীরভাবের কপালে শুদ্ধ স্বরের জয়টিকা পরাবেন? কেন মিষ্টি কবিতায় দেশ, গম্ভীর কবিতায় কেদারা, সাত্ত্বিক কবিতায় ভৈঁরো বসবে? পরীক্ষা করে দেখে ড. ভ্যালেনটাইন লিখেছেন:

> We may suppose that the custom of setting sad songs to minor keys originated without any felt suitability of the key to the ideas, but that gradually, by repetition, we have come to connect the two, so that a piece of music in a minor key now usually appears to us sad or plaintive. There is nothing inherently sad about the minor key.

অর্থাৎ কোমল পর্দার কোমলত্ব আমাদেরই আরোপ, আমাদেরই অভ্যাস। শুধু তাই নয়, কারো কারো কাছে সুর কোমল কিংবা কঠিন ধরাই পড়ে না। এও পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে স্বর সম্বন্ধে মানুষ সাধারণত পাঁচ রকমের বিচার করে থাকে, অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের শ্রোতা আছে। প্রথম, subjectively, যেমন স্বর শুনে গায়ে কাঁটা ওঠা, কি সুড়সুড়ি লাগা, দ্বিতীয়, associatively, একটা স্বর শুনে সদৃশ কোনো শব্দের স্মরণ হওয়া; যেন ঘণ্টা বাজছে, ঝরনা বইছে, ইত্যাদি। তৃতীয়, objectively, যেমন স্বরটি বেশ গোলগাল, মোলায়েম। চতুর্থ, character ঘটিত, ব্যক্তিগতভাবে, যেমন স্বরটি নিরাশায় ভরা তেজী, নিরীহ, সাত্ত্বিক প্রভৃতি। পঞ্চম, associative other than musical, যেমন রামায়ণ শুনে রামছাগলের কথা মনে হওয়া। এই রকম ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলির দ্বারাই সুরের সৌন্দর্য বিচার হয়। পরীক্ষকের মতে চতুর্থ বিচারই শ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেণীর শ্রোতাই সত্যকারের সুররসিক।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু উপায় নেই, বিশেষত যখন সাপটি অবান্তর নয়। ১৪৬ জন শ্রোতা নিয়ে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে ছেলেদের মধ্যে পাঁচ জন এবং মেয়েদের মধ্যে পনেরো জনের মনের উপর স্বরের কিছু প্রভাব থাকলেও মুখে ব্যক্ত করবার ক্ষমতা নেই। বিদেশী ভাষাতেই অদ্ভুত ও অপ্রিয় সিদ্ধান্ত পেশ করছি:

If we increase the number of judgments given by the

men proportionately, for the sake of ready comparison with those of the women, we find that in the highest type of judgment (character), the men surpass women by 10 percent, whereas the women give 10 percent more of the lowest type of judgment than do the men...(সাধে কি মেয়েরা অবৈজ্ঞানিক !)...The fact that women concern themselves more than men with music (for example, as regards the taking of lessons in the playing of piano is perhaps a matter of convention,and is not due to any greater sensitiveness to music, at least so far as individual tones are concerned.

মেয়েরা যে গান শেখেন ফ্যাসানের কিংবা বিবাহের জন্য এ ধরনের ইঙ্গিত আমি অগ্রাহ্য করি। ও রকম কটু কথা শুনতে হলে মানতে হয় যে character typeই শ্রেষ্ঠ শ্রোতা। কিন্তু ঐ ইংরেজি শব্দটির অর্থ মনোভাব ব্যক্ত করবার ক্ষমতা ছাড়া আর কী? মেয়েরা আজকাল নভেল, গল্প, এমন কি গদ্য কবিতা লিখলেও মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেন না কে না জানে? তা ছাড়া পূর্বোক্ত মন্তব্যের শেষাংশে এক-একটি স্বরেরই উল্লেখ আছে, এবং সুর স্বর-সমষ্টি ছাড়া আরো কিছু হতে পারে। মেয়েরা না হয় শুদ্ধস্বর বোঝেন না, গাইতে বাজাতে পারেন না, তাতে কিবা আসে যায়, যদি তারা সুরের রূপটিই পরিগ্রহ করতে পারেন। যৎসামান্য অবশ্য একটু আসে যায় যখন গায়িকা সংগীতে কবির প্রতিভূ হয়ে ওঠেন, নিজেদের সুরের জগতে কবিতার বিষয় ও প্রতিনিধি ভাবেন। কিন্তু এ প্রকার আসা-যাওয়ার দাম সুরের দিক থেকে এতই কম যে তার সম্বন্ধে বেশি বিচার করা অন্যায়। সোজা কথা এই, সুরের স্তরে মেয়েরা অবতীর্ণা হয়ে শ্রোতার মনে কবিতাপ্রীতি জেগেছে, সুর ও কথার পার্থক্য ঘুচেছে— কেবল তাই নয়, আরো অনেক কিছু সম্ভব হয়েছে যেটা জীবনযাত্রার জন্য নিতান্ত আবশ্যক। তাঁদের কাছে সংগীত-রসিক মাত্রেই কৃতজ্ঞ। মাত্র সুররসিক বড়োই গোঁড়া, একপ্রকার বে-রসিক, তাঁর কাছে ব্যক্তিগত রূপ, রস অবান্তর।

সে যা হোক, পরীক্ষাগুলি থেকে বোঝা গেল যে সকলেই এক স্বর কি সুরকে কোমল বলতে বাধ্য নয়। যা আজ অত্যন্ত কটু ঠেকছে শুনতে শুনতে পরে তাও ভালো লাগতে পারে। একটি স্বর কি সুরের অর্থ প্রত্যেকের কাছে, একই ব্যক্তির কাছে সব সময়ে একই হবে, অন্তত একই ভাবে ব্যক্ত হবে তাও নয়। তার

ওপর তাল রয়েছে। তথাকথিত করুণ সুরও খেমটা কি কাহারোয়াতে চুটকি ঠেকে, আর পিলু, ঝিঁঝিট খাম্বাজের মতন সাদাসিধে রাগিণীও বড়ো তালে বসিয়ে গাইলে গম্ভীর শোনায়। শ্রোতার মনে এতরকম বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া থেকে কি প্রমাণ হয় না যে সুর যে ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করে ঠিক সেটি কথিত ভাষায় অব্যক্ত? অন্তত সেটি যদি কবিতায় যথাযথ প্রকাশ পায় তবে কবিতাটি এত সার্থক ও সম্পূর্ণ হল যে সংগীতের সাহায্য সে ভিক্ষা করে না? রস-বস্তু টাকা নয় যে অধিকন্তুতে দোষ বর্তায় না। কথা থামলে সুর শুরু হয়।

সাহেবের কথা এদেশে খাটে বললে চলবে না। হিন্দুস্থানী সুর-পদ্ধতি নিশ্চয়ই বিদেশী সুর-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন, বিশেষত বিন্যাসে। কিন্তু পরীক্ষার বিষয় স্বরবিন্যাস নয়, সাধারণ মানুষের মনের 'পরে স্বর ও বিরামের প্রভাব। মানুষের মোটামুটি ভাবধারাগুলি প্রায় সর্বত্রই সমান, কেবল সংস্কৃতি অনুসারে তাদের রূপ ভিন্ন। সাধারণ অশিক্ষিত শ্রোতার প্রবৃত্তি প্রায় সর্বত্রই সমান, এবং স্বর সেই প্রাথমিক ভাবধারা ও প্রবৃত্তিকেই নাড়া দেয়। একটি স্বরের কম্পন ভারতেও যা বিদেশেও তাই, যদিও তার ব্যবহার ভিন্ন। যদিও স্বীকার করা যায় যে সব সাহেবই পাজি, তবু মানতে হবে যে বিলাতী সংগীতে, যেখানে কোনো রচনা ঘুম ভাঙিয়ে প্রাণকে আশান্বিত করে, কোনো রচনা শুনে আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়, যেখানে কান্না, হাসি, পাখির ডাক, সমুদ্রের গর্জন, ঘোড়ার হ্রেষারব, বেড়ালের মিউ মিউ পর্যন্ত শব্দের অনুকরণে বাধা নেই— সেখানেও যখন কোমল পর্দার সাহিত্যিক কোমলতা নেই, সেখানেও যখন কোনো একটি স্বর সকলের কাছে এক অর্থ বহন করে না, তখন আমাদের হিন্দুস্থানী সুর-পদ্ধতির মতন অত অ-বাস্তব, অ-পার্থিব, সূক্ষ্ম চারুকলার কাছে সাহিত্য-রসের প্রত্যাশা করলে, তার সঙ্গে কবিতার রস মিশিয়ে দিলে, তার সাহিত্যের সমর্থন প্রয়োজন আছে, কিংবা তার সাহায্যে সাহিত্য-রসের উদ্রেক হয় স্বীকার করলে আমরা সাহিত্য-রসিক ভিন্ন সুরের প্রেমিক প্রমাণিত হব না। 'সাহিত্যিক ভাব' বলতে আমি সাধারণ ভাবই বুঝি, যেমন ভালোবাসা, মান-অভিমান, করুণা, রাগ, হিংসা প্রভৃতি— অর্থাৎ যেগুলি নিয়ে সাহিত্য এতদিন কারবার করে এসেছে, যেগুলি, এক হিসেবে, সাহিত্যিকের সৃষ্টি। তালের আলোচনা স্থগিত রাখছি। এইখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে জানি— সুরের experience ও-সব ছাড়া তবে কি? সেটা কী পরে বিবেচ্য। সেটা কী নয়, কল্পনা করা যায়— মুখভঙ্গি নয়, ভাও বাতানো নয়, দেহের সাহায্যে কবিতাকে প্রথমে ফুটিয়ে তুলে সেই কবিতার সঙ্গে সুরের অলংকার পরানো নয়।

প্রথম মতের সঙ্গে আমার গরমিল এই পর্যন্ত। মিলের কথা স্মরণ করি আবার। অত্যন্ত পুরাতন ও পূর্বপরিচিতকে না ভালোবেসে যে থাকতে পারি না। যে কথিত ভাষাকে বাল্যকাল থেকে প্রথমভাগের ভেতর দিয়ে জানি সেটা আমার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। কথার শেকড় অতিদূর পর্যন্ত ছড়ানো। কথার সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ, কাজের সম্বন্ধ, জীবনযাত্রা চালাবার সম্বন্ধ সুরের চেয়েও নিকটতর। মনে যত ছবি ভেসে ওঠে তার অনেকগুলিই ভাষায়, কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। অনেকের মতে আবার যা ভাষায় ব্যক্ত হয় না তার অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই, সকলের পক্ষে না হোক, সর্বসাধারণের পক্ষে তো বটেই। মানুষের উপভোগকে চিরে চিরে ভাগা দেওয়া অসম্ভব। অনুভূতিটা অখণ্ডরূপেই আসে, উপভোগও সেইমতো আসে অনেক সময়। হিন্দুস্থানী ভাষায় ওস্তাদী গান শোনবার পর যদি কেউ বাংলা গান গায়, তা হলে শ্রোতারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, কারণ এতক্ষণ বাদে পূর্বপরিচিতের সাক্ষাৎলাভ হল। এ তৃপ্তি অন্যায় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? সুরও আমরা চি'নি অবশ্য— কিন্তু বিদেশিনীকে চিনি চিনি বললেই কি ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলা উচিত, না ঘরের লক্ষ্মীর পদযুগল পুজা করতে বসবেন? এই ঘরের লক্ষ্মীটি বড়োই খামখেয়ালী।

তবু যেন সন্দেহ থেকেই যায়। না-হয়, আমরা কথিত ভাষার কবিতার সাথে পরিচিত ও বন্ধুকে দেখলে সকলেরই ভালো লাগে। কিন্তু, পরিচয়ই কি পরিচিতের প্রকৃতি বদলে দিতে পারে? এমন মানসিক অবস্থা কল্পনাতীত নয় যার প্রকৃতি ও রূপ কবিতাতেও ধরা পড়ল না। তখন কবিতা অবান্তর নিশ্চয়ই। ভাতের খিদে রুটিতে যায় কি? পূর্বপরিচয় সবক্ষেত্রেই আনন্দের মাত্রা বাড়ায় নিশ্চয়, তার জন্য আমরা সুরও বেশি উপভোগ করি, যেই বুঝলুম ওস্তাদ দরবারী কানাড়া গাইছে অমনই বাহবা দিলাম। সকলেই জানেন যে বড়ো ওস্তাদরা পর্যন্ত সাধারণত পঞ্চাশ-বাটখানি সুর নিয়ে নাড়াচড়া করেন, এবং বছর খানেকের মধ্যেই বোধহয় সেগুলিকে অন্তত চেনা যায়। এই কয়টি রাগ-রাগিণী সুপ্রচলিত থাকার দরুনই তাদের সঙ্গে সাধারণ সুরপ্রিয় শ্রোতার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার ফলেই সুরের নাম আবিষ্কারের পরমুহূর্ত থেকেই স্বরবিন্যাসের দিকে তাঁদের বেশি নজর পড়ে। কারণ, familiarity breeds contempt, অর্থাৎ ঘরের লক্ষ্মী ঘোমটা টানেন না। তখনো পরিচয়ের জের চলে, তবে অন্যস্তরে। যেমন ধরা যাক, ভীমপলাশির গান নিচের কোমল নিখাদ থেকেই শুরু হয় সাধারণত, একটি গান আছে যেটির ওপরের নিখাদ থেকেই আরম্ভ হয়। তখন অ-পরিচয়ের খট্‌কা লাগে, সন্দেহ হয়, ভীমপলাশি নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই

ঋি সা ধ মা পা পকড়টি না পাওয়া যায়। পাবার পর ভীমপলাশি বোঝা গেল, ও তখন নতুন সুরপদ্ধতির বিচার শুরু হল। তার পরও বিচার চলে, অপ্রত্যাশিত, অপরিচিত স্বর-বিন্যাসের সঙ্গে অভ্যস্ত স্বর-বিন্যাসের তুলনার ফলে একটা রায় জাহির হয়— ভালো কিংবা মন্দ। পরিচয়ের মোহ ত্যাগ করার পর যে রায় দেওয়া হয় তার মধ্যে বিচার-বুদ্ধির ছাপ নিশ্চয়ই বেশি। এখন, নতুন সুর-রচনা রোজ শোনা যায় না, অথচ নতুন ও বিচিত্র কবিতা তার চেয়ে বেশি ছাপা হচ্ছে। সেইজন্য, অর্থাৎ নতুনের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুবিধার তারতম্যের জন্যে, যে ব্যক্তি কবিতাও পড়েন, গান শোনেন, তাঁর বিপদ হয়। অতএব যদি কোনো গায়ক কোনো নতুন ধরনের বাংলা কবিতা পুরাতন সুরে গান, তা হলে তিনি ভাষার তরফ থেকে আনন্দ দিতেও পারেন, কিন্তু সুরের দিক থেকে পূর্বপরিচিত সুরের ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারছেন না। যদি দিতে চেষ্টাও করেন তবে আমরা সুরের বিকাশই প্রত্যাশা করব, কথার মাধুর্যকে অবহেলা ক'রে। মানুষের মন একই সময় দুটি ভিন্ন দিকে সমানভাবে নজর দিতে পারে না। চেষ্টার ফলে গায়ক জোর এই প্রমাণ করবেন যে তিনি একজন স্বভাষাভক্ত বাঙালী। তিনি একজন সুগায়ক ও আর্টিস্ট প্রমাণ করতে হলে সুরের প্রতি তাঁকে ঝোঁক দিতেই হবে, একটি পরিচয়ের তৃপ্তিকে জলাঞ্জলি না দিয়ে তাঁর উপায় নেই। সত্যকারের উৎকৃষ্ট কবিতা ওস্তাদিভঙ্গিতে পরিচিত সুরে গাওয়ার ও শোনার গলদ এইখানে। দুটি ভাবের কাটাকুটি হওয়া সম্ভব।

তা হলে, দ্বিতীয় মতের সঙ্গেই আমার মিল বেশি রয়েছে দেখছি। তবু স্বীকার করি যে এই মতের পিছনে আছে রসভাগ, রসভোগ নয়। রসভাগ চুলচেরা বুদ্ধির কথা, রসভোগ একটি অবিভাজ্য অভেদ্য অখণ্ড অনুভূতি যার মধ্যে বুদ্ধি, বৃত্তি, ইচ্ছার ক্ষণিক ক্রিয়া একত্রে সাজানো রয়েছে। কেবল তাই নয়, তার অনুভূতি কেবল আমার নয়, আপনার নয়, প্রত্যেক মানুষের, সর্বসাধারণের, সার্বজনীন ব্যক্তিত্বের, মানবসমাজের। তার ঐক্যকে পরে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু অভিজ্ঞতা হিসেবে সেটি নিতান্তই একমাত্র। দিল্লীতে হুমায়ুনের কবর দেখলাম, ভালো লাগল। বন্ধু যখন সন্ধ্যা-বৈঠকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ভালো লাগল? তখন সেই একক অভিজ্ঞতাকে ভেঙে, গম্বুজের সঙ্গে সম্মুখের ভিত্তির সঙ্গে উচ্চতার রূপগত সম্বন্ধ যে কত পরিপাটি তাই বোঝালাম। বানু বেগমের পতিভক্তি, লাল ও সাদা পাথরের ব্যবহারের ইতিহাস, কিংবা দিল্লীর সেই মোগলাই খুশবুর— কোনো কিছুর উল্লেখ করলাম না। কিন্তু যখন কবর দেখছিলাম, তখন তাকে হুমায়ুনের কবর বলেই জানতাম, হুমায়ুন কত বড়ো

রসিক কদরদান ছিলেন তাও জানতাম, তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁর প্রতি আমার দরদ ছিল, এবং বাহু বেগমকে তাজের স্বামীর মতনই শ্রদ্ধা করছিলাম। কেবল তাই নয়, স্থপতিবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির বচনগুলিও আমার অজানা ছিল না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রূপের আদরও করছিলাম। গোটাকয়েক ঐতিহাসিক তথ্য ও অবান্তর তত্ত্ব আমার রূপভোগের সঙ্গে মিশেছিল। ছোটো ও সুন্দরী মেয়ের ভালো গান শোনার মধ্যেও খাদ থাকে, যেমন থাকে বৃদ্ধ খানদানী ওস্তাদের পাকা গান শোনায়। এই রকম আর্টের-পক্ষে-অবান্তর মনোভাবকে দূর করা উচিত বলা যত সোজা কাজে ততটা নয়। ঐতিহাসিক তথ্য না-হয় দূর হয়—আজকালকার প্রত্যেক সায়েন্স গ্রাজুয়েট অবলীলাক্রমে তা পারেন, কিন্তু বাংলা গান শুনব অথচ তার কথা শুনবো না, এবং সে-কথা ভালো কবিতা হলে তার রসকে ভিন্নজাতীয় বলে কানের বাইরে হরিজনদের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে বলব—এ আমি পারি না— সাফ কথা এই। ওরকম রসভাগ বুদ্ধির চিহ্ন নয়, অস্বাভাবিক মনের চিহ্ন, যে মন কথায় কথায় 'ভয়' পায়, কথায় কথায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। নতুন-মনস্তত্ত্ববিদ বলছেন, আমাদের মন সভ্যতার তাড়নায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান, এখনো সভ্য হতে দেরি আছে। যদি কখনো ঐরকম শহুরে কিংবা দরবারী সভ্য আমরা হই, তখন না-হয় রস উপভোগের সময় কথার দাবি মানব না, তখন অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও কীর্তনের পদ, মায় তানসেনের অনেক গানও পুড়িয়ে ফেলব, আসরে কেবল তেলানা আর যন্ত্রই শুনবো। ভালো কথা, কবিতায়ও, ন্যায়ত, আমরা তখন মিল কি ছন্দ, সুরের কোনো প্রকাশ রেশও প্রত্যাশা করতে পারব না। চিত্র হবে জ্যামিতিক, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য হবে যান্ত্রিক, তাই ভালোবাসতে হবে, আর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' উচ্চারণ করা হবে পাপ…কেবল ক্ষণিকবাদ, আর কোটি কোটি দেবতার পৃথক্ পূজা চলবে। মজা এই, যাঁরা সুরের স্বাতন্ত্র্য মানেন তাঁরা কবিতায় ঝংকার, চিত্রে গল্প চান, দেবদেবী মানেন, আবার ধর্মে বৈষ্ণব হতেও তাঁদের বাধা নেই। একটির স্বাতন্ত্র্য মানতে হলে অন্যের স্বাতন্ত্র্যকে খাতির করতে হয়। না খাতির করলে আত্মা-টাত্মা কিছুই থাকে না।

তৃতীয় মত হল এই: যে কথা ও সুরের মিলনের কালে একটি নতুন রস উৎপন্ন হয়, সেটি কথারও নয়, সুরেরও নয়। কথা ও ভাবের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, এবং সুর হিসেবে শুদ্ধ না হলেও যে অতুলনীয় সুর রচনা সম্ভব তার প্রমাণের অভাব নেই। আবার কবিতা হিসেবেও চমৎকার ও সুরও শুদ্ধ, অথচ দুয়ে মিলে একটি অভিনব মধুর রচনা হল না, তারও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। এই নতুন

সৃষ্টিকে সংগীত বলাই ভালো। আনন্দ দেবার ক্ষমতা যদি রচনার চূড়ান্ত পরিচয় হয় তবে সংগীতকে বরণ করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গান যে শুদ্ধ ভাষা, কিংবা বাউল, ঠুংরী, কীর্তন, ভাটিয়াল বা প্রচলিত রাগিণীর পরিচয়ের দ্বারাই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে তা নয়, সে-সব গানের সুরের ব্যঞ্জনা, কথা ও সুরের সংযম, কথার দ্বারা সুরের ও সুরের দ্বারা কথাগত ভাবের প্রকাশ যথার্থ হয় বলেই আমরা আনন্দ পাই। এই-সব গানে কোন্‌টি কাকে ব্যক্ত করছে বলা শক্ত, কোন্‌টি রূপ আর কোন্‌টি সত্তা ধরাই যায় না। অতএব সংগীত রসকে পৃথক ভাবাই উচিত মনে হয়।

এই সংগীত সম্বন্ধে আমার গোটাকয়েক বক্তব্য আছে। কথা ও সুর নামক প্রবন্ধে তার প্রকৃতি মিলনের শর্ত নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছি। পুনরাবৃত্তির ভয়ে এখানে অন্য মন্তব্য করছি। সংগীত যখন দুয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৃতীয়ের সৃষ্টি, বহুব্রীহি সমাসের মতন, তখন বড়ো ওস্তাদও বড়ো কবি না হয়েও, কেবল 'সুরেলা' ও সাধারণ কবি হয়েও সংগীত রচনা সম্ভব। যেমন নিধুবাবুর টপ্পা, বিশেষত তাঁর 'যে যাতনা, অযাতনে' গানটি। এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় করিত-কর্মা গায়কের পক্ষে উৎকৃষ্ট সংগীত রচনা যেন আরো বেশি শক্ত। সে যাই হোক —সংগীতের গায়ন পদ্ধতিই আমার বিচার্য, কারণ আমি শ্রোতা, অতএব শ্রোতার আনন্দ পাবার উপায় সম্বন্ধেই আমার বিচারের অধিকার আছে। আমার বিশ্বাস, দরবারী কানাড়ার ধ্রুপদ খেয়াল গাইতে যতটা রসজ্ঞান থাকা চাই, তার চেয়ে কোনো অংশে কম রসজ্ঞান থাকলে সংগীত গেয়ে প্রকৃত আনন্দ কেউই দিতে পারে না। এটা লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। সব সুরের খেলাই এই জগৎ থেকে দূরে নিয়ে যায়, রবীন্দ্রসংগীত ও তেলানা দুইই। দু প্রকার গানেই ধরা-বাঁধা নিয়মের বশবর্তী হয়ে বন্ধনকে অতিক্রম করতে হয়, তবেই মুক্তির আস্বাদ মেলে। রবীন্দ্রসংগীতের ভৈরবীও সুর, আবার ভৈরবীর তেলানাও সুর। শেষের ভৈরবী কে কবে বেঁধে দিয়েছে জানি না, অতএব সেটি নারদ ঠাকুরের দান ও অন্য ভৈরবীটি একজন জীবন্ত লোক রচনা করেছেন— অতএব হেয়, এই তফাত। কিন্তু দু প্রকার গানেই বিপদ রয়েছে, সাধারণ গায়কের পক্ষে। তেলানা গাইতে সুরকে আপমান করে ঐতিহ্যকে খাতির কিংবা কেরামতি দেখানোই যেমন রীতি হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রসংগীত গাইতে সুরের ধারা বদলে দিচ্ছি, সৃষ্টি করছি এই প্রকার আত্মসচেনতা গায়কের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠতে দেখছি। সেইজন্যই বলি সংগীতে সম্মান দেখানো যার তার সাধ্য নয়। বড়ো কঠিন, বড়ো দায়িত্বপূর্ণ এই কাজ।

একটি কথা সর্বপ্রথমে সংগীত-গায়কের সর্বদা মনে রাখা চাই। সংগীতে সংযমের অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন। যেখানে-সেখানে তান সংগীতে অচল। হিন্দুস্থানী গায়ন পদ্ধতিতেও অবশ্য তাই; কিন্তু অভ্যাসের দোষে তানবর্ষণকে যেন আমরা মাপ করতে শিখেছি। সংগীতে অযথা তান অক্ষমনীয়। যেকালে সংগীতস্রষ্টার মনে সুর ও কথা একত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন যমজ সন্তান দুটিকে বিচ্ছিন্ন করলে প্রত্যেককেই কষ্ট দেওয়া হয়। যমজের একটির অসুখ করলে অন্যটিরও হয় সকলেই জানে। সংগীতকার যেকালে কবিতা ও সুর, উভয়েরই স্রষ্টা, তখন সাধারণত, সংগীতের অনুপম ও অভিনব রসটি যে-কোনো সাধারণ গায়কের অপেক্ষা সংগীতকারের নিজের কাছে বেশি প্রকৃত ও পরিস্ফুট, এটুকু ভাবা অসংগত নয়। অবশ্য যদি কেউ সংগীতের মর্যাদা সংগীতকারের অপেক্ষা বাড়িয়ে দিতে পারেন তো বহুত আচ্ছা। সে আমাদেরই লাভ, কে না বেশি আনন্দ চায়? তবে মর্যাদা বেড়েছে কি কমেছে তার বিচারক হবেন সংগীতস্রষ্টা নিজে, কেননা কথা ও সুরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অপূর্বতা সম্বন্ধে তিনিই সব চেয়ে বেশি সচেতন, শ্রোতার চেয়ে, গায়কেরও চেয়ে।

অবশ্য মর্যাদা বাড়িয়েই দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমাদের দেশে সংগীত রচয়িতার কবিতা ও সুরের উপর কোনো পেটেণ্ট নেই; অতএব সে কবিতাকে যে-কোনো ভদ্রলোক তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে ভরে খেয়াল-মাফিক গাইতে পারেন— আইনে বাধে না। একই কবিতার একই ইঙ্গিত হবে কেন? বরঞ্চ প্রত্যেকের কাছে যদি ইঙ্গিতে পৃথক হয় তবেই সেটি ভালো কবিতা হল। এপ্রকার তর্ক আমি শুনেছি। কিন্তু ভেবে দেখেছি, আপত্তিটা ঠিক খাটে না। ব্যাপারটা কবিতায় সুর বসানো নয়। ব্যাপার হল এই: সংগীতকে ভেঙে, তার কবিতাটিকে আলাদা করে তার উপর নিজের ইচ্ছামতো সুর বসিয়ে গাইলে সংগীত-রসের উদ্‌বোধন হয় কিনা। আমার মতে, কোনো একটি ফুলের শিশিতে পোরা নির্যাস দিয়ে সেই ফুলের কিংবা অন্য ফুলের শুখনো পাতা গন্ধময় করে তোলা স্বাধীনচেতার চিহ্ন, কিন্তু রসজ্ঞতার নয়। এই রকম বোকামি আমি নিজে একবার করেছিলাম। অতুলপ্রসাদ একদিন 'সাথি, ওগো, সাথি, আমি সেই পথে যাব সাথে' গানটি রচনা করে গাইলেন। কবিতাটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছিল, কিন্তু কীর্তনের জন্য কিংবা অন্য কি কারণে আমার মনে নেই, সংগীতটি আমার তখন পছন্দ হল না। আমি তাঁর অনুমতি চাইলাম নিজের মতন করে গাইবার। তিনি অবশ্য হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। অনেক ভারী, হালকা সুর বসালাম বাড়ি এসে। হঠাৎ মনে হল, যাত্রার

আসরে যুধিষ্ঠির সেজে নেমেছি। সেই থেকে আমার ধারণা হয়েছে সংগীতের হাড়মাস পৃথক করতে পারি, কিন্তু পুনরায় জোড়বার জাদুমন্ত্র আমার জানা নেই। অন্যের থাকতে পারে নিশ্চয়। যদি আমার দেওয়া সুরেই গাইতাম অতুলপ্রসাদ আমার নামে এক নম্বর রুজু করে দিতেন না। তবে, তাঁর বলবার অধিকার চিরকালই থাকত যে তিনি তাঁর সংগীতে যে-ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন সেটি আমি ফোটাতে পারিনি। মোট কথা এই : সংগীতকারের রচনায় তাঁর অপেক্ষা শোভন সুর দিতে হলে গায়ককে একাধারে তাঁর অপেক্ষা বড়ো সুরসিক ও কাব্যরসিক হতে হবে— তা তিনি ছোটোই হন, আর বড়োই হন। বোধহয় তা হলেও চলবে না— যে শুভ মুহূর্তে ভাবগুচ্ছটি আপনা হতে সুরের রূপে বিকশিত হল সেইটি ফিরে পাওয়া চাই। আমি দেখেছি সংগীতকার নিজেই অনেক সময় তা পারে না। ভাবের অদল-বদল হয়ে যায়, অতএব অন্যে পরে কা কথা! তবে রসের কথা বাদ দিলে গণ্ডগোল চুকে যায়। যতক্ষণ না পেটেণ্টের আইনকানুন পরিবর্তিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমি যা তা করে গাইতে পারি— কেননা, রচয়িতাও মানুষ, আমিও মানুষ, অতএব আমায় রোখে কে! এ-মনোভাবকে চিনি— আর্টিস্টের বলে নয় কিন্তু। সংগীতবিচারেও পলিটিক্স এসে পড়েছে।

অতএব আমার সিদ্ধান্ত মুক্তকণ্ঠে প্রচার করতে বাধা নেই। শাগির্দ যেমন নাড়া বেঁধে ওস্তাদের কাছে পাকা গানের প্রতি অক্ষর ও স্বর কণ্ঠস্থ করেন, ঠিক তেমনিটি করে বাংলা গানের শিক্ষার্থীকেও, মনোযোগ সহকারে, এক পর্দা এধার ওধার না করে, পান থেকে চুন না খসিয়ে সংগীতের গায়ন শিখতে হবে। বছর দশেক পরে হয়তো একদল সংগীতশিক্ষক উঠবেন, যাঁরা শিষ্যের ব্যক্তিত্বকে আগেকার ওস্তাদদের মতনই চেপে মেরে ফেলবেন। তখন অবশ্য বাংলা সংগীতের মুক্তির বাণী, আশার স্বপন, ডাইনোদের মতন আকাশে মিলিয়ে যাবে। আমার মতন লোকের পক্ষে কোনো কালেই মুক্তি নেই, আজ রহিম খাঁ, কাল লালিমা পাল (পুং)। তবে ওস্তাদের বদলে শিক্ষয়িত্রী এলে কী হয় বলা যায় না। সন্দেহ হয় খুব লাভ হবে না। মাছিমারা কেরানিতে পরিণত করবার ক্ষমতায় তাঁরা খাঁ সাহেব ও পণ্ডিতজীদের চেয়ে কম নন। কিন্তু সে তখন দেখা যাবে— আপাতত আমার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তিসংগত মনে হচ্ছে।

পূর্বের প্যারা লিখেই মনে হল ঠাট্টা করে ফাঁকি দিলাম। সত্যই, এ-সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের স্থান কোথায়, কতটুকু? এক্সপ্রেশন বলতে কী বুঝি? মৌলিকত্ব কি কথার কথা? হিন্দুস্থানী ওস্তাদী গানে ও বাংলা সংগীতে গায়কের স্বাধীনতা কি ভিন্ন ধরনেরই? সাধারণত আমাদের ধারণা যে হিন্দুস্থানী গায়ন

পদ্ধতিতে তান কর্তব, তালের বাটোয়ারা প্রভৃতি নানাপ্রকার অলংকারের ব্যবহার গায়ক ইচ্ছামতো করতে পারেন। দুটি স্থলে পারেন না, এক স্বর-যোজনায়, এবং ধ্রুপদে যেখানে নিয়ম একটু কড়া। তা ছাড়া, অবশিষ্ট স্থান সৃষ্টির লীলাভূমি। এ-ধারণা আংশিকভাবে সত্য। একটি বিখ্যাত খেয়াল গান যদি দশবার শোনা যায় তবে অলংকারের পুনরাবৃত্তি ধরা পড়ে, এমন-কি তানের পর্যায়টি পর্যন্ত। কেবল তাই নয়, সব কাকেরই একই রা, প্রায়। ঘরোয়ানা অনুসারে অবশ্য অলংকার প্রয়োগের পার্থক্য আছে, এবং সত্যকারের প্রতিভার কথাও আলাদা। তবু ঠুংরী যে ঠুংরী, যেখানে ভাবের কতরকম ব্যাখ্যাই না চলে, তাতেও একঘেয়েমি থাকে। ক্ল্যাসিকাল স্বরপদ্ধতির অনেক বন্ধন। তাই যদি না হবে তবে ধ্রুপদের এই দশা কেন, এতরকমের টোড়ি, মল্লার, কানাড়ার কী প্রয়োজন? তেলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ প্রভৃতি কত ভঙ্গিই না আছে। রাগিণীর এত মিশ্রণ হল কেন? নিশ্চয় নিয়মের বিপক্ষে বিদ্রোহ করবার প্রবৃত্তি অহিংস ভারতবাসী ওস্তাদী মনেও ছিল, ও এখনও আছে।

তবু বলি, গায়কের স্বাধীনতা আছে, তার বৈশিষ্ট্যে। ব্যক্তিগত কামক্রোধ-রূপ মানসিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য নয় অবশ্য, কারণ স্বরে ও স্বরযোজনায় কোনো অন্তর্নিহিত সাহিত্যিক ভাব নেই আমরা জানি। কিন্তু অন্তর্নিহিত সাহিত্যিক ভাব না থাকলেও গায়কের মনের সাধারণ গতি, শিক্ষা, ভদ্রতা, অভদ্রতা গায়কের কণ্ঠে ধরা পড়ে, খুঁজে দেখলে। বাদকের বেলা ধরা আরো শক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এক টাঙাওয়ালা 'সাঁচি কহো মুসে বতিয়া' গাইতে গাইতে পাশ দিয়ে চলে গেল। তার মুখ দেখে মনে হয় সে কখনো অনুনয়, কখনো অভিমান করছে। সে সুরের নাম জানে না স্বর চেনে না, সে কেবল প্রিয়ার সঙ্গে সুরে কথা কইছে, প্রিয়া যেন তার আঁখির আগে আগে চলেছে। ভাবছি, কত দরদ, কী ফিলিং, কী একস্‌প্রেশন! আওয়াজ ঘন, শিরা ফোলা, চোখের জল যেন পড় পড়। ব্যাপারটা কি? টাঙাওয়ালা ব্যবহারিক জগতেই রয়েছে, ঘোড়াকে চাবুকও মারছে, সোওয়ারীর প্রতি নজর রাখছে, অবশ্য অভ্যাসের বশে। টাঙাওয়ালা তার বিবির কাছে যেতে পারছে না, তাকে স্টেশনে যেতে হবে, টাকা রোজগার করতে হবে। জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে বলবে যে নিজের গৃহিণীর কাছে আর ফিরতে চায় না, মজনু হয়ে সে লয়লার কাছেই যেতে চায়। যাবার উপায় ঐ সংগীত। একটু পরে সে হঠাৎ তান ছাড়লে, আনন্দের লহর ছুটল, রাগ অভিমান উড়ে গেল, প্রিয়া অদৃশ্যা হলেন, রইল কেবল কল্পনার বিস্তার। এখানে কোনো উদ্দেশ্য, কোনো স্বার্থ, কোনো আত্মসচেতনতা রইল না, থাকল

কেবল স্বরযোজনার রীতি, স্বরবিকাশের নীতি, সামঞ্জস্য, অর্থাৎ ওজন জ্ঞান। টাঙ্গাওয়ালা ওস্তাদ নয়, তাই রীতি-নীতি সম্বন্ধে অচেতন। এই কল্পনার রাজ্যে ইতিহাস নেই, সাহিত্য নেই, বিশেষ কোনো আবেদন নেই, স্বার্থের কুসন্ধি, ব্যাকুলতা পর্যন্তও নেই। এ রাজ্য ব্যবহারিক জগৎ হতে বহুদূরে অবস্থিত। সব আর্টিস্টই ব্যবহারিক জগৎকে সুইমিং বোর্ডের মতন ব্যবহার করেন, তবে গায়ক পরীর মতন ভিন্নলোকে প্রবেশ করেন, ও সাহিত্যিক খানিকটা লাফিয়ে জলে পড়েন, কেউ কেউ সাঁতার কাটেন, আবার যাঁরা সাঁতারু নন, তাঁদের দেহটাকে বাস্তবপন্থী কুমির কিংবা আদর্শপন্থী শকুনিরা টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে। সুরের জগতে গায়ক ব্যবহারিক জীব মোটেই নয়।

তবে মৌলিকত্ব কি মাত্র সংগীত-রচনায় কিংবা তানের বেলাই কেবল? আমার আন্তরিক বিশ্বাস, সুরের ক্ষেত্রে, যেখানে নিয়মের অত্যন্ত কড়াকাড়ি সেখানে গায়কের স্বাধীনতা ধ্বনির ওজনে। এই ওজন দেওয়া যে কত শক্ত, দিতে পারলে যে কত মজা হয় তা খুব বড়ো আর্টিস্টের কাছে কিছুদিন ধরে না শুনলে বোঝা যায় না। হারমোনিয়মের সাহায্যে গাইলে ওজন দেবার প্রবৃত্তিটাও চলে যায়, গায়ক যদিও দিতে চেষ্টা করেন তবু ধরা পড়ে না, এবং অনভ্যাসের ফলে তার অস্তিত্বে শ্রোতার মনে অবিশ্বাসই জন্মায়। সেইজন্যই হারমোনিয়ম মৌলিকতার প্রধান শত্রু। লোকে যাকে কোমল ধৈবত বলে সেটি অনেক সুরেই লাগে, সকালের, সন্ধ্যার, আবার গভীর রাতের, কিন্তু প্রত্যেক সুরেই কোমল ধৈবতের ধ্বনি-ব্যঞ্জনা আলাদা। কেবল কোমল ধৈবত গাইলে আমরা অবশ্য কোন্‌টি ভৈঁরোর, কোন্‌টি পূরিয়া-ধানশ্রীর আর কোন্‌টি মালকোষের চিনতে পারব না, কিন্তু সত্য-কারের আর্টিস্ট যখন যে-সুরে কোমল ধৈবতটি লাগান তখন মনে হয় রাগটি এতই চমৎকার ফুটে উঠল যে অন্য যে-কোনো সুরের কোমল ধৈবত থেকে এটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই পার্থক্যের সুস্পষ্ট আভাস ও তার সাহায্যে রাগিণীর রূপ প্রকাশ করাই গায়ক-আর্টিস্টের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ও মৌলিকত্ব। স্বর ও স্বর-বিন্যাসের প্রতি দরদই প্রধান কথা, ইংরেজিতে যাঁকে feeling for the medium বলে। আনুষঙ্গিক অন্য কাজও আছে অবশ্য। আজকাল দরদ কথাটি খুব সচল, বিশেষত আসরে মহিলা আবির্ভাবের পর থেকে এত দরদ দেখেছি যে গা ঘিন ঘিন করে উঠছে। দরদ মানে ভাবপ্রবণতা নয়। দরদ অর্থে ভালোবাসা মেশানো শ্রদ্ধা। মা যদি ছেলেকে কেবলি ভালোবাসেন তবে সে-ছেলে মানুষ হয় না, মা'র ছেলেকে শ্রদ্ধা করাও চাই, অর্থাৎ ছেলের পৃথক সত্তাকে গ্রাহ্য করে তার অর্বাচনীতার ক্ষতিপূরণের জন্য তার সহ-অনুভূতি চাই।

ভালোবাসলে এই সহ-অনুভূতিটা আসে, তাই ভালোবাসার এত নাম-ডাক, নচেত মাথাখাবার খিদে বাড়াবার জন্য ভালোবাসার মতো অমন জোরাল হজমীগুলি আর নেই। দুর্ভাগ্যের কথা, সংগীত-গায়ক ও বিশেষত গায়িকারা কেবল ভালো-বাসতেই জানেন। সেইজন্যে শ্রদ্ধা, অর্থাৎ সংযমের উপর অত জোর দিচ্ছি। প্রকৃত দরদের জন্য নিয়ম মানতে হবে, তবেই ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, নিয়মকে অতিক্রম করা যাবে। এইপ্রকার নিয়মাধীনতা ও সন্তর্পণতা ভিন্ন রাগিণীর ও সংগীতের রূপ ফোটে না, মৌলিকত্ব তো দূরের কথা। বলা বাহুল্য, আমি ওস্তাদী শুচিবাই-গ্রস্ততার উল্লেখ করছি না। সত্যকারের আর্টিস্ট রাগিণীতে বিবাদী স্বর পর্যন্ত লাগান, তাতে রাগভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু কখন? রূপ ফোটাবার পরে। বিবাদী স্বরকে শত্রু বলা হয়, আর বাদী স্বরকে রাজা। রাজার কাজ শত্রু জয় ক'রে নিজের শৌর্য বীর্য প্রকাশ করা। কিন্তু আগে রাজত্বটাই প্রতিষ্ঠিত হোক তার পর শত্রু জয় ক'রে রাজার ব্যক্তিত্ব, মৌলিকত্ব প্রভৃতি দেখাবার সুযোগ হবে। আমার বক্তব্য যদি ধ্রুবপদ্ধতির বেলা সত্য হয়, তবে সংগীতের বেলা আরো সত্য, কারণ সেখানে কথার অতিরিক্ত বাঁধন রয়েছে, এবং সেই বাঁধনের সঙ্গে সুরের বাঁধনের ফাঁস লাগিয়ে দুটোকেই কাটতে হবে, তবেই সংগীত-গায়ক মৌলিক, স্বাধীন, মুক্ত হবেন। সংগীতের নিয়ম আরো কড়া। দুঃখ, এই লোকে ভাবে অতি সোজা।

সকলে সংগীত স্রষ্টা নন— রবি ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল হওয়া একটু কঠিন, তাই সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে মৌলিকত্ব, ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে হলে, তার সুচারু প্রকাশ করতে গেলে যাতে ওজন-জ্ঞানটি বৃদ্ধি পায় তার চেষ্টাই প্রাথমিক কর্তব্য। তার উপায় স্বর-সাধন, ভালো গায়কের গান শোনা, স্বর-বিন্যাস শেখা। তার পরও কর্তব্য রয়েছে—সেটি বিচার, অর্থাৎ রসানুভূতিকে বাঁচানো ও বৃদ্ধি করা। গলা ও মূল্যজ্ঞান যদি ওস্তাদ ও পণ্ডিতের মতামত থেকে রক্ষা করতে কেউ পারে, তবে বাকিটা সহজ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রচয়িতার সংগীত একটু মন দিয়ে শিখতে হবে, হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীরই মতন, এই ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করি—কেননা, আজকের রোমান্টিক সংগীত আগামীকালের ক্ল্যাসিক্যাল সুরপদ্ধতি। এবং আগামীকাল আসেই আসে।

লেখাটি শেষ করে নিজেরই হাসি পাচ্ছে। সকলেই জানেন, আমিও জানি যে আমার গান শেখা হল না। না-শেখার কারণ পরকে উপদেশ দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল। আমার দ্বারা কোনো কৃচ্ছ্রসাধনই সম্ভব নয়— না ওর বানান, না ওর উচ্চারণ। কোথায় তর্কের জগৎ আর কোথায় রাগের জগৎ? প্রলুব্ধ

মধুকরকে কৃতী গণ্য করে দুষ্মন্ত মহারাজ তত্ত্বান্বেষীকে যথার্থই উপহাস করেছিলেন।

মহারাজ তা করুন গে! আমি দেখছি, বুঝেসুঝে গান শুনলে আনন্দ বাড়ে বই কমে না। শোনবার সময় বুদ্ধিটা লুকিয়ে রাখতে হয়, তাকে মেরে ফেলতে নেই। ভালো কথা— সংগীত-গায়কবৃন্দ একটু-আধটু ধ্রুপদ খেয়াল শিখুন-না। আর গায়িকারা—তাঁদের যেন শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হয়, ঘর সংসার ভরে যায়।

রবীন্দ্র সংগীত

আমার বিষয় হচ্ছে হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসে রবীন্দ্র-সংগীতের স্থান কোথায় ও কতটুকু। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো যে আমি দুটি শ্রেণীর ভদ্রলোকদের জন্য কিছু বলছি না। এক শ্রেণী হচ্ছে ওস্তাদদের; কেননা যত সত্যকারের বড়ো ওস্তাদদের সঙ্গে আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি ততই দেখেছি যে তাঁরা রবীন্দ্র-সংগীত সত্যই ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে: ছোটো ওস্তাদদের এবং তথাকথিত উচ্চসংগীতপ্রিয়দের; এঁদের গোঁড়ামি দেখে আমি হতাশ হয়েছি। বড়ো ওস্তাদদের নতুন কথা শোনাবার ধৃষ্টতা নেই, এবং অন্যদের নিজ মতে আনবার বাসনাও নেই, শক্তিও নেই। আজ আমি শুধু তাঁদেরই সঙ্গে কথা কইব যাঁরা কোন্ সংগীত উঁচু আর কোন্‌টি নিচু না ভেবে সব রকমেরই সংগীত থেকে সহজ আনন্দ উপভোগ করেন, যাঁরা রবিবাবুর গানের মধ্যে প্রাণের অনেক গোপন কথার আভাস পান, এক কথায় যাঁদের মন ধার করা মতের বাণ্ডিল হয়ে ওঠে নি। আশা করি তাঁরাই আজকে শ্রোতা। আমার বিশ্বাস আমাদের দলেরই সংখ্যা বেশি, এবং কণ্ঠে হোক আর না হোক, আমাদেরই পোষকতার ওপর সংগীতের প্রসার ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমাদের মধ্যে সংগীত-শিক্ষার অভাব দুঃখের বিষয়, কিন্তু পূর্বার্জিত কুসংস্কার থেকে মুক্তিও কম লাভ নয়।

হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতিতে দুটি ধারা লক্ষ্য করতে হবে। এক দরবারী সংগীত, অন্যটি লোকসংগীত। কেবলমাত্র দরবারী সংগীতকেই হিন্দুস্থানী সংগীত ভাবলে সংগীতকে অবমাননা করা হয়। হিমালয় শুধু গৌরীশৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নন্দা পর্বত নয়। কোনো এক সংগীত একটি মাত্র শ্রেণী কি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যদি থাকে তা হলে হয়তো তার কোনো-এক দিকের বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয়— কিন্তু সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির জন্য দরবারের বাইরে সর্বসাধারণের মিলনক্ষেত্র খোলা মাঠঘাটের জীবনসঞ্চারক মুক্তির একান্ত প্রয়োজন। যাকে আমরা এখন দরবারী সংগীত বলি তার চরম বিকাশ — ধ্রুপদ, আগ্রা গোয়ালিয়র অঞ্চলের দেশী লোকসংগীত ছিল; পরে নানা কারণে দরবারে প্রবেশলাভ করে। হয়তো আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে আকবর বাদশার দরবারে ধ্রুপদ গাওয়া হত বলে একজন ঐতিহাসিক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। আকবর বাদশার যুগের পূর্বে ধ্রুপদ কোন্ দেবদেবীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল আমাদের সঠিক জানা

নেই। সে সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বিস্তর, কিন্তু প্রমাণ স্বল্প। যতটুকু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছি তার থেকে মনে হয় যে একটা অঞ্চলের সংকীর্ণ দেশী সুরপদ্ধতি দরবারী সংগীত হয়ে উঠেছিল। আমরা সকলে ধ্রুপদকে শাস্ত্রোক্ত মার্গসংগীত বলে ভুল করি। ধ্রুপদ যে মার্গসংগীত নয় তার একটি প্রমাণ এই যে মার্গসংগীতের ঠাট মুসলমান যুগের কিছু পূর্বেও ছিল কনকাঙ্গী— যার পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায় দক্ষিণী সংগীতে। সকলেই জানেন যে বর্তমান পদ্ধতির ঠাট শুদ্ধ বেলাওলের। শাস্ত্রোক্ত শুদ্ধ গান্ধার এখনকার প্রায় কোমল গান্ধার, অর্থাৎ এখনকার কাফি ঠাট আগেকারের শুদ্ধ সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা। অবশ্য পুরোপুরি নয়, কেননা শ্রুতি সম্বন্ধে ধারণা অনেক বদলেছে। অর্থাৎ, এখন মার্গসংগীত গাইতে হলে ধ্রুপদ গাওয়া অন্যায় হবে। দক্ষিণী গায়কী চালে ধ্রুপদ গাওয়া হোক্, এ কথা ধ্রুপদের অতিবড়ো ভক্তরাও বলবেন না। মোদ্দা কথা এই যে মান তানোয়ারের পূর্বেই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝেই ভক্তিরসের বন্যায় মার্গসংগীত কোথায় ভেসে চলে যায়। সেই বন্যার জলকে রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে আনলেন কয়েকজন প্রতিভা-শালী ব্যক্তি— মান তানোয়ার, আদিল শা', আকবর এবং তাঁদের দরবারে সম্ভ্রান্ত ওস্তাদরা। তার পরে সেই রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে পবিত্র পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করলেন পুরোহিত পণ্ডিতদের দল। অনেক শাস্ত্র, টিকাটিপ্পনী লেখা হল। উদ্দেশ্য নিতান্ত সাধু— বাদশা, রাজ-রাজোয়াড়ার পছন্দকে দুর্বোধ্য ভাষার সাহায্যে শাস্ত্রের কোঠায় তোলা— এ তো পণ্ডিতদের সনাতন ব্যবসা! তাঁদের উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধিলাভ করেছে তার প্রমাণ হচ্ছে ধ্রুপদ সম্বন্ধে ভুল ধারণা, এবং যে পদ্ধতি দরবারী সংগীত পদ্ধতি থেকে একটুও পৃথক, তাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অবজ্ঞা করা। আমি ধ্রুপদের অন্ধভক্ত, সব গানের চেয়ে আমার ধ্রুপদই ভালো লাগে, কিন্তু আমি জানি ও আপনাদের জানাতে চাই যে আজকালকার ধ্রুপদ চার-পাঁচশো বছর পূর্বে সংকীর্ণ, দেশী, লোকসংগীতই ছিল। অতএব তার নাম নিয়ে অন্য একটি দেশী সুর-পদ্ধতির মিশ্রণকে অশাস্ত্রীয় বলবার ঐতিহাসিক অধিকার আমাদের নেই। এই সংকীর্ণ সুর-পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান সংকীর্ণ সুর-পদ্ধতির পার্থক্য শুধু এই— একটি গোয়ালিয়রের, অন্যটি বাংলার, পার্থক্য শুধু মুসলমান বাদশার সংগীতপ্রিয়তা, আর ইংরেজ রাজার রুচির অভাবে, পার্থক্য শুধু তানসেন, ধোঁন্দি, সরযুর কৃতিত্বে আর নাকীসুরের মনভোলানো ন্যাকামিতে। কিন্তু রচয়িতার সৃষ্টির অধিকারে কোনো পার্থক্য নেই।

ব্যাপারটা এই— কৃষ্টি অর্থাৎ কাল্চারের ক্ষেত্রে আভিজাত্যের এমন-কি কৌলীন্যের বিশেষ প্রয়োজন সর্বদাই রয়েছে। একটা-না-একটা পরিমাণ না

থাকলে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এও ঠিক যে কুলীনে কুলীনে বিবাহ ও আদান-প্রদান হতে হতে আভিজাত্যের বীজটি নষ্ট হয়ে যায়। একটা নদী সেই আদিম প্রস্রবণের স্রোতের জোরেই খুব দূরের সমুদ্রে মিশতে পারে না। উপনদীর জল, মাঠের জল, খালবিলের জল এসে নদীতে মেশা চাই, না হলে নদী আপনা হতেই মজে যায়। এটি শুধু উপমা নয়, সত্য কথা। হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসেও তাই দেখি। যে খেয়ালকে উচ্চসংগীত বলা হয়, তার সম্বন্ধে দুটি মত আছে। একটি মত, খেয়াল আমীর খসরুর সৃষ্টি, আলাউদ্দীন খিলজীর সময়; অন্য মত হচ্ছে যে, এটি জৌনপুরী চাল, প্রথম প্রচলিত হয় সিকিদের সময়। অবশ্য মহম্মদ শা' রঙ্গীলের সময়ে সদারঙ্গ ও অধারঙ্গের দৌলতেই খেয়াল রাজদরবারে হাজির হয় এবং ধ্রুপদের মতনই দরবারের পোষকতায় প্রচারলাভ করে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় যে দরবারী হিন্দুস্থানী সংগীত শুধু কৌলীন্য করেই তার আভিজাত্য বজায় রাখে নি। প্রাদেশিক সুরপদ্ধতিও অনেক সময় গৃহীত হয়েছে। শুধু পদ্ধতি নয়, প্রাদেশিক সুরও নেওয়া হয়েছে। প্রমাণ, রাগিণীর নামেই পাওয়া যায়, যেমন বাঙালী, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্রী, গুর্জরী। আবার কোনো বড়ো ওস্তাদ একটি রাগিণীকে নিজের মতো করে গেয়েছিলেন, লোকের ভালো লেগেছিল, এখনও সেই ভঙ্গিতে রাগিণীটি গাওয়া হচ্ছে; ওস্তাদরা শুদ্ধ টোড়ী, শুদ্ধ মল্লার, শুদ্ধ কানাড়া গেয়ে তৃপ্ত হন না, তাঁদের কৃতিত্ব দেখাতে গিয়ে বিলাসখানী টোড়ী, মিঞাকী মল্লার, ধোঁন্দি মল্লার, সুরদাসী মল্লার, হোসেনী কানাড়া গাইতে হয়। একই সুর বসন্ত এক প্রদেশে পঞ্চম দিয়ে, অন্য প্রদেশে পঞ্চম বর্জিত করে গাওয়া হয়, এবং দু'চালের বসন্তেই ধ্রুপদ শোনা গেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে একই তালের মাত্রা ও বোল ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন, অথচ প্রত্যেক রূপই ওস্তাদরা সংগত বিবেচনা করেন। দেশী সুরের ইতিহাস আমরা ভালো করে জানি না। তবে এইটুকু বোধহয় বলা যায় দেশী অর্থাৎ লোকসংগীতও তার কৌলীন্য বজায় রাখতে পারে নি। যাত্রাও অপেরা হয়েছে।

অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আমাদের দেশের সুরপদ্ধতি বদলেছে, সেটি অচলায়তন নয়, তার গতি আছে, সেটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। সেটি একেবারে জুপিটারের মাথা থেকে মিনার্ভা দেবীর মতন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে জন্মায় নি। যারা ভাবেন যে বছরও চলছে, আর সবেরই অবনতি হচ্ছে, তাঁরা হয়তো প্লেটো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শিষ্য হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা হিন্দুস্থানী সংগীতকে অপমান করেন জোর করে বলতে পারি। কেননা আমাদের সংগীত, দরবারী ও দেশী, দুটি ধারাই এখনও চলছে, এখনও জীবিত।

আমি আশা করি যে তার জীবন্মৃত অবস্থা জ্ঞানের ক্ষণিক লোপ মাত্র। এই হল সংগীত ইতিহাসের শিক্ষা— এবং সে শিক্ষাকে গ্রহণ করতেই হবে। না করলে নিস্তার নেই, কেননা মাটির প্রতিহিংসা, জীবনের প্রতিহিংসা, ইতিহাসের প্রতিহিংসা ভীষণ, দুর্নিবার।

এখন দেখা যাক যে রবীন্দ্রনাথের সংগীত আমাদের সংগীত ইতিহাসকে খাতির করেছে কিনা— তাঁর সংগীতে জীবনের পরিচয় আছে কিনা, তাঁর সংগীতের অভিব্যক্তি আছে কিনা। তার পর দেখতে হবে যে হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি থেকে তাঁর গানের পদ্ধতি কতটা পৃথক, অর্থাৎ তাঁর রচনার বিশেষত্ব কী। আমার সময় কম তাই মাত্র এই তিনটি বিষয়ের আংশিক আলোচনা সম্ভব হবে। ইতিহাসের অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে স্ববশে আনবার তাঁর প্রয়াস এবং নিজের সংগীতের ক্রমবিকাশ অনেক সময় একই ধারায় চলেছে। এটি জীবনধর্মেরই রীতি; সমগ্র জাতির অভিব্যক্তি ব্যক্তি-জীবনে ক্রমিক পরিণতি লাভ করে। মোটামুটি হিসাবে ব্যক্তির জীবনকে তার শ্রেণীর ইতিহাসের ছোটো সংস্করণ বলা যেতে পারে। অতএব রবীন্দ্রনাথের সংগীতের ক্রমবিকাশটি বুঝলেই তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশধারাকে কতটুকু বরণ করেছেন বুঝতে পারব।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতে তিন-চারটি স্তর আছে। প্রথম যুগে কিংবা স্তরে তিনি ভালো ভালো খানদানী 'ঘরোয়ানা চীজের' সুরকে আশ্রয় করে গান রচনা করেছেন। যদু ভট্ট ও রাধিকা গোস্বামী, এবং সেই সময়কার বড়ো বড়ো ওস্তাদের মুখে তিনি খুব ভালো চালের ধ্রুপদ ও খেয়াল শুনতেন— তাঁর সেজদাদা জ্যোতিবাবু এই সুর নিয়ে পরীক্ষা করতেন, সেই সুরে রবীন্দ্রনাথকে গানের কবিতা লিখতে বলতেন। এই যুগে তাঁর গান শুদ্ধ, তানে মানে, লয়ে, সে গানের চাল অধিকাংশই ধ্রুপদ, ধামার, সাদ্রা অর্থাৎ ঝম্পের; ধ্রুপদের চারটি পদ, মীড়, মূর্ছনা সবই তাঁর এই যুগের গানে আছে। গানের বিষয়গুলিও গুরুগম্ভীর।

দ্বিতীয় যুগে তিনি সেই খানদানী কাঠামোর ভেতরেই একটু সুরের ও তালের নতুনত্ব করেছেন। কাঠামোটি সেই পুরাতন, কিন্তু কিসের একটা প্রয়োজন, কিসের একটা তাগিদ তিনি পূরণ করতে পারছেন না, তাই কাঠামোর ওপর রঙটি বদ্‌লাতে হচ্ছে, তার ওপর অলংকারগুলিকে একটু নতুন রকম সাজাতে হচ্ছে। এ প্রয়োজনটি কিসের? আমার মতে এ প্রয়োজন একটি বিশেষ mood-এর, ভাবের, খেয়ালের। ওস্তাদের মুখে যখন মল্লারের association-গুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে, অথচ বৃষ্টিধারার বিরাম নেই, মেঘ আপন খেয়ালে

নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছে, প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে, তখন মল্লারের আশ্রিত স্মৃতি-গুলিকে রূপ দিতে হলে রাগিণীকে ওস্তাদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে, তাকে মনোভাবের উপযোগী করবার জন্য কিছু অদলবদল করতে হবে। সেই জন্যই মল্লারে দুটো নিখাদ উপরি উপরি না দিয়ে গানের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় যুগে এক কারণেই 'স্বরভ্রষ্ট' হয়েছেন।

বাস্তবিক পক্ষে, স্বর মনের একটি ভাষা, ভাষা ভাবকে প্রকাশ করে, অবশ্য যা তা ভাবকে নয়। ভাব কিছু একই ধারায় চলে না, তার বৈচিত্র্য আছে, বর্ষার সময় কারুর ছোলাভাজা খেতে ইচ্ছে করে, কারুর মেঘদূত পড়তে ইচ্ছে করে, কারুর বা গান শুনতে ইচ্ছে হয়। মানুষের মনের গতি মোটামুটি এক হলেও প্রত্যেক মানুষের, বিশেষ করে, আর্টিস্টের খেয়াল বিভিন্ন। এই বিশিষ্ট মনো-ভাবের দাবি হিন্দুস্থানী স্বরের ওস্তাদের মুখে পূরণ হয় না। আমাদের ধারণা ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীতে পরিণত হল, প্রত্যেক রাগিণী আবার ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত হল। এটা ঠিক ঐভাবে হয়েছে কিনা জানি না, তবে আমাদের সংগীতে প্রত্যেক রাগিণীর নানান রূপ আছে। এই বৈচিত্র্যের তাৎপর্য কী? তাৎপর্য এই, মানুষই যখন গান গেয়ে থাকে, যখন মানুষ নিয়েই কারবার, তখন তার মনো-ভাবের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করতেই হবে। অতএব হিন্দুস্থানী সুরের কাঠামোকে অদলবদল করবার প্রয়োজনীয়তা আছে, মানবমনের বৈচিত্র্যকে রূপ দেবার অধিকার আছে, যে অধিকার অষ্টাদশ কানাড়ার অস্তিত্বে বিশ্বাসের মধ্যে গুপ্ত রয়েছে। এই কারনেই, এই বিশ্বাসের জোরেই রবীন্দ্র-সংগীতকে বিচার করা ঐতিহাসিক সমীচীনতা।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে নতুনত্বটুকুর মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ আছে কিনা। গানে অনেক ধরনের গুরুচণ্ডালী দোষ ওঠে। স্বরের দিক থেকে বিবাদী স্বরকে বাদী করা, গতির দিক থেকে আরোহীর নিয়মকে রক্ষা না করা, ভাবের দিক থেকে গুরুগম্ভীর ভাবকে হালকা সুরে ব্যক্ত করা, তালের দিক থেকে ভারী সুরকে হালকা তালে বসানো প্রভৃতি নানারকমের গর্হিত আচরণ সম্ভব হয়। এক কথায় বলতে গেলে রীতিবিরুদ্ধ কাজ করার নামই গুরুচণ্ডালী। কিন্তু সামান্য অদলবদল করবার অধিকার শাস্ত্রেই দিয়েছে, বিবাদী স্বরকে দেখানোর রীতিও আছে। একটা শ্লোকে আছে বাদী রাজা, ও বিবাদী শত্রু। রাজা যেমন তাঁর প্রজাকে ক্ষমতা দেখাবার জন্য শত্রুকে কয়েদ করেন, তেমনি গায়ক তাঁর কৃতিত্ব দেখাবার জন্য বিবাদী স্বরকে ব্যবহার করতে পারেন। বরোদার দরবারী গাইয়ে ফৈয়াজ খাঁ এবং আবুল করিমের মুখে ও কেরামত খাঁর হাতে মালকোষ-

এ পঞ্চম লাগিয়ে গাইতে বাজাতে শুনেছি, তাতে মালকোষের সাধারণ মনোময় রূপটি নষ্ট হয় নি। তবে আর্টের ক্ষেত্রে অন্তত জেনেশুনে পাপ করলে সেটি পাপ থাকে না এই যা। আসল কথা হচ্ছে রূপটি রক্ষা করতে হবে, এবং সেই রূপটি নিতান্তই অভ্যাসের ক্রীতদাস। অতএব অভ্যস্ত পদ্ধতিকে অত্যাচার না করে নতুন রসের সৃষ্টি করবার অধিকার যুক্তিসংগত। মানুষ বৈচিত্র্যের উপাসক— তাই বলে অবশ্য নতুনত্বের মোহে চরিত্র নষ্ট করতে কিংবা উৎসন্ন যেতে বলা যায় না। কিন্তু যদি কোনো মধ্যবয়সী ভদ্রলোক অফিস থেকে তেতেপুড়ে এসে তাঁর গৃহিণীকে অনুরোধ করেন, 'ওগো, একটু ঘোমটা দিয়ে, নতুন শাড়ি পরে বসো, একটু পরস্ত্রী বলে মনে হোক'— তা হলে তাঁর প্রতি অনুকম্পাই হয়, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ব্যাপার হচ্ছে, **opposition within the constitution** হলেই সংগত হয়। রবীন্দ্র-সংগীতের দ্বিতীয় স্তরে এই জিনিসটি রয়েছে, সেইজন্য এই যুগের গান অনেক ওস্তাদও গেয়ে থাকেন।

এই যুগেই তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন, তা হলে তাঁকে শুধু একজন উচ্চস্তরের নিধুবাবু কিংবা যাত্রাগানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলতাম। কিন্তু এই দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে তিনি এক নতুন পরীক্ষা করলেন। শুধু এক সুরের সঙ্গে সেই জাতেরই অন্য সুর মিশিয়ে সুখী হলেন না, সৃষ্টির এক নতুন উৎসের সন্ধান পেলেন। সে উৎস অতি নিকটেই ছিল, একেবারে হাতের কাছে, দ্বারের পাশে, পল্লীগ্রামে। কবি চিরকালই পল্লীজীবনের ভক্ত, শহরের কৃত্রিমতা তাঁর কখনো ভালো লাগে না। তাঁর জীবনের বোধহয় সবচেয়ে সুখের সময় ছিল যখন তিনি পদ্মার দুধারের গ্রামের ঘাটে নৌকা ভেড়াতেন। মাটে ঘাটে, নদীর ধারে, তিনি বৈরাগীর বাউল ভাটিয়াল, মাঝিদের সারি গান, পল্লী-উৎসবের ঐক্যসংগীত শুনে বেড়াতেন— তাঁর প্রাণে ওই প্রকার গানের সুরের আবেগ, ভাবের সরল স্বাধীনতা ও গভীরতা সাড়া দিত। নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো তিনি এই পল্লীসংগীত, এই লোকসংগীতের মর্ম গ্রহণ করলেন। এইখানেই তাঁর প্রতিভা। জীবনের সমগ্র ধারাকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে বহমান করানো প্রতিভার কাজ।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে হিন্দুস্থানী দরবারী সংগীত এতদিন যে বেঁচে এসেছে তার অন্যতম কারণ এই যে তার ক্রাইসিস-এর সময় লোকসংগীতের রক্ত তার শিরার মধ্যে ইনজেক্‌ট্‌ করানো হয়েছিল। (কোন্ ডাক্তার এ কাজ করে আমাদের জানা নেই, তবে এ পন্থায় যে সে এখনও বেঁচে রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওস্তাদদের ব্যক্তিগত দানও কম নয়।) সেইজন্য রবিবাবুর গানের তৃতীয় স্তরে ভাটিয়াল, বাউলের আগমন লক্ষ করি। এই যুগের গানে দরবারী

স্বরপদ্ধতির সঙ্গে ভাটিয়াল বাউলের মিশ্রণ হয়েছে। স্বরগুলিতে আমাদের কান অভ্যস্ত নয়, সেইজন্য এইযুগের গান শুনে আমরা বলি 'এটা না হল কেদারা, না হল বাউল, হল একটা খিচুড়ি।' আমার বক্তব্য এই, পোলাও খুব ভালো জিনিস, তবে খিচুড়ি রাঁধতে পারলে মন্দ হয় না। বর্ষাকালে কি শীতকালে খিচুড়ি খুবই উপভোগ্য খাদ্য। খিচুড়ি হিন্দু বিধবারা খান না, কিন্তু যত্নসহকারে রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দেন— জগন্নাথ অন্য খাবার পছন্দই করেন না। আদত কথা, রান্নাটি ভালো হওয়া চাই। শুধু খানিকটা ঘি, তেজপাতা, ছোটো এলাচ, জাফরান, আখনির জল দেরাদুন চালের ওপর ঢেলে দিয়েই যে পোলাও চমৎকার হয়ে ওঠে স্বীকার করতে নারাজ।

এর পরের যুগ এখনও চলছে। ঘোড়া উইনিং-পোস্ট-এর কাছে এসেছে, তার স্ন্যাপশট্ তুলে দিতে রাজি নই— কারণ যে ঘোড়া ছুটছে তার সৌন্দর্য ছবিতে ওঠে না, যখন ঘোড়া আস্তাবলে যাবে তখনই তার ছবি তোলবার সময় হবে— এখনও হয় নি। শুধু এইটুকু বলি, এই যুগের গানই তাঁর গানের কীর্তি— তা আমাদের আগেকার গানের মতো ভালো লাগুক আর না লাগুক— এর কথাগুলি হয়তো গীতাঞ্জলির কথার মতন নয়, তবু এর মধ্যে এমন একটি সংযম আছে, কথা ও সুরের মধ্যে এমন একটি মিল আছে, তার সৌষ্ঠব এত হৃদয়গ্রাহী, তার আবেদন একসঙ্গে এত personal ও impersonal, যে তার থেকে আনন্দ না পেয়ে থাকা যায় না। লোকসংগীতের গ্রাম্যতা, তার অসংযত আবেগ ও চিৎকার যেমন এর মধ্যে নেই, তেমনি দরবারী সংগীতের অজস্র তানের ও তালের নিরর্থক গুণ্ডামিও এর মধ্যে নেই। অথচ তাদের সদগুণ সবই রয়েছে, আনন্দের সব উচ্চাঙ্গের উপাদানই রয়েছে, লোকসংগীতের ভাবসম্পদ, এবং দরবারী সংগীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য, ভদ্রতা ও শালীনতা। তবে এগুলি খাঁটি লোকসংগীত নয় মনে রাখাই ভালো।

রবিবাবুর গানের বৈশিষ্ট্য কী এবং কোথায়, তাঁর গানের থেকে হিন্দুস্থানী স্বর-পদ্ধতি কিভাবে পৃথক পূর্বে বলেছি। সেই কথাটির পুনরুল্লেখ করে আজ শেষ করি।

হিন্দুস্থানী স্বরপদ্ধতি নিতান্তই impersonal, abstract ; ব্যক্তির, গায়কের, শ্রোতার মনোভাবের সঙ্গে সে পদ্ধতির সম্বন্ধ মোটেই direct নয়, দু থাক দূরে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে। বিরহ সর্বপ্রকার আর্টের বিষয় হতে পারে, তা নিয়ে ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, মূর্তি গড়া চলে। তবে প্রত্যেক আর্টের প্রকাশ রীতি ও আঙ্গিক ভিন্ন বলে বিরহের সব সূক্ষ্ম মনোভাবগুলিই এক আর্টের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্য উচিত নয়। একটু কর্মের বিভাগ দরকার হয়

ওঠে। সুরও একটি প্রকাশের ভাষা, অতএব বিরহের কোনো-একটি বিশেষ খেয়ালকে প্রকাশ করাই গানের সংগত বিষয়। এখন যদি আমি শুধু সার্গম গেয়ে যাই কিংবা আ-আ-আ করে করে তান তুলি তা হলে সেই বিশেষ সংগীতোপযোগী বিরহভাবের প্রকাশ সহজ হয় না। প্রকাশ হয় না, এ কথা মোটেই বলছি না, কেননা যন্ত্রের সাহায্যে অনেক ভাব ব্যক্ত করা যায়। আমি বলছি সহজে হয় না। সহজ হয় না বলেই যে সেটি খারাপ হল, তাও মানি না, কিন্তু আর্টের অন্তত একটি প্রধান কথা যখন ব্যক্ত করা, তখন ব্যক্ত করাটিকে সহজ করলে শ্রোতার আনন্দানুভূতির পথটি সুগম করা হল, শ্রোতার মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করা হল না, শ্রোতা মন দিয়ে সুরের বিচার করতে পারল। অতএব সহজে বিশেষ কোনো মনোভাবকে ব্যক্ত করা যদি কোনো আর্টের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সহজে বোধগম্য কোনো উপায়ের সাহায্য নিতে হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে এই উপায়টি— কথা। কথার সাহায্য নেওয়াতে বিপদ আছে, কেননা কথার মূল্য আলাদা, তার নিজের রীতি-নীতি, টেকনিক্ আলাদা। অতএব কথার সঙ্গে সুরের একটা বোঝাপড়া করা চাই। কথা যদি ভাবকে সাহায্য করে, তা হলে তাকে মিত্র বলে গ্রহণ করতেই হবে; কেননা এই মিত্র সংগীতের সম্পদবৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু কথা যখন স্বাধীন হয়ে উঠল, তখন তাকে বর্জন করতে হয়। সুরের সঙ্গে কথার সন্ধি-শর্তগুলি ভালো করে draft করা চাই, না হলে alliance ভেঙে যায়। আদত কথা মনের ঐক্য।

এখন হিন্দুস্থানী গানে একটি জিনিসের অভাব লক্ষ করেছি। সব গানের কথা বলছি না, বেশির ভাগ গানে সুরের সঙ্গে কথার সম্পর্ক মিত্রের হওয়া দূরে থাকুক শত্রুরও নয়। ফলে হিন্দুস্থানী গান যেখানে যন্ত্রসংগীত থেকে পৃথক সেখানে কোনো মনোভাবকেই ব্যক্ত করে না। অনেকে একেই হিন্দুস্থানী গানের বিশেষত্ব বলেন। মনোভাবের সঙ্গে যদি সুরের সম্পর্ক নাই থাকে, তাতে আপত্তি নেই, তেলানা শুনেও প্রাণ খুশী হয়। কিন্তু ব্যাপার এই যে সব সময়ে হয় না। সেইজন্য তেলানা ও যন্ত্রসংগীত ছাড়া অর্থসংগীতের প্রয়োজন রয়েছে, তবে সুরকে যেন ভাবার্থটি ছাড়িয়ে না যায়, তাকে সাহায্য করে, সমৃদ্ধ করে, তার ইঙ্গিত বহন করে এইটাই দেখতে হবে। প্রয়োজন স্বীকার করবার পর দেখতে হবে যে মনোভাবের কোনো বৈচিত্র্য আছে কিনা, দেখতে হবে যে মনো-ভাবটি একই রাগে গাওয়া হচ্ছে, না তার ছত্রিশ রাগিণীতে গাওয়া হচ্ছে। মনোভাব সাধারণের সম্পত্তি হলেও মানুষের মনের, সংস্কারের রঙিন কাচ দিয়ে আসার দরুন ভিন্ন হয়ে যায়। কানু বিনা গান নেই, এবং গৌড়সারং গাইতে হলেই

'পলন লাগে মোরে আঁখিয়া' গাইতে হবে স্বীকার করতে বাধো বাধো ঠেকে। সত্য কথা এই যে মানুষের মন বদলেছে, সভ্যতার দরুন তার মনোভাব বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে। ভালোবাসা সেই রয়েছে, কিন্তু সেই গোপিকার দল আজকাল ননী ছানা তৈরি না করে চপ্‌ কাট্‌লেট ভাজছেন, ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক পড়ছেন, (থুড়ি, এঁরাও বুঝি পুরাতন) ফলে প্রেমের ভাষাও বদলাচ্ছে। ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেমের প্রকৃতিও বদলাচ্ছে। অতএব বিচিত্র সুরের ও মিশ্রণের প্রয়োজন রয়েছে। সে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ মিটিয়েছেন— হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতির abstract nature-কে concrete করে, এক কথায় সুরকে humanise করে, অথচ তাকে আর্ট থেকে artifice-এর নিচু পঙ্‌ক্তিতে নামতে না দিয়ে। শুনেছি ও পড়েছি বিলেতে বীট্‌হোফেন্‌ এই কার্য করে ছিলেন। যদি সত্য হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই সঙ্গে তুলনা করা চলে, আমাদের দেশে তাঁর সমতুল্য composer জন্মায় নি।

রসোপভোগ

রসানুভূতির বাধা-বিপত্তি অনেক। শ্রদ্ধার ও শিক্ষার অভাবে, পূর্বপরিচয় কিংবা নূতনত্বের মোহে রসানুভূতি থেকে আমরা অবান্তরের খাদ বাদ দিতে পারি না। সেজন্য নিজেরাই অনেক সময় নিজেদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি। সংগীতে রবীন্দ্রনাথের দান আমাদের আনন্দের একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান, তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার চরম বিকাশ। মনকে কিভাবে বাঁধলে, সংগীতকে কিভাবে দেখলে আনন্দের অনুভূতি গভীর ও প্রশস্ত হয় তারই ইঙ্গিত দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রদ্ধার অর্থ অন্ধভক্তি নয়। শিক্ষার অর্থ কৃচ্ছ্রসাধন নয়। কোনো বস্তুকে আত্মগত সংস্কার কিংবা কামনার বহির্ভূত করে দেখাই হচ্ছে শ্রদ্ধার তাৎপর্য। এই বহিষ্করণের প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষা ও সাধনা। বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষার অন্য দিকটা, বাহিরকে অন্তরে আনার দিকটা, লোপ পাচ্ছে।

এই যুগের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ঐতিহাসিক তুলনামূলক ও বৈজ্ঞানিক বিচারই প্রামাণ্য। সুর সম্বন্ধে অবশ্য পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু সেটা ঠিক সুর নিয়ে নয়, স্বর নিয়ে, আমাদের দেশেও নয়, পরের দেশে, যেখানে সুরের পক্ষে স্বরের মূল্য আমাদের মূল্য হতে পৃথক। সেজন্য বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তের কথা তোলা বোধ হয় এ-ক্ষেত্রে উচিত নয়, শুধু এই বলা যায় যে, ভালো লাগা বা না-লাগা অনেক সময় অভ্যাসের ওপরই নির্ভর করে। এই সুপরিচিত তত্ত্বটি পরীক্ষার দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। নিতান্ত অপরিচিত সুরপদ্ধতি শিক্ষা করে তাকে অভ্যাসে পরিণত করার সুবিধা যখন আমাদের নেই, তখন তুলনামূলক বিচারও বেশি দূর করা যায় না। রসানুভূতির পূর্বোক্ত বাধা-বিপত্তির ওপরে এখানে আবার এক নতুন বিপত্তি আশ্রয় করে— তার নাম দেশাত্মবোধ। অতএব ঐতিহাসিক বিচারই প্রকৃষ্ট। যদি কোনো ওস্তাদ হিন্দুস্থানী সংগীতে, অর্থাৎ এককালীন দেশী ও দরবারী সংগীতের ইতিহাসে শিক্ষিত হন, তবে সংগীতের ইতিহাসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতকে খুব উচ্চ স্থানই দেবেন কল্পনা করা যায়।

শ্রদ্ধার পক্ষে বিশেষ একটি অনুকূল অবস্থা হচ্ছে, ঐতিহাসিক মনোভাব। এই মনোভাবের বশে অনেক সংকীর্ণতা দূরে সরে যায়, গতির আনন্দে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, যদি না অবশ্য ইতিহাসের মোহে মন ইতিমধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে, চলার নেশায় রসের সন্ধান না হারিয়ে যায়।

হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস আমাদের ভালো করে জানা নেই। যতটুকু জানা আছে তার সারসংগ্রহ এই। পাঠান ও তার পরবর্তী যুগ থেকেই মার্গসংগীত দেশী সংগীতের স্পর্শদোষ দুষ্ট হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধির চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। একেই শহর-দরবারের জীবন গ্রাম্য-জীবন থেকে পৃথক, আবার প্রাদেশিক অর্থ-সংগীত কথিত ভাষায় লেখা, তার উপর ভক্তির বন্যায় দেশ ডুবে যাচ্ছে ; এ ক্ষেত্রে দেশী ও দরবারী সংগীতের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধে দেশী সংগীতের দানই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। মার্গসংগীত মুখে মুখে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পণ্ডিতরা শাস্ত্র লিখতে শুরু করলেন ; কিন্তু নানা পণ্ডিতের নানা মত। এই অরাজকতায় আদানপ্রদান ও মিশ্রণের কার্য সহজ হয়ে ওঠে। তারই ফলে অনেক নতুন ধরনের সুর, তাল ও ভঙ্গির সৃষ্টি হয়। সেগুলি পরে দরবারী সংগীতে উচ্চ স্থান পায়। যে ধ্রুপদকে আমরা দেবতার স্কন্ধে চাপাই, যার অন্তত দ্বিতীয় জন্মভূমি গোয়ালিয়র অঞ্চলে ; সেটি একটি প্রাদেশিকা বা দেশী সুরপদ্ধতি। আকবর বাদশাহের দরবারে ধ্রুপদ গাওয়া হয়েছিল বলে লোকে আক্ষেপ করেছিল, লেখা আছে। মার্গসংগীতের কৌলীন্য এইপ্রকারে ভেঙে যায় ; দেশী সংগীত থেকে তার আত্মরক্ষা করার উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে হোরি, টপ্পা, ঠুংরীও এল। লোকে বলে খেয়াল তার আগেই তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া অনেক প্রাদেশিক সুর আমাদের তথাকথিত উচ্চসংগীতে গৃহীত হয়েছে মনে হয়, যে-সব সুরের উল্লেখ পর্যন্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। মোদ্দ কথা এই যে মোগলদের আমল থেকেই শাস্ত্রোক্ত মার্গসংগীত লোপ পেয়েছে, তার বদলে 'দরবারী' সংগীত এসেছে, সে 'যবনস্পৃষ্ট' ও অশাস্ত্রীয়। অর্থাৎ মার্গসংগীত দরবারী সংগীত নয়। আমরা যাকে ক্ল্যাসিক্যাল বলি সেটা দরবারী— তার ঠাট বেলাওলের। মার্গসংগীত হিন্দুস্থানের শাস্ত্রেই আছে— কণ্ঠে নেই, তার অন্তত একটা ঠাট কনকাঙ্গী। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রোক্ত কোনো-একটি সুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রূপ ও প্রসার পদ্ধতি দরবারী সংগীতে প্রবেশলাভ করেছে, এ খবরও আমরা জানি। বাঙালী ওস্তাদ পঞ্চম বাদ দিয়ে দুই মধ্যম, ও শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার করে যে আসরে বসন্তের ধ্রুপদ, ধামার গান, সে আসরেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ওস্তাদ বসন্তে পঞ্চম জোর করেই লাগান, কোমল ধৈবত ব্যবহার করেন। দরবারী গানে বসন্তের দুই রূপের, দুই ভঙ্গিরই যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। তালের বেলায় তাই— এক দেশের যৎ সাত, অন্যদেশের আট মাত্রার, ঝোঁক বদলে বাংলাদেশের ঢিমে তেতালাকে বাংলার বাইরে তিলুয়াড়া বলা হয়।

আবার বড়ো বড়ো ওস্তাদের রচিত সুর ও প্রকাশভঙ্গিও অভিনন্দিত হয়েছে,

যেমন বিলাসখাঁনি টোড়ী, ধোন্দিমল্লার, মিয়াকী মল্লার, হোসেনী কানাড়া, হদ্দু খাঁ, তানরাজ খাঁ, জাকরুদ্দিনের ঘরোয়ানা তান ও গমক। যন্ত্রের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই— মসীদ খানি, রেজা খানী গতের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দুটিই ওস্তাদরা সমান ভক্তিসহকারে বাজিয়ে থাকেন। অতএব ইতিহাসের দিক থেকে বলতে হয় যে, আমাদের সংগীত একটি অচলায়তন নয়; তাতে কোনোপ্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, তার ইতিহাস আছে, গতি আছে, অভিব্যক্তি আছে, পরিণতি আছে। এই মূল কথাটি প্রত্যেক সমালোচক, শিক্ষার্থী ও রসপিপাসুর জানা উচিত, জানলেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতের ওপর শ্রদ্ধা আসবে। আমাদের সংগীতের অভিব্যক্তি নেই, কেননা সেটি অপৌরুষেয় ও সর্বাঙ্গসুন্দর, অতএব রবীন্দ্রনাথের সংগীতে কৃতিত্ব কিছু থাকতে পারে না— মনে করার মতন আমাদের সংগীতের অপমান আর কিছু হতে পারে না। সত্যিই 'মরার বাড়া গাল নেই'।

এ তো গেল ইতিহাসের মাত্র একটা দিক। হিন্দুস্থানী সংগীতের পটভূমিতে রবীন্দ্র-সংগীতের এবং তাঁর ব্যক্তিগত মৌলিকত্ব কোথায় জানতে হলে, আমাদের দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের গত শতাব্দীর মানসিক ইতিহাসের পাতা উলটে দেখা উচিত। ইংরেজ বণিক প্রথমেই পশ্চিমী সভ্যতা এদেশে বহন করে আনে নি। ইংরেজ বণিকের আশ্রয়ে দেশে বিশেষত কলকাতা প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্রে, একদল বিত্তশালী ব্যবসাদারের সৃষ্টি হয়। তাঁরা দেশের অর্থ না বাড়িয়ে নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। দেশের মাটির সঙ্গে, মনের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কোনো সংস্রব ছিল না। পরে অনেকে তাঁরা জমিদার হন, কিন্তু সেই আদিম অভিশাপ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। যখন ইংরেজ বণিক রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলে, তখন দেশের কৃষ্টি দেশী রাজদরবারে, পুরাতন ও কয়েকজন জমিদারের বৈঠকখানায় আত্মগোপন করল। তখনও আমাদের দেশের চারুকলা একেবারে লোপ পায় নি— তখনও ইংরেজ বলতে রাজার জাতি বোঝাত, তখনও ইংরেজ পশ্চিমী সভ্যতার বাহক হলেও প্রতিভূ হয়ে ওঠে নি। সর্বক্ষণ বন্ধ ঘরে আত্মরক্ষায় বদ্ধ পরিকর হলে যা হয় চারুকলার তাই হল— লীনা শীর্ণা শুচিবাই-গ্রস্তা বিধবার মতন। এই সময়কে সংগীতের ছুৎমার্গের যুগ বলা যেতে পারে। অশুদ্ধ-শুদ্ধ বিচার করাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়ে উঠল। কিন্তু এই সময় এক মহাপুরুষ জন্মালেন। রাজা রামমোহনের কৃপায় আমাদের মনের জানালা দুয়ার খুলে গেল; আমরা মুক্ত হাওয়া পেলাম; আমরা বুঝলাম, বিদেশী গবর্নমেণ্টের পিছনে আছে এক বড়ো সভ্যতা, সে সভ্যতাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের শুচিবাইগ্রস্ততা

পর্যন্ত নষ্ট করতে পারে নি— সে সভ্যতা নিতান্তই জীবন্ত, এবং তার মূল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রহণ করবার, দান করবার, সৃষ্টি করবার স্বাধীনতা। এই বার্তা জোড়াসাঁকোর এক বাড়িতে পৌঁছল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ইংরেজ জাতির অভ্যাসকে অনুকরণ করাটাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য কখনও ভাবেন নি। দেশী রাজোয়াড়ার দরবার থেকে অনেক গুণী কলকাতায় ঐ সময় জমায়েত হন। কলকাতা তখন রাজধানী, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার সম্প্রদায় কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন, শহরের বড়োলোকেরাও শৌখিন হলেন— মেটেবুরুজে ওয়াজিদ আলি শা'র দরবার তখনও সরগরম; মহারাজ শৌরীন্দ্র-মোহন সংগীতের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁরা পৃষ্ঠপোষক হয়েই রইলেন। তাঁদের কৃপায় অনেক গুণী অন্নাভাবে, অনেক সুর অভ্যাসাভাবে লোপ পেল না। তাঁরা সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখলেন। কিন্তু মুক্তির বীজ পড়ল, সৃষ্টির শুরু হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ধর্ম, সমাজ, চারুকলার প্রত্যেক বিভাগেই এই বীজ অঙ্কুরিত হল। আবহাওয়া নিতান্তই অনুকূল ছিল। এ বাড়িতে বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে আসতেন, প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে হাতে নাড়া বেঁধে গানবাজনা শিখতে হত। জ্যোতিবাবু ছিলেন এই দলের অগ্রণী, তিনিই রবীন্দ্রনাথকে সংগীত-রচনায় প্রথম উৎসাহ দেন। তিনিই পিয়ানোতে দেশী, বিদেশী, সবরকমের সুরের মিশ্রণ করতেন, আর ছোটো ভাইকে বলতেন গান রচনা করতে। পশ্চিমী সভ্যতাকে অন্ধ অনুকরণের যুগের পর, সেই সভ্যতার যাথার্থ্য মর্মে গ্রহণ করার যুগে, মানসিক স্বাধীনতার ফলে পুরাতন-নূতনের বিবাহের শুভ সন্ধিক্ষণে, সর্বতোমুখী সৃষ্টিপ্রেরণার আবেষ্টনে ও প্রভাবে, রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনা করতে আরম্ভ করেন।

এ তো গেল শুধু ঐতিহাসিক আবেষ্টনের দিক। আবেষ্টনকে সৃষ্টির কাজে কী করে লাগানো হল বুঝতে গেলে কবির অন্য দিকটা দেখতে হবে। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ পথিক— অল্প বয়স থেকে তিনি নানা কাজ ও অকাজের ছলে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। বাংলাদেশের বাউল, কীর্তন, ভাটিয়াল প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাদেশিক অর্থাৎ দেশী-সুর পদ্ধতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে, দেশের প্রাণের সঙ্গে যোগ তাঁর খুবই নিবিড় ছিল। সেজন্য বিদেশী সভ্যতার কল্যাণে পুষ্ট স্বাধীন চিন্তা ও সৃষ্টির দ্বারা এই দেশের, গ্রামের পলিমাটি কেটেই রইল। মুমূর্ষু হিন্দুস্থানী দরবারী সংগীতকে দেশী সুরের রক্তে সঞ্জীবিত করাতে রবীন্দ্রনাথ জীবনধর্মেরই অনুগমন করলেন। সৃষ্টি তখনই সুন্দর হয় যখন সেটি জীবনধর্মের অনুগমন করে। শহর ও দরবারের কৃষ্টি দেশের

প্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই ধ্বংসোন্মুখী হয়, এবং তার পুর্নজীবনের জন্য এককালীন ঘর ও বাহির থেকে শক্তি অর্জন করতে হয়, মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত করতে হয়। এই কথাটি শ্রোতার স্মরণ রাখা উচিত, এবং স্মরণ রাখলে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আসবেই, তাঁর দানের মৌলিকত্বকে মর্যাদা দিতেই হবে। মাটির সঙ্গে যোগ স্থাপন করে হিন্দুস্থানী সংগীতকে পুনর্জীবন দান করা তাঁর কীর্তি।

রস-উপভোগের আরো দু-একটি অন্তরায় আছে। যা চলে আসছে, যাতে মানুষ অভ্যস্ত, যেটি ঐতিহ্যের ধারা বলে গৃহীত হয়েছে, তার একটি ধাক্কা দেবার ক্ষমতা আছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আদত কথা কিন্তু এই যে, গতানুগতিকতার ফলে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী একটি বিশেষ আকারে সজ্জিত হয়; তারই ফলে অভিজ্ঞতাগুলির সেই ধারায় গ্রথিত হবার, নকশায় সজ্জিত হবার একটা ঝোঁক থাকে। পুরাতন অভ্যাসের নকশা কিন্তু নতুন অভ্যাস অর্জনের পথে বাধা দেয়। নতুন-পুরাতনে বিরোধ বাধে। সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে নির্বাচনকার্য চলে। নতুন অভিজ্ঞতাগুলি কার্যকরী প্রতিপন্ন হবার পর তারা দানা বেঁধে প্রিয় ও সুখজনক হয়ে ওঠে। মূল্যবিচারের পিছনে, জনসাধারণের সমালোচনার অন্তরালে এই বিরোধান্তের অভ্যাসজনিত সুখের স্পৃহা রয়েছে। সেজন্য আমরা পরিচিতকে ভালোবাসি ও অপরিচিতকে ডরাই। কিন্তু অপরিচিতটি যখন কোনো কারণে, কোনো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার দৌলতে, কোনো অভিভাবনের মৃদু তাড়নায়, স্বার্থের জন্য, কিংবা অন্য কোনো কারণে স্থায়ী হল, সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করল, তখন, পরিচিত জনমতের আড়ালে সাধারণ লোক নবতর সৃষ্টি করার দায়িত্ব ও তাকে যথার্থ মূল্যদানের কর্তব্য ও ভয় থেকে মুক্ত হল, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার দায়িত্ব জনমতের হাতে সঁপে দিয়ে লোকে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

গ্রহণ, বর্জন ও নির্বাচনের পিছনে যখন এই স্নায়ুঘটিত, অর্থাৎ দেহগত সুখের সন্ধান রয়েছে, তখন ভালোমন্দর বিচারে, বিশেষত চারুকলার সমালোচনায় অভ্যাসের অর্থাৎ জনমতের স্থান অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু অভ্যাস চিরন্তন নয়, নিতান্তই সময়সাপেক্ষ, বাইরের আঘাতে ভেঙে যায়। এইজন্যই আজকার রোমান্টিক্ কালকার ক্লাসিসিস্ট হয়ে ওঠে এবং সেইজন্যই ঐ দুটি বুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গান ওস্তাদী গানের অপেক্ষা নিচু স্তরের বলার কোনো সার্থকতা নেই। মনের পিছনে দেহ থাকলেও, দেহ দিয়ে শ্রেষ্ঠ মানসিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না, মাত্র অভ্যাস দিয়ে সৃষ্টির শেষ ফলের মূল্যবিচার চলে না। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, অনভ্যস্ত তাল ও স্বর-যোজনা অনবরত কানে এলে ভালো লাগে— ভালোমন্দর কথা তখন ওঠেই না।

অন্য একটি বিপদ রয়েছে। মানুষ যে শুধু অভ্যাসের দাস, স্বীকার করতে মানুষেরই অহংবুদ্ধিতে আঘাত পড়ে। সেজন্য মানুষের ইচ্ছা হয়, প্রত্যেক অনভ্যস্ত অভিজ্ঞতাকেই শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করতে— তা সেটি পুরাতনের সঙ্গে খাপ খাক্ আর নাই খাক্। বরঞ্চ নতুন অভিজ্ঞতা যতই অস্বাভাবিক, যতই খাপছাড়া, যতই বিসদৃশ হয়, ততই বরেণ্য হয়ে ওঠে। এটি অভিমান এবং অনেক সময় প্রথম অবস্থারই প্রতিক্রিয়া। স্থিতিশীলতা ও চিরন্তন চলিষ্ণুতা একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। প্রথম অবস্থার সুবিধা এই যে ঐতিহ্যের সাহায্যে রুচির মেরুদণ্ড ও বিচারে মাপদণ্ড তৈরি হয়। দ্বিতীয় অবস্থার সুবিধা এই যে, গতিশীল ও পরিবর্তনশীল জীবনের আসরে সৃষ্টির জন্য পরীক্ষা করা চলে, নিজের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসে। এই দুই অবস্থা অর্থাৎ অভ্যাসের দাসত্ব এবং নতুনত্বের মতিহীন গতি ভিন্ন অন্য একটি অবস্থা ও মনোভাব আছে। তার বিশেষত্ব হল ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের মতি নির্ণয় করা। তার গুণ সাময়িক আপেক্ষিকতার হাত থেকে মুক্তি, যে-মুক্তি, সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হবে। বলা বাহুল্য, আমি প্রতিভাশালী স্রষ্টাকে নির্দেশ করছি। অতএব, প্রত্যেক সমালোচকের কর্তব্য হচ্ছে, স্নায়ুগত অভ্যাস এবং নতুনত্বের স্নায়বিক সুখ ও মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সংগীতে ঐ অতিরিক্ত অবস্থার সন্ধান করা। সমালোচকের কান যদি শুধু দরবারী সংগীতে কিংবা শুধু দেশী সংগীতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলে তাঁর আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাবার কোনো আশা নেই। কিন্তু দুইপ্রকার হিন্দুস্থানী সংগীতেরই রসগ্রাহী হয়ে, কবিতার রসগ্রহণ করবার ক্ষমতা অর্জন করে এবং নব নব রূপের সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধানে ব্যগ্র হয়ে যদি কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সংগীত শোনেন তা হলে তাঁর আনন্দের মাত্রা বেড়েই যাবে। রবীন্দ্র-সংগীতে তার অভ্যাস, অনভ্যাস, প্রধান কথা নয়; আদত কথা তার যোগসাধন, সৃষ্টিতত্ত্ব। এই কথাটি ঐতিহাসিকেরও স্মরণ রাখা উচিত। সৃষ্টি আমাদের সংগীতে সম্ভব, এবং অভ্যাস-অনভ্যাসে মিশ্রণের ফলে একটি অভিনব রূপ সৃষ্টি হতে পারে স্বীকার করলে নিজেকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয় না, বরঞ্চ রসোপভোগের যথেষ্ট সুবিধা হয়। তার পর যদি রূপটি সত্যিকারের মোহন হয় তা হলে তো কথাই থাকে না, মন আনন্দে ভরে ওঠে।

মন তৈরির কথা ছেড়ে দিলে, ভেতরের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, রসবস্তুর রূপ, তার প্রকাশ যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান তৈরি হল। আনন্দের সাক্ষাৎ উপাদান ও অব্যবহিত কারণ হচ্ছে সম্পূর্ণতা। বিষয়বস্তু, রূপ ও প্রকাশপরতাকে পৃথকভাবে দেখলে আংশিক সুখ হতে পারে,

কিন্তু আনন্দ হয় না। আনন্দের জন্য সম্পূর্ণতা চাই। একটি বাদ দিলেই আনন্দ দৈহিক সুখে পরিণত হল। রবীন্দ্রনাথের সংগীতে সৃষ্টির সম্পূর্ণতা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। যে ভাবটি তিনি গানের রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে চান, সেটি সুরের উপযুক্ত, সেটি বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান, এবং অতি সুন্দর রূপেই ব্যক্ত বলে সম্পূর্ণ। হিন্দুস্থানী সংগীতে, বিশেষত ধ্রুপদ ও খেয়ালে ভাবাত্মক গান নেই যে তা নয়, কিন্তু সকলেই জানেন যে ভাবগুলির সংখ্যা অর্থাৎ বৈচিত্র্য কম, এবং বেশিরভাগ গানেই ভাবের কোনো স্থান নেই; থাকলেও গায়কের কণ্ঠে ভাবের সঙ্গে রূপের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

হিন্দুস্থানী সংগীতে সুরের বিকাশ রচয়িতার কি গায়কের ব্যক্তিগত ভাবের, কিছু হলেও, বড়ো বেশি ধার ধারে না। কেবল তাই নয়, এবং এই কথাটি দরকারি, গায়কের কণ্ঠে গায়নপদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য, উচ্চারণ, অলংকার, সামঞ্জস্যবিধানের জন্য, মিষ্টতা ও অমিষ্টতার জন্য, একই রাগিণী যে ভিন্ন রূপ অর্জন করে সেটা কোনো ব্যক্তির ভাবগত রূপ নয়। আমরা বলি, কী দরদ, কী ব্যঞ্জনা! কিন্তু ধ্রুবপদ্ধতির গানে ওই প্রকার মন্তব্য নিতান্ত অবান্তর। সেখানে যে ভাব ফোটানো চাই সেটা রাগিণীর। রাগিণীর ভাব ও রূপ, ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, মোটেই নয়। কিন্তু এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। ভাবকে হিন্দুস্থানী গানে যা মূল্য দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি মূল্য তিনি দিয়েছেন এবং দিয়েও তিনি সুরের সম্পূর্ণতাকে ছোটো করেন নি। অথচ তাঁর গান কেবল কথার তান, কিংবা ভাবের বিলাস নয়। তাঁর গান এক-একটি চিত্তবৃত্তি বা mood-এর ভাবগত বিকাশ। গায়ক সেই mood ধরতে পেরে যদি তাকে রূপ দিতে পারেন তা হলে সে রূপটা হিন্দুস্থানী দরবারী সংগীতের চেয়ে বেশি সহজ এবং পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। সাধারণকে ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করলে আমাদের আনন্দ বেড়েই যায়। সম্পূর্ণতাকে রূপ দেবার জন্য এই উপায় নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী। সাধারণ ভাবের পক্ষে স্বর-বিন্যাস বেশি উপযুক্ত হলেও সীমাবদ্ধ, বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত ভাবের উপযুক্ত কথা ও ভাবের সম্যক মিশ্রণ বেশি মূল্যবান। তবে, সুরের প্রকাশে স্বরের ব্যত্যয় কোনো ক্ষেত্রেই শোভা পায় না।

তার পর আসে রূপের কথা। বাক্য, অর্থ, ভাব এবং এই তিনের সুসমঞ্জস প্রকাশেরই নাম হচ্ছে রূপ। রূপের সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে রচয়িতার প্রদত্ত রূপকে ভিন্ন আকৃতি দিতে গায়কের একটু কুণ্ঠিত হওয়া উচিত। বিচারের জন্যও রূপটি রচয়িতার, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া রূপ হওয়া চাই। সে-রূপকে বিকৃত করে যে-রূপ গায়ক তৈরি করেন তাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুরের রূপকে বিচার

করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের ‘দেওয়া’ রূপ কথাটা হয়তো ভুল, কেননা যাঁরা তাঁর গান রচনা লক্ষ করেছেন তাঁরাই জানেন যে, তাঁর কাছে সুর ও কথা একত্র আসে, হরগৌরীর মতন। হরকে গৌরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে হরকে পিশাচ এবং গৌরীকে শীর্ণা কুমারী বলে ভ্রম হয়। সুর ও ভাবার্থক কথার মিলনে রূপ, এবং সে-রূপ তখনকার জন্য, তার অন্তরের সত্তায় বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ। যদি কোনো গায়ক তাঁর কথাকে নিজের রচিত সুরে বসান, কিংবা তাঁর সুরকে নিজের কথার উপর চাপিয়ে দেন, তা হলে জিনিসটা বীভৎস হয়ে ওঠে। প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে যেটি সাধারণত গায়কের উপরই নির্ভর করে। গায়ক কতটা গানের ভাবকে নিজস্ব করতে পেরেছেন, কথাগুলিকে কতটা শ্রদ্ধা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, সুরের বৈশিষ্ট্য কতটা রক্ষা করতে পারেন, গানের সম্পূর্ণতাকে কতটা অটুট রাখতে পারেন, এই সবের উপর তাঁর প্রকাশ মাধুর্য নির্ভর করে। এক হিসাবে তাঁর কাজ ওস্তাদের চেয়ে সহজ, অন্য হিসাবে শক্ত। তাঁর স্বাধীনতা কম, কিন্তু তিনি সাহায্য পান বেশি। স্বাধীনতার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাঁকে কৃতিত্ব দেখাতে হবে বলেই তাঁর নৈপুণ্যের প্রয়োজন মনে হয় বেশি।

রবীন্দ্রনাথের গানের সম্বন্ধে এই কয়টি মোটা কথা স্মরণ রাখলে দেখা যাবে যে তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতধারার বিপক্ষে যাওয়া দূরে থাকুক, সেই ধারাকেই দেশী সংগীতের সংস্পর্শে ও ব্যক্তিগত ভাবের সম্পর্কে এনে নতুন জীবন দিয়েছেন। শ্রদ্ধা সহকারে দেখলে, ইতিহাসকে খাতির করলে, সংগীতকে ভালোবাসলে, রসিক হলে, অবান্তরকে বাদ দিলে হয়তো দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের স্থান সংগীত ইতিহাসে খুব উঁচুতে। নতুনকে অপরিচিত বলে অবজ্ঞা না করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, সেটি পুরাতনের রূপান্তর, সনাতনেরই বিকাশ। সনাতনকে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে, তার মধ্যে অনেক সময় নতুন জীবনের আভাস রয়েছে। রসোপভোগের এই হল জ্ঞানগত ভিত্তি। ভালো লেগেছে— এইটাই যথেষ্ট নয়।

যাঁরা যন্ত্রসংগীত ভিন্ন অন্য সব সংগীত অশুদ্ধ, অতএব হেয় বিবেচনা করেন, তাঁদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখছি না। যাঁরা মনে করেন যে হিন্দু সংগীতের ইতিহাস অবনতির ইতিহাস তাঁরা আমার প্রচেষ্টাকে কৃপার চক্ষেই দেখবেন, অতএব প্রতিদানে তাঁদের কোনো অনুরোধ পর্যন্ত করতে সাহস হয় না। যাঁরা বলেন, দেশে বাংলা গানেরই ভবিষ্যৎ আছে, হিন্দুস্থানী ঢং অচল, কিংবা হিন্দুস্থানী গানই চলবে, বাংলা গানের আয়ু দুদিনেই শেষ হবে— তাঁদের কোনো প্রবন্ধই আদ্যোপান্ত পড়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁদের দিব্যচক্ষুতে সমগ্র ভবিষ্যতের আভাস সুস্পষ্ট।

আমি লিখছি তাঁদের জন্য যাঁদের ইতিহাসের যুক্তির ওপর বিশ্বাস আছে, সংগীতে কথাকে সাপের বিষের মতো নেই নেই করে উড়িয়ে দিতে চান না, এবং হিন্দুস্থানী স্বরপদ্ধতিটাই বাংলা অঞ্চলের ধ্রুবপদ্ধতির ভূমিকা মানেন এবং তুলনা-মূলক বিচারে বুদ্ধি এবং ঘটনাকেই প্রধান করেন। মূল্যদান সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে শ্রীবৎস চিন্তার গল্পটি স্মরণ করাতে চাই। মূল্যদানের পূর্বে মিল-গরমিল দুধারেই সমানে নজর রাখতে হবে। তুলনার ক্ষেত্রটি যদি সমান না হয়, তবে তুলনাটি হবে সংস্কারেরই সংস্কার। টাকাকে আনা দিয়ে ভাগ দেবার পূর্বে তাকে আনাতে পরিণত ক'রে পঞ্চম শ্রেণীর বালক, কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো না বাংলা গান ভালো আলোচনা করবার সময় এই বালকসুলভ ফন্দিটি বয়স্করাও ভুলে যান। তাঁদের দোষ নেই, কারণ বড়ো-ছোটো, আগে-পিছে, জয়-পরাজয়, ইত্যাদির বিচারকেই শিক্ষা বলা হয়। প্রকৃতিগত পার্থক্য, পরিপ্রেক্ষিতের ভেদ, পরিণতির হারের বৈষম্য বোঝবার পক্ষে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু প্রকৃত তুলনা ও মূল্যবিচার আমাদের করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত সমালোচনার জন্য তাঁর পূর্ববর্তী সময়কার বাংলাদেশে উচ্চসংগীতের ইতিহাস জানা চাই। দুর্ভাগ্যবশত সে ইতিহাস কেউ লেখেন নি। আমরা কেবল জানি যে বাংলাদেশে ধ্রুপদের ও টপ্পার যতটা প্রচলন হয়েছিল, খেয়াল ঠুংরীর ততটা হয় নি। কৃষ্ণধনবাবু যন্ত্রকেই সেজন্য দায়ী করেছেন। তাঁর মত আংশিকভাবে সত্য। কারণ, তারের যন্ত্রের প্রভাব সুবিস্তৃত থাকলে কণ্ঠ-সংগীতে শ্রুতির প্রাধান্য ধরা পড়ত; এবং বাঙালী গায়কের কণ্ঠ শ্রুতিশুদ্ধ ছিল কেউ বলেন নি, অন্তত থাকলে অত সহজে হারমোনিয়মের কৃপায় কণ্ঠের সর্বনাশ

হত না। বোধহয়, উপযুক্ত সংগতের জন্যই ধ্রুপদকে আমরা সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে গোলাম আব্বাস নামে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজী বাংলাদেশে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁর দুজন বিখ্যাত শিষ্যের নাম নিতাই ও নিমাই চক্রবর্তী। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ভাই কেশব মিত্র এবং ঝামাপুকুরের মুরারী গুপ্ত মহাশয় তাঁদেরই ঘরোয়ানা। বিংশ শতাব্দীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ বাঙালী পাখোয়াজীই কেশববাবু ও মুরারীবাবুর শিষ্য। নগেনবাবু, দুর্লভবাবু দীন হাজরা প্রভৃতি বাদক সেদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে ধ্রুপদের মর্যাদাদানে সহায়তা করেছেন। দুর্লভবাবু ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ এখনও ভাঙাহাটে বাজান।

এদেশে ধ্রুপদের প্রচলনের অন্য কারণ লোকসংগীতের উন্নতি। অন্যান্য প্রদেশে লোকসংগীত বরাবরই ছিল কিন্তু, খুব সম্ভব, আমাদের কীর্তনের মতো উৎকর্ষ লাভ করে নি। কীর্তনের সুর ও তালের বৈচিত্র্য হয়তো হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংঘাতেই সৃষ্ট। ভজনের গায়কী অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে লাগতে পারে, একথা প্রাদেশিক হিংসার যুগে ধ্রুবপদ্ধতির জন্মভূমিতে অ-বাঙালীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। লোকসংগীতের প্রভাবের সঙ্গে ধ্রুপদ প্রচলনের যোগ আছে। সে যোগ আন্তরিক। লোকসংগীতে তানের অভাব, ধ্রুপদেও তান নেই; লোকসংগীত অর্থমূলক, অর্থও আবার সাধারণত আধ্যাত্মিক, রূপ তার কবিতার, রস তার অনুভূতির; অন্যধারে পুরাতন ধ্রুপদের অর্থ তখনও উচ্চারণ বিভ্রাটে অস্পষ্ট হয় নি, রচনাগুলি ছিল সাধারণত ধর্মভাবাপন্ন, কাব্যাংশও তার হেয় ছিল না। তা ছাড়া, কথার গায়কী-উচ্চারণ পদ্ধতিতে খেয়ালিয়ার অপেক্ষা ধ্রুপদিয়ার সঙ্গে বাউল কীর্তনিয়ার মিল নিবিড়তর। লোকসংগীতে অন্তের স্বরবর্ণ টেনে এবং দম ছেড়ে গাওয়া হয়, তাই গানের পক্ষে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক অনুপযোগিতা শ্রোতা ততটা অনুভব করতে পারে না। খেয়ালে কথার যেখানে ফাঁক সেইখানেই তান চলে এবং তানের জন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন। উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ ব্রজভাষায় রচিত হত, সে ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলি কিংবা পূর্ববঙ্গের ভাষার গরমিল যথেষ্ট থাকলেও অন্তত দুটি একটি বিষয়ে, যেমন যুক্তবর্ণের ও স্বরবর্ণের ব্যবহারে কিছু মিল পাওয়া যায়। এই মিলনই গায়কের অবলম্বন। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করবো। ভাষা বাদ দিলেই লোকসংগীতের ঋজুতা, গাম্ভীর্য, ঐশ্বর্যহীনতা, সরলগতি, সংযম, অন্তর্মুখিনতা ধ্রুপদকে যতটা স্মরণ করায় খেয়ালকে ততটা করায় না। এইপ্রকার মিলের জন্য বাংলাদেশে ধ্রুবপদের প্রচলন খেয়াল অপেক্ষা সহজ হয়। বলা বাহুল্য, সব অঞ্চলের কীর্তন সমানভাবে সহজ নয়। এমন কীর্তনও শুনেছি যার ঐশ্বর্যের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর স্থাপত্যেরই তুলনা চলে।

যাঁরা সামাজিক ব্যাখ্যায় আস্থা রাখেন না, তাঁরা নামের ভক্ত। অবশ্য নামগুলি ইতিহাসের রাস্তায় স্তম্ভের মতন। বিষ্ণুপুরে অনেকদিন পূর্বেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতি এসেছিল। কারণ ছিল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজা বৈষ্ণব হবার পরেই সেখানে সুকুমার শিল্পের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু বেহার অঞ্চল থেকে উড়িষ্যা যাবার পথে বিষ্ণুপুর পড়ে, সেইজন্য বিষ্ণুপুরে কেবল কীর্তনের চলন হল না, উত্তরপ্রদেশের মুসলমানোচিত প্রকর্ষের প্রভাব সেখানে স্বীকৃত হল। কীর্তন ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়ায়, এবং বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে ধ্রুবপদ্ধতি শেখাতে আরম্ভ করলেন। তানসেনের বংশধর জ্ঞান খাঁ, প্যার খাঁ ও জাফর খাঁর মতো বিখ্যাত গায়কের ঘরোয়ানা বেহার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। বেথিয়া তখন বাংলার অন্তর্গত ছিল বলা যায়। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের ধ্রুপদ গান বেথিয়ার দান। মহারাজ নওয়লকিশোর ও আনন্দকিশোর উৎকৃষ্ট রচয়িতা ছিলেন। রাধিকাবাবুর গুরু গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং তাঁর ভাই এঁরা কাশীর লোক হলেও বেথিয়া থেকে কলকাতায় আসেন। পূর্ববঙ্গের অনেক জমিদারবর্গ ধ্রুপদিয়া পালন করতেন। গোবরডাঙার গঙ্গানারায়ণবাবুই সর্বপ্রথম পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলমান ওস্তাদের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করে দেশে ফেরেন। এই সময়ে রাণাঘাট, শ্রীরামপুর ও পানিহাটি প্রভৃতি গঙ্গার উপকূলস্থ গণ্ডগ্রামে ধ্রুপদ গানের মর্যাদা ছিল। মৌলাবক্স্‌ও এইসময় কলকাতায় আসেন এবং বাংলাদেশ পর্যটন করেন। পূর্বোক্ত কারণে বাংলাদেশে ধ্রুপদের প্রচলন হয়। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে ও নিকটস্থ যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরদের বাড়িতে যেসব বিখ্যাত ধ্রুপদিয়ার সমাগম হত, তাঁদের মধ্যে মৌলাবক্স্‌, যদুভট্ট, বিষ্ণুভট্টই সর্বপ্রধান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চ সংগীতের একজন মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি রাগরাগিণী পিয়ানোতে বাজাতেন এবং সুরের মিশ্রণ ও বিস্তার নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা করতেন। পিয়ানোতে তানবিস্তার কিংবা আলাপ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই সেইসব পরীক্ষায় সহায়তা করতে হত, উপযুক্ত কথা যোগান দিয়ে। বলা বাহুল্য, বাড়ির আবহাওয়ায় ছিল সংযত স্বাধীনতা এবং সুগম্ভীর ধর্মভাব, যেটি ধ্রুপদের অনুকূল। অতএব বলা চলে উচ্চসংগীতের মধ্যে ধ্রুপদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

ধ্রুপদের চিহ্ন কি? প্রায় প্রত্যেক ধ্রুপদ গানেই চারটি তুক্ কিংবা পদ থাকে। অলংকারের মধ্যে মীড়, গমক ও আশই ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদের রূপ নির্দিষ্ট। আলাপের পর অস্থায়ী গেয়ে অন্তরা গাইতে হয়, বাকি দুইটি তুক্ বা পদ প্রায় অস্থায়ী ও অন্তরারই পুনরাবৃত্তি। তান চলে না ধ্রুপদে। তালের মধ্যে চৌতাল,

আড়া চৌতাল, তেওরা, ঝাঁপ, সুরফাক্তা, পঞ্চম শোয়ারির ব্যবহারই প্রশস্ত। কিন্তু ধ্রুপদে তানের বাহাদুরী দেখানো অন্যায়। গানের শেষে যৎসামান্য বাটোয়ারা, আড়ি, দেড়ি, কুয়াড়ি, বিসম, অনাঘাত দেখালেই যথেষ্ট হয়। ধ্রুপদের বিষয় হল ধর্ম, প্রকৃতির বর্ণনা ও রাজার গুণগান। তার গতি গজের, যেমন সর্পগতি হল ধামারের। ধ্রুপদের রস শান্ত ও গম্ভীর— বাহুল্যবর্জিত। ঐশ্বর্য তার অন্তরের। যাঁর কণ্ঠে তান অজস্র, স্বর কম্পমান, যাঁর স্বভাবে সংযম নেই তাঁর পক্ষে প্রকৃত ধ্রুপদী হওয়া অসম্ভব। ধ্রুপদের চার প্রকার বাণী আছে। তার মধ্যে ডাগর বাণী ও গোবর বাণী বেশি চলে। খাণ্ডার বাণী কিংবা গহর বাণী গাওয়া অত্যন্ত শক্ত। যাঁদের এই কয় প্রকার বাণী শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা জানেন যে হিন্দুস্থানী সংগীতে voice production বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু ধ্রুপদ গানের বিষয়ে বৈচিত্র্য কম, তার রচনার ভাষায় কথা বেশি ও কথাগুলি চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ডের মতন, অতএব তার গায়কী-রীতিতে স্বাধীনতা প্রকাশের সুযোগ খেয়াল এবং ঠুংরী অপেক্ষা কম সকলেই স্বীকার করেন।

আজকাল অনেকের মুখে শোনা যায় যে খেয়াল ও ঠুংরীতে গায়কের নিজের কৃতিত্ব দেখাবার স্বাধীনতা আছে। বলা বাহুল্য, উচ্চ শ্রেণীর খেয়াল ও ঠুংরী রচনায় সুরের বিকাশ অনিয়ন্ত্রিত নয়। কোন্ তানের পর কোনটি আসা চাই তার নিয়ম আছে, সে কথা ভালো ঘরোয়ানার গান শুনলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া খেয়ালের তান রাগিণীর আশ্রয়ে, তার মূল প্রকৃতির অবলম্বনেই ফুটতে পারে, একথা সব ভালো খেয়ালিয়ারাই জানেন। ঠুংরীতে এই তানবিস্তার পদ্ধতির ওপর আছেন নায়ক-নায়িকা ও তাঁদের মেজাজ। খেয়াল-ঠুংরীতে তানের স্বাধীনতা যে যথেচ্ছাচারিতা নয় বলাই বাহুল্য।

মোদ্দা কথা এই— রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে সংযত সংগীতেই পরিপুষ্ট। তাঁর প্রতিভা অল্প বয়সেই বিকশিত হয়। তাঁর মতন ব্যক্তির এই প্রকার শিক্ষাদীক্ষায় এবং ওই প্রকার বেষ্টনীতে যা করা সম্ভব তাই তিনি করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদের গুণ গ্রহণ করলেন, গমকের হুংকার ত্যাগ করলেন এবং বৈচিত্র্য আনলেন। আধার, বাংলাভাষা। তাঁর বৈচিত্র্যসাধনের উপায় একাধিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষানবিশীর কাল তখন উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি আর সুরে কথা বসাচ্ছেন না। রাধিকাপ্রসাদ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক। রবীন্দ্রনাথ কবিতার উপযুক্ত সুর খুঁজতেন রাধিকাপ্রসাদের কণ্ঠে। তখন তিনি কবি এবং সুরের প্রযোজক মাত্র; অর্থাৎ কথায় সুর বসানোই ছিল তাঁর সমস্যা। এই যুগের তাঁর অনেক রচনা এখনও ওস্তাদের মুখে শোনা যায়। তাঁরা বলেন

রবীন্দ্র-সংগীতের আজকাল পতন হয়েছে। তাঁদের মন্তব্য বিচার করলে হয়তো পূর্বপরিচয়ের আনন্দটুকুই ধরা পড়বে। 'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি' শুদ্ধ ইমনকল্যাণ, অতএব গানটি ভালো— এক্ষেত্রে শুদ্ধতার অর্থ পুনরাবৃত্তি, যথাযোগ্যতা গৌণ— যদিও স্বীকার করি এ যুগে বেশির ভাগ গানেই সুর ছিল কবিতার উপযুক্ত। কিন্তু এ যুগের রচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই— কথা ও ভাবের উপযোগী না হলেও সুরটা যদি সংগীতজ্ঞ শ্রোতার মনে কোনো বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গান স্মরণ করাতে সমর্থ হত, যদি সুরটা হুবহু তার নকল হত, তা হলেই শ্রোতা সন্তুষ্ট হতেন। অতএব, কেবল উপযোগিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গানকে যাচাই করা যায় না। করলে পরে তাঁর ক্রমবিকাশকে শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। অথচ উপযোগিতাই সংগীতরচনা ও রচয়িতার মূল্য নির্ধারণ করবে।

উপযোগিতার অর্থ হল এই— কথা ও সুরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাকে স্বীকার করা, তার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত করা, তদ্‌ভিন্ন কবিতার মূলভাবটির সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত রাগিণীর মূলভাব কিংবা মূর্তির মিলনসাধনকেও উপযোগিতা বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কবিতাটি মেঘলাদিনের বর্ণনা, তার মধ্যে মেঘ, বিজলী, ময়ুর, হানা প্রভৃতি গুরুগম্ভীর কথা রয়েছে। আমাদের সংস্কারে মল্লারের সঙ্গে বর্ষার যোগ আছে। এখনও শুনতে পাই, অমুক ওস্তাদ মল্লার গেয়ে শীতকালে বৃষ্টি আনলেন। অতএব কবিতাটির প্রকৃষ্ট মিলন হবে মল্লারের সঙ্গে। কিন্তু এইপ্রকার মিলনসাধনের কোনো সাংগীতিক মূল্য নেই। কথা ও সুরের মধ্যে সম্বন্ধকে প্রকাশ করাই যদি সমস্যা হয় তবে তাদের মধ্যে গোটাকয়েক সন্ধিশর্ত থাকা চাই। সন্ধির শর্ত তৈরি করবার সময় মনে রাখতে হবে বাংলা কবিতার ভাষা, অর্থ ও ছন্দকে, বাংলাদেশের প্রচলিত গায়কী পদ্ধতিকে। সন্ধি কখনও একতরফা ডিক্রি নয়, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানই তার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, প্রত্যেককেই সন্ধির সময় কিছু না কিছু ছাড়তে হয়। ছাড়বার সময় পাবার প্রত্যাশা থাকেই থাকে।

রবীন্দ্র-সংগীতে নেওয়া দেওয়াটা কী ও কতখানি এখন দেখা যাক। ঐ যুগে রবীন্দ্রসংগীতে পাওয়া গেল সুরের মিশ্রণ, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং আশের আধিক্য। মীড় রয়েই গেল— বিদেশী সংগীতের হারমনিক্‌স্ এবং যন্ত্রসংগীতের অলংকারের পরীক্ষা সফল হল না। ছাড়া হলো, রাগরাগিণীর ও ব্রজভাষায় যতটা শুদ্ধতা তখন ছিল তাকে, এবং সেই সঙ্গে তার পাশে যে সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাকেও। সুরের মিশ্রণ সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বললেই চলবে যে, তাঁর প্রদত্ত সুরে গুরুচণ্ডালী দোষ বর্তায় নি। অনেক বড়ো ওস্তাদ এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি

পাপী। ইমন-বেলাওল, ভৈঁরোবাহারের গান অনেক বাঙালী যুবক আজকাল গেয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির সম্বন্ধে কিছু লিখছি না— অতএব সুর ও কথার সন্ধিশর্তে ফিরে যাওয়া যাক।

বাংলাভাষায় স্বরবর্ণের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সংগীতালোচনার পক্ষে জানা প্রয়োজনীয় সেগুলিকে নিম্নলিখিত মোটামুটি চারটি মন্তব্যে প্রকাশ করা যায়।

(১) অর্থপরিবর্তনে স্বরবর্ণের হ্রস্বতায় বা দৈর্ঘ্যে কোনো তারতম্য ঘটে না— যেমন দিন, দিনকাল ও দীনদুঃখী একই উপায়ে উচ্চারিত হয়।

(২) যে নিঃশ্বাসটুকু নিয়ে বাক্যারম্ভ করা যায় তার ঝোঁকে যত কথা উচ্চারিত হতে পারে তারাই একটি সমষ্টি হিসাবে বিবেচিত হয়।

(৩) বাংলা উচ্চারণের ঝোঁক পড়ে সাধারণত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রথম শব্দে। এ ছাড়া অর্থভেদেও ঝোঁক পড়তে পারে। অন্য কোনো বাধা না থাকলে হসন্তবর্ণের পূর্ববর্ণও ঝোঁক দিয়ে উচ্চারিত হয়।

(৪) ক্রিয়াপদ বাদ দিলে বাংলা শব্দ স্বরান্ত নয়, হসন্তান্ত।

ব্রজভাষায়, যে-ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হত তার স্বরবর্ণের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকৃতির। তার স্বরোচ্চারণ রীতিতে অর্থের পরিবর্তনে তারতম্য ঘটে। যেমন দিন ও দীনদয়াল। তার ঐক্য কথাগুচ্ছে আবদ্ধ, শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মে নয়। তাতে উচ্চারণের জোর দেওয়া হয় উপান্ত স্বরবর্ণে।

দুটি ভাষার স্বরবর্ণের ব্যবহারে যদি মোটামুটি ওই ধরনের পার্থক্য থাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের রচিত বাংলা গানে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল স্বীকার করতে হবে। অন্তত আ-কারের বেলা তো বটেই। (ধরা যাক্, রাখাল, কিংবা মাতাল কথাটি। ব্রজভাষার নিয়মানুসারে প্রথম স্বরবর্ণ ছোটো হয়ে এবং শেষটি দীর্ঘতর হয়ে রাখাল রাখোয়াল-এ, এবং মাতাল মাতোয়ালায় পরিণত হয়।) বাংলা গানে স্বরবর্ণের স্বাভাবিক সংকোচে ক্ষতি হল তানের, কারণ সাধারণত খেয়ালে প্রথম স্বরবর্ণের আশ্রয়ে তান নেওয়া হয় না, শেষের উপান্ত স্বরবর্ণেই নেওয়া হয়। কিন্তু ধ্রুপদে সে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, কারণ তানের ব্যবহার নেই সেখানে। অতএব বাংলায় ধ্রুপদ রচনা অপেক্ষকৃত সচল— বাংলার স্বাভাবিক গাঢ় সম্বদ্ধতা ততটা মারাত্মক নয় ধ্রুপদে, যতটা মারাত্মক বাংলা খেয়ালে। স্বরবর্ণ-সংকোচের জন্য যে ক্ষতি হয়, বাঙালী গায়ক তার পূরণ করেন 'য়' দিয়ে, যেমন 'মা আমার' কথা-দুটির মধ্যকার অবকাশ অতিক্রান্ত হয় 'মা-য় আমার' glide এর দ্বারা।

বাংলা ভাষার breath-group ধ্রুবপদী অলংকারের নিতান্তই অনুকূল; কিন্তু

খেয়ালের প্রতিকূল। মীড় ও গমক স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরামের উপযোগী। বাংলাভাষা যেকালে আমাদের মাতৃভাষা, তখন আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথার অর্থ আমাদের মনে আসবেই আসবে। গান যখন কবিতাতেই লেখা হয়, তখন উচ্চারণ স্পষ্ট করতেই হবে। ব্রজভাষার অর্থ আমরা বুঝি না, তাই তার শুদ্ধ-বাণীর দায়িত্ব বাংলার অপেক্ষা কম। কম বলেই অবশ্য সুর উপভোগের সুবিধা। অতএব একধারে যেমন ক্ষতি, অন্যধারে তেমন সুবিধা। সুতরাং দেখা গেল যে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েই ধ্রুপদের আড়ষ্টতা কমে যায়, বৈচিত্র্যের অবসর পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ ধ্রুপদাঙ্গের বাংলা গান রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। নানা বিষয়ে তিনি গান রচনা করতে লাগলেন, সবগুলি কিছু ধ্রুপদাঙ্গের হতে পারে না। তাঁর রচনায় নানা প্রকারের মনোভাবের, mood-এর প্রকাশ হতে লাগল। এখন সমস্যা উঠল সেইসব বিচিত্র রচনার উপযুক্ত সুর দেওয়া নিয়ে।

এইখানে বাংলা ছন্দের আড়ষ্টতা ও একঘেয়েমি কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ ভাঙলেন, তা আমাদের জানতে হবে। পুরাতন ছড়া বাদ দিলে বলা চলে যে বাংলায় পয়ারেরই রাজত্ব ছিল। পয়ার ভাঙলেন ভারতচন্দ্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দিয়ে। তবু বাংলার ঠাসবুনানি হাল্‌কা হল না, কারণ যুগ্মশব্দ গাঁটের মতন। রবীন্দ্রনাথ এসে যুগ্মবর্ণকে দুমাত্রায় ব্যবহার করলেন। এতদিনে বাংলা ছন্দ স্বাধীন হল, কারণ, শব্দের মধ্যকার অবসরটুকু ধ্বনিতে বিস্তারিত হয়ে মাত্রা গোনার দাসত্ব দিলে ঘুচিয়ে। এই অবসরটুকু দীর্ঘ নয়, অতএব তাকে দীর্ঘ তানকর্তব দিয়ে ভরাট করা যায় না, জোর তার মধ্যে আশ ব্যবহার চলে। মীড় ও আশের সাহায্যেই কবিতার রূপ অনেকটা ফুটে উঠতে পারে। যতটা পারে ততটাই এই যুগের রবীন্দ্র-সংগীতের সার্থকতা।

তবু কাব্যছন্দের দাসত্ব গেল না। পরের যুগের কথা ও সুর সমস্তরের। 'তিমির অবগুণ্ঠনে' গানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কথা ও সুরের সন্ধিশর্তগুলি বিজেতা-পরাজিতের নয়, মিত্রমণ্ডলীর। মিত্রও একাধিক, কারণ 'কে তুমি'-তে বিস্ময়-ভাবটিও চমৎকার ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সকল গানেই এইপ্রকার সুর, কথা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গি মিলন দেখা যায় বলছি না, কিন্তু বিস্তর রচনায় সম্পূর্ণ মিলনের সাক্ষাৎ পাই। সেইসব রচনাগুলি আমাদের সমস্যাপূরণের সার্থকতার পরিমাণদণ্ড হবে।

অতএব বোঝা গেল, রবীন্দ্র-সংগীতে তান কেন নেই। বাংলাভাষায় লেখা সংগীতে তানের সুযোগ কম। লেখক আবার ধ্রুবপদে অভ্যস্ত। ততটুকু তান

সম্ভব যতটুকু সুযোগ breath-group-এর শেষে, অর্থের ইঙ্গিতে এবং ছন্দোবৈচিত্র্যে পাওয়া যায়। তার বেশি তান দিলে রাগিণীর বিকাশ হয়তো হবে, কিন্তু ভাষা, ছন্দ, অর্থ ও সুরের ভারসাম্য নষ্ট হবে— অর্থাৎ সংগীত হবে না। আমার বক্তব্য এই— তানের উদ্দেশ্য আর সংগীতের উদ্দেশ্য এক নয়। তান সুরের একপ্রকার অভিব্যক্তি— সেটি রাগিণীর রূপ-উদ্ঘাটনের ইতিহাস; সংগীত হল পরিপূর্ণ সামগ্রী, ইতিহাসের দিকটা তার মুখ্য নয়। তান সুরের একপ্রকার অলংকার, যেটি সুরের ওপর বসাচ্ছেন গায়ক স্বয়ং। সংগীতের অলংকার প্রধানত শ্রোতার মনে। তানে চাই স্বরবর্ণের দীর্ঘ অবসর, সংগীতের অবসর গাওয়ার পর, রেশে। তা ছাড়া, বাংলা সংগীতের, বাংলা ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং অর্থ ও ভাবকে অগ্রাহ্য করার অক্ষমতাহেতু তানকে নিতান্তই বশে রাখতে হয়। অর্থসম্ভার সর্বদাই সুরকে চাপা দিতে যাচ্ছে; তাই সংগীত-রচয়িতারা সেই গুরুভারকে লঘু করতেই সচেষ্ট হয়েছেন এতদিন। সংগীতে সুরের মিশ্রণ এবং বৈচিত্র্যের সাহায্যে গুরুভারকে লঘু না করে, সহজে বহন করানো— এই হল রবীন্দ্রনাথের একটি কৃতিত্ব।

কথা ও সুর

যাঁরা বাংলা গানকে অবহেলা করেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি বাংলা গান ভালোবাসি এবং তার বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা আর ভালো-বাসা সমগুণাত্মক নয়। ভালোবাসি রক্তের টানে, শ্রদ্ধা করি নানা কারণে। বাংলা গান যদি না ভালোবাসতাম তবে শ্রদ্ধার দিক ও তার গুরুত্ব পরিবর্তিত হত। যদি না শ্রদ্ধা করতাম, কেবল ভালোই বাসতাম, তবে আমার প্রাদেশি-কতাই প্রমাণ পেত। ভালোবাসা দেখানো মনের অসংযম, অতএব প্রবন্ধের বিষয় নয়। চিঠির হতে পারে। আমি শ্রদ্ধারই কারণ দেখাব।

ব্যক্তিগত রুচি বাদ দিলে দেখতে পাই যে সংগীত প্রভৃতি কারুকলা জীবনী-শক্তির উদ্বর্ত অংশের প্রক্রিয়া। জীবনে প্রাচুর্য এলেই অতিরেকাংশের সাক্ষাৎ মেলে, নচেত জীবনযাত্রানির্বাহেই শক্তিতে টান পড়ে। অতএব বর্ধিত শক্তির বিভাগের ওপরই কতটা অংশ আনন্দ-উপকরণের সহায়ক হবে তা নির্ভর করছে। সমাজের ওপর নতুন কোনো ধাক্কা এলে, সংঘর্ষের ফলে, নতুন শক্তি জন্মায়, তাই প্রথম প্রথম সংগীতের উন্নতি হয়। অবশ্য সমাজ যদি জীবন্ত হয়, যদি ধাক্কা হজম করতে পারে তবেই হবে। সমাজশক্তিতে ভাঁটা পড়লে, উদ্দীপনার শক্তি দুর্বল হলে আনন্দের মূলধনে টান পড়ে। তখনই বাড়ে শুচিবাইয়ের প্রকোপ। ভারতের মধ্যযুগের শেষভাগে মুসলমান আমলে ভক্তির বন্যা, যে কারণেই হোক— বোধহয় ক্ষতিপূরণের জন্যই ডেকেছিল। তাই লোকসংগীতের প্রসার হল যথেষ্ট। তারই ফলে, তারই তাগিদে ধ্রুবপদ্ধতির উন্নতি। ইংরেজ আমলের গোড়ায় কাকজ্যোৎস্না দেখে কোকিল ডেকে ওঠে। কিন্তু অতি শীঘ্রই বুঝলাম যে সেটি সুপ্রভাত নয়। বিদেশী সভ্যতার প্রকৃতি যেদিন বুঝলাম সেইদিন আমরা রসের খেতে আল দিলাম। সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা চালানোই যখন একমাত্র কাম্য হয় তখন কোনো কারুকলা প্রাণের বস্তু থাকতে পারে না, শৌখিন দ্রব্যে পরিণত হয়; যেমন মুঘল দরবারে হয়েছিল। সংগীতে অবশ্য ঐ প্রকার সার্থক জীবনের ছোঁয়াচ লাগতে দেরি হওয়াই স্বাভাবিক— তবু লাগে। বাইরের চাপে, জীবনের অল্পতার সংকোচনে সংগীত হয় 'বিশুদ্ধ', অব্যবহারিক জীবনের প্রতীক, অন্য আর্টের আদর্শস্থল। এইপ্রকার মতবাদ য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রচলিত হয়। আমাদের দেশেও সংগীতে গোঁড়ামি শুরু মাত্র পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে।

এই গোঁড়ামিকে ঘৃণা করতে পারি না— তার মধ্যে বুদ্ধির চর্চা, চরিত্রের দৃঢ়তা, আভিজাত্যবোধের দম্ভ আছে। ভট্টপল্লীর স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে, যোগাযোগের মধুসূদনকে যে কারণে শ্রদ্ধা করি সেই কারণেই ধ্রুবপদ্ধতির গোঁড়ামিকেও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই তর্কবুদ্ধির সীমা নির্দিষ্ট, এই দৃঢ়তা পরিবর্তনশীল, সংস্কারাশ্রিত, এই আভিজাত্যবোধে অনৈতিহাসিক, অসামাজিক, জীবনপ্রগতির প্রতিকূল। এখন সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই— আর নেই বশিষ্ঠদেব— বালখিল্যের খাতির খানিকটা কমেছে। এখন সব শ্রীক্ষেত্র— তাই বলে দুঃখ করলে চলবে না, ভাঙনের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ রয়েছে— তারই ওপর রসানুভূতির যুগোপযোগী মত খাড়া করতে হবে। এখন কোনো রসস্রষ্টাই গ্রামের বৃদ্ধাপিসীর মতো 'এই আমাকে ছুঁসনি' বলে আলগোছে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে পারবেন না। তথাকথিত অন্তর্জনিষ্ণু কিংবা স্বনিষিক্ত শুদ্ধতা এখন বন্ধ্যাত্বের নামান্তর, বহির্জনিষ্ণুতাই এখনকার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত। সংগীতের ইতিহাস সামাজিক জীবনের গূঢ় নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। আমি প্রতিভার বিশেষ দান অস্বীকার করছি না। প্রতিভার জোরে ধ্রুবপদ্ধতি হয়তো আরো কয়েকদিন চলবে। কিন্তু দিব্যশক্তিসম্পন্ন কলাবিদের সংখ্যা কমেছে। কেবল তাই নয়, সংখ্যাহ্রাস অপেক্ষা প্রতিভাশালী নায়কবৃন্দের নিজেদের অবদানের সসীমতাই এখন চোখে পড়ে। মিয়াঁ তানসেনের মল্লার যে আজও বেঁচে আছে আর চর্জু কি ধোঁন্দি মল্লার লোপ পেতে বসেছে তার কারণ কি? সংগীতের রূপ পরিবর্তন করেন হয়তো দু'একজন বড়ো ওস্তাদ— কিন্তু তাঁদের প্রবর্তিত রূপের মধ্যে কোনটি বেঁচে থাকবে আর কোনটি মরবে নির্ভর করেছে সামাজিক প্রক্রিয়ার ইতিহাসের ওপর। মার্গ-সংগীতের দিক থেকে নতুনরূপের ভালোমন্দ বিচার খানিকটা চলে, বাকিটা অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি। মার্গ-সংগীত বোধ করি প্রত্যয় মাত্র। তার রসোপভোগের জন্যে যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন সেটি কোনো ব্যক্তি অর্জন করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। পণ্ডিতবর্গের মুখে শুনেছি যে আমাদের আলংকারিকরা অনিবদ্ধ সংগীতে কোনো রস খুঁজে পাননি। লোচনের মতে* নিবদ্ধ সংগীত, অর্থাৎ বর্ণ তান মান লয় ছন্দপ্রধান গীতেরই রস আছে।

'নিবদ্ধমনিবদ্ধং চ গীতং দ্বিবিধমুচ্যতে
অনিবদ্ধং ভবেদ্গীতম্ বর্ণাদি নিয়মৈর্বিনা
যদ্বা গমকধাত্বংগ বর্ণাদি নিয়মৈবিনা
নিবদ্ধং চ ভবেদ্গীতম্ তালমানরসাঞ্চিতম্
ছন্দোগমকধাত্বংগ বর্ণাদি নিয়মৈঃ কৃতম্'

বাংলা গান নিবদ্ধ সংগীতের মধ্যে পড়ে। তান মান ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। সাধারণভাবে ভাষার আলোচনা করবো। আমার বক্তব্যের যুক্তিবিন্যাস গোড়ায় বলে রাখি। ভাষার সঙ্গে সুরের গরমিল ও মিল কোথায় প্রথমে বিচার করবো, তার পর কবিতার উপযোগী সুর কী ভাবে বসান যায় তার আলোচনা করবো। অবশেষে সংস্কারগত সুরপদ্ধতির এবং বাংলা ভাষার প্রকৃতির গোটা কয়েক মূলতত্ত্বের নির্দেশ থাকবে। আমার উদ্দেশ্য বাংলাকথা ও হিন্দুস্থানী সুর-পদ্ধতির যোগাযোগের নিয়মের ইঙ্গিত দেওয়া।

প্রথমে আমি যন্ত্রসংগীতের উল্লেখ করছি, কারণ, এক হিসেবে যন্ত্রসংগীতই বিশুদ্ধ ও কুলীন। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া তর্কের সনাতন রীতি, অতএব যন্ত্রসংগীতের সাহায্যে সুর ও ভাষার পার্থক্য ধরা পড়বে। সাহিত্যের ভাষা যেমন একপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তির উপায়, বাহন ও বর্ধক, তেমনি সুরও অন্য একপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তির উপায়, বাহন ও বর্ধক। যে ভাববস্তু সাহিত্যের উপকরণ, সে ভাববস্তু যন্ত্রসংগীতের উপকরণ নয়। সাহিত্যে, ষড়রিপুর সাক্ষাৎভাবে আশ্রিত মনোভাব ফুটে ওঠে; যেমন ধরা যাক কবিতা পড়লে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য কিংবা তাদের কোনো সূক্ষ্মপ্রকারভেদ সহজেই পাঠকপাঠিকার মনে জাগ্রত হয়। ভারতীয় যন্ত্রসংগীতে তা হয় না। (ভারতীয় বললাম এই-জন্যে যে টলস্টয়ের **Kreutzer Sonata** নামক বিখ্যাত গল্পটি আমি ভুলতে পারি না—এবং ড্রাইডেনের আলেকজান্দারের স্বপ্ন নামক কবিতাও পড়েছি। লোকমুখে শুনেছি যে টলস্টয়ের সংগীত-জ্ঞানের মধ্যে ততটাই মর্মবুদ্ধি ছিল যতটা বীরত্ববোধ ছিল আলেকজান্দারের সংগীতজ্ঞানে। তা ছাড়া— বিদেশী সংগীত সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে চাই না।) তবু বিদেশে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে কোনো স্বরের অন্তত অন্তর্নিষ্ঠ ক্ষমতা নেই করুণা কিংবা ক্রোধ উদ্রেক করবার। পরীক্ষা যেকালে স্বর নিয়ে, স্বরবিন্যাস নিয়ে নয়, তখন স্বদেশী বিদেশী সংগীতের তর্ক উঠতেই পারে না। ওঁদের **minor third** আমাদের কোমল গান্ধার। যাঁরা দরবারী কানাড়া কী বস্তু জানেন না, সে সম্বন্ধে গল্প পর্যন্ত শোনেন নি এমন উচ্চশিক্ষিতদের নিয়ে একবার পরীক্ষা করা হয়। প্রথমে আলাপ, পরে গৎ, ধীরে ও ধুনে বাজানো হল, কেউ কেউ বললেন কান্নার আওয়াজ, দুচারজন সমুদ্রের গর্জন, অনেকে আবার ঘুঙুরের ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। ওঁদের সুরানুভূতি অপেক্ষা স্মৃতির সহচরীশক্তিই ছিল জোরালো। আমি তাঁদের দোষ দিচ্ছি না, তাঁদের মনে একই সুরের দ্বারা উদ্দীপিত মনোভাবের বৈচিত্র্য উল্লেখ করছি। একই সাহিত্যিক রচনা শুনলে অ-সাহিত্যিকদের মনেও অত বিভিন্ন-

ভাব উৎপন্ন হয় না। সেইজন্য বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় সাহিত্যের ও সংগীতের আবেদন ভিন্ন আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া চাই। যন্ত্রসংগীতের উপাদান, গঠন, উপভোগ সাহিত্যের উপাদান, গঠন ও উপভোগের সমশ্রেণী নয়।

এই ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বুঝতে হবে। আমরা জানি যে মনে কোনো-প্রকার আঘাত পড়লে গোটাকয়েক প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। তাই দিয়েই আমরা ব্যাপারটা কি বুঝি এবং প্রতিবিম্বগুলির (প্রতিমা, প্রতিরূপ), সাধারণ গুণের সাহায্যে পরকে বোঝাই। প্রতিবিম্ব মোটামুটি দুই প্রকারের— বস্তুগত ও কথাগত। মনোবিজ্ঞানে এতদিন এদেরই আলোচনা হয়েছে। অবশ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিংবা আশ্রয়েই প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। আমাদের ধারণা ছিল যে ইন্দ্রিয়গুলি সকলের সমানভাবে প্রবল নয়। বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যেই ভাবতাম কোনো আর্টিস্ট হবেন গাইয়ে, কেউ বা হবেন পটুয়া, কেউ ভাস্কর, কেউ সাহিত্যিক। অর্থাৎ, কথাগত প্রতিমার আধিক্যে সাহিত্য, বস্তুগত প্রতিমার আধিক্যে চিত্রকর প্রভৃতি। পরে টের পাওয়া গেল যে ব্যাখ্যাটা অত সোজা নয়। আজকাল পরীক্ষার দ্বারা বুঝেছি যে কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়-প্রাবল্যের সঙ্গে প্রতিরূপ বিন্যাসের সম্বন্ধ কার্যকারণের মতো সরল নয়। সম্বন্ধের নিগূঢ়তা সম্বন্ধেও আজকাল বৈজ্ঞানিকরা সন্দেহ পোষণ করছেন। আমরা জানি যে ব্যবহারিক জগতেই এমন সব ঘটনা ঘটে, এমন অভিজ্ঞতা আসে যার কোনো প্রকার কথাগত ও বস্তুগত প্রতিরূপ তৎক্ষণাৎ মনের উপর জেগে ওঠে না। আমরা এও জানি, এমন সব কথা কিংবা অভিজ্ঞতা আছে যাদের প্রতিমা তৎক্ষণাৎ ভেসে ওঠে বটে কিন্তু তার পরে সে সম্বন্ধে একটামাত্র সাধারণ বোধই রয়ে যায়। (হিন্দু বৈয়াকরণরাও বহুপূর্বে এ কথাটি জানতেন।) ধরা যাক, অতি.পরিচিত ফুল কথাটি—'ফুল' শব্দটি উচ্চারণ করলেই গোলাপ, বেল, চামেলি একটা না একটা ফুলের চেহারা অনেকেরই মনে ওঠে, কিংবা হয়তো মুগল চিত্রের কোনো বাদশাহ কি বাদশাজাদীর হাতের ফুল, না হয় বড়োদিনের উৎসবে খ্রীস্টান পরিবারে গাঁদাফুলের মালা, না হয় কারুর গলার মালার একটি ফুল। কিন্তু এইপ্রকার কথা-গত ও বস্তুগত প্রতিরূপের অতিরিক্ত অন্য একটি অনুভূতি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ঐ কথারই মধ্যে আছে— সেটি সাধারণ, অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটি ফুল নয়, কোনো বিশেষ মুখের উচ্চারিত ফুলও নয়, কোনো ব্যক্তির হাতের কী গলার ফুলও নয়। তাকে ফুলের ফুলত্ব বলা চলে। (এই অনুভূতি কারুর মতে গোড়ায়, কারুর মতে শেষে জন্মায়— সে তর্ক এখানে অবান্তর।) ফুলের অনুভূতি কিন্তু সকলেরই মতে ফুলের বস্তুগত কিংবা কথাগত প্রতিবিম্বের দু'ধাপ

দূরে, নীচে কি ওপরে সে তর্ক করেও লাভ নেই। কিন্তু তারা যে একজাতের নয়, এ সম্বন্ধে দুই মত নেই বোধহয়। পূর্বোক্ত সাধারণ বোধের কোনো স্পষ্ট আকার নেই, যেমন প্রতিবিম্বের থাকে। সেটি অন্যজাতের কী অন্তস্তরের বলেই তাকে ভাষায় কিংবা চিত্রে যথার্থ ব্যক্ত করা যায় না। জোর তার অনুবাদ চলে, ভাষায় কিংবা চিত্রে, সাধারণ থেকে বিশেষে এনে। (এইটুকুই হলো রাগরাগিণীর চিত্রের প্রকৃত সার্থকতা।) ব্যবহারিক জীবনে এইপ্রকার সাধারণ অভিজ্ঞতার অবিশেষ ও অস্পষ্ট অনুভূতি নিতান্ত কম, তাই তার প্রয়োগ কথিত ভাষায় স্বল্প, কারণ চলতি ভাষা সকলের ব্যবহারের উপযোগী হওয়া চাই। নব্য মনোবিজ্ঞানে এই অনুভূতির একটা জার্মান প্রতিশব্দ দেওয়া হয়—যার ইংরেজি awareness, যেটি cognition থেকে পৃথক।

আমার বক্তব্য এই— বিশুদ্ধ সংগীতের (যেমন যন্ত্রসংগীতের) উপকরণ কিংবা মূল বিষয় হলো কথাগত ও বস্তুগত প্রতিবিম্বের অতিরিক্ত অন্য একপ্রকার পূর্বোক্ত অ-ব্যবহারিক, অস্পষ্ট, অ-বিশেষ অনুভূতি। যখন কোনো ব্যক্তির মনে ঐ ধরনের অনুভূতি জন্মায় এবং প্রকাশ করবার তাগিদ আসে তখন সে ব্যক্তি তাকে সুরে রূপ দিতে বাধ্য; অন্তত সুরে রূপায়িত হলেই ঐ অনুভূতি প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে। (অন্তত বললাম এইজন্য যে অনেক অনুভূতি অনির্বচনীয় হতে পারে, যেমন যোগীরা বলেন।) অতএব, রসিক শ্রোতার মনেও তার ইঙ্গিত দেওয়াই সুরস্রষ্টার ধর্ম। আবার বলি, যে অনুভূতি সুরের প্রেরণা, যাকে রূপায়িত করাই সুরস্রষ্টার প্রধান কাজ সেটি ব্যবহারিক জীবনের ভাবগুলির তুলনায় অস্পষ্ট হতে বাধ্য, কারণ ব্যবহারিক জীবনের ভাবগুলি জীবনযাত্রার উপযোগী কাজে পরিণত হয় এবং সংগীতের অনুভূতি কোথায় যেন আটকে থাকে। সাহিত্যে তবু তার কর্মপরিণতি আছে কিন্তু সংগীতে মোটেই নেই। কিন্তু অত অস্পষ্ট ও অ-ব্যবহারিক ও অকর্মণ্য বলেই যে সে রূপাতীত তা নয়। তারও প্রতিমা সম্ভব। যে অভিজ্ঞতা অমন সূক্ষ্ম ও সাধারণ বোধের (awareness) ওপর প্রতিষ্ঠিত তার উপযুক্ত ভাষাও সূক্ষ্ম হতে বাধ্য। সেই ভাষার নাম সুর, তার অক্ষর স্বর, তার বিন্যাস লয়, তাল ইত্যাদি। সুর হলো imageless awareness-এর নতুন রূপ এবং উপযুক্ত প্রতিমা। এই হলো সুরের সঙ্গে সাহিত্যের ভাষাগত প্রাথমিক পার্থক্য।

তর্কের খাতিরে কেবল নয়, সত্যের তাগিদেও বিশুদ্ধ সংগীতকে (যেমন যন্ত্র-সংগীতকে) ব্যবহারিক জগৎ ও বাঙ্ময় জগৎ থেকে পৃথক রাখতে হলো। কিন্তু সেই সত্যের খাতিরেই মিলগুলি দেখাতে হবে— তবেই আমরা বাংলাগানের এবং

নতুন চালের বাংলা সংগীতরচনার মূল্য নির্ধারণ করতে পারব। সর্বপ্রকার অনুভূতির পার্থক্য ও শ্রেণীভেদের মূলে রয়েছে সেই মানুষ, তার ভাবধারা, তার প্রকাশেচ্ছা এবং সেই মানুষের মনের ওপর প্রতিক্রিয়া, ফলাফল। আর্টিস্টকে বিশিষ্ট জীবনমাত্র ভেবে আর্ট সংক্রান্ত মতবাদ খাড়া করলে সেটি অচিরে ধূলিসাৎ হয়। যদি কোনো ভদ্রলোকের দোতলা বাড়ি থাকে তবে তার পক্ষে যে-কোনো তলায় অন্তরীণবাস সুস্থ ও সহজ অবস্থায় অসম্ভব; কারণ বাড়ি তার নিজের, স্বাধীন ও সুস্থ মানুষ সে, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত কিংবা নাতিপুতির চিৎকারে বিধ্বস্তও নয়, ভদ্রলোক সারা দিনরাত পুজোও করে না— কোনো খেয়ালে সে ওপর তলায় থাকবে, কোনো ঋতুতে সে নীচে নামবে, তার মরজিকে বাদ দেওয়া যায় না। সুরস্রষ্টা ও রসিক শ্রোতা উভয়কেই এইভাবে দেখতে হবে। যে রসতাত্ত্বিক মানুষকে বাদ দিয়ে রস বিচার করে তার নিজের অনুভূতিই অসম্পূর্ণ। সোজা কথা এই— একই মানুষ কথা কয়, কাজ করে, গান গায়, গান শোনে। কথাগত, বস্তুগত, সুরগত অনুভূতি একই মানুষের সম্পদ ও স্বভাব। জীবনটা বিশ্ববিদ্যালয় নয় যে বিশেষজ্ঞ হলেই মূর্খ ও অন্ধ হতে হবে। অতএব মানুষ যেকালে একটি আস্ত গোটা জীব, তখন তার কোনো বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে গেলে তার অখণ্ডত্বকে, শাস্ত্রের ভাষায়, তার বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবকে একত্রে ধরতে হবে। এই হলো প্রথম যোগ, সুরের সঙ্গে কথার, অর্থাৎ মানুষের দিক থেকে।

সুরানুভূতির উপযুক্ত প্রতিমা স্বরবিন্যাস— কথাও নয়, চিত্রও নয়, পূর্বে বলেছি। সেই সঙ্গে আরো বলেছি যে কোনো কোনো কথার মধ্যেই কথা ও বস্তুগত প্রতিবিম্বকে অতিক্রম করবার শক্তি রয়েছে। অবশ্য কম বেশি আছে— এবং সেটি নির্ভর করছে কথার ভাষানুষঙ্গ এবং বিন্যাসের মধ্যে তার বিশেষ অবস্থিতির ওপর। বিন্যাস, ছন্দ প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। সহচারী, অনুষঙ্গ আসক্ত ভাবেরই উল্লেখ করছি, ইংরেজিতে যাকে association বলা হয়। ঐ 'ফুল' কথাটিই ধরা যাক— ধীরাজের একখানি বিখ্যাত বসন্তের ধামার বাংলায় খুব প্রচলিত— ভ্রমরা ফুলি বনোয়ারী ইত্যাদি। এই গানের 'ফুল' কথাটি চামেলি বেলা চম্পা নয়— এর নাম নেই, গন্ধ নেই, এররূপ নি সা ঋ সা নি ধা ক্ষা— কী ঐ ধরনের একটা স্বরবিন্যাস। কিন্তু উচ্চারণের বেলা সেটি ফুলি— অন্য কিছু নয়, এবং হিন্দুস্থানী কিংবা বাংলা যে ভাবেই উচ্চারণ করাই যাক না কেন, শব্দটি শুনে ফুল ভিন্ন ফলের কথা মনে হবেই না। আমার বক্তব্য হলো এই— ঐ ললিতাঙ্গের বসন্তরাগের নিতান্ত পরিচিত গানে 'ফুলি' শব্দটি থাকার দরুন

এবং বসন্ত ঋতুতে ফুলের বাহার হয় এই সাধারণ অভিজ্ঞতার জন্য কোনো নতুন কবিতায় যদি 'ফুল' কথাটি প্রথমেই থাকে এবং সেই কবিতাকে যদি সুরে বসাতে হয় তবে তাকে বসন্তরাগেই বসাতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। শ্রোতা যদি গানটি জানেন তখন তিনিও সম্ভবত কবিতাটিতে ললিতাঙ্গের বসন্তরাগ প্রত্যাশা করবেন। স্রষ্টার রচনা এবং শ্রোতার প্রতীক্ষা— দু'এর মিলনে গানটি সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। তবেই দেখা গেল যে মানুষের স্মরণশক্তি এবং পূর্বপরিচয় থাকার জন্য সুরস্রষ্টা তাঁর অস্পষ্ট অনুভূতিকে রূপ দেবার সময় যথাযথ কথাকে আশ্রয় ও গ্রহণ করলে রসসৃষ্টির কোনো বাধা ঘটে না। অন্তত শ্রোতার পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। অর্থাৎ কথার সাংগীতিক আভাসকে গায়ককে শ্রদ্ধা করতেই হবে।

যথাযথ কথা সম্বন্ধে আরেকটি মন্তব্য করতে চাই। কোনো কথার ব্যবহারিক অর্থ যদি সুস্পষ্টভাবে কোনো বস্তুর কিংবা অন্য কোনো শব্দসমাবেশের প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তোলে তবে স্বভাবতই সে কথা গানে অচল হবে, কারণ ওই ধরনের প্রতিবিম্বকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যা। সেইজন্যই বোধহয় শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় দুর্বোধ্য কথার বদলে পুরাতন ও পরিচিত কথারই প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে শ্রোতার দাবী খুব বেশি।

কারণ, শ্রোতা পৃথিবীতে থাকবেই, এবং শ্রোতার আর রচয়িতার রসাভিজ্ঞতার মিলন ভিন্ন রস জন্মায় না। অতএব শ্রোতার অভিজ্ঞতা প্রাথমিক না হলেও (হঠাৎ বড়োলোকের বাড়িতে কিন্তু প্রাথমিক) তাকে স্বীকার করতেই হবে; অতএব তার মনে সুরস্রষ্টার প্রাথমিক অনুভূতি উৎপন্ন ও বহন করবার জন্য তারই সুবিধানুযায়ী কিছু না কিছু রফা করা চাই। আসরে গায়ক-বাদক একজন কি দুজন, শ্রোতা অনেক। অতএব নানাধরনের (ভদ্র) শ্রোতা থাকতে বাধ্য — তাদের মানসিক প্রকৃতির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বোধগম্য যে শব্দ তাকেই আশ্রয় করতে হবে— তবেই সুরের ধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে না। মজা এই যে ওই ধরনের কথার আর কোনো বিশেষ বস্তুগত প্রতিবিম্ব থাকে না। কানুহাইয়ার হাতে তখন বাঁশি থাকে না, মাথার চূড়াও উড়ে যায়— থাকে স্বরবর্ণের সাজ, যার ওপর তানের ঝলক খোলে ভালো। তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে' গানটির প্রত্যেক শব্দ কোনো প্রতিরূপ সৃষ্টি করে না, শ্রোতাকে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত করে না। শ্রোতা যদি গানটি শুনে চুপ করে বসে থাকেন তবে সেটা মানুষ যে চিড়িয়া নয় ভেবে নয়।

এতক্ষণ আমি 'কথার' কথা কয়েছি। কিন্তু কবিতা কেবল পর পর কথার গোছা নয়। আমি আমার যুক্তির সূত্রটি আবার ধরিয়ে দিচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য

সুরের এবং কথার মিলনক্ষেত্রটি জরিপ করা, 'পূর্বে গরমিল কোথায় দেখিয়েছি। আমি গদ্য বাদ দিলাম— যদিও তার ঝংকার আছে এবং আবৃত্তির সময় সেটি মেনে চলতে হয়। দীর্ঘ কবিতার, চারণ-গানের, লোকসংগীতের, গজলের অনেকাংশ সুরে আবৃত্তি করা হয়। আমি সে অংশগুলিকেও ধরছি না। আমার বিষয় গীতিকবিতা, বিশেষ করে নতুন ধরনের বাংলা গীতিকবিতা। কবিতার কথা নিয়ে আলোচনা করেছি, এবার তার অন্য দিকটা দেখব। আমরা অনেকেই এমন একাধিক কবিতার সঙ্গে পরিচিত যার অর্থ গদ্যের বাক্যে পরিণত করা যায় না। 'তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়, হায়রে হায়, বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায়রে হায়'— গানটি আবার স্মরণ করুন। মরমী কবিতা প্রায় সবই ওই ধরনের। সুরের রেশ ধরে মরমী কবি গুহ্য জগতে প্রবেশ করেন। বিদেশী সিম্‌বলিস্ট কবিদের অন্য কোনো রাজ্যে যাবার প্রয়োজন নেই— প্রতিমা সাজানই তাঁদের মতে কবির একমাত্র উপযোগী কাজ। কিন্তু তাঁদের প্রতিমাগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অব্যবহারিক ও অনাবশ্যক। তাই কোনো সিম্‌বলিস্ট কবিতার গদ্যে সারার্থপ্রকাশ অসম্ভব। একাধিক সমালোচকের মতে সুরের দিকে ঝোঁকের এবং গদ্যের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে পরিণত হবার অক্ষমতার মাত্রাই কবিতার সার্থকতা প্রতিপন্ন করে। ঐ মন্তব্যের সারাংশ হলো এই : কবিতার শব্দবিন্যাস চিন্তাধারাকে তর্কযুক্তির অপর পারে নিয়ে যায়, বস্তুর এবং ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনীয় ভাববস্তুর অন্য কিনারে ; তখন বস্তুগত প্রতিবিম্ব লোপ পায় বলা চলে— কিন্তু শব্দগত প্রতিবিম্ব লোপ পায় না, কারণ শব্দের দুটি ইঙ্গিত আছে— একটি অর্থ, অন্যটি শব্দগত ব্যঞ্জনা। যে সুরস্রষ্টা কবিতার সুর বসাচ্ছেন তিনি ব্যঞ্জনাকেই প্রকট করবেন। কিন্তু কবিতার অর্থ তখনও একেবারে লুপ্ত হচ্ছে না, সুর বসাবার মুহূর্তে হয়তো লোপ পাচ্ছে— কিন্তু তার পূর্বে নয়, এবং অন্তত গানটি শোনবার সময় শ্রোতার মনেও পুরোপুরি নয়। অর্থ তখন উহ্য, লুকিয়ে রয়েছে। যেই শ্রোতাকে গানটি কেমন লাগল, এবং রচয়িতাকে, এই কবিতায় ঐ সুরটি বসানো হলো কেন প্রশ্ন করা হয় তখন সুররসিককে অর্থের উপযোগিতার উল্লেখ করতে হয়। তবু সেটা হয়তো সুরগত উপযোগিতা না-ও হতে পারে। তাই শব্দের বেলা যেমন বলছি তেমনই কবিতার বেলাতেও বলি ; যে শব্দ যত পরিমাণে অর্থ কিংবা বস্তুকে অতিক্রম করবার শক্তি ধারণ করে সেই শব্দ তত পরিমাণে গীতে সহায়ক, এবং সেইপ্রকার শব্দবাহী, শব্দবিন্যস্ত কবিতাই ততটা পরিমাণে সুররচনার উপযুক্ত বাহন।

তবুও কবিতা হলো না। কবিতায় শব্দ, শব্দবিন্যাস ছাড়া আরো কিছু থাকা চাই

— তার সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ কি ? প্রত্যেক কবিতায় বিশেষত গীতিকবিতার একটি মূলভাব থাকে। আলংকারিকরা তাকে স্থায়ীভাব বলেছেন। কারণ, যখন কার্য ও সহকারী সম্বন্ধ আলম্বন ও আধার এই দুই বিভাব, এবং অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব সাহিত্যে প্রকট হয় এবং যখন তারা কোনো স্থায়ী ভাবকে আশ্রয় করে তখনই, কাব্যপ্রকাশের মতে, রসের উদ্ভব হয়। একটি কবিতায় স্থায়ীভাব সাধারণত একটি, তবে একাধিকও সম্ভব। (ইংরেজি ভাষায় যেমন mood-এর মধ্যে একাধিক felling থাকতে পারে। Temper, অর্থাৎ মেজাজ ক্রিয়াপদ্ধতির কথা। রসবিচারে এই তিনটি বিভাগ মানতেই হয়।) সাহিত্যে সব স্থায়ীভাবকে সুরে প্রকাশ করা যায় না, অন্তত উচিত নয় মনে হয়। হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি দেখে মোটামুটি বলা চলে যে তথ্য কি তত্ত্বপূর্ণ কবিতা উৎকৃষ্ট হলেও হিন্দুস্থানী ঢঙের তানকর্তব পূর্ণ খেয়ালে অচল। ধ্রুপদে হয়তো চলতে পারে। (মিস্টিক্ কবিতার ইঙ্গিত করছি না।) দার্শনিক কবিতার প্রতিপাদ্যটি মূলভাব ও প্রকৃতির অপেক্ষা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কবিতা বুঝতেই যদি বেগ পেতে হয় তবে সেটা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হতে পারে না। তেমনই কবিতা শুনেই যদি তৎক্ষণাৎ কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয়, তার মধ্যে যদি উপদেশ থাকে, (শেষের সেদিন করবে স্মরণ), কিংবা সেটি যদি জ্ঞাতব্য বিষয়ে ভারাক্রান্ত হয় তবে তাকে আবৃত্তি করাই ভালো। কর্মপ্রবৃত্তির প্রতিরূপগুলি বস্তুগত, তর্কপ্রবৃত্তির প্রতিরূপগুলি কথাগতই হয়ে থাকে। গীতিকবিতার অর্থ বোঝবার তাড়া নেই, কাজ করবার হুকুমও নেই। আছে খেয়াল, খামখেয়াল, যেটি গম্ভীর হলেও চলবে — কিন্তু সুগভীর চিন্তাধারা হলে চলবে না, হাল্‌কা হলেও চলবে কিন্তু তার উত্তেজনায় নেচে উঠলে চলবে না। বিশুদ্ধ বাংলাতে বলি— থাকবে mood, proposition নয়, incentive to action কিংবা line of conduct-ও নয়। পদকর্তাদের অনেক পদই আধ্যাত্মিক, কিন্তু কীর্তনিয়া ঠাকুর মূলভাবকে— যেমন মান, বিরহ প্রভৃতিকে গ্রাহ্য করে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পদও যদি গান তবু সংগীতরস সৃষ্টি করতে পারেন না। ঠিক এই কারণেই লোক-সংগীতের ভাষা সহজ, সুরও তাই সহজ। ঠুংরীতেও এইপ্রকার স্থায়ীভাব আছে— তাদের নায়িকা বলে। অতুলপ্রসাদের কবিতা দর্শনের দিক থেকে বুদ্ধিকে সদাজাগ্রত নাও রাখতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রত্যেক রচনা এক-একটি খেয়াল-প্রসূত— তাই সুরগত রূপের অভাবে অপূর্ণ। তাঁর কোনো কবিতাই স্বাবলম্বী নয়, মনে হয়। 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে ?' এর মধ্যে তত্ত্ব নেই—কেবল তাই নয়— প্রশ্নটির সমাধানের ওপর— কিংবা তিনি এলে তাঁকে অভিনন্দন ও সমুচিত অভ্যর্থনার ওপর গানটির সার্থকতা নির্ভর করছে কি ?

সুরের জন্যেই এই গীতিকবিতাটি যেন প্রতীক্ষা করছে, কোনো মহিলার জন্যে নয়।

আমার বক্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ জয়দেবের একটি পদ উদ্ধার করছি।*

বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্।
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥

সখী রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে উত্তেজিত করছেন। এই পদের ছন্দলালিত্য, শব্দের ঝংকার কেবল রাধিকা কেন সকল শ্রোতারই মন হরণ করে। এই পদ অগ্রাহ্য (এমন-কি অন্যায় অর্থাৎ অহিন্দু)— প্রধান কারণ, তার লালিত্য উপভোগে কর্মপ্রবৃত্তি হত হয়। জয়দেব বসন্তরাগে পদটিকে গাইতে অনুরোধ করেছেন— তাল দিয়েছেন ঝাঁপ। ওধারে রত্নাকরে কি আছে শুনুন:

বসন্তে প্রহরে তুর্য্যে মকরধ্বজ বল্লভঃ
সম্ভোগ বিনিয়োক্তব্য বসন্তঃ তৎসমুদ্ভবঃ।

অর্থাৎ গ্রন্থকার (সংস্কৃত যখন তখন ঋষি) শৃঙ্গার নামক স্থায়ীভাবের সম্ভোগাংশে বসন্তরাগকেই উপযুক্ত বলেছেন। (দেখা যাচ্ছে স্থায়ীভাবেরও প্রকারভেদ স্বীকৃত হয়েছে।) শৃঙ্গারের অন্য প্রকারে শার্ঙ্গদেব বরাটি ও গুর্জরী অনুমোদন করেছেন। সেই অনুসারে বোধহয় জয়দেবও অন্যপদে বরাটি ও গুর্জরী বসিয়েছেন। আলংকারিকরা সাধারণত সাহিত্যরসেরই রসিক ছিলেন, কিন্তু সংগীতশাস্ত্রবিদের উপদেশ কবিরাও গ্রহণ করতেন দেখা যাচ্ছে।

এখনকার কবি কার উপদেশ গ্রহণ করবেন? শার্ঙ্গদেব নেই, তাঁর বদলে আছে গোটাকয়েক সংগীত সংক্রান্ত সংস্কার। সংস্কারে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও গোটাকয়েক মূল ধারা আছে। সেই ধারাগুলি আমাদের মনের মধ্য দিয়ে বইছে। তাদের অস্বীকার করা যায় না। (রবীন্দ্রনাথ তাদের নব্যসংগীতের ভূমিকা, এবং সে ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব বলেছেন।)** একটি মূল সংস্কারের উল্লেখ করছি। পুরাতন সংগীতে বর্ষার গান প্রায়ই মল্লারে গাওয়া হতো এবং

* আমার একটি ছাত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর পন্ত এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত সম্বন্ধে Research Fellow হয়েছেন। ম্যারিস কলেজেও সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী ও খেয়ালী— সর্ববিষয়ে আমাদের গৌরব।

** সুর ও সংগতি

বর্ষার কবিতায় স্থায়ীভাব ছিল বিষাদ। এই 'প্রবীণা প্রথা'র প্রভাব স্বীকার করাই স্বাভাবিক, কবির ও সুররচয়িতার পক্ষে। অস্বীকার করলে পুরাতনের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়, বিচ্ছিন্ন হলে অভ্যস্ত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ছকগুলি যায় উল্‌টেপাল্‌টে, অতএব অন্তত শ্রোতার অস্বস্তি হয়। পুরাতন ছকের পরিবর্তে নতুন ছক চাই, সেজন্য চাই সময় ও দৈবশক্তি।

অতএব, মোটামুটি বলা চলে, সার্থক পরিবর্তনেই সুররচয়িতার স্বকীয় প্রতিভা পরীক্ষিত হবে। কিন্তু সকলের প্রতিভা থাকে না, তাই সংস্কারকে মেনে চলতেই সুবিধা। সব সংস্কারকে নয়, মূল ও প্রধান সংস্কারকে। রবীন্দ্রনাথের দুটি বর্ষার গানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা। হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা…' গানটি মল্লারে (দু' একটি স্থান ছাড়া) এবং 'আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে, আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে…' এই গানটি ইমনে। প্রথম গানটিতে বিষাদ হলো স্থায়ী ভাব, তাই সংস্কার অনুসারে সুররচয়িতার মনে মল্লার ফুটে উঠল। দ্বিতীয়টিতে শ্রাবণের উল্লাস হলো স্থায়ীভাব, মল্লার এখানে অনুযুক্ত, এলো ইমন, তাও আবার ইমনের পরিচিত অভিব্যক্তি নয়, ইমনের সুর-প্রকৃতি বজায় রেখে তার গতিপদ্ধতিকে কবিতায় বর্ণিত উল্লাসের অনুযায়ী ইমনের রূপ। 'ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে, ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে, বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে, হৃদয় মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে…' ইত্যাদি বাক্য কয়টির ভাব ও সুরের গতি স্মরণ করুন। শেষের গানটির দ্রুত তেওড়া তাল ভাবের ব্যস্তসমস্ত রূপটি ফুটিয়ে তুলেছে। তবু স্বীকার করতে হবে যে প্রথমটির শব্দ ও সুর সংস্কারের সহযোগেই আমাদের অধিকতর প্রিয়, নচেত উপযোগিতার, অর্থাৎ সৃষ্টির দিক থেকে দ্বিতীয়টি সত্যিই অতুলনীয়।

পূর্বে যা বললাম সে অত্যন্ত মোটামুটি ভাবে। বর্ষার কবিতায় একাধিক ভাব ছিল, আছে ও থাকবে। বর্ষার ভিন্নভাবের কবিতায় মল্লারের ভিন্নরূপ এবং মল্লার ভিন্ন অন্য রাগরাগিণীরও সাক্ষাৎ পাই। নচেত অত রকমের মল্লার, মল্লারের সঙ্গে অন্য রাগিণীর মিশ্রণের কোনো অর্থই থাকে না, নচেত সাহিত্যও একঘেয়ে হয়ে উঠত। আজকালের তো কথাই নেই। আজকাল মনের নকশা নতুন ধরনের তৈরি হচ্ছে, সাহিত্য ও সংগীতের সংস্কার পরিবর্তিত হচ্ছে, যদিও তার মূল একেবারে উৎপাটিত হয়নি। স্থায়ীভাবের চুলচেরা ভাগ চলছে, রাগিণীর মিশ্রণ চলছে, নতুন মিশ্রণ ও ঢঙ্-এর প্রয়োজন অনুভব করছি। অতএব মূল কিংবা স্থায়ীভাবে বৈচিত্র্য আসা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাকে শৃঙ্গারের দৃষ্টান্ত বলা চলে কি?

এবার সংগীতের সংস্কারের দিক থেকে সাহিত্যিক ভাবপরিবর্তনের উপযোগী সুরমিশ্রণের তত্ত্ব নির্দেশ করতে হবে। এতক্ষণ যা বলছি তাই থেকে প্রমাণ হয় যে কবিতার মেজাজ দেখে বোঝা যাবে যে সেটি কোন শ্রেণীর রাগরূপ ধারণ করতে সমর্থ। এর বেশি সবিস্তার বলা অসম্ভব। কারণ, যদি কবিতার প্রত্যেক লাইনের সূক্ষ্ম ভাবের উপযোগী স্বরবিন্যাস কি বিকাশ পদ্ধতি খুঁজতে হয় তবে সংগীতের অপমান করা হয়। সংগীত যদি ছোটো ছোটো সাহিত্যিক ভাবের প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে ওঠে তখন সংগীত আর সংগীত থাকে না, অনুবাদে পরিণত হয়। অর্থাৎ একটি ছোট্ট কবিতাও পালাকীর্তন হয়ে ওঠে। চিত্রশিল্পে আমরা এতদিন অনুবাদের যুগে ছিলাম— তাকে realism বলা হতো— তার ফলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে, সংগীতে আর ঐ প্রকারের ক্ষতি আনতে চাই না। 'ভাও বাতলানো' দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু সেটা নাচের অঙ্গ।

সে কথা থাক : আমাদের সংগীতের সংস্কারগুলিতে মিশ্রণের রীতি কিভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে আলোচনা করা যাক। সেই রীতিগুলিই প্রধানত বাংলা গীতি-কবিতার উপযোগী সুররচনার পদ্ধতি কী হবে বলে দেবে এবং বর্তমান সুররচনার সমালোচনাও করবে। আমরা জানি যে গোটাকয়েক রাগিণী কাছাকাছি থাকতে চায়। যেমন বসন্ত, ললিত, পরজ ও সোহিনী ; কেদার, হাম্বীর, ছায়ানট, কামোদ, শ্যাম ; দেশ, সুরট, মল্লার ; বেলাওল, আলাহিয়া ; কানাড়া, বাগেশ্রী, আড়ানা ; খাম্বাজ, ঝিঁঝিঁট, খাম্বাবতী ; টোড়ি, ভৈরবী, আশোয়ারী ; রামকেলী, ভৈরো, কালাংড়া প্রভৃতি। অতএব বলা চলে, যদি কোনো কবিতার মেজাজ অনুসারে বসন্ত না লাগে তবে তার কাছাকাছি কোনো সুর, যেমন পরজ, বসালে বিশেষ ক্ষতি হয় না। যদি কবিতার একটির অধিক দুটি স্থায়ীভাব থাকে এবং সে দুটি যদি বিপরীত না হয় তবে রাগসান্নিধ্য কিংবা ঠাট অনুসারে রাগমিশ্রণই বাঞ্ছনীয়। ভৈরবীর সঙ্গে হিন্দোল খাপ খায় না, যতই ঠাট সম্বন্ধে মতভেদ থাক না কেন। আমার বিশ্বাস রাগরাগিণী সম্বন্ধে সংস্কারের ঐক্য অনৈক্যের অপেক্ষা বেশি। (যেমন হিন্দু-মুসলমানের পারিবারিক দায়িত্ববোধ আচারের ভিন্নতাকে অতিক্রম করে।) কবিতায় নিতান্ত বিপরীত ভাব থাকলে কবিতাটিই বোধহয় গীতিকবিতা হিসেবে সার্থক হয় না। তবু ভাব-পরিবর্তন মানতেই হয়, অন্তত এই যুগের সাহিত্যিক মনোভাবে।

কবিতায় ভাবপরিবর্তনের উপযোগী রাগিণীমিশ্রণের অন্য একটি মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের সংগীতপদ্ধতির কালবিভাগে। কালবিভাগের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা জানি না ; অর্থাৎ ভৈঁরোর কোমল রে ও কোমল

ধা শুনলে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে এমন নিয়ম আছে বলে জানা নেই। ওটা আমাদের সংস্কার, অত্যন্ত পুরাতন না হলেও প্রায় ৩০০ বৎসরের, তাই আজ্ঞার মতনই মনে হয়। আমি এই সংস্কারের বিশ্লেষণ করছি।

রে গা ও ধা শুদ্ধ—চড়াদিকে সন্ধ্যা ৭-১২ পর্যন্ত,

পূর্বরাগ ; যেমন ইমন কল্যাণ।

নীচের দিকে সকাল ৭-১২ পর্যন্ত

উত্তররাগ ; যেমন বিলাওল,

দেশকার।

রে কোমল—গা ও নি শুদ্ধ

বিকাল বেলা ৪-৭টা পূর্বরাগ ; পুরবী

ভোর বেলা ৪-৭টা উত্তররাগ, ভৈরোঁ।

গা ও নি কোমল—রাত ১২-৪ পূর্বরাগ ; আড়ানা, কানাড়া,

দিন দুপুর ১২-৪ উত্তররাগ ; দেশী।

এই ধরনের একটা কালচক্র আমরা সকলেই লক্ষ করি। তা ছাড়া সন্ধিরাগ, অর্থাৎ ভোর ও সন্ধ্যার রাগের মিল সকলেরই কানে পড়ে। সকালের বিলাওল, সন্ধ্যার কল্যাণ, দুপুরবেলার সারং, দুপুররাতের আড়ানা, সকালের জৌনপুরী ও দেশকার, রাতের কানাড়া ও ভূপালির সাদৃশ্য কে না জানে? অতএব কবিতার ভাবপরিবর্তন কিংবা মিশ্রণের জন্য যদি রাগপরিবর্তন ও মিশ্রণের প্রয়োজন হয় তবে উত্তররাগের সঙ্গে পূর্বরাগের মিলনই শোভন। রাগিণীর সংস্কারের বাধা ভয়ানক বাধা, চালাকি করে সংস্কারের আধিপত্য নষ্ট করতে হয়। কতটা ভাঙন বরদাস্ত হয় তারই ওপর নতুন সৃষ্টির সার্থকতা নির্ভর করে। চিরকাল ওস্তাদবৃন্দ তাই ক'রে এসেছেন। যে কোনো পরিচিত একটি মিশ্র রাগিণীর বিশ্লেষণ করলে তার উপাদান স্বরূপ ভিন্ন রাগিণীর মিলনযোগ্য অঙ্গ ধরা পড়ে, যেমন আড়ানা-বাহার। শংকরার মতন খানদানী রাগিণীর নীচের অংশ কল্যাণ, ওপরের অংশ বেহাগ, আড়ানায় কানাড়া ও সারং রয়েছে।

রাগিণীমিশ্রণের একটা সংস্কারগত রীতি গড়ে উঠেছে ওস্তাদের মুখনিঃসৃত রাগমালার ভেতর দিয়ে। ধরা যাক খাম্বাজ শ্রেণী কিংবা ঠাটের রাগিণীগুলিকে। খাম্বাজ ধরছি এই কারণে যে খাম্বাজের সহচারী বিশেষ কোনো সাহিত্যিক স্থায়ীভাব নেই, যেমন বসন্ত রাগের আছে। তাই বোধহয় খাম্বাজকে নানা রূপ

দেওয়া যায়, তার বিখ্যাত ধ্রুপদ, খেয়াল আছে, আবার টপ্পা ঠুংরী আছে এবং খাম্বাজের সঙ্গে অনেক সুর বেমালুম মিশে যায়, যেমন ঠুংরীতে শুনেছি। নিশাসাগ, লচ্ছাসাগ কি জিলা ধরছি না। তবু খাম্বাজের সমশ্রেণীর ও কাছাকাছি অন্তত গোটা ছয়েক রাগিণী আছে— ঝিঁঝিঁট, তিলং, রাগেশ্বরী (মতভেদ ও প্রকার-ভেদ আছে), খাম্বাবতী (দু রকমের শুনেছি), দুর্গা-খাম্বাজ, গারা। এদের প্রত্যেকের বাদীস্বর গান্ধার, যেমন খাম্বাজের আর একটু দূরে, অথচ বেশি দূরে নয়, আরো ৪টি রাগিণী রয়েছে যেমন দেশ, সুরট, তিলককামোদ ও জয়জয়ন্তী। এদের প্রত্যেকের বাদীস্বর রেখাব। যাঁরা রাগমালা শুনেছেন মন দিয়ে তাঁরাই জানেন যে প্রথম ছয়টির যে কোনোটি থেকে শেষ চারটির যে কোনো রাগিণীতে যাওয়া যায়— যদি বিবাদী স্বর না বাধা দেয়। সোজা উপায় ও প্রধান উপায় হলো গান্ধার থেকে রেখাবে নামা। তেমনই শেষের চারটির একটি থেকে পূর্বের ছয়টির যে কোনোটিতে যাওয়া যায়, যদি বিবাদী স্বর আপত্তি না তোলে। জয়-জয়ন্তী খাম্বাজের ঘর থেকে কাফি ঠাটের ঘরে যাবার রাস্তা দেখাচ্ছে। তাই একে পরমেলপ্রবেশক রাগ বলা হয়। এমনি বাদী সম্বাদীর সামান্য অদল বদলে রাগমালা তৈরি হয় এবং মালা তৈরি হবার সময় সুতো ছেঁড়ে না। বাদী-সম্বাদী ও বিবাদী সংস্কারের স্ফটিক মূর্তি। না ভেঙে, বেঁকিয়ে চুরিয়ে দেখলেও অনেক রঙই চোখে পড়ে।

এতক্ষণ সুরের ও সুরমিশ্রণের হিসাব দিলাম, নিতান্ত আংশিকভাবে। আবার গীতিকবিতায় ফিরে যাওয়া যাক। তার শব্দের প্রকৃতি ও নিজের স্থায়ীভাব নিয়ে সামান্য কিছু বলেছি— একটি দরকারী বিষয় বাদ পড়েছে, সেটা স্বরোচ্চারণ পদ্ধতি। গান গাইবার সময়কার উচ্চারণ পদ্ধতি নিয়ে গোটাকয়েক মন্তব্য পেশ করছি। বিশেষ আলোচনা শব্দতাত্ত্বিকের কাছে পাওয়া যাবে।

(১) আমাদের ভাষায় গুণবাচক বিশেষ্য কম, তাই কবিতায় বস্তুবাচক বিশেষ্যই ব্যবহার করতে হয়। অথচ বস্তুগত প্রতিমা ঠিক সংগীতধর্মী নয়। সেইজন্য গান গাইবার সময় বাংলা কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা বোধ হয় উচিত নয়। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদে হিন্দীকথা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, হলে সুরের বিকাশ হয়, ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক। অবশ্য প্রচলিত কথার এবং একাধিক স্বরবর্ণযুক্ত ও স্বরান্ত কথার বিপদ কম। আমাদের বিশেষণগুলিকে উপযোগী করতে হলে টেনে লম্বা করতে হয়, নচেত সংস্কৃত বিশেষণের আশ্রয় নিতে হয়। বৈজু বাওরার বিখ্যাত ইমনের ধ্রুপদ—

সুন্দর অতি নবীন প্রবীণ মহাচতুর নার

মৃগনয়নী মনহরণী চম্পক বরণী বায়
কেশরী কটি কদলী জঙ্ঘা, নাভি সরোজ শ্রীফল উরোজ,
চন্দ্রবদনী, শুকনাসিকা, ভোঁহ ধনুষ কাম চার ইত্যাদি।

এই পদের বিশেষণগুলি এত ঘন গাঢ় যেন মনে হয় এক-একটি শব্দ স্বয়ম্ভূ এবং তার প্রত্যেকটিকে খাতির না করে থাকা যায় না। কেবল তাই নয়, শুকনাসিকা কিংবা শ্রীফল উরোজ উচ্চারণ করলে শুকপক্ষী কিংবা কাঁচা কি পাকা বেলের চিত্র মনে ওঠেই না। কবিতা হিসাবে পদটি উচ্চশ্রেণীর নয়, কিন্তু উচ্চারণ-পদ্ধতির দরুণ, তার লঘুগুরু ভেদের জন্য, তার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসের জন্য গীতিকবিতা হিসাবে চমৎকার। প্রচলিত বিশেষণ কবির স্বকীয়তার বিরোধী— কিন্তু অতি-প্রচলনেই বোধহয় সুর-রচয়িতার সুবিধা। সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হলেও পুরাতন বিশেষণগুলি অর্থজ্ঞাপন ক'রে সংগীতরসের বিঘ্ন ঘটায় না। কোথায় যেন উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার সঙ্গে আধুনিক উৎকৃষ্ট কবিতার বিরোধ আছে।

(২) আমাদের ভাষা উচ্চারণে স্বরবর্ণের অপেক্ষা ব্যঞ্জনবর্ণের ও যুক্তবর্ণের ভিড় বেশি। সেইজন্য তানের স্থান সংকীর্ণ এবং ছোট্ট গমকের অবসর আছে। বড়ো গমকের স্থান মোটেই নেই মনে হয়।

(৩) যদি ভিন্ন অর্থ সূচনা করবার প্রয়োজন হয় তবে আমাদের স্বরবর্ণের হ্রস্বতায় ও দৈর্ঘ্যে কোনো তারতম্য ঘটে না, যেমন ঘটে হিন্দীতে। দিনকাল ও দীনদুঃখী কথা দুটি একই ওজনে আমরা উচ্চারণ করি। তাই বাংলা গান একটু একঘেয়ে মনে হয়। সেটা সামলানো যায় হ্রস্বদীর্ঘ মেনে চললে।

(৪) ক্রিয়াপদ আমাদের নিতান্ত কম। সেগুলি বাদ দিলে বাংলা স্বরান্তশব্দ আরো কমে যায়। সবই প্রায় হসন্তান্ত, অতএব,— য় জুড়ে দিতেই হয়। অতএব তানের স্থান বাংলাগানে আরো কম হতে বাধ্য।

মোটামুটি বলা চলে বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের সংকোচের জন্য, তার শ্বাসগুচ্ছের প্রকৃতির জন্য বাংলা গানের উচ্চারণ পদ্ধতি হিন্দীভাষার গানের উচ্চারণ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। অতএব বাংলা গানে যে-কোনো কথাকে তানকর্তব বাটোয়ারা দেখাবার ছুতো হিসেবে ব্যবহার করা অন্যায়। ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুগ্মধ্বনির আধিক্যের জন্য বাংলা গান বোধহয় ধ্রুপদের ও ধ্রুপদ-ঘেঁষা খেয়ালেরই অনুকূল। ছোট্ট গমক, মীড়, আশ ও ছোট্ট তান সংবলিত যে কোনো গায়নপদ্ধতি বাংলা গীতিকবিতায় চমৎকার খাপ খায়। নিধুবাবুর টপ্পায় শোরী মিঁঞার টপ্পার মতন তানের আধিক্য নেই। অতুলপ্রসাদ যখন নিজের গান গাইতেন তখন কি সুন্দরভাবে বিরাম দিতেন তা যিনি শুনেছেন তিনি আর জীবনে ভুলবেন না।

আমি বাংলা গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সম্বন্ধের একটা মোটমুটি বিচার করলাম। আমার বক্তব্যের সূক্ষ্ম বিচার বিশেষজ্ঞরা করুন। বাংলাদেশে গানের সাড়া পড়েছে, এই প্রবাসেরই ডাকে। আপনারাই তার উত্তর দিন, কারণ আপনারা এদেশের ভাষাও জানেন, বাংলাভাষাও ভোলেন নি। আপনারা, অর্থাৎ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ এই অঞ্চলের ভাষা, তার উচ্চারণপদ্ধতি, তার গান গায়ন-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাভাষা ও সংগীতের তুলনামূলক বিচার করুন, তবেই একসঙ্গে সংগীতের ও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হবে। আমার ওস্তাদ সবচেয়ে বড়ো, তোমার ওস্তাদ সুর ও তালকানা— এই মন্তব্য প্রকাশের বাইরেই সংগীতের প্রকৃত সমালোচনা শুরু হবে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সংগীত শাখার কর্তব্য নয় বাংলা গায়নপদ্ধতিকে কিংবা বাংলা গানকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করা। তার উন্নতি কিসে হয় তাই দেখতে হবে— সেজন্য চাই ভাষা ও সুরের তুলনামূলক বিচার। সাহিত্য শাখায় কয়টি শব্দতত্ত্বের প্রবন্ধ আসে জানতে চাই। সংগীত শাখায় তো কোনো প্রবন্ধই আসে না।

আমার লেখায় একটা বদনাম আছে— তাতে কোনো সিদ্ধান্ত থাকে না এবং বোঝাও যায় না স্পষ্টভাবে। অন্য লেখার বিপক্ষে এই নালিশের জবাব দেব না — কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি নাচার। ক্ষেত্রটি কথা ও সুরের সীমান্ত প্রদেশ— তাই এখানকার রীতিনীতি সুশাসিত প্রদেশের মতন নয়। আর কী সিদ্ধান্তে আসব? আমিও খুঁজছি, আসুন আপনারাও খুঁজুন, কিছু পাওয়া যায়, ভাগাভাগি করা যাবে। একটা গল্প মনে পড়ছে: উইলিয়ম জেমসের লেকচার ছেলেরা ঠিক বুঝত না— একবার একটি ছাত্র প্রশ্ন করে, 'But then Sir, what is your conclusion?' জেম্‌স্‌ উত্তর দেন, 'But then -- is the universe coucluded that I should come to a conclusion?' অবশ্য তিনি লিখতেন চমৎকার। আমি কোনো অংশেই তাঁর মতন নই। সুসাহিত্যিক নামের প্রার্থী নই বলতে পারি না, কিন্তু নতুনভাবে চিন্তা করবার পক্ষপাত আমার একটু যেন বেশি। সে যাই হোক— দেশটা ভারতবর্ষ, আমি শিক্ষক, তাই নিজের ধর্ম ও সুনাম রক্ষার জন্যে আমার বক্তব্যগুলির নোট দিচ্ছি।

(ক) সংগীতের ইতিহাস আছে বলেই বাংলা গানকে অবহেলা করা যাবে না।

(খ) সুরের জগৎ কথার জগৎ থেকে পৃথক।

(গ) তবু এমন কথা আছে যাকে সাজালে সুরের রাজ্যে সহজে যাওয়া যায়।

(ঘ) কবিতার স্থায়ীভাব আছে।

(ঙ) রাগরাগিণীর ও সংস্কারগত ভাব আছে।

অতএব কবিতার স্থায়ীভাব ও সুরের সংস্কারগত অনুভাবের মধ্যে রফা করা চাই। রফার শর্তগুলি হিন্দু বিবাহের মন্ত্রের মতন নয়। ভাব বদলালে উপযোগী সুরও খুঁজতে হবে। যথাযথ সুরমিশ্রণেরও প্রয়োজন রয়েছে। উপযোগিতার নিয়ম গায়নপদ্ধতিতে ও বাংলা কথার বিন্যাসে ও উচ্চারণে লুকিয়ে আছে। সেই নিয়মের উদ্ধার প্রয়োজন। আমি যেগুলি উদ্ধার করতে পেরেছি সেই হিসেবে আমি দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের সুররচনাকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলি।

নৃতনাট্য চিত্রাঙ্গদা

যৌবনের চিত্রাঙ্গদা, কবির ও পাঠকের যৌবন, আর যৌবন সভ্যতার। মোহমদির তার আবিলতা, বর্ণপ্রচুর তার দৃপ্তগরিমা অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার তপোভঙ্গে প্রেমের জয় ঘোষণা; পৌরুষে নারীত্ব, নারীত্বে পৌরুষের প্রকাশ; সংযত কামনার ভদ্র পরিশেষ, বীর্যবান ক্ষত্রিয়ের মাধুর্য অর্জন, কবিপ্রতিভার সর্বতোমুখী উন্মেষ, আমাদের যৌবনাভিলাষের সর্বাঙ্গীন সিদ্ধি!

সেই চিত্রাঙ্গদা বহু বৎসর পরে অভিনীত হলো। ইতিমধ্যে কবিপ্রতিভার, সভ্যতার, পাঠকের মনের কত না বিবর্তন সংসাধিত হয়েছে। মোহ আজ বিদূরিত, বর্ণরাজি শুভ্রতায় সংকলিত, ছন্দ সুগম্ভীর, কঠোর ও বিচিত্র, গরিমা মহিমায় পরিণত; কামনার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে অন্তরের সত্য পূর্ণ ও শান্ত-জ্যোতিতে বিকশিত; মোহাবেশমুক্ত চিত্ত সহজসত্যের নিরলংকৃত সৌন্দর্যে প্রদীপ্ত। তারই আলো পড়ে দর্শকের মনে। যে-মন নিতান্ত দুর্বল সে-মন অর্জুনের ক্ষাত্রবীর্য গ্রহণে অক্ষম, কেবল তার সুমধুর প্রেমনিবেদনেই সুখানুভব করে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বীরভোগ্যা— সে যেন রবীন্দ্রপ্রতিভারই প্রতিরূপ। তার নির্দেশও সর্বজনীন। অতএব চিত্রাঙ্গদা-কাব্যের রূপপরিবর্তনে আমাদের আগ্রহ প্রকাশ কর্তব্যের শামিল।

মন মুখরিত হয় ভাষায় ও গানে। সাধারণত, ভাষা ও সুর ভিন্নস্তরের বিকাশ, অবশ্য একই মনের। কিন্তু মুখরা যখন মূক হয় তখন অঙ্গসঞ্চালনেই সেই মন নিজেকে ব্যক্ত করে। নৃত্যকলা মূকের ভাষা, অক্ষর তার প্রতি অঙ্গের মুদ্রায়, বাক্য তার দৈহিক সংগতিতে, ছন্দ তার দেহের হিল্লোলে। সে ছন্দ আবার সমগ্র কারুকলার মৌলিক লয়েরই ব্যঞ্জনা। তাই নৃত্যকলা নীরব কবির কায়িক কবিতা, সুর ও কথা তাই তার সরব সহভাবী, যেন কোনো একটি রসিক যৌথ-পরিবারভুক্ত। কিন্তু এই পরিবার দায়ভাগের, মিতাক্ষরার নয়। তাই 'নটীর পূজা'র নটীর মতন সকল আভরণ ঘুচিয়ে দেবার পরই নৃত্যকলা আপন অস্তিত্ব অর্জন করে। তখনই বাক্য হয় সংযত, সুরও হয় নৃত্যের অনুকূল। বাক্যের তাৎপর্যকে অবদমিত করবার পর যেমন সুরের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছিল, তেমনই বাক্য ও সুরের সার্থকতাকে অপ্রধান করবার পরই নৃত্যকলার স্বাধীন উন্মেষের প্রকৃত অবকাশ আবিষ্কৃত হল।

যৌবনের চিত্রাঙ্গদা-কাব্যের সম্ভার ছিল শব্দের, তার ধ্বনিসন্নিবেশ আবৃত্তিরই উপযোগী। নতুন চিত্রাঙ্গদার শব্দ, বাক্য ও ধ্বনি গৌণ, তার মুখ্যভাষা হলো নৃত্য। কাব্যাংশ বাদ পড়লেও মধ্যে রইল সংগীত। সে-সংগীত রবীন্দ্র-সংগীতের অন্তর্গত হলেও একটু নতুন ধরনের। নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার সংগীত প্রধানত নৃত্যেরই উপযোগী, যে-নৃত্য আবার নাটকীয়। অতএব সংগীত এবং নৃত্য উভয় কলাই নাট্যের গল্পাংশ উদ্‌ঘাটনকার্যে নিযুক্ত।

বোধহয়, পূর্বোক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে তার প্রত্যেকটি রচনা রাগিণীর সাধারণগুণের অধিকারী হয়েও অ-সামান্য। অর্থাৎ কোনো-প্রকারেই রবীন্দ্র-রচনা আলাপধর্মী নয়। ধরা যাক ভৈরবী; ভৈরবীর আলাপে আদি স্বরস্থাপনা থেকে তান-কর্তব, ধুন-চৌধুন ও নানাপ্রকার অলংকার সমেত বিবর্তনের স্থান আছে কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতে তার বদলে আছে নানারকমের গান, যার প্রত্যেকটি ভৈরবী, কিংবা তৎসংলগ্ন সুরের আশ্রিত কোনো রাগিণী, তবু যেটি আপন অস্তিত্বে বিশেষ। হয়তো গরীয়ান, মহীয়ান নয়, তবু নিজত্বে ভরপুর, তাই এত মধুর। তার কোনোটির সম্বন্ধে বলা চলে না যে সেটি ভৈরবীর দৃষ্টান্তস্বরূপ রচনা, তার সম্বন্ধে বলা চলে যে এই গানটিতে ভৈরবী রয়েছে। তবু কোনো রচনাই সুরে বসান কবিতা নয়, কোনো কবিতাই সুরে বসাবার জন্য লেখা হয়নি। রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষত্ব উদ্ভূত হয় যোগাযোগে, যেজন্য তাকে অন্যের পঙ্‌ক্তিতে বসান যায় না, তাকে নিয়ে যথেচ্ছাচারও চলে না।

রবীন্দ্র-সংগীতের স্বাতন্ত্র্য এতই জীবন্ত যে তাকে নৃত্যের ভাষায় অনুবাদ করলে তার ধর্মচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা বেশি। অথচ কথা-বিহীন 'তিরাণা'র নৃত্য পাখোয়াজ কিংবা বাঁয়াতবলার বোলের পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু সম্ভবপর মনে হয় না। অতএব কথা অর্থাৎ সাহিত্যিক ভাবের প্রয়োজন সর্বদাই নৃত্যকলায় রয়েছে। অন্যধারে আবার আর্টের ধর্মপরিবর্তন নিতান্ত ভয়াবহ। অনুবাদ যতই সুষ্ঠু হোক না কেন তার মূল্য মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা কম। (কবি নিজেই এই তত্ত্বটুকু আমাদের বুঝিয়েছেন তাঁর চিত্রের সাহায্যে। তাঁর চিত্রে স্বধর্মাচরণে নিধনপ্রাপ্তির সংবাদে সান্ত্বনা পাই পরধর্মের আশ্রয়ত্যাগের ও আশ্রয়ভিক্ষা না করবার সাহসিকতা লক্ষ করে। তাঁর কোনো চিত্রই সাহিত্যের আশ্রিত নয়, রঙে গল্প বলা নয়।) অতএব রবীন্দ্র-সংগীতের সাহিত্যাংশের দৈহিক অনুবাদে কিংবা ব্যাখ্যায় রবীন্দ্র-সংগীতের সমগ্র বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।

আজ গত কয়েক বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ নৃত্যকলার

নতুন পদ্ধতি উদ্‌ভাবনে সযত্ন হয়েছেন। তাঁদের সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। যা দেখেছি তাই থেকে আমার মনে করা নিতান্ত সহজ হয়েছে যে নতুন পদ্ধতিটি রবীন্দ্র-সংগীতের আশ্রয়ে বিকশিত ও তারই বৈশিষ্ট্যে অনুগৃহীত। তার মধ্যে সুকুমারত্ব ও কৃতিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন বর্তমান। তবু আমার বিশ্বাস যে আশ্রিত সবসময় আশ্রয়দাতার মর্যাদা রক্ষা করেনি এবং পূর্ব-চিত্রাঙ্গদা যুগের অভিনয়ে বিশুদ্ধ নৃত্যকলার বীজ থাকলেও সে-বীজ রবীন্দ্র-সংগীতের পূর্বলিখিত বৈশিষ্ট্যের জন্য গুপ্ত ছিল। অর্থাৎ স্বাধীন নৃত্যকলার অনুদ্ভাবনের জন্য ঐ বিশেষত্বটুকু সম্পূর্ণভাবে বোঝবার অক্ষমতা এবং আংশিকভাবে রবীন্দ্র-সংগীতের স্বাতন্ত্র্যকেই দায়ী করা যায়। তপতী, নটীর পূজা প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যের যে অনুকরণ দেখেছি তাকে ভাও-বাতলান ভিন্ন অন্য আখ্যা দেওয়া চলে না। আমার বক্তব্য হলো এই, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যেই স্বাধীন নৃত্যকলার সর্বপ্রথম উন্মেষ হলো। কবিকে আশ্বাস দিতে পারি— চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের অনুকরণ হবে না। প্রবাসী বাঙালীরাও ভয় পাবেন অভিনয় করতে। তবে কি চিত্রাঙ্গদা অসার্থক হলো? না, কারণ শিল্পীমন এরই স্মৃতি থেকে সৃজনীশক্তি আহরণ করবে।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুকুমার স্বাতন্ত্র্য, উৎকর্ষ ও বিশেষ ভাবাত্মকতা ভিন্ন তাল বৈচিত্র্যের অভাবও নৃত্যশিল্পের স্বাধীন জীবনযাত্রায় বিপত্তি বাধিয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীত বেতালা, এই মন্তব্যের অবশ্য কোনো অর্থ নেই, কারণ তাল গায়কেরই কণ্ঠে। কিন্তু প্রামাণ্য স্বরলিপিতে ও অন্য প্রকাশিত রচনায় অল্পসংখ্যক তালের নির্দেশ পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে দুটি কথা মনে রাখতে হবে: প্রথমত রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল, পঞ্চম-সোয়ারী, এমন-কি ধামার, চৌতাল প্রভৃতি কঠিন তালের প্রত্যাশা করা অসংগত। দ্বিতীয়ত, যে-সংগীত বিশেষ করে গায়ক ও গানের প্রকৃতির (মেজাজের) সাহচর্যে সার্থক হয় তার গায়নপদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাটোয়ারার সুযোগ নিতান্ত কম। (উৎকৃষ্ট খেয়ালিয়া বন্দেশি গানে সংগতিয়ার কাছে কেবল ঠেকাই চান।) কিন্তু দুটি কথা স্মরণ রাখবার পরও সমস্যাটি জীবিত থাকে। সমস্যা হলো রবীন্দ্র-সংগীতের সাহচর্যে যে নৃত্যপদ্ধতি বর্ধিত হয়েছে তাকে স্বাধীন হবার সুযোগ দেওয়া, সাহচর্যের অর্জিত গুণাবলীকে না ত্যাগ করে। সমস্যা হলো পরমাত্মীয়কে মুক্তি দেওয়া। রবীন্দ্র-সংগীতেই নৃত্যসৃষ্টিরবীজ ছিল, সে-বীজের পাট করতে হবে, তাই আশ্রয়দাতা-বৃক্ষটিকে পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার, নচেত তাল-বিভাগের জট ও ঝুরিতে নৃত্য যাবে শুকিয়ে।

চিত্রাঙ্গদার নাটকত্বই রবীন্দ্রনাথের সহায়ক হলো। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য, নৃত্যও

আবার সংগীতমুখর। সুরমুখর নৃত্যে তালবৈচিত্র্যের অবকাশ খুবই বেশি, সংগীতমুখর নৃত্যে অবকাশ সংকীর্ণ হয়ে আসে; (সংগীত অর্থে কথা ও সুরের যোগের ফল, রাগিণী-আলাপের বিপরীত) কারণ নচেত নাটকত্বের জন্যে যে মনঃসংযোগের প্রয়োজন সেটি হবে বিভক্ত। নাটকীয় একাগ্রতাকে যত কম বিক্ষিপ্ত করা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু লয়কে বাদ দেওয়া কখনোই চলে না। লয় হলো যান্ত্রিক মাত্রাভাগের পিছনকার মূলগত ছন্দটি। লয় নিয়ন্ত্রিত হয় রচনার প্রকৃতির দ্বারা। রচনা যদি নাটকীয় সংগীত হয় তবে আদিমছন্দেরই পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়, কেবল মাত্রা-সমষ্টির অসম, বি-সম বিভাগ কিংবা তাল-বৈচিত্র্য নয়। অতএব রবীন্দ্র-সংগীতে তালের সংখ্যা কম স্বীকার করেও নৃত্যনাট্য-চিত্রাঙ্গদার বিচারে সে অভিযোগ অগ্রাহ্য। এক্ষেত্রে লয়ের বিচারই সংগত। আমার বিশ্বাস চিত্রাঙ্গদায় সংগীতের লয়পরিবর্তন নাটকের প্রয়োজনীয় গতি-পরিবর্তনের অনুযায়ী হয়েছিল। দু-এক ক্ষেত্রে ত্রুটি লক্ষ করি নি যে তা নয়। তবে পূর্বের মতন নয়। সামান্য ত্রিতালিতেও ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল পদক্ষেপ লক্ষ করেছি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ে প্রত্যেক নর্তক-নর্তকীর পদক্ষেপ ছিল নির্ভুল যদিও চিত্রাঙ্গদার নৃত্যনাট্যে সে ভুল মার্জনা করা হয়তো শক্ত ছিল না। কেবল তাই নয়, ঝাঁপতালের মতন গম্ভীর তালে, যখন সংগীত ও বাক্য স্তব্ধ তখনও; অর্থাৎ নিরালম্ব, শুদ্ধ ও স্বাধীন নৃত্যেও আমি 'আড়ির কাজ' লক্ষ করেছি। আরো কতটা তালের উন্নতি নৃত্যনাট্যে সম্ভব সে-বিচারের স্থান অন্যত্র, কিন্তু উন্নতি যে হয়েছে এবং সে উন্নতি যে প্রয়োজনের, অতএব ভব্যতার অতিক্রম করে আড়ম্বরে পরিণত হয়নি এইটুকুই আমার এখানকার বক্তব্য।

সংক্ষিপ্তভাবে আবার বলি, শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র নৃত্যকলার উদ্ভাবনের জন্য দুটি শর্তরক্ষার প্রয়োজন ছিল, প্রথমত সাহিত্যিক উৎকর্ষ অথচ কোনো বিশেষ ভাবাশ্রিত সংগীতরচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি, দ্বিতীয়ত তালের খানিকটা বৈচিত্র্য-বৃদ্ধি। সংগীত হিসেবে, (রাগিণীর বিকাশের দিক থেকেও) কোনো রচনা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট হবে সেই পরিমাণে সে-রচনা নৃত্যকলার স্বাতন্ত্র্য-অর্জনে বাধা দেবে। কাব্যের বেলাও তাই, গূঢ়ভাবব্যঞ্জক কিংবা সূক্ষ্ম অর্থবাহী কবিতা নৃত্যের অনুপযোগী! চিত্রাঙ্গদার অধিকাংশ সংগীত (সবগুলি নয়, অনেক রচনা চিত্রাঙ্গদার জন্য লেখা হয়নি) নৃত্যের এবং নৃত্যনাট্যের নিতান্ত অনুকূল। তার মধ্যে ছড়া, আবৃত্তির উপযোগী কবিতা, উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা, সংগীত রচনা সবই বর্তমান, নাটকের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনই তাদের সার্থকতা, কিন্তু মোটের ওপর সংগীতের

ধারাটি নৃত্যলীলাকে সমর্থন করে তাকে ফুটতে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। 'মোটের ওপর' অর্থে গড়পড়তা নয়, সমগ্রতার অনুভূতিকে ইঙ্গিত করছি। সংগীতের আত্মসংযম না থাকলে চিত্রাঙ্গদা নামক নৃত্যনাট্যের বিশেষত্ব থাকত না, রবীন্দ্রনাথের রচিত অন্যান্য গীতিনাট্যের পুনরাবৃত্তি হতো। নতুন সৃষ্টির জন্য পূর্বোক্ত সংযমের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

চিত্রাঙ্গদাকে স্বাধীন নৃত্যের ক্ষেত্র ভেবে ক্ষান্ত হলে তার প্রতি অন্যায় করা হবে। চিত্রাঙ্গদা নাট্য, কিন্তু নৃত্যনাট্য ; অর্থাৎ সাধারণ নাটকের কথোপকথনের পরিবর্তে চিত্রাঙ্গদার পাত্র-পাত্রী ভাববিনিময়ও প্রকাশ করেন নৃত্যের দ্বারা। ভাবকে যে কালে ব্যক্ত করতে হবে তখন সর্বাঙ্গের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী, মাত্র পা দুটির ওপর নির্ভর করলে চলবে না। তাই বলে চিত্রাঙ্গদা সমস্যাপূরক মূক অভিনয় (শ্যারাড্) নয়। চিত্রাঙ্গদার নৃত্য সংগীতমুখর নৃত্য, পাত্র-পাত্রীর কণ্ঠে অবরুদ্ধ নয়, আবার সে নৃত্য কণ্ঠ-নিঃসৃত সংগীতের দৈহিক অনুবাদও নয়। নৃত্যনাট্য অবশ্যই নাট্য, তার মধ্যে গল্প আছে, সে গল্পের নাটকীয় গুণাবলী ও বিবর্তন আছে। নাট্যই হলো মূল, প্রধান শাখা হলো সংগীত। স্ফটিক যেমন মূল সূত্রটির চারপাশে বিরচিত হয়, তেমনই চিত্রাঙ্গদার অনুভূতি নাট্যকে ঘিরেই দানা বাঁধবে। তখন নাট্যের তাৎপর্যের তুলনায় সংগীতের মূল্য অপ্রধান, কলমের একপার্শ্ব মাত্র। অন্যভাবে বলা যায়, চিত্রাঙ্গদার নাটকত্ব উপযোগী সংগীতের আভাসে পরিস্ফুট হবে, আশ্রয়ে নয়।

চিত্রাঙ্গদা নাটকটি রবীন্দ্রনাথেরই নাটক, অন্য কারুর নয়। তার অন্তর্নিহিত বিরোধের চেয়ে আদর্শের অভিব্যক্তিটাই উপভোগ্য। বিসর্জন প্রভৃতি দু-একখানি নাটক ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ইদানীংকার প্রায় সমস্ত নাটকের মূলতত্ত্ব চারিত্রিক ব্যবহারের ঘাতপ্রতিঘাত নয়, মানসিক ব্যবহারের প্রগতি। মনোময় জগতের বিবর্তন নিয়ে যদি নাটক লেখা হয় তবে সে-নাটক পদ্য, বিশেষত মরমী-পদ্য ব্যবহার করবে, এবং সেখানে সেইজন্য সংগীতের স্থান স্বভাবতই সুপ্রশস্ত। মানসিক অভিব্যক্তির দিক থেকে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা এবং নাট্যের আঙ্গিক প্রধানত সাংগীতিক। পূর্বোক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য এই, মোহমুক্তি যে-নাট্যের সংকটময় পরিশেষ তাকে সেইভাবে দৈহিক অনুবাদ কিংবা অভিনয়ের দ্বারা প্রকট করা চলে না যেমন সম্ভব 'রাজহংসের মৃত্যু' কিংবা দুঃশাসনের রক্তপান প্রভৃতি বিষয়কে। চিত্রাঙ্গদা নাট্যের অ-বাক্‌গোচর ও বিদ্রোহী বিশেষত্বটুকু তার আঙ্গিককে নিরূপিত করার পরও তাকে রক্ষা করেছে বিদেশী অপেরার ভাবপ্রবণতা এবং কথাকলির দৈহিক কিংবা জৈবিক অভিনয় থেকে। প্রমাণ,

চিত্রাঙ্গদার গল্প বোঝার চেয়ে চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যনাট্যে অন্য একটি আনন্দের উপকরণ ছিল। সেইজন্য গল্পের ধারাটি দু-এক স্থানে বিচ্ছিন্ন হলেও না-বোঝার ব্যাকুলতায় আমি পীড়িত হইনি। সংগীত ও নৃত্যের মীড়ে দু-একস্থলে আমার গল্পানুসরণবৃত্তি রুদ্ধ হলেও সেজন্য আমার মনে কোনো আক্ষেপ ওঠেনি'।

তবু চিত্রাঙ্গদা নাট্য, তার পাত্র-পাত্রী একাধিক, তার গতি একমুখী হলেও একটানা নয়, তাতে জোয়ারভাঁটা আছে ; খালবিলের জল এসে তাতে পড়েছে। তাই সেখানে সমবেত বা পুঞ্জ-নৃত্যের অবকাশ যথেষ্ট রয়েছে। লক্ষ্ণৌএর কালকা-বৃন্দার প্রবর্তিত এবং সমগ্র উত্তরভারতে প্রচলিত 'কথক'-নৃত্যে (যাকে ভুল করে ক্ল্যাসিক্যাল বলা হয়, কিন্তু যেটি প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক ও ঠুংরীর আশ্রিত) নাটকীয় গুণ যা আছে তা প্রকট হয় মাত্র একজনেরই অঙ্গ-ভঙ্গিতে। তিনিই কখনও রাধা, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বা গোপিনী। নায়িকা হয়ে কখনও তিনি নওল-বলা, কখনও প্রৌঢ়া-ধীরা, কখনও বা বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, গুণগর্বিতা ; নায়ক হয়ে কভু দুঃসন্ধানী, কভু শঠ নিপট, কভু বা স্বয়ং দূত। তিনি একাই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ভিন্ন ভিন্ন রসের উত্তেজক সংস্থান সৃষ্টি করেন।

দেশী নৃত্যেই বহুর স্থান আছে। নাটক যখন বহুনিষ্ঠ, এবং মার্গপদ্ধতিতে সমবেত নৃত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমরা অচেতন ও অজ্ঞান তখন নাট্যনৃত্যে কবি দেশী নৃত্যের ঐ আঙ্গিকটুকু গ্রহণ করতে বাধ্য। এই বহুর ব্যবহার নিতান্তই দায়িত্বপূর্ণ। সংখ্যাধিক্য এককের ও স্বকীয়তার সর্বনাশ ঘটাতে সদাই তৎপর। তাই সাবধানের বিশেষ প্রয়োজন। প্রয়োগকুশল শিল্পীর হাতে বহুর অস্তিত্ব এককের— অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধের গুরুত্ব নির্ধারণ করে। তখন পাত্র-পাত্রীর কাজ হলো যেন তরফের, নায়ক-নায়িকা যেমন জুড়রি। মূলগত ঐক্যের সাথে ঐ প্রকার আন্তরিক দেনা-পাওনা যদি না থাকে তবে পাত্র-পাত্রী কেবল ভিড় জমায়। ভিড়ের এক ভিড় করা ছাড়া অন্য কোনো সার্থকতা নেই, তার মধ্য থেকে স্বতই কোনো সম্বন্ধ রচিত হয় না, বরঞ্চ প্রধান সম্বন্ধটিকে গোপন করে, নীচুস্তরে নামিয়ে আনে। কিন্তু নায়ক-নায়িকার ব্যবহারে বিরোধ ও বিবর্তন দেখান যদি উদ্দেশ্য হয় এবং সেই সঙ্গে অন্য পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করার যদি প্রয়োজন থাকে, যেমন নাটকে থাকতে বাধ্য, তবে নায়ক-নায়িকা ও পাত্র পাত্রীর ব্যবহারকে গ্রথিত করা চাই।

সম্বন্ধ স্থাপনের পর, সম্বন্ধের সূক্ষ্মতা বজায় না রাখলেও চলে। এতদূর পর্যন্ত বলা যায় যে সম্বন্ধের সূত্রটি অতিশয় পাতলা হলে গঠনটাই পলকা হয়। সংগীত থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। খেয়াল তানপ্রধান, দেশ অতি মধুর রাগিণী, দেশের খেয়ালে

তান খুবই চলে ; বন্দেমাতরম নামে জাতীয় সংগীতটি একসময়ে দেশ-এ গাওয়া হতো (পরে তিলককামোদ, ছায়ানটেও শুনেছি) একজনের কণ্ঠে দেশএর বন্দেমাতরম সহনীয় ছিল, কিন্তু কোরাসে, অর্থাৎ সমবেতকণ্ঠে কলকলনিনাদে যখন মুখরিত হতো তখন গানটি হয়ে উঠত অশ্রাব্য। তানকর্তব একজনের কণ্ঠেই শোভা পায়— কোরাসে অচল। এই সোজা কথাটি দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন, তাই তাঁর কোরাস রচনায় কারুকার্য কিংবা কোমল পর্দার আতিশয্য আনেন নি। তালের বেলাও তাই। সমবেত প্রকাশে শ্রুতি, তান ও তালের বাহাদুরী দেখান যায় না, উচিত নয়। তেমনি, একক নৃত্যে তালের চুলচেরা ভাগ ও আড়ম্বরের অনেকটা সুযোগ থাকলেও পুঞ্জ-নৃত্যে মোটেই নেই। এখানে স্থূল হওয়া ছাড়া নাস্তি গতিরন্যথা। তবু যখন নাটকে পাত্র-পাত্রীর চেয়ে নায়ক-নায়িকাই প্রধান তখন পুঞ্জ-নৃত্যকে নায়ক-নায়িকায় একক কিংবা দ্বৈত-নৃত্যের চেয়ে প্রসিদ্ধি দেওয়া অসংগত। বহু এককেরই আশ্রিত, একক থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার সত্তা লোপ পাবে। সে যেন নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধরূপ ঐক্যের চারপাশে জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করছে। পূর্বের মন্তব্যটিও স্মরণ রাখা চাই— শুদ্ধতা অর্জনের আরোহণপথ হলো নিরালম্বতা। অর্থাৎ সমগ্র নৃত্যের ম ধ্য নায়ক-নায়িকার নৃত্যই আদর্শ, বাকি পাত্র-পাত্রীর নৃত্য সমর্থন মাত্র, গৌরীশৃঙ্গের চারপাশে অন্যান্য উঁচু পাহাড় ও নিম্নতর মালভূমির মতন। দেশী নৃত্যের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যেই বহু তার যথার্থ স্থান পেয়েছে। চিত্রাঙ্গদা নিজে মণিপুরের রাজকন্যা এই কথাটি চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণের চূড়ান্ত কারণ নয়।

বলা বাহুল্য, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা নাট্যের নায়ক-নায়িকা, তাঁরা ভিন্নদেশের রাজপুত্র ও রাজকন্যা। চিত্রাঙ্গদার দেশে, মণিপুরে অর্জুন এসেছেন একাকী অজ্ঞাতবাসের পরিশেষে। যুবতী চিত্রাঙ্গদা যুবকের মতনই প্রতিপালিত, তাঁর অদ্ভুত পুরুষজনোচিত শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস তাঁর সখীগণই বিবৃত করতে পারেন। তদ্‌ভিন্ন অর্জুনের বন্যপরিচর, গ্রামবাসীগণও রয়েছে। আর আছেন মদন। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ব্যবহারই নাটকের প্রধান অধিশ্রয়ণ। তাঁদের ভাব-বিনিময়ের প্রতিফলন হবে মদন ব্যতীত নাট্যমঞ্চস্থ অন্যান্য ব্যক্তির ওপর। কখনও তারাই সেই মূল সম্বন্ধের অভিব্যক্তির সাতত্য বজায় রাখবে, সময় সময় আবার তারাই হবে সে ব্যবহারের প্রতিবাদী। মৌলিক সুর ও নৃত্য পরিপুষ্ট হবে তাদেরই সহযোগী পারিপার্শ্বিকে, না হয় বৈপরীত্যে। চিত্রাঙ্গদা নাট্যে সমবেত নৃত্যকে নানারূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবু যদি চরিত্র উদ্‌ঘাটনের ধারা শুকিয়ে যায়, বিবর্তন শিথিল হয়, ছক্ হয়

ছিন্নভিন্ন, তবে মদনের আশীর্বাদে এবং মঞ্চের এক কোণে কবির উপস্থিতিতে ও তাঁর আবৃত্তি ও মন্ত্রপাঠে সে-ধারা আবার বইবে, সে-বন্ধন কঠিন হবে, সে-ছকে জোড়া লাগবে। বন্ধনরীতির ধারা অক্ষুন্ন রাখার এই আঙ্গিকটি আমাদের পরিচিত চিত্রাঙ্গদার অভিনয়ে বন্ধনরীতি সংস্কৃত নাট্য এবং দেশী যাত্রা থেকে নেওয়া। অবশ্য মার্জিত করে, যদিও তার ব্যবহারটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। পুরাতনের ভূমিকায় সমবেত নৃত্যের অভাব স্মরণ রাখলেই দেখা যাবে চিত্রাঙ্গদার কৃতিত্ব কতটা বিপ্লবাত্মক। পুঞ্জ-নৃত্য বোধহয় ধ্রুবপদী নয়, শাস্ত্রেও তার আঙ্গিক বর্ণিত আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। এখানে আমার ও অন্যান্য জনসাধারণের অজ্ঞানতাকে তথ্য হিসাবে ধরলে বোঝা যায় যে সংস্কৃতি যে কালে বিচ্ছিন্ন, যখন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমরা অচেতন তখন তাকে ভিত্তি করে নতুন ইমারত গড়া চলে না। শুনেছি, একজন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদের স্মৃতিপটে চিত্রাঙ্গদার নৃত্যাভিনয় গুপ্তরাজ্যের সমসাময়িক কৃষ্টি জাগ্রত করেছিল। পণ্ডিতদের পক্ষে সবই সম্ভব। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া যেমনই অসম্ভব তেমনই অসম্ভব পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। একেই মার্গনৃত্যের পুনরাবৃত্তি এক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব, তার ওপর স্রষ্টা ও প্রযোজক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ধরার বুক থেকে রস উদ্‌গমন করে মুমূর্ষু ও প্রবীণ পিতামহ-পন্থার প্রাণসঞ্চার একমাত্র বীর্যবান উত্তরাধিকারীরই সামর্থ্যের মধ্যে। সংস্কারের তৃষ্ণা-নিবারণের পর নবজীবনের লক্ষণ সূচিত হয়। সৃষ্টির এই লীলারহস্যটি কবির আয়ত্তাধীন। মার্গসংগীত যখন শুচিবাইগ্রস্ত তখন তিনি তার সাথে বাউল-ভাটিয়াল মিশিয়ে সংগীতের নতুন জাতি তৈরি করলেন। ব্রাহ্মণ তাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করলে, তবু তার মৃত্যু হলো না। কবির নৃত্যকল্পনাতেও তাই হয়েছে, জ্যোতিষী না হয়েও বলা যায়, এই উপায়েই চলবে। সংগীতের বর্ণসংকর এবং নৃত্যে বর্ণ-সংকরের মধ্যে পার্থক্য আছে। যতটুকু পার্থক্য ততটুকু তার কৃতিত্বের আধিক্য। মার্গ কিংবা ধ্রুবপদী পদ্ধতি আমাদের কাছে অনেকটা জীবন্ত ছিল, আমাদের জাতীয় অবচেতনা থেকে সেটি কখনই বিলুপ্ত হয়নি, যদিও তার জীবন গতানুগতিকতারই নামান্তর ছিল। কিন্তু মার্গ কিংবা ধ্রুবপদী নৃত্যরূপ কী ছিল আমরা জানি না। বলী-নৃত্যকে কিংবা দক্ষিণভারতীয় নৃত্যকে মৌলিক বলব? তাও কি আমাদের সংস্কারগত? বাঈজী-নৃত্য যে ধ্রুব নয় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ, যদিও সেটি সুপ্রচলিত স্বীকার করতেই হবে। এ-দুটির মধ্যে প্রথমটিতে ধ্রুবপদ্ধতি আংশিকভাবে বর্তমান আছে অনুমান করা অসংগত নয়। সে-রূপও আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার বাইরে, যদিও দক্ষিণী-জনসাধারণের

অপরিচিত নয়। যেখানে সংস্কার নেই সেখানে সৃষ্টি দুরূহ। অনেকে বিপরীত কথা বলবেন নিশ্চয় ; নৈরাজ্য থেকে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার মূল্য অস্বীকার্য ; কিন্তু সে-রাজ্য কত সুদৃঢ় হয় জানি না। মাইকেলী ছন্দের ভাগ্য লক্ষ্য করে আর কী ভাবা যায় ? অবশ্য রবীন্দ্র-সংগীতের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি সক্রিয়, রবীন্দ্র-নৃত্যের সম্বন্ধে মনোভাব উদাসীনের। সক্রিয়তার অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় বিরাগের শক্তি বেশি, এই যা বিপদ।

অতএব পণ্ডিতের দল যাই বলুন না কেন, নৃত্যনাট্যের স্বকীয় প্রয়োজনের জন্য পুঞ্জনৃত্যকে গ্রহণ যদি করতেই হয়, তবে দেশী-নৃত্যকে একক নৃত্যের সাথেই বরণ করতে হবে, তবেই নৃত্যকলার ইতিহাসে সৃষ্টিমুখী বিপ্লব সংসাধিত হবে। বাংলার দেশী-নৃত্যের মধ্যে যতগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তার মধ্যে অন্তত একটিকে নিয়ে কবি ইতিমধ্যে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু বাউলের নাচ নাচতে পারে একা বাউল, যেমন ফাল্গুনীতে সে নেচেছিল, কিন্তু সব নাটকে বাউল আনা যায় না, অর্জুনও বাউল সাজতে পারেন না, চিত্রাঙ্গদা তো দূরের কথা। সেরাইখেল, গাজন, রাইবেঁশের সংস্কার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তাদের পুনঃ প্রচলনে যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে চিত্রাঙ্গদায় তাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। ইদানীং, দেশী-নৃত্যের মধ্যে দুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে— কবির আশীর্বাদে মণিপুরীর এবং ভালাঠোল ও উদয়শংকরের কৃপায় মালাবরী কথাকলির। আর-একটি পদ্ধতির প্রতিপত্তি সমগ্র উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত, সেটি একক নৃত্য—অর্থাৎ নায়ক-নায়িকারই উপযোগী। তার প্রবর্তক লক্ষ্ণৌ-এর যুগল কলাবিদ—কালকা ও বৃন্দা মহারাজ। তাঁদের পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব নয়, তবু তার পরিব্যাপ্তির জন্যও অন্তত তাকে বাদ দেওয়া যায় না। ধ্রুব না হলেও আমাদের ধারণা যে সেটি ধ্রুব। (আমার নিজের বিশ্বাস যে পদ্ধতিটি দেশী, অযোধ্যার দান ; কাজরী, ঝুলন, চৈতী প্রভৃতি লোকনৃত্যই তার ভিত্তি)। চিত্রাঙ্গদার জন্য নৃত্যরূপ কল্পনা করতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মণিপুরী, মালাবরী ও লক্ষ্ণৌ-নৃত্যের ঋণী হওয়াই স্বাভাবিক। এই তিনটির অদ্ভুত সংমিশ্রণ চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যে বিশ্লেষণের ফলে ধরা পড়ে। অনুপাত অবশ্য বিভিন্ন। নায়িকার জন্য লক্ষ্ণৌ, নায়কের জন্য দক্ষিণী, পুঞ্জের জন্য মণিপুরী। তা ছাড়া সংকলন ও কৃতিত্ব সর্বদাই মনে থাকা চাই এবং মনেও পড়ে।

কালকা-বৃন্দা নিজেরা কেমন নাচতেন ও বাজাতেন আমি জানি না, আমি যখন লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হই তখন হাটে ভাঙন ধরেছে। তবু তাঁদের পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র ও একাধিক শিষ্য-শিষ্যার নৃত্য দেখে বলতে পারি যে তাঁদের প্রবর্তিত নৃত্যকলার

অনেক অলংকার শান্তিনিকেতনী নৃত্যে বাদ দেওয়া হলেও তার মূলতত্ত্বটি অন্তত চিত্রাঙ্গদায় নৃত্যে পরিত্যক্ত হয়নি। গ্রহণের ক্ষেত্রটি জরিপ করা ভালো। পূর্বেই লিখেছি, লক্ষ্ণৌ-নৃত্যে বহুর স্থান নেই, অতএব সমবেত-নৃত্যের আঙ্গিক সেখানে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ব্যক্তিগত নৃত্য, অর্থাৎ নর্তক কিংবা নর্তকী একাই যেখানে একাধিকের সাথে সম্বন্ধ ফুটিয়ে তুলছেন। লক্ষ্ণৌ-নৃত্যের অন্য আঙ্গিক আছে— মুদ্রা, চোখের ব্যঞ্জনা ও ভ্রূ ও গ্রীবা সঞ্চারণ এবং পায়ের কাজ। বাঈজীরা মুদ্রা দেখান না, আচ্ছান সাহেব ও শম্ভু মহারাজ মুদ্রা ব্যবহার করেন— শান্তিনিকেতনে মুদ্রা আছে; যদিও যৎসামান্য এবং বোধহয় অশাস্ত্রীয়। চিত্রাঙ্গদা নাট্যে মুদ্রার যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও ব্যবহৃত হয়নি। চক্ষু ও ভ্রূর সঞ্চালন ছিলই না বললে অত্যুক্তি হয় না। উগ্রভাবে কটাক্ষ ও ভ্রূ কিংবা গ্রীবা সঞ্চালন নিশ্চয়ই অভদ্রতা, কিন্তু রিপুকেও মিত্র ভাবা চলে সাধনার কোনো এক বিশেষ স্তরে। তারপর 'পায়ের কাজ'। লোকে যাকে পায়ের কাজ বলে সেটি তাল বাঁটোয়ারার বোলের পদানুবর্তিতা। সেটি সত্যই অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। ধামারের মতন অসম বিভাগের তালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ, আড়ি, দেড়ী, কুয়াড়ি, বিসম, অনাঘাত প্রভৃতি যেসব কারুকার্য পাখোয়াজের বোলের সাহায্যে হোরীধামারের সম্পদ বৃদ্ধি করে সেগুলি দুটি পায়ের উত্থান-পতন ও ঘুঙুরের দ্বারা কী স্পষ্টভাবে অনুকৃত হয় না-শুনলে প্রত্যয় হয় না। তবু, তবু আমি বলি এই পায়ের কাজ কালকা-বৃন্দার প্রধান কৃতিত্ব নয়, লক্ষ্ণৌ-এ প্রবর্তিত নৃত্যপদ্ধতির প্রাণবস্তু নয়। যাঁরা লক্ষ্ণৌ-নৃত্যকে নতুন বলে শ্রদ্ধা করতে উৎসুক তারা 'পায়ে বোল' বাজানকে মহৎসৃষ্টি ভাবতে পারবেন না, এমন কি তার নতুনত্বের জন্য ভাওবাতলানর অদ্ভুত কৌশল স্বীকার ভিন্ন অন্য দাবী পেশ করতে হবে। ভাওবাতলান জিনিসটি বহু পুরাতন। 'ভাওবাতলান' ভাবের এক প্রকার না হয় দশ প্রকার ব্যাখ্যা, অতএব সেটি নৃত্যের একটি প্রধান আঙ্গিক বরাবরই ছিল। কালকা-বৃন্দা না হয় দশ প্রকার বিশদ ও চমকপ্রদ ব্যাখ্যা করতেন কল্পনা করা যায়। কিন্তু তবুও সে ব্যাখ্যাগুলি নৃত্যের আশ্রয়দাতা সংগীতের বাক্যের সমর্থন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ধরা যাক— লক্ষ্ণৌ-এর নৃত্য দেখছি, মধ্যে নর্তক, পার্শ্বে সারেঙ্গীয়া ও তবলিয়া, সারেঙ্গীতে সুর চলছে, নর্তক যদি সুকণ্ঠ হন তবে তিনি নিজে সেই সুরের গানের পদ গাইছেন, না হয় অন্য একজনও গাইতে পারেন। ধরা যাক গানটি 'বালমোরে চুনরিয়া ম্যায় লালে রঙ্গাদে' অর্থাৎ, 'হে প্রিয় আমার শাড়িটা লাল রঙে ভিজিয়ে দাও।' নর্তক একাই নায়ক এবং নায়িকা, তিনি এই পদটির ব্যাখ্যা করছেন নানা ছলে। আমি প্রায় বারো রকমের 'ভাও' দেখেছি, তার মধ্যে গোটাকয়েক

বুঝেছিলাম— ছু-তিনটি লিখছি ; (১) নায়িকা নায়ককে জোর করে পান খাওয়াচ্ছেন, তিনি খাবেন না যতক্ষণ না নায়িকা আগে খেয়ে প্রসাদ দেন, তাই হলো, নায়কের ঠোঁট বড়োই লাল, নায়িকা ওড়নার প্রান্ত দিয়ে নায়কের ঠোঁট পুঁছিয়ে দিলেন ; (২) নায়ক ভোরবেলা বাসকশয্যা ত্যাগ করে বাড়ি ফিরছেন, নায়িকা তখনও নিদ্রিতা, উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে প্রভাত সূর্যের আরক্ত আভা মুখে পড়েছে, নায়ক যাবার সময় নায়িকার মুখ ওড়না দিয়ে আবৃত করলেন ; (৩) নায়িকার ঘরে নায়ক রাত্রিযাপন করছেন, এমন সময় সখা খবর দিলেন শত্রু এসেছে, নায়ক তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা করে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত, নায়িকা কোমরে তলোয়ার বাঁধতে দেরি করছেন, তূর্যধ্বনি হলো, খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নায়ক ছুটে যাবেন, নায়িকা মধুর বাধা সৃজন করলেন, তাঁর হাত কেটে গেল, নায়ক ওড়না দিয়ে আঙুল বেঁধে দিলেন। প্রত্যেক ভাওয়েই চুনরি লাল হচ্ছে। এইরকম আরো কত ইঙ্গিত 'ভাও'-এর সাহায্যে সুস্পষ্ট হয়। বাহাদুরী হলো এই, যে এক, জোর দুই কি তিন আবর্তের মধ্যে (একটি সম্ থেকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সমের মধ্যে) ঘটনাটি সুচারুরূপে ব্যক্ত করা চাই। কিন্তু তবু, নৃত্য কি এত বাহাদুরী সত্ত্বেও গানটির পদাশ্রিত নয় ? অর্থাৎ, নৃত্যকলা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় নি। অথচ লক্ষ্ণৌ-এর নৃত্যকলা একটি সুন্দর সৃষ্টি। তার সৌন্দর্য পূর্ববর্ণিত অলংকার প্রাচুর্যে নয়, তার মূল সৌন্দর্য হলো নর্তক-নর্তকীর রেখায়িত দৈহিক ভঙ্গিমার সমঞ্জস সাধনের ইঙ্গিতে। 'রেখায়িত' কথাটি মনে রাখতে হবে। এই রেখাভঙ্গির চলন্ত সমাবেশ এবং সংগীতাধীনত্ব শান্তিনিকেতনী নৃত্যে বর্তমান ছিল, পায়ের কাজ, ভ্রূ ও কটাক্ষ প্রভৃতি অবর্তমান থাকা সত্ত্বেও। অতএব লক্ষ্ণৌ-নৃত্যের সমস্যা এবং শান্তিনিকেতনী-নৃত্যের সমস্যার মূল একই। সংগীত ভিন্ন অন্য প্রেরণা চাই, অর্থাৎ দেহ নিজের ভাবে রেখায়িত হোক, ভেঙে যাক, নতুন ছন্দে নেচে উঠুক। যতক্ষণ না নৃত্য স্বাধীন হচ্ছে ততক্ষণ দেহজ অর্থাৎ নৃত্য-তরঙ্গের ছন্দের সঙ্গে সাংগীতিক তালমান লয়ের বিরোধ সম্ভাবনা দূর হবে না। সত্য সত্যই যে ঐ দুটি ছন্দের বিরোধ বাধে আমি দেখেছি।

পূর্বকথিত রেখায়িত তরঙ্গ দক্ষিণী কিংবা বলী-নৃত্যের বিশিষ্ট আঙ্গিক নয়। দক্ষিণী-নৃত্যেও 'ভাও-বাতানা' আছে, পায়ের কাজও নেই যে তা নয়। বালা-সরস্বতী ও তাঞ্জোর অঞ্চলের একাধিক নর্তকীর নৃত্যে খাস্ লক্ষ্ণৌইয়ারও দিলখোশ্ হয়। কিন্তু দক্ষিণী ও বলী-নৃত্যের ধর্মই ভিন্ন, সেটি অভিনয়ের। উদয়শংকর যাঁকে এখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেন, সেই শংকরম নম্বুদ্রীর, রাগিণীদেবীর গুরু গোপীনাথের, মালাবারের শ্রেষ্ঠ কবি ভালাটোলের প্রতিষ্ঠিত কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত

দলের, এবং আরো দুচারজন মাদ্রাজ অঞ্চলের প্রাথতযশা নর্তক-নর্তকীর নৃত্য দেখে মনে হয়েছে যে দক্ষিণভারতীয় নৃত্য এখনও অভিনয়ের সংজ্ঞায় পড়ে। পূজারিণীর-নৃত্যে অভিনয়াংশ নিতান্ত কম, কিন্তু পূজারিণীর সংখ্যা ও প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য অমন একটি সুন্দর নৃত্যরূপ আজ লুপ্তপ্রায়। মোটামুটি বলা চলে যে দক্ষিণী নৃত্যাভিনয় দেহের উপরিভাগে, বিশেষত আঙুল, চোখ ও ভুরুতে যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি পায়ের কাজে, এবং সর্বোপরি সমগ্র দেহের ভাববিকাশের দিক থেকে তেমনই স্থূল। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের দীর্ঘকালব্যাপী পুনরাবৃত্তিতে দর্শকের দম বন্ধ হয়ে যায়, রামেশ্বরের মন্দিরে সহস্রস্তম্ভ দরদালানে সমুদ্রের হাওয়া বয়, কিন্তু তবু যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কলার উৎকর্ষ সংখ্যার পরাকাষ্ঠায় নয়।

উৎকৃষ্ট বলী-নৃত্য আমি দেখিনি। যা দেখেছি ও রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতি-বাবুর মারফত যা শুনেছি তাইতে মনে হয় যে সেটি দক্ষিণভারতীয় পদ্ধতির প্রসার এবং উত্তরভারতীয় নৃত্যপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বলী ও দক্ষিণী নৃত্যের আঙ্গিক দৈহিক 'প্লেনে' ভাঙা এবং জোড়া, উত্তরভারতীয়ের মতন রেখার লীলা নয়। উত্তরভারতীয় কলাবিদ্ যতই আসরের ওপর ঘুরে বেড়ান না কেন, একটি মুহূর্তে তিনি তাঁর দেহের যে-কোনো একটি প্লেনেই অবস্থান ও প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর ব্যতিরেক ক্ষণস্থায়ী, তাঁর ভারসাম্য মাধ্যাকর্ষণ রেখাশ্রিত প্লেনেরই মধ্যে। 'লহরা' ও 'তোড়া'র পর যেমন লয়ে ফিরতে হয়, তেমনই ভাও-বাতান ও নৃত্যের পর উত্তরভারতীয় নর্তক এমন একটি স্থিরভঙ্গিমায় ফিরে আসেন যার ভারসাম্য স্বাভাবিক। অবশ্য মানুষে যেরকম ভাবে দাঁড়িয়ে কি বসে থাকে সেরকম স্বাভাবিক নয় বলাই বাহুল্য। মোটামুটি একই প্লেনের মধ্যে উত্তরভারতীয় কলাবিদের গতি আবদ্ধ বলে 'পায়ের কাজ' সম্ভব, কারণ এই 'পায়ের কাজ' অর্থাৎ বোলের পদানুবর্তিতা একই লম্বভাবাপন্ন তলের উত্থান ও পতনেই সম্ভব। কিন্তু তাণ্ডবের কিংবা দীপলক্ষ্মীর বিভিন্ন মূর্তি যিনি দেখেছেন তিনিই বুঝবেন দক্ষিণীনৃত্যের আঙ্গিক কত পৃথক। তার মর্মকথাই হলো দেহের প্লেন ভাঙা, প্রতি পায়ের, প্রতি হাতের, প্রতি আঙুলের, স্কন্ধের এমন-কি বুকের প্লেনও ভিন্ন। একটিকে অবশ্য স্থায়ী এবং তাকে অবলম্বন করে অন্য প্লেনের সামঞ্জস্য বিধানেই যথার্থ কৃতিত্ব। সাধারণত বুকের প্লেনকেই প্রধান করা হয়। দুটি চোখ ও ভ্রূর মধ্যে একটি উঁচু অন্যটি নিচু দেখেছি। এইরকম প্লেন ভাঙার ব্যাপারে 'পায়ের কাজ' অচল। এ যেন দেহের হার্মনি, এতে মীড় ও লালিত্য কম, কিন্তু বৈচিত্র্য বেশি। দক্ষিণীনৃত্য পুরুষেরই উপযুক্ত, ব্যালে-নৃত্যে য়ুরোপীয় মেয়েদের পা তোলা, কি ছোড়া ভারতীয় ভব্যতায় যেন বাধে।

চিত্রাঙ্গদা পুরুষোচিত ভাবপ্রকাশের জন্য দক্ষিণীনৃত্যের ভঙ্গিতেই নাচেন। সমবেত-নৃত্যের আঙ্গিকও দক্ষিণী হতে পারে না।

মণিপুরী-নৃত্যের সঙ্গে আমাদের প্রায় সকলেরই পরিচয় যৎসামান্য। রবীন্দ্রনাথ একটি মণিপুরী নর্তক পরিবারকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করেন। এখনও মণিপুরী শিক্ষক সেখানে শিক্ষা দেন। কিন্তু তাঁদের শান্তিনিকেতনের ওপর প্রভাব কেবল উপস্থিতির জন্য নয়। মণিপুরী ঘরোয়ানার সমবেত-নৃত্যের সুচারু বিকাশ, ভব্যতা ও কবিত্ব রবীন্দ্রনাথকে সহজেই আকৃষ্ট করে। তার সাজসজ্জা, ভঙ্গি, গতি এবং নায়কনায়িকার সাথে অন্য পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধের ভদ্র সংযমে কবি যেন প্রাণের কথার উত্তর পান। মণিপুরী নৃত্যের প্রাণবস্তু কী? নেহাত মোটামুটি বলা চলে, দক্ষিণী বলীনৃত্য ভাস্কর্য, লক্ষ্ণৌ-এর নৃত্য সংগীত এবং মণিপুরের নৃত্য কাব্যধর্মী। চিত্রাঙ্গদা নাট্যের পক্ষে মণিপুরের বিশেষ যোগ তার সমবেত নৃত্যে, যার আঙ্গিক লক্ষ্ণৌ-এ কিংবা দক্ষিণে বিশেষ কিছু নেই। অবশ্য সাঁওতালী নৃত্যের কাছে কবি ঋণী হতে পারতেন— কিন্তু সাঁওতালী দলের নাচে গতি থাকলেও স্ত্রী ও পুরুষের দল কেমন যেন একটি সূত্রেই বাঁধা, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সে-গতি যন্ত্রের। সেখানে পুরুষের দল হয় এগিয়ে যাচ্ছে, না হয় পিছু হটছে, স্ত্রীর দল যেন তারই উত্তর দিচ্ছে— অনেকটা শুকসারির ছড়ার মতন। আবর্তনও চক্রবৎ। যুক্লিডের প্রথম পুস্তকেরই মতন তার নকশা। সাঁওতালী নৃত্যকে শ্রদ্ধা করার পরও মানতে হবে যে চিত্রাঙ্গদার মতন নাট্যে তার দান খুব বেশি হতে পারত না। মণিপুরী নৃত্যে প্রত্যেকেরই গতি আছে, প্রত্যেকের গতি মিলেমিশে একটি বিচিত্র নকশা তৈরি হচ্ছে, যেটি আবার অন্য একটি ছকের সঙ্গে কখনও মিশে যাচ্ছে, কখনও বা তাই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মণিপুরী নৃত্য যেন একটি পার্শিয়ান কার্পেট, কিংবা ক্যালীডস্কোপ। চিত্র তার রূপভঙ্গি, অথচ তার সমগ্রতার অনুভূতি বিশেষের মুখ চেয়ে থাকে না। মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিক কবি গ্রহণ করতে তাই বাধ্য হয়েছেন।

শান্তিনিকেতন নৃত্যে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রভাব ভিন্ন অন্য বিশেষত্ব ছিল রেখার লীলায়। অবশ্য রঙের খেলাও ছিল সাজসজ্জার অপূর্ব সমাবেশে। মোটামুটি তাকে চিত্রধর্মী বলা যায়, সংগীতাংশ বাদ দিলে। আমার বক্তব্য এই মণিপুরের কাব্যনিষ্ঠ ভদ্রতার সঙ্গে রবীন্দ্র প্রবর্তিত নৃত্যের যোগ নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এতদিন যোগ ভিন্ন সমন্বয়ের, অর্থাৎ গ্রহণের পর নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন ও সুবিধা হয়নি। অন্যান্য রবীন্দ্রনাট্যের পক্ষে যোগটুকুই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা নাট্যের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। তার গল্পাংশ জটিল, তার প্রধান চরিত্রে দ্বন্দ্ব

আছে, পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত জটিল, চিত্রাঙ্গদায় অভিনয়ের সুযোগ বেশি। তার নৃত্যপদ্ধতি রেখাভঙ্গিতেই আবদ্ধ থাকলে নাট্যের জটিলতার প্রতি অবিচার হয়। রেখা ছাড়া তার আরো অন্য কিছুর আশ্রয় চাই। দক্ষিণী অভিনয় স্থূল, কিন্তু তার 'প্লেন ভাঙা' নতুন, সেটি চতুষ্কোণের তৃতীয় বাহু কিংবা অন্য পরিমাণের ইঙ্গিতবাহী, অতএব চিত্রাঙ্গদা নাটকের গভীরতার উপযোগী। মণিপুরী নৃত্যের পাত্রপাত্রীর সমাবেশ, সমবেত-নৃত্য, তার সুন্দর নকশা এবং সর্বোপরি তার সংযম যেন চিত্রাঙ্গদার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। উত্তরভারতীয় নৃত্যের ছন্দলালিত্য আরো বেশি গ্রহণ করবার সুযোগ চিত্রাঙ্গদায় রয়েছে। ভিন্ন আঙ্গিকের প্রকৃত বণ্টনও হয়েছে— পুঞ্জনৃত্যে মণিপুরী, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে পুরুষনৃত্যে দক্ষিণী এবং মহিলা-নৃত্যে উত্তরভারতীয় আঙ্গিকের পরিচয় পাই। হয়তো মণিপুরীর প্রভাব সামান্য একটু বেশি হয়েছে কোথাও কোথাও। অর্জুনের নৃত্যে পৌরুষ অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাই সন্দেহ হয়েছিল, যদিও মহিলাকে দিয়ে পুরুষাভিনয়, অর্জুনের ঐপ্রকার অবস্থা, এবং অ্যাকিলিসের মতন বীরেরও স্ত্রীসুলভ কমনীয়তার স্মৃতি সন্দেহের নিরাকরণে সদাজাগ্রতই ছিল।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের পিছনকার ভূমিকা এবং সম্মুখের ইঙ্গিত আছে। গ্রহণ কথাটি অনেকবার ব্যবহার করেছি। গ্রহণ অর্থে সমন্বয়; এবং সমন্বয়টিই আসল কথা। দর্শক প্রথমেই সমগ্রভাবে চিত্রাঙ্গদা নামক নৃত্যনাট্যকে উপভোগ করেন, উপলব্ধির সময় কিছুতেই সৌন্দর্যসৃষ্টির উপাদানের কথা তাঁর মনে পড়ে না। মনে পড়ে পরে, বিচারের সময়। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য দর্শকের পক্ষে একটি অখণ্ড সৃষ্টি। স্রষ্টার মস্তিষ্কে অবশ্য সংকলন পদ্ধতি ছিল, আঙ্গিকের ভিন্নতা স্বীকার তাঁকে করতেই হয়েছিল, নচেত সংকলন হবে কিসের? সেই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের সংকলন রূপ পেল এককে, যেটি দর্শকের কাছে সগৌরবে উপস্থিত হয়েছে। আমি স্রষ্টার সমস্যা ও সমাধানকেই বিচার করেছি. ঐতিহাসিকের মতন বিচার করিনি। সে যাই হোক চিত্রাঙ্গদাকে আমি মহৎ সৃষ্টি মনে করি। তার মহত্ত্ব যদি প্রকাশ না হয়ে থাকে সে আমার দোষ। কিন্তু স্রষ্টার দিক থেকে যদি অন্য কেউ আরো স্পষ্টভাবে সৃষ্টির বিচার করেন তবে তার মহত্ত্ব উপলব্ধিতে সকলেই আমার মতন স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেনই হবেন।

এইখানে বোধহয় নৃত্য সম্বন্ধে যা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি দরকার, যদিও নৃত্য সেই অখণ্ড সৃষ্টির অঙ্গ। নৃত্যকলা সম্বন্ধে দেশে বেশি আলোচনা হয়নি, এবং দেশে নৃত্য সম্বন্ধে সাড়া পড়েছে— এইটুকুর জন্যই নৃত্যের ওপর এতটা জোর দিচ্ছি। বিশুদ্ধ নৃত্যের দিক থেকে বলা যায় যে চিত্রাঙ্গদায় নৃত্যকলা মুক্তিলাভ

করেছে। যোগশাস্ত্রে বলে কানই নাকি ব্রহ্মচারীর পরম শত্রু। অন্তত দর্শকের পক্ষে বিশুদ্ধ নৃত্যরসের উপভোগে তো বটেই। সংগীত ভিন্ন নৃত্যের অস্তিত্বে আমরা অভ্যস্ত নই। এক্ষেত্রে অভ্যাসটি আরো দৃঢ়, কারণ যিনি নৃত্যরূপ পরিকল্পনা করেছেন তিনি নিজে একজন সংগীত-রচয়িতা, বহুদিনের এবং উচ্চদরের। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের ও আমাদের অভ্যাস ভাঙার কল্পনাতীত দুঃসাহসী কাজে ব্রতী হয়েছেন। চিত্রাঙ্গদায় মধ্যে মধ্যে সংগীত স্তব্ধ হয়, মাত্র তালই চলে পাখোয়াজের সঙ্গে, তালের ঠোকা ও আড়ি। নৃত্য তখন পুরুষের। সংগীতের ইচ্ছাকৃত বিরতি নিশ্চয়ই অনেকে লক্ষ করেছেন। কেন সংগীত স্তব্ধ হয় আমাদের বিচার্য।

ধরা যাক, নৃত্য কথা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, কিন্তু পূর্ণস্বরাজ পাবার পথে তখনও বিপত্তি থাকে। কথা-বিহীন সুর-লীলার মোহকেও তার কাটাতে হবে। কাজটা ভীষণ শক্ত। নানাপ্রকার মধুর মায়া এই দ্বিতীয় স্তরে আমাদের আচ্ছন্ন করে, অন্তত করতে পারে। হুবহু দৃষ্টান্ত দিতে পারব না, কিন্তু দৃষ্টান্ত কল্পনাতীত নয়। রাগিণীর যেমন মেজাজ, স্বর, স্বর-যোজনা, বাদী-বিবাদী, তান-কর্তব, প্রসার থাকে, তেমনি প্রত্যেকটির অনুযায়ী দৈহিক ভঙ্গিমা ও সঞ্চালন খুবই সম্ভব। গৌড়-সারং-এর 'রে গা রে মা গা' যেমন, তেমনি উপযুক্ত মনোভাবের নৃত্যব্যঞ্জনার অনুযায়ী একটি বিশেষ সঞ্চালন কেন হবে না? অতি অল্পস্থলে সত্যকারের আর্টিস্টের ভঙ্গিমায় আমি রাগিণী-রূপের নৃত্যরূপ দেখেছি মনে হয়, যেন পিলুর খোঁচ সে ভঙ্গি ছাড়া প্রকাশ পেত না। বলা বাহুল্য, এই স্তর পূর্ববর্ণিত স্তরের উচ্চে; এবং উদয়শংকর ও তিমিরবরণের সহযোগিতায় যে রূপ উদ্‌ভাবিত হয়েছে সে ভিন্ন অন্যত্র এখনও এই স্তরে আরোহণের নিদর্শন দেশে পাইনি। তবুও আমি শেষস্তরের আলোচনা করছি যেখানে নৃত্য ও সংগীতের সমধর্মিতাও লোপ পাবে। এখানে বাধা তোলে আমাদের হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি। রাগের যে সংজ্ঞা আছে তাই থেকে, এবং ভালো ওস্তাদের মুখে রাগিণীর রূপ বিকাশের ধারা লক্ষ্য করে বলা চলে যে আমাদের গায়ন পদ্ধতিতে আরোহী-অবরোহী ভিন্ন অন্য 'ভুজ' নেই। যন্ত্রসংগীতে তরফের তারের জন্য, একই সঙ্গে একাধিক আঙুল দিয়ে একাধিক তারের আঘাত, অর্থাৎ চিকারা এবং 'জোড়ের' বাজনায় অন্য ভুজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গায়ন পদ্ধতিতেই তানপুরার সাহায্যে অন্য ভুজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুরের জুড়ী, নিম্ন পঞ্চম ও ষড়জ যদি ভালো করে বাঁধা যায় তবে পর্দার সব সুরই আসে একই সঙ্গে। তদ্‌ভিন্ন স্বরের গতির জন্য গাম্ভীর্য ও ভলুম হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। তার ওপর মূলকাণ্ডের আশ্রিত শাখাপ্রশাখার মতন তানকর্তবও

রয়েছে। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে কোনো তৃতীয় প্লেনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না যার ইঙ্গিত আছে শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় 'সন্নাহ' কথাটিতে। যদিও থাকে তবু নৃত্যে, বিশেষত পুঞ্জনৃত্যে আলাপ অচল, সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য অসম্ভব। সেইজন্য নৃত্যে দু-এর অধিক প্লেনভাঙার প্রয়োজন যদি ওঠে তবে প্রযোজকের বিপদ। তাঁর চারটি উপায় আছে এক্ষেত্রে— তানপুরা, অন্যান্য যন্ত্র এবং পাখোয়াজ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ, কণ্ঠের সাহায্যে নতুন ধরনের তান তোলা, বিদেশী হার্মনির প্রবর্তন, কিংবা সংগীতকে স্তব্ধ করা, মাত্র তাল দেওয়া। প্রথম দুটির অর্থই হলো সংগীতের অধীনতা স্বীকার করা; তাদের সাহায্যে নৃত্য স্বাধীন হয় না। তাদের মধ্যে অবশ্য প্রথমটিকে রবীন্দ্রনাথ অবলম্বন করলে খুব ভালো হতো— উদয়শংকরের দলে তানপুরা, সারেঙ্গী, তবলা, পাখোয়াজ, এমন-কি কাঁসরঘণ্টাও ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে তান চলে না এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা তান সাধেন না। বিদেশী হার্মনি জোর জবরদস্তি করে আনার সাহস রবীন্দ্রনাথের নেই, তিনি নিজেই লিখেছেন যে তিনি ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হতে চান না এবং পারেন না। (আজকালকার কনসার্ট এবং তথাকথিত আবেষ্টন সংগীতে এই প্রচেষ্টা চলছে)। অতএব, পূর্ববর্ণিত সব কথাগুলি মনে রাখলে আমরা বুঝব কেন সংগীত মধ্যে মধ্যে চিত্রাঙ্গদায় নীরব হতে বাধ্য। নীরব কিন্তু প্রাণস্পন্দন চলছে। স্পন্দনের ছন্দের মতন তখন আঘাত চলেছে, কিন্তু সে-আঘাতে বাটোয়ারা নেই। জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিক্ষণে আসে সুষুপ্তি— যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ নয়, সরল ও স্বাভাবিক। তাই বলে চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যনাট্য আজ নৃত্যকে উর্ধ্বস্তরে তুলে ধরলে যেখানে গিয়ে তার আত্ম-পরিচয় হলো। নাট্যের জটিলতা আজ সরল ছন্দে পরিণত; শুদ্ধতা অর্জনের ফলে নৃত্য আজ আত্মবিশ্বাসী।

এতক্ষণ আমি নৃত্যের স্বরাজ সাধনের বিবরণ দিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বরাজলাভের পর যে আন্তর্জাতিক মিলন ঘটে সেই প্রকৃত মিলন। তখনই হয় দেশে দেশে প্রকৃত বন্ধুত্ব, কারণ, কেউ কারুর অধীন নয়। শুদ্ধ নৃত্যকলার উদ্‌ভাবন অর্থে সংগীতকে পদানত করা নয়। সব জ্ঞানে, সব কলাবিদ্যার উৎকর্ষের ইতিহাসে দুটি গতি আছে; ত্যাগের দ্বারা শুদ্ধি, এবং শুদ্ধির পর, সমানে সমানে পূর্বপরিত্যক্তের সাথে পুনরায় মিত্রের সম্বন্ধস্থাপন। রবীন্দ্রনাথ, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে, নৃত্যের শুদ্ধতায় আরোহণ করে সম্বন্ধে অবরোহণ করেছেন, তাই চরুকলার সমন্বয় চিত্রাঙ্গদায় সর্বাঙ্গীন হয়েছে। কোনো কলার প্রতি অশ্রদ্ধা সূচিত হয়নি। চিত্র-কলার ব্যবহার কত সুচারু হয়েছে আমি বোঝাতে পারবো না। পূর্বেই শান্তি-

নিকেতনী নৃত্যে রেখার লীলা উল্লেখ করেছি। তার ওপর সাজসজ্জার বর্ণ সমাবেশ এবং রঙ্গমঞ্চের ও দৃশ্যপটের সুব্যবস্থা অত্যন্ত সুচারু হয়েছিল। একাধিক অভিজ্ঞব্যক্তি চিত্রাঙ্গদা অভিনয়কে একটি চলন্ত ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুনেছি, এই সুব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ, শ্রীপ্রতিমা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের কাছে ঋণী।

রঙ্গমঞ্চের ওপর সুব্যবস্থাতেও পূর্বোক্ত সশ্রদ্ধ ব্যবহারের নিদর্শন মেলে। সংগীতমুখর নৃত্যনাট্যের প্রযোজনা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। যেখানে নাট্য সংগীতাধীন সেখানে নাটকীয় গতি রুদ্ধ হয়। আবেগ যায় থেমে যখন শ্রোতৃমণ্ডল নৃত্যরত নায়ক-নায়িকার মুখে গল্প শোনে। পুরাতন কালে যাত্রায় তাই হতো। অতএব, নাটকীয় যুক্তি অনুসারে শ্রমবিভাগের প্রয়োজন উঠেছিল। দ্রুতিরক্ষার জন্য পাত্র-পাত্রী ভিন্ন অন্য একদল গায়ক-গায়িকাকে রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করা হলো। কিন্তু আমাদের বাল্যকালের দেখা যাত্রায় তার ফল হতো বিপরীত। কথাকলি, বলী ও উদয়শংকরের নৃত্যে ফল শুভ হয়েছে। মায়ার খেলা, বাল্মীকিপ্রতিভা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাট্যে এই রীতি অবলম্বিত হয়নি শুনেছি। ইদানীং রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আঙ্গিকটিকে সশ্রদ্ধভাবে ব্যবহার করেছেন। চিত্রাঙ্গদায় তার প্রকৃত বিকাশ। পাত্রপাত্রী ভিন্ন একটি গায়ক-গায়িকার দলকে রঙ্গমঞ্চের পিছনে, কিংবা কোণে বসালে এবং তাদের সংগীতকে প্রাধান্য না দিলে নাটকীয় গতিরক্ষার সুবিধা হয়। এঁরা যাত্রার জুড়ি নন, কোরাসও নন। তাঁরা কেবল পটভূমি, তাঁদের সংগীত কেবল ভূমিকা ও বিচ্ছিন্ন ব্যবহারের সূত্র মাত্র। কবি নিজে রঙ্গমঞ্চের অবস্থান-ত্রিকোণের শীর্ষে বসেন। তাঁর উপস্থিতি ও আবৃত্তি পূর্বোক্ত রীতির চূড়ান্ত নির্দেশ।

অবশ্য ভূমিকা থাকলেই যথেষ্ট হলো না। সূত্র যদি ঘটনাকে না গ্রথিত করে তবে সেটি অনাবশ্যক। কথাকলি প্রভৃতি অভিনয়মূলক নৃত্যে ভূমিকাটি স্থির, গল্পাংশ তাই প্রধান চরিত্রের অভিনয় এবং সাজসজ্জার সাহায্যে প্রকট হয়। মাত্র একটি অর্ধ উচ্চারিত একটানা সুর থাকে, তার উত্থান-পতন ও অন্য বিবর্তন যৎসামান্য, এবং আত্মপ্রচারে যত্নবান নয়। কথাকলি প্রভৃতিতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের পরিচিত ঘটনা অভিনীত হয় বলে শ্রোতাদের গল্পাংশ খোলাখুলি বুঝিয়ে দেবার আবশ্যক থাকে না। এই অবসরে অভিনেতা নিজের আঙ্গিক দেখাবার দীর্ঘ অবসর পান। সাজসজ্জাও এমন ধরনের যাতে চরিত্রের ও তার মূলভাবের প্রকৃতি অতিরঞ্জিতভাবে দর্শকের সামনে সদাবিরাজমান। ভাবগুলির টাইপও মুখোশে মূর্তিমান। (ইংরেজি পার্সনালিটি কথাটির আদিতে রয়েছে পার্সনা = মুখোশ) যেখানে পূর্বপরিচয় রয়েছে সেখানে ঘটকালি উপরন্তু, বাহুল্যের

চিহ্ন। অভিনেতা ও দর্শকের মন পূর্ব হতেই কথাকলি ও বলী-নৃত্যে (অন্যান্য সব দেশী নৃত্যাভিনয়েই) সংযুক্ত। তখন ঐ সাংগীতিক ভূমিকা, (দক্ষিণী ওস্তাদের ভাষায়) শ্রুতির কাজ করে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার গল্প দর্শকের মোটেই সুপরিচিত নয়। অতএব গল্পের বিবরণ দেওয়া এবং নাটকীয় গতি রক্ষা করা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান কর্তব্যের শামিল। এই কর্তব্য-পালনের জন্যই চিত্রাঙ্গদার সংগীতকে কথাকলি অপেক্ষা বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে।

উদয়শংকরের নৃত্যাভিনয়ে ভূমিকাটি প্রযুক্ত হয়েছে। তাঁর রঙ্গমঞ্চের পিছনে গায়ক-বাদকদের দল বসে ভূমিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু সূত্র হিসাবে সাংগীতিক ভূমিকার স্থান কতটুকু আমাদের বিচার্য। সংগীতের ব্যবহার তাঁর কিরূপ? সে ব্যবহারে নৃত্যের স্বরাজ-স্বাধনার পর অন্য চারুকলার প্রতি যে শ্রদ্ধার উল্লেখ করেছি তার কতটুকু বর্তমান? চিত্রকলার ব্যবহার, আমার মতে, উদয়শংকরের নৃত্যে চমৎকার, অর্থাৎ সশ্রদ্ধ। উদয়শংকর নিজে একজন চিত্রশিল্পী। কিন্তু তিনি বোধহয় সেই শ্রেণীর সুরজ্ঞ কিংবা সুররচয়িতা নন। তিমিরবরণ ভট্টাচার্যই (ইদানীং শেরালী মহাশয়) উদয়শংকরের নৃত্যোপযোগী সুর জোগান দেন। দুজনেই উচ্চশ্রেণীর আর্টিস্ট। উদয়শংকরের নৃত্যে আছে মোহন অভিব্যক্তি, এবং তিমিরবরণ ও তাঁর দলের শিল্পীরা যে সেই বিবর্তনশীল নৃত্যের উপযোগী সাংগীতিক বিকাশ দেখাবেন সে আর বিচিত্র কি? তথাপি, দুটি গতির সর্বত্র মিল নেই, কোথাও কোথাও নৃত্যের নাটকীয় পরিবর্তনের অনুরূপ সাংগীতিক নাটকীয় পরিবর্তন যেন পাওয়া যায় না। দুটি প্রকাশভঙ্গি যেন সমান্তরাল রেখায় চলে, সংগীত-নৃত্যের অপরূপ সৃষ্টি হয় না, হয় দুটি রসের, সংগীতের এবং নৃত্যের। নৃত্যের রূপ যখন ফুটছে, তখন নাটকীয় গতি নৃত্যের সাহায্যে সবল হলো, যখন নৃত্য শিথিল, তখন নাটকীয় গতি সাংগীতিক সাযুজ্যের অভাবে ঢিমে হয়ে পড়ল। সাধারণত উদয়শংকরের ব্যক্তিগত কৃতিত্বে, তাঁর প্রতিষ্ঠার আশীর্বাদে, তাঁর প্রযোজনা শিল্পের জন্য এই দুর্বলতাটুকু ধরা পড়ে না— কিন্তু দুর্বলতাটুকু যেন তাঁর পদ্ধতির অন্তর্নিহিত মনে হয়। যেখানে সংগীত উৎকর্ষ লাভ করেছে, সেখানেও যেন অত্যন্ত সন্ত্রস্তচিত্তে উদয়শংকরের পদানুসরণ করাই সংগীতের উদ্দেশ্য, আমার সন্দেহ হয়েছে। অনুসরণও একপ্রকার অনুকরণ, অবশ্য নিজের ভাষায়, তাই সমান্তরাল রেখার উপমা দিয়েছি। উদয়শংকরের পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরা যাক, উদয়শংকর শিবের নৃত্যাভিনয় কল্পনা করছেন; শিবের সঙ্গে ভৈঁরোর একটি সংস্কারগত যোগ আছে; পিছন থেকে ভৈঁরোর সুর উঠল, কণ্ঠে কিংবা বাদ্যে; উদয়শংকর নীরবে, অথচ অপরূপ অব্যক্ত অনুচ্চারিত ভাষায় ও ভঙ্গিতে

নৃত্য শুরু করলেন, তার নানা রূপ ব্যক্ত হলো : পিছনের কনসার্টে কিংবা কণ্ঠে ভৈঁরোর ধুন্-চৌধুন্, তান-কর্তব চলল। দুটিই আমাদের ভালো লাগছে। কিন্তু হঠাৎ যেন কোথায় ছেদ পড়ল মনঃসংযোগে, কান ও চোখ পৃথক হলো, সেই ফাঁকে দীর্ঘ হয়ে ঝুলে পড়ল অভিনয়ের সূত্রটি। শিবপার্বতীর দ্বন্দ্বে দোষটি বর্তমান ছিল, এবং সেই নৃত্যটিই বোধহয় উদয়শংকরের কল্পিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে সংগীত ও নৃত্যের সম্বন্ধ পূর্বপ্রকারের নয়, মিশ্রণের। সে-মিশ্রণের অনুপাত যথার্থ, কারণ, সেখানে নৃত্য স্বাধীন, সংগীতের ব্যবহারও তাই সশ্রদ্ধ। সেইজন্য সমগ্রতা-সৃষ্টির দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা শিবপার্বতীর দ্বন্দ্ব অপেক্ষা বেশি সার্থক হয়েছে মনে হয়। এমন মূর্খ কেউ নেই যে উদয়শংকর কিংবা তিমিরবরণের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যে-কোনো ছাত্র-ছাত্রীর তুলনা সম্ভব মনে করে। তুলনা চলে উদয়শংকরের ধারণার সাথে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী, তাই তাঁর সৃষ্টিকে স্থাপত্য বলতে ইচ্ছা হয়— যেখানে মন্দিরের সঙ্গে পরিবেশের মিলন অঙ্গাঙ্গী, যার মধ্যকার ভাস্কর্য স্থাপত্যের অন্তরঙ্গ, যার দেওয়ালের চিত্র ভাস্কর্যের অনুরূপ, যার পূজারি, উপাসক-সম্প্রদায়ের গঠন, আচার-ব্যবহার, গতিভঙ্গিটিও অত্যন্ত সুসদৃশ, নৃত্যগীত যেন সেই মন্দিরের পাথর গলা স্রোত, যার নৃত্য নিষ্ঠাচারের অঙ্গ। কল্পনা-কৈবল্যের জন্যই চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সমগ্রতার দিক থেকে চিত্রাঙ্গদার আলোচনা করলাম। স্থলবিশেষে ত্রুটি আছে, লক্ষ্যও করেছি, নির্দেশও করেছি। কিন্তু মূল সম্বন্ধে ত্রুটি নেই, সূত্র বিচ্ছিন্ন নয়। বিশেষের আলোচনা আমার সাধ্যাতীত, বিশ্লেষণের ফলে যদি সমন্বয় উপলব্ধিতে বাধা ওঠে তবে সেটি— সেইটুকু বোধ হয় আমার সৃষ্টি।

চিত্রাঙ্গদা দেখে ট্রেনে ফেরবার পথে মনে উঠেছিল নৃত্যের, নৃত্যনাট্যের ভবিষ্যতের কথা। ,এত দ্রুতভাবে, নবজীবনের সঞ্চার হতে না হতেই এমন একটি কীর্তি বাংলাদেশে যে সম্ভব হলো তার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। চিত্রাঙ্গদার মতন অমন একটি সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়, কিন্তু সময় লাগবে। তাই মনে হলো, অতঃপর যে সব আর্টিস্ট জন্মগ্রহণ করবেন তাঁরা একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অনুকরণ করবেন এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবেন। কিন্তু নান্যেব পন্থাঃ। অমন প্রতিভার প্রতি ক্রোধ, দ্বেষ, অকৃতজ্ঞতা আমাদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। স্বভাবে যেটি ফুটতে লাগে দীর্ঘকাল, তাকে অসামান্য প্রতিভার জোরে ফুটিয়ে তোলা— এ অন্যায় মানবপ্রকৃতি সহ্য করে না। অগণিত

যুবকেরা সৃষ্টিকার্যে বঞ্চিত হলো— রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত তাঁর পদ্ধতি বিচার করে, বিচারের পর স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করে। একি হবে? আমার প্রবন্ধ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো যুবকদের জানিয়ে দেওয়া যে চিত্রাঙ্গদায় একটা কিছু হয়েছে— ঐ শ্রেণীর অন্য কিছু না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন।

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

পঞ্চম ভারতীয় সংগীত সম্মেলন

এ বৎসর নিখিল ভারতীয় সংগীত-সঙ্ঘের পঞ্চম বৈঠক পাটনায় না বসে লক্ষ্ণৌএ বসলো। পাটনার অধিবাসীরা এ'তে দুঃখিত হয়েছেন, কিন্তু আমরা আনন্দিত হয়েছি— তাঁদের দুঃখে নয়, গত বর্ষের অধিবেশনের সঙ্গে তুলনা করবার সুযোগ পেয়েছি বলে। অনেকে হয়ত এ-কথায় আপত্তি তুলবেন যে, তুলনার ফলে আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা দুঃখের মাত্রাই বেশী হবে এবং সে আপত্তি খণ্ডনের ক্ষমতা আমার নেই। কেন না, এ বৎসর সুগায়কের অভাব বড়ই অনুভব করেছি। ফৈয়াজ খাঁ বরোদা থেকে আসতে পারেন নি এবং চন্দন চৌবের গলার মিষ্টতা হ্রাস হয়েছে। নসীর খাঁ ইন্দোর থেকে এসেছিলেন বটে, এবং তিনি গমকের পরিমাণও কম করেছিলেন, কিন্তু তাঁর গান জমে নি। কছ্ দেশ থেকে আর এক নসীর খাঁ এসেছিলেন। একদিন মাত্র তাঁর ঠুংরী ভালো লেগেছিল। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকার বৈঠকের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই বছর আমেদাবাদ কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন। তিনি ভাতখাণ্ডেজীর কাছে কয়েক বছর গান শিখে ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য হন। এই তিন রকম শিক্ষার সংমিশ্রণে কী সুফল হয়েছে তা যিনি তাঁর ভৈরবী খেয়াল শুনেছেন তিনিই স্বীকার করবেন। অবশ্য, তাঁর গলা দিলীপকুমারের মতন সুমিষ্ট নয় বটে কিন্তু মোটেই কর্কশ নয়। তাঁর গলায় সব অলংকারই আছে এবং তাঁর গানে আছে সেই অলংকারগুলির অপূর্ব সমাবেশ। তাঁর সুরের বিস্তারে বিভিন্ন রূপের প্রকাশ পেলেও তাঁর গানে একটি বিশুদ্ধ সংগীত রস সৃষ্টি করে— যেটি সাহিত্য রস হতে বিভিন্ন। কথার সঙ্গে সংগীতের অঙ্গাঙ্গী মিলন অবশ্য রাজযোটক এবং রাজযোটকের মতনই সে মিলন দুর্লভ। সাধারণত এ কথা সত্য, কিন্তু বিশেষত বাংলা কীর্তনে, উর্দু গজলে এবং হিন্দী ভজনে, গান কথার এবং সাহিত্য-ঘটিত নানা ভাবের দাসত্ব করে। একটি কারণ বোধ হয়, বেশীর ভাগ সময় গান মানে কবিতায় সুর বসান ছাড়া আর কিছু নয়। গোটা কয়েক সুর অবশ্য কতকগুলি রসের সহায়তা করে। কারণ বোধ হয় সেই সুরগুলির সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার খুব বদ্ধমূল, যেমন বেহাগ, পূরবী আমাদের মনকে উদাস করে দেয়। আর একটি কারণ এই হতে পারে যে, তিনটি বিশেষ পর্দার সংযোগে এমন একটি ঠাটের বিশেষত্ব প্রকট হয় যাকে ভাষার দৈন্য হেতু আমরা একটি বিশেষ

সাহিত্যিক মূল্য দিয়ে থাকি। এ দুটি কারণ ওতপ্রোত ভাবে কার্য করে। যেমন 'দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন' গানটি ছেলেবেলা থেকে পূরবীতে শুনে আসছি। গানটি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, কেননা আয়ুসূর্য অস্ত যাবার আশঙ্কা থাকলে অতি বড় পাপীর মনও উদাসী না হয়ে থাকতে পারে না। অতএব পূরবী মাঠের মাঝে শুনলেই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কেননা উক্ত আশঙ্কাটির কথা স্মরণ না হয়েই থাকতেই পারে না। তার ওপর আবার রবিবাবুর 'ঘাটে বসে আছি আনমনা' এবং 'বেলা গেল' পূরবীতেই গাওয়া হয়। এ অবস্থায় পূরবী শুনে আনমনা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু 'জানকী রমণ, সুখ ভাওন' শুনলেও প্রাণে বড় শান্তি আনে। গানটি রামচন্দ্রের গুণ বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক নিজের গুণ কীর্তন ছাড়া যে আর কারুর গুণ কীর্তন শুনে, তা শ্রীরামচন্দ্রেরই হোক আর যুধিষ্ঠিরের হোক যে শান্তি পাওয়া যায় এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না। অথচ শান্তি পাই— তার কারণ বোধ হয় পূরবীতে কোমল রে এবং দুই মধ্যম, বিশেষ করে শুদ্ধ মধ্যমের গুণে। এই কোমল রে এবং শুদ্ধ মধ্যম যেখানেই ব্যবহৃত হয় সেখানেই সাধারণত শান্তি পাওয়া যায়। সাধারণত বলছি দুই কারণে— প্রথমত, এক একটি সুরের সঙ্গে মনোভাবের সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক হয়নি; দ্বিতীয়ত তাল এবং লয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রসের উদ্‌গম হতে পারে। তা হলেও বোধ হয় যেন সুর, বাদী এবং অনুবাদীর ভিতর একটি সুরের প্রাণ লুকান আছে। যখন কবিতায় সুর বসান হয় তখন সুরজ্ঞ ব্যক্তি কবিতার প্রাণটি প্রকাশ করতে চান এমন একটি সুরের মধ্য দিয়ে— যার সুর, বাদী, অনুবাদী এবং সম্বাদী সুরের সমাবেশ, ঐ রকমই এ সাহিত্য-রসের অনুরূপ হয়। যেখানে হল না সেখানে খটকা লাগেই লাগে। এই সুর বসান বড় শক্ত কাজ। সাধারণত কিন্তু সুরজ্ঞ ব্যক্তি বাদী সুরগুলি না বিচার করেই শস্তায় কার্য চালাতে চান। থিয়েটারের ওস্তাদরা সময়ের অভাবে বোধ হয় এই রকম পরিশ্রমের লাঘব করেন। আমার ঠিক এখন থিয়েটারের কোনো বিশেষ গান মনে হচ্ছে না— তাই একটি উৎকৃষ্ট কবিতা এবং গানকে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে। গানটি রজনী সেনের, 'ফুটিতে পারিত গো' অন্তরার একটি লাইন হচ্ছে 'নিরসতা ভরা এ নিদয়া ধরা, শুকায়ে গেল কলি উষ্ণ শ্বাসে,' আর একটি লাইন হচ্ছে 'দুদিন এসেছিল, দুদিন ভেসেছিল, দুদিন হেসেছিল সুখবিলাসে।' কবিতাটি বড়ই করুণ। করুণতা প্রকাশ পেয়েছে কলি যখন শুকিয়ে যাচ্ছে, এবং যখন সুখবিলাসে হাসার কথা স্মরণ হচ্ছে। এখন যদি ঠিক ঐ দুই জায়গায় চড়া পর্দার রেখা থেকে কোমল নি তে জোর দিয়ে পঞ্চমে আসা যায় তা হলে লোকের চোখেও জল আসে। আমি ও-গানটি অন্তত দুই বার

গেয়ে শ্রোতার চোখে জল আনতে না পারলেও, বক্তার মুখ বন্ধ করেছিলাম। আমার গলার এ কম কথা নয়, যিনি শুনেছেন তিনিই বুঝবেন। এ কার্যের জন্য আমি নিজে বাহাদুরী নিচ্ছি না। বাহাদুরী কবির এবং কোমল নিখাদের। কোমল নিখাদের মোহিনী শক্তির আরও প্রকাশ বাংলা বেহাগে। যেই কোমল 'নি' দেওয়া হয় অমনি লোকের মন ভিজে ওঠে। অথচ ঠিক ঐ ধরনের কোমল 'নি', যখন চড়া 'রে' থেকে না নেমে, যখন scale-এর 'রে' থেকে ওঠে যেমন স্বরটে, তখন লোকের মনে উল্লাস হয়। আমার বক্তব্য এই যে, বাংলা কবিতায় যত স্বর বসান হয়েছে তখন ওস্তাদ কবিতায় রসের বিকাশেরই প্রয়াস পেয়েছেন। স্বরের যে নিজস্ব রস আছে তা ভুলে যান— যখন ভোলেন না, তখন কবিতার একটি কথা, এমন কি অক্ষর নিয়ে তানের তাণ্ডব নৃত্য করেন। তখন না থাকে স্বর, না থাকে কথা। শ্রীকৃষ্ণের গানের কথা ছিল হিন্দী, অতএব তার মানে আমি বুঝিনি, কিন্তু মনে হয়েছিল যেন তাঁর গান শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে উপযুক্ত স্বরের হরিহর মূর্তি ধারণ করেছে। একটি গানের কথা ছিল অতি সামান্য, কিন্তু ভাল লেগেছিল যেন রবিবাবুর একটি উৎকৃষ্ট গানের মতন। শ্রীকৃষ্ণ একটি বড় গুণী।

যন্ত্রী ভাল ছিল অনেকগুলি। ফিদা হোসেন, আলাউদ্দিন এবং হাফেজ শারোদে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন—হাফেজের বাজনা আমাদের সকলেরই মনোহরণ করেছিল। তাঁর বাজনায় এমন একটি দরদ ছিল যেটি ওস্তাদী কেরামতিকে ছাপিয়ে সমঝদার, অ-সমঝদারের প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলেছিল। ফিদা হোসেনের গৎগুলির চাল অতি সুন্দর এবং তাঁর বাজনার দেহভঙ্গিও ভাল। তাঁর ছন্দজ্ঞান অসাধারণ। সে বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়েছিল বীরু মিশ্রের তবলায়। এনায়েৎ খাঁ সেতারে যে গৎগুলি বাজিয়েছিলেন সেগুলি বহুবার তাঁর কাছে শুনেছি, কিন্তু চিরকালই নূতন বলে মনে হয়। তাঁর লয়ের কাজে কিন্তু এত অঙ্কের ছাপ থাকে যে, বেশীক্ষণ তাঁর বাজনা শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ঠিক এইখানে বীরু মিশ্রের হাত খোলে। গতের 'মুখ'গুলি তিনি এত সুন্দর ভাবে পরণ এবং তেহাই-এর সাহায্যে এঁকে যান যে তাঁকে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর সংগতি-জ্ঞান খুবই মার্জিত বলে তাঁর সংগত এতই মধুর। যন্ত্রী যে ছন্দ নিচ্ছেন তিনি সেই ছন্দ বাজিয়ে যাচ্ছেন, যখন আস্তে বাজান হচ্ছে, তাঁর বাজনাও ধীর হয়ে পড়েছে, যখন বাজনা গম্ভীর হয়ে গেল, তখন বাঁয়ার কাজ অরম্ভ হল, যখন স্বর হালকা, তখন তবলার চট্‌পটানিতে প্রাণটা নেচে ওঠে। যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর বাজনা, গেল-বছরের মতনই এ-বছরও সংগীত সভায় এক অতুল সম্পদ। একজন

সত্যকারের শিল্পী, গয়ার চন্দ্রিকাপ্রসাদ এবার এস্‌রাজ বাজিয়েছিলেন। এ-রকম এস্‌রাজ বাজনা আমি কখনও শুনিনি। তাঁর হাত যেমন মধুর, সুরের রূপ প্রকাশ করাবার ক্ষমতাও তেমনি অদ্ভুত। কিন্তু যন্ত্র-সংগীতের রাজা হয়েছিলেন ওস্তাদ মোরাদ খাঁ, বীণকার। আমি শেষান্নার কিংবা উজীর খাঁর বাজনা শুনি নি। যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বল্লেন যে তাঁরা মোরাদের চেয়ে বেশী ভাল বাজান। কিন্তু মোরাদের চেয়ে আর কী ভাল বাজনা হবে তা আমি ভাবতেও পারি না। তাঁর বাজনার যে গুণটি প্রথমেই কানে ধরে সেটি হচ্ছে সংযম। তিনি ফিদা হোসেনের মতো বিষম, অনাঘাত নিয়ে বাহাদুরী দেখান না কিংবা আলাউদ্দিনের মতন আলাপ সাঙ্গ না হতেই দূনে উপস্থিত হন না কিংবা হাফেজের মতন দ্রুত অঙ্গুলি-সঞ্চালনে সুরকে ছিন্ন-ভিন্ন করেন না। তাঁর বাজনা অতিশয় ভদ্র এবং সংযত। বর্তমানকালের একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক যদি পুরাতন ওস্তাদের মতন পরিশ্রম করে বীণা বাজান, তবে তাঁর বাজনা অনেকটা মোরাদ খাঁর মতন হবে। তাঁর বাজনায় অঙ্কের ছাপ নেই, ছন্দের ছাপ আছে। সে ছন্দ যে শুধু তালে আত্মপ্রকাশ করেছে তা নয়। সে ছন্দের বিকাশ হয়েছে শুধু তানে নয়, ঝালা, তার পরণ কিংবা চিকারার কাজে নয়। তার বিকাশে কোন অনাবশ্যকীয় অলংকার নেই। সে ছন্দ আপনার প্রয়োজনীয়তার সৌষ্ঠবান্বিত। সেই জন্য ওস্তাদ মোরাদ খাঁ সুরের আরম্ভ করতেও যেমন জানেন শেষ করতেও তেমনি জানেন। এ-রকম সংগতিজ্ঞান সংগীত-জগতে দুর্লভ।

পণ্ডিত ভাতখাণ্ডের কথা না বললে প্রবন্ধ শেষ করা যায় না। দিলীপকুমার তাঁর জীবন-কাহিনী ইতিপূর্বেই প্রকাশ করেছেন। তিনি এ-বৎসর সন্ধিপ্রকাশ রাগগুলি সম্বন্ধে এক অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন। এত সরল ভাবে কূট বিষয়ের সমালোচনা শোনবার সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি— কি সংগীতে, কি অন্য বিষয়ে। যদি ভারতে সংগীতের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় তা কেবল তাঁরই সাহায্যে হবে তা নয়, তাঁরই শক্তিকে কেন্দ্র করেই হবে। এত বড় শক্তিশালী পুরুষ যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছেন এতে আমরা সকলেই ধন্য হয়েছি।

এ বছর মঞ্চে বসে দিলীপকুমার একটি পিলু এবং একটি বেহাগ ভজন গেয়ে ওস্তাদ-প্রপীড়িত ক্ষুব্ধ-হৃদয়কে বড় তৃপ্ত করেছিলেন। সংগীতজ্ঞান-অভিমানী ওস্তাদ নসীর খাঁ পর্যন্ত মস্তক সঞ্চালন করে দিলীপকুমারকে ধন্য করেছিলেন। তার মধুর গলা, তানের কর্তব এবং ভাবের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি শুনে আমরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। অথচ কোনো ওস্তাদ তাঁর গানে কোনরকম দোষ নির্দেশ করতে সক্ষম হন নি। ওস্তাদের কাছে সুখ্যাতি পাওয়া অবশ্য বড় কথা নয়, তবে

ওস্তাদের মনোহরণ করা বড় শিল্পীর কাজ। ওস্তাদের মন থাকে চোরা কুটরির ভেতর, সে মনের সন্ধান পেয়ে হরণ করা শুধু দুঃসাহসের কথা নয়, বিশেষ গুণের কথা। এমেচার গায়ক-বাদক-সম্প্রদায় ধনবানের দাম্ভিকতা ছেড়ে আসরে নামলে সংগীতের বিশেষ উপকার সাধিত হবে বলে আশা করি।

মনের দুটি ভাষা

চৈত্রের এবং বৈশাখের "বঙ্গবাণী"তে সংগীতবিষয়ক আমার প্রবন্ধ দুটি পড়ে পাঠকের মনে এ ধারণা হতে পারে যে, আমি স্বর কিংবা সংগীতকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে সাহিত্যকে, এমন কি উৎকৃষ্ট কবিতাকেও, অবহেলা করেছি। শ্রীবৎস-চিন্তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আমার জানা আছে, অতএব স্বরকে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে কবিতাকে অবমাননা করার কুফল ভোগ করতে আমি অনিচ্ছুক। রবিবাবুর তাজমহল, অবনীবাবুর মৃতশয্যায় সাজাহান, সাজাহান-রচিত তাজমহলের মতনই আমার ভাল লাগে। তবে যে কারণে আমি পুঁথিগত সাম্যবাদ বিশ্বাস করি না, ঠিক সেই কারণেই আমি প্রত্যেক আর্টের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গিকে শ্রদ্ধা করি এবং কোন্‌টি বেশি এবং কোন্‌টি কম উপভোগ করি শপথ করে বলতে অক্ষম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম বজায় থাকতে যেমন সাম্যবাদের কথাই উঠতে পারে না, তেমনি রসভোগের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ শুষ্ক বুদ্ধির কচ্‌কচি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। রসরাজ্য হতে বহিষ্কৃত হয়েই তুলাদণ্ড বেণের দোকানে এবং বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে আশ্রয় নিয়েছে। সেই তুলাদণ্ডকে উদ্ধার করে তার পুনরাভিষেকে পৌরোহিত্য করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

চল্‌তি কথাবার্তায় ভিন্ন জিনিসের ভিন্ন মূল্য আমরা সকলেই দিয়ে থাকি, যদিও সূক্ষ্ম বিচারের ফলে ও-রকম মূল্যের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় ভাল, মন্দ, উন্নতি, অবনতি, শ্রেয়, শ্রেয়তর প্রভৃতি কথাবার্তা মনের অপরিপক্ক অবস্থার চিহ্ন। বালকবালিকারাই প্রশ্ন করে তাদের মধ্যে কে বেশি লম্বা, কার গায়ে সব চেয়ে বেশী জোর। পরীক্ষায় প্রথম স্থানের ওপর তাদের শ্রদ্ধা নির্ভর করে। কলেজে পড়ার সময়ে প্রশ্নের বিষয় স্বতন্ত্র হলেও ধরন একই রকমের,—কে সব চেয়ে সুন্দর দেখতে, কোন্ অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ক্রিকেট খেলায় কার দৌড়-সংখ্যা অধিকতম, কে সব চেয়ে বেশী বার প্রেমে পড়েছে ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এসে 'সভ্য' মানুষ প্রশ্ন করে, ফোর্ড না রক্‌ফেলার বেশী ধনী, লাহারা না ভাগ্যকুলের রায়েরা, কোন্ কোন্ নটের মাসিক আয় লক্ষ মুদ্রারও অধিক, সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় কোন নারী প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, কোন্ ফিল্‌মে ক্রোর ডলার খরচ হয়েছে, কোন্ শহরের বাড়ি সব চেয়ে উঁচু, কোন্ পুস্তক এবং মাসিক পত্রিকার বিক্রী অধিকতম। এই প্রকার 'রেকর্ড ভাঙবার'

প্রবৃত্তি superlatives-এর অজস্র ব্যবহার এবং সংখ্যাতত্ত্বের প্রচুর প্রয়োগ শুধু যে মার্কিন সভ্যতার নিদর্শন হয়ে উঠেছে তাই নয়, আমেরিকায় বড় বড় অধ্যাপকের লিখিত পুস্তকেও ঐ প্রকার বাল-সুলভ সংখ্যামোহ ধরা পড়ে। কবির ভাষায় বলতে গেলে, প্রায় সব আমেরিকানই lisps in numbers, for numbers come! ঐ প্রকার ছেলেমানুষী প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সেখানে অনেক পত্রিকা বের হয়। সংখ্যাই তুলনার মাপকাঠি বলে গণ্য হবার জন্যই একজন আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে লিখেছেন যে, চীনের পার্সিলেন, ছবি, দর্শন, কবিতা সব ছেড়ে দিলেও বলতে হবে যে যেকালে চীনের জন্মহার পৃথিবীর মধ্যে অত্যধিক, তখন মৃত্যুহার ইংলণ্ডের মতন কমে গেলেই চীন-সভ্যতা জগতকে জয় করবেই করবে। সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি এবং মূল্যনির্বাচনের শক্তি না থাকলেও একথা সুনিশ্চিত যে কেবল সংখ্যার ওপর, গণিতের ওপর কোন সমাজতত্ত্ব স্থাপিত করা যায় না। সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় মানুষেরই কার্যাবলী এবং সেই মানুষেরই মন বলে একটি পদার্থ আছে— যেটি চিন্তা করে, আকাঙ্ক্ষা করে। চিন্তার ধারা যাই হোক না কেন, তার একটি স্বভাব এই যে সে-ধারা সব বাঁধা-ধরা নিয়মকে নিষ্ঠুরভাবে ওলট্-পালট্ করে দেয়, এমন কি অধ্যাপকের সুবিধা এবং গাম্ভীর্যকে যথেষ্ট খাতির না করেই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, তার একটি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সংখ্যামোহ এবং অঙ্কশাস্ত্রের শাসন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। হিসাব থেকে রেহাই পাবার জন্যই গরীব গৃহস্থ ক্রোরপতি হবার বাসনা পোষণ করেন এবং প্রতিবৎসর ছেলে-মেয়ের জামা না কিনে ডার্বির টিকিট কেনেন। ব্যবহারিক জগতেই যদি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হয়, তা'হলে রসের ক্ষেত্রে ত কথাই নেই। Moonlight sonata শুনে যদি কেউ জ্যোৎস্নার candle-power বিচার করতে বসে তা'হলে তাকে আমরা বাতুল বলি। ক্লাসে ব'সে কোন্ কবিতায় সব চেয়ে বেশীসংখ্যক যুক্তাক্ষর কি স্বরবর্ণ আছে, ক'বার 'প্রেম' কথাটির উল্লেখ আছে এই ধরনের বিচার-পদ্ধতি চলতে পারে, কিন্তু ক্লাসের বাইরে, যেখানে রসসৃষ্টি সম্ভব, সেখানে ঐ প্রকার মূল্যনির্ধারণ একেবারেই চলে না। সেইজন্য আমি মনে করি যে, সুর বড় না কবিতা বড় যাচাই করা বেণে-বুদ্ধির কাজ এবং রসভোগের অন্তরায়। সুর সাহিত্যের চেয়ে 'অধিক' পরিমাণে এবং 'উচ্চ' ধরনে আনন্দ দেয় কিনা প্রশ্ন করা যেমন শিশুসুলভ জ্ঞানানুসন্ধিৎসা, তেমনি সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পিতৃসুলভ স্নেহান্ধতাই বলে মনে হয়। মানুষের মন অত্যন্ত কুটিল, তার প্রবৃত্তি নিতান্ত জটিল। মানুষের মন কলের মতন সোজাসুজি কাজ করে না। সংখ্যাতত্ত্ব কিংবা গণিত dead forms-কেই নিয়মে গ্রথিত করতে পারে

এবং মোটামুটি সরল ধারাগুলির দিক্ নির্ণয় করতে পারে। মানুষ জীবন্ত জীব; জীবন্ত রূপের নিয়ম Spengler সাহেব, Pareto সাহেবও বার করতে পারেন নি, কেননা জীবন সর্বদাই উদ্ঘাটিত হচ্ছে। উদ্ঘাটনের উদ্ঘাটিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তথ্য নেই যে সংখ্যার সাহায্যে তার প্রকৃতি ধরা পড়বে কিংবা মূল্য নির্ধারিত হবে।

এ-সব কথার মানে এ নয় যে মূল্যের আপেক্ষিকতা নেই। রবিবাবু যে দেশের অন্য সকল কবির চেয়ে ঢের বড় বেশ বুঝতে পারি এবং দিলীপকুমার ওস্তাদ না হয়েও যে অনেক ওস্তাদের চেয়ে ভাল গান করেন জোর করেই বলতে ইচ্ছে হয়। মানুষের সাধারণ ব্যবহারে অনেক রসের সঞ্চার হয় দেখা যায়। সাপের বিষ নেই নেই করতে উপে যায় শুনেছি, কিন্তু মানুষ যতদিন সোঽহং-জ্ঞানী না হচ্ছে ততদিন সে ভাল, মন্দ, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি কথা কইবেই কইবে। শুধু তাই নয়,—কোন্‌টা উচ্চ, কোন্‌টা উচ্চতর এবং কোন্‌টা উচ্চতম এই প্রকার আপেক্ষিক বিচার মানুষকে সদা-সর্বদাই করতে হয়। মূল্যের পর্যায় নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ সে ক্রমের ভিত্তি যাই হোক না কেন। 'যাই হোক্ না কেন' বল্লে অবশ্য মন বোঝে না। বুদ্ধির স্বভাবই হচ্ছে সুবিধা খোঁজা, অর্থাৎ formula কিংবা মন্ত্রের সাহায্যে নিজেকে অবসর দেওয়া এবং কুঁড়েমি করা। সেইজন্য সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতাকে একটি পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা বরাবরই চলছে, এবং উক্ত কারণেই মূল্যের পর্যায় কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রশ্ন সকলেরই মনে ওঠে। এই প্রশ্নের সোজা কথায় উত্তর দিতে সব দার্শনিক চেষ্টা করেন, কিন্তু সব উত্তরই অসম্পূর্ণ থাকে। তার কারণ এই যে, উত্তর দেবার পূর্বেই ঠিক করতে হয় যে মূল্য একটি বাহ্য সত্তা যেটি বস্তুর গুণ মাত্র, না আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার একটি বিশেষ অবস্থা, না আমাদের মনেরই স্বাধীন সৃষ্টি বস্তু-সাপেক্ষ মোটেই নয়। উত্তর ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে যখন আমরা দেহ ও মনের সম্বন্ধে নিজেদের অসীম অজ্ঞতা বুঝতে পারি। দেহ-বিজ্ঞান দৈহিক প্রকরণ এবং পরিবর্তন দিয়ে ভাবপ্রকরণকে ব্যাখ্যা করে। কোনো কোনো দর্শনশাস্ত্র আবার দেহকে মানেই না। আবার ভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিন্ন স্তর রয়েছে; এক স্তরে যে ব্যাখ্যা খাটে, অন্য স্তরে সে ব্যাখ্যা খাটে না! ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে সকালে চায়ের সঙ্গে কুইনিনের বড়ি উপকারী, সে তুলনায় বর্তমান সাহিত্যিকবৃন্দকে, বিশেষ করে "কল্লোল" "কালি-কলমের" লেখকদিগকে, চায়ের সঙ্গে রোজ একপাতা করে ভূদেববাবুর সামাজিক কিংবা পারিবারিক প্রবন্ধ জোর করে পড়ালে যে বিশেষ উপকার হবে না সে-কথা বলাই বাহুল্য। সন্দেশে কেউ কেউ বেশী চিনি পছন্দ করে, কেননা চিনি খেলে

শক্তি সঞ্চয় হয়। সেই তুলনায় বাংলা কবিতায় কেবল মধুর ভাবের সমাবেশ, কিংবা শ্রাদ্ধ-বাসর থেকে আরম্ভ করে বিবাহ-বাসর পর্যন্ত কীর্তন গাওয়াই প্রশস্ত এ-কথা এক ভক্ত ছাড়া অন্য আর কেউ বলে না। শৈশবে মিছরী ভাল লাগে, যৌবনে জয়দেবের লালিত্য ভাল লাগে, বৃদ্ধবয়সে রাস-পঞ্চাধ্যায় প্রায় সকলেরই ভাল লাগে, অতএব 'ভাল লাগা'কে সর্বসময়ে এবং সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকার মূল্য নির্ধারণের সর্বসাধারণ গুণনীয়ক বিবেচনা করা গণিতশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত হলেও সত্য সিদ্ধান্ত নয়। সোজা কারণ এই যে, উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত মানতে হলে অন্য অভিজ্ঞতা— যা আপাতমধুর নয়— তাকে বাদ দিতে হয়, এবং সর্বপ্রকার রসভোগকেই এক স্তরে ফেলতে হয়— যা একেবারেই অসম্ভব। ভাল-লাগা না-লাগা সময়-সাপেক্ষ, সময় মুহূর্তের সমষ্টি এবং মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী। সময় একটি বহমান ধারা। শুধু তাই নয়, আমার ভাল-লাগা না-লাগা অনেক সময়েই অন্যের ভাল-লাগার ওপর নির্ভর করে; পরের কী জন্য ভাল লাগছে, কি লেগেছিল জানবার সুবিধা আমাদের নেই। এখানে আন্দাজ করতে হয়। ঠিক আন্দাজ করবার শক্তি সকলের নেই। অতএব পছন্দ, অ-পছন্দের যখন দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী ভিন্ন স্তর রয়েছে, তখন সুখ-দুঃখ কিংবা, ভাল-লাগা না-লাগার কাঠামোতে সব মূল্যকে আবদ্ধ করলে হয়ত একটা system তৈরি হতে পারে, কিন্তু কোনো প্রকার রসানুভূতির সত্য ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না।

রসানুভূতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার এই যে, কোন্‌টি কার চেয়ে ভাল ঠিক করবার সময়ে আমাদের পূর্বতন সংস্কার, স্মৃতি-শক্তি, ঔচিত্য-জ্ঞান,— অর্থাৎ সামাজিক ধর্মাধর্মজ্ঞান— বিচার-শক্তিকে খর্ব করে প্রকাশ্যে না হলেও অলক্ষ্যে। অনেক স্ত্রী-পুরুষের ধারণা এই যে, পারিবারিক জীবনেই তাদের পরম সার্থকতা। অতএব পারিবারিক জীবন-ভঙ্গের বর্ণনা কখনও সাহিত্য হিসাবে ভাল হতে পারে না— অন্তত সে বর্ণনা যখন মাতৃভাষায় লিখিত হয়। সে-জন্য 'ঘরে-বাইরে,' 'নৌকাডুবি' অপাঠ্য। সমাজে বিধবা-বিবাহ এবং প্রেমে পড়বার স্বাধীনতা না দিলে, পতিতাদের এবং পতিত চাষীদের উদ্ধার না করলে, দেশের কোনো আশা-ভরসা নেই, অতএব যে-কেউ ঐ মতগুলির সমর্থন করে যা-তা লিখুক না কেন তাই সাহিত্যপদবাচ্য হবে। আমি বৈষ্ণব, রাধা নামে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, ধর্ম-হিসাবে এই রকম দশা পাওয়া দশ-দশার ওপরেও হতে পারে, কিন্তু উক্ত কারণে কীর্তনের কান্নাই সুরের শ্রেষ্ঠ বিকাশ মনে করাতে সুরজ্ঞ মনের পরিচয় দেওয়া হয় না, বরঞ্চ আমার মাথার মধ্যে একটি বৃহৎ গণ্ডগোলেরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এই জন্যই অন্তত কোনো theory of values ধর্মজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত না করে

মনোবিজ্ঞানের ওপর, অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত করাই সমীচীন মনে হয়। আমি এখানে কোনো ব্যক্তিগত ধর্মের কথা বলছি নে। যাকে রবিবাবু Personality বলেছেন তারই ওপর শেষকালে সব মূল্যই নির্ভর করে। কিন্তু Personality-র কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, নেই বলেই বোধ হয়। যতক্ষণ না সংজ্ঞা দেওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ মনের তরফ থেকে একটি কাজ-চালানো সংজ্ঞা ঠিক করা দরকার মনে করি। যদি কখনও সরল ভাষায় Personality-র স্বরূপ বোঝাতে পারি, তখন, আশা করি, প্রমাণ করা শক্ত হবে না যে, বর্তমান সংজ্ঞাটি Personality-র স্বরূপ বোঝাবার অনুকূল। একটি কোনো ভাবের বিপত্তি ঘটলে কোনো ব্যক্তির কার্যের কি ভাবনার যতখানি বিচ্যুতি ঘটে সেই বিচ্যুতির শক্তি এবং পরিমাণের ওপরই মূল্য নির্ধারণ খানিকটা স্থাপিত করা যায়। আপাতত আমি এই মনে করি। অন্য সংজ্ঞা দেবার অধিকার আমার আছে, আশা করি পাঠক-পাঠিকারা তা স্বীকার করবেন।

ব্যাপারখানা এই যে, সব গোলমালের কারণ ভাষার অর্থ নিয়ে। সাধারণ কথাবার্তায় যে-কথাটি কিংবা যে-বাক্যটির যে অর্থ মনে করে ব্যবহার করি তর্ক কিংবা বিচারের সময় স্ব-ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সেই কথা কিংবা বাক্যের একই বাক্যে যদি একটি কথার দু'ই বার প্রয়োগ থাকে তা'হলে সাধারণত দেখা যায় যে, দ্বিতীয় প্রয়োগের অর্থ, আমাদের অলক্ষ্যে, প্রথম প্রয়োগের অর্থ হতে ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এই যেমন 'কারণ' কথাটি। গ্রামোফোনে সুরের 'কারণ' রেকর্ডে সূচলাগান, যুদ্ধের 'কারণ' মানুষের মধ্যে জাত্যাভিমান এবং ভেদজ্ঞান, সৃষ্টির 'কারণ' ভগবানের লীলা— এই তিনটি বাক্যে 'কারণ' কথাটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম কারণ কার্যের মুখটি উস্কে দিয়েই ক্ষান্ত, এখানে কার্যকারণের সম্বন্ধটি অতি ক্ষীণ ; দ্বিতীয় কারণ কার্যের background হিসাবে সত্য, এখানে কার্যকারণ সম্বন্ধটি যোদ্ধার মনে যুদ্ধের সময় সত্য নয় ; এবং তৃতীয় কারণটি তর্কবুদ্ধির নিষ্ফলতা এবং পরাজয়ের চিহ্ন বলেই গণ্য হচ্ছে। সেইজন্য অন্তত শেষের দুটি বাক্য নিয়ে অত বাজে তর্ক এবং বই লেখা হয়েছে। অতএব প্রথমেই কোন্ কথা কী ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তাই বুঝতে হবে।

আজকালকার মনোবিজ্ঞানে বলছে যে মন নিজে হতে জ্ঞান সঞ্চয় করে image অর্থাৎ প্রতিবিম্বের সাহায্যে। যদি কোনো দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, কি পুরাতন ভাবনা ও অনুভূতি মনে ওঠে, জ্ঞানতই হোক আর অজ্ঞানতই হোক তখন একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। এতদিন ধারণা ছিল যে প্রতিবিম্ব মাত্র দুই প্রকারের — বস্তুগত (concrete) এবং কথাগত (verbal)। এর মধ্যে কোনোটি কানের,

কোনোটি চোখের, কোনোটি ত্বকের, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে মনে ওঠে। সেইজন্য অনেকে ভাবতেন যে, প্রতিচ্ছবি যার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে, সেই সুরজ্ঞ হবে এবং যার চোখের সাহায্যে বেশি ওঠে সেই চিত্রকর হবে; অবশ্য শিক্ষা-দীক্ষার পর। কিন্তু এখন পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, মনের কোনো শক্তি কিংবা বিশিষ্ট ভাবধারার সঙ্গে এইরূপ image-types-এর কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নেই। তাই যদি হয়, তা'হলে আমাদের জানতে হবে যে এমন কোনো মানসিক কার্য কিংবা ঘটনা সম্ভব কিনা, যার নিজের কোন রূপ থাকুক আর না থাকুক অন্তত যার কথাগত ও বস্তুগত প্রতিবিম্ব মনের মধ্যে ভেসে ওঠে না। যদি সম্ভব হয় তা'হলে সেই প্রতিবিম্ববিহীন চিন্তার প্রকৃতি বুঝতে হবে। আমার বিশ্বাস এই যে কথাগত, বস্তুগত এবং প্রতিবিম্ববিহীন চিন্তার পরস্পর সম্বন্ধ এবং তাদের সঙ্গে আমাদের মনের সম্বন্ধটি খানিকটা বুঝতে পারলেই শ্রেয়, শ্রেয়তর, শ্রেষ্ঠ, উন্নতি এবং অবনতি কথাগুলির ভাবার্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে; অর্থাৎ কোন্‌টি সুর, কোন্‌টি সুর নয়, কে কার চেয়ে বড় কবি কিংবা অধিকতর বুদ্ধিমান খানিকটা বুঝতে পারব। এক কথায় শ্রেয় ও শ্রেয়তর বুঝতে হলে 'তর' প্রত্যয়টির মানে শ্রেয় কথাটির আগে বোঝা চাই।

যদি কোনো ছেলেকে প্রশ্ন করা যায় "কথাগুলির যে রকম উল্টো জবাব বলে দিচ্ছি সেইরকম অন্য কথার উল্টো জবাব দাও— সুখ-দুঃখ, ঘৃণা-প্রেম, আকাশ— ?" তখন দেখা যায় বেশীর ভাগ সময় উত্তর হচ্ছে 'পাতাল'। এই প্রকার বিপরীত-বোধের পিছনে কোনো বস্তু-সত্তা নেই। আবার যখন 'কুকুর' কথাটি শুনি কিংবা উচ্চারণ করি তখন কেলো ভুলো জ্যাকিকে মনে না করেও কুকুরত্বের একটি সাধারণ অর্থ জেগে ওঠে,— চার পা, ঘেউ ঘেউ করছে, মাংস খাচ্ছে, তেড়ে আসছে ছুটে পালাচ্ছে ধরনের। এখন পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে কুকুর কথাটি না মনে করেও, কিংবা কুকুরের ছবি না স্মরণ করেও— যেমন স্বপ্নে এমন কি দিবাস্বপ্নেও,— কুকুরের প্রকৃতি এবং অর্থ মনের মধ্যে ভেসে উঠতে পারে। এই প্রকারের অনুভূতি হয় তুলনামূলক বাক্যে— যেমন 'ত্যাগ ভোগের অপেক্ষা বড় জিনিস' কিংবা 'যন্ত্র-সংগীত কণ্ঠ-সংগীত অপেক্ষা শুদ্ধ'। যখন কুতব-মিনার দেখেই তাকে অক্টারলনি মনুমেণ্টের চেয়ে বড় বলি তখন অবশ্য মনের মধ্যে শেষটির ছবি এবং তার একটি আন্দাজি মাপ থাকতে বাধ্য। কিন্তু ত্যাগের কিংবা সুরের তুলনামূলক বিচারে এই প্রকার সংখ্যামূলক মাপকাঠি থাকে না। এ ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার মানে নিজেরা খানিকটা বুঝতে পারলেও সে মানে ভাষার সাহায্যে নিজের কাছে পরিস্ফুট এবং অন্যের কাছে বোধগম্য করবার শক্তি হয়ত আমাদের

সকলের নেই। যে ছবি কিংবা প্রতিবিম্ব কথা কিংবা বস্তুর প্রতীক মাত্র, তার অর্থ থাকতে বাধ্য, এবং সে অর্থ প্রকাশ করাও যেতে পারে, কিন্তু যে চিন্তার পিছনে কোনো কথা কিংবা বস্তুগত প্রতিবিম্ব নেই, শুধু বৈপরীত্য কিংবা আপেক্ষিকতার অনুভূতি আছে, তার অর্থ যদি থাকে, তা'হলে তাকে আমাদের ভাষা এবং বস্তুর সাহায্যে সম্পূর্ণ বোঝান যায় না। এই প্রকার অনুভূতিকে নব্য মনোবিজ্ঞানে awareness বলা হয়।

অবশ্য ব্যবহারিক জগতে কথাগত এবং বস্তুগত ভাব অ-বস্তু এবং অ-বাক্ ভাবের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশি। কথার সুবিধা এই যে, মনের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা আমরা কথার দ্বারাই মানসিক ভাবগুলিকে অন্যের নিকট বিশদতর করতে পারি। শুধু তাই নয় কথার সাহায্যে অনেক নতুন ভাবের ও ভাবনার উদ্রেক হয় এবং পুরাতন ভাবের অস্পষ্টতা দূর করতে পারি। বস্তুর সাহায্যে অর্থ প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু সে অর্থ পরিষ্কার নয়, কারণ এক একটি বস্তু অদ্বৈত এবং অপরিবর্তনীয়। কথাগত প্রতিবিম্বের কাজ হচ্ছে চিন্তাকে স্থায়ী করা, যে বস্তুর প্রতীক তার প্রকৃতি ধার্য করা এবং চিন্তাধারার যুক্তি-বিচার করা। শেষে অবশ্য কথা চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বাধীন হয়। কথা স্বাধীন হলে অনেক সময়ে ধরতাই বুলিতে পরিণত হয়। কথার আবৃত্তি, সাধারণত ভাবনার নিবৃত্তিরই পরিচায়ক,— যেমন আমাদের সমাজে মন্ত্রতন্ত্রের অবস্থা হয়েছে এবং স্বরাজ কথাটি খবরের কাগজে এবং গোলদীঘির বক্তার মুখে যে-অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু স্বরাজ কথাটি ১৯০৭ সালের নৌরজী কংগ্রেসে এবং তিলক, চিত্তরঞ্জনের মুখ হতে উচ্চারিত হয়ে অনেক নতুন চিন্তার উদ্রেক করেছিল। কথার জন্যই, অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতে সুবিধার জন্যই, আমরা অনেক ভাবের শ্রাদ্ধ করি। কে আর পুরাতন মন্ত্রকে নতুন অর্থ দিয়ে সঞ্জীবিত করে! World Phenomenon (প্রপঞ্চ) একটি ধারা সকলেই জানে, কিন্তু ধারা কিংবা গতি বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়। সেইজন্য আমরা সুবিধা অনুসারে প্রপঞ্চকে ভাগ করে ফেলেছি, তার গতি রুদ্ধ করেছি। ফলে, ধারার প্রথমাংশ শেষাংশের বিপরীত বলে মনে হয়। ঐ সব স্বকৃত বিরোধের মধ্যে সত্য আত্মগোপন করে। এই যেমন, হৃদয়-বৃত্তি এক প্রকারের, বুদ্ধি-বৃত্তি অন্য প্রকারের, সেইজন্য হিন্দুস্থানী সংগীত, বিশেষত ধ্রুপদ-খেয়াল বুঝতে মাথা খাটাতে হয়, তাদের আনন্দ intellectual ; এবং রবিবাবুর গান ও কীর্তন উপভোগ করতে হয় প্রাণ দিয়ে— তাদের আবেদন ভাবগত বা emotional ;— যদিও খেয়ালে প্রাণ থাকতে পারে এবং কীর্তন কিংবা রবিবাবুর গান উপভোগ করতে হলে মাথায় কিছু ঘি থাকা চাই, এই কথাই সত্য। এই যেমন, বর্তমানে স্বাদেশিকতা প্রয়োজনীয়

এবং বিশ্বজনীনতা অপ্রয়োজনীয়, যদিও সত্য কথা এই যে এ দুটির মধ্যে কোনো সামগ্রিক বিরোধ নেই ও থাকতে পারে না। যেখানে ঘটনার ধারাটি নিরবচ্ছিন্ন তখন তাকে ছিন্ন করে, তুলনা, উপমা, বিরোধের সাহায্যে, কিংবা কালচক্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে, আমরা বুঝতে এবং বোঝাতে যাই বটে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা সার্থক হয় না, কারণ বিশেষণ দিয়ে বিশেষ্যের সত্তার সম্যক উপলব্ধি হয় না। বিচ্ছিন্নতার জন্যই গোড়া থেকে এক একটি কথা অসম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। কিন্তু এই ভুলের সংশোধন কথার সাহায্যে অসম্ভব। সেইজন্য অন্য ভাষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যে ভাষায় দুটি কথার মধ্যে অতখানি অবসর নেই। কথার বাঁধন ঠাস্-বাঁধন নয়।

Ogden এবং Richards-সাহেবদ্বয় দেখিয়েছেন যে পাঁচ রকম ভাবে কথার প্রয়োগ হতে পারে। প্রথমত বস্তুর নাম হিসাবে— যেমন রাম, শ্যাম, গঙ্গা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, শ্রোতার প্রতি বক্তার মনোভাব প্রকাশের হিসাবে,— যেমন 'মহাশয়' বলে শ্রদ্ধেয়কে সম্বোধন করি, এবং 'ছোক্‌রা' বলি বয়স্যকে ঠাট্টার ছলে। তৃতীয়ত বস্তুর প্রতি বক্তার মনোভাব দেখান হিসাবে,— যেমন রবিবাবুর গানে 'মনের কামনা' এবং "কল্লোলে"র পাতায় 'মনের কামনা'। চতুর্থত, উচ্চারণের ফলে মনোভাবকে বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দেওয়া হিসাবে— যেমন 'যা ইচ্ছা তাই' এবং 'যাচ্ছেতাই'। পঞ্চমত, যখন কোনো বস্তু কি ভাবের স্বরূপ ধরতে পারছি না কিংবা অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারছি না তখন বোঝবার এবং বোঝাবার সাহায্য হিসাবে— যেমন 'এই মনে করুন' 'এই সত্য কথা বলতে কি' ইত্যাদি। অতএব কথার আদর্শ হচ্ছে সেই ভাষা যেখানে বর্ণনা করতে গিয়ে মনের কোনো attitude প্রকাশিত হবে না, প্রকাশিত হবে শুধু বস্তু, ঘটনা, সম্বন্ধগুলি। আদর্শ ভাষার একই মানে সকলের কাছে একই হওয়া চাই। কথা যোজনার রীতি-নীতি একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইখানেই ভাষার সামাজিকতা প্রমাণিত এবং পরীক্ষিত হয়। ভাষা পুরাতন হলে গোটা কয়েক অভ্যস্ত বুলি. সামাজিক ভদ্রতার নিদর্শন বলে গ্রাহ্য হয়— যেমন নিমন্ত্রণ পত্রের পাঠ, 'Goodmorning', 'Fine weather' প্রভৃতি। এক কথায় বলতে গেলে, নতুন চিন্তার জন্য কথার খানিকটা স্বাধীনতা থাকবে, কথার সঙ্গে কথার সম্বন্ধ, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের ন্যায় এবং যুক্তিপুর্ণ (logical) পারম্পর্য থাকবে, যে-স্বাধীনতার জন্য ভাবধারা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হবে, যে সম্বন্ধের জন্য সন্দেহ এবং অস্পষ্টতা দূরীকৃত হবে, এবং যে-পারম্পর্যের জন্য সত্তার একত্ব এবং নিরবচ্ছিন্নতা অন্তত আংশিক ভাবে রক্ষিত হবে।

কথায় কিন্তু কতটুকু অংশ রক্ষিত হয়? কথায় যে চিন্তাধারা ধরা পড়ে,

তার গতি ও যুক্তি রেখা ধরে চলে,— ছাপার অক্ষরেরই মতন। মনের গতি ও যুক্তি সব সময় ওভাবে চলে না। সেইজন্য অন্য ভাষা চাই। সুরও মনের একটি ভাষা; একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি। সুরের এক একটি স্বর এক একটি অক্ষর, দুই তিনটি বিশিষ্ট স্বরের সমাবেশ যেন একটি কথা, এবং সুরটি যেন বাক্য। সব প্রকার প্রতিবিম্বই সাহিত্যের ভিত্তি, কিন্তু সুরের পিছনে কোনো বস্তুগত কিংবা কথাগত প্রতিবিম্বই নেই, আছে imageless thought. কথার যুক্তি আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে, অর্থ আছে, সুরে নেই। কথার অবসর আছে, সুর অবিচ্ছিন্ন। এখন কোন্ ভাষার দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে কতখানি বিশদরূপে ব্যক্ত করতে পারা যায় এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমার মতে এ প্রশ্নের জবাব নেই। কারণগুলি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মোদ্দা কথা এই যে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় কথার সাহায্যে; কথার পিছনে যে-সব প্রতিবিম্ব, যে-প্রকার সংখ্যার ঘটা এবং সংস্কারের ছটা থাকে, সেগুলিরও অতিরিক্ত অনেক প্রক্রিয়া উত্তর দিতে গেলে মনের মধ্যে তৈরি হয়। সেই সব প্রক্রিয়াকে বাদ দিলে সত্তা ধরা পড়ে না! সেগুলিকে গ্রহণ করলেও যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাও নয়। কথা ও সুরের অতিরিক্ত যদি কোনো ভাষা থাকে তা'হলে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে ভাষা একমাত্র যোগীরা জানেন, দুঃখ এই যে আমরা তাঁদের ভাষা জানি না। তা সত্ত্বেও কথা ও সুর এই দুই প্রকার ভাষার সম্বন্ধ নিয়ে গোটা কয়েক মন্তব্য প্রকাশ করা যেতে পারে। মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে যদি ভালমন্দের রায় দিয়ে ফেলি, তা'হলে প্রথমত সেটি ভাষার দোষ, এবং দ্বিতীয়ত আমার ভাষার দোষ। আমার ভাষার দোষ কোথায় আমি ভালরকমই জানি।

সুরের দিকে সাহিত্যের এক প্রকার প্রকাশ আছে। এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, কবিতার অর্থ সুস্পষ্ট না হলেও, অর্থাৎ গদ্যে পরিণত না করতে পারলেও, সুরের দিক দিয়ে কবিতার একটা মূল্য থাকতে পারে। যেমন ইংরাজী সাহিত্যে সুইন্‌বর্নের অনেক কবিতা, রবিবাবুর 'সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে' প্রভৃতি কবিতা, এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের অনেক ফরাসী কবিতা। মরমী (mystic) কবিগণ এই সুরের রেশ ধরেই অন্য রাজ্যে প্রবেশ করেন, নতুবা দর্শনের ল্যাজ ধরে নয়। শেক্‌সপীয়রের Merchant of Venice এবং মেটারলিঙ্কের Peleas and Melisanda নাটকখানিতেও সুরের রেশ রয়েছে। ওয়ালটার পেটার, হুইস্‌লার, এবং অনেক ফরাসী সমালোচক বলেছেন যে কবিতার এমন কি ছবিরও, সুরের দিকে অভিব্যক্তিতেই তাদের চরম সার্থকতা। এই মন্তব্যের মধ্যে সত্য এইটুকু যে যেকালে কবিতার কথা ও ছন্দবিন্যাস চিন্তার

ধারাকে অগ্রসর করে দেয়, তখন সে ধারা একমাত্র বস্তু ও বাক্যের অতিরিক্ত প্রতিবিম্ববিহীন রাজ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে যাবে, সুরের দিকে, বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা জেনেছি যে, সুর শুনে সুরেলা লোকের মনে কোনো বস্তু কিংবা কথার প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে না, স্বর-সংশ্লিষ্ট চিন্তার ধারাই খুলে যায়,— ইমন-কল্যাণের শুদ্ধ মধ্যম শুনে বেলাওলের মধ্যমের কথা মনে পড়ে। বিলাতী সুরে পাখির কলরব, সমুদ্রের কল্লোল প্রভৃতি শব্দের অনুকরণ আছে, কিন্তু স্বরের সাহায্যে পাখির ডানার, কিংবা সমুদ্রের বর্ণের নিবিড়তার উল্লেখ নেই, আছে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসের আভাস। কীট্‌সের Hyperion এ ইয়ুরেনসের বক্তৃতায় এই প্রকার মর্মরধ্বনির ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে বর্ণনার বাহাদুরী তুলনায় এবং সুরাত্মক ছন্দে। যদি কখনও কেউ স্যার লাণ্ডন্ রোনাল্ডের মতন রবিবাবুর 'বলাকা' কবিতাটিকে সুরে গ্রথিত করতে পারতেন, তাহ'লে দেখা যেত যে সুরের ভাষা কথা হতে কত পৃথক। নন্দলালবাবুর বলাকা নামক ছবিখানি ছবি হিসাবে একখানি উৎকৃষ্ট ছবি। কিন্তু সেটি 'বলাকা' কবিতার তুলির তর্জমা নয়। সে ছবিখানি দেখলে সুরাত্মক কোনো চিন্তার ধারা উন্মুক্ত হয় না, কিন্তু 'বলাকা' কবিতাটি শুনলে সুর ও ছবি দুই মনের পটে ভেসে ওঠে। অবশ্য মনের ওপর হিন্দুস্থানী সুরের কী প্রভাব তা জানি না, সে বিষয়ে কোনো পরীক্ষা হয় নি, তবে এটা জানি যে টোড়ী কি আসোয়ারী শুনলে হরিণ ও সাপের ছবি মনে আসে না। সেইজন্য রাগ-রাগিণীর কোনো চিত্রগত মূল্য নেই। সেদিন *Illustrated London News*-এ একটি মেয়ে অনেক সুরের ছবি এঁকেছে দেখছিলাম ; তিনি নাকি সুরগুলির নাম পর্যন্ত জানতেন না। না জেনে ছবি এঁকেছেন, তার সঙ্গে সুরগুলির বিষয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই থেকে প্রমাণ হয় না যে সুরের আত্মা প্রেতাত্মার মতন আকৃতি ধরতে পারে, যে আকৃতি হিস্টিরিয়া-প্রবণ গায়ক কিংবা মেয়েপটুয়ার মিডিয়মে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সুরের রূপ আছে, সেই রূপটি অনুভব করে কবি ও চিত্রকর নিজেদের বিশিষ্ট ভাষায় নতুন রূপ সৃষ্টি করতে পারেন। এ সৃষ্টির রূপ সুরের রূপ হতে পৃথক, তার প্রতিচ্ছবি মোটেই নয়। সে যাই হোক এ কথা সত্য, যে-ভাষা যত অ-প্রকাশিত imageless thought-কে প্রকাশ করবে সে-ভাষা ততই সুরেলা হবে এবং সুরেলা হওয়া ভাষার সম্পদের কথা।

কথা ও সুর সম্বন্ধে দ্বিতীয় মন্তব্য এই হতে পারে যে যেখানে কথা হার মেনে কাঁদে সেইখানেই সুর আরম্ভ হয়। অর্থাৎ সাহিত্য ও সুর একই মনের ভাষা, তবে ভিন্ন স্তরের। আমি এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের সম্বন্ধকে অস্বীকার করছি না।

অসভ্য অবস্থার চিৎকার এবং অঙ্গভঙ্গি ছেড়ে দিলে, সভ্য মানুষ সর্বপ্রথমেই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে কথা দিয়ে, তারপর কথায় সুর মিশিয়ে। শেষ অবস্থা অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌। অতদূর না গিয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। ঐ পর্যায়টি কেবল সময়-সাপেক্ষ, গুণ-সাপেক্ষ নয়, কেননা কথা যা পারে সুর তা পারে না, এবং সুর যা পারে কথা সে কাজ পারে না, এবং কথা ও সুর দুই-ই সত্তাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম। যা প্রকাশিত হচ্ছে তাই সৎ, কিন্তু যাই সৎ তাই প্রকাশিত নয়। সময়ের কিংবা পর্যায়ের এমন কোনো অন্তর্নিহিত মর্যাদা নেই যার বলে যেটি পরে আসে সেটি পূর্বের অপেক্ষা শ্রেয়। (এই হিসাবেই সামাজিক উন্নতির কোনো অর্থ নেই।) পরে এলে যদি উদ্দেশ্যসিদ্ধির অধিকতর সুবিধা হতো, তা'হলে না হয় সুর কথার চেয়ে বড় হতো। কিন্তু বিশেষ্য যখন তার সমস্ত বিশেষণেরও অতিরিক্ত, এবং আদর্শ ভাষা যখন ethical attitude বর্জিত, তখন, সুর বড় না সাহিত্য বড়, এ কথাই ওঠে না। অর্থ এবং যৌক্তিকতার দ্বারা কথা সত্তার রূপ প্রকাশ করে, সুর কিন্তু অর্থের ধার ধারে না, যৌক্তিকতা মানে না। সুর হচ্ছে একটি স্বরে তৈরি symbol মাত্র। সুর প্রতীক সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত, যে-প্রতীক বস্তুর, কিংবা কথার আভাস হতে পারে, প্রতিকৃতি কিংবা প্রতিচ্ছবি মোটেই নয়। যতটুকু আভাস দিয়ে বোঝান যায় সুর ততটুকুই বোঝাতে পারে, বেশীও নয় কমও নয়। এই হিসাবে সুরকে সংগীতেরও অতিরিক্ত বলা যেতে পারে, সত্তার সম্পূর্ণতর প্রকাশ হিসাবে নয়। লোকে যখন 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' কিংবা পিনাল কোডের সূত্রগুলি এক বাসর-ঘর ছাড়া অন্য কোথাও গায় না, তখন সংগীতে কবিতার আবশ্যকতা আছে এ-কথা বলতেই হবে। কবিতায় কথা চাই, বাক্য চাই, সব বাক্যের অর্থ থাকা চাই,— সে অর্থ গদ্যে তর্জমা করা যাক আর না যাক, সে অর্থ প্রত্যক্ষ অনুভূতি-সাপেক্ষ হোক আর না হোক। অর্থবিহীন 'তিলানা' সুর হতে পারে, কিন্তু সংগীত নয়। আমরা গানকে যে দুই ভাগে ভাগ করেছি—(সুরে বসানো কবিতা এবং সংগীত) তার মধ্যে প্রথমটিতে কবিতার অর্থ, অর্থাৎ কবিতার বিষয়টির সঙ্গে গায়কের মানসিক সম্বন্ধ, কিংবা সেই বিষয়টির সঙ্গে শ্রোতার মানসিক সম্বন্ধ যতটা গায়ক বুঝেছেন তারই ইঙ্গিত দেওয়া গায়কের কর্তব্য বলে মনে হয়। সংগীত-গায়কের ও ঐ ধরনের কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু সে কর্তব্যপালনের রীতি-নীতি সংগীত-রচয়িতার পদ্ধতির দ্বারা আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। প্রথমটির যা উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টির তা নয়, অর্থাৎ রবিবাবু এবং অতুলপ্রসাদের গান ভাল করে গাইতে হলে রবিবাবু এবং অতুল-প্রসাদের মনে কবিতার যে-অর্থ যে-সুরের রূপ ধরে উঠেছে সেই রূপেরই প্রকাশ

করতে হবে। কিন্তু শুদ্ধ সুরে, যেমন যন্ত্র-সংগীতে, এ প্রকার অধীনতা নেই। স্বাধীনতা যেকালে অধীনতার অতিরিক্ত, তখন সুর সংগীতের অতিরিক্ত মানতেই হবে। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে? সেইজন্যই বোধ হয় দিলীপ-কুমার কবিতা গেয়ে থাকেন; সংগীত গান না, সংগীতে তানের স্বাধীনতা নেই বলেই। কিন্তু এই যুক্তি অনুসারে তাঁর বীণা বাজানোই উচিত ছিল।

তা'হলে সুর এবং সাহিত্য নিয়ে কোনো মূল্য-পদ্ধতি দাঁড় করান শক্ত বলেই মনে হয়। আমার বিশ্বাস যে, সাহিত্য সম্বন্ধে যদি বা কিছু তত্ত্ব বার করা যায়, সুরের সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। যে জিনিসের ব্যবহারিক জগতে কোনো উপকারিতা নেই, তার মূল্য ব্যবহারিক জীবনের মাপকাঠি দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না। সুরের কোনো উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা এবং কোনো প্রকার অর্থ না থাকার জন্য, এবং সুরের শুধু রূপই আছে এই বিশেষত্বের জন্য আমরা স্বরের শুদ্ধতা এবং অলংকারের ওজন-জ্ঞানই সুর সম্বন্ধে বিচারের একমাত্র ভিত্তি বলতে বাধ্য হই। সুরের অন্যান্য সাহিত্যিক গুণের কথা আমরা ভাল করে জানি না, সেগুলি দেশ, কাল, পাত্র এবং ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে। সেইজন্যই বিলাতী ঐকতান অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু স্বরের শুদ্ধতা এবং ওজন-জ্ঞান দিয়ে বিচার করলে কোনো বিদেশী বাদক আর্টিস্ট কী না অতি সহজেই বোঝা যায়। মনের ওপর সুরের প্রভাব বিশ্লেষণ করা ভারী শক্ত কাজ। আমাদের nervous system-এর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইনি। এই অজ্ঞানতার ওপর আবার একটি ভুল ধারণা রয়েছে, যার উৎপত্তি হচ্ছে চিন্তাধারার মানসিক ক্রিয়াগুলিকে বিচ্ছিন্ন করবার অভ্যাসে। অনেকে সুরজ্ঞানকে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান বলেন, যে জ্ঞান, যে রসবোধ কারুর থাকে, কারুর থাকে না। যে অনুভূতি একান্ত, তার একটি দাম্ভিকতা থাকে। এই প্রকার অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা যে, তাকে বিশ্লেষণ করলে সেটি অদৃশ্য হয়, যেমন ভগবৎপ্রেম, ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু সুরবোধ কারুর একচেটে নয় আমি দেখেছি, যদিও আমার পূর্বে এই ধারণা ছিল। আমার পরিচিতের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা ইমন ও কল্যাণের প্রভেদ না জেনেও আমার অপেক্ষা অতি সহজে কে ইমন, কে কল্যাণ ভাল গাইছেন এবং কে গাইছেন না বুঝতে পারেন। শুধু তাই নয়, গুচ্ছ স্বরের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য আছে যেটি পর পর স্বর কয়টি গাইলে ধরা পড়ে না। রে, গা, রে, মা, গা গুচ্ছটির সঙ্গে গৌড় সারং-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, যদিও রে, গা, মা স্বর কয়টির কোনো স্বাধীন মূল্য নেই, কারণ এই তিনটি স্বর অনেক সুরেই ব্যবহৃত হয়। ঐ তিনটি স্বরের একটি বিশিষ্ট সমাবেশ ও সমন্বয়ের মূল্য প্রত্যেক স্বরের মূল্য যোগ

করে নয়, তারও অতিরিক্ত একটা কিছু, যেমন রসায়ন-শাস্ত্রে নূতন, পুরাতনের অতিরিক্ত। এই নূতনত্বের প্রক্রিয়া আমরা জানি না। হয়ত সেটি মীড়ের ওপর কিংবা আর্টিস্টের ওপর নির্ভর করে। সে যাই হোক, এই অজ্ঞতার উপর আবার প্রত্যেক স্বরের ভিন্ন ভিন্ন pitch, timbre রয়েছে যা যন্ত্র অনুসারে, গলার আওয়াজ অনুসারে তফাত হয়ে যায়। যেমন একই সুর বীণায় গম্ভীর, এসরাজে করুণ, মেয়েদের গলায় মধুর হয়ে ওঠে। আবার গমক, মীড়, মূর্ছনা, আশ সুরের যেন রঙ বদ্‌লে দেয়। সেইজন্য ভাবরাজ্যে সুর এমন বিপ্লব এনে দেয়, এমন অজ্ঞাত উপায়ে রস সঞ্চার করে যে, সুরের কোনো মূল্যতত্ত্ব আবিষ্কার করা আপাতত অসম্ভব।

আমার শেষ কথা এই যে, সাহিত্য ও সুরের আদিতে একই জিনিস বিদ্যমান—আর্টিস্টের মন এবং সেই মনের চিন্তাধারাকে বিকাশ করবার এবং রূপ দেবার প্রয়াস। এই মন রাম, শ্যাম, যদুর মন নয়, এবং এই প্রয়াস একান্তই স্বতঃপ্রণোদিত। এই প্রেরণাতে কোনো নীতি নেই, নিয়তি আছে। এখানে কার্য-কারণ-পরম্পরা অবশ্য থাকতে বাধ্য, কিন্তু এখানে কারণের ন্যায়-অন্যায় বিচার,— অর্থাৎ উদ্দেশ্যসাধন ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার সামাজিক, ব্যবহারিক কিংবা ধর্মসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার বিচার— নেই। শুক্তো রাঁধতে হলে তিক্ত-কষায় দরকারী। তিক্ত কষায় না দিলে শুক্তো হবে না, অন্য কিছু হবে, এর বেশী ঔচিত্যজ্ঞানের আবশ্যক এখানে নেই। অবশ্য সুর কিংবা সাহিত্যের মূল্য একটি সমগ্র ফলের (result-এর) ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক কার্যের পক্ষে সেই কার্যের জ্ঞাত কারণগুলিই ন্যায়সঙ্গত কারণ, সে কারণগুলি না ঘটলে কার্যটি সমগ্র হতো না। অতএব বিশ্লেষণের ফলে একটি সম্বন্ধের যে কারণগুলি আবিষ্কৃত হয় তাদের একমাত্র কার্য ও মূল্য ঘটা ও হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। মূল্য নির্ধারিত হয় সমগ্র ও একান্ত কার্যের দ্বারা, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে একান্তের আশায় বসে থাকবার ধৈর্য আমাদের নেই। সেইজন্য আর্টের জগৎ সৃষ্টিছাড়া জেনেও কথাবার্তায় কে বড়, কে ছোট প্রশ্ন সর্বদাই করে থাকি।

সংগীত-শিক্ষা

বাংলা দেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর সংগীত-শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের মতামত চেয়েছেন। মত প্রকাশ করবার যোগ্য ব্যক্তি আমাদের দেশে অনেক আছেন। কিন্তু তাঁরা এখনও নীরব রয়েছেন। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে নীরব থাকা অন্যায়। অবশ্য যে সব ওস্তাদ স্কুলের পদ্ধতি অনুসারে সংগীত-শিক্ষার বিরোধী, তাঁদেরও কিছু বক্তব্য আছে স্বীকার করতেই হবে। তাঁদের মোদ্দা কথা এই "স্কুল, কলেজে কোনো আর্টেরই এমন চর্চা অসম্ভব যার ফলে কোনো ছাত্র দিগ্‌বিজয়ী আর্টিস্ট হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞানে সম্ভব। যে পদ্ধতিতে সাধারণত শিক্ষা দেওয়া হয় তার দ্বারা প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। রবিবাবু, অবনীবাবু সব স্কুল পালানো ছেলে।" তাই বলে, কিন্তু একথা জোর করে বলা যায় না যে রবিবাবু, অবনীবাবুর বাল্যকালে যদি শান্তিনিকেতন থাকত তাহলে তাঁরা সেখান থেকেও পালিয়ে আসতেন। কেউ কিছু সংগীতের ডিগ্রী দিয়ে শিক্ষার্থীকে সংগীত নায়ক করে তুলতে পারে না, চায়না।

ওস্তাদের কাছে শাগীর্দ হয়ে শেখার গুণও অনেক। প্রথমত তারই ফলে ওস্তাদের ঘরের প্রকৃত চালটি শেখা যায়; দ্বিতীয়ত সেই ঘরের গুপ্ত বিদ্যাটি আয়ত্ত করা যায়, তৃতীয়ত শিষ্যের চরিত্রের উন্নতি হয়, গুরু ভক্তি, ধৈর্য, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিষ্য অর্জন করবার সুবিধা পায়। এ ছাড়া অন্যান্য সুবিধাও আছে। নিম্নলিখিত আপত্তিগুলি স্কুলে সংগীত-শিক্ষা পদ্ধতির বিপক্ষে পেশ করা যেতে পারে। প্রথমত ভাল ওস্তাদ কখনও মাস্টারি করতে ইচ্ছুক হন না, অতএব ভুইফোঁড় ওস্তাদরা শিক্ষক হয়ে কুশিক্ষা দেবার আশঙ্কা সদাই রয়েছে। দ্বিতীয়ত আমাদের সংগীতের প্রকৃত রূপটি স্বরলিপিতে এবং ছাপার অক্ষরে ধরা পড়েনা। তৃতীয়ত কুশিক্ষিত সংগীত ডিগ্রীধারী প্রত্যেক ব্যক্তিই না বুঝেসুজে এক একজন সমালোচক হয়ে উঠবেন, তার ফলে সংগীত রাজ্যে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হবে, যেটি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ ছাড়া অন্য আপত্তি এই যে আমাদের দেশে সংগীত পদ্ধতি একটি নয়, দেশ, কাল, পাত্র ও শাস্ত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন, একজন দেশের এক ওস্তাদ দরবারী টোড়ীতে কোমল নিখাদ দেন, অন্য দেশে কেউবা দেননা। এ অবস্থায় পদ্ধতি এক করবে কে? গভর্নমেন্ট না বিদেশী ওস্তাদ? একবার গভর্নমেন্টের হাতে পড়লে কোনো অনুষ্ঠানের, বিশেষত সংগীত বিদ্যালয়ের আর কি রক্ষা আছে?

যেমন আমাদের দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিলেতের রয়েল একাডেমির দুরবস্থা হয়েছে, কোনো ভাল লোকের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই, এখানেও তাই হবে। কোনো ওস্তাদ যদি সংগীত ছাড়া অন্য সম্বন্ধেও গভর্নমেণ্টের বিপক্ষে কোনো মত পোষণ বা প্রকাশ করেন তাহলে তাঁহার অন্ন মারা যাবে।

এ প্রকার আপত্তির যথেষ্টই মূল্য আছে আমি স্বীকার করি। বড় ওস্তাদরা যে স্কুলের শিক্ষক হতে রাজী হন না, তার প্রধান কারণ স্কুলের অধ্যক্ষরা অনেক বিষয়ে তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করেন, তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখান না, অল্প বেতন দিয়ে বেতনভোগী চাকরের মতন ব্যবহার করেন। অন্তত এই প্রকার আচরণের আশঙ্কা আছে, এ ক্ষেত্রে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে শিক্ষক হতে যাওয়া আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দেওয়া। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে সর্বত্রই ঐ দশা। তবে কলেজের অধ্যাপক বেতন বেশী পান এই যা তফাত। স্কুলের পরিচালন পদ্ধতি ন্যায়-সঙ্গত নয় বলে সাধারণের মধ্যে বিদ্যা প্রচার হবে না— ভগবান আমাকে যে শিক্ষা অর্জন করবার সুযোগ দিয়েছেন, সেটি যক্ষের মতন রক্ষা করব, এমন কিছু কথা নেই। বিদ্যাপ্রচার করা চাই, তবে সেই সঙ্গে পরিচালন পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন দরকার। পরিচালকবৃন্দ অনেক সময় সংগীত সম্বন্ধে মূর্খ, তাঁদের শুধু পয়সার জোর আছে। এমন পরিচালক চাই যাঁরা সংগীতের মর্যাদা বুঝবেন, যাঁরা জানবেন যে সংগীত-ব্যবসায়ে ধনী হবার আশা সুদূর পরাহত জেনেও অনেক ওস্তাদ চারুকলার প্রতি প্রেমের জন্যই প্রাণাতিপাত করেছেন। এক সংগীতজ্ঞই ওস্তাদের প্রকৃত কদর্ দিতে পারেন। দেশে কদরদানের আবশ্যক, সেজন্যও স্কুল নাই। একবার সাধারণে সংগীতের মাধুর্য বুঝলেই, একবার সুরের সঙ্গে প্রেম হলেই, একবার সংগীত শেখবার জন্য কত যত্ন, কত প্রয়াস করতে হয় বুঝতে পারলেই, ওস্তাদরা 'নফর লোকের' জাত বলে গণ্য হবেন না। অবশ্য এখানেও ভয় আছে। কু-শিক্ষিতের দাম্ভিকতা, অশিক্ষিতের মূর্খতা অপেক্ষাও ভয়ংকর। কুশিক্ষিতকে সুশিক্ষিত করবার জন্যও স্কুলে সুশিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। তবে সময় লাগবে, এক যুগে হবে না। আমাদের দেশে কি এমন ওস্তাদ নেই যাঁরা ভবিষ্যতে সংগীত প্রসারের জন্য বর্তমানে অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেও সুশিক্ষা দিতে প্রস্তুত হবেন? আমি জানি, এমন লোক আছেন, যদিও দিনে দিনে তাঁদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব দেওয়া শক্ত। হিন্দুস্থানী সুরের প্রকৃত রূপটি স্বরলিপিতে ধরা পড়েনা অথচ স্বরলিপি চাই এবং পরীক্ষার জন্য একটি সমরূপ পদ্ধতি চাই, যে পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। আমাদের সংগীতে এমন সব অলংকার আছে সেগুলি মাত্র মুখে মুখেই শেখান যেতে পারে। কিন্তু সেগুলি

ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের জন্য তত প্রয়োজন নয়। যারা উচ্চ সংগীতের শিক্ষার্থী তাদের জন্য সেগুলি আলাদা রাখলেই চলবে। ষোল বৎসর বয়সে সকলে রাধিকা গোঁসাই, মুলো গোপাল হতে পারেনা, এবং হবে কোনো শিক্ষক আশাও করেন না'। সংগীতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর যখন একাডেমিতে ছাত্র পড়বে তখন ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে শেখবার আপত্তি কি? ওস্তাদরা মনে করতে পারেন যে তখন আর কেউ ঐ উপায়ে শিখতে চাইবে না। কিন্তু যে পাঁচ-ছয় বৎসর সুরের আলোচনা করেছে এবং ভাল করে শিক্ষিত হয়েছে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে স্বরলিপি দেখে সুর শেখায় দোষ কোথায়। না পারলে তার শিক্ষাই হয়নি বুঝতে হবে। স্বরলিপির উদ্দেশ্য নিজেকে বাতিল ও ফাজিল করা। সেজন্যও গোড়া থেকে সুশিক্ষা অর্থাৎ সুশিক্ষকের প্রয়োজন। তার পর কথা ওঠে সমরূপ পদ্ধতি তৈরি করা নিয়ে। যে প্রকার মানসিক প্রবৃত্তির জন্য এ রকম কথা ওঠে তাকে দূর করতে হলেও সুশিক্ষা চাই। মানুষের মন সহজে বদলায় না, কিন্তু কিছুতে যদি পরিবর্তন হয় তো শিক্ষার দ্বারা। দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ছেড়ে দিলে সমরূপ পদ্ধতি করা যত শক্ত লোকে মনে করে ততটা নয়। অন্তত এমন ত্রিশ-চল্লিশটি রাগ-রাগিণী আছে যার স্বর বিন্যাস সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নেই। সেই কয়টি গোড়ায় শেখালেই চলে। যদি অন্যান্য সুর সম্বন্ধে মতের পার্থক্য থাকেও, তা'হলেও পরীক্ষক যদি উদার হন, কোন পরীক্ষার্থী দরবারী টোড়ীতে শুদ্ধ নিখাদের স্থানে কোমল নিখাদ লাগালে ফেল হবেনা। দরবারী টোড়ীর রূপ নষ্ট না হলেই হল। যাঁরা সুরকে খাতির না করে স্বর নিয়ে শুচিবাইগ্রস্ত তাঁরা পরীক্ষক হলে অবশ্য বিপদ আছে। শুচিবাই-গ্রস্ততা দূর করবার জন্য স্কুলে যাওয়া, স্কুলের শিক্ষকতা করার মতন ওষুধ আর নেই। আমার বিশ্বাস কিন্তু যে ওস্তাদরা ইচ্ছা করলেই একমতাবলম্বী হতে পারেন। যদি বাইরে থেকে তাঁদের ওপর চাপ পড়ে, যদি তাঁরা জানতে পারেন যে এক মত হলে অন্তত চারশত ওস্তাদ চাকরি পাবেন, তাঁদের পেশার খাতির হবে, তখন গোলমালের সম্ভাবনা কমে যায়।

অর্ধশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বাংলা-সাহিত্য যেকালে বিকশিত হচ্ছে, তখন সংগীতের ঐ ধরনের সমালোচনায় যে কোনো প্রকার বিশেষ ক্ষতি হবে মনে হয় না। সমালোচকদের শিক্ষা আবশ্যক। কত মেহন্নৎ করলে শুদ্ধস্বর তৈরি হয় জানলে সমালোচনার তীব্রতা কমে আসতে বাধ্য। তবে গণতন্ত্রের যুগে কেউ কারুর মুখ ও কলম বন্ধ করতে পারে না, কেননা গণতন্ত্রের মানেই হচ্ছে মুখ ও কলমের স্বাধীনতা— সেইজন্য আইনও ঐ ধরনের। সমালোচনার রীতিই হচ্ছে না বুঝে, না পড়ে জোর করে পরের মত নিজের বলে

প্রচার করা। ওস্তাদের পক্ষে অসহিষ্ণু হওয়াই স্বাভাবিক, তাঁরা আর্টিস্ট মানুষ, এবং অপমান সহ্য করে করে দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁরা অত অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। দারিদ্র্য দূর হলে, লোকে তাঁদের পেশাকে শ্রদ্ধা করতে শিখলে, তাঁরাও সমালোচনাকে সহ্য এবং অগ্রাহ্য করতে শিখবেন।

গভর্ণমেণ্টের হাতে যাওয়ার বিপক্ষে সব যুক্তিই অকাট্য। কিন্তু আপাতত কী করা যায়? আকবার বাদশাহ., সুলতানশাহ, আদিলশাহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, মহারাজ নাটোর ও শৌরীন্দ্রমোহন আর বেঁচে নেই, দেশে একজন বই দু'জন ব্রজেন্দ্রকিশোর জীবিত নেই, জমিদার সম্প্রদায় ধ্বংসোন্মুখ। দেশের ওস্তাদবর্গ দেশ ছেড়ে রামপুর, ইন্দোরে যেতে পারেন না, অথচ খেতে হবে, স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অতএব আপাতত গভর্নমেণ্ট যতটুকু সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন তাই গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। একবার সংগীত প্রচার কার্য সুসম্পন্ন হলে নিজের হাতে নিতে আপত্তি কি? তবে বেশী দিন পরের হাতে রাখলে সর্বনাশ হবে, সেইজন্য যত শীঘ্র যুবক সম্প্রদায় সংগীতে সুশিক্ষিত হ'য়ে নিজের হাতে অধিষ্ঠানটি তুলে নেন ততই মঙ্গল। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে দেশ স্বাধীন হলেও সংগীত পরিষৎ দেশী সরকারের হাতে রাখা চলবে না। কলাবিদ্যা-সংক্রান্ত কোনো অনুষ্ঠানের সঙ্গে কি দেশী কি বিদেশী গভর্নমেণ্টের সংস্রব রাখা উচিত নয়, কেবল টাকার সম্বন্ধ ছাড়া। অর্থাৎ পরিষৎ টাকা নেবে, আর মাঝে মাঝে, যেমন ডিগ্রী দেবার সময়, বড় বড় কর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করে আনা হবে— তার বেশী লেনদেন করা মানে অর্থের সর্বনাশ করা। এ রকম আশা পোষণ করা আবদার করা নয়। অন্তত ইংলণ্ডে অনেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের ঐ পর্যন্ত সম্বন্ধ। অবশ্য এখন আমরা গভর্নমেণ্টের হাতে খানিকটা, সেই জন্য গভর্নমেণ্টের সাহায্যের স্বাধীন হওয়া কিংবা হস্তক্ষেপ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। পরে যাতে শীঘ্র সম্ভব হয় তার দিকে নজর রাখা চাই।

ভাল ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে শেখার গুণ কত পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তার হাতে কিংবা মুখে সুর মূর্ত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ না স্থাপিত হলে বিদ্যার তাৎপর্য ধরা পড়ে না। ছাপার অক্ষরে মন্ত্র পড়া আর গুরুর মুখে মন্ত্র শোনার মধ্যে অনেক প্রভেদ। কিন্তু এই প্রথার পূর্বোক্ত গুণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে। ওস্তাদের ঘরোয়ানা সুর শেখাটা শিল্পের শেষ কথা নয়। শেষ কথা, সুর শিখে বড় আর্টিস্ট হওয়া। এমন ঘরোয়ানা বিরল নয়, যেখানে

সুরের চাল মোটেই মধুর নয়, কিংবা একটি মাত্র অলংকারের চলন আছে। স্বর্গীয় আলবন্দে খাঁর ঘরের বিপক্ষে আমার ঐ আপত্তি— তাঁর নিজের মুখে, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়ের মুখে যা গমক শুনেছি, অন্য কোথাও শুনব না। কিন্তু শুধুই গমক; বীনের অনুকরণে। এখন মাত্র একটি 'ঘরোয়ানা' শিখলে সেই ঘরের গানের সঙ্গে যত দোষ শিষ্যে বর্তায় এবং অন্য ওস্তাদের ঘরোয়ানা শেখবার, এমন কি সমাদর করবার পক্ষে, বাধা হ'য়ে ওঠে। সেইজন্য ওস্তাদের ঘরোয়ানা থেকে আত্মরক্ষা করাও তরুণ শিক্ষার্থীর একান্ত কর্তব্য। অনেক ওস্তাদের গুপ্তবিদ্যা আছে, তাও কি তাঁরা নিজেদের আত্মীয় ছাড়া অন্য কাউকে শেখান? কী খোশামোদ করে গুপ্তবিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায়, কত পা টিপে, কত কল্কে তামাক সেজে, কত অসভ্য রোগের সেবা করে শাগীর্দ ওস্তাদের মনোরঞ্জন করেন তার খবর যে ৺ মৌলা বক্স, ৺ অঘোর চক্রবর্তীর জীবনীর সহিত পরিচিত তিনিই জানেন। বেহালার বামাচরণবাবু কী করে আলি বক্সের কাছে গান শিখেছিলেন আমি শুনেছি। কেরামাৎ খাঁর কাছে যোগিয়া ঠাটের একটি অত্যন্ত মধুর নতুন সুর শেখবার জন্য কালী পাল মহাশয় এবং বাবু হরেন্দ্রনাথ শীল কী কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তাও অনেকে জানেন। সে রকম কৃচ্ছ্রসাধন বর্তমান যুবক-যুবতীর ধাতে নেই, থাকতে পারে না। তার ওপর হিন্দু ওস্তাদ মুসলমান শিষ্যকে, মারহাট্টি ওস্তাদ বাঙালী শিষ্যকে শেখাতে স্বভাবত গররাজী। ভয় পাছে বিদ্যা মেরে নিলে, অন্ন মারা যায়। ওস্তাদের কাছে শিখতে গেলে চরিত্রের কতখানি উন্নত হয় না বলাই ভাল। ওস্তাদ-নির্বাচন মেয়ের বাপের একটি প্রধান সমস্যা হ'য়ে উঠেছে। আর ধৈর্য শিক্ষা যদি অত দরকারী হয়, তারও অন্য উপায় রয়েছে। গুরুভক্তি কারুর স্বাভাবিক, কারুর নয়।

সেইজন্য পুরাতন পদ্ধতি না নষ্ট করে, তার আদর্শ গ্রহণ করেও নতুন পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্কুলে, সংগীত শিক্ষা সম্ভব মনে করি। যখন সংগীত শিক্ষা হওয়া উচিত কিনা প্রশ্ন উঠছেনা, তখন তর্ক বাধে সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা নিয়ে অর্থাৎ শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে, দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে স্কুলের পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে।

শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রকাশ করা যেতে পারে। সংগীত-শিক্ষা পদ্ধতির মূলতত্ত্ব আলোচনা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি শিক্ষক হলেও, কখনও সংগীতের শিক্ষকতা করিনি, আমার সে বিদ্যা নেই, আমি কেবল গান বাজনা শুনেই এসেছি, একের অধিক ওস্তাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। কী করলে শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে। তা ছাড়া সংগীত-শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখবার আমার কোনো দরকার নেই। সুর সম্বন্ধে আমার মতামত ভুল হবার সম্ভাবনা

কম যতটুকু, তার চেয়ে স্বরশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত ভুল হবার সম্ভাবনা কম, এইটুকু শুধু বলতে পারি। সংগীত-শিক্ষা বিষয়ে আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি অনেকে আছেন তাঁদের কুড়েমির শাস্তি আমার এই প্রবন্ধ পড়া।

(১) স্বর সাধনা গান গাওয়ার চেয়ে শিক্ষার্থীর পক্ষে বেশী দরকারী। বালক-বালিকাকে সংগীতপ্রিয় করবার জন্য সর্বপ্রথম অর্থাৎ নিম্নতম শ্রেণীতে মধুর গান শেখালে উপকার হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে শুদ্ধস্বর ও তান শেখাতেই হবে। শেষ অবস্থায় কিন্তু গানই গাইতে হবে, তখন সার্গম করা, অর্থাৎ সাধনা পদ্ধতির ইতিহাস উদ্ঘাটিত করা উচিত নয়, এক নতুনত্ব হিসাবে ছাড়া।

(২) স্বর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে, সুর শেখবার পূর্বেই তাল ও লয় শেখা চাই। মাত্রা দিয়ে গাওয়া তালের ও স্বরের নাম জানবার পূর্বেই সম্ভব হওয়া চাই।

(৩) স্বর সাধনার পরই পাল্টা ও অলংকার শিখতে হবে, পরে সুরের নাম ও রূপ।

(৪) ক্লাসের কাল বোর্ডে, কিংবা শিক্ষকের কথামত স্বর দেখা ও শোনা মাত্রই একটি স্থায়ী স্বরের অনুপাতে ছাত্রের গাইতে পারা চাই। এই অভ্যাস প্রথম থেকেই দরকার।

(৫) তানপুরা বাঁধতে এবং তার সঙ্গে গাইতে গোড়া থেকেই শিখতে হবে।

(৬) পাখোয়াজ ও তবলার বোল সাধা চাই এবং সেই সংগতে গাওয়া চাই।

(৭) যন্ত্র-সংগীতেও ঐ নিয়মগুলি খাটবে।

সেইজন্য পুরাতন পদ্ধতি না নষ্ট করে, তার আদর্শ গ্রহণ করেও, নতুন পদ্ধতিতে, অর্থাৎ স্কুলে, সংগীত শিক্ষার অন্য উপায় রয়েছে। গুরুভক্তি কারুর স্বাভাবিক, কারুর নয়।

(৮) উচ্চতম ক্লাসে বাংলা দেশের বিশিষ্ট সুর শেখা চাই, যেমন কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল, রবিবাবুর গান প্রভৃতি।

(৯) উচ্চতম শ্রেণীতে বিদেশী প্রভৃতি সংগীত অর্থাৎ কর্ণাটি ও বিলাতী সুর পছন্দ করবার জন্য তার মূলতত্ত্ব জানা চাই ও ভাল ভাল রেকর্ড অন্তত শোনা চাই।

(১০) উচ্চতম ক্লাসে শাস্ত্র পড়া চাই, সংস্কৃতে হলেই ভাল হয়।

(১১) শুদ্ধ উচ্চারণ, শুদ্ধ বাণী, শুদ্ধ মুদ্রার ওপর বরাবরই জোর দিতে হবে। হিন্দী ও উর্দু গানের বাণীর মানে জানা চাই।

(১২) নতুন নতুন রাগিণী কিংবা স্বর বিন্যাস করবার স্বাধীনতা মানতেই হবে। প্রতিভাশালী ছাত্রের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা আছে গ্রাহ্য করতে হবে এবং

সেইজন্য সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে। একজন প্রাতভাশালী ছাত্র কিংবা ছাত্রীর জন্য সব নিয়মকানুন ত্যাগ করা উচিত।

আমি চারটি মন্তব্য প্রকাশ করে প্রবন্ধ শেষ করি। কোনো পাঠক-পাঠিকার যদি ঐ সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য থাকে তা হলে, আশা করি সেটি 'সংগীত-বিজ্ঞান' প্রবেশিকাতে প্রকাশিত হবে, কিংবা আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখলে সত্যই উপকৃত হব। কোনো পত্র না পেলে কিংবা আলোচনা না হলে বুঝব যে ঐ মন্তব্যগুলি সাধারণে স্বীকার করেছেন। অতপর সংগীত শিক্ষার অন্য দিক থেকে কিছু বলতে চেষ্টা করব।*

প্রবন্ধটি এখানেই শেষ হয়েছে। ঠিকানা রয়েছে The University, Lucknow। নিম্নরেখ লেখকের। —সংকলক

আজকালকার গান

বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতায়, গানের একটা সাড়া পড়েছে। ছেলেমেয়ের দল সকলেই না হয় গানে, না হয় বাজনায় মন দিয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতেই এক একটি, কোনো কোনো বাড়িতে আবার দুই তিনটি প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেছে। সকাল সন্ধ্যায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং বড়লোকের বাড়িতে রেডিওতে গানবাজনা শোনবার জন্য ছেলেমেয়ে জড় হচ্ছে। তার ওপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে কনসার্ট পার্টি, থিয়েটারের দল গানের আখড়া দিচ্ছে। কলের বাজনা ত রয়েইছে। আত্মহত্যা মহাপাপ নচেৎ বহুদিন পূর্বেই ও কাজ করতুম।

গত মাসে প্রায় দশ-বারোটি প্রতিভাশালী যুবক-যুবতীর গানবাজনা শুনলাম। তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন রবিবাবুর গান গাইলেন, বাকী সব কার গান গাইলেন বুঝতে পারলুম না। সন্দেহ হল অতুলপ্রসাদের কিন্তু তাঁর নয়— তিনি নিজে অস্বীকার করলেন। শুনলাম সেগুলি কাজী নজরুলের। সত্য মিথ্যা জানি না। তাতে ছন্দের কিছু বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু মানে নেই মনে হল। তাতে সুরের একটা গতি আছে কিন্তু সে গতি অত্যন্ত হালকা এবং নিতান্তই একঘেয়ে। তাতে গজল ঠুংরী, শাউনীর মাধুর্য আনবার প্রয়াস আছে, কিন্তু সে মাধুর্য একেবারে ঝুটা। ঢাকার মুসলমানের উর্দু র সঙ্গে লক্ষ্ণৌ নবাবের উর্দু র যা তফাত, ভটাপাড়ার ভটচায্যি মশাইএর সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে এই বাংলাদেশের অভিনব ঠুংরীর তফাত তাই। পশ্চিমাঞ্চলের ঠুংরী গজল শোনবার বিশেষত বাঈজীর মুখে শোনবার সৌভাগ্য যার ঘটেছে সেই বুঝবে এই তফাত কোথায় এবং কতখানি।

দিলীপকুমার ইদানীং ঠুংরীর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রভাব শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাঁর প্রতিভায় অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থীর দল তাঁর ভুলটি পর্যন্ত অনুকরণ করেছেন। তাঁর ভুল হয়েছিল একটি সংজ্ঞায়। ধ্রুপদ ও খেয়ালের বাঁধাবাঁধি নিয়ম অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি ভাবলেন যে ঠুংরীতেই গায়কের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সত্য কথা হচ্ছে ঠুংরীরও নিয়মকানুন আছে, সে নিয়মকানুনগুলি ধ্রুপদ খেয়ালের নিয়ম থেকে ভিন্ন হলেও অত্যন্ত কঠোর। বরঞ্চ এক হিসাবে খেয়াল ধ্রুপদের নিয়মাপেক্ষা বেশী দুর্ণিবার। ঠুংরী গজলে কথার সৌন্দর্য, ভাব ও রস বজায় রেখে তান দিতে হয়। বাজুবন্দ্ খুল্ খুল্ যায়, একটি বিখ্যাত ঠুংরীর ভৈরবী, আবার 'হে শিশু, পার

করো মোরী নেইয়া'ও ভৈরবীর ঠুংরী। কিন্তু গান দুটির স্থায়ী, অন্তরা, তান-কর্তব, স্থিতি, মীড়, মূর্ছনা সব আলাদা। শুধু তাই নয়, ঠুংরী তানের একটি বিশেষ রীতি আছে, এক ধরনের তানের পর আর এক ধরনের তান দিতেই হয়। এই রীতি ওস্তাদী লোকাচার, উপচার, অত্যাচার নয়— একে স্বাভাবিক, আন্তরিক নিয়ম বলে অত্যুক্তি হয় না। তার ওপর ঠুংরীর তানও অন্য রকমের যেন পুঁতির মালা, মুক্তার মালা এতে গলার ছোট নয় কাজ ও মীড় দেখাতে হয়। অতএব ঠুংরীর স্বাধীনতা বলতে, তানের তালের যথেচ্ছচারিতা বুঝলে ভুল বোঝা হবে। কিংবা ঠুংরীতে গায়কের শুধু স্বরের সংমিশ্রণ করবার অধিকার আছে, সে সংমিশ্রণেরও একটা পদ্ধতি আছে, সেখানে ভৈরবীর সঙ্গে ইমনকল্যাণ মিশ খাওয়ালে চলে না। দিলীপের গলা ছিল অদ্ভুত। তার গলায় সব রকমের তান ছিল, সব রকমের অলংকার ছিল। সেই অলংকার শ্রোতার মনকে চমকিয়ে দিত। কিন্তু তার গানে ঠুংরীর বৈশিষ্ট্যটুকু রক্ষিত হতো না। ঠুংরী গানে সে প্রায়ই টপ্পার তান ছাড়ত, টপ্পাতে ঠুংরীর তান মেশাতে, কীর্তনেও ঠুংরীর খোঁচ দিতে তাকে শুনেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে তার স্বাধীনতার মূল্য অনেক। তার গান তার নিজস্ব সম্পত্তি, তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তার গান শুনে সেই মধুর স্বভাব, পবিত্রমনা, স্বাধীনতাপ্রিয় এবং কিঞ্চিৎ অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তির কথাই মনে হতো। আর কোনো গায়কের গানে অতখানি ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে দেখিনি। সেইজন্যই তার গানের সমালোচনাও এত personal হয়ে পড়ে, সেইজন্যই তাঁর প্রভাব এত বিস্তারিত হলেও অনেক সময় সুফল প্রসব করছে না।

রচনা হিসাবে অতুলপ্রসাদের ঠুংরীও ঠুংরী নয়। তাঁর রচনায় ঠুংরী এবং সুরে ঠুংরীর ঠুংরী-গন্ধটুকুই আছে। তাঁর মুখে তাঁর গান শোনবার সৌভাগ্য যার হয়েছে সেই তাঁর গানের ভক্ত হয়েছে। গজল কবিতার মধুর conceits-গুলি তিনি গ্রহণ করলেও, তাঁর কবিতার ভাবগুলি অতিশয় সরল এবং করুণ। ফার্সী ও উর্দু কবিতার বিষাদ তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। "আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায়"—এই লাইনটির সঙ্গে সুর হিসাবে একখানি বিখ্যাত ঠুংরীর 'যা ম্যায় তুঁ ল নহি বোলুঙ্গী' প্রথম লাইনের হুবহু সাদৃশ্য আছে। 'কেন চলে যায়'— ভাবটি তো গজল ঠুংরীর মামুলি জিনিস। তার পরের লাইনটি 'ভুলে কি গিয়েছে ভোলা,' একেবারে বাংলা দেশের খাম্বাজ কিন্তু আবার গজলে গানটি ফিরে এল। মোটের ওপর গানটি অতি চমৎকার হয়েছে। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যায়, যার থেকে প্রমাণ করা সহজ যে অতুলপ্রসাদ ঠুংরী গজলের কাছে সম্পূর্ণ অত্মদান না করলেও ঠুংরী গজলের মধু চুরি করে দেশজাত সুরের

এমন কি ভাটিয়াল, কীর্তনেরও নবজীবন সঞ্চার করেছেন। দিলীপ ও সাহানা দেবী অতুলপ্রসাদের এই ধরনের গান বাংলাদেশে প্রচার করেছেন। দিলীপের তানের প্রাচুর্য অনেক সময় অতুলপ্রসাদের সুর ও রচনার মাধুর্যকে শ্রদ্ধা করেনি। দিলীপ যাও শ্রদ্ধা করতো, বর্তমানের ঠুংরী গজলের ভক্ত সম্প্রদায় তাও করেন না। অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের জন্যই প্রধানত ঠুংরী গজলের বন্যা এসেছে কিন্তু তাঁদের প্রবর্তিত চাল ছেলেমেয়ের হাতে পড়ে কী রূপ নিয়েছে যদি তাঁরা জানতেন, তাহলে লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া অন্য উপায় তাঁদের থাকত না। বলাবাহুল্য এই অবনতির জন্য তাঁরা দায়ী নন। দায়ী আমরা যাঁরা গানবাজনা না শুনে কিংবা না শিখে ভালমন্দ বিচার করি এবং হালকা গান গেয়ে বিনা কষ্টে ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের মন মজাতে চেষ্টা করি। আজকালকার যুবকযুবতীরা অন্যান্য কলা বিদ্যার মতনই সংগীতের ভীষণ শত্রু। হালকা সুরের খোঁচ দেখিয়ে মন মজানর চেয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে করুণা উদ্রেক করান ঢের ভাল। তাতে প্রাণ যেতে পারে কিন্তু সুরের মর্যাদা রক্ষা পায়।

এ বৎসর কলকাতায় এসে দেখছি যে কাজী নজরুলের গান দেশ ছেয়ে ফেলেছে। তাঁর সুরও ঠুংরী গজল নয়। তাঁর দেওয়া অনেক সুর শুনতে ভাল লাগলেও সুর হিসাবে খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়। সুর-সৃষ্টি হিসাবেও তাঁর মূল্য খুব বেশী নয়। অনেক সময় তাঁর সুর বাজারের ঠুংরী গজলের অনুকরণ মাত্র। যেখানে তিনি অনুকরণ করেন নি, সেখানে তাঁর সুর রচনা অত্যন্ত flat সাদামাঠা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই হালকা সুরের জন্য তাঁর গলা এবং কবিতা প্রধানত দায়ী। তাঁর গলা মোড় খায় না, তাঁর গলায় তান নেই, মীড় নেই। এই অভাবের জন্য তাঁর রচনার ক্ষতি হয়েছে। গান রচনার বাহাদুরী অলংকার ফোটাবার অবকাশ দেওয়া —যেমন স্বরবর্ণের প্রাচুর্য। কাজীর কবিতা সব ঠাস্‌বোনা, (অতুলপ্রসাদের নয়) ব্যঞ্জনবর্ণ সেখানে প্রধান। কাজী মনে মনে জানেন যে তাঁর গলা নেই, সেইজন্য গলার দোষ ঢাকবার জন্য তাঁর কলম ব্যঞ্জনবর্ণই ব্যবহার করতে উৎসুক এবং তালপ্রধান ঠুংরী গজলের ছাঁচে গান লিখতে ব্যগ্র— দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করতে। অতুলপ্রসাদের গলায় চমৎকার ছোট ছোট তান আছে, তাঁর গান গাইতে হলে ছোট তানের দরকার। সেইজন্য সকলেই কাজীর গান গাইতে পারে এবং সকলে অতুলপ্রসাদের গান গাইতে পারে না। পূর্বোক্ত দোষের জন্য কাজীর কবিতাও দায়ী। কাজীর কবিতায় অনেক কথা টেনে বোনা হয়েছে। অনেক সময় তার মানে হয় না। অথচ কথাগুলির বাহ্যিক মিল আছে। মিল খোঁজবার জন্য কাজীকে অদ্ভুত কথার আমদানি করতে হয়। অপূর্ব কথাগুলি

মনকে চমক লাগিয়ে দেয়— বৈঁচীর কাঁটার সঙ্গে পৈঁছির মিল, সত্যই অদ্ভুত— এই ফাঁকে সুর এবং ভালমন্দের বিচারশক্তি পালিয়ে যায়। বিচারশক্তির কথা 'সংগীত বিজ্ঞান পত্রিকা'র এক সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। সংগীত রচয়িতার মূল্য-জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। এই মূল্যজ্ঞান অতুলপ্রসাদের আছে কাজী নজরুলের কম— দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গানের উল্লেখ করলেই চলবে—'বাগিচায় বুলবুলি তুই' এই গানটির স্থায়ী চমৎকার কিন্তু পরের লাইনটি প্রথম লাইনের সঙ্গে একেবারে খাপ খায়নি। পাঠক শুনলেই বুঝতে পারবেন। এই ধরনের নিয়মভঙ্গ অতুলপ্রসাদের দ্বারা অসম্ভব।

কাজীর দেওয়া সুরে অনেক স্থলে তবু মিষ্টত্ব আছে, তাঁর ছন্দজ্ঞান আছে কিন্তু তাঁর শিষ্যবর্গের গান ও সুর রচনা একেবারে অশ্রাব্য। শিষ্যের দোষ গুরুতে আরোপ করা যায় না, কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে দিলীপ, অতুলপ্রসাদ ও কাজীর নকলনবিশরা ঠুংরী গজলের শ্রাদ্ধ করছেন। তাঁদেরকে এই সান্ত্বনাটুকু দিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের গানেরও ঐ ধরনের দুর্দশা হয়েছে।

দেশের সংগীত-অবনতির জন্য গ্রামোফোন কোম্পানি দায়ী। বর্তমানে বিশেষ করে দায়ী Broad casting Company— তাদের অনেক বাধাবিপত্তি লঙ্ঘন করতে হয় মানি। টাকার অভাব, সত্যকারের আর্টিস্টের অভাব, পরিষ্কার গলার অভাব মোচন করা শক্ত। কিন্তু কিছুতেই মানতে পারি না যে জনমতের শিক্ষার অভাবের জন্য তাঁরা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর গান-বাজনার আয়োজন করেন। রেডিও কোম্পানীর ভারতীয় ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রবাবু খুব ভাল রকমই জানেন যে শিশির ভাদুড়ী মশাই অল্পদিনের মধ্যে কী করে জনমতকে অভিনয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। কে আগে স্বপ্নেও ভেবেছিল যে 'বিসর্জন' দেখতে কিংবা 'চিরকুমার সভা' দেখতে জনতা হবে? জনমতকে মূর্খ বলে অপমান করে লাভ নেই। জ্ঞানেন্দ্র গোঁসাই, ঊষারাণী, গিরিজাবাবু, কৃষ্ণবাবু ও উজীর খাঁর এবং হাফেজের শারোঙ্গ ও নৃপেনবাবুর বাঁশি শুনতে সকলেই ব্যগ্র। দেশে আরো অনেক গুণী আছেন; এমেচারের দলকে গাইতে বাজাতে দিলে হয়ত ব্যবসায় হিসেবে লাভ আছে, কিন্তু অন্যান্য গুণীদের গান বাজনা শোনালে ব্যবসায়ে ক্ষতি হবে জোর করে কি বলা যায়? Broad casting Company-র দায়িত্ব অনেক, সেইজন্য তাঁদের প্রোগ্রামের এই সামান্য সমালোচনা করছি। বিশদ ভাবে সমালোচনা করবার স্থান মাসিক পত্রিকা নয়, সেইজন্য বিরত হলুম।

কথাটা এই দাঁড়ায় যে দেশে সংগীতের নবযুগ এসেছে। এই নবযুগে অভিনব রূপের সন্ধান চলেছে। সন্ধানের স্পৃহাকে শ্রদ্ধা করবার সঙ্গে সঙ্গে রূপের সমালোচনা

করবার সময় এসেছে। গান শুনে (বাজনায় এখনও নতুন কিছু হয়নি, আলাউদ্দিন সাহেব যেকালে নতুন রাগিণীর স্বরলিপি এখনও প্রকাশ করেন নি), আমার বিশ্বাস হয়েছে যে রূপগুলির অধিকাংশই ঠুনকো বড় লোকের বাড়ির মেয়েদের মতনই স্বাস্থ্যহীন— powder box ও lip-stik এর কেরামতি মাত্র। আমাদের কর্তব্য সংগীতের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা —সেজন্য heredityর দিকে একটু লক্ষ রাখতে হবে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে হিন্দুস্থানী সংগীত শিখতে হবে, পাখি পড়ার মতন ভাল ভাল গান মুখস্থ করতে হবে। তারপর শিক্ষার্থীর আত্মরক্ষার কথা উঠবে। Classic গানগুলির স্বরগুলি এত সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত যে সেগুলিকে আয়ত্ত করলে রূপ-জ্ঞান আসতে বাধ্য, যদি না শিক্ষার্থী একেবারে বোকা হয়।

বাংলা দেশে কি এই ধরনের ওস্তাদ আছেন ? যদি থাকেন ত ভালই, না হয় বিদেশ থেকে আমদানি করলেই হবে। মিথ্যা আত্মসম্মান জ্ঞানে দেশের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না।

'উত্তর'

নলিনীবাবুর উত্তর যে-রকম ভদ্রভাবে লেখা তাতে খুশী না হয়ে থাকা যায় না। নলিনীবাবুকে আমি চিনি, যদি নাও চিনতাম তা হলেও তাঁর সংযত ও মার্জিত ভাষার তারিফ না করে থাকতে পারতাম না। আমাদের সাহিত্যে সমালোচনার ভাষা এই ধরনের হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু তাঁর ভাষায় যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তাঁর যুক্তিতে সেরূপ হইনি। নলিনীবাবু প্রথমেই ধরে নিয়েছেন যে আমি অতুলপ্রসাদের গানের propaganda করছি। নলিনীবাবু লিখেছেন :

(১) "এই স্বাস্থ্যরক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ যেন স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে কোন আপনজনের propaganda চালিয়ে না বসেন। আমাদের দুর্ভাগা দেশের···আগে থেকেই দরকার।"

(২) "নজরুল ইস্‌লামের গানের সম্বন্ধে এরূপ অভিযোগপূর্ণ অভিমত কোনওদিন ধূর্জটিবাবুর কাছে থেকে শুনতে পাইনি। তাঁর এ মনোভাব হঠাৎ হল কেন, বুঝতে পারলাম না।"

নলিনীবাবু কারণ খুঁজছেন—

(৩) "অতুলপ্রসাদের গানের কথা ও সুর-রচনায় মুগ্ধ ধূর্জটিপ্রসাদ"···আবার

'বিশেষজ্ঞ' ধূর্জটিপ্রসাদ "যখন উক্ত আসরের গানগুলোকে অতুলপ্রসাদের গান বলে সন্দেহ কোরেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই অতুলপ্রসাদের রচনার উক্ত গুণ ও বিশেষত্ব তিনি তাতে পেয়েছিলেন। ধূর্জটিবাবু সেই গানগুলো সম্বন্ধে বলেছেন, 'সন্দেহ হল অতুলপ্রসাদের, কিন্তু তাঁর নয়—তিনি নিজে অস্বীকার করলেন। শুনলাম সেগুলি কাজী নজরুলের। "যেই তিনি শুনলেন, গানগুলি অতুলপ্রসাদের নয়, অমনি দেখ্‌লেন"...ইত্যাদি

(৪) "নজরুল ইস্‌লামের প্রতি এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে ধূর্জটিবাবু প্রবন্ধটি আগাগোড়া রচনা করেছেন।"

নলিনীবাবুর মতে আমার দোষ হচ্ছে অতুলপ্রসাদের জন্য propaganda করা এবং নজরুল ইস্‌লামের গানকে হেয় প্রতিপন্ন করা। বলা বাহুল্য যে, আমার এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল আজকালকার গানের গলদ কোথায় দেখান-- অর্থাৎ সর্বসাধারণে যে সংগীতকে বরণ করেছে সে সংগীত উচ্চশ্রেণীর নয় তাই দেখান। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তুলনামূলক বিচারের আবশ্যক হয়েছিল। লেখকের মনে কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি আছে সন্দেহ না করে লেখকের ভাষা ও বক্তব্য ধরে সমালোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে আমি আরো একটি কথা বলছি। নলিনীবাবু একজন হাস্য-রসিক, শুধু তিনি কাব্য ও সংগীতরসিক নন। তিনি আমার 'সন্দেহ'টির প্রকৃত অর্থ ধরতে পারলেন না দেখে দুঃখিত হলাম। **আমার 'সন্দেহ'টি শুধু লিখনভঙ্গি—যেখানে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না সেখানে সন্দেহ জাগিয়ে তার অতি সহজ নিরাকরণ করা তর্কের অতি সনাতন পন্থা।** নলিনীবাবু নিজেই লিখেছেন,যে অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে। যদি আমি অতুলপ্রসাদের ও কাজীর গানের পার্থক্য কোথায় শুনেই ধরতে না পারতাম— যদি আমার সে সূক্ষ্মজ্ঞান নাই থাকে— তা হলেও, আমার পরিচয়ের জন্যও, ওই প্রকার ভুল করা আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব কেননা অতুলপ্রসাদের অনেক কবিতার গোটাকয়েক লাইন অন্তত আমার জানা আছে। অতএব "যেই" শুনলাম গানগুলি অতুলপ্রসাদের, নয় "অমনি" আবিষ্কার করলাম যে কাজীর গান নিম্নশ্রেণীর— এই ধরনের সমলোচনার কোনো মূল্য নেই। অবশ্য কথার ভিন্ন অর্থ ধরে সমালোচককে বিদ্রূপ করাও সনাতন প্রথা। সেই হিসাবে নলিনীবাবু বেশী দোষ করেন নি।

নলিনীবাবু সমালোচনায় আগাগোড়া begging the question করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে "বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি......সুর-লয়ের সঙ্গে বাঙালী চায় emotion-পূর্ণ কথা। আর চায় সেই কথার সঙ্গে সুর লয়ের ভাব সম্মিলন।

কবি নজরুল ইসলামের গানকে বাঙালী এই হিসাবেই কণ্ঠাভরণ করে নিচ্ছে।" অন্যত্র নলিনীবাবু লিখেছেন "ধূর্জটিবাবু......প্রবন্ধটি লিখতে যে সময় নষ্ট করেছেন, তার চাইতে অল্প সময় খরচ করে যদি ভেবে দেখতেন যে "কাজী নজরুলের গান দেশ ছেয়ে ফেলেছে" কেন, তা হলে হয়তো তাঁর প্রবন্ধটি লিখবারই প্রয়োজন হত না। বাঙালী 'শুনতে ভাল লাগার' দিক দিয়েই মুখ্যত গানের বিচার করে থাকে। শ্রেণীর উচ্চতা-পরিমাপের ভার তারা পরিমাপক শ্রেণীর ব্যক্তির উপর ছেড়ে দিয়ে "খুব বেশী মূল্য" দিয়েই কবি নজরুলের গান নিয়েছে। দেশভরা আগ্রহ না থাকলে এ গান দেশ ছেয়ে ফেলতো না। এই আকুল আগ্রহই তাঁর গানের মূল্য।"

তা হলে দাঁড়াল এই যে যা হচ্ছে, যা ভাল লাগছে তাই ভাল হচ্ছে— এবং নলিনীবাবুর বর্ণিত "ভাব বিলাসী বাঙালী" 'Emotion-পূর্ণ কথা'র বাঙালী 'গ্রহণ' ও 'বরণ' করেছে, যেমন কাজীর গান, তা গ্রহণ ও বরণ করা হয়েছে বলেই ভাল। নলিনীবাবুও অতুলপ্রসাদের গান ভালবাসেন ও ভাল বলেন— কিন্তু উক্ত কারণে— প্রমাণ "কিন্তু অতুলপ্রসাদের যে গানগুলি বাঙালী গ্রহণ করেছে—" লাইনটি। নলিনীবাবু গ্রহণীয়তা ছাড়া গানের অন্য মূল্য দিতে নারাজ। প্রমাণ "কীর্তন বাউল থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমানের গান পর্যন্ত বাঙালী, যে সংগীত বরণ করে নিয়েছে, উচ্চ নিম্ন অভিধায় তার কিছুমাত্র যায় আসেনা। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি।" বাঙালী যাই হোক না কেন— নলিনীবাবুর মন আছে, তাই তিনি একবার বলে ফেলেছেন—অতুলপ্রসাদের "গানগুলির সঙ্গে সাধারণের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের মূল কারণ হচ্ছে এই গানগুলির সুরের ও ভাষার ভিতরে বাঙালীর প্রাণের যোগ আছে।" আমার প্রশ্ন এই ছিল এবং এখনও এই— বাঙালীর প্রাণের সন্ধান আমি পাইনি— জনকয়েক বাঙালী ব্যক্তির মনের খবর জানি— সে কথা ছেড়ে দিলে কাজীর গানে সুর ও ভাষার হরিহর মিলন আছে কি? যদি থাকে সে মিলন কি অতুলপ্রসাদ ও রবিবাবুর গানে যে মিলন আছে তার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ও মধুর? আমার মনে হয়— নয়। নলিনীবাবু এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ দেখাতে না চেষ্টা করে কাজীর প্রতি অন্যায় ও অবিচার করেছেন।

আমার বক্তব্য ছিল যে যদিও কাজীর গান দেশ ছেয়ে ফেলেছে তবুও সেটি উঁচুদরের ভঙ্গি নয়। যা ছেয়ে ফেলে তাই ভাল হলে পানা পুকুর পরিষ্কার করা উচিত নয়, পানার ফুল গোলাপের চেয়ে ভাল প্রমাণিত হয়, কেননা ও ফুল বিদেশ থেকে আনা এবং বাংলার মাটিতে ভাল হয় না— মধুপুর মিহিজামেই হয়। আমি কাজীর গানকে পানার সঙ্গে তুলনা করছি না— কাজীর গানের প্রসারকে

পানার প্রসারের সঙ্গে তুলনা করছি। আমার বক্তব্যের ভুল দেখাতে গিয়ে নলিনী বাবু একটি বাঙালীপ্রাণ আবিষ্কার করলেন— তাকে ভাব-বিলাসী করলেন— তার গ্রহণকে বরেণ্য করলেন। মোদ্দা কথা— এরূপ যুক্তিতে কাজীর গান খুব উঁচুদরের প্রমাণিত হল না। নলিনীবাবু শুধু Categorically বললেন আমি যা সমালোচনা করেছি তা ভুল, কেননা যেকালে বাঙালীপ্রাণ কাজীর গান মাথায় তুলে নিয়েছে, তখন তুলনামূলক বিচার করা, এমন কি বিচার করাই অন্যায়। এর অপেক্ষা অন্য এক যুক্তি আমাকে স্পর্শ করতে পারত— যেমন "বাঙালী 'শুনতে ভাললাগার' দিক দিয়েই মুখ্যত গানের বিচার করে থাকে।" সে যাই হোক— আমার প্রবন্ধের কথা ভুলে গিয়ে নলিনীবাবু যদি কাজীর গানের বিস্তারিত সমালোচনা করেন— তা'হলে আমি সত্যই উপকৃত হ'ব। সে প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় লেখা হলেও, বাঙালী পাঠকের জন্য লেখা হলেও একটু কম ভাবপ্রবণ হবে আশা করতে পারি কি? কেননা ভাবপ্রবণ সমালোচনা আমার কাছে নীচুস্তরের কীর্তনের মতনই খারাপ লাগে।

সত্য কথা এই মনে হয় যে ভাবপ্রবণতার সঙ্গে গানের কোনো সম্বন্ধে নেই। ভাব-বিলাস ও রস একবস্তু নয়, বাঙালীর প্রাণে যাই থাকুক না কেন— তার কানে সুর নেই বলে আমার বিশ্বাস— কেন না বাঙালী-কাণ ভাল সুর শোনবার সুযোগ কম পেয়েছে। ব্যক্তিগত হিসাবে অনেক বাঙালীর কান তৈরি আছে, কাজীর গান সম্বন্ধেও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেক "বুদ্ধিমান বাঙালী"— (হঠাৎ ভাব-বিলাসী বাঙালী তর্কের খাতিরে বুদ্ধিমান হয়ে গেলেন) "এই প্রাণ-পুটেই নজরুল ইসলামের গানকে আগ্রহে গ্রহণ" করেন নি। অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না। আমার বুদ্ধিতে আমি কাজীর গানকে প্রাণপুটে আগ্রহে গ্রহণ করতে পারছি না— এইতেই আমার লাভ ক্ষতি হচ্ছে। "আকুল আগ্রহ" দিয়ে আমি কোনো জিনিসের মূল্য যাচাই করতে পারি না— কেননা Value is determined by demand and supply এই পড়াই ও বিশ্বাস করি। ছোট ছেলে ঘুম থেকে উঠে মিছরি চায়, তাই বলে একতাল মিছরি পাওয়াও যায় না, পাওয়া গেলেও দেওয়া যায় না।

নলিনীবাবু আশা করি একটু সাবধানেই প্রবন্ধটি পড়বেন। অনুরোধ করবার কারণ এই যে অসাবধানতাবশত তিনি আমার 'স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার' চেষ্টাকে 'স্বাস্থ্যরক্ষা'র চেষ্টা বলে প্রথমেই ভুল করেছেন। সেই ভুলবশতই আমার কাজীর গানের তুলনামূলক বিচারের মতন অসাধু প্রস্তাবকে 'সাধু সংকল্প' বলে ঠাট্টা করেছেন। ভয় হয় পাছে 'রস-পিপাসু' বাঙালী-প্রাণ তাঁর ঠাট্টাকে তত্ত্বকথা বলে

আগ্রহে বরণ করে। নলিনীবাবু আমার সংগীত সম্বন্ধে মতামত কি নিশ্চয়ই জানেন—তিনি আমার সুখ্যাতি পর্যন্ত করেছেন— অতএব তাঁকে আমার প্রবন্ধ-গুলির কথা স্মরণ করালে বন্ধুত্বের অপমান করা হয়। শুধু এই বলে ক্ষান্ত হই যে আমি সংগীতরাজ্যের যতীন সিংহও নই এবং নিতান্ত আধুনিক ও তরুণ সাহিত্যের অন্ধভক্তও নই। আমি যে ডাক্তার কি রোগী প্রমাণিত হয় না।

কাজীর গানকে খুব ভাল বলতে আমি সদাই ইচ্ছুক— মাঝে মাঝে ভালও লাগে তার গান। তবে যা ভাল লাগে আমার প্রাণে তাই ভাল বলতে আমি কুণ্ঠিত। বিচার-বুদ্ধিকে ত্যাগ করতে আমি অত্যন্ত গর্‌রাজী। নলিনীবাবু যদি আমার আনন্দ বাড়িয়ে দিতে পারেন তা হলে তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আনন্দের উপাদান আমার জীবনে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে।*

---

* ধূর্জটিপ্রসাদের আজকালকার গান প্রবন্ধের প্রতিবাদ শ্রীনলিনীকান্ত সরকার 'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৬ সংখ্যায় 'আজকালকার গান' এই শিরোনামে প্রকাশ করেন। নলিনীকান্তর প্রতিবাদের উত্তরে ধূর্জটিপ্রসাদ লেখেন 'উত্তর'। নলিনীকান্তর প্রবন্ধটির জন্য গ্রন্থ-পরিচয় দেখুন। —সংকলক

অতুলপ্রসাদ

অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে এত শীঘ্র কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখনও পর্যন্ত নিষ্কামভাবে তাঁর জীবনের ঋণ গ্রহণ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, তিনি এখনও জীবিত রয়েছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার উচ্ছ্বাস পড়ে হাসছেন। যিনি পরের সুখ্যাতি ছাড়া কখনও নিন্দা করেন নি, তিনি কখনও নিজের সুখ্যাতি সহ্য করতে পারতেন না, ছেলেমানুষের মতন লজ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ইতিপূর্বে একাধিক প্রবন্ধে তাঁর সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, সে সব মন্তব্য যদি কখনও তাঁর চোখে পড়ত তাহলে বলতেন, তোমরা স্নেহের বশে আমাকে লোকের সামনে আনলে। আমি জানি লক্ষ্ণৌ-এর নির্মলচন্দ্র দে মহাশয় তাঁর ছেঁড়া খাতা থেকে কত যত্নে, তাঁর অজানিতে কবিতাগুলি উদ্ধার করেন; এও জানি কত সাধ্য-সাধনা করে সেই পাণ্ডুলিপি ছাপাবার সম্মতি পাই। তাই আমার সদাই ভয় হয়, পাছে আমার কোনো ব্যবহারে, কোনো ভাষায় তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ পায়। এমন সুকুমার মনের বিশ্লেষণ করা মহাপাপ। অনুভূতিই এ ক্ষেত্রে শোভন।

সমগ্রতাকেই অনুভব করা চলে। তিনি ছিলেন সুসমন্বিত পুরুষ। তাঁর জীবনের বহুমুখীনতা কোনো দ্বন্দ্ব কিংবা বিভাগ সৃষ্টি করেনি। দ্বন্দ্ব ছিল না বলি না, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের শক্তিকে তিনি সুসমৃদ্ধ সংহতিতে পরিণত করেছিলেন। বিভাগ যে কত ছিল সকলেই জানেন, অত বড় ব্যারিস্টার, নেতা, সমাজ-সেবক, কর্মী, দাতা, কবি, সংগীত-রচয়িতা একাধারে দুর্লভ। কিন্তু প্রত্যেক কর্ম তাঁর স্বভাবে এত উত্তমরূপে ধৃত ছিল যে মনে হত সবই যেন অন্তরের জ্যোতির বিকিরণ, গোলাপ-গাছের গোলাপ ফোটার মতই স্বাভাবিক, প্রতিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। প্রতিকূলকে অনুকূলে রূপান্তরিত করার যাদুবিদ্যা তাঁর ছিল করায়ত্ত। এমন প্রয়াসবিহীন সামঞ্জস্যের কৃপাতেই তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। তাঁর জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখলাম— সেদিনকার শ্মশান-যাত্রায়। বিদগ্ধ নাগরিকের শ্মশান-যাত্রা নয়, শহরের প্রত্যেক জাতির, ধনী-নির্ধনের, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের আত্মীয়ের শবানুগমন। শোক-সভায় প্রত্যেকেই তাঁকে নিজের বলে দাবী করতে উদ্যত, কিন্তু কারুর মুখ ফুটে সে দাবী উচ্চারিত হল না,— এই হল তাঁর শোক-সভার বিশেষত্ব। এই প্রকার মনোভাব একমাত্র সম্পূর্ণ ব্যক্তির প্রতিই সম্ভব।

কিন্তু বিশেষ কর্মেই তাঁর সমগ্রতা ধরা পড়ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, সর্বোচ্চ সমিতির সভ্য-হিসেবে। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্য ধরনের। আরো অনেকের মতো আমি তাঁর কর্মান্তে বিরামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের পরিচয় হয় সংগীতের দৌত্যে, সংগীতের আসরে। আমার প্রিয়-গানের রচয়িতা হিসেবে যুবা বয়স থেকে তাঁর নাম শুনে এসেছি। 'সবুজপত্রে'র এক বৈঠকে তাঁর মুখে তাঁর গান শুনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেবার পূর্বে একবার লক্ষ্ণৌএ বেড়াতে আসি। কৈসারবাগে তখন তিনি থাকতেন। অনেক রাত পর্যন্ত গান-বাজনা হয়। তার পর কত আসরে তাঁর পাশে বসে গান বাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই। ভাল গান বাজনা শুনলে তিনি বালকের মতো অধীর হয়ে উঠতেন, অস্ফুট চিৎকার করতেন, মুখ থেকে উর্দু জবান বেরুত, একস্থানে বসে থাকতে পারতেন না, আবার তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন, 'ছাখ, একটু ব্যাকুল ও বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেন ···তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিকানা নেই!' কিন্তু শারীরিক উত্তেজনা অল্পক্ষণের জন্যই তাঁকে অভিভূত করত। তারপর ধীরে ধীরে নামত তাঁর মুখে, সর্বাঙ্গে এক সস্মিত কমনীয়তা, যার স্মৃতি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমার কেন? সকলেরই। সন্ন্যাসের প্রথম আঘাতে, মাত্র এক ঘণ্টার জন্য সে হাসি চলে গিয়েছিল, তার পর বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের প্রকৃতি বিকশিত হয়ে উঠল সেই হাসিতে। সকলের মনে পড়ল সেই ভাল গান শোনবার পর শান্ত সকরুণ হাসি। রস-উপভোগের সময় অন্যান্য ব্যক্তির ব্যবহারে বৈলক্ষণ্যটাই চোখে পড়ে, অস্বাভাবিকতাই প্রকাশ পায়, কিন্তু সুন্দরের পরিচয়ে তিনি অন্তরের অক্ষুন্ন পূর্ণতায়, অভিন্ন প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করতেন। তাঁর উপভোগ তাঁর অখণ্ডতারই বিকাশ। অমন শ্রোতা কোথায় কে পাবে? গান শুনে অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগের দিন আমার চলে গেল।

তাঁর নিজের গান আসরে ভাল গাইতে পারতেন না। সভায় অতি সহজেই নিজের ওপর বিশ্বাস হারাতেন, মূল সুর খুঁজে পেতেন না। ছোট আসরেই তাঁর গলা খুলত, সব চেয়ে ভাল শোনাত গুন-গুন করে গাইবার সময়। হাতে গোলাপ-কাটা কাঁচি নিয়ে, ড্রেসিং গাউন পরে বাগানে বেড়াচ্ছেন, গানের আধখানা চরণের গুঞ্জন-ধ্বনি হচ্ছে, এমন সময় গিয়ে পড়েছি। 'নতুন বুঝি?' 'এই যে! এস,—কোথায় যে থাক?' 'নতুন বুঝি? কবে হল?' 'হয়নি এখনও' 'শোনান' 'শুনবে এখুনি?' তার পর গলার জড়তা ভেঙে আস্তে আস্তে গাওয়া,। 'ভাল হয়েছে' 'ভাল হয়েছে?' 'আরো আছে নাকি'? 'এই সে দিন একটা

কেসে মফস্বলে গিয়েছিলাম। নদীর ধারে একটা বাংলোতে থাকতে দিলে, তাই থাকতে পারলাম না, না লিখে'। 'মক্কেলে টাকা দিলে ?' 'দিলে' 'নেই বুঝি ?' তারপর ছোট ছেলের মতো হাসতে হাসতে দোষ-স্বীকার। বাগান থেকে বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম, অফিস-ঘর থেকে উকিলের ডায়রি নিয়ে আসতেন, তারই পাতা থেকে গানের খসড়া বেরোত, শুনতাম, চলে আসতে ইচ্ছে হতো না, যখন আসতে হতো, তখন মন আমার ভরে থাকত।

তাঁর গান গাওয়ার মধ্যে একটি কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সেটি হল, অবসর। আরম্ভ করবার পূর্বে গানকে অবসর দিতেন, চোখ বুজে, নীরবে, জমি তৈরি করতেন, কালো ভেলভেটের ওপর কামদানীর কাজ ; আগ্রহে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতাম। গান গাইবার সময়ে প্রত্যেক কথাকে অবসর দিতেন, বাক্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি উপলব্ধি করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হতাম। নীরবতার আশ্রয়ে গানটি মিলিয়ে যেত, যেন মায়ের কোলে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমরা নীরব হয়ে রস উপলব্ধি করতাম। তাঁর গান গাওয়া ছিল নিভৃতির কম্প্র রূপচ্ছটা, বাক্ হতো সম্ভ্রমের সংযত কুশলতা। এই বিরাম কি তাঁর বিশ্রামবিহীন জীবনেরই ক্ষতিপূরণ ? কে তাঁর জীবনের মর্মকথা বুঝে তাঁর গান গাইবে ? করুণায় মৃদুল, অন্তরেরই ভাব-সম্পদে অন্তর্মুখী যে নয়, সে যেন তাঁর গান না গায়।

তাঁর সঙ্গে সাহিত্যের সূত্রেও বাঁধা পড়ি। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। কবির কবিতা শুনতে পেলে আর কিছু চাইতেন না। বলতেন, 'লিখতে লজ্জা হয়, ইচ্ছে হয় কেবলই পড়ি, কিন্তু হঠাৎ কেমন হাত কি রকম করে ওঠে!' রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্য কবির রচনা পড়তে তিনি খুবই ভালোবাসতন। তাঁর রুচি ছিল নিতান্ত উদার। সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি না থাকলে ঐ প্রকার সার্বভৌমিকতা লাভ করা যায় না। তুলসী ও কবীরের দোঁহা, মীরাবাই-এর ভজন তাঁর নিতান্তই প্রিয় ছিল। কিন্তু সাতরাজার ধন মাণিক তাঁর নিজের ভাষা, বাংলা ভাষা। সংগীত ও কবিতা রচনা ছাড়া অন্য কি কি উপায়ে তিনি বাংলা ভাষাকে সাহায্য করেছেন এ অঞ্চলের কোন প্রবাসী বাঙালীর অবিদিত নেই। 'উত্তরা'র জন্য, উত্তর-ভারতের প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-অনুষ্ঠানের জন্য, এ অঞ্চলের প্রত্যেক বাংলা-বিদ্যালয়ের জন্য তিনি যে হাজার হাজার টাকা দান করেছিলেন সে কেবল সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালবাসারই প্রেরণায়।

'উত্তরা' তাঁরই মানস-সন্তান। তিনিই প্রথমে বলেন কাগজ বার করতে হবে। রাধাকমলবাবু এবং প্রবাসী বাঙালী প্রত্যেকেই তাঁর প্রস্তাব সোৎসাহে গ্রহণ করে। প্রথম সংখ্যা বেরুল, তারপর সব উৎসাহেরই প্রকৃতি অনুসারে

এ উৎসাহেও ভাঁটা পড়ল। অন্য শহর থেকে টাকা এল, কিন্তু তাঁর দুরাশা পূরণের উপযুক্ত নয়। 'লাগে টাকা দেবে অতুল সেন।' তিনি টাকা দিলেন কত, আমি জানি। দেবার সময় রাগের ভান করে বল্লেন, 'টাকা আমি আর দিতে পারব না।' শুনে প্রত্যেকেই হেসেছিলাম। তাঁর রাগ দেখতে বড় ভাল লাগত। কতবার যে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই—'অমুক লোকটা আমাকে ঠকিয়েছে হে, ওকে আর এক পয়সা দেব না'। তখনি বুঝেছি আরো পাঁচশ টাকা গেল। যখনই রাগ দেখেছি তখনই আমরা বলাবলি করতাম, 'ইতিপূর্বেই মন নরম হয়েছে, তাই নিজের দুর্বলতা লুকোতে ব্যস্ত।' সে যাই হোক— 'উত্তরার' জন্য প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার টাকা দিলেন। কিন্তু একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না—'উত্তরা'র প্রতি মমতার সঙ্গে সুরেশ চক্রবর্তীর ওপর স্নেহ মিশে গিয়েছিল। তিনি সুরেশকে আন্তরিক স্নেহ করতেন।

অনেক সাহিত্যিকের মতে, 'উত্তরা' একখানি ভাল কাগজ— দু'চার জন নামজাদা সাহিত্যিকের মুখে এও শুনেছি যে 'উত্তরা'ই একমাত্র সাহিত্য-পত্রিকা। তাঁকে এই খবর শুনিয়েছি। শুনে তাঁর মুখে হাসি এসেছে— আর একটু তোৎলামি করে, আধখানা ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন…'বেশ বেশ বেশ, লেখ, লেখ…আচ্ছা করে লেখ দেখিনি'। 'অতুলদা, আপনি "মুশোয়ারা"র মতন আর একটা প্রবন্ধ লিখুন' 'তাই—তাইত কখন লিখি বল? এরা যে ছাড়ে না। তোমরা সব লেখ'। 'অতুলদা—আমরা সকলেই লিখছি…কিন্তু আমাদের লেখাটাই উত্তরার সর্বস্ব নয়…"আমি ভাই কবিতা দিতে পারি— তাও সময় কই?' সময় পেলেই তিনি কবিতা ও গাম লিখতেন, আর সেই কবিতা ও গান 'উত্তরা'র জন্যই প্রধানত লেখা হতো। অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতো বটে, কিন্তু তাঁর ইদানীংকার শ্রেষ্ঠ রচনা সবই 'উত্তরা'রই জন্য। যখন টাকা দেবার দরকার হতো না, যখন লেখা দিতে পারতেন না তখনও 'উত্তরা'র কল্যাণের জন্য চিন্তা করতেন। 'উত্তরা'র আজ যে প্রতিপত্তি হয়েছে সে কেবল তাঁরই কামনায়। সুরেশের বাহাদুরী স্বীকার করি কিন্তু তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা না থাকলে সুরেশকে অন্য পত্রিকায় চাকরি নিতে হতো।

প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-সভায় যোগ দেওয়া ছিল তাঁর নেশা। তাঁর সঙ্গে একাধিক সভায় যোগ দিয়েছি। তাঁর উপস্থিতিতে রসের ফোয়ারা খুলে যেত। গান আর গান, গান আর গান। কানপুরে রাত্রি দুটো পর্যন্ত গাইলেন— দিল্লীতে, জয়ন্তী উৎসবে রাত বারোটা পর্যন্ত, শেষকালে জোর করে বাড়ি পাঠালাম। গোরখপুর, নাগপুর, কাশী সর্বত্রই তিনি গিয়েছেন— সকলকে মুগ্ধ

করে এসেছেন— কেবল সৌজন্যে নয়, সাহিত্য-প্রীতির সংক্রমণে।

অমন রসিক সুজন দুর্লভ। রসই তাঁকে সংহিত করেছিল। রসের মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন। পর্ণকুটিরে ভৈরবীর ঠুংরী শুনতে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে। বৃদ্ধ ওস্তাদ কেঁপে অস্থির— সেন সাহেবকে কোথায় বসাবে? সেই ছেঁড়া ভাঙা খাটিয়ার ওপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনলেন— বেলা বারটা হল— ওস্তাদের ছেলের হাতে দুখানা নোট গুঁজে দিলেন—আর 'কিসী রোজ্ তস্রীফ' নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। লক্ষ্ণৌ-এ একজন পাগলী আছে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এককালে বিখ্যাত গায়িকা ছিল। এখনও অদ্ভুত টোড়ী আর ভৈরবী গায়। অতুলদা শুনেই সংবাদদাতাকে পাঁচ টাকা দিলেন, 'তাঁকে নিয়ে এস, নিয়ে এস'। সেদিন তাকে পাওয়া গেল না। টাকা ফেরত দেবার সময় তিনি বল্লেন, 'ও তো, তো তোমার কাছেই থাক, যখন খুঁজে পাবে ধরে এন।' বুঝলাম, এটা হয় সুখবরের পুরস্কার, রাজকুমারের গজমতির মালা-দান, না হয় সংবাদদাতাকে সাহায্য। যে খবর দিয়েছিল সে ছিল বিদেশী সংগীত শিক্ষার্থী। ছোট মুন্নে ওয়াজিদ আলি শা'এর দরবারের শেষ গায়ক। এসে জুটেছিল অতুল সেনের বৈঠকখানায়। তালিব হুসেন লক্ষ্ণৌ-এর শেষ বিখ্যাত সানাইয়া— কৈসারবাগে থাকতে ভোর বেলা ভৈঁরো আর টোড়ী বাজাত দূর থেকে, অতুল সেন ঘুম থেকে সুর শুনতে শুনতে উঠতেন। 'ইয়ুসুফের সেতারে মিঠে হাত, রাখলে হয় না?' তাকেই রাখলেন; বরকতের ছড়ির টান ভাল— 'নিয়ে এস তাকে'। 'কদরদান্' বলতে লক্ষ্ণৌ-এর লোকে ঠিক কী বোঝে জানিনা— তবে আমি অতুলপ্রসাদকেই বুঝতাম। বাংলা দেশ নবাব ওয়াজিদ আলি শার মারফত লক্ষ্ণৌ-এর কাছে চিরঋণী, কিন্তু অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্ণৌ-এ প্রবাসী করে লক্ষ্ণৌ সে ঋণের প্রতিশোধ করেছে। অমন দরদী না হলে কেউ অমন কদর দিতে পারে!

সোজা কথা এই, তাঁর কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না। কেননা আমরা উপযুক্ত নই। তাঁর কীর্তি থাকবে তাঁর গানে। সেই জন্যই যে গানই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি এ বলতে আমি তৎপর নই। তাঁর কীর্তির অপেক্ষাও তিনি ছিলেন মহান এই আমার ধারণা।

এই ধারণাটি ধারণ করে তাঁর গানের আলোচনা করা উচিত। আমি এখন তাঁর সমগ্রতা অনুভব করছি, অতএব তাঁর সংগীত-সম্বন্ধে বিচার করতে অপারগ।

রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে লিখতে যাওয়া ধৃষ্টতা মনে করি। তার কারণ এই ঃ প্রথমত প্রায় আড়াই হাজার গান তাঁর রয়েছে এবং কেবল সংখ্যার দিক থেকেও সেগুলি বিচিত্র। দ্বিতীয়ত, যদি বৈচিত্র্যের কথাও ধরা যায়, তা হলে 'মূড' বা ভাব সিম্বল ও ইমেজ বা প্রতীক ও চিত্রকল্প সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত জানা যায় নি। সবই সাহিত্যিক অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। অতএব গুণবাচক বর্ণনা ও বিচার প্রায় এক রকম অসম্ভব। সুতরাং সংখ্যাধিক্য আর বিচারের অভাবের জন্য আমি রবীন্দ্রনাথের সংগীতের যৎসামান্য নমুনা তুলে নিচ্ছি। হয়তো আড়াই হাজার গানের এক সময় সাংখ্যিক বিচার হবে। যদি হয়, তা হলে আমাদের এই বিচার চলবে না। সংখ্যা তখন গুণে পরিণত হবে। আমি মধ্যেকার কথাই বলছি।

রবীন্দ্র-সংগীত— যদি রবীন্দ্রনাথের সংগীতকে রবীন্দ্র-সংগীত বলাই যায়— মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা চলে। বাল্য-রচনা ছেড়ে দিলে প্রথমে আসে ব্রাহ্ম-সংগীত। আঙ্গিকের দিক থেকে তাকে ধ্রুবপদ্ধতির গানই বলা যায়। অর্থাৎ ধ্রুপদের চার তুক, সরল সহজ অনাড়ম্বর গায়ন। তালও মোটামুটি সহজ, অর্থাৎ চৌতাল, ঝাঁপ, তেওরা, আড়া ইত্যাদি। তান নেই বললেই হয় এবং আছে মীড় ও কিছু গমক। ভাষাও সরল, ধর্মের গান সহজ হতেই বাধ্য।

কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতার প্রলেপও এসেছে। অবশ্য তার ফলে আঙ্গিকের ধর্মচ্যুতি হয়নি। শুদ্ধ ধ্রুপদ ছেড়ে দিলে অনেক পাকা খেয়াল, ধ্রুব খেয়াল এবং সামান্য টপ্পার ছোঁয়াচও আমরা পাই। শোরীর টপ্পা পাই না, লক্ষ্ণৌ ঠুংরীও বোধ হয় নেই। সংগীত-রসের দিক থেকে কোন্‌টা বেশী ভালো বলা যায় না। কিন্তু খাঁটি বাংলা গান হিসাবে, যাকে রাগ-প্রধান বলা হয়, ব্রাহ্ম-সংগীতের অনেকগুলি গান সত্যিই অপূর্ব। এ সংগীতে ভাব আছে এবং ভাবগুলি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অর্থাৎ 'অ-বিশেষ', ব্যক্তি-সম্পর্ক রহিত বলে হিন্দুস্থানী সংগীতের মতন উপভোগ্য। ব্রাহ্ম-সংগীতে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধ্রুপদ আছে বলে, উপভোগ্য নয়, ধর্ম-সংগীতের সাংগীতিক আঙ্গিকের জন্যও বটে। মাত্র ভাষা হিসাবে অনেকগুলি চমৎকার, কিন্তু এখানে মাত্র ভাষার ব্যবহার করছি না।

পরবর্তীকালের রচনাগুলি বেশীর ভাগই মিশ্রণ— সুরের মিশ্রণ এবং একত্রে

ভাষা ও ভাবের মিশ্রণ। আমার মতে, প্রায় হাজার গানে মিশ্রণ ঘটেছে এবং তার মধ্যে দেড়শ কী দু'শ গানে এই ধরনের মিশ্রিত রাগের একটা সম্পূর্ণ গঠন বা স্ট্রাক্‌চার সহজেই পাওয়া যায়। তাকে রবীন্দ্রসংগীত বলা চলে। আবার তারও মধ্যে গোটা কতক গান আছে যেগুলো মিশ্রিত হয়েও অ-মিশ্রিত, যেগুলি খাঁটি রাবীন্দ্রিক। এই ধরনের প্রায় শ দেড়েক গানের যে নিজস্ব গঠন রয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু আঙ্গিকের বিচার করা যেতে পারে।

আমি মূলত গোটা কয়েক 'জনক' রাগ নিচ্ছি। ভৈরবীতে বোধ হয় সব চেয়ে বেশী এই ধরনের রাগ রয়েছে। সেগুলিতে একধারে আশাবরী, তিন চার রকমের টোড়ী ও অন্যধারে সামান্য ভেঁরো। (বাউল-ভাটিয়ালের কথা শেষে বলব।) এখন কথা এই— এই ধরনের মিশ্রণ প্রায় সমধর্মী অর্থাৎ 'কগ্‌নেট'। যথা ভৈরবীর কোমল রে গা ধা নি সারং, পূরবী, ইমন প্রভৃতির সঙ্গে মিশ খায় না, পাশাপাশি এই ভৈরবী ধরনের রাগের সঙ্গেই মিশ খায়।

তা যদি হয়, এবং মিশ্রণগুলি যদি একাঙ্গ হয়ে যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের এক একটা রূপ ফোটে। সেখানকার রূপ ঠিক অ-বিশেষ নয় আবার সব সময় স-বিশেষও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। অবশ্য সুর চালু হবার পরই রূপ পায়। যদি কোনোটা মিশ্রণ সর্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে গৃহীত না হল, তবে সে সুর অপ্রচলিত হয়ে মরে গেল। আবার অনেক দিন পরে ফিরেও আসে, যেমন দুর্গা। কিন্তু সহৃদয়হৃদয়বেত্তা— যাকে আমি সর্ববাদি-সম্মতি বলছি— গ্রহণ করলে রূপের নাম পাবে, যেমন ঠাকুরী ভৈরবী। অবশ্য একাধিক ঠাকুরী ভৈরবী রয়েছে।

ভৈরবীর পরে মল্লার। দেশ-মল্লার, নট-মল্লার, সুরঠ-মল্লার, মিঞা-মল্লার শুদ্ধ-মল্লার—এগুলো তো রয়েইছে প্রায় বিশুদ্ধভাবে, কিন্তু এ ছাড়া বর্ষার গানে অন্য ভাবে পিলু-বারোঁয়া এমন কী ইমনকল্যাণও দেখা যায়। তার কারণও সোজা। হিন্দুস্থানী গানে মল্লারের বিস্তর রূপভেদ রয়েছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের রচিত মল্লারে গোটা কয়েক ব্যতীত হিন্দুস্থানী মল্লারের রূপই বেশি।

এর পর পূরবী ; সেখানে পূরবী-কল্যাণই প্রায় সব। কোমল ধৈবত বোধ হয় নেই, কোমল রেখাবও কম, আছে দুই মধ্যম।

তার পর বেহাগ। সেখানে কেদারার অন্য দুই প্রকারের মধ্যম, বিহাগড়ার কোমল নিখাদ ইত্যাদি। কেদারার অংশই বেশি মনে হয়। আমার মতে প্রায় সব রাগেই কেদারা পাওয়া যায় এবং তার মিশ্রণ সত্যিই অদ্ভুত।

এর পর এমন একটি বস্তু এলো যেটার মিশ্রণ অভূতপূর্ব। তিনি বাউল ও ভাটিয়াল গ্রহণ করলেন এবং তারই ফলে, শুদ্ধ-বাউল ভাটিয়াল ছেড়ে দিয়ে তাদের

সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগ মিশিয়ে দিলেন। অনেকগুলি ঠিক মেশেনি, আবার অনেকগুলি মিশেছে। (অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাটিয়াল আর শুদ্ধ বাউল-ভাটিয়াল এক নয়। রবীন্দ্রনাথের হ'ল ছাঁকা বালি আর গ্রামের হ'ল পাঁকের মাটি।)

এই ধরনের মিশ্রণের একটা নতুন প্রকৃতি আছে। সেটা হ'ল জীবনের প্রকৃতি। সুর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সাহিত্যে ভাঙন ধরেছে, আর্টে নতুন কিছু হচ্ছে না, একাডেমিক হয়ে যাচ্ছে,— সে সময় জমি থেকে, মাটি থেকে একটা নতুন জীবন বইতে থাকে। অতি-মানব জীবনেও তাই। হিন্দুস্থানী সংগীত 'ওস্তাদী' গান হয়ে গেল, নতুন কিছু হচ্ছে না, সব বন্ধ হয়ে গেল,— তখন মাটির হাওয়া চাই, বাউল-ভাটিয়াল হওয়া চাই। অবশ্য এটা একটা মোটামুটি ধারণা। আমি প্রায়ই মহাভারত থেকে একটা গল্প বলি। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান। তাঁর পৌত্র আত্মীয়-স্বজন শিষ্যবৃন্দ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি জল চাইলেন, কেউ দিতে পারলেন না। তখন অর্জুন মাটির লক্ষ্যভেদ করলেন, জল উপচে উঠল। ভীষ্ম তাই খেলেন এবং তার পর তাঁর মৃত্যু হ'ল।

এখন বাউল-ভাটিয়াল হ'ল মাটির লক্ষ্যভেদ আর সেই বাউল ভাটিয়ালকে রবীন্দ্রনাথ ঢেলে সাজালেন। অনেক গান এই রকম ঢেলে সাজা। তারই মধ্যে যেগুলি উত্তীর্ণ হয়ে গেল, সেগুলি নতুন এবং চমৎকারের অধিক যদি কিছু বলা যায়, তা হ'ল পূর্ণ। শোভন তো আছেই। প্রথমেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাটিয়াল মার্জিত ও ভদ্র। ভাষা তো ভদ্র বটেই; স্বরবর্ণের সুদীর্ঘ টান, উচ্চারণের পাড়াগেঁয়ে ভাব একেবারেই নেই। অর্থাৎ 'রুর‍্যালিজ্‌ম' বা গ্রামীণতার এখানে নিতান্ত অভাব। আমার যেন মনে হয় যে এই মিশ্রণের সময়, প্রথমে রাগ ও পরে বাউল-ভাটিয়াল। কিন্তু তার পর হ'ল প্রথমে ভাটিয়াল-বাউল ও পরে রাগ এবং শেষে হ'ল নিছক বাউল-ভাটিয়াল। সময়ের দিক থেকে আগে-পরে ঠিক নয়,— বলা যায়, notionally।

এ তো গেল মোটামুটি ইতিহাসের কথা, ক্রনলজি নয়। এখন প্রশ্ন হবে— কি উপায়ে রাবীন্দ্রিক সুর এল, তাদের আঙ্গিক কি? কী ভাবে 'ধীরে বন্ধু ধীরে' (আশোয়ারী, টোড়ী, ভৈরবী), 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' ইত্যাদি বাউল-ভাটিয়াল নতুন ভাবে জন্মাল? গোটা কয়েক কারণ আছে। সুরের আলোচনায় অনির্বচনীয়, বাক্যের অতিরিক্ত বলা চলে না। যেখানে অতিরিক্ত, সেটা আমাদের আপাতত বুদ্ধির অগম্য বলাই ভালো।

প্রথম কথাটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। হিন্দুস্থানী (এবং বেশির ভাগ

সময় কনকাঙ্গী) সংগীতের রাগবস্তুটি অ-বিশেষ, 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট'। অর্থাৎ বহু বিশেষের গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু.। অবশ্য প্লেটোর 'আইডিয়া'-প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। মোটামুটি বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক ভাবে chant প্রভৃতি প্রাথমিক, বিশেষ গানগুলিকে সাধারণভাবে সমন্বিত করলে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট রাগে পরিণত হয়। কিন্তু এইখানেই বিপদ। রাগে কোনোও বিশেষ গান ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট রাগ। অর্থাৎ ইতিহাসের উৎপত্তি চোখে পড়ে না, ধরা পড়ে যেন প্রথম থেকেই অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন। অবশ্য সেই রাগেরই কত পরিবর্তন হয়েছে, কত মতামত বদলেছে! আর সেটা যেন কোনোও না কোনোও বিশেষের তাগিদে। আজ পর্যন্ত মল্লারের অন্তত সাত-আটখানি রূপ শুনেছি যেমন, শুদ্ধ মল্লার, মিঞা-কি-মলার, হরিদাসী মল্লার, সুরদাসী মল্লার, সুরঠ মল্লার, গৌড় মল্লার, দেশ মল্লার, মেঘ মল্লার ইত্যাদি।

এতগুলি মল্লারের বিশেষ রূপ নিশ্চয়ই আছে, অন্তত ছিল মনে হয়। কোনোটা মন্দাক্রান্তা ছন্দের ঝর-ঝর বারিপাত, কোনোটা এক রকমের বিরহ। কোনোটা আকাশভাঙা বর্ষণ, কোনোটা বৃষ্টির পূর্বাভাসে মেঘ, কোনোটা বা গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি। এ ছাড়াও অন্য ধরনের বিরহ রয়েছে। সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের বিরহ বহু রকমের; সেটি প্রতি বিষাদের সম্পত্তি এবং প্রত্যেকটা পৃথক, অর্থাৎ প্রতি রচনা হ'ল বিশেষ। রাগ যেন স্ত্রীকে সব গহনা, সব কাপড় জামা সাজিয়ে দেখান, কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতে প্রত্যেক স্ত্রী নিজের-নিজের পোশাক পরা। যদি তাই হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের ভৈরবী বহু রূপের ভৈরবী। রাগের ভৈরবী একই ভৈরবী। অবশ্য রাগের ভৈরবীতেও কিছু ইতর বিশেষ আছে নিশ্চয়। তবে সেটা তালের, ছন্দের এবং কিছু বন্দেশীতে।

দ্বিতীয় কথা হ'ল সুরের 'মুড' বা ভাব। এই 'মুড'টা যে কি, তা ঠিক সত্যি করে বলা শক্ত। প্রথম কথা ওঠে ভাষা এবং সেই ভাষা সংগীতে মূর্ত হয়ে ওঠে। কবিতায় যদি 'মুড' ফুটে ওঠে, তবে সেই 'মুড' সুরে বসতে চায়। হিন্দী উর্দু ভাষায় কিন্তু সব সময় সুরে বসছে না দেখেছি। যেমন বৃষ্টি হলেই মল্লার, দুঃখ হলেই কোমল নিখাদ, গম্ভীর হলেই কেদারা মালকোষ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'মুড' সুর ও কবিতার দ্বৈত সম্বন্ধ, যেন ডিপ্‌থং। এখানে, ভালো ভালো স্থানে, একত্রে দুয়ের যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথ যেন একত্রে সুর ও কথা প্রয়োগ করেছেন,— প্রয়োগ কথাটি ঠিক উপযুক্ত নয়, সুর ও কথা একত্রে জন্মাচ্ছে। তারই ফলে এল 'মুড'।

অবশ্য এ কথা সত্যি যে দুয়ের সংযোগ বিধান এক প্রকার অনির্বচনীয়, অব্যক্ত

বস্তু। কিন্তু কখনও কখনও আরও একটি কথাও মনে হয়। এটা ঠিক যে দুই বস্তু, সুর ও কবিতার মিশ্রণে এক হচ্ছে। কিন্তু এক মুহূর্তে ঠিক এক হচ্ছে না। প্রথমে হয় কবিতা না হয় সুর। রবীন্দ্রনাথের বেলায়, অনেক ক্ষেত্রে, সামান্য কিছু আগে ও পরে। তাই যেন মনে হয়, ব্যাপারটা ক্যাটালিটিক এজেন্ট-এর মতন। অর্থাৎ প্রথমে দুই, পরে মিশ্রণ,— যেটা আমরা বেশি জানিনা, তবু খানিকটা জানি, এবং সেই মিশ্রণের পরে এক। অর্থাৎ খানিক অংশে কবিতা খানিক অংশে সুর। কবিতা সুরের আকার নিল, আবার সুর কবিতার আকার নিল। কবিতায় যদি আংশিক ছন্দ জন্মায়, তবে নিশ্চয় তার অংশত আঙ্গিক আছে। সুরে যদি আংশিক ছন্দ থাকে, তবে তারও আংশিক ছন্দ থাকবেই।

কবিতায় খানিকটা তা হলে আসবে কথা,— কথার অক্ষর, কথা অক্ষর-অনুসারে সাজানো, তার স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস, তার গতি ও ছন্দ। সুরের বেলায়ও তাই। তারও পরে আসছে সংগীত। দুয়ের মিলনে একটা সাংগীতিক ভাব, 'মুড'। অনেকগুলি 'মুড' ঠিক জমে না, আবার অবার অনেকগুলি জমে। 'ভুলতে দিতে' গানে প্রথমে বাউল, পরে ভৈরবী— দুটো যেন এক 'মুড' হয় নি। আবার বহু গানে 'মুড' খুব ভালো বসেছে।

এখন যদি বিশেষ 'মুড' বা ভাব জন্মায়, তখন সেখানে এক প্রকার চিত্র-সংগতি আসে। 'মুড'-কে পৃথক করে দেখলে অর্থাৎ কবিতা ও সুর ভিন্ন করলে চিত্র ফুটে ওঠে। আবার কেবল কবিতা, কেবল সুর থাকলেও তাই। (দুটোর মধ্যে তফাত করলে দুটো ভিন্ন চিত্র আসতে পারে, সন্দেহ হয়)। কবিতার কথা যদি ভুলে গিয়ে আ-আ করে সুর গাই, তবে সেখানে গোটা কয়েক 'কার্ভ', বক্রগতি আসে এবং সেই সুরের বক্রতায় ছবি মনে হয়।

সুরের রাগরূপ অবশ্য ভোলা কঠিন। কিন্তু যদি তা হয়, তবে কবিতা কেবল, চিত্রধর্মীই হবে। সে যাই হোক, বিশেষ সাংগীতিক রূপে চিত্র জন্মায়। এই বিষয় নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করেছি। চিত্র পেয়েছি, কিন্তু সেটি নিতান্ত রেখাগত, যদিও রেখাগত সাংগীতিক রূপ থেকে চিত্রই বেশি পেয়েছি। এই নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। শোয়াইটজারের 'বাখ্' গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে তার ইংগিত আছে। রবীন্দ্র-সংগীতের নাটকত্বও এইভাবে দেখানো যায়। এমন কি সেখানে শুদ্ধ নাটকত্বও বোধ হয় পাওয়া যাবে।

আমার বক্তব্য নিতান্ত সোজা। রবীন্দ্রনাথের সংগীতের মিশ্রণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে করাই ভালো। অর্থাৎ তার আঙ্গিকটা ভালো করে দেখা উচিত। তাকে

অব্যক্ত বললেই চলে না। সংগীতের আঙ্গিকটাই সব; তার শেষে অব্যক্তটা দেখা যাবে। কাজটা করা শক্ত, কেননা সেখানে সুর ও কবিতা জুড়ে রয়েছে। তারও পরে চিত্র নাটক ইত্যাদি। ব্যাপারটা হ'ল কার্বাংকল-এর মতন। তার প্রতিফলন দুই, এমন কি হয়তো দুয়েরও বেশি।

রবীন্দ্রনাথের গান

ভারতীয় রাগপদ্ধতির ক্রমবিকাশ রবীন্দ্রসংগীত, চলচ্চিত্র ও 'জাজ্' (jazz) প্রবর্তনের পূর্বপর্যন্ত তার নির্দিষ্ট সুরবৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেই হয়েছিল বলা চলে। স্বরমিশ্রণ এবং কিছু পরিমাণে বিদেশী প্রভাবের ফলে স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আসলে পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীর পর ভারতীয় রাগ-পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছু হয়নি। দক্ষিণ ভারতের শ্রদ্ধেয় ত্রয়ী (Trinity) মূল পদ্ধতিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। উত্তর ভারতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। এমনকি রবীন্দ্রসংগীতের প্রসঙ্গেও একথা প্রযোজ্য। এতে মিশ্রণ গ্রহণ করা হয়েছে, কয়েকটি নতুন মিশ্রণ প্রবর্তিতও হয়েছে কিন্তু অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ— রাগরূপায়ণের এই চারটি স্তরকে রাখা হয়েছে অটুট।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'আমি ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হতে চাই না।' অন্য-ভাবে বলতে গেলে, রবীন্দ্রসংগীতের নতুন রাগগুলো ধরতে হবে ঠাকুর-টোড়ী, ঠাকুর ভৈরবী, ঠাকুর-পূরবী প্রভৃতি। কিন্তু মূলে সেগুলো টোড়ী, ভৈরবী এবং পূরবীই। তাই রবীন্দ্রনাথকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের যথার্থ অনুগামীই বলা যেতে পারে। অথচ উচ্চাঙ্গ সংগীত থেকে তাঁর গানের স্বাতন্ত্র্যও অনেক। এখানে তিনটির কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করছি :

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের গানে দেশী বৈচিত্র্য ধ্রুপদী (ক্লাসিকাল) সুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশেছে যা আগে শোনা যায়নি। বাঙালী, জৌনপুরী, সুরঠ, গুজ্জরী, পাহাড়ী প্রভৃতি প্রাচীন দেশী রাগসমূহের ধ্রুপদী সুরের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে একথা ঠিক। কিন্তু সেগুলি একেবারে মিশে এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্র-সংগীতে কিন্তু এভাবে রাগগুলি হারিয়ে যায়নি, সময় সময় একেবারে সব মিশে এক হয়ে যায়। তখন গানের বাণী আর সুরের পৃথক কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সব একাত্ম হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুর দুই-ই আমরা পাই ; কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতের নতুন রূপে শুধু রাগেরই প্রাধান্য। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানটি। এখানে বাউল মিশেছে কানাড়ার সঙ্গে। যদিও খুব সহজভাবে নয়। কিন্তু কাব্য যখন রূপ নিল তখন দুটো হয়ে গেল এক। সংগীতে

সাধারণত সুরের কাছে কথা থাকে অপ্রধান। রবীন্দ্রনাথের গানে এ ধরনের মিশ্রণ প্রধানত হয়েছে বাউল, ভাটিয়ালী এবং কিছুটা কীর্তনের সঙ্গে। পরবর্তী যুগের গানেই তা হয়েছে, প্রথম যুগে সুর ছিল উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুগামী।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রসংগীত পরিণত রূপ লাভ করবার পর রাগ নিজেই সমরূপের রাগের বিভিন্ন বৈচিত্র্যে বিকাশ লাভ করেছে। তাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি ছায়ানট বহু ছায়ানটে বিস্তারলাভ করেছে। উচ্চাঙ্গসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতে পার্থক্য হলো এই যে উচ্চাঙ্গসংগীতে রাগ-বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় এক থেকে দশ পর্যন্ত। যেমন, ভৈরবীতে একটি, টোড়ীতে ছয়টি এবং কানাড়াতে দশটি। রবীন্দ্রসংগীত অসংখ্য গানে বিভক্ত। তাতে অনেকগুলি ভৈরবী অনেকগুলি টোড়ী ও অনেকগুলি কানাড়া সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি গান স্বতন্ত্র এক একটি রাগরূপ। গায়কের নিজস্ব রাগারোপের কোন অবকাশ নেই। কথা ও কবিতার সঙ্গে সুর একাত্ম হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সুরের এই হলো বৈশিষ্ট্য। দু হাজারেরও বেশী সুর তিনি রচনা করেছেন। তার মধ্যে দেড়শ সুর বাস্তবিকই অতি উৎকৃষ্ট। প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র সংগীত। রবীন্দ্রনাথের চমৎকারিত্ব হচ্ছে এই যে তিনি একাধারে কবি, গীতিকার এবং সুরস্রষ্টা।

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের গানের আত্মিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে প্রত্যেকটি সুরের কাঠামো এবং প্রত্যেকটি কবিতার কাঠামো একসঙ্গে মিশে একটি ভাবের সৃষ্টি করে। আমরা উদাহরণস্বরূপ মল্লার রাগটির কথা উল্লেখ করতে পারি। উচ্চাঙ্গসংগীতে আমরা ছয় থেকে আট রকমের মল্লার পাই। মেঘমল্লার থেকে শুরু করে সুরদাসী মল্লার পর্যন্ত। মাঝে রয়েছে গৌড়মল্লার, সুরঠমল্লার এবং দেশমল্লার। এর প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র মেজাজ; এবং এই মেজাজ হলো বর্ষার। সবসুদ্ধ আটটি মেজাজের রাগ এটি। রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই রাগের পঞ্চাশ রকম প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ভাব সৃষ্টি করেছে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করবো। বিষণ্ণতা, বৈচিত্র্যহীনতা, স্বাগত, দুঃখ, আকস্মিক আনন্দ, শান্তি এবং এমনকি আনন্দের ভাবও রয়েছে এই গানগুলিতে। প্রত্যেকটির রূপ স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটির পাঁচ-ছয় রকম বৈচিত্র্য। এক কথায় বলতে গেলে এই প্রত্যেকটি মল্লার-সংগীতের নিজস্ব কাব্যগুণ রয়েছে। এই কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য সাংগীতিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতের মল্লারে পাওয়া যায় আটটি রাগ। এবং এই আটটির প্রত্যেকটি আবার সমরূপের রাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন দেশ, সুরঠ প্রভৃতি। রবীন্দ্রসংগীতে বর্ষার কবিতাও ইমণ (যথা, ক্ষ্যাপা শ্রাবণ) কিংবা বাউল, ভাটিয়ালী কেদারা প্রভৃতি রাগে বাঁধা। এই মিশ্রণ, সংযুক্তি ও যথাযথ রাগবিন্যাস এমন

একটি ভাব সৃষ্টি করে যা স্বতন্ত্রভাবে কাব্য নয় গানও নয় কিন্তু উভয়ের একাত্ম একটি রূপ। আর এই এক হয়ে যায় বহু। ভৈরবীতে আমরা ভাবের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাই। প্রত্যেকটি গান ও সুরের বিভিন্ন রকম ভাব আমরা পাই। অবশ্য দু'হাজারেরও বেশী ভাব পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অসংখ্য ভাব রয়েছে একথা ঠিক। যাঁরা উচ্চাঙ্গসংগীতের অনুরাগী তাঁরা উচ্চাঙ্গসংগীতের অনুযায়ীই এ গুলিকে চিনতে চাইবেন। তার কোনো পরিবর্তন চাইবেন না। রবীন্দ্রনাথও তাঁদেরই একজন। কিন্তু তিনি যে সমস্ত পরিবর্তন করেছিলেন এমন কি তাঁর ভুলত্রুটিগুলিও, নতুন ভাব, নতুন রাগরূপ সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব মূলত ছিল কাব্যিক একথা আমার মতে ঠিক নয়। কথা ও সুরের সুসামঞ্জস্য আরোপেই এই ভাব সৃষ্টি হয়েছিল।

সংগীতকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যিকারের একজন বিপ্লবী। তাঁর এই বিপ্লব ভারতীয় রাগসংগীতের অন্তরঙ্গ বিবর্তনেই সাধিত হয়েছিল। অন্তরঙ্গ এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের গানে বিদেশী প্রভাব অতি সামান্যই। তাঁর গানের কারুকার্য হয়েছে নতুন মিশ্রণে, বহুবিধ স্বতন্ত্র সুর এবং ভাব সৃষ্টিতে। কিন্তু তাঁর সৃজনী প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রয়েছে দেশীয় লোকায়ত সংগীতে বাউল ও ভাটিয়ালীতে বিশেষ করে। সাংগীতিক বিপ্লবের এখানেই আসল সৌন্দর্য নিহিত। রাগরূপ ক্রমশ ক্ষয়িত হয়, তাদের চমৎকার কারুকার্য সত্বেও আবার মূলে ফিরে যায়। পরে একসময় আসে যখন প্রতিভার স্পর্শে মাটি থেকে প্রবাহিত হয় স্রোত, বন্যা, তরঙ্গ। মহাভারতে একটি সুন্দর রূপক কাহিনী রয়েছে। ভীষ্ম মরণশয্যায় শায়িত শিষ্যরা এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশে। সূর্যাস্ত না হ'লে তিনি প্রাণত্যাগ করতে পারেন না। তৃষ্ণার্ত ভীষ্ম জল চান। কিন্তু জল কোথায় পাওয়া যাবে? তারপর এলেন অর্জুন। তীরবিদ্ধ করলেন পৃথিবীকে। ভূগর্ভ থেকে জলধারা উৎসারিত হলো। জল পান করে ভীষ্ম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। জীবনের জলধারাও তেমনি উৎসারিত হবে মাটি থেকে। রবীন্দ্রনাথ লোকায়ত সংগীত থেকেই এনেছেন নবজীবন ধারা।

অনুবাদ

সংগীতস্মৃতি

বয়স যখন কাঁচা ছিল তখন অনেক সমজদারের মধ্যে সাচ্চা ঠেকেছিল দিলীপ-কুমারকে। তার 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী'তে দেখা পেয়েছিলাম উত্তর ভারতের বেশ কিছু সেরা সংগীত-শিল্পীর। তার মধ্যে কাউকে সে পছন্দ করত, কাউকে হয় তো তেমন করত না কিন্তু ভালবাসত সে সবাইকেই। আচ্ছান বাই, ফৈয়াজ খাঁ, উজীর খাঁ আর তাঁর প্রেমাস্পদা জয়পুরের সেই বৃদ্ধা, জরাজীর্ণা বাঈজী— সকলেই ছিল দিলীপের ভালবাসার পাত্র।

শেষাশেষি দিলীপ হয়ে পড়ল ভক্ত, তার ভালো লাগতে লাগল ধার্মিক মানুষ ও ধর্মসংগীত। তবু আমাদের সকলের মধ্যে তারই ছিল সব থেকে বড় সমজদার হওয়ার সম্ভাবনা। গান আর গাইয়ের প্রতি তার ছিল আশ্চর্য দরদ আর এক সময়ে তাদের গুণগ্রহণও সে করতে পারত যথার্থই। সেদিন সে গান গাইত আর ভালোবাসত। এখন তার নিঃসঙ্গ সংগীতের সাধনা।

লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দেখা পেলাম সমজদার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর। মিউজিক কলেজ শুরু হওয়ার আগে তিনি বার দুই লক্ষ্ণৌয়ে এসেছিলেন। ঠাকোর নবাব আলি খাঁকে এর আগে থেকেই চিনতেন আর মন্ত্রিপ্রবর, রায় রাজেশ্বর বালির সঙ্গে পরিচয় তখনই। এই তিনজনে মিলেই ভিত গাঁথলেন মিউজিক কলেজের। ভাতখণ্ডেজী প্রথমেই শুরু করলেন শিল্পী বাছাই। 'চীনা গেটের' কাছে তাঁর পুরোনো বাড়িতেই চলত তার মহড়া। আমিও সেখানে হাজির থাকতাম অনেক সময়ে। একবারের কথা মনে পড়ে। একজন বুড়ো গাইয়ে এসেছেন। তাঁর জানা বহু সব বিরল রাগের কথা তিনি বলে চলেছেন অবিশ্রাম। ভাতখণ্ডেজীও তারিফ করে যাচ্ছেন কিন্তু আমি তখনও টের পাইনি যে তিনি সব শুনছেন এক কানে। মাঝে মাঝে তিনি উল্টো মাথা নাড়ছেন, কথা বলছেন ও হাসছেন শান্ত ভাবে। তারপর হঠাৎ বললেন, 'ওস্তাদজী সত্যই অপূর্ব আপনার কাজ আচ্ছা, ওস্তাদজী, একটা হাম্বীর ধরুন না কেন'। 'নিশ্চয়ই' বলে ওস্তাদজী ভাঁজতে শুরু করলেন, হাম্বীর কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই গুলিয়ে ফেললেন অবরোহীতে পৌঁছে। ভাতখণ্ডেজী কিন্তু মাথা নেড়েই চল্লেন ও একটু পরেই যথারীতি বল্লেন : 'চমৎকার, চমৎকার। ঠিক হয়েছে একদম'। ভাতখণ্ডেজী ঐ সব ওস্তাদদের উপরে হাম্বীর গাওয়ার ঐ সহজ চালটি চালতেন— আরোহী কিছুতেই সেখানে শুদ্ধ মধ্যমে শুরু হবে না— নইলে কেদারার মতো হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকারের তখন তরুণ বয়স। তিনি প্রত্যহ সকালে রেওয়াজ করতেন দু' ঘণ্টা। ভাতখণ্ডেজী শান্তভাবে শুনতেন আর ঈষৎ মাথা নেড়ে সামান্য কিছু মন্তব্য করতেন। বিকেলে আমাদের ক্লাস নিতেন দু' ঘণ্টা ধরে। আমার রোল নম্বর ছিল এক, পাহাড়ী সান্যালের তিন। একবার এক নাগাড়ে পুরো দশ দিন— রবিবার শুদ্ধ— তিনি শুধু 'কল্যাণ' রাগ বিষয়ে তার সারবস্তু ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গে দশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আমার নোটবুকেই লিখতেন, কিন্তু সে খাতা আজ হারিয়ে ফেলেছি। কলেজ খোলার পর ভাতখণ্ডেজী তার চৌহদ্দীর মধ্যে পুরো ছ'মাস কাটান প্রতিষ্ঠানটিকে ঠিকমত চালু করার জন্যে। এর প্রথম অধ্যক্ষ হলেন যোশী। তিনি ছিলেন এক প্রবীণ স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর ও সংগীতবিদ্যায় বিশেষ সুপণ্ডিত। দু' তিন বছর পরে অধ্যক্ষ হন শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকর। আমাদের তখন গানের সাপ্তাহিক আসর বসত শনিবারে। সেখানে আমরা অনেক কিছুই শিখতাম কিন্তু তার সর্ব প্রধান প্রেরণার উৎস ছিল ভাতখণ্ডেজীর উপস্থিতি।

গল্প বলার ক্ষমতার দিক থেকে আমি যত লোক দেখেছি, তার মধ্যে তিনি ছিলেন অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সে দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ, তবু ভাতখণ্ডেজীর গল্প ও ঘটনা বলা খুবই মোক্ষম রকমের হতো। তিনি বলে যেতেন কি করে তিনি আসল 'চিজ'টি নিংড়ে বার করতেন ওস্তাদদের কাছ থেকে ; তাঁরাও বাগ মানবেন না, তিনি ইস্ক্রুপের প্যাঁচ কষতে থাকবেন। একবার তিনি এক মারাঠি পণ্ডিতের কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য এক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন বরোদার মহারাজাকে দিয়ে তাঁর তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে। সদাশিব রাওয়ের কাছ থেকে এক সংগীতচক্র যোগাড়ের জন্য একবার তিনি এলাহাবাদে তিন দিন অপেক্ষা করেছিলেন, আর তারপর দেখলেন সেটি কোনো কাজেরই নয়। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল গ্রন্থাদি পড়ার জন্য তিনি বাংলা শেখেন অনেক বয়সে। দক্ষিণের মস্ত সব আচার্য, উত্তরের বড় বড় ওস্তাদ সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়। পাণ্ডুলিপি ও গুণীর তল্লাসে তিনি দু' বছর ধরে সন্ধান করে ফিরেছেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। এ সবের বৃত্তান্ত তিনি বলে যেতেন অজস্র।

কখনো তিনি আমাদের শোনাতেন গোয়ালিয়রের বুড়ো বুড়ো সব ওস্তাদের কাছে তিনি যে সব গল্প শুনেছেন তার কথা। তাঁরা সবাই নাকি নাম করতেন মাধোজী সিন্ধিয়ার। একবার গান গাইছিলেন হদ্দু খাঁ। মাধোজী আস্তে আস্তে বললেন, 'ওস্তাদজী, আপনি কি আমার পিলখানা থেকে হাতি বার করে আনতে পারেন'? ওস্তাদ জানালেন, 'হাঁ হুজুর'। আর যেমন বলা, তেমন কাজ।

হদ্দু খাঁ কী একটা জানি রাগ ধরলেন— আমার এখন মনে নেই কি সে রাগ— অমনি হাতিরা পিলখানা থেকে পিলপিল করে চলে আসতে লাগল খাশদরবারে। আর তারপর শুরু হলো তাদের নৃত্য। আমরা তো গল্প শুনে হাসিতে ফেটে পড়লাম। ভাতখণ্ডেজী বললেন, "এইখানেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়। কারণ কী করে এখন হাতিদের ফেরত পাঠানো যায়? তখন হদ্দু খাঁর ভাই হস্সু খাঁ ধরলেন কেদারা। দাদা তাঁকে বাৎলা দিলেন 'ভায়া, উল্টো তান লাগাও'। ভাই তাই করলেন। হাতিরাও আবার পিলপিল করে ফিরে গেল পিলখানায়।"

ভাতখণ্ডেজী এ গল্প ইংরেজীতে বলেন নি— তিনি বলেছিলেন তাঁর মারাঠিতে। মস্ত সে গল্প, তার প্রতি সুবিচার করাও আমার অসাধ্য। এ কাহিনীর আবার পাঠান্তরও আছে নানা রকম।

তাঁর গল্প বলার ধরনটিকে কী বলা যায়? অবশ্যই তিনি মজলিশি। কিন্তু তাঁর মজলিশ তো জমে বন্ধুদের নিয়ে। অথচ তাঁর সঙ্গে গল্প চালানোর মতো বন্ধু লক্ষ্ণৌতে তেমন কেউ ছিলেন না— তাঁকে তাই গল্প করতে হতো শিষ্যদের সঙ্গে। তা হলে তাঁর সমাজদারির মাহাত্ম্য কোনখানে? আমার মতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, দেশের শ্রেষ্ঠ যা কিছু তাকেই আয়ত্ত করার মত বিপুল শক্তি— এরই মধ্যে সে-মাহাত্ম্য নিহিত। তিনি একেবারে যেন মজে গিয়েছিলেন সে রসসমুদ্রে। একদিন সকালে তিনি রাধিকা গোস্বামীকে দিয়ে সকাবেলায় বিলাওলের নানা রকমফের ও সন্ধেবেলা কৌশিকী কানাড়া গাওয়ালেন। শ্রীকৃষ্ণকে বললেন চুপিচুপি তার স্বরলিপি তুলে নিতে। মনে হল তাঁর সংগৃহীত জ্ঞান একেবারে যেন মিশে গেছে তাঁর চেতনায়। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি চুপচাপ তাঁর ঘরে বসেছিলেন— মনে হল ধ্যানস্থ। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম এখন তিনি দু' কানেই আর একেবারেই শোনেন না। আমি বোকার মত তাঁকে প্রশ্ন করলাম 'আপনি এতে অসুবিধা বোধ করেন না'? তিনি বল্লেন, 'না মুখার্জিবাবু, এতে আমি একেবারেই পীড়িত হই না। কাল মাঝরাতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল পঞ্চাশ বছর আগে শোনা এক পুরোনো রাগ। আবার সে-রাগ আমার কাছে কাল আবির্ভূত হলো তার পূর্ণ মহিমায়। অমনি ঠিক যেমনটি শুনেছিলাম আমি তাই-ই গাইতে শুরু করলাম। ওটি খুবই এক বিরল রাগ— মঙ্গল রাগ। এই বলেই তিনি ফের চুপ করে গেলেন যদিও তাঁর মননপ্রক্রিয়া চলতে থাকল পুরোদমেই।

আসলে ভাতখণ্ডেজী ছিলেন এমন এক ধরনের সমজদার— যাঁর সমজদারির পিছনে ও সামনে ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের সমজদারি কিন্তু আর এক

ধরনের, মনে ধরে রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। বারবার যেন নতুন করে তিনি স্বাদ নিতে চাইতেন, তাই তিনি পুনরাবিষ্কার করতেন ও সৃষ্টি করতেন নতুন করেই। তাঁর ক্ষেত্রে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ছিল অতিরিক্তরকমের দ্রুতগতি। আমার বোধ হতো, সেটি আর একটু ধীরগতি হলে হয়তো মননশীল সমজদারিত্বের দাবি পুরোপুরি মিটত। ভাতখণ্ডেজী তাড়াহুড়ো করতেন না। ফৈয়াজ খাঁ ও রাজা ভাইয়াকেও তিনি বলতেন 'চৌথ' শিল্পী বা 'সিকিরথ'; একমাত্র জকরুদ্দীনই তাঁর কাছে ছিলেন পূর্ণ মহারথী।

লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেবার কয়েক মাস আগে আমার পরিচয় অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে। তিনি আমাদের সকলেরই 'অতুলদা'। লক্ষ্ণৌ-এর সেরা ব্যারিস্টার, তাঁর বিপুল সম্পত্তি তিনি দু'হাতে খরচ করতেন গরীব দুঃখীর জন্যে। সারা শহর তাঁর গুণমুগ্ধ, আবার তিনিও মশ্‌গুল লক্ষ্ণৌ-এর প্রেমে। পারিবারিক জীবন তাঁর সুখের ছিল না। এক ধরনের সুগন্ধগুল্মের মতো, পিষ্ট হলেই যেন তিনি আরো বিকীরণ করতেন সৌরভ। খেয়াল, ঠুংরী, কাজরী, চৈতী, সবরকম অপরূপ লোকসংগীতের, সব সংগীতেরই তিনি ছিলেন অসম্ভব রকম অনুরাগী। আমাদের ভাষায় সব থেকে সুন্দর ক'টি গান তাঁরই রচনা। ভারি চমৎকার গলায়, আশ্চর্য সংযতভাবে তিনি সেগুলি গাইতেন। তাঁর গানকে ঘিরে থাকত এক ধরনের আশ্চর্য নৈঃশব্দ্যের মেজাজ।

অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িটি ছিল গানের কেন্দ্র। লক্ষ্ণৌ-এর শ্রেষ্ঠ গাইয়েরা জড়ো হতেন সেখানে, শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকার ও দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। হেমেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, অম্বিকা মজুমদার, শচীন দত্ত, প্রশান্ত দাশগুপ্ত সর্বদাই আসতেন তাঁর কাছে। বিখ্যাত সমজদার রাজা নবাব আলি প্রায়ই আসতেন তাঁর হার্মোনিয়াম নিয়ে। অতুলদা কীর্তনও ভালোবাসতেন। তাঁর জীবনের কয়েকটি সংগীত-সংশ্লিষ্ট ঘটনা আমি কখনো ভুলব না— আমার স্মৃতিপটে সেগুলি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কে একজন একবার তাঁকে বললেন যে একজন ভিখারিণী নাকি ভৈরবী গাইছে অপরূপ। অতুলদা তাঁকে বললেন তাকে একটি রাস্তার মোড়ে ডেকে আনতে। দূরে গাড়ি রেখে তিনি মোড়ের দিকে এগোলেন। ভিখারিণী কিন্তু তাঁকে দেখেই পালায়। অতুলদা তাকে চিনলেন; সে ছিল লক্ষ্ণৌ-এর এক বিখ্যাত বাঈজী— প্রেমে পড়ে তার সর্বস্ব সে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রেমিককে। প্রতিদানে তার কপালে জুটেছিল প্রবঞ্চনা। জানি না তার কী হলো, যন্ত্রণাই পেল হয়ত শেষ অবধি। আর একবার তিনি অম্বিকা মজুমদারের বাড়িতে গিয়েছিলেন। অম্বিকা বললেন,

'অতুলদা, কাছেই এক আশ্চর্য ঠুংরী-গাইয়ে এসেছে। যাবেন নাকি একবার। তার কিন্তু আপনাকে বসতে দেবার মত একখানা চেয়ারও নেই।' অতুলদা তখনই সেখানে গেলেন এবং তার গান শুনলেন ছু' ঘণ্টা ধরে। এমন যে কিছু ভালো গাইয়ে তা নয়, অতুলদা ঠাওরালেন যে লোকটার গানের চাল ভালোই।

ছুটি নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনেই অতুলদা (পণ্ডিত জগৎনারায়ণ সমেত) উপস্থিত ছিলেন, দিনেরাতে একবারও আদালতমুখো হন নি। এই তিন দিনে তাঁর হাজার ছু'তিন টাকা ক্ষতি হলো। আমি সত্যিই তাঁকে দেখেছি তাঁর বাড়িতে গান শোনার জন্য, যে কোনো গান শোনার জন্য, মক্কেলদের কাছ থেকে দৌড়ে পালাতে। তাঁর চাইতে বেশি গান ভালোবাসতে আমি কাউকে দেখি নি। ভালো গানের তারিফে তিনি যে সব স্বগতোক্তি করতেন তা সত্যিই শোনবার মতো ছিল। গানের সামনে তিনি যেন শিশু ছিলেন।

তাঁর কথায় অনেক দূরে ভেসে এলাম। কিন্তু অতুলদার প্রসঙ্গে 'পরে বলব' বলা কঠিন। তিনি ছিলেন এক প্রকৃত পুরোদস্তুর সংস্কৃতিবান মানুষ। রবীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও লোকেন পালিতের বন্ধুত্বভাগ্য তাঁর ছিল। সংগীত ও সাহিত্যের হরগৌরী মিলন সম্ভব হয়েছিল তাঁর মধ্যে। সর্বস্ব বিলিয়েই তাঁর ছিল পরম আনন্দ।

১৯২৪ সনে আমি আবতুল করিম খাঁকে শুনেছি তার চরম উৎকর্ষের মুহূর্তে— চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর দিনকয়েক পরে। সত্যিই আশ্চর্য সে সমাবেশ: রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শরৎচন্দ্র ও অতুলপ্রসাদ সবাই হাজির ছিলেন দিলীপের বাড়িতে, আবতুল করিমের গানের ফাঁকে ফাঁকে গান্ধীজী চাঁদা তুলতে লাগলেন। আবতুল করিমের মেয়ে হীরাবাঈও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। উপস্থিত সব মেয়েরাই উজার করে দিতে লাগলেন গান্ধীজীর ঝুলিতে। একটি আনন্দভৈরবী সমেত আবতুল করিম আরো কয়েকটি গান গাইলেন; কিন্তু গানের মেজাজ তাঁর নষ্ট হল ঐ সবের ফলে। অথচ শ্রীসত্যানন্দ যোশী আমায় বলেছিলেন যে মোট চারজন— গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও আর-একজন— পুরোপুরি মশ্‌গুল হয়ে যাবেন গানে। আমার ধারণা গান্ধীজী রাগসংগীত বা অন্য কোনো সংগীতে তেমন অনুরাগী ছিলেন না। তিনি পছন্দ করতেন শুধু ধর্মসংগীত, বিশেষত ভজন। একবার আহমেদাবাদে অম্বালাল সরাভাইয়ের বাড়িতে বিখ্যাত বাণকার মুরাদ আলি বাজাচ্ছিলেন তাঁর উপস্থিতিতে। গৃহকর্তা জানতে চাইলেন, 'কেমন লাগছে বাপুজী?' বাপু বললেন, 'আশ্চর্য, কিন্তু আমার চরখার গানের চাইতে মিষ্টি নয়।' ওটা কৌতুক, কিন্তু রসগ্রাহিতা কি? রবীন্দ্রনাথের সমজদারি ছিল সাচ্চা;

তিনি চোখ বুজে একেবারে 'মস্ত্' হয়ে যেতেন। অতুলপ্রসাদ হতেন উন্মত্ত। আর শরৎচন্দ্র? দিলীপ তাঁকে আবদুল করিমের গান শোনার অনুরোধ জানালে তিনি বলেছিলেন 'নিশ্চয়ই আসবো কিন্তু তিনি থামবেন তো?'

অতুলপ্রসাদ সেনের কথা এতাবৎ যা বলেছি তার চাইতে অনেক বেশি আমি বলতে চাই গানের ব্যাপারে তিনি একেবারে পাগল না হলেও নিশ্চয়ই পাগলাটে ছিলেন। শিল্পীর দশ গজ দূরে থেকে তিনি শুরু করতেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরম্ভ হতো তাঁর 'ওয়া, ওয়া' আরো পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরো কাছে ঘেঁষে আসতেন শিল্পীর, সঙ্গে টেনে আনতেন গুটোনো শতরঞ্জটিকে আর তারই সঙ্গে আমাকেও, যদিও বারবার আমাকে সাবধান করতেন তাঁর এই ধরনের পাগলামির বিরুদ্ধে, বলতেন আমি যেন এমন কাণ্ড কখনো না করি। অনিবার্যভাবেই আমরা দু'জন ভিড়তাম একঘাটেই। আনন্দ উপভোগের তিনি ছিলেন মস্ত সমজদার— সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের সে সমজদারি।

গোলগঞ্জের নবাবও ছিলেন ঐ ধরনেরই আর একজন, গান শুনলে তিনি একেবারে গলে পড়তেন। রাজা নবাব আলিও ঐ দলের, তবে তিনি সুর বানাতেন না, শুধু ছটফট করতেন সর্বক্ষণ। তিনিই সেই নবাব যিনি কদর পিয়ার গানে দুরস্ত ছিলেন আর তালিম দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণজীকে। এঁরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো দিক থেকে বিশিষ্ট— তবে সবাই ছিলেন সুর-পাগল পুরোদস্তুর।

১৯২৩ সন নাগাদ একবার মনে পড়ে আর্কট ও লক্ষ্ণৌয়ের নবাবজাদা হুমায়ুন গভীর রাতে তাঁর জুড়িগাড়িতে আমার ওখানে এসে আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অজানা এক জায়গায়। গাড়ি থেকে নেমে আমরা বেশ খানিকটা হেঁটেছিলাম, মনে পড়ে তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেছিলাম কিছুটা। অতঃপর হঠাৎ পৌঁছে গিয়েছিলাম আশ্চর্য সুন্দর এক পুরোনো প্রাসাদে। সেখানে জনত্রিশেক লোক— দেখে বোধ হলো নবাব আসরে বসেছিলেন, লক্ষ্ণৌ-ই কেতায় পিছন দিকে পা মুড়ে। নবাবজাদা আমার সঙ্গে পরিচয় করালেন তাঁদের। জবাবে তাঁদের নেতা আশ্চর্য যে-সব কথা বললেন তার মানে আমি কিছুই বুঝলাম না, তবে নবাবজাদা ইংরেজীতে বললেন যে তার অর্থ নাকি 'অপরিচয়ের মেঘের আড়ালে কতদিন আপনি লুকিয়ে রয়েছেন?' নবাবজাদা অবশ্য ধন্যবাদ জানালেন যথারীতি। তারপরে আমরা আসরে বসলাম, আমাদের আপ্যায়ন করা হলো যুঁইয়ের মালা ও সরবৎ দিয়ে। তারপর সংগীত। প্রায় জনা দশেক গাইলেন ওয়াজেদ আলি শার গান, উপলক্ষ্য ওয়াজেদ আলি শা'র লক্ষ্ণৌ ছাড়ার দিনটির স্মৃতি উদ্‌যাপন। যাঁরা গাইলেন তাঁদের ঠিক সংগীতবিশারদ হয়তো বলা চলে না,

তবু তাঁরা গাইয়েই। আসল ব্যাপার হলো আবহাওয়া, মেজাজ আর সেই মেজাজের থেকেই উদ্ভব তৃতীয় আর এক ধরনের সমজদারির।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গরমের ছুটিতে পরপর দু'বার আমি এলাম কলকাতায়। সেখানে পরিচয় অমিয় সান্যালের সঙ্গে। সে তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকত এক মেসবাড়িতে। তারা গান জানত কিন্তু জানত না যে অমিয় তাদের চাইতে অনেক বেশি জানে। আশ্চর্য লাগে কী করে অমিয়র পক্ষে সম্ভব হয়েছিল অমন আত্মগোপন। তবে ডাক্তারি জগতের বাইরে সে নিজেকে লুকোয়নি। অদ্ভুত তার এস্রাজের হাত ; ঠুংরী গাইত সে অপূর্ব, আবার খেওয়ালও গাইত চমৎকার। হাফেজ আলি খাঁ একবার বলেছিলেন 'পাঁচুবাবু (অমিয় ঐ নামেই পরিচিত ছিল), আমি আপনার এস্রাজের হাতটা চুরি করতে চাই।' এক টিপ নস্যি নিয়ে সে শুরু করত হয় তো একটা ঠুংরী। তার 'বাজু-বন্ধ' ফৈয়াজ খাঁ-র পরে সবার সেরা ভৈরবী। একবার শচীন সিংহের বাড়িতে বাদল খাঁর এক দারুণ দেশকার, মঈজুদ্দীনের এক আশ্চর্য আড়ানা শুরু করে তারপর সে এস্রাজ বাজাতে লাগল তার তুলনাহীন ভঙ্গিতে। কালি পাঠকও তার সঙ্গে আসতেন মাঝে মাঝে ও রবি মিত্র তো ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

অমিয় এখন কৃষ্ণনগরে হোমিওপ্যাথী করে। তার দুই বা তিন মেয়েকে সে ঠুংরী শিখিয়েছে— তারা সত্যই চমৎকার গায়। তিনটি বইও সে লিখেছে— প্রথমটি খুবই ভালো— তৃতীয়টিও ভালো, যেটি ইংরেজীতে। তবে তার দ্বিতীয় বইটি আমার তেমন ভালো লাগেনি।

সে যাই হোক অমিয় সত্যিই একজন সাচ্চা সমজদার। সে জানে, গায় ও বাজায় ; সে লেখে ও কথাও বলে চমৎকার। কৃষ্ণনগরী ঢং তার আপনার। তার সঙ্গে দেখা করতে আমি এখনও মাইলখানেক হাঁটতে রাজি। আপসোস এই যে আমাদের দেখা হয় না তেমন ঘন ঘন। মজলিশি মহলেও সে বনেদী। ক'দিন আগে সে আমায় বলেছিল যে সংগীতের আদত কথা হলো রস, রস বাদ দিয়ে কোনো কিছুই সে বরদাস্ত করতে রাজি নয়। অথচ নানা ঢংয়ের গান সে ভালোবাসে— উদার তার রুচি।

পাথুরিয়াঘাটায় ভূপেন ঘোষের কিন্তু ঝোঁক ছিল না সঞ্চয়ের দিকে। তখনকার সেরা গাইয়ে বাজিয়েদের তিনি জড়ো করতেন ও তাদের আপ্যায়ন করতেন এলাহিভাবে। সকলের শিল্পের প্রতিই তাঁর সমান আগ্রহ। সমজদার হিসেবে তিনি ছিলেন অতিশয় সজ্জন।

আবার ঠাকোর জয়দেব সিংহের কথাও বিশেষ করেই মনে পড়ে। কানপুরের

এক কলেজে তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যাপক ও সুপণ্ডিত। তারপর তিনি যান খেরি-লখিমপুরে ও সেখানে হলেন অধ্যক্ষ। সংস্কৃত পুঁথি ও দর্শন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ সত্যিই একটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু সংগীতেও তিনি হলেন একেবারে পয়লা সারির লোক। আচার্য নরেন্দ্র দেও যখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন একবার তিনি ঠুংরীর তত্ত্ব ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে আশ্চর্য এক ভাষণ দিয়েছিলেন। ভারতীয় সংগীত বিষয়ে আমি তাঁর রেডিও বক্তৃতাও শুনেছি। এখন তিনি দিল্লী রেডিও স্টেশনের পরিচালক। সত্যিই তিনি এক আশ্চর্য মানুষ, আমার মতে একজন প্রকৃত সমজদার।

বাংলা দেশে আরো কয়েকজন সমজদার দেখেছি: জিতেন রায়চৌধুরী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী— বাস্তবিকই ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা ও গৌরীপুরের সমগ্র পরিবারই। এঁরা হলেন মস্ত সংগ্রাহক। কালি পালও ছিলেন যিনি আমায় সন্ধান দেন রাগ কুসুমের। গুণীদের মধ্যে সব থেকে ভালো গল্প বলতেন করামৎ খাঁ। বাংলাদেশের নামকরা ঔপন্যাসিক, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর অনেক গল্প ব্যবহার করেছেন নিজের মতো করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজেও আমি অনেক সমজদারের সঙ্গে আলাপ করেছি। আমি আগে ভাবতাম সেখানে বুঝি বাংলা দেশের চাইতে অনেক বেশি সমজদার আছেন। এখন আর আমি অতটা নিশ্চিত নই সে-ব্যাপারে। বাংলা দেশও এগোচ্ছে নিঃশব্দে। এ কথা ঠিক নয় যে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে ঐ সমজদার জাতটাই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার বরঞ্চ মনে হয় যে তাঁদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কারণ খেলাধুলোর মতো সংগীতেও সক্রিয় যোগদানকারীদের সংখ্যা হয় তো তেমন নয়, কিন্তু দর্শক ও শ্রোতাদের সংখ্যা অনেক বেশি। অবশ্য এও ঠিক যে সক্রিয় যোগদানকারীদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। তবু এ দুইয়ের অনুপাত সম্পর্কে আমি এখনো নিশ্চিত নই। এও কি ঠিক যে গুণগত দিক থেকে সমজদারির মাত্রা নিচে নেমে গেছে? ব্যাপার হচ্ছে গুণের ক্ষেত্রে আমরা কিছুতেই নিশ্চিত কথা বলতে পারি না। অবশ্য আলগাভাবে বলতে গেলে মনে হয় যে গুণের পারা বরঞ্চ কিছুটা চড়েই গেছে। সব মিলিয়ে আমার মতে সমজদারি ও কীর্তির দিক থেকেও ভারতীয় সংগীতের এখন উঠতি অবস্থা— আর তার কারণ হচ্ছে অল ইণ্ডিয়া রেডিও। রেডিও অনেক কণ্ঠের সর্বনাশ করেছে, আধুনিক সংগীত সমেত বহু অনাসৃষ্টিও ঘটিয়েছে— তবু আমাদের সবাইকেই ঐ রেডিওই করে তুলেছে সংগীত-সচেতন। এ কথা কোনোক্রমেই আমি ভুলতে পারি না যে ১৯১০ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে খুব কম ছাত্রই গানবাজনা নিয়ে মাথা ঘামাতেন বা যাঁদের ঐ বিষয়ে অনুরাগ

প্রবল ছিল। কিন্তু গত বছর দশেকের মধ্যে তেমন ছাত্রের সংখ্যা বেড়েছে আশ্চর্য রকম। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যথেষ্টই সমালোচনার বুদ্ধি ধরেন, কারো কারো মনের গড়ন তো রীতিমত গবেষকের মতো। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রাজ্যেশ্বর মিত্র ও 'দেশ' পত্রিকার শার্ঙ্গদেবের মতো কয়েকটি নাম তো অনায়াসেই করতে পারি এ-প্রসঙ্গে। আর কম জানান দেন এমন বহু লোকের তো আমি খবরই জানি না। আমি নিশ্চিত জানি যে তাঁরা আমার চাইতে অনেক বেশি জানেন শোনেন এ-সব ব্যাপারে।

বাংলা দেশের আরো তিনজন সমজদারের আমি উল্লেখ করতে চাই— সুরেশ চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও ডি. টি. যোশী। এ'রা সবাই মজে আছেন মার্গসংগীতের রসে, তবে জানি না হয়তো ধ্রুপদে ততটা নয়। এ'রা খেয়াল সত্যই খুব ভালো রপ্ত করেছেন, জ্ঞান ঘোষ তা ছাড়াও জানেন ঠুংরী। তবলা ও হার্মোনিয়ামেও তাঁর দক্ষতা অসামান্য— শেষের যন্ত্রটি তিনি খুবই ভালো বাজান। বেশ কিছু তরুণ, সুদক্ষ তবলিয়া তাঁর শিষ্য। সুরেশবাবু ও জ্ঞানপ্রকাশ দু'জনেই আবার রবীন্দ্রসংগীতেরও রসগ্রাহী। সুরেশবাবু আজ বাংলা দেশের সব থেকে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হিন্দুস্তানী সংগীতের ক্ষেত্রে। কলকাতা রেডিওতে তিনি পরের পর কয়েকটি বিরল রাগ পরিবেশন করে যাচ্ছেন। রেডিওতে যাকে বলা হয় লঘু সংগীত, জ্ঞান ঘোষ হলেন তার প্রযোজক। আগেই বলেছি 'আধুনিক সংগীতে' আমার বিশেষ অরুচি। সেগুলি বিদেশীও নয়, দেশীও নয়। আশ্চর্য এই যে জ্ঞানপ্রকাশ এ-ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দোহাই পাড়েন রবীন্দ্রনাথের! আবার তিনিই দীপালি নাগের সঙ্গে চমৎকার দ্বৈত গানের আসর জমান মার্গ-সংগীতের। আসলে তিনি পড়েছেন এক দোটানায়।

তবে তাঁর সংগীতজ্ঞান সত্যিই গভীর। যেভাবে তিনি গাইয়ে বাজিয়েদের উৎসাহিত করেন তাও সত্যই আশ্চর্য। তাঁর সংগীতপ্রতিষ্ঠান 'ঝঙ্কারে' তিনি কলকাতায় আগত শ্রেষ্ঠ গুণীদের সমাবেশের ব্যবস্থা করেন এমন কি পাকিস্তানি ওস্তাদেরাও বাদ পড়েন না। বড়ে গোলাম আলি, আমির খাঁ, আলি আকবর, বিলায়েৎ, রবিশংকর, সলাকৎ ও নাজাকৎ সবাই এসেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে। তাঁর টেপ্‌রেকর্ড সংগ্রহও চমৎকার। তাঁর বৈঠকখানায় সাজানো নানান যন্ত্র। ওস্তাদদের তিনি ভারতের নানা জায়গায় সফরে নিয়ে যান। সত্যই তিনি ভালোবাসেন গান ও গাইয়েদের।

আর সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় হচ্ছেন লাজুক প্রকৃতির। তিনি ভালো বক্তৃতা করতে পারেন না কিন্তু কথা বলেন চমৎকার। জ্ঞানপ্রকাশের বাড়িতে একবার

আমরা মুলতানের দুই ভাই, সলাকৎ ও নাজাকতের গান শুনছিলাম। তারা হালের রেওয়াজ অনুসারে বিরল এক রাগ ধরেছিলেন। আমার মনে হল কেদারা ও পুরিয়ার মিশ্রণ। সুরেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে জানালেন 'ওটি কেদুরিয়া'। আমাদের সংগীতে এমন কিছু নেই যা তিনি জানেন না। তিনি আকণ্ঠ ডুবে আছেন সংগীতরসে। সংগীত তিনি উপভোগ করেন পুরোমাত্রায় কিন্তু সে রসগ্রহণের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই। কবে বেরোবে তাঁর বই?

ধ্রুবতারা যোশী সেতার বাজান খুবই ভালো। তাঁর তালিম এনায়েৎ খাঁর কাছে। কিন্তু তাঁর আলাপ তাঁর নিজস্ব। আবার তাঁর গলাও খুব সুন্দর। আমার ধারণা তিনি ভারতীয় সংগীতের একজন সাচ্চা সমজদার। আমি তাঁর সঙ্গে গেছি লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ ও কলকাতায় এবং সর্বত্রই আস্বাদ পেয়েছি তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার।

২.

'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'-র কলকাতা কেন্দ্রে বাঙালী গাইয়ে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাছবিচার করা খুবই দুরূহ কাজ। তাই যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে ও দুরুদুরু চিত্তেই সে-কাজে হাত দিচ্ছি। প্রথমত, তাঁরা যাকে বলে বেশ একটু পরশ্রীকাতর; বন্ধুদের প্রতি তাঁরা যতটা সদয়, ততটাই বীতরাগ অন্যদের প্রতি। ঐ মহানগর— আর বাংলা দেশ মানেই তো কলকাতা— নানা দলে ও গোষ্ঠীতে ঠাসা, তাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজ নিজ ভক্তবৃন্দ। কাজেই তাঁদের কথা যদি উল্লেখমাত্রও করি আর আমার এই লেখা তাঁদের নজরে পড়ে, তবে তো আমায় তাঁদের সবার কথাই লিখতে হবে। সেটা কিন্তু ঠিক সুবিচার হবে না আমার প্রতি। দ্বিতীয়ত, সত্যি কথা বলতে কি বেশির ভাগ সুপরিচিত শিল্পীই তৃতীয় শ্রেণীর, তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা কোনোমতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার। তাঁদের কেউ কেউ যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্থকতার ঘাটে তরী ভিড়োতে পারেন, তবে খুবই ভাল কথা। কিন্তু অধিকাংশই পারেন না, বরং গড়িয়ে পড়েন চতুর্থ শ্রেণীতে। আমি অবশ্য এই মার্কাগুলি দিচ্ছি প্রতিষ্ঠিত মাপকাঠির নিরিখেই। তৃতীয়ত, খুব সম্ভব কিছু কিছু শিল্পী গাছেরও খান, তলারও কুড়োন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের বাদ দেওয়া অথবা তাঁদের দোটানার কারণ নির্দেশ করা ছাড়া আর আমি কী করতে পারি? হয়তো আমার এই সব যুক্তিতর্কের ফলে ঢি ঢি পড়ে যাবে। তবু বলে রাখি এঁদের কাউকে কাউকে আমি ব্যক্তিগতভাবেই চিনি, তাঁদের প্রতি সত্যিই আমার গোড়ার

থেকেই কোন বিরূপতা নেই। তাই বরং ঝুঁকিই নেব, আর শিল্পীদের বলব আমার বিচারবুদ্ধিমতোই আমাকে তাঁদের মুখোমুখি হতে দিয়ে দেখুন। কাজটা অবশ্য খুবই কঠিন।

চিন্ময় লাহিড়ী, রথীন চ্যাটার্জি ও সুখেন্দু গোস্বামী— এরা আসে সবার আগে। চিন্ময়ের গলা ছিল সরু, তবু তাকেই সে নিয়ে যেত তার শেষ সীমানা অবধি। লক্ষ্ণৌ-এর অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকারের কাছ থেকে ক্লাসিকাল খেয়াল ধারাটির তালিম সে-ই যে সব চাইতে বেশি নিয়েছে, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আসলে তাকে সে আরো যেন শানিয়ে তুলেছিল। তার রাগরূপ ছিল নিখুঁত, আর হলক গমক তানগুলি ছাড়া তার অন্যান্য তানগুলিও সত্যিই ভাল। বিশেষ করেই আমার পছন্দ ছিল তার সাপট তান, তার বন্দিশও উঁচু দরের। শেখাতেও সে ভালই। তবে হালে তার ধার পড়ে গেছে, তার গলা নেমেছে, তার গুণপনাও কমতির দিকে। আর এখন সে শুরু করেছে কসরৎ দেখাতে, অপ্রচলিত রাগরাগিনী আমদানি করে। বিরল রাগরাগিনী আমারও ভাল লাগে, তবে পরীক্ষা হিসেবেই। আমি সত্যিই তৃপ্তি পাই প্রচলিত রাগরাগিনীতেই। ঐ চালু রাগরাগিনীতেই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ যা কিছু দেবার তা দেওয়া সম্ভব। আর তাতে আনন্দও পাওয়া যায় সত্যকার। পুরানোগুলি সব সময় সহজ নয় আর সহজেরও আছে সোজা ও সরাসরি আবেদনের গুণ। চিন্ময় কসরৎ দেখানো শুরু করেছে। তার মানে কি এই যে তার পড়তির সময় এসে গেছে? এখনো তার বয়স কাঁচাই। আমার কিন্তু খাঁটি ছাড়া মন ওঠে না।

বাকিরা সব তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর। এধার ওধার কিছুটা হয়তো ভুল হতে পারে আমার। দু'চারজন বাদ পড়ে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই। তবু খুব একটা ভুল হচ্ছে কি? পুরো পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমার এই টান সংগীতের প্রতি, আর তাই আমি হয়তো ভুল বলব না, যদি বলি আমার সমঝদারির মান একদা যা ছিল, তার চাইতে খুব একটা কিছু নেমে যায় নি।. আবার বলছি আমার এই মার্কাগুলি প্রতিষ্ঠিত মাপকাঠি অনুসারেই, তত্ত্বের দিক থেকে সে মাপকাঠির যে মূল্যই থাকুক না কেন। নাসিরুদ্দিন ও আলাবন্দে, ফৈয়াজ খাঁ ও আবদুল করিম, বিষ্ণু দিগম্বর, ভাজে, রাজাভাইয়া, কেশর বাঈ ও আরো কারো কারো কাছ থেকে আমি পেয়েছি কিছুটা মাত্রাজ্ঞান। তার নিচে নামতে তাঁরাই আমাকে দেন না। আর দুর্ভাগ্য এই যে এ'রা কেউই সে মাত্রা অবধি পৌছতে পারছেন না। আলি আকবর, রবিশংকর ও বিলায়েতের মত বাদ্যযন্ত্রী বাংলা দেশে আর তাই ভারতবর্ষ ও সারা দুনিয়াতেই নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর। এমন কি বেশ ভাল

বাজিয়েও অনেকে রয়েছেন— নিখিল ব্যানার্জি, রাধিকা মৈত্র, সম্ভবত শ্যাম গাঙ্গুলিও। কিন্তু সে-দরের গাইয়ে নেই। কেন নেই? বোম্বাই ও অন্য কোথাও কোথাও দ্বিতীয় শ্রেণীর গায়ক কেউ কেউ আছেন, কিন্তু বাংলা দেশে আছেন কি? অথচ আমার বিশ্বাস বাংলা দেশে গলার গুণ আরো উঁচু দরের।

নতুন দলের মধ্যে সব থেকে ভাল মালবিকা কানন (বিয়ের আগে রায়)। গত পাঁচ বছরে সে তার পিতা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবি রায়ের তত্ত্বাবধানে উন্নতি করেছে। খুবই সে নিখুঁত ও দক্ষ গাইয়ে আর তার দৌড় কতটা তাও সে জানে। গানের পুঁজি যথেষ্টই ভাল বলে তার অনুষ্ঠানে সে গানই করে, তার বেশি কিছু করতে যায় না। তার গঠন প্রক্রিয়ার ধারণা ভাল— গান থেকেই তার সূত্রপাত। অতি সতর্কভাবে রাগ ধরেই সে শুরু করে, নির্ভুল তান লাগায়, আর যেখানে তার থামা উচিত সেখানেই অর্থাৎ আধ ঘণ্টাটেক পরে থামে। তার কণ্ঠ ক্ষীণ, রেডিওতেই সে বেশি ভাল গায়। তার ব্যক্তিত্ব এখনো গড়ে ওঠে নি, যা তার স্বামী শ্রীযুক্ত কাননের রয়েছে। কাননের গলাটি চমৎকার। দক্ষিণ দেশ থেকে এলেও আশ্চর্য কী ভাবে সে উত্তরের ঢং অমন রপ্ত করেছে! এধার ওধার থেকে কিছু কিছু সে হয়তো নিয়েছে, কিন্তু আমার ধারণা বিশেষ করে ঠুংরীর বেলায় সে গ্রহণ করেছে আবদুল করিম খাঁ-কে। কানন গান গায়, মালবিকা গান করে। অবশ্য কাননকেও আমি দেখেছি ভুলচুক করতে।

তারপর যে মেয়ের কথা ওঠে, সে হল মীরা ব্যানার্জি (বিয়ের আগে চ্যাটার্জি)। ভীষ্মদেবের কাছে তার হাতেখড়ি। ভীষ্মদেব যখন পণ্ডিচেরী গেল, তখন সে তালিম নিল তার পিতা শৈলেন চাটুর্যের কাছে। চাটুর্যে তার সাধ্যমত মীরাকে শেখাল। বড়ে গোলাম তখন মাঝে মাঝেই কলকাতায় থাকতেন—মীরা কিছুটা তালিম নিল তাঁর কাছে। ভীষ্মদেব ও গোলাম আলি, এ এক অদ্ভুত মিশ্রণ, তবে আমার ধারণা সে বেশি শিখেছে শেষোক্তের কাছ থেকেই। এক দিক থেকে সে বেশ রপ্ত করে নিয়েছে গোলাম আলির কায়দাকেতা। তার উন্নতি বেশ ভালই হয়েছে। কোনো কোনো মল্লার তো তার প্রথম শ্রেণীর। নানারকমের পরীক্ষা সে চালিয়ে যাচ্ছে— তার কোনো কোনোটি বেশ উৎরিয়েও যাচ্ছে। তবে গোলাম আলির কাছ থেকে যে ঠুংরী নিয়েছে তা দুর্বল। তার 'পানি ভরেলি' আর রসুলন বাঈ-এর 'পানি ভরেলি'র মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। ভীষ্মদেবের সঙ্গে লেগে থাকলেই সে ভাল করত। গলা তার খাটো মাপের হলেও তার উচিত খেয়াল নিয়েই পড়ে থাকা। তার স্বামী প্রসূন ব্যানার্জির গলা সত্যিই চমৎকার। সে শুরু করে ভাল। তবে শেষরক্ষা করতে পারে না।

কেন পারে না? আমার প্রবল ধারণা গোলাম আলির শিক্ষা, তার শক্তি ও দুর্বলতা— দুটোর জন্যই দায়ী। তার কাজে ভাল-মন্দ দুই-ই রয়েছে, তার আস্থায়ী ভাল, তার তান ভাল নয়, যা নিয়ে সে বাড়াবাড়ি করে ও ভুল পর্দা লাগায়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা সে তার সীমায় পৌঁছে গেছে। কয়েকটা রাগ সে ভালই গায়, কিন্তু আর সে এগোবে বলে মনে হয় না।

দীপালির সম্পর্কে বেশ কিছু লিখতে পারলে আমি খুশী হতাম। তার চালটা ভাল, গলাও ভালই। তার ভয় ছিল তাল আর তানে, তবু সে তার সামাল দিত দক্ষভাবেই। কিন্তু এ সবই অতীততের কথা। এখন সে রেডিওতে গান শেখায়। মাঝে মাঝে গানও গায় এবং ভালই গায়।

বাংলা দেশে এখন সব থেকে চমৎকার গলা রথীন চ্যাটার্জি— নিটোল, মিষ্টি ও নরম। উচ্চগ্রামে তার কণ্ঠে তেমন জোয়ারী আছে মনে হয় না, কিন্তু নীচেরটাতে আছে। গিরিজাবাবুর কাজ থেকে সে বেশ কিছু শিখেছে। তবে আমি শুনেছি সে আরো বেশি পেয়েছে তার নতুন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র কাছ থেকে। তবে নেহাৎ কালেভদ্রে ছাড়া তার গানে ফৈয়াজকে মনে পড়ে না। শরাফৎ হুসেন খাঁ— তার কথা আমি পরে বলব— সব থেকে বেশি ফৈয়াজের কথা মনে করিয়ে দেয়। আতা হুসেনও ফৈয়াজ ঘরানার ভাল গায়ক, তবে তেমন চতুর নয়। দীপালি নাগ আমার বোধ হয় ফৈয়াজেরই বেশ কিছুটা নমুনা দেখায়, প্রধানত ফৈয়াজের খুড়ো আগ্রার তমদ্দুক হুসেনের তালিম মারফৎ। জলন্ধরে আর একজন ওস্তাদ ছিলেন, তার নাম আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু রথীন এখনো ফৈয়াজপন্থী নয়। সে মুখারা ধরে ঐ ঢং-এ, কিন্তু তারপরে এখনো সে হোঁচট খায় জলদ তানে, যেখানে ফৈয়াজের তুলনা নেই। রথীন কি আর বাড়বে?

আগের তুলনায় বেশ এগিয়ে চলেছে সুখেন্দু গোস্বামী। একবার আশুতোষ হলে 'দক্ষিণী'র অনুষ্ঠানে আমি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছিলাম, তাকে গানে রূপ দিয়েছিল সুখেন্দু। আমি দশটি মল্লার বেছেছিলাম সব ক'টি ধরনেরই, তবে কথা বাদ দিয়ে। শ্রোতারা ধরতে পারেন নি কোনটি কী। সুখেন্দু খুবই ভালো করে দেখিয়েছিল ওগুলি। তারপর তাকে আমি রেডিওয় শুনেছি। তার দৌড় কিছুটা সীমাবদ্ধ, তবু সে বেশ ভালো। সে ছাড়া আর বাকি সবাই দাঁড়িয়ে অথবা পিছিয়ে পড়েছে। সুখেন্দুরও অগ্রগতি খুব একটা চোখে পড়ার মতো নয়।

তবে কলকাতা রেডিওয় একটি লোক আছে, যার সম্ভাবনা রয়েছে সত্যিই ভালো কিছু করার। লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রে আমি মাঝে মাঝেই তাঁর গান শুনতাম কিন্তু

কলকাতায় তিনি খুব কমই গান। দু'বার মাত্র তাঁকে আমি সেখানে শুনেছি। শ্রীযুক্ত এন. ভট্টাচার্য খাঁটি ক্লাসিকপন্থী, গোঁড়া মানুষ আর গানও করেন বিচক্ষণ চালে। কিন্তু সে-চাল তাঁর নিজস্ব নয়; তিনি নিয়েছেন একেবারে সেরাদের কাছ থেকেই। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে তিনি একেবারে অন্যের থেকেই উদ্ভূত নন। আমার মতে তার গলাটা মোলায়েম নয়। কিন্তু আমার ধারণা তিনি এগোবেন। হিন্দুস্থানী গানের যা জানবার তিনি তা সবই জানেন। গানের দিক থেকে তিনি বেশ বিজ্ঞ। আমাকে তিনি তিন ধরনের থট দেখান। রেডিও তাঁর জন্য আরো বেশি শ্রোতার ব্যবস্থা করে না কেন?

জ্ঞান ঘোষকে বাদ দিলে কলকাতা রেডিওকে উড়িয়ে দেওয়া চলে। তিনি আসলে একজন সংস্কৃতিবান পুরুষ, কিন্তু তিনি সংগীতজ্ঞও খুব উঁচু দরের। তিনি তবলা বাজান অপূর্ব, হার্মোনিয়ামও সমান ভালো। তবে তাঁকে সংগীতের একজন patron হিসেবে জানতেই আমার ভালো লাগে। তাঁকে আমি খাতির করি খুবই বেশি। তবে একটা ভুল তিনি করছেন। রেডিওর বাংলা আধুনিক গান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাকে সমর্থন করেছেন এই অজুহাতে যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নাকি হাল্কের এই মেজাজ চালু করেছিলেন। জ্ঞানবাবু একেবারেই ভুল করছেন। হাল্কা গানের ক্ষেত্রে যা চলছে, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ আদৌ দায়ী ছিলেন না।

একটা যুক্তি দেখানো হয় যে, বাজিয়েরা যত ভালোই হন, গাইয়েরা স্বভাবতই নাকি ততই খাটো মাপের হয়ে থাকেন। কথাটা কিছু দূর অবধি ঠিক। রেনেসাঁসের সব ফুল একত্রে সমান হয়ে ফুটবেই, এমন কোনো কথা নেই। তবে এও ঠিক যে কিছু ফুল তা-ই ফোটে। আসলে রেনেসাঁসের তোড়ের ব্যাপারে আমরা অমন ঢালাও কথা বলতে পারি না। কবিতা গানকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে, এ যন্ত্রসংগীত কণ্ঠসংগীতকে। তবু সবই ঘটনার বিবরণ, তার ব্যাখ্যা নয়। ব্যাখ্যা হয় তো এই যে, মোট শক্তির ভাণ্ডার কোনো এক ক্ষণে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, আর তার অসম বণ্টন তাই ঘটে থাকে সেই সীমানার মধ্যেই। যতটা বুঝি, এ কথা একেবারে ফেলবার নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও কাব্য তাঁর ছোট গল্পের চাইতে বেশি উদ্বেল, তাঁর গান তাঁর নাটকের চেয়ে। তেমনি এও বলা যায় যে, তাঁর সংগীতের রীতি— অবশ্যই তা কণ্ঠসংগীত— বাংলা দেশের অন্য ঢং-এর গানকে এতই ছাপিয়ে গিয়েছিল যে, তাদের গৌরব-হানি কিছুটা ঘটেছিল তার তুলনায়। অর্থাৎ বাংলা দেশের ক্লাসিকাল গান মার খেয়েছিল রবীন্দ্রসংগীতের কাছে। কথাটার দৌড় যতখানি, ততটা হয়তো ঠিক, কিন্তু শক্তির মাত্রা কি

নির্দিষ্ট? রেনেসাঁসে তো শক্তির প্রসার ও বিকাশই ঘটে থাকে। সে-ক্ষেত্রে সে বিকাশ তো সব রূপের মারফতেই হওয়া উচিত— সব ফুলই তো ফোটা উচিত একযোগে।

এই দুই ভাবনার মধ্যে একটা বিরোধ রয়েছে মনে হয়। এটা ঠিক যে বাঙালী কণ্ঠের মিষ্টত্ব রবীন্দ্রসংগীতে সঞ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু এটা নয় যে সে-মিষ্টত্বের মাত্র ক্লাসিকাল সংগীত বজায় রেখেছিল বা বাড়িয়েছিল। তবু মিষ্টত্ব ও নিপুণতার বিস্তর তারতম্য সম্ভব। তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের নিজের দৃষ্টান্তই ক্লাসিকাল গান শোনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল? আংশিকভাবে কথাটা ঠিক, কিন্তু পুরোপুরি নয়। ঠিক সেই ক্ষণটিতে সংগীতের একজন সত্যকার বাঙালী বিরাট পুরুষের অভাবই সম্ভবত এ ব্যাপারের জন্য দায়ী। গোলাম আলি ও আমীর খাঁ মনে হয় বাংলা দেশের স্থায়ী বাসিন্দা নন। যন্ত্রসংগীতেও আলি আকবর, রবিশংকর, তিমিরবরণ ও নিখিল ব্যানার্জি আল্লাউদ্দীন খাঁর কাছে তালিম নিয়েছেন, সবাই বাঙালী হলেও বাংলা দেশের বাইরে, মাইহারে। এক দিক থেকে বিলায়েৎ এঁদের সবার চাইতে বেশি বাঙালী। তবু এঁদের বাঙালী ভাবতে, বাঙালীর হাতেই তাঁদের শিক্ষা এ-কথা মনে করতে আমরা ভালবাসি। আলাউদ্দীনই হচ্ছেন যন্ত্রসংগীতের প্রকৃত বাঙালী বাদশা। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাঁশি-বাজিয়ে পান্নালাল ঘোষ বোম্বাই ও পরে দিল্লীবাসী হলেও সাকরেদ ছিলেন আলাউদ্দীন খাঁরই।

৩.

একথা ঠিক রবীন্দ্রসংগীতের চাইতেও আমার আজও ক্ল্যাসিকাল গানের দিকেই টান বেশি। কিন্তু কথাটা কম-বেশির নয়, এখনকার মতো প্রশ্ন রবীন্দ্রসংগীতে ভালো লাগে কেন? সমস্ত বাঙালী মেয়ে— অনেক অবাঙালী মেয়েও তো রবীন্দ্রসংগীতের নামে পাগল। এ জনপ্রিয়তার রহস্য কি? অবশ্য সব মেয়েই আর সব পুরুষই রবীন্দ্রনাথের কবিতারও বিষম ভক্ত। এ সবই ঠিক। তলিয়ে দেখলে কিন্তু এর মানে দাঁড়ায় — ভাবনার আমেজ। এক দিক থেকে সব গানের বেলাতেই তাই। তবু রবীন্দ্রসংগীত বিশেষ ক'রেই রসোপলব্ধিসাপেক্ষ। সব আবর্জনা ইতরতা ও মামুলিয়ানার আবিলতা থেকে তা মুক্ত জ্যাজের সঙ্গে তার কোনোই মিল নেই।

এর পরেই এও বলা দরকার যে রবীন্দ্রসংগীতে ঐ ভাবনা এতো উর্বর ও বিচিত্র

যে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়। তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার চঞ্চল লীলার চাইতে বিচিত্রতার কোনও অনুভূতির নাগাল আমরা সহজে পাই না। প্রেমের সমস্ত আলো-আঁধারি বর্ষা, শরৎ, গ্রীষ্ম ও খরা, হেমন্ত, শীত ও বসন্তের আশ্চর্য অনুভূতি, দেবত্ব, সম্ভ্রমবোধ ও পবিত্রতার উপলব্ধি, বিরহ-মিলনের রস, এমন কি একান্ত মামুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ— তাঁর গানে এ সবই রয়েছে অজস্র ধারায়। পুনরাবৃত্তি কিছুটা আছে জানি, কিন্তু দু'হাজারেরও বেশি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ভাবনার আমেজ তো আর সম্ভব নয়। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের নব রসের চাইতে অনেক বেশি এর অঙ্ক। বিভিন্ন খাতে ফেলতে চাইলে আমার মনে হয় এরা বেশ কিছু দাঁড়াবে দশের মাপেও। তবে আদৌ তা করার দরকার নেই। ওরা যেমন আছে তেমনি থাকলেই ভালো। ইচ্ছে করে ঐ ভাবনাগুলিকে, অন্তত তার কয়েকটিকে, তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করার কিন্তু তার মানে দাঁড়াবে প্রবন্ধ ফাঁদা। আপাতত আমার কাজ ঐ ভাবনাগুলিকে ভাবনা হিসেবেই রূপ দেওয়া আর আমার আসল মতলব আমার গানের স্মৃতি ঝালানো।

সমস্ত গায়ক-গায়িকার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। একমাত্র তিনিই রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন ঠিক যেমনটি সে-গান গাওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাই গাইতেন— তাঁর ষাট বছর বয়স পর্যন্ত। দিনেন্দ্রনাথ কিন্তু কখনো থাকেন নি তাঁর গতিপথে। তাঁর কণ্ঠ ছিলো দরাজ, উচ্চাঙ্গ সংগীতে তাঁর পূর্ণ অধিকার, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান তিনি জানতেন আর গাইতেন তাদের সমস্ত ব্যঞ্জনাসমেত। আমার বিশ্বাস ঠুংরীর প্রতি পূর্ণ সুবিচার করতে পারেন শুধু পুরুষ শিল্পীই— রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও বোধহয় তাই। রবীন্দ্রনাথের বেলায় যাকে নারীশোভন ব'লে মনে হয় তার এক কারণ তাঁর সরু বাঁশির মতো গলা আর এক কারণ তাঁর গানেরই আশ্চর্য কমনীয়তা। দিনেন্দ্রনাথের কিন্তু গায়কী ও মেজাজ ছিলো পুরুষোচিত। অবাক লাগে তাঁর সেই ভরাট জোরালো গলায় কী ক'রে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের সমস্ত লালিত্য ও নিরুপমতা পরিস্ফুট করতে পারতেন। তাঁর সব থেকে বড়ো গুণ তাঁর সাবলীলতা। তার পিছনে ছিলো তাঁর উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা। অন্য গায়কেরা ঐখানেই আর তাঁর নাগাল পান না। তাঁদের মধ্যেও অনেকেই বেশ ভালো গান, কিন্তু দিনেন্দ্রনাথের সে গুণে তাঁরা বঞ্চিত। প্রায় তাঁদের সবাইকেই আমি শুনেছি— তাঁরা গান গলা চেপে। অবাধ কণ্ঠের স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের অনায়ত্ত। পুরুষ শিল্পীদের সম্পর্কে এটা হয়তো একটা ঢালাও মন্তব্য। কিন্তু যে ত্রুটি সর্বব্যাপী তাকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা ছাড়া উপায় নেই।

তার চাইতে বরং নারী শিল্পীদের দিকে নজর ফেরানোই ভালো। মনে মনে দুঃখ পেলেও তাঁরা বুঝবেন যে তাঁদের আঘাত দেবার জন্যই এ-সব কথা বলছি না। পুরুষদের মতো তাঁরা অতো স্পর্শকাতর নন। আগেই বলেছি আমার মতে মোটের ওপর গায়কেরা গায়িকাদের চাইতে ভালো গান। তবু তাঁরা যা, তাই ধ'রে নিলে দেখা যাবে যে গায়িকারা সত্যিই খুব ভালো গেয়ে থাকেন। অমলা দাশ ও অভি দেবীর গান অবশ্য আমি শুনিনি, কিন্তু ১৯১৯ সাল থেকে আমার আর কিছুই বাদ পড়ে নি। রেকর্ডে আর এক রাজনৈতিক সম্মেলনে অমলা দাশের গলা আবছা মনে পড়ছে। তার জোরালো চরিত্র বাদে সে-সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। ঠাকুর পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সবাই মনে করতেন অভির গলা নাকি ছিলো সব চাইতে আশ্চর্য। কিন্তু তাঁর গান আমি শুনি নি।

বিশের কোঠায় দুই গায়িকা আমায় প্রচণ্ড নাড়া দেয়। শ্রীমতী চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (এখন শ্রীমতী সিদ্ধান্ত) নাকি মণ্টেগু সাহেবের কাছে একদা পরিচিত করা হয়েছিল 'বাংলা দেশের নাইটিঙ্গেল' ব'লে। নাইটিঙ্গেলের কথা জানি না, কিন্তু তার বর্ষামঙ্গলের সব গান সেদিন শিহরিত করেছিল আমাদের সকলকেই। তার পরেও সে গেয়েছে কিন্তু ক্রমে যেন ঝিমিয়ে এসেছে তার গলা। কিন্তু উৎকর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে তার গলা ছিলো ভরাট ও আশ্চর্য স্পষ্ট। তার গায়কী ধ্রুপদী চালের, মীড় লাগাতো সে পুরোদমে। কিন্তু ধ্রুপদী ব'লেই তার তানগুলি হতো অসম্পূর্ণ অথবা অবিশুদ্ধ। অবশ্য টপ্পা ধাঁচের খাটো মাত্রার তানও ছিলো তার গানে।

চিত্রলেখার বন্ধু সাহানা দেবীর গলা ছিলো মোটা ও ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু তার গান একেবারে স্বর্গীয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী গায়িকা সে-ই। অতুলপ্রসাদের গানে আর, অবশ্যই একটা সীমানার মধ্যে, খেয়ালেও তার দখল ছিলো সমান চমৎকার। এখন সে পণ্ডিচেরীতে, তার প্রতিভা খোয়াচ্ছে ভজন গেয়ে।

সাহানার সাবলীলতা ছিলো অবিশ্বাস্য— প্রায় দিলীপের মতোই অদ্ভুত। হয়তো ঐ সাবলীলতা বাদ দিলে— সে কি দিলীপের চাইতেও বড়ো গাইয়ে ছিলো না? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, এক কালে এই নিয়ে আমরা তর্ক করতাম। সে যাই হোক, সাহানা ছিলো তার সময়ের সব থেকে অকুণ্ঠিতা গায়িকা— যে কোনও সময়ে, যে কোনও মুহূর্তে সে গাইতে পারতো গান।

আসলে খুকু, সুচিত্রা, সাহানা— এরা গান গায় সুরেলা পাখির মতো, পরিপূর্ণ

স্বাচ্ছন্দ্যে। এখানে কিন্তু আমার কাছে এক সমস্যা ওঠে। আমাদের শ্রোতাদের জন্যে ভালো-মন্দ-মামুলি সব গানের পাঁচমিশেলি এরা গেয়ে যায় অবলীলায়। এটা কি তাদের পক্ষে ঠিক হচ্ছে? তাদের কি উচিত না কয়েকটি ঢঙের গান বাছাই ক'রে গাওয়া? এমন কি, তাঁর দু'হাজারেরও বেশি গানসমেত রবীন্দ্রনাথকেও তো চিহ্নিত করা যায়, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত যদি বা না-ও করা চলে। অতুলপ্রসাদকে তো নিশ্চয়ই যায়। রাগগুলির বেলাতেও তাই। আর ভজনের ক্ষেত্রে যদি বা না সম্ভব হয়, কীর্তন অনায়াসেই শ্রেণীভুক্ত করা ও গাওয়া চলে। শ্রোতাদের তরফেও এর প্রয়োজন আছে আর তার চৌহদ্দির মধ্যেও গাইয়েরা স্বচ্ছন্দ হ'তে পারেন প্রাণ খুলে। সাহানা কি আজো তেমনি গান গায় বেপরোয়া অবলীলায়? কী গাইয়েই ছিলো সেদিন সাহানা! রবীন্দ্রনাথের নাটকের অথবা অতুলপ্রসাদের বাড়িতে কী অপরূপই না ছিলো তার গান! প্রতিমার মতো সে গান গেয়ে যেতো— বলতেই হবে একটু বেশি হয়তো অচঞ্চল— তবু সেই খোদাই করা মূর্তি থেকেই অবিরাম ব'য়ে যেতো তার গানের প্রস্রবণ।

এদের দুজনার পরে রবীন্দ্রসংগীতের আসরে আরো দুজন শিল্পী এলো একেবারে সেরা ধাতুর— অমিয়া দেবী এবং সৌম্যেন ঠাকুরের বোন রমা ঠাকুর। এরা রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ। রমা কখনো রেডিওতে গায় নি, তার রেকর্ডও নেই। অমিয়া দেবীরও বাছ-বিচার ছিলো খুবই বেশি। এরা কিছুটা লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু নিছক লালিত্যের বিচারে এদের জুড়ি ছিলো না, আর হবেও না। আমি রমার গান শুনেছি ছটি আর অমিয়ার তো মাত্র চারটি। কিন্তু সেগুলি গেঁথে রয়েছে আমার স্মৃতিতে। অবিস্মরণীয় রমার 'সুদূরের পিয়াসী'। অমিয়ার ছোটো ছোটো টপ্পার তান, তার মীড়ের কাজ, তার নিখুঁত পরিবেশন— এ সবই ছিলো উৎকর্ষের একেবারে শেষ কথা। এটা ঠিক, তা কেউই ছন্দ বা তালের কাজ তেমন দেখায় নি। এও ঠিক যে লালিত্যের জন্যে তারা হয়তো কিছুটা হারিয়েছিলো তাদের শক্তি। কিন্তু সে-সব কথা আমি বেমালুম ভুলে গেছি। শুনেছি অমিয়ার নাকি তালিম নেওয়া ছিলো উচ্চাঙ্গ সংগীতে। সেটা ধ'রে নেওয়া যায়। অমন মীড় তার ছাড়া আর কারোর হ'তেই পারতো না। কিন্তু রমার ওসব সাজ-সরঞ্জাম প্রায় ছিলো না— তার প্রতিভা ছিলো একেবারে শিক্ষা-দীক্ষাবর্জিত। তারা দুজনেই বিচরণ করতো রবীন্দ্রসংগীতের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দির মধ্যে— যদি অবশ্য তাকে 'সীমাবদ্ধ' বলা যায়।

তারপর অনেকেই এসেছে, গেছে। তাদের কেউ কেউ রয়ে গেছে আমার স্মৃতিতে। খুকু মারা গেলো অল্প বয়সে— সে-ও গাইতে পারতো অনায়াস

দক্ষতায়। রাজেশ্বরী দত্তের গলা চমৎকার আর জোরালোও। তার তালিম ছিলো ঠুংরীতে— তার সুযোগ সে নেয় পুরোপুরি। পাঞ্জাবিনী হ'লেও তার বাংলা উচ্চারণ নিখুঁত; শান্তিনিকেতনবাসের ফলে তা একেবারে শুদ্ধ। মঞ্জু গুপ্তের গলা খেলে ভালো। সে শিখেছে অতুলপ্রসাদের গান আর দিলীপ ও সাহানার গানও। তার তানগুলি বেশ জোরালো আর ঠিক যেমনটি দরকার তেমনি সে তাদের ছাড়তে পারে। কণিকা দেবীকে আমি শুনেছি শুধু রেকর্ডে ও রেডিওয়। তাই তাঁর গলার গুণাগুণ বিচারের আমি অধিকারী নই— তবে তিনি যে শুধু জনপ্রিয় নন তা আঁচ করতে পারি।

নিঃসংশয়ে এদের মধ্যে সেরা হচ্ছে সুচিত্রা মিত্র। সে বেশ গলা ছেড়ে, পুরো দমে গান গায়। এর মধ্যে কোনো গোঁজামিল নেই। গলা হয়তো তার রমা বা অমিয়ার মতো অতো মিষ্টি নয়, কিন্তু খুবই জোরালো। পুরুষের গলার যতোদূর সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছোয় তার গলা। আর তার সাবলীলতা— সে একটা দেখার এবং শোনার জিনিস বটে। আমি প্রথম তার গান শুনি ১৯৪৩ বা ১৯৪৭ সালে। তারপর দিন-দিনই সে এগোচ্ছে। আজ সে পৌঁছেচে রবীন্দ্র-সংগীতের সিদ্ধির চরম বিন্দুতে। তার ছন্দোজ্ঞানও অসামান্য। মেয়েরা সচরাচর তালে খাটো হয়, কিন্তু সুচিত্রা নিখুঁত। মনে হয় দিনেন্দ্রনাথ বুঝি ফিরে এলেন। তবু বলবো, সুচিত্রার উচিত গান বাছাই করা। এখন সে বড়োই এলোমেলো গান ছড়িয়ে বেড়ায়।

না এবারেও আমি গায়কদের নাম ধ'রে ধ'রে উল্লেখ করবো না। আমার অভিযোগ: তারা গান করে মেয়েদের মতো। দিনেন্দ্রনাথের গলা ছিলো পুরুষোচিত, রবীন্দ্রনাথের গলাও খুবই জোরালো। তবে এরা কেন গায় গলা চেপে? আর গানের সঠিকতা? সে তো উনিশ-বিশের বিচার।

দ্বিতীয় সম্ভার

ভূমিকা

'আমার কোনো লেখাই থাকবে না, তার থাকাও উচিত নয়। চিন্তার গতি নিয়েই আমার কারবার। চিন্তা নেই, আমিও নেই। চিন্তার দানা বাঁধত তো আমিও থাকতুম। স্বল্পক্ষণের জন্যই বেঁচে থাকা। স্বল্পক্ষণের জন্য যারা ভাববে, তারা আমার কথা মনে রাখবে— তার বেশি নয়। এটা বোধ হয় দম্ভ হলো।' (পৃষ্ঠা ২১৮)। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজের কথাই লিখেছেন, উদ্ধৃতিটি 'ঝিলিমিলি' থেকে। দম্ভ নয়, বিনয়ও নয়, স্পষ্টভাষণ, যা তাঁর মনে এসেছে তার অতি সচ্ছল প্রকাশ। কেউ-কেউ বলেন মনীষা, কেউ-কেউ বলেন পাণ্ডিত্য, কেউ-কেউ বলেন চিন্তাশীলতার সর্বগ্রাসী বিস্তার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভার সারাৎসার নিয়ে হাজার ধরনের আলোচনা-গবেষণা সম্ভব। সেই তর্কের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার তেমন কোনো সার্থকতা আছে ব'লে মনে হয় না। তা হ'লেও কিন্তু এটা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়, ধূর্জটিপ্রসাদের মতো বিরলপুরুষ আমাদের সমাজে জন্মগ্রহণ ক'রে মানবপ্রতিভার সংজ্ঞাকে একটি নতুন সোপানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, নিজেকে শাণিত থেকে শাণিততর করে, সংস্কৃত থেকে সংস্কৃততর করে। মানুষ তা করতে পারে কারণ তার যে শুধু মন আছে তা-ই নয়, সেই মনের সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োগের ইতিবৃত্ত আরো বড়ো সত্য। মন এবং বুদ্ধি দুটো-ই অধিকতর বিমূর্ত ব্যাপার, অথচ মনের সঙ্গে যখন বুদ্ধির ফলিত প্রয়োগ ঘটে, চিন্তা করবার প্রক্রিয়া যখন নিজেকে আলম্বিত করে, আশ্চর্য এক জাদু ঘ'টে যায়, উন্নত, উন্নততর উন্নততম পর্যায়ে মানুষ নিজেকে তুলে নিয়ে যায়। এবং এই প্রক্রিয়ার কোনো উপসংহার নেই, প্রতি মুহূর্তে আরো কোনো নতুন শৃঙ্গে নিজের সত্তাকে মানুষ উত্তীর্ণ করছে। আমার সংবেদনশীলতা আছে, সেই সঙ্গে আমার বুদ্ধি আছে, এই দুইয়ের সংশ্লেষণ সম্পন্ন ক'রে আমি যে-কোনো মহত্ত্বে পৌঁছে যেতে পারি: মানুষের সবচেয়ে বড়ো দম্ভ এখানে, মানবত্বের তাৎপর্যও এখানেই।

ধূর্জটিপ্রসাদের সমগ্র জীবন জুড়ে এই সার্থকতার ছায়া পড়েছে। একুশ-বাইশ বছর বয়সে অধ্যাপনা শুরু করেন, সত্তরের কাছাকাছি বয়সে পৌঁছে, প্রয়াত হবার মুহূর্ত পর্যন্ত, তাঁর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কোনো যতিপাত ঘটেনি। প্রায় পঞ্চাশ বছর জুড়ে একটি ইতিহাস: চিন্তার পরিধিতে ব্যাপ্ত, মনীষায় ঠাসা, পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়ত্বে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু এখানেও একটি মস্ত রকমফের আছে। হাজার-গণ্ডা

পণ্ডিত রাস্তাঘাটে খুঁজে পাওয়া যায়, যাঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের ভারে জবুথবু, তাঁদের পাণ্ডিত্য ঈষৎ একপেশে, স্বার্থপর, সংকীর্ণ। তাঁদের জ্ঞানচর্চা নিজেদের ব্যক্তিত্বের পরিখার বাইরে পৌঁছুতে পারে না। তাঁরা জ্ঞান নিয়ে অহরহ কণ্ডুয়ন করেন, জ্ঞানের কুম্ভিপাকে তাঁরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, কিন্তু কোথাও অক্ষমতা ভিড় ক'রে আসে, অস্পষ্টতার ছায়া পড়ে, তাঁদের পাণ্ডিত্য অন্যকে আলোকিত করে না, অন্যকে এমন কি ঠুনকো আনন্দ পর্যন্ত দিতে পারে না কোনো চকিত ক্ষণের জন্যও। ধূর্জটিপ্রসাদ সারা জীবন ধ'রে পড়াশুনোয় ডুবে ছিলেন, কিন্তু তিনি একপেশে ছিলেন না। জ্ঞানের কোনো বিশেষ অলিন্দ সম্পর্কে তাঁর পক্ষপাত ছিল না, সমস্ত পরিমণ্ডল অধিকার ক'রে তাঁর বৈদগ্ধ্যের বিচরণ। এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁদের পাণ্ডিত্য অপ্রকাশিত থেকে যায়। দুটো আলাদা কারণে হয়তো ব্যাপারটি ঘটে। এক, তাঁদের জ্ঞানের নির্যাস এতই বৈদেহী যে প্রকাশের ভার সইতে অক্ষম; দুই, তাঁরা স্বভাবকুঁড়ে, সেজন্য তাঁদের পাণ্ডিত্যের স্পর্শ বাইরের কাউকে তাঁরা পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতে পারেন না। ধূর্জটিপ্রসাদ অসাধারণ ব্যতিক্রম। পড়াশুনো, অবিশ্রান্ত পড়াশুনো করছেন, এক বই থেকে আর-এক বইতে অতর্কিত দ্রুত বিহার ক'রে যাচ্ছেন, কিন্তু, অশান্ত, পর মুহূর্তে, অন্য-আরেক বইতে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। একটিই তো জীবন, সুতরাং একচারিতায় তিনি আগ্রহহীন, জ্ঞানচর্চার প্রতিটি বর্গক্ষেত্র তিনি চ'ষে বেড়াতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু, স্বার্থের সঙ্গে পরার্থ, কী শিখলেন-কী জানলেন-কী বুঝলেন তা পড়শীদের সঙ্গে, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে, পাঠককুলের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবেন। ঘরময় বই, পড়ার ঘরে, বসবার ঘরে, শোবার ঘরে, মধ্যবর্তী সরু কড়িডরে, খাবার ঘরে, এখন অনেকে হয়তো প্রত্যয় করবেন না, রান্নাঘরের টঙ্গে পর্যন্ত বই। 'মনে এলো'-তে একটি কবুলতি আছে, কোন্ বই কবে কোন্ উপলক্ষে কিনেছিলেন তা আর মনে আনতে পারেন না। পারা সম্ভবও ছিল না। কারণ পঞ্চাশ বছরের বিস্তার জুড়ে তিনি, আমার সন্দেহ, অন্তত পঞ্চাশ হাজার বই কিনেছিলেন, এবং এই বিশাল গ্রন্থরাজির চরিত্রবৈচিত্র্য আমাদের ধাঁধিয়ে দেবে: দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংগীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, বিদ্যার প্রতিটি অনুষঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের অদম্য, অনবচ্ছিন্ন আগ্রহ, তাঁর বইয়ের ভাণ্ডারে সেই আগ্রহের পুঞ্জিত পরিচয়।

যে-উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছিলাম তারই প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ধূর্জটিপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের একটি বিশেষ আদল ছিল। আয়ু অনিত্য, হাতে সময় বড়ো কম, অথচ আমার বোধ, আমার বুদ্ধি, আমার সমগ্র মানসিকতা আমাকে চিন্তার সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বে পৌঁছে দিয়েছে, আমি সেই অধিকারের পূর্ণতম সদ্ব্যবহার

করবো। এবং যেহেতু আয়ু অনিত্য, আমি কোনো-একটি বিশেষ প্রকোষ্ঠে নিজেকে আবদ্ধ রাখবো না। আমি ছড়িয়ে দেবো, ছড়িয়ে পড়বো, প্রজ্ঞাপারমিতার অন্বেষণে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে আমার অভিযাত্রা। জ্ঞানের এতগুলি দিক আছে, আবিষ্কারের এতগুলি সুড়ঙ্গ, আমি আমাকে কোনো-একটি বিশেষ গবাক্ষে স্থিত থাকতে দেবো না। সে-ধরনের কোনো ঝোঁক চিন্তাশীলতার প্রতি, জ্ঞানচর্চার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল হবে। অতএব কাব্য থেকে বিজ্ঞানে, দর্শন থেকে রাষ্ট্রশাস্ত্রে, অর্থনীতি থেকে সংগীতে, চিত্রকলা থেকে ইতিহাসে বিহার ক'রে ফিরবো। আমি সাহিত্যের কথা পড়বো-বলবো, গানের কথা পড়বো-বলবো, কিন্তু পাশাপাশি আমি হাতে সামান্য সময় পাবো কি পাবো না যায় আসে না, এমন কি লঘু কোনো পরিপার্শ্বে পর্যন্ত সুড়ুৎ ক'রে চ'লে যাবো: স্বকীয় চরিত্র থেকে নিজেকে বিচ্যুত হ'তে দেবো না।

সন্নিবদ্ধ দুটি গ্রন্থেই — 'মনে এলো' এবং 'ঝিলিমিলি' ধূর্জটিপ্রসাদের এই অখণ্ড চরিত্র পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। একেবারে শেষ বয়সের ফসল এরা। শরীরে ইতিমধ্যেই কর্কট রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করেছে, কিন্তু, নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রে অবাক হ'তে হয়, তাঁর চিন্তার প্রাখর্য, বুদ্ধির দীপ্তি, ভাষার শাণানো ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্র নিষ্প্রভ হয়ে আসেনি। হয়তো অবচেতনে একটি অনুভব ছিল, সময় ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু আরো অনেক কথা, অনেক অনেক কথা তো বলবার আছে, তাই, প্রায় প্রত্যহ, কিছু-কিছু ক'রে লিখতেন, যে-চিন্তাগুলি মিছিল ক'রে মনের কোনে আশ্রয় গ্রহণ করতো, তা কোনো ঘটনাকে অবলম্বন ক'রেই হোক, কোনো নতুন-কেনা বইয়ের প্রসঙ্গেই হোক, কোনো ব্যক্তিত্ব নিয়েই হোক, একটু-একটু ক'রে লিপিবদ্ধ ক'রে যেতেন। সেই লিপিবদ্ধতার ইতিহাস এই দুই বই। প্রতিটি পংক্তি ঝলমল করছে, বাংলা ভাষার লিখিত চর্চা শেষের দিকে তাঁর ক্রমশ ক'মে আসছিল, কিন্তু বাচনে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই, পরিস্বচ্ছ, ধারালো, অস্পষ্টতাহীন: যা বলতে চাইছেন, নিখুঁত ক'রেই বলছেন, এবং প্রায়ই কৌতুকের কণা ঠিকরে বেরোচ্ছে, জ্ঞান যে এতটা নির্ভার হ'তে পারে তা জেনে পাঠককে অবাক হ'তে হয়।

গোটা মানুষটি যেন ফুটে বেরোচ্ছেন গ্রন্থদ্বয় থেকে। ধূর্জটিপ্রসাদের বড়ো গর্ব ছিল— যে-গর্বের কথা তিনি 'ঝিলিমিলি'তে উল্লেখ করেছেন — প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে 'কুঁচিয়ে ধুতি পরা থেকে' শুরু ক'রে 'সিগারেট খাওয়ার ধরন, চলন-বলন' সব-কিছু শিখেছিলেন। সবচেয়ে বেশি শিখেছিলেন লেখার কথন-ভঙ্গি। প্রমথ চৌধুরীর যে-প্রতিভা আমাদের মুগ্ধ করে, তা লেখা এবং বলার মধ্যে যে-শৈলীব্যবধান, তা সম্পূর্ণ সেতুবন্ধনের জাদু। যেন পণ্ডিত মানুষটি, রসিক

মানুষটি, বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটি আমার-আপনার মুখোমুখি ব'সে কথা কইছেন, লিখছেন না, লেখা এবং কথা দুইয়ের গড়নই একরকম, কোনো বিরোধবৈপরীত্য নেই। ধূর্জটিপ্রসাদের লেখাতেও আমরা সেই গুণটি প্রতি মুহূর্তে প্রতিবিম্বিত হ'তে দেখি। তাঁর মতো ব্যাপকপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতবর্ষে, বিগত দেড়শো-দু'শো বছরে, খুব বেশি জন্মাননি। এই প্রতিভার প্রকাশের অতি-ঋজু সাবলীলতা, তা বাংলায় হোক, ইংরেজিতে হোক, কিংবা অতি পরিচ্ছন্ন হিন্দুস্থানীতেই হোক, আমরা যারা তাঁর খুব কাছাকাছি এসেছিলাম, আমাদের অবাক ক'রে দিত। প্রত্যেকটি উদ্ভাবিত বাক্য একটি নিটোল স্ফটিকের মতো, বিভাস ঠিকরে বেরোচ্ছে: গঠনে নিখুঁত, জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, বুদ্ধিতে তুখোড়, প্রতিনিয়ত ঝিলিক দিচ্ছে যেন, ভঙ্গিতে সামান্যতম জড়তা নেই। যা বলতে চাইছেন, অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বলছেন, ভাষার জড়ত্বহীনতা প্রতিটি পংক্তিতে অব্যাহত। বিষয়ের আপাত-পারম্পর্যহীনতা থেকে মনে হ'তে পারে এলোমেলো লেখা, যা মনে এলো তাই লেখা, আলস্যভরে লেখা। হয়তো তাই, অবসর মুহূর্তে নিজেকে শিথিল ক'রে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন তিনি, সেই অধ্যায়গুলির সমষ্টি 'মনে এলো'-'ঝিলিমিলি'। কিন্তু শিথিল ব'লে তুচ্ছাতিতুচ্ছ নয়। প্রতিটি বাক্যবন্ধনের একটি নিজস্ব ধৃতি আছে। একটি বাক্য থেকে পরের বাক্যে যখন আমরা প্রবেশমান হই, কোনো বাধা পথ আটকে দাঁড়ায় না, বুদ্ধির গাঁথুনি ও নান্দনিক ভারসাম্য পরস্পরকে আশ্রয় দান করে।

এই মুখবন্ধ লেখবার উপলক্ষে যখন 'মনে এলো' ও 'ঝিলিমিলি' ফের পড়বার সুযোগ হলো আমার, যেন পঁয়তিরিশ-চল্লিশ বছর পিছনে চ'লে গেলাম। যেন লখনউতে তাঁর বাদশাবাগের বাড়িতে বৈঠকখানায় ব'সে আছি, তিনি কথা বলছেন, আমরা কথা গিলছি। অথবা যেন আমাদের সবাইকে জড়ো ক'রে নিয়ে তিনি চ'লে এসেছেন হজরতগঞ্জের কফি হাউসে; আটটা-দশটা টেবিল জড়ো ক'রে তাঁর গুণমুগ্ধরা আসীন হয়েছি, বিদ্যুৎক্ষিপ্র, আমাদের কথার পরে কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যাচ্ছেন, বুদ্ধির সঙ্গে প্রাখর্য, বিদ্যার সঙ্গে প্রকাশস্বচ্ছতা, জ্ঞানের সঙ্গে কৌতুকক্ষমতা যুক্ত হ'লে কী কুহক রচিত হ'তে পারে আমাদের তার পরিচয় পাইয়ে দিচ্ছেন, একটি অভিভূত সম্মোহনকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে। আমি আলাদা ক'রে এই দুই বইয়ে আলোচিত বিষয়-গুলি নিয়ে বিশেষ বলতে চাই না। কারণ বলা মুস্কিল হবে। এমন-কোনো বিষয় নেই যা চট্ ক'রে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না, মনোযোগী, এমনকি অমনোযোগী পাঠকও তার প্রমাণ পাবেন। ইতস্তত কয়েকটি পৃষ্ঠা নাড়াচাড়া ক'রে দেখুন,

কী নেই এখানে। একটি পরিশীলিত সমাজে যে-যে বিষয় নিয়ে আলোচনা চিন্তা হওয়া উচিত, সে-সমস্ত বিষয়ই এখানে উপস্থাপিত। শিক্ষা সমস্যা, ছাত্র সমস্যা নিয়ে লিখেছেন, ঠিক পরের মুহূর্তে এঁর-ওঁর-তাঁর স্মৃতিচারণের চুটকি গল্প, ঠিক তার পর অর্থনীতির প্রসঙ্গ, পরের মুহূর্তেই ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে মন্তব্য, অতঃপর মিস্টিসিজিম নিয়ে স্বগত উক্তি ও প্রায়-প্রবন্ধ আকারে কিছু মন্তব্য, ট্রেনের সামাজিকতা, সংগীত সম্মেলন, এনার্কিসিস্ট লিটারেচার কাকে বলে, ভবানীপুর বা এণ্টালি পাড়ার সাংস্কৃতিক চর্চা, ইতিহাস সম্মেলন, মালিক মনসুরের রাগসংগীত, সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান, রবিশংকর ও বিলায়েত, শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে আচার্য নরেন্দ্র দেবের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছ থেকে কী-কী শিক্ষা পেয়েছেন, রাধিকা গোস্বামী-গিরিজা চক্রবর্তী-ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গ, গীতাউপনিষদ, নতুন আমেরিকান কবিতা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, গতি এবং এবং অসাম্যের ধর্মীয় সম্পর্ক, বিনোদিনী-গিরিশ ঘোষ, যামিনী রায়, স্থিতধিতা এবং স্থিতিস্থাপকতা, মার্কস, এঙ্গেলস্, হিস্টরিক্যাল কন্‌জেশন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিভা, হেরোক্লাটিস, অ্যারিস্টটল, লাওৎসে, টমাস ম্যান ও জর্মান পাপবোধ, 'সকালে ইকনমিকস আর বিকেলে ও সন্ধ্যায় বৌদ্ধদর্শন'। আমি অল্প ক'রে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম মাত্র। তারপর শুনুন, অতি স্পষ্ট ভাষণে হঠাৎ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন: 'যখন সমাজতাত্ত্বিকরা ধোঁয়া ছড়ায়, তখন আমি ইকনমিস্ট— কারণ ইকনমিকস-এ যতটা বুদ্ধির শাসন ততটা এক জুরিসপ্রুডেন্স ছাড়া অন্য কোনো সমাজবিজ্ঞানে নেই। আবার যখন ইকনমিস্টরা অঙ্কের ধোঁয়া ছাড়েন, তখন তাঁদের সামাজিক রিয়ালিটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি কোনো লেবেল চাই না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। একটি জিজ্ঞাসু ছাত্র হিশেবেই জীবন কাটিয়ে এসেছি, এখনও তাই চাই। এই আমার গুরুদের শিক্ষা। আমি মানব-জীবনের ছাত্র, তাই অল্পবয়স্ক ইকনমিস্ট কেন, অল্পবয়স্ক সাহিত্যিক, চিত্রকর-গায়ক-বাদক সকলেই আমাকে সমগোত্রের ভাবে। প্রাপ্তবয়স্কদের আমি অপমান করছি না— তাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তাঁরাও ছাত্র— তবে তাঁরা প্রধানত বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ, যা আমি মোটেই নয়। এটা বিনয় নয়, সত্য ও সত্য দম্ভ। সে দম্ভের অন্যদিক হলো এই; আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, পরশু না হয় তরশু— অবশ্য তার পর নয়— প্রত্যেক যুবক-ইকনমিস্টকে আজ আমি সমাজ সম্বন্ধে যা থাপছা থাপছা বলছি, সেগুলিকেই গুছিয়ে নকশা তৈরি করতে হবে। জীবন বাদ দিয়ে পাণ্ডিত্য আমি অনেক দেখেছি ভাটপাড়ায়— আর ইকনমিক্

জার্নালের পৃষ্ঠায়। ওসব বুদ্ধির চালাকি জীবন ধরে ফ্যালে। অবশ্য আপাতত আমি ধোবিকা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাটকা। কিন্তু এই কুত্তাগুলো খুব ভালো ওয়াচডগ হয়, অন্তত গাধাকে ঘরে পৌঁছে দেয় কাপড়সমেত' (পৃষ্ঠা ১৩৬-৭)।

সাধুবাদ দেবো দে'জ পাবলিশিংকে, তাঁরা বাঙালি সমাজের মস্ত উপকার করলেন। এই মুহূর্তে আমাদের সমাজ ভয়ংকর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে: আমরা মনস্খলন থেকে ভুগছি। সমাজ যখন একটি অনিশ্চিত পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে, এমনধারা হয়। সামনের দিকে কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি না, পিছনের দিকে কী ছিল তা জানতে মস্ত সহায়ক হবে ধূর্জটিপ্রসাদের এই রচনাসংগ্রহ। আমাদের মুখোমুখি ব'সে তিনি পড়িয়েছেন, শিখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন। সে-সৌভাগ্য আমাদের ঘটেছিল তিরিশ বছর আগে অথবা চল্লিশ বছর আগে, কিংবা পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু যে-কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, যে-ভঙ্গিতে বলেছিলেন, সেগুলি নতুন ক'রে জানবার বড়ো প্রয়োজন এখন আমাদের। এই কথাগুলিই আমাদের রক্ষাকবচ; আমাদের আবার নিখাদ সংস্কৃতিতে ফিরে যেতে, বাঙলা সংস্কৃতি সারাৎসারে ফিরে যেতে গভীর সাহায্য করবে। প্রকাশকের কাছে আমার অন্তত কৃতজ্ঞতার পরিসীমা নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদের বহুধা অন্বেষা, নিজেকে উজাড় ক'রে দিচ্ছেন সর্বদিকে, কিন্তু সম্পূর্ণতার স্বার্থে, পাশাপাশি, অন্য কথাটিও বলতে হয়। সর্বত্র বিহার শেষ ক'রে, শেষ পর্যন্ত কিন্তু, তাঁর আশ্রয়-ভরসা-সম্বল মার্কসবাদের মহীরুহতলে: 'এইটা নিয়ে ঊনিশখানা বই লিখলাম। আরো দু একটা লেখা চলতো, যদি স্বাস্থ্যে কুলোত। কী লিখেছি তাই জানিনা। তবে বোধ হয় একটা মোটা ধারা আছে। তাকে personality বলা চলে— নভেলে তাই, সমাজতত্ত্বে তাই, অর্থনীতিতে তাই, ইতিহাসেও তাই, সংগীতেও তাই। এরই আশেপাশে কার্ল মার্কস্। আমার জীবনে মার্কসিজম্ এর প্রভাব বেশি।...অর্থনীতি সম্বন্ধে বেশি কিছু লিখতে পারি না, মাথা নেই, এবং মার্কসিজম্ ছাড়া অন্য অর্থনীতিতে অবিশ্বাসী। এমন কী কীনস্‌কেও গ্রহণ করতে পারলাম না।...সমাজতত্ত্বে ইতিহাসে মার্কসিজম্ চলে, তাই এখনও লিখি। আমার নভেলেও তাই আছে। নিজেকে Marxologist বলা চলে। ভারতবর্ষে সে বস্তু বিরল, তাই আমিও বিরল।' (পৃষ্ঠা ২১৭)। অন্য-আরেকটি মন্তব্য: 'রেডিওতে শুনলাম তার (মেঘনাদ সাহার) political views extreme ছিল। কোন্ ভদ্রলোকের ছেলের political views extreme না হয়ে থাকতে পারে। সব কংগ্রেসওয়ালা হবে, ভুঁড়ি বাড়বে, আর বহুমূত্রে ভুগবে, আর যা হচ্ছে তাই ভালো বলতে হবে। মেঘনাদ ল্যাবরেটরির বাইরের

মানুষও হতে পারতো— দরকার হলে। এবং দরকার আছে'। (পৃষ্ঠা ১৫৬)।

ধূর্জটিপ্রসাদের সামাজিক বিবেকবোধ সর্বশেষ উদ্ধৃতিটিতে উন্মোচিত। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতমন্যতা থেকে ভুগতেন না। হঠাৎ বললে একটু অদ্ভুত শোনায়, তাঁর মন আপ্লুত ছিল ভালোবাসায়, এবং এই ভালোবাসা তাঁর সমাজ-বিবেককে চালিত করতো, তাঁর জ্ঞানচর্চাকে সংস্কৃত করতো। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চ'লে আসি, যদিও তার প্রাসঙ্গিকতা অনুকম্পায়ী পাঠকের কাছে অবিলম্বে প্রতীয়মান হবে। বাঙলাদেশের অখ্যাত মফস্বলের ছেলে ছিলাম আমি। পুলিশের তাড়া খেয়ে নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উত্তরপ্রদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, একমাত্র উদ্দেশ্য কোনোক্রমে শেষ ডিগ্রিটা জোটানো। বহিপরীক্ষক হিশেবে ধূর্জটিপ্রসাদ আমার এম. এ. পরীক্ষার কোনো একটি খাতা দেখেছিলেন। যে-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পরীক্ষায় বসেছিলাম, সমাজবিবেকের তাড়নায় সেখানে আমার সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রে চিঠি দিলেন, খুঁজে বের করলেন আমাকে, খানিক পরে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ব্যবস্থা করে দিলেন, আরো পরে বিদেশে গবেষণার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবারও। এটা যেমন আমার ক্ষেত্রে করেছিলেন— জীবনে সুযোগ ঘটিয়ে দেওয়া—, ধ'রে নিচ্ছি আরো হাজার-হাজার ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রেও করেছিলেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভালোবাসা, মনীষার সঙ্গে মমতা, চিন্তার সংহতির সঙ্গে বাক্‌স্বচ্ছলতা— এধরনের রাজযোটক তেমন-একটা দেখা যায় না। ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে সেরকম ঘটেছিল ব'লেই সংকলনটি বর্তমান বাঙালি সমাজের পরম আদরের ধন হয়ে থাকবে।

গ্রন্থাবলীর এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ-কৃত একরাশ পুস্তক সমালোচনা থেকেও তাঁর বৈদগ্ধ্যের তথা রুচিঔদার্যের পরিচয় মেলে। বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকে, এদেশে কি বিদেশে প্রকাশিত এমন-কোনো বই চট ক'রে মনে আনা অসম্ভব যা ধূর্জটিপ্রসাদ পড়েননি, কিংবা পাঠান্তে প্রকাশ্য আলোচনা করেননি। আমি এলোমেলো একটি ফিরিস্তি দিচ্ছি : সোভিয়েত ইউনিয়ান সম্পর্কে পশ্চিমে প্রকাশিত তিনটি বই, সেই সঙ্গে 'রাশিয়ার চিঠি', বার্ট্রাণ্ড রাসেলের The Seientific Outlook, অল্ডাস হাক্‌সলীর Brave New world, দিলীপকুমার রায়ের পত্রাবলী, আনন্দকুমার স্বামীর ভারতীয় শিল্প অভিজ্ঞান, ট্রট্‌স্কীর রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, মহম্মদ ইকবালের ধর্মতত্ত্ব, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ভূমিসমস্যা, সরোকিনের Social and Cultural Dynamics, সমর সেনের কাব্যগ্রন্থ 'নানা কথা', রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু সভ্যতা, লু শী'র চৈনিক নবজাগরণ, সীডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েবের Soviet Communism : A New Civilisation। বিষ্ণু দে'র

'চোরাবালি', স্টিফান ৎজাইগের উপন্যাস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রজার ফ্রাইয়ের জীবনী, গ্রাহাম গ্রীনের The Power and the Glory, আহ্‌মাদ আলির Twilight in Delhi, রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প', গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর', রমাপতি দত্তের 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', অমিয়নাথ সান্ন্যালের 'স্মৃতির অতলে'। অপ্রতিরোধ্য ধূর্জটিপ্রসাদ, তাঁকে রোখা যাবে না, জ্ঞানের-শিল্পের প্রতিটি কন্দরে তিনি অনুপ্রবেশ করবেন, রসাস্বাদন করবেন, রসের ব্যত্যয় ঘটলে সেটা বলবেন, প্রায় গায়ে প'ড়ে উপদেশ দেবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কোনো এখনো-অখ্যাত তরুণ লেখককে উচ্ছ্বসিত পিঠ চাপড়ে দেবেন। এবং সমস্ত-কিছুই করবেন ঝকঝকে ভাষায়, সুডৌল ভঙ্গিতে, যা বলছেন তার পাশাপাশি কেমন ক'রে বলছেন তা-ও সমান গুরুত্ব নিয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত। আমি অন্তত, যখনই কোনো অবসর মুহূর্ত আসবে, ফিরে-ফিরে এই গ্রন্থাবলীতে প্রত্যাবর্তন করবো, নিজেকে হারিয়ে ফেলবো এই এক কাঁড়ি পুস্তক সমালোচনার ভিড়ে, নিজেকে সংস্কৃত করবো, আনন্দঋদ্ধ করবো, প্রসারিত করবো।

সবশেষে একটি কথা যোগ করা প্রয়োজন মনে করছি। অনেকেরই প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায়, শিক্ষক-বন্ধু-সখা-প্রিয়জন, এমনকি একমাত্র সন্তানেরও উল্লেখ আছে একবার। শুধু একজনের কথা নেই, তাঁর সহধর্মিণী, শ্রীযুক্তা ছায়া দেবী, উহ্য থেকে গেছেন। এটাই প্রকৃত বিনয়। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর মনীষা, তাঁর বৈদগ্ধ্য, তাঁর জীবনযাপন, তাঁর বাৎসল্য কোনো-কিছুই অথচ শ্রীযুক্তা ছায়া দেবীর নিঃশব্দ উপস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাবা সম্ভব নয়। এই মহিয়সী মহিলা সারা জীবন ধ'রে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন, যে-কথা উল্লেখ করতে ধূর্জটিপ্রসাদ হয় তো লজ্জা পেয়েছেন। তাঁর সংস্কৃতিতে বেধেছে, কারণ স্ত্রীর সত্তাকে নিজের সত্তা থেকে আলাদা ক'রে ভাবতে পারেননি কোনোদিন: অহমিকা ও অহমিকাহীনতা একাকাকার হয়ে গেছে এখানে। আমি অন্তত, এই মুখবন্ধের অছিলায়, ছায়ামাসির কাছে আমাদের অভিভূত কৃতজ্ঞতার কথা না ব'লে পারছি না। এই কর্তব্যচ্যুতি ঘটলে চরম কৃতঘ্ন হিশেবে আমাদের পরিচয় রটবে।

অশোক মিত্র

মনে এলো

মনে এলো

বহুদিন বাংলায় বড় বেশি কিছু লিখিনি। কখনও সখনও কলকাতায় ছুটিতে এসেছি, বন্ধুরা ধরাধরি করেছেন, যা হয় একটা লিখে দিয়েছি, তার বেশি পরিশ্রম করতে সময় পাইনি, অন্তরের তাগিদও ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে কখনই আমার কোনো রচনার পিছনে লোকে যাকে প্রেরণা বলে তা ছিল বলে মনে পড়ে না। সবই প্রায় খোঁচা খেয়ে লেখা। হয় বুদ্ধিগত, কারুর সঙ্গে মতের মিল হয়নি, না হয় ব্যক্তিগত, কেউ আঘাত করেছেন। সেই জন্য আমার রচনার ধর্ম পাল্টা জবাবের, ডায়লগের। নিজের থিসিস নেই, সব ক্ষেত্রে মতও হয়তো নেই। তবে মন আছে, এবং সে-মন বিচারে সদাই তৎপর। ব্যস, ঐটুকু, তার বেশিও নয়, আশা করি, কমও নয়। আমার যে-মন, তার জন্য দায়ী আমার পারিবারিক পরম্পরা। আমার বন্ধুরা ও বই— ভালো বই। সবে মিলে যে নক্‌সা আমার মধ্যে রয়েছে, তাকেই নিজস্ব মন বলি।

'মনে এলো' কিন্তু ঠিক ঐ ধরনের কোনো খোঁচা খেয়ে লিখিনি। বন্ধুরা কিছুদিন ধরে বলতে শুরু করেছেন, 'আপনি ancdotes লিখুন।' প্রথমে ভেবেছিলাম ইংরেজীতেই লিখবো, নামও ঠিক করলুম— Anecdotage। কিন্তু ভেবে দেখলাম মনে এখনও যখন বুড়ো হইনি তখন আদ্যিকালের গল্প শোনাবার সময় হয়নি। পরে দেখা যাবে ; আপাতত 'মনে এলো'ই লিখি। পুরানো কথাই মনে পড়ে, এখনকার ও ভবিষ্যতের কথা মনে আসে।

বলা বাহুল্য, এটা ঠিক ডায়েরি নয়। সন তারিখ কেবল ক্যালেণ্ডারের গোপন কথা এতে নেই, কারণ যে বয়সে কোনো কোনো গোপন কথা ডায়েরিতে না লিখলে দম বন্ধ হয়ে যায়, সে বয়স আমি পার হয়ে এসেছি। মনোভাবটাও ঠিক রোমান্টিক নয়, আবার দার্শনিকও নয়। অন্য দিকে মানসিক রিপোর্টাজও লিখতে বসিনি। সারাদিন খেটেখুটে একলা খাবার টেবিলের ধারে বসে নিজের সঙ্গে যা কথোপকথন করেছি এ খানিকটা তাই। অতএব এক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা, কিংবা অসংলগ্নতার কথাই ওঠে না। এই বয়সে, এই পরিস্থিতিতে আমি যা, তাই হওয়াই শোভন ও সঙ্গত। আমি

কোমর বেঁধে সাহিত্যসৃষ্টি করতে বসিনি। আমার মনের নক্‌সা যদি মামুলি না হয়, তবে 'মনে এলো'র আঙ্গিকও মামুলি হবে না।

আমার বন্ধু সাগরময় ঘোষ ও আমার ভাই বিমলাপ্রসাদের উৎসাহে 'মনে এলো' দেশে বেরিয়েছিল। অতএব পাপের অংশীদার তাঁরা। কিন্তু যদি পাপ না হয় তবে পাঠক যেন তাঁদেরই ধন্যবাদ দেন। আমার ভালো-বাসা তো রয়েইছে। প্রকাশকরা বইখানি ছাপিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিলেন কিনা তাঁরাই জানেন। আমি এইটুকু জানি যে, এই ধরনের লেখা আমি আরো কিছুদিন লিখে যাবো।

বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে চিঠি লিখে উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধূর্জটিপ্রসাদ

অসহ্য গরম, অসম্ভব গুমোট! অসভ্য শহর আলিগড়। এখানে বিশ্ব-বিদ্যালয় খাড়া করবার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না। আগে না হয় পাকিস্তানের রঙরুট তৈরি হতো এখানে, কিন্তু এখন? এমন একটি বই-এর দোকান নেই যেখানে যাওয়া যায়, বই ঘাঁটা যায়, বিদেশ থেকে বই আনাবার অর্ডার দেওয়া যায়। কফি পাওয়া যায় না, সিগারেট নয়। দেয়াশলাই যা পাওয়া যায়, তা জ্বলে না। এত বড় নোংরা শহর ভারতবর্ষে নেই। শহরের মধ্যে খোলা নালা; সেখানে ময়লা পচছে বছরের পর বছর, কেউ আপত্তি করে না। বহু পুরাতন শহর। গুপ্ত যুগের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে; পাঠান, মুঘল, রাজপুত, মারহাট্টা, ফরাসী সকলেই এসেছে আর গিয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত একাডেমিক স্বাধীনতা আছে। পজিটিভ কিছু নয়, তবে কাজে কোনো বাধা নেই। দেরি হয় খুব অবশ্য। ঢিলে জায়গা। চিন্তার কোনো ঐতিহ্য নেই। গড়ে তুলতে হবে— এবং গড়া যাবে, আমার বিশ্বাস। ছেলেদের মনে যেন একটু রং ধরেছে। ছাত্ররা ও নতুন লেক্‌চারারের দল গ্রীষ্মের ছুটিতে লু ও আঁধির মধ্যেও খুব পরিশ্রম করলে। এরা দেশকে জানতো না, এখন দেশ আছে বুঝছে। অর্থনীতিতে বাস্তবতার ঝোঁক এনে দিতে পারলে আমি কৃতার্থ হবো। সকলেই খুব ভদ্র। যৌবনসুলভ তেজ যেন একটু কম। ভালোই। ছাত্রসমাজের ব্যাপার দেখে ভয় হয়। তাদের ভবিষ্যৎ দেখে ততটা নয়, যতটা আমাদের বোঝবার অক্ষমতা ও নিঃস্পৃহতা দেখে। কী ভণ্ডুলটাই না হলো এলাহাবাদ আর লক্ষ্ণৌ-এ! এখনও হচ্ছে।

সাতটি মেয়ে এম. এ ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। বুরখা পরে এলে ক্লাশে ঢুকতে দেবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। হেসে বুরখা খুলে ফেললে। নিজেরা কেউ চায় না পরতে, বাড়ির গিন্নীরাই চান। যারা বুরখা পরে না তাদের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কর্মিষ্ঠা। একটি মেয়েকে লেকচারার নিযুক্ত করলাম। পর্দা চলে যাচ্ছে। আশা করি সংযম টুটবে

না। ভারতীয় মেয়েদের শরমের মধ্যে যে গাম্ভীর্য ও শালীনতা আছে, তার তুলনা কুত্রাপি নেই। এখনও— তবে যেন কমছে সন্দেহ হলো কলকাতার হালচাল দেখে।

ড. বিধান রায়ের খাস কামরায় গিয়েছিলাম সেদিন। বাংলা দেশের অর্থনীতিবিদরা তার প্ল্যান সম্বন্ধে গোটা কয়েক প্রশ্ন করেছিলেন। ড. রায় উত্তর দিলেন। আমি ছিলাম সুশীল দে'র অতিথি। উত্তরই শুনলাম; আলোচনার গন্ধ পর্যন্ত পেলাম না। অত্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ড. রায়ের উত্তরের পর দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল : (১) প্রশান্তবাবুর প্ল্যান-ফ্রেম ডিডাক্‌টিভ্, আর বিধানবাবুর ইণ্ডাক্‌টিভ্। (২) বিধানবাবুর প্ল্যান ডিমোক্রেটিক, আর প্রশান্তবাবুর টোট্যালিটারিয়ন। সোজা ব্যাপার! কলকাতায় আজকাল কোথায় নতুন বই পাওয়া যায় জানি না, নচেৎ ইচ্ছে হচ্ছিলো কয়েকজনকে Weldon-এর 'Vocabulary of Politics' কিনে উপহার দিই। বইটা ছোট ও সস্তা— পেলিক্যান। টোট্যালিটারিয়ন, ডিমোক্রেটিক ইত্যাদি অর্থনীতির ভাষা নয়, পলিটিকসের এবং বস্তা পচা পলিটিকসের এবং সামাজিক ব্যাপারের শাস্ত্রে মিল সাহেব বহু পূর্বে দেখিয়েছেন যে, ডিডাক্‌টিভ্ ইণ্ডাক্‌টিভ্ প্রভৃতি সংজ্ঞা অচল। বাংলা দেশে ড. রায়ের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত। মাথা তার বৈজ্ঞানিকের, প্রতিপত্তি বৃদ্ধের ও অভিজ্ঞতার এবং তথ্যের উপর তাঁর অদ্ভুত দখল। উপস্থিত অধ্যাপক গোষ্ঠী প্রায় নীরবই থাকলেন। এক এক সময় মনে হচ্ছিলো, আমরা ছোট বলেই অন্যে অতটা বড় হয়। আমার ধারণা হচ্ছে যে, আমরা প্ল্যানিং জিনিসটা বুঝতে পারিনি এখনও এবং প্ল্যান-ফ্রেম যে ফ্রেম এটুকু বোঝবার উদারতাও আমাদের নেই। এই না-বোঝার মধ্যে অনেকখানি পরশ্রী-কাতরতা ও বাংলা দেশের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অভিমান মিশে আছে।

অবশ্য প্রশান্তবাবু the gentle art of making enemies (and not always so gentle)-এর আর্টিস্ট। কিন্তু তিনি যে একটা বিরাট কাজ করেছেন, সেটুকু মানতে কৃপণ হওয়া নীচতা। সংখ্যা-বিজ্ঞান নামে বস্তুটির সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া, দশ পনেরো বছরের মধ্যে একটা বিরাট অনুষ্ঠান খাড়া করা— যার তুলনার জন্য ভিন্ন দেশে যেতে হয়— এ-সব না হয় ছেড়ে দিলাম ইতিহাসের হাতে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন যা পারেনি,

ইকনমিস্টরা যা করেননি, সেই কাজ একজন অর্থনীতিতে অনভিজ্ঞ লোক করেছেন তাইতে বাহাদুরি দেবো, না হিংসে করবো! সভায় ডিমর‍্যা-লাইজেশুন-এরই লক্ষণ যেন বেশি পেলাম। সুশীল দে বললেন, 'এত আশাই বা করেছিলেন কেন?' উত্তর দিলাম, 'শচীন চৌধুরী যে বলেছিল!'

লিওনতিয়েফ-এর বই দু'খানি* আবার নাড়াচাড়া করলাম। দেরাদুনে দু'মাস ধরে চেষ্টা করলাম বুঝতে। এখনও পারছি না। একটা আবছায়া ভেসে উঠছে। 'কম্‌পারেটিভ স্ট্যাটিক অ্যাপ্রোচ'-এর কি এই শেষ কথা? উচ্চাঙ্গের গণিতশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে 'ডাইন্যামিক' বিশ্লেষণ কি অসম্ভব? টেক্‌নিক্যাল কো-এফিশিয়েন্টগুলি আমাদের দেশের সব শ্রম-শিল্পে কি পাওয়া যাবে? ব্যাপারটা প্রধানত ইঞ্জিনীয়ারিং-এর। অর্থনীতির সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হলো। কুটির-শিল্পের 'ইনপুট-আউটপুট' বিশ্লেষণ কীভাবে হবে? মাঝারি আয়তনের শ্রম-শিল্পগুলির? যন্ত্রপাতিগুলোও তো আদ্যিকালের। টেক্‌নিক্যাল কো-এফিশিয়েন্ট বা গুণক বার করতে টেক্‌নিক্যাল সমধর্মিত্ব ধরে নিতে হয় না কি? পরিশ্রমকে না হয় সম-হারে পরিণত করা গেল,— যথা খুব সুদক্ষ মজদুরি অদীক্ষিত পরিশ্রমের তিনগুণ, চারগুণ। কিন্তু যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে কী বলা যায় যে, আধুনিকতম মেশিনটি হাতুড়ির চেয়ে দশগুণ কী বিশগুণ কর্মঠ? ওদের জাতই আলাদা, কাজই আলাদা। এই ধরনের মূল্য পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনে আমার মন সায় দেয় না। অথচ উপায় নেই। আপেক্ষিক মূল্যের ব্যাপারেও একটা গলদ রয়েছে সন্দেহ হয়। রাশিয়ার প্ল্যানিং-এ 'ইন্‌পুট-আউটপুট' বিশ্লেষণের ব্যবহার হয় না, যতদূর জানি। তবু সেখানে আজকাল ভুলের অবকাশ খুবই অল্প শুনেছি। এতদিনের আন্দাজে ওরা মোটামুটি একটা কার্যকরী খসড়া দাঁড় করায়। কিন্তু অত ভয়ংকর পরীক্ষা কি আমরা বরদাস্ত করতে পারবো? ওদের চাপ ছিল বাইরের ও ভেতরের এক সঙ্গে— আমাদের প্রধানত ভেতরের। তাই বোধ হয় রাশিয়ান প্ল্যানিং-এর ভুল-দোষগুলি কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে। সহজে নয় অবশ্য। খুবই দেরি লাগবে। ততদিনে নৌকো বানচাল না হয়!

*** The Structure of American Economy : L and other—Studies in the Structure of American Economy.**

এই ধরনের অর্থনীতিক বিশ্লেষণের বিপক্ষে উপায় ও সঙ্গতির নির্দেশকরণ সংক্রান্ত তর্ক অবাস্তব। নির্দেশকরণের জন্যই বিশ্লেষণ। কিন্তু এতে বণ্টনের থিওরি নেই। এতে মজুরি, সুদ ও মুনাফা হচ্ছে 'অ্যাজ গিভ্‌ন'। অথচ 'গিভ্‌ন' বললেই তো উড়িয়ে দেওয়া চলে না! মানুষের মনুষ্যত্ব প্রভৃতি কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু মানুষের আয়-ব্যয় তো আছে! আয়কে কর্মের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? টাকা, আয়-ব্যয় এদের প্রয়োজন হয়তো প্রাথমিক নয়, কিন্তু প্রাথমিক নয় বলেই কি তারা উবে যাবে? আমার ধারণা, কীন্‌সের বিশ্লেষণের সঙ্গে লিওনতিয়েফের বিশ্লেষণের পার্থক্য স্তরের ও আঙ্গিকের পার্থক্য, মৌলিক নয়। ভেবে দেখতে হবে। ভারী মজার ব্যাপার— সমস্যা ছিল এতদিন কীন্‌স ও মার্কসের সম্পর্কে। লিওনতিয়েফের প্রবেশে সমস্যাটি পণ্ডিতদের কাছে তে'কোণা হয়ে উঠলো। সমাধান হবে কর্মক্ষেত্রে— অধ্যাপকের কৃপায় নয়। সেই আদিম পার্স থিওরি ও প্র্যাকটিস-এর ঝগড়া। এর নিষ্পত্তি চার্লস করতে করতে পারেননি, মার্কসিজমের মধ্যেও নেই। ডায়েলেক্‌টিক-এর সাহায্যেও নিষ্পত্তি হয় না, একটা মনগড়া ব্যাখ্যা হয়।

আন্তর্জাতিক সমাজ-বিজ্ঞান বুলেটিন-এর চতুর্থ খণ্ড (১৯৫২) চতুর্থ সংখ্যাটিতে গণিত ও সমাজ সংক্রান্ত বিদ্যার সম্বন্ধে অনেকগুলি গভীর প্রবন্ধ দেরাদুনে বসে পড়লাম। একজন লিখছেন:

> One might ask why mathematics, representing as it does, a powerful aid to theoretical reasoning, is not used all the time. The difficulty lies in the fact that one must know exactly and specifically what one is talking about and what one is saying before it can be stated in terms amenable to mathematical techniques. In other words, before mathematics can be used as an aid to theoretical thinking, the theory in question must be very specific and unambiguous.

এই দুটো শর্ত, নির্দিষ্টতা আর সুনিশ্চয়তা যদি কোনো থিওরিতে পূরণ হয়, তবেই সেখানে গণিতের ব্যবহার চলবে এবং অন্যদিকে গণিতের ব্যবহার যদি অচল হয়, তবে বুঝতে হবে থিওরিটি নিতান্ত ভাসা ভাসা, ধোঁয়াটে। সমাজতত্ত্বের থিওরি ঘোলা; অর্থনীতিক থিওরি অপেক্ষাকৃত

পরিষ্কার। প্ল্যানিং মাত্র আর্থিক নয়, অন্তত ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা খুবই সামাজিক ব্যাপার ও ঘোলাটে। এই বিষয়গত পার্থক্যই কি অর্থনীতির থিওরি ও সামাজিক ব্যবহার, দু-এর মধ্যে অসামঞ্জস্যের হেতু? আমাদের সমস্যাগুলোই দ্ব্যর্থবাচক, অপরিষ্কার ও অনির্দিষ্ট— তা না হয়েই যায় না। অতএব থিওরি ও ব্যবহারের বিবাদ আরো কিছুদিন চলবে— যতদিন পর্যন্ত যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে সমস্যার ছাঁচ সহজে তৈরি না হয়, মানুষ সংখ্যায় পরিণত না হয়। প্রশ্ন উঠছে— সেটা কি সুদিন? এর উত্তর জানি না। অনুভব করি, নয়। অথচ ইতিহাসের গতি কি করে অমান্য করি! ঐ দিকেই ভারতবর্ষ চলেছে! বোধ হয় কাপুরুষতা।

বুদ্ধিজীবীর কাজ কি ইতিহাসের গতির ওপর ব্রেক কষা? বাঞ্ছিত পথে চালাবার শক্তি যখন নেই, তখন আর কী সম্ভব? মোটর যে চালায়, সেই ব্রেক কষে। বুদ্ধিজীবীরা না চালিয়ে ব্রেক কষতে চান। তাই বেচারিদের এমন দুর্দশা।

যে প্রবন্ধটি আমেরিকান পত্রিকার জন্য পাঠিয়েছি, তার মধ্যে একাধিক জায়-গায় ফাঁকি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনটেলেকচুয়ালদের আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম। বিদেশীর কাছে নিজেদের কেচ্ছা গাইতে লজ্জা হলো। লজ্জা এলো দেখে আরো লজ্জিত হলাম। মনোমোহন ঘোষ রবিবাবুকে বলে-ছিলেন, 'living apologetically'— আমাদের সকলের অবস্থাই তাই। সবাই লজ্জিত হয়ে, পরের কৃপায় বেঁচে আছি। অন্য দেশে সমাজে ও সরকারের কাছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের স্থান আছে। এখানে অল্প কয়েক-দিন হলো বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিজ্ঞদের কিছু খাতির হচ্ছে সরকারের কাছে। অনেকেই দিল্লী ছুটেছেন। কিন্তু আমি জানি ভেতরের কথা। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কীর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে আমরা প্রত্যেকে অড ম্যান আউট— শিকাগো বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় 'মার্জিনাল' জীব। ধোবিকা কুত্তা,— না ঘরকা, না ঘাট্‌কা। ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা মধ্যবিত্তের একটি অংশ,— ইংরেজী-শিক্ষিত, ইংরেজী-চিন্তায় লালিতপালিত, দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং স্বাধীন চিন্তায় অক্ষম। এই আমার তেত্রিশ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। পুরানো ব্রাহ্মণশ্রেণী গত, নতুন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হবার পূর্বেই পলিটিশিয়ানের প্রাদুর্ভাব। যুবকদের আদর্শ টাইপ

পণ্ডিত নয়, উচ্চ কর্মচারী, হয় সরকারের না হয় বড় ব্যবসার। অনেকখানি আমাদের নিজেদেরই দোষ। খুবই আফসোস হয়, কারণ তেজ ছিল বিদ্যাসাগরের, বিবেকানন্দের। রবীন্দ্রনাথের, রামেন্দ্রসুন্দরের, অশ্বিনী-কুমারের, সতীশবাবুর, আরো অনেকের তেজ তো স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁরা বলতে পারতেন, 'এ হয় না'। আর এখনও একাধিক বিখ্যাত পণ্ডিত, বাঙালী পণ্ডিত, বাংলার বাইরে রয়েছেন। তাঁদের পক্ষে সবই সম্ভব। কথাটা ব্যক্তিগত মোটেই নয়। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পয়সা কোথাও থাকে না— এক রাশিয়ায় ছাড়া। অতএব কেবল আত্মসম্মানবোধটাই তাঁদের পুঁজি। আমার পুরানো অর্ধপণ্ডিত পণ্ডিতমশাই-এর এঁদের চেয়ে বেশি চরিত্র ছিল। বিধবা বিবাহের সমর্থনের জন্য তাঁকে পঁচিশ টাকার লোভ দেখানো হয়। তিনি প্রস্রাব করতে উদ্যত হন। ভাষাটা অ-সংস্কৃতই ছিল। তখন তাঁর মাসিক বেতন ৩০/৩৫ টাকা মাত্র, যতদূর মনে পড়ে এবং তাঁর স্ত্রী তখন বাতে ভুগছেন। সে যুগের অন্যান্য বহু দোষ ছিল, কিন্তু গ্রামের মাস্টারদেরও তেজ ছিল, তাই সম্মানও ছিল। আমার বিশ্বাস, এখন এখানে বুদ্ধিজীবীদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। প্ল্যানিং কমিশন যদি দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনার পৃথক বন্দোবস্ত করেন, তবে বোধ হয় কিছুটা হতে পারে। ঠিক এখনকার সরকারী বুদ্ধিজীবীরা মাত্র কেরানি, 'ব্যাক-রুম বয়েজ'!

অর্থনীতির দিক থেকে ব্যাপারটা কেবল 'ফুল এমপ্লয়মেণ্ট'-এর নয়; সমাজে কাজ পাবার অধিকারের। অর্থাৎ, জন্মালেই কাজ জুটবে এবং নিজের রুচি অনুযায়ী কাজ এবং যে কাজের বেতন জীবনযাত্রার পক্ষে মাত্র যথেষ্ট নয়, অবসরের জন্যও যথেষ্ট। এবং অন্য বেতনের কিংবা রোজগারের তুলনায় এমন কম নয়, যাতে শ্রেণীবোধ ফুটে উঠতে পারে। দেশ তো এগুচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে শুনছি। দেখি মাস্টারমশাইদের হাল কী হয়! আপাতত গ্রামের মাস্টারমশাই সরকারী পিওনদের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে কম পান। পিওনগিরিও দরকারি কাজ এদেশে— কারণ 'অফ্‌সার' সাহেবরা ফাইল বইতে পারেন না, তাঁদের গৃহিণীরা তরকারি কিনতে বাজারে যেতে পারেন না, ইত্যাদি। আমাদের সরকারী কাজটাও তো 'লেবার ইণ্টেন্সিভ'! দেশে অসংখ্য লোক; এবং ম্যালথস্ সাহেব দুর্দশা কমাবার জন্য লোক-লস্কর রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের শিক্ষা বিস্তার, চিন্তা বিস্তার— এগুলিও কম প্রয়োজনীয় নয়। একে একে সবই হবে, আগে হোক আন্তর্জাতিক স্টেটাস, পরে দেখা যাবে ইণ্টেলেক্-

চুয়্যাল স্টেটাস! এই ধরনের যুক্তি ও আচরণের দোষ কাল-প্রত্যয়ে। ইতিহাসের সময় রেখামতো চলে না। ঘটনাগুলো গোছার মতন ঘটে। Innovations occur in clusters—

আমাদের ইতিহাসে ইনোভেশ্যন-এর 'রোল'টা কি?

যদি আমাদের ধারণা এই হয় যে, সব সমস্যাই মূলত সামাজিক অর্থাৎ সমাজ না বদলালে কিছুই হবে না, তখন নতুন ইন্টেলেকচুয়ালদের নজর পড়বে কোন্ পরিস্থিতিতে কী ধরনের ব্যবহার উপযোগী হবে তারই ওপর। ভাবের ওপর নয়, চিন্তার ওপর নয়, প্রকাশশৈলীর ওপরও নয়।

বই কিনতে অনেক সময় ঠকতে হয়। কতবার বেশি দাম দিয়ে নতুন বই কিনলাম, বছর না ঘুরতেই সস্তা সংস্করণ পাওয়া গেল। আমার এই অভ্যাসের মধ্যে অধীরতা ছাড়া আধুনিকতার মোহ, দম্ভ প্রভৃতি চারিত্রিক দোষ রয়েছে। বুদ্ধির চর্চার দিক থেকে দোষটা গুরুতর। বাইরে আঘাত না পেলে মন সজাগ থাকে না; এবং অভ্যাসের ফলে এমন হয়েছে যে, মনকে সজাগ রাখার জন্য অনবরত আঘাত আনা চাই, তাই বই কিনে আনি। এ এক প্রকারের masoschism মাত্র। একেই পেশাদারী রোগ বলে। দাওয়াই আছে, ক্লাসিক্স পড়া। পড়িও প্রায়, আজকাল তাই বেশি ভালো লাগে। তবু লোভ এবং কর্ম ও জীবিকার চাপ। বিদেশী জার্নালের শেষ সংখ্যা না পড়লেই বাতিল হয়ে যাবার ভয়! অবশ্য আমাদের শাস্ত্রে বই লেখার পূর্বে নতুন বক্তব্য প্রবন্ধাকারে বেরোয়। সেগুলি না পড়লে চলে না। যে-বিষয়ে প্রধান আগ্রহ মাত্র সেই বিষয়-সংক্রান্ত নিবন্ধ পড়লেই খানিকটা রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সংখ্যারও শেষ নেই। সারাংশগুলোতেই বা কতটুকু দরকারি খবর মেলে! আজকালকার চিন্তা-ধারা পুরানো সীমান্ত অতিক্রম করেই অনেক সময় চলে। অবশ্য আমার আগ্রহও একাগ্র নয়। যাঁরা আমার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা আমাকে গোটা মানুষ হতে শিক্ষা দেন। অধীত বিদ্যা মনুষ্যত্বের উপাদান হোক—এই তাঁরা বলতেন! তাঁদের উপদেশ সফল হয়নি। একদম বরবাদ হয়েছে, বলবো না। কারণ, ছাত্রেরা তো ভালোবাসছে, আর গান শুনে, কবিতা পড়ে, ছবি দেখে মন তো এখনও চাঙ্গা হয়।

ড. ও মিসেস ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর সম্পাদিত— **'The Intellectual Adventure of Ancient Man'**-এর প্রথম সংস্করণ পড়ি, বোধ হয় পাঁচ-ছ' বছর আগে। গত বছর আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাকে চলে আসবার সময় আরেকটি কপি উপহার দিলে। ইতিমধ্যে পেলিক্যানের সংস্করণ বেরোলো। দু' তিন কপি কিনে ছাত্রদের উপহার দিলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো, ঐ ধরনের বই আমাদের প্রাক্ বৈদিক, বৈদিক যুগ সম্বন্ধে যেন লেখা হয়। জিমার ও ক্যাম্বেল-এর বইগুলো খানিকটা ঐ ধরনের। ভারতবাসীর লেখা বই-এর সন্ধানে আছি।

যদি কেউ প্রাচীন ভারতের মনোজগতের অ্যাড্‌ভেঞ্চার সম্পর্কে গবেষণা করতে চান, তা' হলে ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রভৃতির বই পড়তেই হবে। কিন্তু গোটা কয়েক বিষয়ে প্রথম থেকেই সাবধান না হলে ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবে। হরাপ্পা, মহেঞ্জোদারোর মানসিক সভ্যতা সম্বন্ধে মালমশলা কম, যদিও ধারাবাহিকতা হয়তো খুঁজলে পাওয়া যায় না যে তা নয়।

(১) প্রথম সতর্কতা: কেবল মিথ্‌স্ ও পৌরাণিক কাহিনী নিলেই চলবে না। মাত্র সেগুলি নিলে কেবল মাইথোপিইইক মনোবৃত্তিই ও তারই ক্রিয়া চোখে পড়বে। এবং সেই সঙ্গে সহজেই প্রমাণিত হবে যে, বৈদিক যুগের ভারতীয় চিন্তাধারা গ্রীক চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ব্যাবিলন-ঈজিপ্টের সমগোত্র। অবশ্য এতে একপ্রকার আত্মতৃপ্তি আসবে— কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। মাইথোপিইইক প্রতিপাদ্যের গলদ সেই লেভি-ব্রুলের গলদ, 'প্রি-লজিক্যাল' বা প্রাক্-যুক্তিনিষ্ঠ আর 'লজিক্যাল' বা যুক্তিনিষ্ঠ মনের ঐতিহাসিক বিভাগ। কেবল তাই নয়, এও দেখছি, আদিম ব্যবহারের একই ব্যাপারে 'লজিক্যাল' 'নন্-লজিক্যাল' মিশে আছে। ('নন্-' আর 'প্রি-' এক বস্তু নয়।) যৌক্তিক কেমন করে অযৌক্তিকের পরে বুঝি না, যদি না বিশ্বাস করি যে, গ্রীক মনই সত্যকারের সভ্য মন ; যদি না অবরোহ প্রণালীর জ্যামিতিক পদ্ধতিকে মনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ভাবি, যদি না মানসিক চিন্তাধারা সেই গ্রীকদের মতো একই লাইনে চলছে, স্বীকার করি। যুক্তির দিক থেকেও ইতিহাসের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম— তা কি সম্ভব? এই ধরনের বিপদ থেকে প্রথমেই বাঁচতে হবে। অর্থাৎ বেদের ভাব-সংস্কারগুলোকেও বুঝতে হবে মিথ্‌স্ এবং কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে। ঐ দুটোর সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রভৃতির বইতে রিচ্যুয়াল বা ক্রিয়ার বিশ্লেষণ নেই।

(২) দ্বিতীয় সতর্কতা: মাত্র মিথ্‌ ও কাহিনীর বিচার করলে আমরা

বৈদিক ঋষিদের কাব্যশক্তিরই সন্ধান পাবো। অগ্নিদেবতার সঙ্গে সম্পর্ক কাব্যিক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না সত্তাসূচক অ্যানিমিজম্? সংজ্ঞা-জ্ঞাপক কল্পনা ক্যাসিরার-এর ভাষায় খাঁটি মৌলিক রূপকের দৃষ্টান্ত।

(৩) তৃতীয় সতর্কতা: মাইথোপিয়াতে আরোপ হয় সকলেই জানে। সেই আরোপের প্রকৃতি-বিচারের সময় যেন চরিত্রের সঙ্গে সত্তার, তুলনার সঙ্গে সমতার প্রতিপাদন, দ্বৈত সমতার সঙ্গে সজ্ঞানে একরূপ করার চেষ্টা গুলিয়ে না যায়।

(৪) চতুর্থ সতর্কতা: সমীকরণে স্থান বা ক্রম-বিপর্যয়, অনুকল্প স্থাপন আর মৌলিক রূপক ভিন্ন বস্তু।

(৫) শেষ সতর্কতা: বৈদিক যুগের কল্পনাকাহিনী থেকে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা সিদ্ধান্ত করার মধ্যে 'প্রশ্নভিক্ষা' আছে। যুক্তিটা এই প্রকার: সামাজিক অবস্থা ও ধারণা থেকেই কল্পনার জগৎ উঠেছে। অতএব কল্পনার জগৎ থেকেই বাস্তব সামাজিক জগতের পুরো ছবি পাওয়া যাবে। বাস্তব ও কাল্পনিক জগতের প্রকৃত সম্বন্ধ কিন্তু এই যুক্তিতে ধরা পড়লো না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মার্কসীয় সমাজ-দর্শনের বিপদ এইখানে। ম্যানহাইম, স্কেলার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সামলাতে গিয়েছেন, পারেননি। মনোবিজ্ঞানেও এ-বিষয়ে নতুন খবর পাইনি এখনও। Journal of the History of Ideas— জুন ১৯৫৫ সংখ্যাতে ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর পূর্বোক্ত সমালোচনা রয়েছে।

এই পত্রিকারই এপ্রিল সংখ্যায় Pieter Geyl আর এক হাত নিয়েছেন টয়েনবির ওপর। জুন সংখ্যায় টয়েনবি উত্তর দিয়েছেন। ইউট্রেক্ট-এ গেলাম তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে, সাহেবকে পেলাম না। টয়েনবি হলেন তাঁর কাছে ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড়। আমারও টয়েনবিকে ভালো লাগে না, তবে অতখানি নয়। ওদেশে অধ্যাপকরা সাফ্ সাফ্ কথা বলতে ভয় পান না। এখানে সামান্য কিছু বলেছো কী মরেছো, চিরশত্রু হয়ে গেলে। পাতলা চামড়া! একে স্পর্শকাতরতা বলা চলে না। মূলধনের অভাব। মার্গট অ্যাস্কুইথের ভাষায়— I shall forget but I shall never forgive; ভুলবো কিন্তু মাফ্ করবো না।

জেনেভাতে, 'সামিট টক্‌স' চলছে। এভারেস্ট-কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ের পর শিখরের উপমা চালু হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো উত্তেজনাই আসছে না। জার্মানীকে অ-বৈধ করাই ভালো। কিন্তু NATO-তে তা সম্ভব নয়। য়ুরোপের সমস্যাকে প্রধান করার মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় কী ঘটছে তাকে অগ্রাহ্য করার ইঙ্গিত পাই। আফ্রিকার জাগরণ আগামী পঞ্চাশ বছরেব সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হবে। অন্ধকার মহাদেশের কৃষ্ণকুটিল আক্রোশ ভয়াবহ জিনিস। পন্থা কি ঐ টেক্‌নলজি, না আর কিছু? গোল্ড কোস্ট-এ আমাদের মতন ভদ্রলোক শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। উত্তর আফ্রিকার ইসলাম সামাজিক প্রগতিকে সাহায্য করছে বলে মনে হয় না। কলকব্জারই জয় হবে শেষে, যা বুঝছি। ওখানে বাধা দেবার মতো কিছুই নেই। জাতীয়তা-বাদ আর শ্রমশিল্পবাদ হরিহর।

সুধীন্দ্র দত্তের 'প্রতিধ্বনি' ব্রোমাইড নয়। ঘুম যখন এলোই না, তবে কেনই বা জাগ্রত অবস্থার সদ্ব্যবহার না করি! ভূমিকার মন্তব্য সম্বন্ধে দুই মত থাকতে পারে; কিন্তু এই বইখানির বেলায় নিতান্ত সত্য। তিনটে শেক্সপীয়রের সনেট সুধীনের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। সুধীন নতুন কবিতাই লিখেছেন। পরে অনুবাদের অপূর্ব দক্ষতা বুঝলাম। পরে, একসঙ্গে নয়। এইক্ষণে তার মননের অতুলনীয় সততাটাই আমাকে মুগ্ধ করছে। অনুবাদের জন্য এই কবিতাগুলোই বাছলে কেন সে? অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার ভালো লেগেছিল জানি। তবু নির্বাচনের মধ্যে তার মনের প্রস্তুতি ও ইতিহাস পাওয়া যায় কিনা, ভাবছি। অধিকাংশ কবিতায়— সবগুলিতে নয় নিশ্চয়— একটা হতাশার ছাপ রয়েছে সন্দেহ হয়। আবার পড়তে হবে।

সুধীন্দ্রের কবিতায় কী জীবন সম্পর্কে ট্র্যাজিক ধারণা, না মাত্র ব্যর্থতা-বোধ? অবশ্য সে বলবে, তাতে কিছুই আসে যায় না। এইখানে আমার সঙ্গে তার গরমিল হচ্ছে।

মালার্মের কবিতাটি ভীষণ শক্ত। দু'-একটি ইংরেজী অনুবাদ পড়েছি। বুঝিনি। এবারও বুঝলাম না, সুধীন্দ্রনাথের ভাষ্যের সাহায্যেও। ওদের

প্রতীকগুলো আমাদের নয়, তবে পশ্চিমী সভ্যতা যাঁদের মজ্জায় পৌঁছেছে তাদের পক্ষে হয়তো সেগুলি অভ্যস্ত। তবু যেন আঁতে ঘা দেয় না। মালার্মের কবিতা আমার পক্ষে একপ্রকার বুদ্ধির কুস্তি। সিম্বলিক কবিতা ভাবার্থ অতিক্রম করতে যায়, সুরের সাহায্যে। ফরাসী ভাষা জানি না, অতএব ফরাসী শব্দের অনুরণন কানে ধরা পড়ে না। বিদেশী সুর ও হার্মনিও ধরতে পারি না সব সময়। অতএব আমার পক্ষে বিদেশী প্রতীকী কবিতা মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করা মুশকিল। তবু অদ্ভুত একটা কিছু মালার্মে লিখেছেন, আন্দাজ করতে পারি।

সুধীন্দ্রনাথের সনেটের হাত অতুলনীয়। ঘন অথচ সুস্পষ্ট। তার একটা শব্দ, একটা বাক্যও বদলানো যায় না। (সে নিজে অবশ্য বদলায়।) এক এক সময় মনে হয় যে, সে গদ্যের প্যারাগ্রাফকেও সনেটের রূপ দিতে চাইছে। তার গদ্য ও পদ্য একই মনের একই ধর্ম মেনে চলে। সকলের বেলায় কি তাই? খুব সম্ভব তাই হবে। আরো কিছু, যাচাই করতে হবে।

কেদারার মধ্যম— ক'বার যথার্থ মধ্যম শুনেছি? তিনবারের বেশি মনে পড়ছে না। মম্মন খাঁ'র বড় সারেঙ্গীতে— ১৯২৩ (?) সালে; আলাবন্দে-নসীরুদ্দিনের মিলিত কণ্ঠে ১৯২৪ সালে; এবং জোহরাবাঈ-এর রেকর্ডে। বড় গোলাম আলির কেদারা রেকর্ডে শুনলাম। চমৎকার, কিন্তু সে-মধ্যম পেলাম না। গোলাম আলির স্বরবর্ণের প্রয়োগ আমার কানে অমধুর। পাঞ্জাবী ঘরানার ঐ এক প্রধান দোষ। হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ, আ এবং ও-তে যাবার পথে 'য়্যা' হয়ে যায়। য়্যার জন্য তান শ্রুতিকটু ঠেকে। অবশ্য ওস্তাদের কণ্ঠ এতই মধুর, তাঁর গায়নপদ্ধতি এতই সুললিত যে দোষটুকু কানে স্থান পায় না। গোলাম আলির গান সামনে বসে, মন দিয়ে, বহুবার শুনতে হবে আমাকে। যা শুনেছি তাতে মনে হয়, কপালে রাজ-তিলক নেই। তবু, অপূর্ব কণ্ঠ।

শুমপীটার-এর 'History of Economic Analysis' গত বছরে পড়েছি। আবার পড়ছি। ভীষণ মোটা, অত্যন্ত দামী— তিন মাস লেগেছিল পড়তে। গ্রীষ্মের ছুটির পর নানা রিভিউ পড়লাম। আমার মনে যে দানা

বেঁধেছে, তা নিয়ে মালা গাঁথা যায় না। তবু বলা চলে :

(১) সম্পাদনার কৃতিত্ব অতুলনীয়। ভদ্রলোকের স্ত্রীভাগ্য ভালো। এই উপায়েই কি এপিক তৈরি হতো ?

(২) সবচেয়ে ভালো লাগলো তৃতীয় খণ্ড (১৭৯০—১৮৭০)— ক্ল্যাসিকাল পিরিয়ড এবং চতুর্থ খণ্ড (১৮৭০—১৯১৪)— ইকনমিক্স যে যুগে স্বাধীন হলো।

(৩) প্রতি যুগের ইকনমিক্সের ইন্টেলেকচুয়াল কন্টেক্সট-এর বিবরণ অপূর্ব। স্টার্ক-এর দু'খানি বইতে খানিকটা পেয়েছিলাম, কিন্তু এমন বিশদভাবে নয়। শুমপীটার উপদেশ দিতেন সকলকে ইকনমিক্সের বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকতে, আর নিজে উল্টো কাজ করলেন। এইটাই তাঁর মাহাত্ম্য। অর্থনৈতিক ও মানসিক ইতিহাস বাদ দিয়ে ইকনমিক ধারণা বা চিন্তাগুলি বোঝা যায় না। কেবল তাই নয় তার বিশ্লেষণ পদ্ধতিও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

(৪) জেভেন্স ওয়ল্‌রা, প্যারেটো, বম-বোয়র্ক সম্বন্ধে আলোচনা চমৎকার ; একটু ভক্তিরস বেশি বটে, তবু··· !

Ten Great Economists-তে— এই আভাস ছিল।

সন্দেহ উঠলো গোটাকয়েক বিষয়ে। (১) কে এই মোটা বই অত দাম দিয়ে কিনে পড়বে ? গোটাকয়েক অধ্যায়ের জন্য তাঁরই আগেকার **Economic Doctorines and Method** (ইংরেজী অনুবাদ) বেশি উপকারী। এ যেন একটা বিরাট জঙ্গল। (২) প্লেটো, আডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর প্রতি অবিচার হয়েছে আমার বিশ্বাস। (৩) শেষাংশ অসম্পূর্ণ, খাপছাড়া। তিনি নিজে সংশোধন করতে পারেননি। (৪) আমি প্রত্যাশা করেছিলাম, 'টুল্‌স্ অফ্ অ্যানালিসিস' এ ক্রমবিকাশ দেখতে পাবো। তৃতীয় খণ্ডের মার্জিনাল অ্যানালিসিস ছেড়ে দিলে, চতুর্থ খণ্ডের ইকুইলিব্রিয়ম বর্ণনাতেই যেন সব কিছু ভরা রয়েছে। শুমপীটার চাইতেন ইকনমিক্স পদার্থবিদ্যার মতন শুষ্ক ও সাধারণ বিজ্ঞানে পরিণত হোক। তাই তাঁর মতে ওয়ল্‌রা হলেন সবচেয়ে বড় অর্থনীতিজ্ঞ। ঐ হিসেবে সত্য, কিন্তু অন্য হিসেবও আছে নিশ্চয়। এতদিন কি পৃথিবীর অর্থনীতি ওয়ল্‌রার জন্য অপেক্ষা করেছিল ? সেই প্রকৃতি-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের পার্থক্যের কথা আবার ওঠে। আমার মতে, যতদূর পারা যায় ততদূর পর্যন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানের যুক্তিপদ্ধতি চলুক ; তারপর যাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে, তাদের গ্রহণ করতেই হবে কর্মক্ষেত্রে। তবে জীবন স্বল্প, আর্ট দীর্ঘ, আর

বিজ্ঞানগুলোও জটিল। মানুষ কোথায়? মানুষ ধরলে অনিশ্চিত, vague অথচ বাস্তব; মানুষ বাদ দিলে নিশ্চিত, বিশুদ্ধ অথচ অবাস্তব। অবশ্য একটা না একটা ক্ষণে নির্বাচন করতেই হবে। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে এই বইখানির সার্থকতা মানসিক ইতিহাস-প্রস্তুতির দিক থেকে, অবশ্য যদি তারা পড়ে কিংবা পড়তে পায়। আমার কাছে বইখানি মহামূল্যবান। ঘুরে ফিরে এখানে আসতেই হবে আমাকে। আসবো নিশ্চয়, কিন্তু শুমপীটার যাকে 'হিস্ট্রি' বলেন, অর্থাৎ **the steady march towards the divine event of Walrasian analysis,** তার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস না নিয়ে। শুমপীটার ছিলেন মস্ত ইকনমিস্ট, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, সর্বপ্রকার বিদ্যায় বিশারদ। কিন্তু তাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণায় আমি সায় দিই না।

মানুষ এতদিনে দুটো বিদ্যা অর্জন করেছে— গণিত আর ইতিহাস: এবং সেই দুটোর সমন্বয়ের প্রয়াসের নাম 'ফিলজফি'। আমাদের দর্শন কিংবা মিস্টিসিজম্ ঐ দুটোর অতিরিক্ত, কেননা তার কালপ্রত্যয় নেই। দোষ কারো নয় গো শ্যামা···। এই কি পূর্ব-পশ্চিমের তফাত? জানি না। কুমারস্বামী বলেছেন, সেদিন পর্যন্ত একটা সাধারণ গুঢ়তত্ত্বের ঐতিহ্যে মিল ছিল। মিলের চেয়ে গরমিলই চোখে পড়ে আজকাল। গ্রীক-রোমান-জুডাইক ভাব-পরম্পরার ওপর যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাব, আর আমাদের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান পরম্পরার ওপর ঐ নতুন সভ্যতার প্রভাব— দু-এর মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। পার্থক্যে ভয় কিসের? ইম্পিরিয়ালিজম্ তো যেতে বসেছে। আপাতত 'কো-এক্সিস্‌টেন্স' তো হোক, পরে দেখা যাবে। ভারতবর্ষের কাজ অপক্ষপাত সমালোচনামূলক, নিউট্রাল নয়। ভারতবর্ষ হচ্ছে একপেশে মনের **gadfly.**

কী আশ্চর্য! পড়ছি অর্থশাস্ত্র, আর ভাবছি মানুষের কথা! ইকনমিস্ট হওয়া ধাতে বসলো না। ওধারে হাইড্রোজেন বোমা, আর হাতে শুমপীটার কিংবা ইকনমিক জার্নাল! ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক-মশায়ের কী চমৎকার মূল্যজ্ঞান! কত হাস্যকর মূঢ়তা!

অসহ্য গরম ও গুমোট। পূর্বাংশে বন্যা, আর পশ্চিমাংশে অনাবৃষ্টি। এদেশে মার্কসিস্ট ব্যাখ্যা অচল। এখানে ভৌগোলিক ব্যাখ্যাই উপযুক্ত। মনের উপর আবহাওয়ার এতটা প্রভাব, প্রভাব নয় প্রতাপ, জানতাম না।

এটাওয়া প্রোজেক্টের মায়ার সাহেব একবার বলেছিলেন, 'এদেশে কোনো কিছুই সম্ভব হবে না, যতদিন পর্যন্ত না প্রতি গ্রামে ঠাণ্ডা-ঘরের বন্দোবস্ত হয়; গান্ধী-চবুতরায় চলবে না। মানুষের রস-কষ শুকিয়ে যায় তাপের চোটে।'

আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পড়ি। ক্যাসিরারের 'ফিলজফি অফ সিম্বলিক ফর্মস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড— মিথিকাল থিংকিং আরম্ভ করেছি। মিথ ও ধর্মের কালপ্রত্যয় নিউটনীয় নয়— তার মধ্যে পরম্পরা নেই, অর্থাৎ সিকোয়েন্স-এর বিপরীত। একত্রে সব ঘটেছে এবং 'স্পেস'-এর সঙ্গে একত্রে। আইনস্টাইনের মন এই হিসেবে মিথিক্যাল, প্রায় আদিম। পারম্পর্য নেই, অথচ গভীরতা ও মাত্রা আছে। হিন্দু দার্শনিকদের কাছে কাল চক্রবৎ, অথবা ক্ষণিক ইত্যাদি। ধর্মবিশ্বাসের বেলায় পারম্পরিক, যথা ব্রহ্মার মুহূর্তে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। কালের শ্রেষ্ঠ 'সিম্বল' মহাকাল। সেইজন্য পশ্চিমী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এদেশে ইতিহাসের প্রাণবস্তু নয়। যুগান্তর, যুগাবতার, যুগধর্ম হলো আমাদের সমাজের ম্যাক্রো-ডাইনামিক্স— আর মাইক্রো হলো অতিকথা, উপাখ্যান, রূপকথা— যেগুলি প্রতি মানুষের ব্যবহারকে আদর্শ নমুনার ছকে টেনে আনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের ইতিহাসের মালমশলা ভিন্ন। আমি বলি, আমাদের ইতিহাসের কাল-প্রত্যয়ই ভিন্ন। অন্তত এতদিন তাই ছিল। বোধ হয় গ্রামের ইতিহাসে এখনও খানিকটা তাই পাওয়া যায়। সেখানেও বদলাচ্ছে যন্ত্র ও শহরের আশীর্বাদে। পরিবর্তন সহজ হচ্ছে না। সর্বত্র তাই বাধ-বাধ ঠেকছে।

নতুন বাঙালি কবি যখন ইতিহাসের পর্যায় সম্বন্ধে কবিতা লেখেন তখন ঠিক রসসিদ্ধ হতে পারেন না কি এই আন্তরিক বিরোধের জন্য? মিথিক্যাল, ধর্মের যুগ হলো মাইথোপিইক,— কবিতার পক্ষে উপযোগী, আমাদেরও অভ্যাস-সুলভ। নতুন যুগ হলো নিউটনীয়, অনুক্রমিক, স্বতন্ত্র। অতএব কবিতার পক্ষে ততটা উপযোগী নয়, বিশেষত আমাদের মনে ধরে যে-কবিতা সে-কবিতার পক্ষে ততটা নয়। অবশ্য পরিবর্তনের পরে সবই অভ্যাস হয়ে যাবে। এখনও হয়নি, যোগাড় চলছে।

অর্থনীতিক পরিকল্পনার কাল-প্রত্যয় ক্ষণিক-বাদ নয়। তার অ্যাপ্রোচ যেকালে সমষ্টি-বাচক, তখন তার ইউনিট হবে প্রোডাকসন ফেজিং ও তার গতির হার নির্ধারিত হবে যন্ত্রপাতি ও মানুষের কার্য-সম্পাদিকা শক্তি এবং জিনিসপত্রের অবারিত গতি ও কাজে লাগানো— এই দুটির সমন্বয়ের ওপর।

সমন্বয়কে বলা যেতে পারে ব্যবস্থাপনের আকার বা দিক। কিন্তু তার অন্তরের প্রত্যয় এক বিশেষ অনুক্রম ও পারম্পর্য। অর্থাৎ ভিন্ন কাজের গ্রুপ-এর ভিন্ন সময়; এবং সেই গ্রুপ-টাইমিং অনুসারে অংশ বিশেষকে চলতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অথরিটির কাল ঐ ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ-টাইমিং-এর সামঞ্জস্যে। তারও বাইরে আর একটি কাল আছে— সেটি জাতীয় প্রয়োজনের। অর্থনীতিবিদরা একে রাষ্ট্রিক কারণ বা প্রয়োজন বলে অবহেলা করেন। জাতীয় প্রয়োজনের সময়কে আবার আন্তর্জাতিক অবস্থা (এখানে ব্যালেন্স অফ পেমেণ্টস্ ইত্যাদির কথা ওঠে) ও জগতের ঐতিহাসিক গতির কাল-প্রত্যয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে মাত্র নতুন ব্লক তৈরি হবে। ব্লক-এর মানে হচ্ছে ইতিহাস থেকে কোনো কারণে ভ্রষ্ট হওয়া। প্ল্যানিং-এর মধ্যে অনেকগুলি কাল-প্রত্যয় লুকিয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস সেগুলিকে বাইরে টেনে আনে; চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাদের যোগাযোগ ঘটান— অন্তত চেষ্টা করেন। আমাদের ইতিহাসে পণ্ডিত নেহরু শেষ দুটি কাল-প্রত্যয়ে সিদ্ধ। প্ল্যান-ফ্রেমে প্রথম দুটির সন্ধান পেয়েছি।

প্ল্যানিং-এর সাইকলজি গেস্‌টল্‌ট সাইকলজি। কালেরও একটা গেস্‌টল্‌ট আছে। ক্ষেত্র, উদ্দেশ্য, জীবনের মাত্রা, প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য, সন্ধান ইত্যাদি প্রত্যয়ের সাহায্যে সোশ্যাল টাইম-এর প্রকৃতি ও কাজ বোঝা সহজ। কর্ট লিউইন, প্যাভ্‌লভের দৌড় অতদূর নয়। তাঁদের রাস্তাই আলাদা। ফিল্ড সাইকলজি এসেছে পদার্থ-বিজ্ঞানের ফিল্ড থিওরি থেকে। তাই তার ঘাড়ে অঙ্ক ও পরীক্ষার ভূত। একবার দুঃসাহসী হয়ে ফিল্ড সাইকলজির মোটা মোটা সিদ্ধান্তগুলি সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাটাতে যাই। দু-তিনটি বক্তৃতার পর বিদ্যাবুদ্ধির শেষ। ছাত্রদের সাফ্ বলে দিলাম, ওর বেশি জানি না। পরে চেষ্টা চলছে দেখলাম। একবার ছুটি পেলে বেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে।

নতুন চিন্তা ও ধারণা নিয়ে বক্‌বক্ না করলে আমার আবার মাথা খোলে না। এখানকার ছাত্ররা ও-ধরনে তৈরি হয়নি; শিক্ষকরাও বোধ হয় না। নিজের সঙ্গেই কথা কইতে হয়। তাই লিখতে শুরু করেছি। ডায়রি নয়, যা মনে আসছে সব তাই নয়, নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নয়, অথচ খানিকটা

তো তা বটেই। যা মনে আসছে, সেগুলি অনুপস্থিত, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, আগ্রহশীল বন্ধুর পক্ষে সঙ্গে নীরব কথাবার্তা। মার্টিন বুবার বলেন, সব কিছুই Thou and I-এর কথোপকথন, সংলাপ। Thou আমার ক্ষেত্রে ডিমন নয়, জীবন-দেবতা নয়, জীনিয়স্‌ নয়— ভূত নয়, প্রেত নয়, ভগবান নয়; এমন একটি পুরুষ সে— স্ত্রীলোক নয়— যার আগ্রহ আমার আগ্রহের সমগোত্র; হয়তো পুরুষটি আমার বিশেষ বন্ধুদের একটা আলকেমিক মিশ্রণ। তাদের সঙ্গে মনে মনে কথাবার্তা কইছি; লিখছি, কারণ সেই মিশ্রিত Thou-এর কোনো উপাদান সামনে নেই। এক বই ছাড়া— অর্থাৎ লেখক ছাড়া এবং তাঁরাও নীরব। ক্যাসিরারের সঙ্গে কফি খেলে বেশ লাগতো। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। কে একজন লিখেছেন, বর্তমানকালের অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে শুমপীটার ছিলেন সেরা কথা কইয়ে। আলাপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে ভালো কথা-কইয়ের তালিকা: রবীন্দ্রনাথ, নাটোর, সাহেদ সুরওয়ার্দি, অমৃতলাল, প্রমথ চৌধুরী, শরৎদা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন, হারীতকৃষ্ণ দেব, হিরণকুমার সান্যাল, শিশির ভাদুড়ী— নামজাদাদের মধ্যে। লক্ষ্ণৌ-এ অনেক পেয়েছি। অজানাদের মধ্যে কত! এঁরা আড্ডা জমাতে পারতেন। সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে এক ভাতখণ্ডেজী আর অমিয় সান্যাল। কিন্তু ওস্তাদদের মধ্যে অনেকেই— বিশেষ করে কেরামত খাঁ, হাফিজ আলি, ফৈয়াজ খাঁ। এঁদের wit ছিল অসাধারণ। অবনীবাবুর কথা ছিল খেয়ালি। ড. রাধাকৃষ্ণণ যে কোনো আড্ডা জমাতে পারেন। শরৎদার মুখে বলা গল্প ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে, পড়লাম। সবগুলি না হোক, অনেকগুলিই আমার শোনা। ইদানীং একটু গরমিল হতো। ভালো মিথ্যুক হবার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন স্মরণশক্তির, আজকাল একটু কমেছে, তাই ভাবছি বেশি-দিন নয়। একদিন আমার বালিগঞ্জের বাড়িতে ৫।৬ ঘণ্টা কাটান। প্রমথবাবুও এসেছিলেন সন্ধ্যায়। কে কবে কোথায় বড় মাতাল দেখেছেন, তারই গল্প চলেছিল। প্রমথবাবু একটি য়ুরোপীয়ান মহিলার এবং শরৎদা একটি সাধুর গল্প বলেছিলেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তাঁর বহু গল্প ছিল। একবার বলেছিলেন, তিনি মেয়েদের কাছ থেকে হাজার চিঠি পেয়েছিলেন, প্রত্যেকটাই নাকি আত্মচরিতের অধ্যায়। পতিতা রমণীর বহু জীবনী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন। দেখাননি অবশ্য। বলতেন, হারিয়ে গিয়েছে। তবে গল্প শোনাতেন অনেক। তাঁর কাছে

স্ত্রী-চরিত্রের দু-তিনটি ছক ছিল। একদিন জিজ্ঞাসা করি, এত কম কেন? আমার ইঙ্গিত ছিল তাঁর নভেলের স্ত্রী-চরিত্রের বৈচিত্র্যহীনতার প্রতি। তিনি বুঝে বললেন, 'ওদের মধ্যে বৈচিত্র্য নিতান্ত কম, যা পেয়েছি তাই লিখেছি।' আমার এখনও বিশ্বাস শরৎদা বহু স্ত্রীলোক জানলেও মাত্র যে টাইপের স্ত্রী-চরিত্র তাঁর হৃদয়ে আঘাত দিয়েছিল, মাত্র সেই টাইপগুলোকেই জেনারেলাইজ করতেন। এক 'সতী' ছাড়া। ঐ গল্পটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছিল বলাতে তিনি নিজে এসে এক কপি উপহার দেন ও আমার স্ত্রীকে ঠাট্টায় বিব্রত করেন। সে যাই হোক, আড্ডা জমাতে পারতেন বটে; তবে তাত্‌তে দেরি হতো। মধ্যে মধ্যে একেবারে গুম হয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তার স্তর, ভঙ্গি, সবই ছিল অন্য। এমনটি হয় না, হবেও না। একদিন বলেছিলাম, 'রাত্রে না ঘুমিয়ে কথাগুলি বুঝি সাজিয়ে রাখেন?' 'না, তার প্রয়োজনই হয় না, পঞ্চাশ বছরের সাধনা ভুলছো কেন?'

অশ্বিনীকুমার দত্তের হাসি জীবনে ভুলবো না। এক কোজাগর পূর্ণিমার রাত— প্রায় সারারাতই হাসি-গল্পের ফোয়ারা ছুটেছিল। বাঙালির তাঁকে কি মনে আছে? মস্তলোক, মস্তলোক, মস্তলোক।

শ্যামবাজারের স্কুলপ্রাঙ্গণে অমৃতবাবুর সঙ্গে কথা কইতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে।

লক্ষ্ণৌ-এর কথাবার্তায় রম্যতা অনেক বেশি। উর্দু কবিতার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ঢুকেছে, তেমনি গালিব, মীর, হালি, আকবর প্রভৃতির বহু কবিতা লক্ষ্ণৌ-এর মুসলমান, কায়স্থ, কাশ্মীরীদের মুখে মুখে। গজলের প্রাণবস্তুটাই যেন আলাপ, তাই 'উইট' সহজেই আসে।

বানডুঙ-এর বক্তৃতার জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কেবল তথ্য-সংগ্রহ করলাম। কিন্তু এ-যুগে কো-অপারেশনের থিওরির পিছনে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত একটা থিওরি থাকা চাই। য়ুরোপে যখন কো-অপারেশন চলতে শুরু হলো, তখন ইংল্যাণ্ডে Laissez fa.re চলছে, আর জার্মানীতে একপ্রকার আমলা-তন্ত্রী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হচ্ছে। ফ্রান্স, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশে রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো থিওরি ঐ সময়ে কি ছিল? যা কিছু চিন্তা, কেন্দ্র-বিচ্ছিন্ন সোশ্যাল

ইকনমি ঘিরেই ছিল। তাছাড়া সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন। তাই কোথাও প্রোডিউসার্স, কোথাও কনজ্যুমার্স কো-অপারেটিভসের প্রসার হলো। এদেশে মাদ্রাজ, বোম্বাই অঞ্চলে যা কিছু হয়েছে, তা প্রধানত রুর‍্যাল ক্রেডিট-এর দিকে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এখনও ওরই ওপর জোর দিচ্ছেন। ভালো। স্টেট ব্যাঙ্ক তো হলো ঐ জন্যে প্রধানত, কিন্তু গ্রামোন্নতির অন্যদিকে কো-অপারেটিভগুলো কি করছে ? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেষ রিপোর্ট পড়ে হতাশ হলাম। বরঞ্চ কম্যুনিটি প্রোজেক্ট, ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস-এ বেশি কাজ হবে। গ্রাম একটা গোটা ও জীবন্ত জিনিস। তাকে গোটাভাবেই দেখতে হবে। এ-যুগে রাষ্ট্রকর্ম স্বেচ্ছাকর্মের অপেক্ষা সক্রিয় ও শক্তিশালী। সামাজিক সমগ্রতার ছবি রাষ্ট্রের আয়নাতেই ধরা পড়েছে আজকাল। পছন্দ হয় না। কিন্তু উপায় কি ? বাকুনিন ? আই ডু নট ওয়ান্ট টু বি আই, আই ওয়ান্ট টু বি ইউ ? রোম্যান্টিক !

রাতে কেনিয়ন রিভিয়ুতে দোস্তয়েভ্স্কি সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়লাম। বিশেষত 'দি পসেস্ড' নিয়েই আলোচনা। লেনিনগ্রাডের (না মস্কোতে ?) একটি ঘটনা মনে পড়লো। প্লেখানভের আর বে-খাতির নেই দেখে খুশী হলাম, যেমনি দোস্তয়েভ্স্কির নাম কেউ করে না দেখে রাগ হলো। একজন সাহিত্যিককে বলেছিলাম, 'আবার আপনাদের দেশে আসবো। যেদিন দোস্তয়েভ্স্কিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দেওয়া বন্ধ করবেন। তাঁর মাহাত্ম্যকে অত সহজে এক সামাজিক সূত্রের মধ্যে ফেলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাতে রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবার আপনারা তো সামলে উঠেছেন, এবার তাঁর রচনা নিয়ে সাহিত্যালোচনা করুন না ?' ভদ্রলোক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন কোথাও, ঠিক মনে নেই। তিনি অবশ্য রাগেননি, তবে দুঃখিত হয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের পাদটীকায় গোটাকয়েক মজার কথা রয়েছে !

> Lenin, The Possessed is "repulsive but great," Lunacharsky, he is "the most enthralling" of Russian writers. In a memorial published in 1920 for the hundredth anniversary of Dostoevsky's birth there appears this generous tribute : "Today we read the Possessed, which has become reality ; living with it and suffering with it, we create the novel afresh in union

with the author. We see a dream realised and we marvel at the visionary clairvoyance of the dreamer who cast the spell of Revolution on Russia...'

অবশ্য মত বদলাবেই। আমি কিন্তু ভাবছি, দেশ যদি সমাজতন্ত্রীই হয়, তবে কি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ত্যাগ করবো, তাঁদের কথা ভুলে যাবো, তাঁদের যারা নাম করবে তাদের গালাগালি দেবো? তাহলেই গিয়েছি আর কি! কিছুদিন আগে বেশ ভয় হয়েছিল।

বৃষ্টি পড়ে উঠোনের নিমগাছ গন্ধে ভরপুর। টগর-চাঁদনী চক্‌মক্ করেছে। এত দেরিতে, এত রাত্রে বেলা কেন?

গত দশ বারো দিন বক্তৃতা তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলাম। পছন্দ হলো না, বিস্তর ঢিলেঢালা ফাঁক রয়েছে। এখানকার লাইব্রেরিতে রিপোর্ট খুব কম আসে। আগে থাকতে বিশেষ পরিচয় থাকলেও, একটা বিষয় সম্বন্ধে পঞ্চাশ মিনিট বক্তৃতা দিতে অন্তত সাতদিনের প্রস্তুতি চাই এখনও। লোকের ধারণা আমি খুব নির্বাধভাবে বলি, লিখি ও যে কোনো বিষয়ে কথা কইতে পারি। কিন্তু আমি জানি আমাকে সেজন্য কতটা খাটতে হয়েছে ও হয়। সময় পেয়েছি অনেক— আমি জীবনে ব্রিজ পর্যন্ত খেলিনি। সময় কাটাবার উপায় থাকলে হয়তো সময় পেতাম না। তবু আমার মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে বিস্তর গলদ রয়েছে। লোকে যাকে 'অর্গানাইজেশান' বলে, সেটা আমি কখনও শিখিনি। এটা চরিত্রের দোষ। অর্গানাইজেশান দুই ধরনের— এক, ব্রাহ্মণেরা যেভাবে সমাজ বেঁধেছিলেন, আর এক যাকে বৈশ্যবৃত্তি বলা চলে। সমবার্ট 'ক্যাপিটালিস্টিক স্পিরিট' বা পুঁজিবাদের এক অর্থ 'র‍্যাশনালিস্ট' দিয়েছেন। সেটা দাঁড়ায় 'অ্যাকাউন্টিং'-এ। এই হিসেবের মধ্যে যে বিন্যাস-ধর্ম আছে, আমার সেটাও নেই। ব্রাহ্মণবৃত্তি তো দূরের কথা। অথচ প্ল্যানিং-এ আমি একান্ত বিশ্বাসী— যার মূল ধর্ম হলো যুক্তিবত্তা আর প্রধান যন্ত্র জাতীয় হিশাবকরণ। সমাজের, অর্থবিন্যাসের বেলায় প্ল্যানিং আর নিজের বেলায় অব্যবস্থা। বোধ হয় বৃদ্ধি বা বিস্তার আর বিকাশ বা অভিব্যক্তি, দুটি পৃথক জিনিস। একটি জৈব, অন্যটি

মানবীয় বুদ্ধিসর্বস্ব— র‍্যাশনালিটির চরম কথা অন্তত এই যুগে তো তাই— অন্য যুগে ভিন্ন অর্থ ছিল।

লেকীর 'হিস্ট্রি অব্ র‍্যাশনালিজম' বইখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। দেখে চিনতে পারলাম না, অর্ধেক পাতাই নেই। লেকী কি লিখেছেন ঠিক মনে নেই। নিজেই চিন্তা করা যাক। এই রকম একটা নক্‌সা মনে ভাসছে— সেইটে সাজিয়ে গুজিয়ে যদি অন্য কেউ লেখেন, মন্দ হয় না। 'রীজন' বা বিচারশক্তি হলো মুখ্যত গ্রীক, পুরোপুরি নয়। ভারতীয় ভাব। অবরোহ প্রণালীর জ্যামিতিক যুক্তি (ইউক্লিড ও আলেক-জাণ্ড্রিয়া)। অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্র। (পুরানো গ্রীক ডায়েলেক্‌টিক নির্লোপ হলো কেন ?) সেণ্ট টমাস অ্যাকুউনাসের চেষ্টা, প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের সমন্বয় করবার। আমাদের বৌদ্ধ ন্যায়, শঙ্কর, রামানুজ, কারুরই 'পিওর রীজন' নয়, আবার 'ডিভাইন রীজনও' নয়। তবে একটা মিল থাকতে পারে। য়ুরোপের মধ্যযুগে ও ফরাসী বিপ্লবের সময় রীজন হচ্ছে প্রকৃত নিয়ম বা আইনের সিদ্ধান্ত। আমাদের, কর্মের দুর্বার ফল। কাণ্টের প্রথম বক্তব্য ও দ্বিতীয় বক্তব্য বিপরীত। কাণ্ট ও রুশো— এদের মূলগত পার্থক্য কম। এ দুই-ই কার্টেজিয়ন রীজন-এর বিপক্ষতার ইতিহাস এবং দুটোই এথিকাল রীজন বা নীতির ন্যায়। অযৌক্তিকতার ইতিহাস শুরু হলো রুশো থেকে নয়, জার্মানীর রোম্যান্টিক মুভমেণ্ট থেকে। চলছে জাতীয় চরিত্রনীতি থেকে বর্তমান "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" পর্যন্ত। নীট্‌শে-লরেন্স সংবাদ। বিচার এবং বিশ্লেষণ— অর্থাৎ সংশয়ের দর্শন— ডেকার্ট থেকে ব্যালফোর পর্যন্ত। এই অধ্যায়ে হিউমের স্থান অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। তারপর শেষে আসছে বিচার এবং আধুনিক বিজ্ঞান। মোট কথা যা দাঁড়াচ্ছে, তা এই : র‍্যাশ-নালিজম হচ্ছে হিউম্যানিজমের সব চেয়ে বর্ধিত রূপ ; বিপরীতটা নয়। তারপর র‍্যাশনালিজমের সীমা-জ্ঞান। এখানে অনেককেই আনতে হবে। ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দকে নিশ্চয়। এই জ্ঞান অ-যুক্তির নয়। তবে ভারতবর্ষে এক হয়ে যাবার ভয় আছে।

কিছুদিন আগে E. A. Preyre নামে ফরাসী লেখকের 'দ্য ফ্রীডম অব ডাউট' বলে একখানি ভালো বই পড়ি। ইনি প্রাকৃত সংশয়বাদীর চিন্তা নিয়ে নিজের মানসিক অভিব্যক্তির ইতিহাস লিখেছেন। এঁর কাছে সংশয় হলো নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক দর্শন। চমৎকার চমৎকার উদ্ধৃতি আছে বই-খানায়। আমাদের দর্শনের নেতিবাদ ভদ্রলোক জানেন না কেন,

বুঝলাম না। একজন কাশীর পণ্ডিতের কাছে 'ন' কথাটির চমৎকার ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। আমাদের নব্য ন্যায়ের 'অ' সদ্ভাবাত্মক। যেমন নন-ভায়োলেন্সের 'নন্' শব্দটি গান্ধীজীর মতে।

সন্দেহবাদ সম্বন্ধে আমার নিজের মানসিক স্থিতিটা কি? দুটি মন্তব্য মনে আসছে। শ্রীঅরবিন্দ আমার বিষয়ে (বোধ হয় দিলীপকে) একবার লিখেছিলেন, "Dhurjati, like a good chimney, is burning his smoke." এখনও কিন্তু ধোঁয়া যায়নি। আর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম (নিক্সন) একবার আমাকে বলেছিলেন, "Ever since I knew you, you have been standing on the brink." কৃষ্ণপ্রেম আমার বহু পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। এখনও সেই মাটির শেষ কিনারায়, পার্থিব সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছি। এটা বুদ্ধির দম্ভ, মনুষ্যত্বের আত্মগরিমা এবং সবটা অজানার ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু এতে লজ্জা পাই না। জানি আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড়। জানি তার অতিরিক্ত প্রকাণ্ড আকাশ। সেখানে এই জীবনের অনুমান-পরিমাণ অচল। তবু সেখানেও এই বুদ্ধিরই প্রসার চাই। অন্য যন্ত্র, অন্য উপায় নেই। অনুভূতি? কে তাকে অস্বীকার করছে? কিন্তু অনুভূতিরও আইন-কানুন আছে। সেটা অনুভূতি আবিষ্কার করবে না,— করবে ও করছে এই বুদ্ধি, যেমন অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে। ঠিক এই বুদ্ধি না হলেও মার্জিত বুদ্ধি। তবু বুদ্ধি— অনুভূতি নামে পৃথক বস্তু নয়। অতএব সংশয়ের অর্থ বুদ্ধির মার্জন-ক্রিয়া বা পদ্ধতি মাত্র। তারপর?

তারপর জানি না। তারও পরে আমার কৌতূহল নেই। মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই ভালো। পাইলেট-এর মতন মুখ ফেরানো নয়, বুদ্ধের মতন।

জাকর্তা শহরে রাত কাটালাম। জাকর্তা প্রকাণ্ড শহর। খুব চওড়া রাস্তা, ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রায় প্রত্যেকটাই শুনলাম ডাচ্ কোম্পানির। ডাচ্‌দের কাছ থেকে ওরা পরিচ্ছন্নতা শিখেছে। প্রকাণ্ড হোটেল, পৃথক পরিবারের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত। এক একটি স্যুইট-এর সামনে ছোট বারান্দা, ফুল ও লতাপাতায় সাজানো। সবই য়ুরোপীয়ান প্রায়, দু'চারজন দো-আঁশলা। সামনের হল্-এ তিনজন ডাচ্ ও একজন দো-আঁশলা ডাচ্ জিন খাচ্ছে। একজন আমাকে দেখে "নেহরু নেহরু" বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

মাত্রা একটু বেশি হয়েছিল। আওয়াজে বিদ্রূপ ছিল সন্দেহ হলো, তাই সটান তার সামনে দাঁড়ালাম। ডাচ্ ভাষায় কী বক্ বক্ করলো। খানিক পরে বেসামাল হতে বন্ধুরা ধরে মোটরে তুলে দিলে। সন্দেহ হলো লোকটি দেশ স্বাধীন হতে সুখী হননি এবং নেহরুকে সেই জন্য দায়ী করছেন। এই ধরনের "চীজ" আমাদের দেশেও সেদিন পর্যন্ত ছিল। তবে আমার সন্দেহটা নিতান্ত অকারণ হতে পারে। আমার মাথার টাক নেহরুর মতন আর ধুতি-পাঞ্জাবি ও রঙিন চশমা পরলে রাজাজীর মতো দেখায়, অনেকেই বলেছেন। রানিখেতের রাস্তায় দূর থেকে শ্রীচণ্ডুলাল ত্রিবেদী রাজাজী বলে ভ্রম করেছিলেন; এলাহাবাদের প্রধান বিচারপতি শ্রীবিধু মল্লিক মোটর থেকে নেমে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর তাঁর ভুল ভাঙে। রামানন্দবাবুকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিল, তিনি লিখেছিলেন। ফলে তাঁকে দেশবাসীর কাছে ঠাট্টা ভোগ করতে হয়েছিল। তবে হল্যাণ্ডে আমি ঐ ধরনের অনেক "চীজ্" দেখেছি। তাঁরা দেশ স্বাধীন হবার পর দেশত্যাগী হয়েছেন— অবশ্য কোটি কোটি টাকা সরিয়ে ফেলে। এ ধরনের ভারতবাসীর সংখ্যা বিলেতে নিতান্ত কম— নেই বললেই চলে। অবশ্য ভারত ইংরাজের অধীনে ছিল দেড়শ' বছর, আর এরা ডাচের অধীনে ছিল তিনশ' বছর। দোকান-পসারের ওপর এখনও ডাচ্ লেখা। গাছপালা, আবহাওয়া, আর অবশ্য চেহারা ছাড়া মনেই হলো না এশিয়ার কোনো শহরে রাত কাটালাম। অথচ হাওয়াই বন্দর থেকে বেরুতে এত দেরি হলো যে, মজ্জায় মজ্জায় বুঝলাম এ দেশ এশিয়ারই মধ্যে। খাওয়ার পর শহরে কিছুক্ষণ ঘুরলাম। রাতে প্রত্যেক শহরই সুন্দর দেখায়। বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গাছের পাতা থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছিল। মস্ত মস্ত পাতা। রাত বারোটা পর্যন্ত রাস্তায় মোটরের ভিড়। রাতে ঘুম হলো না। শরীর ভীষণ ক্লান্ত।

ভোর বেলায় বানডুঙ যাত্রা। চল্লিশ মিনিট লাগলো পৌঁছতে। ট্রেনে লাগতো ঘণ্টা চারেক। বানডুঙ পাহাড়ের উপর সমতলভূমিতে। প্রায় হাজার চারেক ফুট উঁচু। আসবার পথ অপূর্ব সুন্দর। শহর একদম বিলেতী। দোকান-পশার, বাস, ট্রাম, মোটর, ট্যাক্সি, হোটেল, রাস্তা, গতায়াত, মায় আবহাওয়া পর্যন্ত, সব বিদেশী। তিন দিন ধরে স্বাধীনতা

দিবস পালন করছে— প্রতি বাড়িতে পতাকা ঝুলছে। আমাদের দেশ জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে উদাসীন। আগেও লিখেছি, এখনও লিখছি আমাদের পতাকার পরিকল্পনা দুর্বল। যে সব রঙের সমাবেশ হয়েছে পতাকায় তাদের প্রতীক-মূল্য জীবন্ত নয় জনসাধারণের কাছে। এ যুগে, এশিয়ার পক্ষে স্বাধীনতার প্রধান গুণ তেজ। এদের পতাকায় লালটা ডগ্‌ডগে। আমাদের শাদা রঙ 'একলেক্টিক', পবিত্রতার চিহ্ন নয়। চক্রের রঙ খোলে না ঐ সমাবেশে। হয়তো কেন নিশ্চয়ই, আমাদের পতাকার রঙ-এর ও চক্রের নিগূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু যারা জানে তাদের কাছে, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে, কিন্তু জনসাধারণ বোধ হয় সিম্বলের চেয়ে ইমেজ-ই চায়। ইমেজ সহজ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ। আমাদের পতাকায় সিম্বল আর ইমেজের মিলন হয়নি, তাই মিন্ মিন্ করে। তার ওপর খদ্দর— তাই ঝুলে পড়ে, পৎপৎ শব্দে হৃদয় আলোড়িত করে না।

প্রকাণ্ড হোটেল— একেবারে নতুন ডাচ্ ধরনের। অসম্ভব খরচ, অসম্ভব শোভা। নাচ-ঘর, খাবার ঘর প্রকাণ্ড। দেওয়ালে নতুন শিল্পীদের ছবি টাঙানো বিক্রির জন্যে। আলোর সমাবেশ সুন্দর; ল্যাম্পগুলি দেশী; আর কাঠের কারুকার্য কল্পনাতীত। একটু জবড়জঙ, তিলমাত্র ফাঁক নেই। একেবারে ভরাট, দ্রাবিড়ী। প্রাচুর্য যৌবনের চিহ্ন, রিনেসাঁস যুগের ইটালিয়ান দরজাতেও ফাঁক নেই। তারপর ব্যারোক্— প্রৌঢ়ত্ব— চেলিনির সণ্ট-সেলার (নিমক্‌দান)— পঞ্চদশ লুই-এর কমোর্ড, ফ্রাজোনার্ড, বুশেযারের ছবি। তারপর রকোকো— বার্ধক্যে যৌবন আনবার প্রাণপণ প্রয়াস। সব অবস্থাই চিদাম্বরমের নটরাজের মন্দিরে দেখেছি। ভার্সাইয়ে— ফনটেনব্লোর ছাতের ছবিতে মার্জিত রুচির লক্ষণ পাইনি। ভারতবর্ষের শিল্পঐতিহ্য যে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, তাইতে একরকম বেঁচে গিয়েছি। পরম্পরার বিপদ অনেক। এ-যুগে একটার বদলে দশটা বিড়লা মন্দির স্থাপিত হলে কী হতো ভাবলে হৃৎকম্প হয়।

অতিরঞ্জনেও রুচি চাই: আবুর জৈনমন্দির, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', লক্ষ্ণৌ-এর আলাদিয়া খাঁ'র তান, আর যবদ্বীপের কাঠের কাজ ও পুতুল। রুচিবিহীন অতিরঞ্জন: আমাদের যাত্রা অভিনয়, কোনো কোনো ঘরোয়ানার (নাম নাই করলাম) তানবাজি আর লয়কারি, হিন্দী ফিল্ম, দিল্লীর বিড়লা মন্দির, বাংলা ভাষায় বহু অচল প্রেমের কবিতা, আর মস্কো

শহরের মেট্রো স্টেশন।

তিন দিন স্বাধীনতা-দিবসের জন্য ছুটি। এখানকার ছুটি আমাদের দেশেরই মতন— কথায়-কথায়, প্রতি পার্বণে এবং পার্বণও হাজার রকমের। চ্যাডউইক নামে এক ইংরেজ এসেছেন একই কাজে। চিরজীবন নাইজিরিয়ায় কাটিয়েছেন, এখন ম্যানিলায় কম্যুনিটি প্রোজেক্টের ভারপ্রাপ্ত। খাসা লোক। আফ্রিকাকে ভালোবাসেন, তাঁর জীবনশক্তিতে, পৌরুষে আস্থাবান এবং নাইজিরিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হয়েছে বললেন। কলোনিয়াল সার্ভিস-এর উৎকৃষ্ট নমুনা। জনসাধারণের শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস। অনেক দৃষ্টান্ত দিলেন। গ্রাহাম গ্রীন-এর নায়ক নন। একটা রিকশ' চড়ে দু'জনে শহর ঘোরা গেল। ট্যাক্সি চড়ার পয়সা দু'জনের কারুরই নেই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা। এশিয়ার নেতা ইত্যাদি। হার্পারেরও তাই মত। অত্যন্ত নরম হয়ে বিনয়ভরে আপত্তি জানালাম। বললাম, "এখনও আমরা বেশি কিছু করে উঠতে পারিনি, তবে চেষ্টা করছি। ভুল হচ্ছে, তবু যেন মনে হয় একটা জাগরণ, একটু যৎসামান্য আত্মবিশ্বাস এসেছে।" দু'জনেই বললেন, ''এ কথা তো অন্যে বলে না— একা ভারতবাসীই বলতে পারে!'' আমি তো হতভম্ব। ফিলিপিন অঞ্চলে পণ্ডিতজীর খাতির কম— আমেরিক্যান প্রেসেরই জন্য।

রাস্তাঘাট বানডুঙের সব বিলেতী। মেয়েরা সারঙ পরছে না— একদম আধুনিক। দেশী ও পুরানো রুচির মধ্যে ঐ যা ফুলের শখ। এখানকার শপিং সেণ্টার ঠিক যেন রটারডামের অনুকরণ। নতুন ডাচ্ ধরনের দোকান— প্রকাণ্ড, অত্যন্ত শৌখিন। বলে এরা প্যারিস, কিন্তু প্যারিস অত সাজানো ছিমছাম নয়। মানুষের গায়ের রঙ কালো, ঠিক কালো নয়, শ্যামবর্ণ! আর নাক থেঁদা যদি না হতো মেয়ে-পুরুষের, তবে বোঝা যেতো না ডাচ্ প্রভুরা চলে গিয়েছেন। তাঁরা গিয়েও যাচ্ছেন না। ওঁদের প্রতি এঁদের মনোভাব বিষাক্ত। বহু প্রমাণ এই কয় ঘণ্টায় পেলাম। দেশের একাংশ তাঁরা এখনও ছাড়ছেন না, দেশে লুকিয়ে লুকিয়ে ঝগড়া বাধাচ্ছেন, এমন কি অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে। য়ুরোপীয়ানদের এঁরা বিশ্বাস করছেন না একেবারেই। য়ুরোপীয়ানরাই বললেন। আভ্যন্তরীণ গোলমাল চলছে। দেশের ভেতরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয় শুনলাম। কনফারেন্সের

প্রতিনিধিরা গ্রাম দেখতে গেলেন, সঙ্গে সশস্ত্র পাহারা সমেত জীপ গেল।

গত ক্যাবিনেটের ন্যায়-মন্ত্রীকে পুলিশে ধরেছে নতুন ক্যাবিনেটের আদেশে। অভিযোগ ঘুষ নেওয়া ; কেউ বলছেন ব্যাপারটা পলিটিক্যাল। সত্য-মিথ্যা কে নির্ণয় করবে ?

সন্ধ্যাবেলা ফুলযাত্রা দেখলাম। চমৎকার লাগলো। স্বাধীনতা-সংগ্রাম-নাটকের মূক-অভিনয়। সব বুঝলাম না। হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ অপেক্ষা করলো তিন ঘণ্টা, নীরবে। তারপর শোভাযাত্রা এলো। ভদ্র ভিড়— এমনটি দেখিনি। সকলের হাসিমুখ। এরা সর্বদাই হাসছে। খুব অল্পসংখ্যক লোক দেখলাম, যাদের পোশাক-আশাক গরীবের মতন। বেশ সাজতে জানে মেয়েরা। জাতটা স্ফূর্তিবাজ বলে মনে হয়।

কালাবাজারের পরিচয় পেলাম। শাদা-কালোয় চার-পাঁচ গুণ তফাত। একটা স্যুট আর টাই ইস্ত্রী করতে দশ রূপেয়া নিলে। হোটেলের বয়গুলো পর্যন্ত বলছে, এ-দেশে মানুষ থাকতে পারে না। প্রত্যেক জিনিস মহার্ঘ। যুদ্ধের পরও আমাদের দেশে এত দাম বাড়েনি। শুনলাম, বানডুং কনফারেন্স-এর পর এতটা বেড়েছে। জায়গাটা ট্যুরিস্টদের জন্যে। ফি-শনিবার হাজার-হাজার লোক নিচে থেকে বেড়াতে আর স্ফূর্তি করতে আসে। এ অবস্থা বেশি দিন চললে সর্বনাশ হবে।

কিউরিও-দোকানে গেলাম। একটিও ভালো জিনিস নজরে পড়লো না। বাজে জিনিসও দামের চোটে ছোঁওয়া যায় না। সব যেন ট্যুরিস্ট-দেরই জন্যে। বলিদ্বীপে কাঠের কাজ যা দেখলাম, তার মধ্যে না আছে পুরাতনের স্বাদ, না আছে নতুনত্বের আগ্রহ। হতাশ হচ্ছি— ভালো নয়। কারুর কাছে জানবার সুযোগ পাচ্ছি না। যাত্রাটাই বিফল হবে না কি ?

গ্রাম দেখার সুযোগ হলো না। আসতে না আসতেই ডেলিগেটরা গ্রামে বসবাস করতে চলে গেল। সঙ্গে সাঁজোয়া গাড়ি! বারো জন সশস্ত্র সৈন্য! বরবদূর যাওয়া বিপজ্জনক— হাওয়াই জাহাজ রোজ ছাড়ে না। অতএব এটাও গেল। বলিদ্বীপে যাওয়াও বিপজ্জনক। একজন বিদেশী বললেন, 'ওখানে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিই না।' এখানকার কর্তৃ-পক্ষকে অনুরোধ করলাম— কেমন যেন নিমরাজি। এখনও দেশে শান্তি আসেনি। মনে হলো, বেশ গোলমাল চলছে। আরেকজন মন্ত্রীকে ধরেছে শুনলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না। ভারতবর্ষের ওপর ভক্তি আসছে।

ধরা পড়েনি বলে? না। মানসিংহ অবশ্য এখনও বিরাজমান। তবু নির্ভয়ে প্রায় সর্বত্রই যাওয়া যায়।

এখনও এত ঘণ্টা পরেও ইলেকট্রিসিটি ফেল করেনি। আলিগড়ে দিনে গড়পড়তা তিনবার বর্ষাকালে, শীতের সময় একবার। অতএব এদের কর্ম-দক্ষতা আমাদের চেয়েও বেশি। তবে বানডুঙ বড় শহর, সাড়ে আট লক্ষ লোক— একেবারে বিলেত। বোধ হয় তার চেয়েও ভালো, বস্তি নেই কোথাও। আঠারো হাজার ডাচ্ এখনও এই শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম চালাচ্ছেন। একজন ডাচ্ মহিলা থাকলেই যথেষ্ট হতো! শুচি-বাই যদি কারুর থাকে তো ডাচ্ মহিলাদের।

এক জার্মান পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো। অত্যন্ত কর্মদক্ষ মহিলা। পনেরো মিনিটের মধ্যে ডিক্‌টেটারশিপের উপযোগিতার উল্লেখ শুনলাম!

২১. ৮. ৫৫

গ্রাম থেকে ফিরে এসে সকলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। এমন পরিপাটি গ্রাম ভূ-ভারতে নেই। ঝক্‌ঝকে তর্‌তরে রঙিন, সুচারু, সুরুচি। একজন বাঙালি ডেলিগেট বললেন, 'এদের রক্তে মাংসে, হাড়ে আর্ট মিশে গিয়েছে। ভারতীয় আর্ট।' শুনে খুশী হলাম। তবে বেশি দিন নয়। মেয়েরা বিলেতী ঘাঘরাই তো পরছে দেখলাম।

কে একজন হোটেলে এলেন। তিন গাড়ি সশস্ত্র সান্ত্রী প্রহরী আগে— পেছনে সশস্ত্র মোটর-স্কাউট। মিশরের উপ-প্রধানমন্ত্রী। পণ্ডিতজী একবার লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন। দু'-তিনদিন পুলিশ পাহারার জ্বালায় অস্থির সকলে। তিনি নাকি ভীষণ চটেছিলেন ঐ প্রকার ব্যবস্থা দেখে। তবে গান্ধীজীর মৃত্যুর পর বোধ হয় দরকার ছিল। হয়তো এখানেও দরকার আছে। মধ্য প্রাচ্য থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত সিভিল আর মিলিটারির বিরোধ এবং সেই সঙ্গে মোল্লা জুটেছে। খুব বেঁচে গিয়েছি আমরা। গান্ধীজী প্রাণ দিয়ে আমাদের বাঁচালেন। এ-যুগে এই প্রায়শ্চিত্তের তুলনা নেই। আউঙসানের মৃত্যুও ঐ জাতেরই। এঁরাই প্রকৃত খ্রীস্টান। হয়তো বা বোধিসত্ত্ব।

২২. ৮. ৫৫

সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বক্তৃতা ; তারপর এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তর। পনেরো মিনিট বিশ্রামের পর পাঠচক্র দেড় ঘণ্টা। আবার আলোচনা চললো ১-১৫ মিনিট পর্যন্ত। একটু ভয় ভয় করছিল, শীঘ্রই কেটে গেল। লেখা বক্তৃতা পড়লাম না, মুখেই বলে গেলাম। মনে হলো খারাপ হয়নি। পূর্বেকার মতো অনর্গল নয়।

বিকেলে শহরে ঘুরলাম। ছবি একখানা। একটাও কি ভাঙা বাড়ি নেই, নর্দমা নেই, একটা বাড়িরও কি রং চটে যায়নি! এমন দোকান বোম্বাই-কলকাতাতেও নেই। কারা কেনে? কোথেকে কেনে? এত পয়সা কোথায় পেলে? প্রায় সব দোকানই বিদেশীর, আর ক্রেতা অনেকেই দেশী। রাস্তার ধারে বসে চা-কফি-পানীয় চলছে। অপেয় চা। এরা দুধ খায় না— সব কেমিক্যাল দুধ ব্যবহার করে। গ্রামে নাকি গরু নেই, মোষ কিছু আছে। বাচ্চারা কি খেয়ে বাঁচে? রাস্তাঘাটে বেশি বাচ্চা দেখলাম না। আমার ঘরের পাশে এক জোড়াই যথেষ্ট। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও কম নজরে এলো। সবই যেন পনেরো থেকে চল্লিশের মধ্যে। অবশ্য বয়স বোঝা যায় না থাঁদা নাকে। গ্রামে প্রতি কুটিরের সামনে একটি পুকুর, মাছে ভরতি। 'বাঙাল' গৃহিণীদের স্বর্গ! কিন্তু সবচেয়ে ভালো মাছও অখাদ্য। এরা মাছ খায় খুব, কিন্তু মাছ কুটতে জানে না। কি করে জানবে! এদের বঁটি নেই, ছোরা-ছুরি দিয়েই মাছ কাটে! তা না থাকুক! এমন হাসিখুশি পরিচ্ছন্ন জাত জগতে দুটি নেই। ডাচেরা পরিচ্ছন্ন, কিন্তু রামগরুড়ের ছানা।

২৩. ৮. ৫৫

সকাল বিকেল বক্তৃতা। সকালেরটা জমে ছিল, বিকেলেরটা বাজে হলো।

বিকেলে কর্তৃপক্ষের একজন মোটরে খুব খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। পাহাড়ের ওপর অনেকক্ষণ বসে গল্পগুজব হলো। কী চমৎকার সাজানো! মুসৌরী থেকে দেরাদুনের দৃশ্য এর তুলনায় কিছুই না। এত ফুল, এত গাছ, এত সবুজ, এত নীল মেঘের খেলা রানিখেতেও নেই। কেবল বরফের চূড়া নেই। আগ্নেয়গিরি চারধারে ; একটা গোলমাল করছে এখনও। বানডুঙ শহর নাকি আদিম কালে হ্রদ ছিল। দেখলে তাই মনে হয়।

ভদ্রলোক নিতান্ত স্বল্পভাষী। তবু যা বললেন, তাতে অনেক কিছু শিখলাম। হোটেলে এসে ম্যাপ দেখলাম। সাড়ে তিন হাজার দ্বীপে শান্তি স্থাপনা অসম্ভব। এমন সব দ্বীপ আছে যেখানে যেতেই চার পাঁচ দিন লেগে যায়। তার ওপর মহাপ্রভুদের কৃপা। অস্ত্র যোগাচ্ছেন এখনও। একাংশ এখনও ছাড়বেন না। তা ছাড়া, হেগ-চুক্তির উত্তরাধিকার। সেই শর্তে ডাচ্ বণিকদের ব্যবসায়ের ওপর হস্তক্ষেপ চলবে না। ওঁরা এখনও টুঁটি চেপে রয়েছেন, তাই কথায় কথায় এদের রাগ ফুটে ওঠে। আমাদের কনফারেন্সে ডাচ্ অধ্যাপক আসতে পারেননি, আসতে দেওয়া হয়নি। শুনে প্রথমে রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। এখন বুঝলাম। কিন্তু ওঁরা এখনও ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখছেন। নিতান্ত অলীক স্বপ্ন। এখানে একটা খুনখারাপি হওয়া আশ্চর্য নয়। ইংরাজেরা সোনার চাঁদ এদের তুলনায়। এশিয়ার জাগরণের খবর ওঁদের অনেকেরই কানে পৌঁছয়নি মনে হয়। আজ আমার হঠাৎ চোখ খুলে গেল।

২৪. ৮. ৫৫

আজ শেষ বক্তৃতা দিলাম। গোটা-কয়েক মূল বক্তব্য সাজিয়ে বক্তৃতা শেষ করলাম। মোদ্দা কথা এই :

কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট বা সমবায়-আন্দোলনকে প্ল্যানিং-এর অঙ্গ করতে হবে, নইলে মাত্র পলিসি-ই থেকে যাবে। যখন আজকালকার রাষ্ট্র অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে কিংবা করছে, তখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপের প্রশ্ন অবাস্তব। আজ যদি সমবায়-সমিতিগুলি কম্যুনিটি প্রোজেক্টস-এর মাধ্যমে এক্সটেনশন সার্ভিসের অঙ্গ হয়, তবে দু'দিক থেকেই লাভ হবে। জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ যাবে না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পাবে। এবং সেই সঙ্গে আমলাতন্ত্রের দোষগুলি সংশোধিত হবে। আমার মতে— এবং আমার মতটি বিশদ করে বোঝাতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগলো— কো-অপারেটিভের অর্থনীতি এতদিন আমাদের দেশে কেবল ক্রেডিট-পলিসিই ছিল, তাও ক্রেডিট সকলে পেতো না, কেবল মাতব্বরেরাই পেতেন। এখন ক্রেডিট-পলিসিকে অল্প সঞ্চয়ের এবং ছোট মাপের (এমন কী সম্ভব হলে মাঝারি ঠাটেরও) উৎপাদন-নীতিতে পরিণত করতে হবে। অনেক প্রশ্ন উঠলো। অধিকাংশ প্রশ্নেরই মূলে সন্দেহ ও ভয় ছিল যে, আমি বুঝি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট তুলে দিতে চাইছি। সকলেই ঐ বিভাগের

উচ্চ কর্মচারী। আমলাতন্ত্রের দোষ আমরা সকলেই জানি, কিন্তু দপ্তর-খানার বিভাগীয় মনোবৃত্তি আরও ভয়ংকর!

এঁরা সকলেই বিশ্বাসী ও বিশেষজ্ঞ। ব্যাপারটাকে বড় প্রতিবেশে দেখাতে গিয়ে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের একাধিক প্রত্যয় ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করতে হলো আমাকে। কো-অপারেটরদের আধুনিক অর্থনীতির একটা দ্রুত প্রাথমিক পাঠক্রম নিতে বাধ্য করা উচিত। লোকগুলি নিতান্ত ভদ্র, একাগ্রচিত্ত; কর্মিষ্ঠ— সবকিছু। কিন্তু 'চামড়ার মতন কিছুই নয়' অর্থাৎ সমবায় তথা সমবায়-সমিতির দপ্তরের কাছে কোনো কিছু নয়!

এই নিয়ে ছ' সাতটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করলাম। এক একজন প্রতিনিধি যেন নিজ নিজ দেশের দূত। এ মনোভাব নিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না। মুখে বিনয়, বুকে দম্ভ! আর একটি বস্তু! এই প্রথম লক্ষ করলাম, আমাদের প্রাদেশিকতা। মাদ্রাজ জানে না বোম্বাইকে, বোম্বাই জানে না পাঞ্জাবকে, আর কেউ জানে না বাংলাকে। চমৎকার! একটা সমগ্র ছবি দেবার চেষ্টা করলাম। দোষ স্বীকার করলাম, গুণ দেখালাম না। কেবল বললাম, এই ধরনের চেষ্টা চলছে। এই হিসেবে আমার যাওয়াটা সার্থক হয়েছে মনে হয়।

দুপুর বেলা ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্তা তাঁর আপিসে নিয়ে গেলেন। প্রকাণ্ড লাইব্রেরি। আমাদের দেশের খুব কম কলেজেই এত ভালো বই এত সংখ্যায় আছে। ইংরেজী ভাষা শেখাবার বন্দোবস্ত দেখে হিংসা হলো। সেই চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে ইংরেজী অক্ষর-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল, এখনও প্রিপোজিশন আর আর্টিক্যল্-এর ভুল হয়। অথচ কত খ্যাত আর অখ্যাতনামা ইংরেজ আমেরিকান লেখকের রচনাই না পড়লাম। সব ব্যর্থ শিক্ষার দোষে। নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শক্তির অতটা অপচয় হয় না। ব্রিটিশ কাউন্সিল পাঠাগারের লেণ্ডিং সেক্শন থেকে সপ্তাহে প্রায় হাজার বই ধার নেয় এদেশের লোকেরা। এতদিন রাজকীয় ভাষা ছিল ডাচ্, যেমন আমাদের ছিল ইংরেজী। এখন ইংরেজীর চলন। আমরা ছাড়ছি, ওরা ধরছে।

তিন চারশ' বছর রাজত্ব করলো ডাচেরা। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের ওপর মোটেই নজর দেয়নি। অত বড় দেশ, একটা নামমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল কলেজ। এখন চার পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু ডাচ ধরনের। পরীক্ষা লিখে নয়— পঁয়তাল্লিশ মিনিট মৌখিক পরীক্ষা মাত্র। পছন্দ হলো না। শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

জাকর্তা, বানডুঙ থেকে চার পাঁচশ' মাইল দূরে অন্য শহরে কোনো কোনো অধ্যাপকদের বক্তৃতা দিতে যেতে হয়। এ ব্যবস্থা অচল।

উপনিবেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা জাতীয় আন্দোলনের নেতা হন। স্বাধীনতা পাবার পর তাঁরাই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনে বাধা দেন। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। 'কালচ্যরল্যাগ্' বা সংস্কৃতির জের-এর মজার দৃষ্টান্ত। ইন্দোনেশিয়ার নতুন শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বেশি খবর কেউ দিতে পারলেন না।

সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম নাচের বন্দোবস্ত হবে। গিয়ে দেখলাম মস্ত জলসা এবং আমারই জন্য। বলিদ্বীপে যাওয়া হলো না, গান শোনা হলো না, নতুন ছবি দেখা হলো না বলে অভিমান করেছিলাম। তাই শুনেই বোধ হয় আয়োজন। গিয়ে দেখি, বিরাট ব্যাপার! বিদায়-অভিনন্দন। এই চমক-দেওয়ার মধ্যে যে সুরুচির পরিচয় পেলাম, সেটা হাজার বছরের সভ্যতার পলি থেকেই জন্মাতে পারে। ফুল-যাত্রার সময়ও দেখেছি, এ সভাতেও দেখলাম সংযম। ঠিক কী ধরনের শান্ত ভাব ধরতে পারলাম না, পরাধীনতার শান্তি না বলিষ্ঠ সংযম? একজন বিদেশী সেদিন বলছিলেন, 'জাতটা বড় নরম, সফ্ট্।' নিশ্চয়ই 'সফ্ট্', কিন্তু নরম স্বভাব আভিজাত্যেরও চিহ্ন হতে পারে। যেভাবে মেয়েরা হাঁটে, তার নমনীয়তা, তার শ্রী দুর্বলের নয়। আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো নাচ দেখে।

এ দেশে আসবার জন্য তৈরি হয়েছিলাম নৃত্য সম্বন্ধে বই পড়ে এবং স্থাপত্যের ফোটো দেখে। এক রবীন্দ্রনাথই এই নৃত্যের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এমন অপূর্ব সৌকুমার্য কোনো নাচেই দেখিনি। চার ধরনের নাচ দেখলাম। দুটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, যুদ্ধ এবং আত্মরক্ষা সংক্রান্ত। লোকনৃত্যের শক্তিমত্তা রয়েছে, কিন্তু স্থূলতা নেই। ছাঁদের আকারে রীতিবদ্ধ না হলে আর্ট হয় না। লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকশিক্ষা নিয়ে মাতামাতির মধ্যে সজীব রুচির চেয়ে শহর সুলভ ক্লান্তিরই পরিচয় বেশি। যা দেখলাম, তা লোক-শিল্প নয়।

যুদ্ধের নাচটি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় এক রাজার কল্পনা। ছুরি নিয়ে নাচ আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষার নাচ, আক্রমণের নয়। এইটিই বোধ হয় এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। হাতে লাল কাপড় (স্কার্ফ), পরনে লুঙ্গি, মাথায় ফাট্টা বাঁধা— গ্রামের পোশাক। পদক্ষেপগুলো বিধিবৎ। মুখে চোখে সব রকমের ভাব। কিন্তু সেগুলোও আমাদের রস-শাস্ত্রে

বর্ণিত ভাবের মতন। রাজার পোশাক রঙিন, অথচ সুরুচিসম্পন্ন। সুন্দানীজ, নৃত্য দুটি : রাজকুমারীদের নৃত্য ও পদ্মদীঘির ধারে স্বপ্ন— দুটি ব্যালে। বলশই থিয়েটারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যালে দেখেছি। প্রয়োজনা বাদ দিলে এই দুটি নাচ কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ রুশ ব্যালের চেয়ে খাটো নয়। বরঞ্চ আরও পেলব, আরও সুকুমার মনে হলোঁ। আঙুল, চোখ, হাতের ভঙ্গির ব্যঞ্জনা আরও সূক্ষ্ম, আরও গভীর মনে হলো। স্কন্ধ ও পায়ের কাজ কম— এখানে কথক নাচের বাহাদুরি। নৃত্যের ভূমি ভারতনৃত্যের নিশ্চয়, কিন্তু ব্যালে হিসেবে কথাকলির চেয়ে আরও পরিপাটি। ভারতনৃত্যের কম্পোজিশন যেন একটি বদ্ধ বৃত্ত, প্রত্যেকটি স্ব সম্পূর্ণ, বন্দেশ আঁটোসাঁটো। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। এ-নৃত্য ঘোলা— পরাবৃত্ত। তাই মন উধাও হয়ে গেল।

দেশবাসী হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের প্রচলিত নৃত্যপদ্ধতি এর চেয়ে অনেক অপটু, অনেক কাঁচা। আমাদের আকাডেমি যব ও বলিদ্বীপ থেকে একদল কলাবিদ্ আনালে দেশের বহু ছাত্র-ছাত্রী সত্যকারের নাচ শিখতে পারবে। আমাদের নতুন নাচ অনেক ক্ষেত্রেই গানের অবয়ব-সংস্থান। তাও সংস্থান পুরোপুরি নয়, বিকৃত দেহভঙ্গি মাত্র। হয় এঁদের একদল ভারতবর্ষে আসুন, না হয় আমাদের একদল এখানে বছর তিনেক এসে থাকুন ও প্রকৃতি-পরিবেশ শিখুন। ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যে বহু বৈচিত্র্য আছে। এক-একটি দ্বীপে এক ধরনের নাচ গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া শ্যাম, বর্মা, কাম্বোডিয়া থেকে অনেক পদ্ধতি এই দ্বীপপুঞ্জে একত্রে বসবাস করছে। সংস্কৃতির দিক থেকে ইন্দো-নেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমিখণ্ডের অঙ্গ। কিন্তু অঙ্গ হয়েও স্বাধীন। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কৃষ্টির এমন সমাবেশের তুলনা নেই। সমাজতাত্ত্বিকের স্বর্গ। দশ-পনেরো দিনে, এত বড় এত দিনের সভ্যতার সমন্বয় কি বোঝা যায়! আবার আসবার সুযোগ কিছুতেই হবে না।

এদের অর্কেস্ট্রেশন কিন্তু অ-পরিণত। সবগুলোই যেন তিলঙ না হয় মালশ্রী। মাত্র পাঁচটি স্বর ; কোমলের মধ্যে কেবল কোমল নিখাদ। প্রায় সবই ব্রাস্, একটা বাঁশের বাঁশি, আর খাড়া বেহালা, আর একটা বড় ড্রাম। একঘেয়ে লাগলো।

একটা নতুন পরীক্ষা করছে বাঁশের যন্ত্র দিয়ে, অথচ ফুঁ দিচ্ছে না। তিন চারটে মাথা তেরচা করে কাটা বাঁশ, নিচে বাঁশ দিয়ে জোড়া— সেইটের গর্ত দিয়ে একটা কঞ্চি নাড়ে। এক একটি যন্ত্র একটি স্বরের, যেমন

সা রে গা ইত্যাদি। কারুর হাতে দুটো— মোটা স্বরের। প্রায় জন পনেরো মেয়ে একত্রে বাজালো। প্রথম সুর জাতীয় সঙ্গীত, দ্বিতীয়টি গেরিলা গান— বীরের গৃহ-প্রত্যাবর্তন। কম্পোজিশন হিসেবে খাসা, কিন্তু বৈচিত্র্য নেই। এদের যুদ্ধের গানও নমনীয়, পেলব। সকলেই আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু স্কার্ট পরে কেন? তাও সবুজ! ব্যাণ্ডমাস্টারের কী দরকার ছিল। কালো 'বো' পরা আবার! ঐ একটি মাত্র ভিন্নরুচির পরিচয় পেলাম!

২৬. ৮. ৫৫

জাকর্তায় সরকারী কর্তৃপক্ষেরা খুব যত্ন করলেন। আমাদের ভারতীয় দূত তায়েবজীর সঙ্গে দেখা হলো। এখানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন। অনেক কথা হলো, বিদগ্ধ পুরুষ। ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের সজ্ঞানতা অত কম বলে আক্ষেপ করলেন। ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলাম! আমার ইম্প্রেশ্যন-গুলি নিয়ে লিখতে অনুরোধ করলেন।

দেশী চিত্রকরের আঁকা খানকয়েক পশ্চিমী ঢঙের ছবি দেখলাম। রং লাগাতে এবং বাস্তব সত্য আঁকতে এরা ভয় পায় না। দু'জনেই মুসলমান। এখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। কিন্তু আমাদের পরিচিত মুসলিম লীগের মুসলমান নয়। (একটা দার-উল-ইসলাম গড়ে উঠেছে।)

কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রার রহিম সাহেব অত্যন্ত কর্মিষ্ঠ লোক। বিস্তর স্ট্যাটিস্‌টিকস্ ঘাঁটা গেল।

প্ল্যানিং দপ্তরে গেলাম। শুনলাম অনেকটা আমাদের পরিকল্পনার ছকে ঢালা! অবশ্য অদল-বদল করা হয়েছে। তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো: (১) মুদ্রাস্ফীতি ও তার ফলে কালোবাজার, (২) শিপিং ও ট্রান্সপোর্ট; জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ খরচ করা হবে। (৩) ব্যালেন্স অব্ পেমেন্টের অবস্থা— ওদের ঘাটতি বাজেট চলছে। সরকারী খরচ কমাবার প্রয়োজন ভীষণ। এত ফালতু লোক রাখলে চলবে না শুনলাম। অথচ কমাতে গেলে ভোট পাওয়া যাবে না। ম্যান পাওয়ার বাজেট ও সেন্সস অব প্রোডাকশ্যনের কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। ওদের সমস্যা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক। হেগ কনভেনশ্যন বদলাতেই হবে। এদের 'ইকনমি'র টুঁটি চেপে রেখেছে ঐ কনভেনশ্যন। নতুন অর্থমন্ত্রী ড. সুমিত্রো। একজন ব্রিলিয়াণ্ট অর্থনীতিজ্ঞ। টিন্‌বার্গেনের ছাত্র। দেখা যাক কী করেন। ড. হাত্তাকে কো-অপারেশ্যনের জনক বলে লোকে।

ড সুমিত্রোকে 'প্ল্যানিং-এর পিতা' বলতে শুরু হবে কবে ?

এদের মধ্যে এখনও বিরোধী মনোভাব প্রবল,— গেরিলা যুদ্ধের ফলই তাই। নঞর্থক মনোভাবকে সদর্থক করে তোলাই এদের প্রধান কাজ। একমাত্র প্ল্যানিং-এর দ্বারাই সম্ভব। দু'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে আটক রাখবার সঙ্গে সঙ্গে দাম কমতে আরম্ভ হয়েছে। যথেষ্ট নয়। আমদানির র‍্যাকেট ভাঙতেই হবে।

২৮. ৮. ৫৫

সিঙ্গাপুরে রাত কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে কলোম্বো। ড. ভানু দাশগুপ্তের বাড়ি উঠলাম। পুরানো লক্ষ্মৌ-এর বন্ধু। একসঙ্গে চাকরি করেছি, টেনিস খেলেছি। চার পাঁচ বছর পূর্বে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে স্টেট সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অর্থনীতিক গবেষণার ডিরেক্টর হয়েছেন। সিংহলের সরকার এঁকে বিশিষ্ট নাগরিক অধিকার দিয়েছেন। প্রায় সাতাশ বৎসর আছেন, ও বেশ ভালোই আছেন। তাঁর মা'র বয়স ৮৩ বৎসর, চশমা পরেন না, নিজে বাংলা রান্না রেঁধে খাওয়ালেন। অমৃত লাগলো। খালের মাছের ঝাল, লাউ-চিংড়ি, সুক্তো, পেঁপে আর আদা দিয়ে ডাল। মা-ছেলের ভাব কী মিষ্টি ! একটি বাঙালি (পূর্ববঙ্গীয়) পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ভাষা বুঝতে কষ্ট হলেও তাঁদের মিষ্ট স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হলো না। আরেকজন বাঙালি (পূর্ববঙ্গীয়) ও কয়েকজন সিন্ধী ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয়ে অনেক খবর পেলাম।

এরা বড্ড সাহেব হয়ে গিয়েছে। পাড়াগেঁয়ে চাষীদের বাড়িতেও চেয়ার-টেবিল, পর্দা টাঙানো, ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। যা রোজগার করে তার চেয়ে বেশি খরচ করে এরা। একটু প্রকটভাবে কনজাম্পশনে বিশ্বাসী। আমদানি সামগ্রী অত্যন্ত সস্তা। ভারতবাসীর পক্ষে সুখের জায়গা নয়। ভয়ানক খুনখারাপী হয়। যে ক'জন সিংহলী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হলো, তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত ও অত্যন্ত দক্ষ। তাঁরা মেম বনে যাননি। অথচ টাইপিস্ট মেয়েও বিলেত যায়। মেয়েরাই যদি কিছু করতে পারেন।

গ্রামগুলো যেন পটে আঁকা ছবি। পুরানো মন্দির সংস্কার করে নতুন

হয়েছে। চল্লিশ বৎসর আগে পুরানোই ছিল। তবু চিনতে পারলাম।

'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব্ উইমেন'-এর সুবর্ণ জয়ন্তীতে বক্তৃতা দিলাম ভারতীয় মহিলার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে। কীভাবে (অর্থাৎ ক্যাপিট্যালিজম্ কথাটি উচ্চারণ না করে) আমাদের পারিবারিক জীবন ভাঙছে দেখালাম। নগরবাসী শ্রমিক-পরিবার আর শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার— এই দুটি নিয়ে বিচার করলাম। বক্তৃতার পর অনেকে প্রশ্ন করলেন। সিয়েরা লিয়ন, আইসল্যাণ্ড, ইরাক, সুইডেন, পাকিস্তান-এর প্রতিনিধিদের সতেজ বুদ্ধি দেখে অত্যন্ত খুশী হলাম। আমাদের লক্ষ্মী মেনন আগের দিন এমন সুন্দর বক্তৃতা দেন যে, তাঁর সুখ্যাতিতে সকলে মুখর। আমি আশ্চর্য হইনি, তিনি আমার বহু পুরাতন বন্ধু।

ভারতের নেতৃত্ব সকলেই মানে। কিন্তু গোপনে, কোথায় যেন একটু হিংসাও রয়েছে। আমাদের বিনয়ী হতে হবে— একটু বেশি করে।

৩০. ৮. ৫৫

দেশের মাটিকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। এত অল্প দিনে অত দেশ ঘোরা, অত পরিশ্রম করা, অত বক্তৃতা দেওয়া, অত জনের সঙ্গে মেলামেশার অর্থ হয় না। হাওয়াই জাহাজ আমাদের 'আমেরিকা-নাইজ্' করে দেবে।

একটা বিশ্বাস নিয়ে ফিরলাম— ঔপনিবেশিক মনোভাবকে যেতেই হবে। এ ভূত ছাড়াতেই হবে। ছাড়বার সময় ভূত হাত-পা ভেঙে দিয়ে যায়। তা যাক— না হয় নুলো খোঁড়াই হয়ে থাকা যাবে। তবু ভূতগ্রস্ত অবস্থার চেয়ে ঢের ভালো। স্বাধীনতার দাম না হয় দেবো! দুর্নীতি একটা দাম, অনিশ্চয়তা আরেকটা দাম, রাজনৈতিক দলের প্রাচুর্য আরেকটা দাম। এ-সব দাম আমরা দিচ্ছি, দেবো। কিন্তু তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। অতিশীঘ্র প্যাণ্ডোরার বাক্সকে রত্নগর্ভ পরিণত করতে হবে, প্রধানত নিজেদের সমবেত চেষ্টায়। নতুন বিদেশীর সাহায্য নিতে ভয় হয়। আর নয়!

ভারতের আত্মবিশ্বাস কিছু এসেছে। কিন্তু বিনয়ী হতেই হবে। আমাদের সংস্কৃতি এতদিন বাঁচিয়েছে, আরও কিছুদিন বাঁচালে মন্দ হয় না। ক্রমেই আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছি, প্রাণের দায়ে। আমাদের 'ভ্যালুজ' বা

মানগুলো মরেও মরছে না— এটা মস্ত কথা। ঐতিহ্যে দিক্-নির্ণয় নেই, কিন্তু প্রয়াসের সমর্থন আছে।

৯. ৯. ৫৫

আজ সকালে বাংলাদেশের বৃষ্টি শুখা আলিগড়ে নামলো। অমনি বিজলী বন্ধ। সরকারী হাইড্রো-ইলেকট্রিক থেকে আমরা বিজলী ধার নিই, অথচ কথায় কথায় বন্ধ হলে আপত্তি জানাই না বা জানাতে চাই না। গোঁজ গোঁজ করেই ক্ষান্ত হই। একেই হয়তো পণ্ডিতজী ছাত্রদের আত্মসংযম বলবেন! ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি ছিলেন না, তাই হয়তো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না।

শিক্ষার জন্য বিলেত যাওয়ার আমি বিপক্ষে, বিশেষত শৈশবাবস্থায় এবং পাবলিক স্কুলে। গত বৎসর য়ুরোপ যাবার পথে প্রায় জন পনেরো দেশী বালকবালিকা আমার সহযাত্রী ছিল। ক্লিফটন স্যার, হ্যারো স্যার, ঈটন্ স্যার, শ্রুজ্‌বেরী স্যার, উঞ্চেস্টার স্যার, (একটি মেয়ে) চেলটেনহ্যাম স্যার···এই শুনলাম। গুজব অথচ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এঁদের জননীরা বোধ হয় বিদেশিনী, তাই সম্ভবত জানেন না যে, জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায় থেকে রমন, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, বীরবল সাহানি, প্রশান্ত মহলানবিশ, ভাটনগর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের দেশী ডিগ্রীর ওপরই বিদেশী ডিগ্রী। সত্যেন বোসের আবার বিদেশী ডিগ্রীই নেই। একমাত্র ভাবা-ই খাঁটি বিদেশী শিক্ষাগ্রস্ত। সুরেন দাশগুপ্তমশায় যখন কেম্‌ব্রিজের ডক্টরেট পেলেন, তখন আমরা লজ্জিত হই। রাধাকৃষ্ণণের ওপর বিদেশী ডিগ্রীর বর্ষণ হয়। সমরফেল্ট সাহেব একবার একজন ভারতীয় ছাত্রকে বলেছিলেন, "ভোঁস— অর্থাৎ সত্যেন বোস থাকতে এই বিষয় শেখবার জন্য জার্মানিতে আসার অর্থ হয় না।" এবার শুনে এলাম ডেরেক্‌সন ঈডেনবার্গ টিনবার্গেন প্রভৃতির কাছে, সংখ্যাতত্ত্ব শেখবার জন্য কোনো ভারতবাসীর বিদেশে যাবার প্রয়োজন নেই, কলকাতার ইনস্টিটিউটই যথেষ্ট। কিন্তু মা-লক্ষ্মীরা কিছুতেই বুঝবেন না! বিলেত না হলে দূন-স্কুল। সেখানেও পাঁচ বৎসরের ধন্নার পর ঢুকতে পায়।

দর্শনশাস্ত্রের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত; (১) ডায়লগ,— কথোপকথন, আর (২) ডায়েলেক্‌টিক। ডায়লগ বিভিন্ন মনোভাব ও পরিশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা, আর ডায়েলেক্‌টিকে মতবাদের পার্থক্য উত্তীর্ণ হয়ে নৈর্ব্যক্তিক সত্যের

সন্ধান। শ্রদ্ধার পর সত্যের সন্ধান না-ও মিলতে পারে; এবং উত্তীর্ণ হওয়ার পথে অশ্রদ্ধা আসাও স্বাভাবিক।

উপনিষদ, প্লেটো থেকে গুরু-শিষ্য সংবাদ সব কথোপকথন। স্থফী, সাধু-সন্ত, যোগী-ঋষিদের এই আঙ্গিক। হেরাক্লিটাস, হেগেল, মার্কস্ থেকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক পন্থা সব ডায়েলেক্‌টিক। বিশ্বজনীন নিরালম্ব সত্যের নিষ্ঠা নিষ্ঠুর। কথোপকথনে তুমি তুমি রইলে, আমি আমি রইলাম। ভদ্রজনোপযুক্ত।

আজ সন্ধ্যায় পুরানো কথা মনে এলো। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের বাড়িতে (সমবায় ম্যানশনে) ছবির প্রদর্শনী খোলা হবে। তার প্রী-ভিয়্যু-এর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। ইন্দিরা দেবী আমাকে নিয়ে গেলেন। অবনীবাবু, গগনবাবু ও সমরবাবু আলখাল্লা পরে ঘুরছেন। হল্-এ দু'জন দীর্ঘাকৃতি ইংরেজ, উড্‌রফ আর কেস্টেভেন। অসিত হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন কর ছিলেন। অসিত হালদারের অপ্সরা ও দুর্গাশঙ্করের পলাশ ফুল, চৈতন্যদেবের মহাপ্রভু, নন্দলালবাবুর শিব, আর বোধ হয় তায়কান ও আরেকটি জাপানীর ছবি মনে ভেসে উঠলো। একপাশে গগনবাবুর খানকয়েক ল্যাণ্ডস্কেপ ছিল। তখন তিনি কিউবিজ্‌ম নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। নতুন ঢঙ বলে সেগুলিকে অন্যত্র রাখা হলো। এখন মনে হচ্ছে, তখন মনে হয়নি। কিউবিজ্‌ম-এর ঋজুতা আর স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে 'সেন্স অব্ মিস্ট্রি' খাপ খায় না। তখন সিঁড়ির মোড়ে কালো ঘোমটা অদ্ভুত লেগেছিল। অসিত হালদারের রেখা কাঁপে, নাচে, এলিয়ে পড়ে; আবার তীরের মতন ছোটে। খাড়া দাঁড়ায় কি মনে পড়ছে না। অসিতের আসলে কবি-মন। গাঙ্গুলীমশাই পাশে এসে দাঁড়ালেন। অসিত হালদারের ছবি লিরিক্যাল বললেন। কাজিন্স সাহেবও পরে তাই লিখেছিলেন। প্রকাণ্ড হল্‌টা বিদ্যুৎভরা। অত উত্তেজনা, অত চঞ্চলতা আর ফেরত পাবো না। যৌবনের জন্য? বাংলাদেশই ছিল বিদ্যুৎভরা। (কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় শিশির ভাদুড়ী বড়, না নরেশ মিত্র বড়— এই নিয়ে দু'দলের বচসা এক রাত্রে ঘুষোঘুষিতে পরিণত হলো। আরো আগে অমর দত্ত-দানিবাবু নিয়ে ছাতা চলতো।)

পরের দিন প্রদর্শনী খোলা হলো। গগনবাবু বললেন, দর্শকদের নিয়ে ঘোরাতে, যৎসামান্য বুঝিয়ে দিতে। কোণে একটা নক্ষত্রপাতের ছবি

ছিল— একজন সাহেব পা বেঁকিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছিলেন। আলোর মধ্যে একটি মূর্তি ছিল— গূঢ়ার্থ বুঝতে পারিনি, বোঝাতেও পারলাম না। ভদ্রলোকের গোঁফটা উঁচুতে তোলা। ভঙ্গিটাই দুষ্টুমি মাখানো— 'রেকিশ'। বোধ হয়, প্রমোদকুমারের ছবির সামনে এসে কথাবার্তা হলো। সাহেবের সাথে ইন্দিরা দেবীকে কে একজন পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইন্দিরা দেবী হাঁটু ভেঙে 'কার্টসি' করলেন। তখন বুঝলাম রোম্যাঁ রোলাঁ। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। পরে তাঁর বই পড়ি। একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী ফরাসী ভাষায় কথা কইলেন। সমরবাবু আমাকে অন্য ধারে নিয়ে গেলেন। আজকাল ক'জন সমরবাবুর নাম জানেন! অথচ চিত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতি— দুই ভাই ও রবিকাকার আবডালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। সমরবাবু ও গগনবাবুর মতন ভদ্র ও বিদগ্ধ জন দেখিনি। সেই গগনবাবুর জিব আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'বিচিত্রা'র এক আসর থেকে বেরুচ্ছি, হঠাৎ পাঞ্জাবি ধরে কে টানলো, ফিরে দেখি গগনবাবু। কী বললেন এক বর্ণও বুঝলাম না। মনে হলে চোখে জল আসে।

১০. ৯. ৫৫

পড়াবার সময় 'অবজেক্‌টিভিটি' কথাটা প্রয়োগ করলাম। ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট পড়াচ্ছিলাম। এটা নূতন বিষয়। পূর্বে নাম ছিল ইকনমিক হিস্ট্রি, এখন নূতন নাম দেওয়া হলো কেন বোঝাচ্ছিলাম। সেই প্রসঙ্গে হিস্ট্রির কথা উঠলো। র‍্যাঙ্কে বলতেন, ইতিহাসের একমাত্র আগ্রহ ও বিষয় তথ্য এবং তার পদ্ধতি 'অবজেক্‌টিভ', বৈজ্ঞানিক। গ্রোথ্-এর আলোচনা পদ্ধতি একটু পৃথক; সেটা বুঝতে হলে নানাপ্রকার মডেল তৈরি করলে সুবিধা হয়। ডেভেলপমেণ্ট আরেকটু ভিন্ন। এর মধ্যেকার ইতিহাস প্রগতিশীল; এবং প্রগতিবাদের অন্তরালে উন্নতি-অবনতির সংজ্ঞা প্রচ্ছন্ন থাকে। অথচ উন্নতি-অবনতি র‍্যাঙ্কের মতানুযায়ী তথ্য নয়। যদি তাই হয়, তবে অবজেক্‌টিভিটির মধ্যে মূল্যের স্থান আছে। ভ্যালুস আর ফ্যাক্টস, বাট্ অল্ ফ্যাক্টস্ আর নট্ ভ্যালুস্। মার্ক্স্ ধনিকতন্ত্রকে ভ্যালু-ফ্যাক্ট হিসেবে দেখেছেন। ডুয়সেন বলতেন, র‍্যাঙ্কে হ্যাড দি অবজেক্‌টিভিটি অব ইউনাক্। সত্যই তাই,— ঐ ধরনের মনোভাব নিয়ে ইকনমিক হিস্ট্রি পড়ানো যায়, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট পড়ানো অচল।

এই প্রসঙ্গে সোশ্যাল ফোর্সের আলোচনা করলাম। প্রায় বিশ বছর আগে যা লিখেছিলাম, তাতে আর মন সায় দেয় না। ফোর্স কথাটি এক্ষেত্রে কীভাবে গ্রহণ করা যায় বলবার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নীরব রইলো। কিন্তু ছাড়বো না, আরো দু'-একদিন বেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে। ঘণ্টার পর একটা গল্প শোনালাম।

কলেজে পড়বার সময় আমার কেমেস্ট্রি, ফিজিক্স, অঙ্ক প্রভৃতি ছিল। বি.এ থার্ড ইয়ারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমশাই পড়াতে এলেন। তিনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন এবং বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। সামান্য দু'-একটা কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা তো কেমিস্ট্রি পড়ে এসেছো, চার্লস ল-টা কি?' গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেলাম। আবার প্রশ্ন করলেন, 'এভোগ্যাডরোর হাইপথেসিসটা কি?' তাও মুখস্থ বললাম। 'আচ্ছা, এখন বলো দেখি ল আর হাইপথেসিস্ কাকে বলে, তাদের পার্থক্যটা কি?' সব চুপ। বড় বড় চোখ মেলে বললেন, 'অঃ, তোমাদের একটু লজিক পড়াতে হবে, পরে যন্ত্রপাতি নিয়ে কারবারের সুবিধে হবে।' সেই আরম্ভ হলো কার্ল পিয়ার্সন-এর গ্রামার অব সায়েন্স আর মঁরি পোঁয়াকারের সায়েন্স এণ্ড মেথড্। তিনমাস পুরো তাই পড়ালেন। এই গল্পটি শোনবার পর ছেলেরা হাসলে। বললাম, 'ভয় নেই, সে বিদ্যে আমার নেই।'

পুরাতন অধ্যাপকদের কথা মনে উঠছে। আমাদের সমবয়সী অনেক অধ্যাপক বিদ্বান, দিগ্‌গজ পণ্ডিত। কিন্তু কোথায় যেন আমাদের কিছুর অভাব আছে। হয়তো নস্টালজিয়া। ঠিক বুঝতে পারছি না। বিদ্যার গভীরতা? ব্রজেন শীলের বক্তৃতা ও তাঁর কথাবার্তা শোনবার অনেক সুবিধা আমার হয়েছিল। একটা ঘটনা লিখে রাখি। আমি তখন বি-এ ক্লাশে পড়ি। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছি, জুবিলী স্যানিটেরিয়মে একটা ঘর নিয়ে আছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ইংরেজী নাটক ও অভিনয়ের মহলা চলছে। সন্ধ্যার পর ড. শিশির পাল ঘরে এসে বললেন, 'ধূর্জটি, একটু বিপদে পড়েছি। কাল সকালে ব্রজেনবাবু আসছেন, ঘরের সুবিধে হচ্ছে না। পরশু সকালে তাঁকে ভালো কামরা দিতে পারবো। যদি কাল রাত্রের জন্য তুমি তোমার ঘরটা ছেড়ে দাও, বড়ই ভালো হয়।' আমার ঘরের সঙ্গে বসবার একটা ছোট্ট কাচের বারান্দা ছিল। 'নিশ্চয়ই, আমি ঐ বারান্দাতেই শোবো। সে তো আমার সৌভাগ্য!' ব্রজেনবাবু পরের দিন এলেন। ঠিক এলেন

নয়, ঝড়ের মতন ঢুকলেন। শিশিরবাবু ব্যাপারটা ব্রজেনবাবুকে বুঝিয়ে দিলেন। কিছুতেই রাজি হন না, তখন আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে এক জায়গায় থাকার গৌরব থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন ?'

'আচ্ছা, বেশ, বেশ, তুমি কি পড়ো ?'

'বি.এ পড়ি মাত্র। কিন্তু আপনার একটা বই পড়েছি।'

কলেজ স্ট্রীটের রাস্তার ওপর থেকে চার পয়সায় তাঁর 'নিও-রোমান্টিক মুভমেণ্ট ইন (বেঙ্গলী ?) লিটারেচার' (নামটা মনে পড়ছে না) কিনেছিলাম।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম আর হ্বার্থার-এর আলোচনার পর কীটস্ সম্বন্ধে সেখানে কিছু বক্তব্য আছে। আমি তখন কীট্‌সের খুব ভক্ত, অনেক কবিতা ও রচনার সঙ্গে পরিচিত।

তাই সাহস ভরে বললাম, 'আপনার কীট্‌স সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি আমার খুব ভালো লেগেছে।'

'ও বই কখনো পড়ে ! আমি তখন নাবালক ছিলাম। ও-সব ছেলে-মানুষী কথা এখন ভুলেই গিয়েছি।'

'আজ্ঞে না, আমাদের কাছে ঐ যথেষ্ট। তবে দু'-একটা কথা বুঝতে পারিনি।'

'কোন্‌টা হে ?'

'আজ্ঞে, আপনি লিখেছেন, কীট্‌সের সৌন্দর্যতত্ত্ব হেলেনিক। সেটা না বুঝলাম। কিন্তু তার পরে আপনি একটা সন্ধি করেছেন, **Indo-Sino-Mazaden philosophy of the East.** ও-সব কি ?'

সেই শুনে বিরাট এক হাসি। এমন ছাদফাটা হাসি এক অঘোর চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী দেবীর পিতা), আর অশ্বিনী দত্ত ছাড়া আর কারুর কাছে শুনিনি; হাসবার পর ব্রজেনবাবু দাড়িতে হাত বোলাতেন।

এতে হাসবার কি পেলেন, না বুঝে বললাম, 'আপনি বড় শক্ত শক্ত কথা প্রয়োগ করেন।' আরো হাসি !

'তা বুঝি জানো না— কার্জন সাহেব কি বলেছিলেন, **You say he is Seal, But he writes like a hippopotamus.** কার্জন সাহেব ইংরেজ, তাই মুখ ফুটে বলেননি, **he looks like one too.**' হাসি আর থামে না। বললাম, 'সিনো-টা কি ?'

'ওটা চীন।' তারপর আধ ঘণ্টা তান-হান-সুঙ-মিঙ ইত্যাদি কথার ছড়াছড়ি শুরু হলো। প্রতি যুগের সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচার চললো।

'আজ্ঞে Mazdean-টা কি ?' তার ব্যাখ্যাও আধ ঘণ্টা।

'কিন্তু ছাখ, ওটাতে আমার ভুল ছিল। ঐ যে হেলেনিক বলেছি সেটার ব্যাখ্যা করলে পারতাম। ওর পেছনে ছিল ক্রীট্, তারও পিছনে ইজিপশ্যন।' হাঁপিয়ে উঠেছিলাম মনে আছে। বহু পরে চৈনিক আর্ট সম্বন্ধে কিছু পড়ি; পরীক্ষার জন্য ঈজিপ্ট সম্বন্ধেও কিছু পড়তে হয়। তখন দেখলাম যে, কত মূল্যবান কথাই না সেদিন ব্রজেনবাবু একজন ১৭।১৮ বছরের যুবককে বলেছিলেন। বলবার কি আগ্রহ! (দিলীপকুমার একবার মহীশূরে ব্রজেনবাবুর অতিথি হন। সেখান থেকে তিনি আমাকে লেখেন, 'ধূর্জটি, ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে জানতে চাও তো এখনই এখানে এঁর কাছে চলে এসো।')

পরের, কিংবা আরো দু'-একদিন পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর।

স্যানিটেরিয়মে আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন, শ্রীভূদেব রায়। তিনি আমার বড়দার (নরনাথ মুখোপাধ্যায়) বন্ধু। বোধহয় সেইবার প্রথম দার্জিলিং-এ এলেন। আমি এর পূর্বে আরো দু'-একবার এসেছিলাম। সে যাই হোক, অবজার্ভেটরি পাহাড়ে ভূদেববাবুকে বরফ-ঢাকা চূড়োগুলো দেখাচ্ছিলাম। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা এইটে, আমার আঙুল যেধারে সেইটে।' ভূদেববাবু ঠিক ধরতে পারছিলেন না। এমন সময় পিছন থেকে গম্ভীরকণ্ঠে কে বলে উঠলেন, 'না, ওটা নয়— আমার ফিঙার ফলো করুন।'

দেখি, ব্রজেনবাবু। আমি বললাম, 'এই তো সার্ভে অফিসের তৈরি ম্যাপটা রয়েছে, তাই দেখলেই তো…'

'না হে না, ওটা ঠিক নয়।'

'স্যার, সার্ভে অফিস অতোটা ভুল করবে!'

'ওটা ভুল নয়, এর‍্যর।'

'কোথায় ?'

'আমার প্রথম অবজেক্শ্যন ফাইললজিক্যল…'

'সে কি! মাপা-জোপার সঙ্গে ফাইললজির সম্বন্ধ কোথায় ?'

'আছে, হে, আছে। ঐ জঙ্ঘা কথাটি ধরো। কথাটি সংস্কৃত, জন্ ধাতু থেকে এসেছে। অর্থাৎ ভারতীয়, অর্থাৎ অ্যাঙ্গল্ অব অবজরভেশ্যন হচ্ছে ইণ্ডিয়ান, নয় কি ?'

'নিশ্চয়ই…'

'তার ওপর কাঞ্চন…'

'হ্যাঁ, স্যার— যাকে পরমহংসদেব বলতেন কামিনীকাঞ্চন। কিন্তু

কাঞ্চনের জঙ্ঘাটা কি রকম ? ওটা কি ইনভারশুন, স্যার ?'

'ওটা ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল।'

তারপর রিফ্র্যাক্শুন, ডিফ্র্যাক্শুন্, রেয়ারিফ্যাক্শুন-এর অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। মোদ্দা কথা এই: মাপ-জোপ করতে হবে অন্তত পনেরো বিশ হাজার ফুট থেকে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এবং বেশি দূরে দূরেও নয়। সবচেয়ে বড় কথা, নেপাল-তিব্বতের দিক থেকে। সার্ভে আপিস তা করেনি। তারপর দেখতে হবে নেপাল-তিব্বতের লোকরা কোন্ শিখরটাকে কি বলে। এইটেই হলো ফাইলো-এ্যানথ্রপোলজিক্যাল রিসার্চের পদ্ধতি। ওদের ভাষা এবং ওদের অর্থ— এই ধরো...'

ধরবার সুযোগ হলো না, বৃষ্টি এলো। দার্জিলিঙের বিদ্যুৎ-চমকানো আমার মোটেই পছন্দ হতো না— আর ঐ রকম কড় কড় ঘড় ঘড়, একেবারে যাচ্ছে-তাই! যাই হোক্, রাত্রে খাবার পর ভূদেববাবু গা ঢাকা দিলেন। আমিও দরজা বন্ধ করে রিহার্সাল দিতে লাগলাম। ব্রজেনবাবু ততদিনে নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন। বোধ হয়, তিন চার দিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

হঠাৎ একদিন বেলা এগারোটার সময় ডাক পড়লো। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত পুঁথি। 'এই ছাখ...' কি আর দেখবো!

ব্যাপারটা এই: ব্রজেনবাবু রায়বাহাদুর শরৎ দাসের বাড়ি গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি শিখরের তিব্বতী নাম খুঁজেছেন এবং পাছে আমার সন্দেহ দূর না হয় ভেবে প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছেন! এ যুগে এ মানুষ হয়? এমন জ্ঞান-স্পৃহা, জ্ঞানের এমন বিশালতা, একটি বিদ্যার সঙ্গে অন্য বিদ্যার যোগ সম্বন্ধে এমন সচেতনতা, আর এমন বিনয় ও শিশুসুলভ সরলতা বর্তমান পণ্ডিতদের মধ্যে আছে কি?

তাঁরা বলেন, বিদ্যা বাড়ছে এমন দ্রুতভাবে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই দুষ্কর। নিশ্চয়ই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, জড়ো করা নয়— যোগ-সাধন। সেজন্য যোগসূত্রের সন্ধান হওয়া চাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যোগসূত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নির্বিকার। তার কারণ সামাজিক, বিদ্যার বৃদ্ধি নয়। য়ুরোপের নব যুগে ফিউডাল সমাজ নিশ্চয়ই ভাঙছিল। কিন্তু তখনও খ্রীস্টানী ভূয়োদর্শনের কাঠামো বজায় ছিল। কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে নতুন বৈশ্য সমাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাই না সে যুগে সর্ববিদ্যা-বিশারদ জন্মায়।

আমাদের দেশের ভূয়োদর্শনের সঙ্গে পশ্চিমী ভূয়োদর্শনের যোগ হয়নি,

যেমন হয়েছিল য়ুরোপের খ্রীস্টানী ও হেলেনিক ভূয়োদর্শনের সঙ্গে। তাছাড়া, এখানে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক-সম্প্রদায় সমাজের স্তর মাত্র, যদিও নতুন স্তর ছিলেন। য়ুরোপের বিশেষত ইংলণ্ড ও ইটালির নব্য শ্রেণীর মতো নব্য শ্রেণী ছিলেন না। তাই তাদের শ্বাস শীঘ্রই ফুরিয়ে গেল। তবু তাঁরা বিরাট ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিত্ব উৎকেন্দ্রিক হলেই সহজ-স্মরণীয় হয়। একটু পাগলামি চাই ; একটু এক্সেন্ট্রিসিটি, অডিটি না হলে মনে থাকবে কেন ? অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজের 'ডন্'-দের কত গল্পই না আছে। অবশ্য ওখানে এক রকম 'ক্যল্ট' হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ অবশ্য অন্য। আমি অতোখানি চাই না। তবু আমাদের ছাত্ররা আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের মতামত, আমাদের 'ওবিটর ডিক্টা' কি মনে রাখবে ? আমাদের য়ুগের বেলা কিছু হয়তো থাকবে। কিন্তু তার পরে ? ভট্‌চায্যিমশাইদের, মৌলবী সাহেবদের কত গল্পই না করেছি !

১২. ৯. ৫৫

আজকাল বাংলা দেশে সঙ্গীত সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু হয়েছে দেখে আনন্দ হলো। সুরেশ চক্রবর্তী ও অমিয় সান্যাল শাস্ত্রজ্ঞ ও করিতকর্মা। অমিয় সান্যালের অতিরিক্ত গুণ যে মজলিশী। একেবারে প্রমথ চৌধুরীর কৃষ্ণনগর। সুরেশের সংগ্রহ সমুদ্র-বিশেষ। অবশ্য পথপ্রদর্শক দিলীপ-কুমার। ইদানীং রাজ্যেশ্বর মিত্র বাংলা সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। আমার এখতিয়ার থাকলে এঁকে দু' বছর জলপানি দিতাম, যাতে মনপ্রাণ দিয়ে কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারতেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে এঁর মন্তব্যগুলির একটা স্ট্যাণ্ডার্ড আছে। নারায়ণ চৌধুরীর রচনা সুখপাঠ্য, কিন্তু বিচারে গণ্ডগোল থেকে যায়। তবু চিন্তা করছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শান্তিদেব ঘোষের মতামত অত্যন্ত মূল্যবান। সৌম্য ও সম্বন্ধে যা লিখেছে, তার চেয়ে সে অনেক বেশি জানে। লেখবার সময়ে সে ভুলতে পারে না যে, সে ঠাকুর বাড়ির ছেলে।

'পরিচয়ে' অশোক মিত্রের যামিনী রায় সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়লাম। অত্যন্ত ভালো লাগলো। শেষ মন্তব্য না করলেও পারতো অশোক। কোনো আর্টিস্টের কাছে কোনো য়ুগে কী প্রত্যাশা করে হতাশ হই, কী হয়েছি— এ সব কথার অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তাঁর চিত্রে দ্বন্দ্ব নেই নিশ্চয়।

কিন্তু যেখানে তিনি পৌঁছেছেন, সেখানে সমস্যার একটা কোনো উত্তর আছে কী নেই— এই হলো প্রশ্ন, যদি অবশ্য এই ধরনের প্রশ্ন করতেই হয়। আমার বিশ্বাস উত্তর আছে।

বিরোধের জন্য মানুষ বিরোধ চায় না। বিরোধ আছে, কিন্তু বিরোধের সঙ্গে বিরোধ-অবসানের আশা ও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যদি পৃথিবীতে শান্তি-আশার অস্তিত্ব স্বীকার করি, তবে সৃষ্টিতেও তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সব সময় রঙ্গমঞ্চের গ্রীন-রুম দেখাতে হবে, এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। যদি না থাকে, তবে দ্বন্দ্ব বিরোধ দুঃখ কষ্ট ক্লান্তি ফোটাবার দায়িত্ব যামিনীবাবুর নেই। অথচ যে তাঁকে জানে, সেই জানে যে কত বিরোধের মধ্য দিয়ে কত কষ্টের পর তিনি এগিয়েছেন, ছবি এঁকেছেন। অনেক ছবি তিনি আঁকেন নিশ্চয়ই। তাঁর মানে নয় যে, তাঁর সৃষ্টির পিছনে কোনো কষ্ট নেই। ছবিতে সে কষ্ট ফোটেনি, বরঞ্চ এইটাই তাঁর বাহাদুরি। দুঃখকে হজম করে শান্ত হওয়া— এইটাই ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্ব শুনেছি। তা যদি নাও হয়, তবু ডিগ্‌নিটি, পয়েজ-এর মূল্য নিশ্চয়ই আছে। (এটা আমি পাইনি আজকালকার রুশ সাহিত্যে ও চিত্রকলায়। আধুনিক চীনে সাহিত্যেও কমছে সন্দেহ হয়েছে।) যামিনী-দার বাড়িতে চীনা-আমেরিকান যে দুই-ই আসে ছবি দেখতে, সেটা পলিটিক্যাল ব্যাপার নয়, আর্টের ভ্যালু-র ব্যাপার।

এই পয়েজ, এই ডিগ্‌নিটি, এই স্থিতধিতা কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা নয়। অশোক ঠিকই ধরেছে যে, যামিনীদার ছবিতে একটা ডাইন্যামিক পয়েন্ট আছে। (সব বড় আর্টিস্টেরই সব ভালো ছবিতেই তা থাকতে বাধ্য।) কিন্তু তাই বললেই যথেষ্ট হবে না। সেই চলিষ্ণু বিন্দু থেকে কীভাবে গতির প্রসার হচ্ছে? এইটাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, প্রসারে ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটেছে কি না। তৃতীয় কথা, নতুন ভারসাম্য (ডাইন্যামিক ইকুইলিব্রিয়ম) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না। আমার বিশ্বাস, যামিনীদা প্রধানত সরল রেখার ব্যবহারে নতুন ভারসাম্য প্রস্তুত করে এসেছেন এত দিন। (যামিনীদার ছবিতে পুরুষের ও কখনও স্ত্রীলোকের শিরদাঁড়া খাড়া সোজা, কাঁধ শক্ত ও লম্বা, চোখ পটলচেরা অর্থাৎ সরল রেখা।) বাঁকা রেখা যখন ব্যবহার করেন, তখন সেটা যেন সম্পূর্ণ হতে চায়— এটাও সরলতার লক্ষণ। মিশরী ধরনের ছবির আঙ্গিকের তাই অর্থ। যামিনী-দার ছবিতে শান্তি আছে। শান্তিরসপ্রধান কিংবা শান্তিরসাত্মক বললে অন্য রসের অভাব মনে ওঠে। পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গিতে 'পয়েজ' 'ডিগ্‌-

নিটি' মানুষিক নয়, মনুষ্যোচিত—আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি, গাম্ভীর্য।

১৯. ৯. ৫৫

আজ সন্ধ্যায় ড. নুরুল হাসান তার উদ্বোধনী ভাষণ পড়লে। নুরুল হাসান ইতিহাসের ভালো স্কলার। অল্প বয়সে প্রোফেসর হয়েছে এবং হবার যোগ্য। বিষয় হলো ভারত ইতিহাসের মধ্য যুগের ঐতিহাসিক সমস্যা। ইতিহাস-দর্শন সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা বিচারের পর কুড়ি মিনিট কাল বিশেষ সমস্যার আলোচনা করলে। শেষাংশটুকু আরো বিশদ হলে ভালো হতো। বিকেলে ইশায়া বার্লিন-এর 'হিস্টরিক্যাল ইনেভিটেবিলিটি' শেষ করি। বক্তৃতার পর ব্লক-এর 'হিস্টোরিয়ান'স ক্রাফ্‌ট'-এর দুটি অধ্যায় আবার পড়লাম। নুরুল হাসান ও বার্লিন অক্সফোর্ড, আর ব্লক প্যারিস। ব্লক আমার প্রিয় ইতিহাস-লেখক। অল্প বয়সে মারা গেলেন, জার্মানরা গুলি করে মারলে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, জার্মান-বিরোধী দলের গুপ্ত নেতা। বইখানি অসম্পূর্ণ কিন্তু হীরের টুকরো। ইতিহাসের কার্য-কারণ সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ বই লিখতে চেয়েছিলেন, তা ঘটে ওঠেনি। একটি ছোট্ট অধ্যায়ে সামান্য ইঙ্গিত আছে।

নুরুল 'হিস্টরিক্যাল কজেশ্যন' নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। শক্ত হতো অবশ্য, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম। বার্লিন সাহেবেরও বয়স কম। অক্সফোর্ডে তাঁর বক্তৃতায় ভিড় হয় রীতিমতো। অনেকেই বললেন, সব চেয়ে ব্রিলিয়েন্ট 'ডন'। বেশি কথা বলেন, একই কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে, বারবার। কিন্তু মন আছে। ব্যক্তির দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঝোঁকটি সত্যই মূল্যবান। তাঁর 'এম্পিরিসিজ্‌ম'টাও সুস্থ। কিন্তু মার্কসিস্টরা যখন 'মেকিং হিস্ট্রি' বলেন, তখন কী অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন? 'ভ্যলগার মার্ক-সিস্ট'দের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই প্রকারের 'আণ্ট্‌স্যালি' খাড়া করা সততার পরিচয় নয়। অবশ্য এই চলছে পণ্ডিত মহলে।

অবশ্য গোড়ার দিকে মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্‌স এক প্রকার ডিটারমিনিজ্‌ম প্রচার করেছিলেন নিশ্চয়। চলতি মতবাদের বিপক্ষতা তাঁদের করতে হয়েছিল। কিন্তু পরে, বহুবার তার ব্যত্যয়ও দেখিয়েছেন। প্রথম উক্তির ভার নামানো শক্ত। ম্যাক্‌সমুলর এরিয়ান রেস প্রথমে লিখে পরে প্রত্যা-হার করেন, তখন আর কে শোনে! গান্ধীজীর হিন্দ স্বরাজে পশ্চিমী

যান্ত্রিক সভ্যতার বিপক্ষে অনেক কটু কথা লেখেন। পরে মত অনেকটা বদলালেন, তবু গান্ধী মানে মাত্র চরখা! রবীন্দ্রনাথের মেসেজ অব দি ফরেস্ট, আর্টিস্ট একাকী ('আমার ধর্ম'), কিন্তু কোনোটাই তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য নয়।

ব্যাপারটা বোধ হয় এই: মহাপুরুষেরা জনমতের বিপক্ষে নিজেদের মত খাড়া করবার জন্য একটু উগ্রভাবেই বলে থাকেন। নচেৎ লোকে গ্রহণ করবে কেন? আত্মসমর্থনও তো চাই! বার্লিন সাহেবের ব্যাপার অন্য। তাঁর নিজের মত কি বোঝা গেল না। তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্যের বলে তিনি নিজে যে একজন বিশেষ মন-সম্পন্ন ব্যক্তি তারই প্রমাণ হলো। এর পেছনে একটা অধ্যাপকসুলভ দম্ভ রয়েছে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নিজেদের ছোট গণ্ডির মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ঐ ধরনের ব্রিলিয়েন্স-এর প্রয়োজন ঘটে। বিশেষত অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে। সে যাই হোক, এম্পিরিসিজ্‌ম দর্শন নয়— দৃষ্টিভঙ্গি। বহু দৃষ্টিকোণের বহু ভঙ্গি। ইতিহাসের দর্শন সম্ভব কী না, তা নিয়ে বহু তর্ক আছে ও আরো চালানো যায়। র‍্যাঙ্কে ও ফিশার বলেছেন, ইতিহাসের ফিলজফি নেই, হওয়া সম্ভব নয়। আমার ক্ষুদ্র মতে— আছে ও সম্ভব। তবে ফিলজফির অর্থ ভূয়োদর্শন ও ইতিহাসের অর্থ মানব-সভ্যতার গতিবিধির চেয়ে অধিক হলেই মুস্কিল। আমার দলেও বড় বড় লোক আছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস (সভ্যতা অর্থে)— দর্শন সম্বন্ধে একটা বই ও গোটাকয়েক বক্তৃতা দিই ও প্রবন্ধ লিখি, ইংরেজীতে ও বাংলাতে। শেষে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। সেগুলো নতুন করে সাজাতে হবে···

কেন এমন হয়? কেন শক্ত জিনিস ধরতে চাই, কেনই বা ছেড়ে দিই? এক উত্তর— দম্ভ। খানিকটা সত্য, পুরোপুরি নয়। বাকিটা শিক্ষা। প্রথমে পারিবারিক শিক্ষা। সারাদিন মোকদ্দমা চালিয়ে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে বাবা আমাকে বললেন, মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে শোনাও। মর্লের লেখা গ্ল্যাডস্টোনের জীবনীও মধ্যে মধ্যে পড়তে হতো। তখন বয়স বোধ হয় দশ-এগারো। তিনি ব্যাখ্যা করতেন মিডলোথিয়ান ক্যাম্পেন-এর ডিস্‌রেলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণগুলি, সেই সঙ্গে বৃটিশ পার্লামেণ্ট আর কন্‌স্টিটিউশ্যন। মায়, ইংরেজী শব্দের উচ্চারণও শুধরে দিতেন।

তারপর স্কুলে ঈশান ঘোষের ইতিহাস আর নারাণবাবুর সাহিত্য

পড়ানো; কলেজে ফাদার পাওয়ার, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ, ক্ষেত্রমোহন, বিপিন গুপ্ত, ললিত বন্দোপাধ্যায়, তার সঙ্গে সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্ক আর কৈলাশ পণ্ডিতমশাই-এর সংস্কৃত পড়ানো, অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের কেমেস্ট্রি; বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টিফেন সাহেব, মনোমোহন ঘোষের ইংরেজী বক্তৃতা শোনা, তার ওপর ব্রজেন শীল, বিজয় মজুমদার, রমেশ মজুমদার, বিপিন সেন, অজয় দত্ত, সতীশ রায়; সেই সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, প্যাট্রিক গেডিস এবং দূর থেকে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র; বাইরে বাইরে অবনবাবু, গগনবাবু আর অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী, কুমারস্বামী, রাধিকা গোঁসাই, কেরামৎ খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, দুর্লভবাবু, আরো কতো! আমার মনে হতো, সকলেই ক্ষুদ্রে সন্তুষ্ট হতে বারণ করছেন। জানকীবাবু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পড়াতে গিয়ে প্লেটো-উপনিষদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশের অর্থনীতির আলোচনাও করেছি ও প্রমথ চৌধুরীর কাছে জমিদার-রায়তের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথাই শিখেছি। এমন কপাল যে, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও ঐ প্রকৃতির। বুদ্ধিবিদ্যার অসীমতাই আমার শিক্ষা। দুরাশা পোষণ করেই ক্ষান্ত হইনি। সেজন্য খেটেওছি। এটা গেল একদিক।

অন্যদিকে শেষরক্ষা করতে পারিনি। খানিকটা স্বাস্থ্য, খানিকটা অধৈর্য, খানিকটা পেশা অর্থাৎ অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনা। আজকালকার অর্থনীতি এতটা জটিল হয়ে উঠেছে যে, তার মূল কথাগুলি ধরবার চেষ্টায় নেশা হয়। যতই ইকনমিক্স পড়ছি, ততই নেশা হচ্ছে ও ততই মূর্খ হয়ে যাচ্ছি সন্দেহ হচ্ছে। এখন এমন অবস্থা যে-ধারে চোখ ফেরাই, সে-ধারেই না জানার পাহাড়। অথচ ছাত্রদের সব সময় সব কথা বলাও যায় না!

তা' হলে, দাঁড়ালো কি? কী আর দাঁড়াবে? উইলিয়ম জেম্স ক্লাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের মনে যা আসতো তাই বকে যেতেন। একদিন ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করলে, **'What then, Sir, is your conclusion?'**

জেমস উত্তর দিলেন,—

'Conclusion? Is the universe concluded that I should come to a conclusion?'

জীবনের অন্তে সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে ধস্তাধস্তি, রগড়া-রগড়ি। খেটে যাও আর ঘণ্টায় ষাট মিনিট বেগে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হও। ব্যস্! ফাদার পাওয়ার বলতেন, **Who cares!**

২৩. ৯ ৫৫

হেরাক্লিটাস পড়া গেল। এক পাদ্রি সাহেব হেরাক্লিটাস আর লাওৎসের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর ধারণা যে, দু'জনেই বছর পাঁচশ' পরে জন্মালে নিশ্চয়ই খ্রীস্টান হতেন। বিশ্বের পেছনে খ্রীস্টানী গোঁড়ামি লুকিয়ে রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার মধ্যেও উপনিষদ আছে, তবে তিলমাত্র গোঁড়ামি নেই। এথেনিয়ন স্বর্ণ যুগের কিছু আগে পর্যন্তও চিন্তা-শীল ব্যক্তিরা ভাবছিলেন, দেশ উচ্ছন্ন গেল, লোকে সত্যসন্ধানে বিমুখ হয়ে পড়েছে, জনসাধারণের অরাজকতা এসেছে ইত্যাদি। এইরকম বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণেই কি মানুষের মাথা খোলে? দরায়ুস হেরাক্লিটাসকে পারস্য দেশে আসতে নিমন্ত্রণ করেন। চিঠিতে আছে, 'গ্রীস দেশে গুণের কদর নেই। আপনি চলে আসুন, এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রকৃত সমাদর পাবেন।'

হেরাক্লিটাস যাননি। ভদ্রলোককে কন্‌স্টিটিউশনের খসড়া করতে অনুরোধ জানানো হয়। দেখা গেল, আর্টেমিসের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছেলে-দের সঙ্গে তিনি গুলি খেলছেন। 'আপনি এখানে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আরে মশাই, ছেলেমানুষি যদি করতেই হয়, তবে ছেলেমানুষদের সঙ্গে করাই ভালো।' জ্ঞানী লোক ছিলেন, প্রোসেস্‌-এ বিশ্বাস করতেন। সক্রেটিস পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য ঠিক ধরতে পারেননি। তবে তাঁর অগ্নি-দর্শনের মধ্যে এক মহান্ অনুভূতি রয়েছে। পারমেনাইডিস ও হেরাক্লিটাসের বিবাদ এখনও ফুরোয়নি। প্রাক্‌-সক্রেটিস দর্শন ও ধর্ম ভারতবাসীর মনোগ্রাহী।

এতদিন বেশ ছিল। সর্বনাশ করলেন ঐ অ্যারিস্টটল, ফিলজফির প্রথম প্রোফেসর! সাদা-কালোর মধ্যে 'কোল্ড ওঅর'-এর জনক ঐ অ্যারিস্টটল। 'Either-Or' পৃথিবীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এক পণ্ডিতের মতে আজকালকার উন্মত্ততার হেতু ঐ অ্যারিস্টটলের সিলজিস্‌ম। রাসেল বলছেন, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তা' অ্যারিস্ট-টলের শিষ্যবৃন্দের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই। হেরাক্লিটাসের যুক্তিপদ্ধতি ডায়েলেক্‌টিক, আমাদেরও আসীৎ-অনাসীৎ একত্রে। 'ক কখনও একত্রে ক ও ক নয় হতে পারে না' যদি সত্য হতো, তবে প্রেম বস্তুটা জগৎ থেকে উবে যেতো। শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যেক জিনিসই অন্য স্তর থেকে দেখতেন। প্রকৃত সমদর্শী হতে গেলে উপরে উঠতে হয়।

২৪. ৯. ৫৫

পুরাতন গেজেটিয়ার নতুন করে লেখার প্রয়াস চলছে। এখানকার কলেক্টর জনকয়েককে ডেকেছিলেন। শহরের মাতব্বরদের মধ্যে বহু ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলো। সকলেই খুশী। খুশী তো হলেন, কিন্তু ঘাড়ে কাজ চাপলো। সরকার এক পয়সা খরচ করবেন না। অথচ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক আরো কত কী-র পরিবর্তনের ইতিহাস চান। থুতুতে ছাতু ভেজে না। আদমশুমারির কাজে এটা জুড়ে দিলে হতো। এইখানে বাংলা জিতেছে। মৌর্য যুগে আদমশুমারি বাৎসরিক ব্যাপার ছিল। তার ওপর সরকার আলিগড়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসও চান। কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে। সরকারী ইতিহাসের আমি বিপক্ষে। তবে প্রধানমন্ত্রী ড সম্পূর্ণানন্দ সত্যকারের শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি সত্য কথা বলেন ও সহ্য করেন। দেখি কতদূর এগোয়! এ সম্বন্ধে আমার অন্য ধারণা। জনগণের ইতিহাস এখানে কে লিখবে! মালমশলা যোগাড় করতেই বছর কয়েক লাগবে। তার ওপর পরিবর্তন। প্রায় দুঃসাধ্য, যদি না একটা বড় টীম এই কাজে লেগে থাকে। ক্রোচ-এর মতে ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস। বড্ড হেগেলবাদী। আমার মনে হয়, ইতিহাস স্বাধীনতা ও নিয়তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

ইতিহাস বিজ্ঞান-সম্মত অনেকটা, বাকিটা কবিতা। অর্থাৎ কবিতা হিসেবেও দেখা যায় এবং কবিতা যতদূর বোঝা যায়, ততদূর ইতিহাসও বোঝা যায়। পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাসের মূল সূত্র হয়তো অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স-এর মধ্যে আছে। অন্তত স্পেঙ্গলার, টয়েনবির রচনা পড়লে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আর. পি. ব্ল্যাকমার লিখছেন।

> ...We have Aristotle frankly at work in Toynbee's version of his Poetics. ..For Toynbee constantly sees the action in his history in the terms of Aristotelian poetics—especially in hamartia or the tragic fault by which we explain and even excuse but cannot justify human action, in anagnorisis or the blinding recognition by which we see the motives of our own actions and natures, and in peripeteia or the reversal of role where we find both our motives and our fates were far deeper in

ourselves and outside ourselves than we had known ; and the passage of history in each of the countries named above as seen through these terms comes alive as praxis or action.

পরে আরো অনেক কথা লিখেছেন ব্ল্যাক্‌মার···

আমার মনে হচ্ছে : (১) এই ধরনের মন্তব্য পশ্চিমী সভ্যতার এক ধরনের ঐতিহাসিকের প্রাথমিক মনোভাব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। টয়েনবি, স্পেঙ্গলার, হেগেল, এমন কী মার্কস্— যিনি গ্রীক ট্র্যাজেডির অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন— এঁদের মধ্যে হ্যামার্টিয়া, আনাগণরিসিস্, পেরিপেটিয়ার আমেজ নিশ্চয় আছে। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ? অবশ্য ঐ ধরনের ভারতীয় ঐতিহাসিক নেই। কেবল তাই নয়, কর্তারা বলেন, আমাদের ইতিহাসই নেই। সে যাই হোক, আমাদের ইতিহাসের ট্র্যাজিক ফল্ট কি ? জাতিভেদ, মুসলমান রাজত্ব, অন্তর্বিবাদ, দার্শনিকতা ? সংস্কৃত কাব্যবিচার অনুযায়ী শান্ত রসই আমাদের সভ্যতার মূল রস নয় কি ? বহুর মধ্যে একের সন্ধান ? আমাদের কাব্যবিচারে ট্র্যাজেডিই নে, কারণ ইতিহাসের দুর্ঘটনাকে ঐ ধরনের ট্র্যাজেডি হিসাবে বোধ হয় কখনও ধরিনি।

৫. ১০. ৫৫

লক্ষ্ণৌ-এ বেশ কাটানো গেল, এক হিসেবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলাপ-আপ্যায়ন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু নতুন চিন্তার খোঁজ পেলাম না। চিন্তা করবো কখন ? প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত! এমন সর্ব-ব্যাপী ব্যর্থতা আমার কল্পনাতীত। আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে, ঠিক অবসর নেবার মুখে মুখে আলিগড়ের নিমন্ত্রণ পেলাম। আর এক বছর থাকলে সন্ন্যাসরোগে মারা যেতাম। এলাহাবাদের ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে লক্ষ্ণৌ-এর ছাত্ররা টোকেন স্ট্রাইক করলে শুনলাম। কোনো গোলমাল হয়নি। এ-সব আমার অপছন্দ। তবু লক্ষ্ণৌ-এর ভদ্রতার তুলনা হয় না।

রাত্রে একটি মিরাসী ঘরের মেয়ের গান শোনা গেল। মেয়েটির বাবা বললেন, মিরাসী ওস্তাদ আর কেউ নেই। বেশি কিছু জানে না, কিন্তু অপূর্ব কণ্ঠ। যেমন জোরদার, তেমনি দরদী। পুরানো বাড়ির পুরানো

বৈঠক। যেন বেচারিকে কখনও মাইকের সামনে গাইতে না হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্নেহ অধ্যাপকদের শ্রেষ্ঠ, বোধ হয় একমাত্র সম্পদ। যে-সব ছাত্রকে রিসার্চে লাগিয়ে এসেছিলাম তাদের উৎসাহ কমেছে সন্দেহ হলো।

ডাক্তার দেখালাম। সকলে বললে, চুপচাপ শুয়ে থাকতে। চা-কফি-সিগারেট খেতে বারণ করলে না। লক্ষ্ণৌ-এর ডাক্তার ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো শহরের ডাক্তার কী অতো বুঝদার, অত ভদ্র হয়। মস্কোর ডাক্তাররা সব বন্ধ করে দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, গাইডদের পর্যন্ত হুকুম হয়েছিল দেখতে যেন সিগারেট-চা না খাই। ঐ এক জায়গায় হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলাম রেজিমেণ্টশনের অর্থ। শেষকালে আধ ঘণ্টা অন্তর স্নানের ঘরে যাওয়া। বলে কিনা ভড্‌কা সিগারেটের চেয়ে কম ক্ষতিকর! বলে কিনা সিগারেট খেলে ক্যান্সার হবে! আমি সিগারেট খেয়ে ক্যান্সারই করি আর যাই করি, সেটা আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আমার হিউম্যান ডিগ্‌নিটি, আমার কন্‌জিউমারস্‌ সভারেন্টি! ওপ্রকার চিকিৎসা ভারতবর্ষে চলবে না। ভারতবর্ষে চলে তো লক্ষ্ণৌ-এ কখনও চলবে না। এমন স্বাধীন শহর হয় না! হজরতগঞ্জের রাস্তার ওপর দল বেঁধে দাঁড়িয়ে গল্প করবো, মোটর চাপা দিক দেখি! লক্ষ্ণৌ শহরে মোটর চাপা দেখিনি বত্রিশ বৎসরে। সকলে চাপা পড়ে মরতে তৈরি, অথচ কেউ মরছে না, কারুর গায়ে আঁচড় পড়ছে না! গাড়ি থামিয়ে নেমে অনুরোধ করুন, 'একটু মেহেরবাণী করে যদি···', অমনি মাফ চেয়ে ইঞ্চিখানেক সরে দাঁড়াবে। এই যে মৃত্যু ও জীবনের সঙ্গে মধুর বোঝাপড়া, এই তো স্বাধীনতা, এই তো বিশুদ্ধ ডিমক্রাসি, এই তো ভদ্রতা।

রাত্রে আলি আকবরের স্বরোদ শুনলাম। অবশ্য রেডিওর লং রেকর্ড। এ-পন্থাটা ভালো। আমাদের সঙ্গীত পনেরো মিনিটের আগে তাতে না। আলাপেই পনেরো কুড়ি মিনিট অন্ততপক্ষে। তারপর অস্থায়ী আরো পনেরো। তবে আধ ঘণ্টার পর যেন একঘেয়ে হয়ে যায়। বয়সের দোষ কি আর কিছু? যুবা বয়সে এম্‌দাদ খাঁ'র পুরিয়া আড়াই ঘণ্টা ধরে শুনি। তখন ক্লান্ত হইনি। তাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ, পৌত্র বিলায়েৎ খাঁ'র সেতার অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি। এম্‌দাদের 'ঘরানা' আমার জীবদ্দশায় তৈরি হলো। এ ঘরের সৃষ্টিশক্তি প্রচুর। তেমনি আলাউদ্দিন, আবদুল করিম খাঁ'র ঘরের। এক এক সময় মনে হয়, আলি আকবর, রবিশঙ্কর একটু

বেশি পরীক্ষাশীল। অর্থাৎ সব মিশ্রণ আমার ঠিক কানে বসে না। নিশ্চয়ই আমার কানের দোষ। পরীক্ষা চলুক, পরে কানে বসবে, রূপ স্বকীয় হবে। গোটা কয়েক হবে, গোটা কয়েক হবে না, তাতে কী আসে যায়! 'মেনি আর কল্ড ফিউ চোজন্'। ছাত্রদের বেলাও তাই। প্রাকৃতিক নির্বাচন আর সামাজিক নির্বাচন দুটো এক না হলেও পদ্ধতির মিল আছে তাদের মধ্যে। পার্থক্য বুদ্ধির প্রয়োগে। অবশ্য বুদ্ধিরও পরীক্ষা আছে। সেটা চলছে। সাঙ্গীতিক বুদ্ধি আর লেখাপড়ার বুদ্ধি এক নয়। তবু সাধারণ বৈদগ্ধের একটা মূল্য আছে মনে হয়। তার ফলে পরীক্ষার প্রবৃত্তি জাগ্রত থাকে এবং পরীক্ষার রীতি-নীতি বোঝা যায়; তার ওপর দখল আসে, ভুল ভ্রান্তি কম হয়।

আমার মনে হয়, মুঘল চিত্র আর খেয়ালের ধর্ম অনেকখানি এক। রাজপুত চিত্র, মাড়োয়ারি লোকসঙ্গীত আর চারণ-বর্ণিত ইতিহাস; অষ্টা-পদী, কীর্তন, পট আর বিষ্ণুপুরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য— প্রতি তিনটির মধ্যে যেন একই সূত্র রয়েছে। সেই সূত্র ধরতে পারলে নতুন সৃষ্টির রীতি-নীতিও বোঝা যায় মনে হচ্ছে। রাইক্স-মিউজিয়মের সপ্তদশ শতাব্দীর ছবির সঙ্গে খালের ধারে বণিকদের আপিস-বাড়ি, গুদোম, বসতবাড়ির মিল ঘনিষ্ঠ। অবশ্য তিনের কোনোটা বেশি খোলে। একজন বিদেশী অধ্যাপক আমাকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন, "কেন কোনো দেশে কোনো একটি যুগে একটি বিশেষ কোনো আর্ট অন্য আর্টের চেয়ে বেশি ফোটে?" ব্যাপারটা ঘটে দেখেছি কিন্তু তার সামাজিক ব্যাখ্যা জানি না···ভেবে কূল-কিনারা পেলাম না। সামাজিক ব্যাখ্যা অচল না কি? অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও মাথায় এলো না। সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ্ আর্টের বেলায় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কিন্তু সবচেয়ে সোজা। একটা দার্শনিক আবহাওয়া? যুগাত্মা? অনেক জার্মান পণ্ডিত তাই বলতেন। একটা ব্যাখ্যায় সবটা বোঝা যায় না। কিছু দৈবের খেলা আছে। প্রতিভাকেও বাদ দেওয়া যায় না তবে আমি জোর দিতে রাজি আছি ছকের ওপর, একটা প্যাটার্ন নক্সা, একটা নেট-ওয়ার্কের ওপর।

অগস্ট লুস্ক্-এর 'ইকনমিক্স অব্ লোকেশ্যন' পড়তে আরম্ভ করেছি। ওখানেও সেই সিস্টেম অব নেট-ওয়ার্কস্-এর আলোচনার পর কতকগুলি নূতন ফ্যাক্টর-এর বিচার। ফিরোজাবাদে কেন অতো চুড়ি তৈরি হয়? কাঁচামালের কোনো সুবিধে নেই, রেলওয়ের ভাড়ার সুবিধেও নেই, অথচ ভারতবর্ষের মেয়েরা যত চুড়ি পরে, তার শতকরা আশি ভাগ ফিরোজা-বাদের। অর্থাৎ একবার শুরু হলে এবং অন্যান্য সুবিধে থাকলে উৎপাদন

চলতে থাকে, তারপর বাড়ে। তবু নক্‌সাটাকে কারণ বলতে মন চায় না। অবশ্য কারণ মানে আদিম কারণ নয়। তবু যেন মন আদিম কারণই খোঁজে। মধ্যযুগীয় মনোভাব বটে, তবু ফিল্ড-থিওরিতে যেন মন ভরে না। কারণ আর উপকরণ, এই দুটোর মধ্যে একটাকে ছাড়তে হয়। ওটা সপ্তদশ শতকের ডাচদের ফিল্ড অব্‌ বিহেভিয়র, আর গতি ফিল্ড অব্‌ ইকোয়েশুন্স না হয় বুঝলাম। তবু কেন এটা, অন্যটা নয়?

লুস্‌ক্‌ পড়ছি। দেশের প্ল্যান-ফ্রেম তো তৈরি হলো এবং পার্সপেক্‌টিভ প্ল্যানিং-এর জন্য তোড়জোড় হচ্ছে। অত্যন্ত সুখের কথা। নতুন প্রদেশ কী হবে এখনও জানা যায়নি, তবে রিজ্যনাল প্ল্যানিং আর ব্যালেন্স না সম্ভব হলে কিছুই হলো না। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্ল্যান তৈরি হবার পর রিজ্যনাল ব্যালেন্স-এ পরিণত করা হয়। একে ব্রেক-ডাউন বলে। অতএব এখান থেকে লোকেশুন-স্টাডি আরম্ভ করা হোক। প্ল্যানিং কমিশনের কাজে এখনও নতুন ভূগোলের জ্ঞান প্রবেশ করেনি। অর্থনীতিবিদ্‌রা কত-দূর পারবেন বুঝতে পারছি না।

গ্রোথ-মডেল নিয়ে সেমিনারে ঘণ্টা দুই আলোচনা হলো। আবার কাল হবে। হ্যারড-ডোমার-সিঙ্গার প্রভৃতির প্রবন্ধ পড়া ছিল। আলোচনা তো হলো। কিন্তু কীন্‌স-এর ব্যবহৃত 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' কথাটি কেবলই মনে পড়ছিল। স্ট্যাটিক আর ডাইন্যামিক— কথা দুটিরই বা অর্থ কি? অণু ও তরঙ্গ পৃথক স্তর যেমন, এও কি তাই? অন্য উন্নত বিজ্ঞান থেকে প্রত্যয় ধার করার বিপদ আছে। ফোর্স, রেসিস্টান্স কিংবা ফ্রিকশুন, ইকুইলিব্রিয়ম, প্রোসেস্‌ প্রভৃতি অঙ্ক কিংবা ভূতবিদ্যার প্রত্যয়গুলি কি অর্থনীতির বেলায় খাটে? আমরাও ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করছি, কিন্তু এক অর্থে? মনে হয় না। এফ. এইচ নাইট তাঁর 'এথিক্‌স অব্‌ কম্পিটিশুন' বই এর স্ট্যাটিক্‌স এবং ডাইন্যামিকস নামক অধ্যায়ে লিখছেন:

> Our general conclusion must be that in the field of economic progress the notion of tendency towards equilibrium is definitely inapplicable to particular elements of growth and with reference to progress as a unitary process or system of interconnected changes is of such limited and partial application as to be misleading rather than useful. This view is emphasized by reference to the phenomena covered by the loose term 'institution'.

এইসব ঘটনার ইতিহাস আছে। কিন্তু যে কাল-বৃত্ত ইতিহাসের বিষয়, সেখানে প্রাইস্-ইকুইলিব্রিয়ম প্রভৃতি প্রত্যয় অপ্রযোজ্য। তিনি তাই বলেন যে, ইতিহাসের মূল পরিবর্তনগুলির আলোচনায় শক্তি, প্রতিরোধ এবং গতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট শব্দগুলি এবং গতানুগতিক যান্ত্রিক তুলনার ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করে আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। নাইট সাহেবের মাথা ঠাণ্ডা, আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। কিন্তু প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল বই-এর আকারে ১৯৩৫ সালে। তারপর অর্থনীতিবিদ্‌রা বুঝেছেন যে, মেকানিক্যাল অ্যানালজিকে কিছু অদল-বদল করা চাই। তাই 'গ্রোথ' শব্দটির প্রয়োগ। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা 'চেঞ্জ' কথাটি ব্যবহার করছেন। অর্থনীতিবিদ্‌ এখনও ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, ইকনমিক হিস্ট্রি কথাগুলি ছাড়তে পারেননি। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এখনও ঐ চলছে। 'গ্রোথ'-ব্যাপারে দিকনির্ণয় নেই। দিক, ডিরেকশ্যন, কেবল অ্যাঙ্গল বিট্যুইন চেঞ্জেস। কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট-এর নিশ্চয়ই একটা দিক আছে। 'প্রোগ্রেস্' কথাটি তো ছেড়েই গিয়েছে। তেমনি ইকুইলিব্রিয়ম হলো প্রোসেস্— তার বিলম্বিত লয় হলো গিভ্‌ন কণ্ডিশ্যন, যার মধ্যে একটা, কী তারো বেশি প্রোসেস্ দ্রুত লয়ে চলছে একটা চলন্ত সাম্যের দিকে। তা তো বুঝলাম (অর্থাৎ কিছুই বুঝলাম না), কিন্তু আমাদের কি প্রয়োজন ? চেঞ্জ, গ্রোথ, ডেভেলপমেণ্ট, প্রোগ্রেস— কোন্‌টার দিকে বেশি ঝোঁক দিলে ছাত্ররা ভবিষ্যৎ ভারতের স্রষ্টা হবে ?

আমার মনে হয়, ডেভেলপমেণ্ট-এর দিকটাই জোর দেওয়া ভালো। তারই অঙ্গ হবে চেঞ্জ, গ্রোথ ইত্যাদি। পাঠ্যতালিকা সব বদলে দিয়েছি ঐ কথাটি মনে রেখে। ম্যাক্রো-ইকনমিক্‌সটাই প্রধান হোক। এক ধারে মার্জিনাল কস্ট নিয়ে অধ্যাপকরা ব্যস্ত আর ওধারে সরকার মহোদয় গড়-পড়তা খরচ অনুসারে সংসার চালাচ্ছেন। এইসব নানা কারণে গ্রোথ-মডেল তৈরি করা যেন একরকমের খেলা মনে হয়। বেশ মজা লাগে ; কিন্তু ঐ মজাই ! এল্‌কেমি যেমন পরে কেমিস্ট্রি হয়েছিল, তেমনি হয়তো মডেল-নির্মাণ থেকে কোনো না কোনো দিন ইমারত তৈরি হবে। এই আশা-বিলাসকেই আদর্শবাদ নাম দেওয়া হয়। আমরা সত্যই বোকা বনতে সদাই রাজি।

জে. আর. ক্যাণ্টর বিজ্ঞানের ইতিহাসের তিনটি স্তর দেখাচ্ছেন :— (১) সাব্‌স্ট্যান্স-প্রপার্টি স্টেজ, (২) স্ট্যাটিস্টিক্যাল কো-রিলেশ্যন স্টেজ এবং (৩) ইন্টিগ্রেটেড ফিল্ড স্টেজ।

বেশ কথা ; ফিল্ড-স্টেজে পৌঁছানোর সঙ্গে সর্বগত নিয়ম বা সূত্রের বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। তখন দাঁড়াবো কোথা ? ফিল্ড-এ ? সেটাও তো মাত্র ফ্যাংশনাল কো-রিলেশ্যন ! ক্রমেই পায়ের নিচে মাটি জল আর জল হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। কেবল তাই নয়, অনুবন্ধগুলো তো বিশেষ—তা অণুই হোক আর গুচ্ছই হোক এবং প্রতি বিশেষের ইতিহাস পৃথক। ফিল্ড-স্টাডির ডাইন্যামিক সূত্রগুলো কি ? অবশ্য আজ একটা ফিল্ড-স্টাডি করলাম, কিছুকাল পরে সেইটাই আবার 'স্টাডি' করলাম, এতে খানিকটা গতির প্রকৃতি বোঝা যায়। রেডফীল্ড আর লিউইস মেক্সিকোর এক গ্রাম নিয়ে তাই করছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ফিল্ড-টা আর ঠিক সেইটা রইলো না। তৎসত্ত্বেও ইকলজিক্যাল স্টাডির মূল্য খুব বেশি।

ছাত্রদের নিয়ে সার্ভে করাচ্ছি। টেক্‌নিক খানিকটা শিখেছে। কিন্তু মূলে যুক্তির ফাঁকি— ফাঁকি ঠিক নয়, প্যারাডক্‌সটা রয়েই গেল। আমি চাই ছাত্ররা সামাজিক সত্তার সম্পর্কে আসুক। এই সম্পর্কে নেই বলেই তারা নিরাগ্রহ, অ-সংযত। তবু একদিন তাদের বলতেই হবে যে, সার্ভের কোনো আঙ্গিকের সাহায্যেই গতির ধর্ম বোঝা যায় না। প্রত্যেক সার্ভে স্ট্যাটিক হতে বাধ্য। অথচ দেশ দাঁড়িয়ে নেই, চলিষ্ণু এবং আমার বিশ্বাস এগুচ্ছে— অন্তত দেশের অগ্রস্গতি চাই, ছাত্রদেরই মাধ্যমে। ঠিক বুঝি না, কী করা উচিত।

৭. ১০. ৫৫

আমেরিকান এনথ্রপলজিক্যাল এসোসিয়েশন থেকে ভিলেজ ইণ্ডিয়া—স্টাডিজ ইন দি লিট্‌ল কম্যুনিটি, এডিটেড বাই ম্যাকিম ম্যারিয়ট বেরিয়েছে। রেডফীল্ড আমাকে 'লিট্‌ল কম্যুনিটি' নামে পুস্তকাকারের বক্তৃতাগুলিও পাঠিয়েছেন। ম্যারিয়ট এই আলিগড়ের পাশে কিশনগঢ়ী নামে এক গ্রামের সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রায় এক বছর এখানে ছিলেন। অনেক তথ্য শিখলাম। বেশ লেখা, কোথাও কোথাও একটু ছেলেমানুষি আছে। পূজা-পার্বণের 'স্যাংস্কৃটিক ট্র্যাডিশ্যন' বস্তুটা কি ? পুরুত ঠাকুরের মন্ত্রপাঠ ? যাই হোক, গ্রামটা যখন জানি না, তখন সত্য-মিথ্যার বিচারে আমার অধিকার নেই। আর একটি প্রবন্ধ মজার—'Notes on an approach to a study of personality formation in a Hindu village in Gujrat'. লেখক খেটেছেন খুব। পার্সন্যালিটির

বাংলা কি ? ওঁদের সভ্যতার তাড়ায় ওঁদের ব্যক্তিগত জীবন বিক্ষুব্ধ, ছিন্ন-ভিন্ন। তাই পার্সন্যালিটির চর্চা। আমি একাধিক আমেরিকান পরিবারের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়ে দেখেছি, একাধিক আমেরিকান রিসার্চ স্কলারের সঙ্গ পেয়েছি। কেমন যেন ছেমো-ছেমো! আমাদের সমস্যা অন্য রকমের। পার্সন্যালিটি রিসার্চ, টেন্‌শন রিসার্চ প্রভৃতির বিশেষ কোনো অর্থ নেই আমাদের কাছে। তবু ঐ ধরনের রিসার্চ করতেই হবে। ঐতেই সহজে টাকা আসে এবং আমাদের অধ্যাপকরা স্ফীত হন।

রিসার্চের নামে আমাদের দেশে অনেক বুজরুকি চলছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞা-নের বিষয়ে আমি অজ্ঞ। সমাজ সংক্রান্ত গবেষণার (সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ) বিষয়ে কিছু কিছু খবর জানি। বিষয়গুলি কেমন যেন হাওয়া-হাওয়া, অ-বাস্তব, অনেক সময় মনগড়া। তা নিয়ে কারুর বহুরাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থায় কেটেছে বলে মনে হয় না। ছাত্র এম.এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী হয়ে গিয়েছে ; 'কিন্তু স্যার, আমার ভয়ানক আগ্রহ।' 'কোন্ বিষয়ে ?' 'স্যার, বিষয় আমাকে বলে দিন। আমি খুব খাটতে পারি, স্যার। আপনি যা বলবেন, তাই করবো।' হয়তো সঙ্গে এক ঠোঙা ডালমুট কিংবা আতর মাখানো পেড়া এনেছে। 'তবু তারতম্য তো আছে।' 'তা যদি বলেন, স্যার তবে আমি অমুক পেপারে বাষট্টি পেয়ে-ছিলাম।' ধরা যাক, শ্রমিক কিংবা কৃষি-সমস্যা। 'শ্রমিকদের কোন্ সমস্যা ?' তারপর শ্রমিকদের দারিদ্র্যের বর্ণনা চললো। শুনতে হয়। পরে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমার হৃদয় অত্যন্ত করুণ, তোমার ন্যায়জ্ঞান উন্নত, যুবকদের যা হওয়া উচিত। তোমার বাড়ি কোথায়, বাবা ?' কোনো এক গ্রামে। 'তোমার বাবা কি করেন ?' 'দোকান আছে গম আর গুড়ের।' 'গবেষণা করতে বছর তিনেক লাগে জানো তো ? এ ক'দিন কিসে চলবে ?' 'সেই-তো বিপদ, স্যার। আজকাল গমের দাম কমে যাচ্ছে, দোকানে কোনো লাভ নেই।' 'তোমার ভাই-বোন ক'টি ?' এক গণ্ডার কম কখনও শুনিনি। 'তোমাদের অঞ্চলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিক খোলা হয়েছে ?' ছেলেটি অনেক ক্ষেত্রেই জানে না ব্যাপারটা কি ? বোঝবার পর লজ্জিত হয়। বলি, 'লজ্জা তোমার নয়, তোমার পিতামাতার। সে যাই হোক, গমের দাম কমছে কেন ?' ছেলেটি গ্রামের উড়ো খবর বলে, আমি শুনি। 'ঐটে নিয়ে কিছু ভাবো না ?' 'ঠিক বলেছেন, স্যার। কোনো বই আছে ?'

'অন্য দেশের সম্পর্কে অনেক বই আছে, আমাদের দেশ সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান চলছে। বছর কয়েক আগে একটা রিপোর্ট লেখা হয়, কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল।' 'স্যার, আমি ঐ বিষয়ে গবেষণা করবো।' ঘণ্টা-খানেক কথাবার্তার পর ছাত্রটি সোৎসাহে চলে গেল। মাস দু'-এক দেখা নেই। একদিন রাস্তায় .পাকড়ালাম। 'কী হে! কি করছো?' হয় নিতান্ত সংকুচিত ভাবে বললে, 'স্যার, একটা সার্টিফিকেট দিতে পারেন?' বেচারি চাকরি চায়, চেষ্টা করছে না, মাত্র চায়। কিংবা হয়তো বললে, 'স্যার, আমার আগ্রহ ব্যাঙ্কিং-এ।' 'ওটা তো আমি জানি না মোটেই। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান।' কথায় কথায় বেরুলো হয়তো তাঁর বাবা সংসার চালাবার জন্য, তার মধ্যে তাকে ও তার ছোট ভাইকে শিক্ষা দেবার জন্যও, মহাজনের কাছে হাজার দুই টাকা কর্জ করেছেন শতকরা পনেরো টাকা হারে। দেশী মহাজনের, সমবায় সমিতির কথা পাড়লাম। শেষে ছাত্রটি ঠিক করে ফেললে, দেশী মহাজনের সম্বন্ধে কিংবা সমবায় সমিতি সম্বন্ধেই কাজ করবে। বহুৎ আচ্ছা! 'স্যার, আমাকে খানকয়েক বই-এর নাম বলে দিন, যেগুলো লাইব্রেরিতে পাবো। আর স্যার, লাইব্রেরিয়ানকে বলে দেবেন যে, আর কেউ এ বইগুলো না নিয়ে যেতে পারে।' 'আমার সঙ্গে কাজ করতে চাও, তবে গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে, তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বাবা, আমি বই-এতে বিশ্বাস হারিয়েছি।' ছাত্রটি কিছুদিন কাজ করলে। হয়তো একটা কিছু লিখেও আনলে। সাধারণত কোনো বই-এর ভূমিকার সার-সংগ্রহ মাত্র। 'এ হয়নি। আবার লেখো। গ্রামে গিয়েছিলে? তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন, কি উপায়ে তিনি ধার নিয়েছেন?' 'না স্যার, এইবার যাবো। বোনের বিয়ে আসছে।' 'বেশ তো! বোনের বিয়ের খরচ কেন হয় এই নিয়েই একটু গবেষণা করো না?' ছেলেটি হেসে ফেললে। তারপর ছেলেটি উধাও। শুনলাম কেরানি হয়েছে। এটা মাত্র একটা নমুনা। এই রকম কত আসে কত যায়, তার ঠিকানা নেই। ব্যাপারটা কি? দারিদ্র্য? নিশ্চয়ই। কিন্তু তা ছাড়া আরো কিছু আছে। গবেষণার বিষয় বলে কোনো জানোয়ার নেই; সমস্যা আছে, তার সমাধানের তাগিদে বিশেষ পদ্ধতিতে চিন্তার নামই রিসার্চ, গবেষণা। ছেলেদের আগ্রহ নেই সত্য কথা নয়, কারণ সেটা মানতে গেলে মানতে হবে ছেলেদের সমস্যা নেই! ছেলেদের বহু সমস্যা আছে। আমরা কী এমনভাবে তাদের পড়াই যে, সেই সমস্যাগুলোর অন্তরের মূল সমস্যা সম্বন্ধে ছাত্রেরা সচেতন হয়? অবশ্য বিষয়ভেদে মূল

সমস্যাও ভিন্ন হবে। আমার বিশ্বাস যে, রিসার্চের বুজরুকি, তার অ-সার্থকতার জন্য আমাদের অধ্যাপনাই দায়ী। বাস্তব জগতের সঙ্গে আমরাই পরিচিত নই; এক চাকরিতে যেন-তেন-প্রকারেণ উন্নতি সাধন ছাড়া আমাদের শিক্ষক-জীবনে মনে হয় যেন কোনো সমস্যাই নেই; আমরা পড়াবো এমন সব থিওরি, দেবো এমন সব দৃষ্টান্ত, যার সঙ্গে আমাদের, অতএব ছাত্রদের জীবনের ঐ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার কোনো যোগ নেই; আর আমরা তৈরি করবো শত-সহস্র পি-এইচ. ডি.! এ হয় না। সাধে কী মার্কস, লেনিন, থিওরি আর অ্যাক্‌শ্যনের অভিন্ন যোগ চেয়েছিলেন! অন্য ধরনের রিসার্চ নিশ্চয়ই আছে— যেমন পদার্থবিদ্যার ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ। সেখানেও দুটি জিনিস লক্ষ করবার রয়েছে: সামাজিক প্রয়োজন ও পূর্বতন পরীক্ষা এবং বিশ্ব-নিয়মের আইনকানুনের অবজেক্‌টিভ রিয়ালিটিতে বিশ্বাস। দুটো বাস্তব-সত্তার মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয় আছে। কিন্তু দুটোরই তাড়ায় সমস্যা ওঠে, যে সমস্যার ফলে রাতে ঘুম হয় না। ছাত্রদের আমি প্রায়ই একটি প্রশ্ন করি, 'বিষয়— সাবজেক্‌ট তো বেছে নিয়েছো; কিন্তু ক'রাত্রি ঘুমোও নি?' আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, 'সমস্যা তো দিলাম ছাত্রটিকে, কটা বড়ি বেলার্গল সেবন করতে হবে সেই সঙ্গে?' নিজেই উত্তর পাই না। সহকর্মীরাও পান কি? বোধ হয় না। নচেৎ কেন শুনি, 'আমার হাতে পঞ্চাশটা রিসার্চ-স্কলার, অথচ আমিও গণ্ডাখানেক প্রবন্ধ কিংবা বই লিখেছি এই বছর, কিংবা গত দু'বছরে?' ধন্য ধন্য, হাততালি, মহাপণ্ডিত! এতটা ফাঁকির ওপর দেশ বড় হয় না।

এই গবেষণার হুজুগ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে। শেষকালে পারবো না। কাকে কাকের মাংস খায় না, হয়তো ভাববো। তবু এই রাত্রে নির্জনে গোপনে নিজের কাছে বলি, 'সমস্যা সম্বন্ধে সুতীব্র সচেতনতাই গবেষণার প্রধান আগ্রহ। এবং সমস্যা উৎপন্ন হয় বাস্তবেরই সংঘাতে।'

৯. ১০. ৫৫

শ্রীমতী সুমতি মুতাৎকারের আবার তাগিদ এলো, 'দি গ্রেট মাস্টারস্‌ অব মিউজিক আই হ্যাভ হার্ড' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে। রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষে পুস্তিকা বেরুবে। সাধনা অদ্ভুত। স্বামী পুত্র ছেড়ে লক্ষ্ণৌ-এ সঙ্গীত শিখতে এলো, সাত-আট বছর প্রাণপণে শিখলো। তারপর ডক্টরেট অব মিউজিক নিলে। আমি একজন পরীক্ষক ছিলাম। এই না হলে

মেয়ে! এই না হলে শেখা! তাকে 'না' বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কি লিখবো ভেবে পাই না। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কমে গিয়েছে। খুব ভালো না হলে শুনতে পারি না। দেখি কাদের কথা মনে আসে। তখন ভাতখণ্ডেজী প্রায় বদ্ধ-কালা হয়ে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'অভাব মনে হয় না।' 'মোটেই না। এই তো কাল রাত্রে মঙ্গল রাগ আমার সামনে উপস্থিত হলো। ১৮৮০-৮২ সালে শুনেছিলাম যা ঠিক তাই।' এই বলে মঙ্গল-রাগ গাইলেন। বেটহোফেনেরও তাই হতো। আমার বাবা বলতেন, হদ্দু খাঁ'র ভাই নথ্ খাঁ'র কেদারার রূপের কথা। আমার কিন্তু রাগের টুকরোই মনে পড়ে। দু'জন মহা ওস্তাদের বাজনা শুনিনি বলে খুব দুঃখ হয়, বীণ শেখান্না আর উজীর খাঁ— অথচ ইচ্ছা করলেই শুনতে পারতাম, নিমন্ত্রণও পেয়েছিলাম। আফ্সোস! অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলনা এসে পড়ে। অথচ আমি বিশ্বাস করি ভারতীয় সঙ্গীতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে। যখন আলি আকবর, বিলায়েৎ, রবিশঙ্কর এখনও ঐ রকম বাজাচ্ছে তখন না করে যে পারি না।

বাংলা কী হিন্দী আধুনিক গান চেষ্টা সত্ত্বেও বরদাস্ত করতে পারছি না। মোটামুটি বলা চলে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সুচিত্রার কণ্ঠ শুনতে বড্ড ইচ্ছে হয়। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাক ও ন্যাকামি' এই বিষয়ে যদি কেউ মজা করে কিছু লেখেন তো তাঁকে মনে মনে আশীর্বাদ করবো। ভাগ্যিস দিনুদা বেঁচে নেই! কী মিষ্টি, কী মধুর কণ্ঠ, বাঙালি মেয়েদের! গান শুনলে বিশ্বাসই হয় না যে, এঁরা স্বামী, ছোট ভাইবোন, ঝি-চাকরদের খিঁচুতে পারেন। কিন্তু পারেন। জীবন আর আর্ট ভিন্ন জগৎ। তা হোক, দুটোর মধ্যে একটা অন্তত তো বাসযোগ্য হোক।

১১. ১০. ৫৫

বুদ্ধদেববাবু ও প্রেমেনের স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প পড়লাম। আমি সম্পাদক হলে কিছু অদল বদল করতাম। নিজের লেখার বিচারক হওয়া কঠিন কাজ। নিজের কথায় নিজের দোষগুণ ধার্য হয় না, ইংরেজী আইনে অন্তত তাই বলে। অবশ্য কোনো সংগ্রহ বা চয়ন সকলকে তুষ্ট করতে পারে না। ক'জন আর প্যালগ্রেভ হতে পারে! তার ওপর নিজের প্যালগ্রেভ হওয়া!

টমাস ম্যান-এর মৃত্যু সংবাদে বাঙলা দেশে শোকসভা হলো না কেন?

মাতিসের মৃত্যু উপলক্ষে তিন-চারটি বাংলা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। অথচ বাঙালি চিত্রের চেয়ে সাহিত্যই বেশি ভালোবাসে। লিজারও মারা গিয়েছেন শুনছি। আজ সারা বিকেল ও সন্ধ্যায় ম্যান্-এর তিনটি ছোটগল্প পড়লাম। অপূর্ব! অর্থাৎ ও-দেশেও অপূর্ব। ম্যান্ পড়তে আমার কষ্ট হয়, বিশেষত শেষ বয়সের নভেলগুলি। .অত্যন্ত ক্লান্তিকর। চিন্তার জটিলতা এত বেশি যে, গল্পের গতি সময় সময় থেমে যায়। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে রোগ আর পাপবোধের ব্যাখ্যান। 'টিপিকাল' জার্মান-সভ্যতার প্রতীক। জার্মানিতে থাকতে পারলেন না, পালিয়ে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। এই ধরনের পলাতক-প্রবাসী জীবন সত্যই ভয়াবহ। ভদ্রলোকের কোনো রচনায় রসিকতার চিহ্নমাত্র নেই। তবু মহান। ভিন্ন জগতেরই স্রষ্টা; অথচ এই জগতেরই আভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতীক। যোসেফাস সাইক্লটা শেষই করতে পারলাম না তবু। ঐ একমাত্র নভেলিস্ট যাঁর নভেলের এক অধ্যায়ের বেশি একদমে পড়তে পারিনি। প্রবন্ধগুলোও অত্যন্ত কঠিন। টিউটনিক মনই ঐ নাকি! অথচ তাঁর ভাই-এর লেখবার ঢঙ বেশ সহজ! ম্যান্কে হয়তো চেষ্টা-চরিত্তির করলে বোঝা যায়, কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না। শেষ নভেলটির মাত্র একটি অধ্যায় হডসন্ রিভিউতে বেরিয়েছে। পুরো বইটা এখনও হাতে আসেনি। থীম্টাও সেই persona-র চরিত্রের মুখোশের। এবার মাথা বদলানো নয়, পুরোপুরি সাজ'।

এ ধরনের গভীর নভেল কী গল্প আমরা কেন লিখতে পারি না কে জানে? প্রতিভা হয়তো নেই। কিন্তু চেষ্টাও তো করা যেতে পারে।

জার্মানদের না হয় 'গিল্ট সেন্স' স্বাভাবিক অর্থাৎ ঐতিহাসিক। কিন্তু ফরাসী Colon-রাই বা কি করছে মরক্কো ও আলজিরিয়াতে! ফরাসী কাগজেই উদ্ধৃতি দেখছিলাম। এই যুগে এই অমানুষিকতা সম্ভব! হাজার দুই লোককে খুন করা হলো! কেনিয়াতেই বা কী হলো! মালয় দেশে! এবার কী সাইপ্রাসেও আরম্ভ হবে? ইম্পিরিয়ালিজমের মরণ কামড়'! অথচ ফরাসী সভ্য জাত, ফরাসী সাহিত্য চিত্র এখনও সভ্যতার নিদর্শন। আর ইংরেজ তো আদর্শ ওয়েলফেয়ার স্টেট তৈরি করেছে, ইংরেজই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডেমক্রাট, ইংরেজ কত বুদ্ধির সঙ্গে আস্তে আস্তে সরে গেল ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে! এত বড় ভণ্ডামির তুলনা ইতিহাসে মেলে না। রাগের বশে এক এক সময় মনে হয়, ফরাসী সভ্যতা অন্তঃসারশূন্য আর ইংরেজী সভ্যতা ভণ্ডামিতে ভরা। ঘৃণা করছি না, কিন্তু মিথ্যা আচরণের

বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ না করলে চরিত্রের অবনতি হয়। হাঁ, নিজেদের আচরণের সম্বন্ধেও। এখনও হরিজনরা পতিত! হিন্দুদের পাপবোধ নেই, ফরাসীদেরও নেই। আমরা উভয়েই পাপ করি আর মনেই রাখি না। কেউ কেউ বলেন, 'সেন্স অব্ গিল্ট' খ্রীস্টানী কিংবা হিব্রেয়িক প্রত্যয়— ওটা সেমেটিক নাকি! ফরাসীরাও তো খ্রীস্টান— ওরা অত আন্ইন্হিবিটেড কেন? আমরা না হয় হিন্দু!

আমার মনে হয়,— গোড়ায় যাই হোক না কেন, পাপবোধটা খ্রীস্টানদের মধ্যে ষোল কী সতেরো শতাব্দী থেকে বেড়েছে। অবশ্য আদিম পাপ, 'ফল্ অব্ ম্যান'-এর ধারণা তো রয়েইছে। যখন ভগবানের রাজ্য থেকে পৃথিবীর রাজ্যতে নামা গেল, তখন থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট (ক্যালভিনিস্ট) 'এথিক' আর ধনিকতন্ত্রের মিল শুরু। মাড়োয়ারিদের অদ্ভুত দানশীলতার মধ্যে কি পাপবোধ লুকিয়ে আছে? ভারতীয় দানধ্যানে, এণ্ডাওমেণ্টেরও হেবারীয়ান ব্যাখ্যা বোধহয় চলে। ইংরেজী কেনিয়া-মালয় আর ফরাসী আলজিরিয়া-মরক্কো— এই দুটোর পার্থক্য চরিত্রগত। দুই-ই খ্রীস্টান। চার্চহিল আবার খ্রীস্টান সভ্যতা আর স্বাধীন জগতকে এক বস্তু ভাবেন!

দিলীপ রায় না একবার চার্চহিল সম্বন্ধে কবিতা লিখেছিল যুদ্ধের সময়? ভাগ্যিস ছাপা হয়নি। অবশ্য রজনী সেনের একটা কবিতায় বার্-এগারো 'পাপ' কথাটি আছে যেন মনে হচ্ছে।

১২. ১০. ৫৫

পিয়র মন্দেঁ ফ্রান্স, (ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সেদিন) ও গেব্রিয়েল আর্দঁ একটি চমৎকার বই লিখেছেন, ইকনমিক্স্ এ্যাণ্ড অ্যাক্শন। দু'জনই ভালো ইকনমিস্ট। কী ঝর্‌ঝরে, তর্‌তরে লেখা! ইচ্ছে হচ্ছে প্রত্যেকের হাতে দিতে, ছাত্রদের, সরকারী অফিসারদের, বিশেষত এম এল. এ., এম পি-দের। আধুনিক অর্থনীতির প্রয়োগশিল্পের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা খুব কমই দেখেছি। বি. এ ক্লাশের ছাত্রদের বিশেষ উপকার হবে আমার বিশ্বাস। ফরাসীরা যখন লেখে তখন কলমে কী মদ ভরা থাকে জানতে ইচ্ছে হয়। একজন ফরাসী অধ্যাপক, লেভি স্ট্রউস্, আমাকে বলেছিলেন,— '**Our tragedy is that we have too many brilliant men.**' সত্যই তাই। কার্টেসীয়ান যুক্তিতে মাথা পরিষ্কার হয়, লেখা ঝক্‌ঝক্ করে, কিন্তু নতুন সমাজশক্তিকে অ-যৌক্তিক, 'ইর্‌র্যাশনাল' নাম দিয়ে

বাতিল করবার দিকে ঝোঁক থাকে। ফরাসী সভ্যতার অবনতি মানে কার্টেসীয়ন যুক্তির সীমা-লঙ্ঘন। ইকুইলিব্রিয়ম আর চয়েস-এর সরলতম ব্যাখ্যা পেলাম। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি আর বর্তমান, ১৯৩০ সালের পরের, অর্থনীতির পার্থক্য বইখানিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু ঐখানেই শেষ!

লেখবার পরেই মনে হচ্ছে ভুল করলাম। অফিসার আর এম. পি-রা পড়লেই (যদি পড়েন) ভাববেন সব বুঝে ফেলেছেন। এ অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর। বর্তমান ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তাদের, অফিসার ও লেজিস্‌লেটার উভয়েরই এখনকার এই অবস্থার, প্রয়োজন হলো সমস্যা একদম বুঝে ফেলা নয়,— তার আবিষ্কার, তার সামনে বিনয়। clarity-র চেয়ে sense of mystery, adventure আর humility-কেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে আপাতত। এইখানেই ফরাসী চিন্তার গলদ। (প্রমথবাবু একে Latin genius বলতেন।) অনুন্নত দেশের উন্নতির ইতিহাস সৃষ্টিতে একটু adventure থাকা ভালো। অত আলো নাই হলো!

State Re-organisation Committee-র দৈনিক পত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের সারাংশ পড়লাম। শিখ সম্প্রদায় আর মাহরাট্টাদের মধ্যে ঘোরতর চাঞ্চল্য হবে নিশ্চয়! সামান্য অদল-বদল করে কংগ্রেস সামলে দেবে মনে হয়। বিদর্ভ সৃষ্টির মধ্যে একটা aesthetic যুক্তি রয়েছে। নামটি খাসা; ঐ নামের একটা প্রদেশ হওয়া উচিত। ভারতীয় বাংলাকে পুণ্ড্রদেশ নাম দিলে কেমন হয়? মানভূম-পূর্ণিয়ার কিছু অংশ বাংলাকে দেওয়া হয়েছে। বাংলা পাবে কি? কেন্দ্রীয় আয়ব্যয় কীভাবে ভাগ হবে? উত্তর প্রদেশ যা ছিল তাই রইলো। পন্নিকরের আপত্তিটা পড়লাম। 'খোঁচা' না দিলেই চলতো। তবে এটা ঠিক যে, ভারতবর্ষের অনেক, বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চলে উত্তর প্রদেশের বিপক্ষে মনোভাব প্রবল। যেভাবে জনকয়েক ভদ্রলোক হিন্দী প্রসারে উৎসাহী হয়েছেন, মুখেই অবশ্য, তাতে একটু রাগ হওয়া অ-স্বাভাবিক নয়। বিক্ষোভটা দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোঠায় পর্যন্ত তোলা হয়েছে জানি। ব্যাপারটা কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তির ব্যবহারের সুযোগ সংক্রান্ত। তাও বলি, অর্ধেকের ওপর সেক্রেটারি ও উঁচু কেরানি তো তোমাদের দক্ষিণেরই।

ভারতীয় ঐক্য সাধনার উপায়গুলি মনোজ্ঞ, যথেষ্ট নয়। ঐক্য শিক্ষা, কী ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় হিন্দীভাষী বিশ্ববিদ্যালয় করে দিলেই চলবে! না হয়, আরো একটা, দুটো, দশটা হোক! তাতেই বা কি হবে?

ভিন্নভাষী অধ্যাপক ও ছাত্র নেওয়া হবে বেশি? যখন মাতৃভাষায় উচ্চ-শিক্ষা পর্যন্ত দেওয়া হবে তখন ক'জন তামিল অধ্যাপক বাংলা ভাষায় এম.এ ক্লাশে পড়াতে পারবেন, ক'জন বাঙালি গুজরাটি-মাহরাট্টিতে? ঐ ফাঁকে ইংরেজীর বুনিয়াদ পাকা হয়ে যাবে। সেটা শুভ হবে না। ছাত্রদের গতায়াত অবশ্য বাড়াতেই হবে। দক্ষিণ থেকে বহু ছাত্র উত্তরে এসেছে পড়তে, অবশ্য ডবল কোর্সের জন্য। কেউ হিন্দী উর্দু শেখেনি— খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, মেলামেশার কোনো পরিবর্তন দেখিনি। আমার মনে হয় ঐ বিষয়ে S. R. C. বেশি চিন্তা করেননি। কিংবা হয়তো পুরো রিপোর্টে আছে সব।

দক্ষিণে প্ল্যানিং অদল-বদল করতে হবে। কম্যুনিস্ট পার্টি কেন সংযুক্ত মহারাষ্ট্র চাইছেন বুঝলাম না। স্ট্যালিনের ন্যাশানালিটি সমস্যার সমাধান প্রয়োগ না কি! আমাদের সমস্যা ঢেলে সাজা, অ-সভ্য, অনুন্নতকে উন্নত করা নয়। **The right to secede** আমরা কাগজেও মানতে পারবো না। একবার ন্যাশনালিটির নামে অনেক বামপন্থীরা বোকামি করেছেন, আর সহ্য হবে না। অবশ্য ভোটের ব্যাপার আছে। এবার কংগ্রেস মেজরিটি কিছু কম হবে, স্বাধীন প্রতিনিধির সংখ্যা আরো বাড়বে মনে হচ্ছে।

বাংলা ছোট থাকতে আপত্তি নেই আমার। আকারে ছোট্ট হলে তেজ বাড়ে— প্যারিসের নেপোলিয়ন, মস্কোর লেনিন, মোহনবাগানের রাজেন সেন, অজ্ঞাত ভারতবাসী তথা স্টেট্‌সম্যানের নীরদ চৌধুরী— সব আকারে ছোট্ট খাট্টো, কিন্তু কত বিস্ফোরণ শক্তি!

১৩. ১০. ৫৫

বন্যা এসেছে উত্তর ভারতে। যুবা বয়সে দামোদর বন্যা-পীড়িতদের উদ্ধার-কল্পে আমরা জনকয়েক তারকেশ্বর অঞ্চলে যাই! সে আজ চল্লিশ বৎসরেরও পূর্বে। এখন বলতে পারি খবরের কাগজে যা ছাপিয়েছিলাম তার চার-ভাগের তিন ভাগও সত্য ঘটনা ছিল না। যে যুবতীটিকে 'উদ্ধার' করেছিলাম তার বয়স গোটা আষ্টেক এবং আমরা উদ্ধার করিনি, করেছিল বিশপ্‌স কলেজের ছাত্ররা। কিন্তু আমাদেব হাতে ছিল দৈনিকপত্র। সেই থেকে পরোপকারের ওপর আস্থা কমেছে।

আর মনে পড়ে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের দেশপ্রিয়তা আর কাজের শক্তি। আর মাঠের মধ্যে স্টীম লঞ্চের ওপর বসে একজন আমেরিকা ফেরত

বাঙালির হাতে মদের গেলাস আর বক্তৃতা—

'What is wrong with Bengal? Bengal has no organisers, she has no ability to organise.'

লঞ্চটি আটকে গিয়েছিল, আমরা ঠেলে গভীর জলে নিয়ে যাই। ভদ্রলোকটি লঞ্চের ওপর থেকেই আমাদের ডাইরেক্‌টিভ (আদেশ) দিচ্ছিলেন। আরো মনে আসে হেমেন্দ্র রায়ের কবিতা পাঠ নৌকার ওপর, সুধীর সরকারের গান ও কাঠের ওপর বাঁয়াতবলা বাজানো, রাত্রে পাল মুড়ে শোয়া, পেটে খিদে মুখে সিগারেট, মোহন্তের সঙ্গে ঝগড়া— আর এক বিধবা জমিদার গৃহিণীর সংযত সমাদর। বাংলা দেশে তখন অনেক মা ছিল।

দামোদর বন্যা-প্রপীড়িতদের (তখন সর্বহারা, বাস্তুহারার চলন হয়নি) উদ্ধার করে এসেই গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে গেলাম। ভিজে এসে জ্বর হলো। জ্বরের ঘোরে শিবে-বিজের নামোচ্চারণ করি। ডাক্তারে এসে মাকে বোঝালেন নামটি কোনো মেয়ের নয়, দু'জন খেলোয়াড়ের। পথ্য পেয়েই দানিবাবুর অভিনয় দেখতে গেলাম লুকিয়ে।

ভারি মজা! বিহারের ভূমিকম্পকে গান্ধী বললেন ভগবানের অভিশাপ, আর বন্যাকে জওহরলাল বলছেন প্রকৃতির challenge to man। একেই বলে রিনেসাঁস। এই কথাটা ঘুরে ফিরে ক'দিন ধরে কেবলই মনে আসছে। যে রবীন্দ্রনাথকে বোঝে সে অতি সহজে জওহরলালকে বুঝতে পারবে। এক ধাতু, এক মেজাজ, কেবল জওহরলালের মজ্জায় উপনিষদ নেই।

বিদেশী অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনী পড়েছি। ঠিক বোঝা যায় না কেন তাঁদের অভিনয় দেখে লোকে পাগল হতো। তবে আমরাও পাগল হতাম। অর্ধেন্দু মুস্তাফীমশাই-এর অভিনয় প্রথম দেখি নিতান্ত অল্প বয়সে, প্রায় শৈশবাবস্থায়। তবু মনে আছে। রবিবাবু, অবনীবাবু, ঠাকুরবাড়ির মতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা "এমনটি আর হয় না"— কবি বলতেন। (তাঁর অনেক fixation ছিল যথা বঙ্কিমবাবু আর যদু ভট্ট) সমরবাবুর কাছে মুস্তাফীমশাই-এর এক 'প্র্যাকটিকাল্ জোক্'-এর গল্প শুনি। ঠাকুরবাড়ির এক (ঘব) জামাই খুব সাহেব হয়ে উঠেছিলেন। সকলে অস্থির। একদিন সকালে দেখা গেল নগ্ন-গাত্র, চটিধারী এক ব্রাহ্মণ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে পূর্ববঙ্গের ভাষায় চিৎকার করছেন। ব্যাপার কি? ব্রাহ্মণ 'হালার পুত

হালা'র সঙ্গে দেখা করতে চান। ব্রাহ্মণের রাগ আর থামে না। শোনা গেল তাঁর ছেলে ঐ বাড়িতে লুকিয়ে আছে, ম্লেচ্ছ হয়ে গিয়েছে। সকলে মিলে তাঁকে ধরে করে বারান্দায় বসালে— সেখানে বসে পিণ্ডিদান আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মণের ছেলেটি শোনা গেল ঐ জামাইবাবুটি। তিনি তখন অন্দরমহলে গায়েব, লজ্জায় বাইরে আসতে পারছেন না। ব্রাহ্মণ খাওয়া-দাওয়ার পর অভিশাপ দিতে দিতে বিদায় হলেন। ব্রাহ্মণটি ছিলেন মুস্তাফীমশাই, আর ষড়যন্ত্রটি পাকিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির দুষ্টু ছেলেরা। জামাইবাবু শুধরেছিলেন কিনা জানা নেই।

গিরীশবাবুর অভিনয় গগনবাবুরা পছন্দ করতেন না, দানিবাবুরও না। একটা কার্টুনেই প্রকাশ। তা না পছন্দ করুন, গিরীশবাবু মস্ত অভিনেতা ছিলেন। নীলধ্বজে গৈরীশি ছন্দের আবৃত্তির রেশ অনেকদিন কানে বাজতো। আর চোখে ভাসতো তাঁর চৌকো ভারি গাল দুটো যার প্রত্যেক পেশীটা তাঁর কথা শুনতো। প্রফুল্লর যোগেশ 'রানি মুদিনীর গলি' গাইছে। 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' তিনবার তিন স্বরে উচ্চারণ করছে— এগুলো ভোলা যায় না। 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় মনে আছে। নাম জানতুম না কারুর তখন। পরে জেনেছি, বিনোদিনী চৈতন্য, আর জগাই-মাধাই গিরীশবাবু আর মুস্তাফীমশাই। নন্দলালবাবুর (?) জগাই-মাধাই-এর রেখাচিত্র মনে হয়। ওঁদেরই ছবি। কলসীর কানায় মহাপ্রভুর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে, তবু কীর্তন চলছে, 'মেরেছো কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না।' জগাই-মাধাই-এর একজনের অনুতাপ এসেছে, অন্যের মুখে তখনও গালাগালি! মুখে গালি কিন্তু পা দুটো খোলের তালে নাচতে আরম্ভ করেছে। নিচে থেকে যেন একটা ঢেউ উঠে শরীরটাকে দুলিয়ে দিলে, এ আমি দেখেছি। এবং একেই অভিনয় বলি।

দানিবাবুর উচ্চারণ ছিল অস্পষ্ট, আধ-আধ। তবু তার মুখের ভাব-ব্যঞ্জনা ছিল অদ্ভুত। বলতেন, 'যা কিছু বাপির কাছে শিখেছি।' 'বিল্ব-মঙ্গলে'র 'সলিলকি' আমার কাছে হ্যামলেটের আত্মোক্তির সমপর্যায়ের। অলিভিয়র, গীলগুড্ দেখে আমরা মোহিত হই আজকাল। ঠিক সেই রকমই মোহিত হতাম দানিবাবুর বিল্বমঙ্গল শুনে ও দেখে। 'গৃহলক্ষ্মীর' কী 'শান্তি ও শান্তির' ঠিক মনে পড়ছে না, 'ওঃ, আজ বুঝি একাদশী', 'বলিদানে'র 'মেজো মেয়েটিকে ছাড়ো না বাবা'— দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোভাবের উক্তি। কিন্তু দানিবাবুর পক্ষে দুইটিরই প্রকাশ সহজ ছিল। অমৃত মিত্রের মতন কণ্ঠস্বর আমাদের রঙ্গমঞ্চে হয়নি, কিন্তু ব্যঞ্জনা ছিল কম। অমর দত্তের

কণ্ঠ ছিল আরো গম্ভীর, তিনি উচ্চারণে গমক দিতেন। তাঁর বহু অভিনয় দেখেছি, কিন্তু যখনই রঙ্গমঞ্চে নাবতেন, তখনই মনে হতো যে তিনি শৌখীন অভিনেতা। অথচ রঙ্গমঞ্চের জন্য তিনি জীবনপাত করলেন। তাঁর প্রতিভা স্থিত হতে পারেনি।

অমৃত বোসমশাই আমার কাছে প্রধানত মজলিশী মানুষ, দ্বিতীয়ত, নাট্যকার ও শেষে অভিনেতা। তাঁর মজলিশী কথাবার্তায়, তাঁর জ্ঞানের বহুমুখিতায়, তাঁর রসিকতায় মুগ্ধ হননি এমন লোক দেখিনি। (হেরম্ববাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'আমার জীবনের শেষ আশা এখনও মেটেনি, হেরম্ববাবুকে স্টেজে আনা।') মনে আছে, তাঁকে আমি ইব্‌সেন ব্যর্নসন্ পড়তে দিই। ভদ্রলোকের খুব আনন্দ। শ্যামবাজার হাইস্কুলের প্রাঙ্গণের দরবারে বললেন, 'তিন সেনে একবার দেশটা মাটি করেছিল। উইলসেন (Wilson Hotel) ইস্টিসেন্ আর কেশব সেন। চতুর্থ সেন জুটলো এই ইব্‌সেন।' Punটি ছিল সস্তা, কিন্তু বলবার ভঙ্গিতে আমাদের মত উন্নাসিক, রবীন্দ্রনাথ-বীরবলী রসিকতায় অভ্যস্তরাও খুব হেসেছিলাম। অনেকের ধারণা, তিনি ব্রাহ্মদের পছন্দ করতেন না। সেটা মস্ত ভুল। একদিন ভগবদ্বিশ্বাসের আলোচনা হচ্ছিলো। তিনি হঠাৎ বললেন, 'আমি ভগবান দেখেছি। যখন কেশব সেন প্রার্থনার সময় God উচ্চারণ করতেন।' অমৃতবাবু বিস্তর পড়েছিলেন, বিশেষত সাহিত্য আর নাটক। প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল, চোখ নষ্ট হবার পর ও অন্য কারণে বিক্রি করে দেন। অমন বিদগ্ধ পুরুষ, নাগরিক বাংলা দেশে খুব কম জন্মেছেন। হুঁকোর নল মুখে দেওয়া থেকে চুল, জামা, বসবার ভঙ্গি প্রতিটি আচরণে বৈদগ্ধ ফুটে উঠতো। হারিতকৃষ্ণ তাঁর সম্বন্ধে বহু কথা জানে। সেই বড় ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই তাঁকে ফোটাতে জানতো। হারিতের বাড়িতে মূকও মুখর হতো, শোভাবাজারের রাজবাড়ির এমনই আবহাওয়া।

আমার কাছে শিশিরবাবুই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা থাকবেন, অভিনয়কলা, অভিনয়ের অভিব্যক্তি ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের দিক থেকে। অথচ শিশিরবাবু একাধিকবার বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথই তাঁর মতে, দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। 'স্টেজের ওপর হাত ও আঙুল নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। হাত ও আঙুলের ব্যবহারই সবচেয়ে শক্ত কাজ; এবং সে কাজে পূর্ণ দক্ষতা ছিল কবির।' তা হোক, তবু শিশিরবাবু আমার কাছে শ্রেষ্ঠ

অভিনেতা। সময় পেলে তাঁর সম্বন্ধে দু'-একটা কথা লিখতে ইচ্ছে করে। পরিচয়ে অমর দত্তের জীবনীর আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু লিখেছিলাম। আরো বিশদভাবে লেখা উচিত। কেবল বিশদ নয়, বিশ্লেষণাত্মকও। এই ধরনের খানিকটা

(১) শিশিরবাবুর উচ্চারণ-পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের ব্যবহার; তাকে দীর্ঘ করার ফলে প্রথমত, যুক্তাক্ষরের মুক্তি, দ্বিতীয়ত, ব্যঞ্জনবর্ণের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। চৌদ্দমাত্রার পয়ার ভাঙার সমগোত্রের। তাই টানা সুর নেই, যা রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে ছিল। গদ্য হলো ফলে, কিন্তু একটা ছন্দ রইলো লুকিয়ে। ছন্দ সব সময় যে ধরা পড়তো না তার জন্য দায়ী বাংলা ভাষা।

(২) আমাদের ভাষায় ক্রিয়াপদ দরিদ্র। তার অভাবে শিশিরবাবুর রঙ্গমঞ্চে গতিবিধির ঐ নতুন ধরনের গদ্যছন্দের অনুগামী হলো। প্রবেশ, নিষ্ক্রমণ খুব শক্ত কাজ নিশ্চয়, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে হাঁটা, স্থান (stance) আরো কঠিন। ক্ল্যাসিক্যাল অভিনয়ে ওর জ্যামিতি সহজ। ভাব প্রকাশের অনুযায়ী তার একটা ছক থাকে। শিশিরবাবু সেই ছক বদলেছিলেন। তিনি ভাবের গতিকে অগ্রাহ্য করেননি; ভেঙেপড়া গদ্যের ছন্দকে দেহের গতির সাহায্যে ফুটিয়ে ভাবকে সম্পন্নশালী করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতারাই এই ক'টি কাজ একত্রে করতে পারেন। সমন্বয়টাই চোখে পড়ে।

(৩) অথচ সাহিত্যিক অভিনয় নয়। পুরো অভিনয়। এই জন্যই দর্শক ভুল করতো (এবং সমালোচক ভুল করতেন) যে সর্বত্রই শিশিরবাবু। অর্থাৎ তাঁরা ভাবতেন জীবানন্দ, যোগেশ ও নিমাইচাঁদের মাতলামির অভিনয়ে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁদের মনে হতো শিশিরবাবুই মাতলামি করছেন। বস্তুত তা মোটেই নয়। জীবানন্দ, যোগেশ ও নিমাইচাঁদের মধ্যে পার্থক্যটুকু চরিত্রগত; সে পার্থক্য ব্যবহারেই প্রকাশ; কিন্তু প্রতি ব্যবহারের সারাংশ, ক্ষীরটুকুই হলো অভিনয়ের বস্তু। বিশেষ হলো ম্যানার, যার অপব্যবহার ম্যানারিজম— তোৎলামি, হাঁচা, ঘাড়নাড়া, একটা কথার অনবরত প্রয়োগ ইত্যাদি। সর্বত্রই শিশিরবাবু নয়, সর্বত্রই অভিনয়। অথচ স্টাইলাইজ্‌ড নয়। (জাপানী, কী বলী, কী কথাকলি অভিনয়ের মত নয়।) স্টাইলাইজেশ্যনে ভাষা আমরা হারিয়েছি, যেদিন অভিনয় নৃত্য থেকে পৃথক হয়েছে।

(৪) তবু শিশিরবাবুর কল্পনা সার্থক হয়নি। রঙ্গমঞ্চের মঞ্চত্ব তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। মার্জিত যাত্রা সৃষ্টি করাই তাঁর ইচ্ছা ছিল। দর্শক ও

অভিনেতার মধ্যেকার দূরত্ব তিনি বজায় রাখতে চাননি। ইচ্ছাটা মূলত বিপ্লবী, কিন্তু নানা কারণে হয়ে উঠলো না। যতটুকু নিজের দোষ তার চেয়ে অনেক বেশি দোষ দেশের।

ইত্যাদি, ইত্যাদি···শুনলাম শিশিরবাবু বাংলা দেশের দশজন শ্রেষ্ঠ বাঙালির একজন গণ্য হয়েছেন। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ হয় না। গরু মেরে জুতো দান! ন্যাশানাল থিয়েটারের ডিরেক্টার করা হয়নি কেন?

বিনোদিনীকে মনে নেই ঠিক। দুই বিনোদিনী ছিল। একজনকে পরমহংসদেব আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমার চৈতন্য হোক।' অমৃতবাবু এঁরই বিলাসিনী কারফর্মার অভিনয়ের শতমুখে প্রশংসা করতেন। একটা ফটো আছে মনে পড়ছে। অন্য বিনোদিনী (কালো) গায়িকা ছিলেন। দু'-একটা রেকর্ডও ছিল। মার্জিত-সুরেলা গলা। একটা পিলু-বারোয়ার ছাঁদ মনে পড়ছে। এখন জানি বারোয়ার রূপ কত পৃথক।

গিরীশবাবু তিনকড়িকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রানীর মতন তার চালচলন। একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ভারতের মিসেস সিডন্স বলেন। বোধ হয় লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকার অভিনয়ের জন্য। একবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'জনা'র এক অংশ নির্বাচিত হয়। বন্ধু, সুরেশ (বোস), তিনকড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির। অত্যন্ত যত্ন করে শেখালেন, খাওয়ালেন। শেষে বললেন, 'তারার (তারাসুন্দরী) কাছে যাও। সে আমার চেয়ে ভালো শিখিয়ে দেবে।' অথচ তিনকড়ির জনাই প্রসিদ্ধ ছিল। তারাসুন্দরীর অপূর্ব কণ্ঠস্বর ছিল। নিতান্ত স্পষ্ট উচ্চারণ, সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অথচ পুরুষালী নয়। তবু তিনকড়ি ছিলেন মহিমাময়ী। যথাসর্বস্ব দান করে গেলেন। একজন অভিনেত্রী অন্য অভিনেত্রীর সুখ্যাতি করা অস্বাভাবিক নয় কি? অন্তত অধ্যাপকের দলের কাছে তো বটেই! যে-কোনো কংগ্রেস কী কনফারেন্সে গেলেই বোঝা যায়।

আরো কত অভিনেত্রীর কথা মনে ওঠে। নরসুন্দরী, কুসুম, রানী, সুশীলা, চারুশীলা, নীরদা, প্রভা, কঙ্কা (ইদানিংকার মলিনা)— এঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রঙ্গমঞ্চের জন্যে। শিশিরবাবুর হাতে চারুশীলার অভিনয়ের অপূর্ব পরিবর্তনের কথা অনেকেই জানে। প্রভার কণ্ঠস্বর আমি অন্তত ভুলতে পারবো না। বাংলা দেশে আমার কথার কোনো মূল্য যদি থাকতো তবে বলতাম এই একনিষ্ঠা আর্টিস্টদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হোক। এই যে পথের পাঁচালীতে আশি বছরের বৃদ্ধা চুণিবালা অভিনয় করলেন তার

জন্য তাঁকে কী সম্মান দেওয়া হলো? 'আকাদমি' খাড়া করলেই হয় না। চুণিবালা তখন নগণ্যা ছিলেন। কিন্তু পথের পাঁচালীর সার্থকতার জন্য কী তিনিই বেশি দায়ী নন! বিদেশে ক'জন মহিলা ঐ ধরনের অভিনয় করতে পারেন। For Whom the bell Tolls-এ ক্যাটারিনা যখন মেরিয়া অভিনয় করলেন তখন ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আর চুণিবালার কিই বা খাতির হয়েছে? বেসুরোয় 'দিন যে গেল সন্ধ্যে হলো পার কর আমারে' কেউ গাইতে পারেন? রাক্কোস-খোক্কোসের গল্প কেউ করতে পারে ঐ-ভাবে? 'ও বৌ হলো কি—হলো কি—হলো কি?' তিনবার তিন পর্দায়? মনোরঞ্জন থাকলে একটা কিছু করে ফেলতো! একটা প্রকাণ্ড সভা হোক, পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তোলা হোক, আর সেই টাকা শিশির-বাবু চুণিবালার হাতে তুলে দিন। লোকে বলে বাঙালি ভাবপ্রবণ! ঐ কবিতা লেখবারই বেলা! আর কেউ আমাদের পোঁছে না বলে অভিমান করবারই বেলা! আমার মতে আমাদের দিল নেই। অথচ কলাপ্রিয় জাত নাকি! অবশ্য খানিকটা তো বটে। বাংলায় কত ভালো অ্যামেচার-অভিনেতাই না হয়েছে! শম্ভু মিত্রের দল বহুরূপী চমৎকার অভিনয় করে। নতুন যা দু'-একটা দেখলাম তা খুবই আশাপ্রদ। I. P. T. A. ভেঙে যাওয়া (দেওয়া?) অন্যায় হয়েছে। সরকার পেছনে লাগলো। বিরাট মূর্খতা! Youth Festival, Children's Theatre শুরু হয়েছে। চমৎকার! কিন্তু ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা গোছের। তার চেয়েও অদ্ভুত! সাহিত্য-চর্চা করতে হয় তো কংগ্রেসেরই আশীর্বাদে! শান্তি-সভা করতে হয় তো আমরাই করছি! থিয়েটার, সঙ্গীত, সমাজ-সেবা, যুবা, বাল-সমিতি কারুর করতে হয় তো সে আমরাই করছি, আমরাই করবো! কেমন যেন খারাপ লাগে। অবশ্য এর একটা ভালোর দিক আছে। তবু মন যেন সায় দেয় না। মনে পড়ে পুরানো ধরনের শাশুড়ীদের ব্যবহার।

২০. ১০. ৫৫

এই প্রথম স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় পেলাম। মৃত্যু ভয় নয়। বহু মৃত্যু দেখেছি, রাগই হয়েছে বেশি, দুঃখের চেয়ে। বৃদ্ধের মৃত্যু কম দেখেছি বলেই। মৃত্যুর সময় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে একটা বোকামির ছায়া পড়ে, যাকে ভক্তিভরে কিংবা স্নেহভরে বলি শান্তি, হাসিমুখ ইত্যাদি।

২১. ১০. ৫৫

গেব্রিয়েল মার্‌সেল-এর The Decline of Wisdom একটি হীরের টুকরো। এঁর Metaphysical Journal দুর্বোধ্য; কিন্তু এখানি নিতান্ত প্রাঞ্জল। ফরাসী দেশের একজন বড় চিন্তাশীল লেখক। এককালে একজিস্‌টেনশিয়ালিস্ট ছিলেন, লোকে বলতো। এখন ঐ নাম থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য নিজেই ব্যস্ত। বাস্তবিক পক্ষে পাস্‌কাল, কীয়ের্কেগার্ড প্রভৃতির সঙ্গেই মিল বেশি। সার্‌তর্‌ বলেন, Existence is prior to existence, আর ইনি বলেন, Essence is prior to existence। তাই তিনি ঐতিহাসিক রিলেটিভিজমের বিপক্ষে। এই ধরনের মতবাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। Popper-এর যুক্তি কিন্তু অন্য ধরনের লজিক্যাল। আমি মানি না, তবু আকৃষ্ট হই। ঐতিহ্য, পরম্পরা প্রভৃতির প্রকৃতি আমি বুঝতে চাই; তাদের আমি কদর করি। একটা কৃতজ্ঞতা, বিশ্বজনীন মূল্য আর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে একটা সতত, ধৈর্যশীল সম্বন্ধ না থাকলে জীবনটা খেয়ালি ক্ষণের সমষ্টিতে পরিণত হয়। সম্বন্ধটা টেন্‌শুন গোছের। যা হচ্ছে তাই ভালো বলতে কে আর রাজি! একবার ননীকে (অধ্যাপক নীরেন চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মার্কসিজমে good আর evil-এর স্থান কোথায় ও কতটুকু?' অন্য কথার মধ্যে সে একটি কথা বলে, 'যা ইতিহাসের (গতির) বিপক্ষে তাই অমঙ্গল, যা তার স্বপক্ষে তাই কল্যাণ।' শুনে ভয় পেয়েছিলাম। নাঃ ও চলবে না। কল্যাণ সম্পর্কে ধারণাকে ইডিয়লজি, সুপারস্ট্রাকচার, এপিফেনমেনা, বললেই তো হলো না!

মার্সেল popular wisdom সম্বন্ধে অনেক দামী কথা বলেছেন। পরমহংসদেবের দিব্যানুভূতি আর ঐ সাধারণ বুদ্ধি (common sence) পরস্পরকে সমর্থন করতো। সব মিস্টিকদের বেলাতেই তাই করে দেখেছি। তেমনই জনগণের চলতি বুদ্ধির মধ্যে ঐ প্রকার উঁচু ধরনের জ্ঞান (wisdom) লক্ষ করেছি। ভগ্নী নিবেদিতা এই সংযোগ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই popular wisdom-এর ক্ষয় আরম্ভ হয়েছে এদেশে। এখন দুই প্রকার জ্ঞানের মিলন ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। না রইলো গোষ্ঠী না রইলো গ্রাম, না রইলো সমাজ-সংহতি— এখন sensorium commune থাকবে কোত্থেকে? তবে? নতুন ক্ষেত্র গড়তে হবে নিশ্চয়। কিন্তু গোলাম তখন গোরে যাবে।

ড সুশীলকুমার দে'র বাঙলা প্রবাদ (ছড়া ও চলতি কথা) একটা খনি বিশেষ। আমি গেব্রিয়েল মার্‌সেল-এর পূর্বোক্ত মতের সমর্থন পেলাম।

আমার মতে নতুন প্রবাদ যে তৈরি হচ্ছে না সেটা সমাজক্ষয়ের প্রধান নিদর্শন। প্রবাদ না থাকলে কার জোরে non-secular wisdom বাঁচবে, প্রতিপত্তি বাড়বে? অপরিণতদের মার্‌সেল পড়া উচিত কিনা জানি না, তবে সার্‌তর্‌ পড়া উচিত নয় জানি। (সাহিত্যিক প্রবন্ধ ছাড়া অবশ্য।)

প্যারিসে একটা হাসির রোল শুনেছিলাম। একদিন দেখা গেল বড় রাস্তা দিয়ে এক শোকযাত্রা চলছে। সকলের কালো পোশাক। এগুচ্ছে পাঁথিও-র দিকে, যেখানে দিগ্‌গজ ফরাসীদের কবর আছে। কে এমন মারা গেল, অথচ খবরের কাগজে বেরুলো না! পুলিশ ভ্যাবাচ্যাকা! এখানে-ওখানে টেলিফোন— কেউ বলতে পারলে না। এক জায়গায় পুলিশ আটকে দিলে— ফরাসী পুলিস তো। বড় অফিসার এসে কফিনের পাশে দাঁড়ালো, ঢাকা খুললে, ভেতরে কেউ নেই— কেবল লেখা রয়েছে, Extentialism is dead— কিছুদিন আগে সার্‌তর্‌ কম্যুনিস্ট হয়েছেন। সমস্ত প্যারিস সপ্তাহখানেক ধরে হাসলো, নতুন হাসির খোরাক না পাওয়া পর্যন্ত। (ফরাসীরা হেসে জিততে চায়, অন্তত প্যারিস।)

আমাদের দেশে হাসি নেই, বক্তৃতা আছে, বই লেখা আছে, সভা-সমিতি করা আছে। জওহরলাল বললেন, মার্কসিজম মরেছে; এম. এন. রায় লিখলেন, মার্কসিজম মরেছে, Society of Cultural Freedom প্রমাণ করছে মার্কসিজম মরেছে। আমি বলি যদি মরেইছে তবে অতো ভয় কেন? ভূতের ভয় অবশ্য আছে। শরৎদা বলতেন, 'ভূত মানি না, ভয় পাই।' খাঁটি কথা। সেভাবে Democracy is also dead। সবই ভূত না কি? তবে সভ্য আর আদিম মানুষের পার্থক্য কোথায় রইলো! কোনো বড় ঐতিহ্য মরে না, যদি মরে তো ভূত হয় না, পুনর্জন্ম হয়। সার্‌তর্‌-এর মতামত লোপ পেতে পারে, কিন্তু পাস্‌কাল্‌? হ্যারি পলিট, রজনী দত্ত যাবে, কিন্তু মার্কসিজম যাবে না— আণবিক যুগেও নয়। আণবিক ইম্পিরিয়ালিজম্‌ আরো ভয়ংকর। পণ্ডিতজী মাঝে মাঝে যে কী বলে বসেন তার ঠিকঠিকানা পাই না। বিহারে গিয়ে সেদিন বললেন, 'আমি জাতি-ভেদপ্রথা ধ্বংস করে ছাড়বো।' অত সহজে হাজার বছরের জিনিস ধ্বংস হয় না। আর উনি একলা ধ্বংস করবার কে! দিল্লীর এক সভায় ড শ্রীনিবাস বেশ উত্তর দিয়েছেন। (প্রবন্ধটি Economic Weekly-তে বেরিয়েছে।) তবে পণ্ডিতজীর চটবার কারণ নিশ্চয় ছিল ও আছে। এবং মধ্যে মধ্যে বে-মওকা বে-সামাল কথা শুনতে মন্দ লাগে না, প্রাপ্তবয়স্ক প্রধানমন্ত্রীর মুখেও।

২৫. ১০. ৫৫

দুর্গাপূজা। এ ক'দিন মা আমাদের বাড়ির ওপর রুষ্টই থেকেছেন। শরতের আলো অন্য ধরনের। এবারকার পুজোর আলো Sisley-এর প্রিয়। নিম-গাছের.পাতার মধ্যে দিয়ে আসতে ভেঙে গিয়েছে। এখানকার বাঙালিরা উৎসাহের সঙ্গে পুজো করছেন। যোগ দিতে দেহ পারছে না, মন চাইছে না!

গ্যাসেট মারা গেলেন। তাঁর **Revolt of the Masses** আমরা সকলেই একটু ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তাঁর **Mission of the University**-তে ভুলের অবকাশ নেই। আমিও **Cultural Synthesis** চাই, আমারও ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়ে **Vital Subjects** মাত্র পড়ানো হোক; আমার বিশ্বাস **Faculty of Humanities**-এর ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার কাছে সিনথেসিসের অর্থ দুটি, দুই স্তরের, (১) জ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধের **methodology**, ও (২) জীবনক্ষেত্রের ব্যবহারিক সংযোগ। প্রথমটি সম্বন্ধে গ্যাসেট ডিল্টাই-এর শিষ্য; অর্থাৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও মানব-সংক্রান্ত বিজ্ঞান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। আমি সম্পূর্ণ পৃথক বলতে রাজি নই। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যুক্তি-পদ্ধতির এখন ভীষণ প্রতিপত্তি, তাই তাকে প্রয়োগ করবার মোহ নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সে যুক্তি-পদ্ধতিও বদলাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই প্রয়োগ করবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তার ফলে কি আমরা বস্তুসত্তার প্রকৃত পরিচয় পাচ্ছি? বরঞ্চ দূরেই সরে যাচ্ছি মনে হচ্ছে। অতএব এই প্রয়োগ ব্যাপারে সাবধানের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ আশঙ্কা থেকে অনেকখানি মুক্ত হওয়া যায় যদি কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্র— যেমন কোনো একটি গ্রাম— নির্বাচন করে, তার ভূমি, আবহাওয়া, আর্থিক জীবন, আশা-ভরসা, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন প্রভৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। 'এই ব্যাপারে সব বিজ্ঞানই এসে পড়বে। যেকালে এটা একার কাজ নয়, তখন সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিকের সহযোগ চাই। সেই কন্‌ক্রীট সহযোগের ফলে বিবিধ বিজ্ঞানের সিন্‌থেসিস সম্ভব। ভূমির বেলা সয়েলকেমিস্ট ও ভৌগোলিক, আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, আশা-ভরসার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ-ব্যবস্থার বেলা সমাজতাত্ত্বিক, রাষ্ট্রতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, খাদ্যের বেলা বায়োকেমিস্ট, অর্থনৈতিক; এই ধরনের সহযোগে বিবিধ জ্ঞানের আন্তরিক সম্বন্ধ ঠিক ঠিক বোঝা যায়, আর জ্ঞানের সমন্বয় হয়।

(বেসিক এডুকেশনের মূলে এই ধরনের একটা প্রয়াস আছে।) অর্থাৎ, বিজ্ঞানের ছাত্রদের আর্ট কিংবা ইতিহাস কিংবা দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিংবা আর্টস কোর্সে'র ছাত্রদের অণু-পরমাণু সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে ফল হবে না, কেবল গোটাকয়েক ধরতাই বুলির প্রচার হবে। মেথডলজির 'বক্তৃতা খুব কম লোকেই দিতে পারে এবং খুব কম ছাত্ররাই বুঝতে পারবে। তাই মাটি থেকে গড়ে তোলাই ভালো। সমস্যা যতই কন্‌ক্রীট হয়, ততই তার সমাধানের সুবিধা। সাধারণ শিক্ষা (General Education)-ই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ উপায়। গ্যাসেট এই সাধারণ শিক্ষা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন; কিন্তু কোথায় যেন গলদ রয়েছে। সত্যকারের চিন্তাশীল ব্যক্তি। লিবারেল এরিস্টক্র্যাসির সব গুণ তাঁর মতামতে প্রকাশ পেয়েছে। একজন অধ্যাপক অতো কাজ কী করে করতে পারতেন, ভাবলে বিস্ময় লাগে। তবু, গ্যাসেট অতীতের মানুষ, যাকে স্পেনে Generation of '98 বলা হতো। সে-যুগ গত।

ক্যাস্টিলের দুরবস্থা নিয়ে একটি পুরানো স্প্যানিশ কবিতা জোয়াকিন কস্টা'র (Costa) হাতে পড়ে। তিনি কবিতাটি জীনারকে (Giner) দেখিয়ে বললেন, 'Giner, that is Spain.' জীনার উত্তর দিলেন, 'No, Joaquin, that was Spain. Spain is different now.' কস্টা বললেন, 'Giner, we want a man now.' জীনার উত্তর দিলেন, 'Joaquin, what we want is a people.'— এই দ্বন্দ্বের, এই ক্যাস্টিলিয়ান সমস্যার আজও মীমাংসা হয়নি। অভিজাত সম্প্রদায় একটা মানুষ চায় এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণও চায়। সে জনসাধারণ শিক্ষিত হোক তবেই— নচেত Revolt of the masses!

রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন লিখেছেন— এক সময় ভাবতেম জনসাধারণ যেন প্রদীপের নিচে আঁধার, অর্থাৎ শ্রেণীভেদ স্বাভাবিক। পরে সে মত তাঁর ছিল না। অবশ্য তাঁর মহামানবের তীরের মহামানব জনগণ নয়। একদিন অতুলপ্রসাদ সেনের ছাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই শ্রেণীবোধ, জনগণ, ইতিহাস প্রভৃতি নিয়ে দু'তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়। আলোচনা আর কী? তিনি বলে গেলেন, আমি শুনে গেলাম; আর মধ্যে মধ্যে একটু যাকে খুঁচিয়ে দেওয়া বলে তাই। তাঁকে বলি, 'এইবার লিখে ফেলি আপনার মতটা কি?' 'না, তা করো না, তুমি আবার মণ্টুবৃত্তি নিলে কবে থেকে?

আচ্ছা আমিই লিখবো।' তাঁর বক্তব্যের খানিকটা 'কালান্তর' প্রবন্ধে প্রকাশ পেলো। কিন্তু তিনি যা-যা বলেছিলেন তার যৎসামান্যই এই প্রবন্ধে রয়েছে। তাঁর মন কত **flexible**, কত **adventurous** ছিল আমরা কল্পনাই করতে পারি না। তিনিও ভিড় পছন্দ করতেন না; তাঁর মুখে অর্ধশিক্ষিত সাধারণ্যের সম্পর্কে অনেক কটু কথা শুনেছি। এখন কবিপক্ষ করলে কী হবে? ভদ্রলোককে খুবই ভুল বুঝেছি আমরা। 'নারায়ণ' মনে পড়ছে। তবু **Revolt of the masses** তাঁর হাত দিয়ে বেরুলো না। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্য একটু যেন অন্য ধরনের। জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে তার ধারণা যেন আরো গভীর।

২৭. ১০. ৫৫

পূজো এলো, গেল বুঝতেই পারলাম না। গোটা কয়েক পুরানো মুহূর্ত মনে এলো— সন্ধিপূজা, আরতি, সঙ্কল্প, বাড়ির পুজোর দালানে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে, চালচিত্র আঁকা হচ্ছে, ভিয়েন ঘরে বোঁদে, পান্তুয়া, লুচি, ছ্যাচড়া, আরো কত রান্না-বান্না চলছে, কর্তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভেতর মহলের উঠোনে বড় বড় বঁটিতে প্রকাণ্ড মাছ কাটা, সেজগিন্নী তার চার্জে, তরকারির ঘরে মেজগিন্নীর প্রভুত্ব, ছোটগিন্নীর একটু দেরি হয়, আর বড়গিন্নী কী যে করেন বোঝা যায় না, মিষ্টির ঘরে পিসেমশাই, আর গণ্ডা তিনেক বোন গণ্ডা পাঁচেক বাচ্চা নিয়ে কলরব করছে, প্রত্যেক মা বাচ্চাকে তাজা বোঁদে খাও-য়াতে ব্যস্ত, সব সাটিনের জামা পরে ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অসহ্য গোলমাল, ঢাক ঢোল, সানাই, সে যে কী সানাই! তারা নাকি তিন পুরুষ বাজিয়ে আসছে আমাদের বাড়িতে, ভিয়েনকারও তিন পুরুষ, কুমোরও তিন পুরুষ, কেউ তিন পুরুষের কম নয়। একবার আমাদের একঘরে করা হলো— চার-পাঁচশ' লোকের খাওয়া ফেলা গেল— কারণ পুজোর দালানে কর্তারা গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য যে ফ্রী স্কুল খুলেছিলেন তার মাস্টার-মশাই-এর স্ত্রী নাকি বিবাহিতা স্ত্রী নন। তাঁকে গ্রাম থেকে না তাড়িয়ে গ্রামের মোড়লরা জলগ্রহণ করবেন না। ব্যাপার সত্য কী মিথ্যা, কেউ খুঁজলো না। কর্তারা বললেন, ভিন্ গাঁয়ের গরীবদের ডেকে খাইয়ে দাও। দ্বিতীয় দিনে কম্প্রোমাইজ হলো, পনেরোজন ব্রাহ্মণ-মোড়লকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে। মহাষ্টমীর দিনে তাঁরা পদধূলি দিলেন, আনন্দ সহকারে খেলেন, আর আমাদের পূর্বপুরুষদের কী সুখ্যাতি! এমন আচারনিষ্ঠ, সদ্ব্রাহ্মণের

গোষ্ঠী নাকি দেশে জন্মায়নি ! পুজোর পর ছাড়াছাড়ি, আর এক মাস ডি. গুপ্তের বোতল, আর কুইনিনের বড়ি। বাংলার গ্রাম বদলেছে নিশ্চয় এখন। শুনেছি, বারোয়ারি পুজো হয় ও তিন রাত্রি কমসে কম থিয়েটার। ছেলেরা এখনও মেয়ে সাজছে ?

গয়া কংগ্রেসের পর চিত্তরঞ্জন লক্ষ্ণৌ এলেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি ভারতবর্ষের গ্রামীন সভ্যতা, পঞ্চায়েত প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তখন রাধাকুমুদবাবুর **Local Government in Ancent India with the Foreward of the Marquess of Crewe, Secietary of State of India** বেরিয়েছে। (এই বইখানির সুন্দর উল্লেখ আছে অলডাস হাক্‌স্‌লের **Point and Counterpoint**-এ)। রাধাকুমুদবাবুর ছোট ভাই রাধাকমলবাবু (এখনকার লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর) তখন 'ডেমোক্রেসিস্‌ অব দি ইস্ট' লিখছেন। দুই ভাই-ই গ্রাম-পঞ্চায়েত সম্বন্ধে ভীষণ উৎসাহী। চিত্তরঞ্জনের উক্তিতে উভয়ই মহাখুশি। রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া হচ্ছে। মুখুজ্যেমশাইদের একজন পঞ্চায়েত সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য করলেন, বললেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গড়ে তুলতে হবে গ্রাম থেকে, পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে। দাশসাহেব অনেকক্ষণ শুনে বললেন, 'ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরেছি— এমন কোনো গ্রাম, এমন কোনো পঞ্চায়েত দেখিনি যা থেকে ভবিষ্যতের ভারত গড়ে তোলা যায়।' মুখুজ্যেমশাইরা দমবার পাত্র নন। তাঁরা বললেন, দেখেছেন। দাশসাহেব কেবল বললেন, 'আমি দেখিনি।' আমার একটু আশ্চর্য ঠেকেছিল মনে আছে। দাশসাহেব রিয়ালিস্ট ছিলেন, গয়ার বক্তৃতায় লীড দিচ্ছিলেন। তাঁর কথাই ঠিক— এখনকার কম্যুনিটি প্রোজেক্ট বেডেন-পাওয়েল কিংবা মুখুজ্যেমশাইদের ভিলেজ-কম্যুনিটি নয়। শরৎদারও পল্লী-সমাজ সম্বন্ধে যে তিলমাত্র মোহ ছিল না তা অনেকেই জানেন। কম্যুনিটি এখন সোসাইটি হয়ে গিয়েছে। প্ল্যানিং কমিশনের রিসার্চ বিভাগের সভ্যদের একবার জিজ্ঞাসা করি, 'কম্যুনিটি কথাটির অর্থ কি হলো ?' উত্তর পেলাম, 'সিমিলারিটি অব ইন্টারেস্টস।' টুনিস সাহেব অন্যভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছেন। সে যাই হোক, গ্রামবাসীর ইন্টারেস্টস এখন আর বেশি সিমিলার নয়, আগেও ছিল না। গ্রামের জমিদার আর ক্ষেত মজুরদের ইন্টারেস্টস এক ছিল ? এখনকার ভূমিধার আর ক্ষেত-মজুরদের এক যাঁরা এক বলেন, তাঁরা জানেন না গ্রামে কী চলছে। উঁচু জাত আর ভূমিধার একধারে আর অন্য ধারে নীচ

জাত আর ক্ষেত-মজুর।

আমার মনে হয় যে, গ্রামের উন্নতি হলেই সেটা ছোট শহর হয়ে ওঠে। হাইডেল আর মোটর-বাসের (ফিল্মেরও) আশীর্বাদে তাই হচ্ছে, আরো হবে, আর হওয়া উচিত। দুর্নিবার গতি। পথের পাঁচালী পড়তে ভালো, দেখতে ভালো— কিন্তু সে-পথে মানুষ হাঁটবে না— সে-পাঁচালী মানুষে গাইবে না, গ্রামের মনুষ্যেও নয়। গ্রামেরও 'দিন যে গেল সন্ধ্যে হলো পার করো আমারে।' নারড্‌নিকী রোম্যান্টিসিজম অচল।

২৮. ১০. ৫৫

আলিগড়ে এসে একটা সুবিধা হয়েছে। এই এক বছরে বন্ধুদের দৌলতে ইতিহাসের কিছু নতুন ভালো বই পড়া গেল। ম্যাথিয়ে (Mathiez), লেফেভ্‌র (Lefevre) প্রভৃতি লেখকদের ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে নতুন গবেষণার খবর কানে পূর্বে এসেছিল। এবার পরিচয়ের সুযোগ পেলাম। আমরা যখন এম.এ-তে ইতিহাস পড়ি তখন শ্রীঅজয় দত্ত (রমেশচন্দ্র দত্তের পুত্র) আমাদের ফরাসী বিপ্লব পড়াতেন। লেকিই ছিল আমাদের প্রধান আশ্রয়। মধ্যে মধ্যে তিনি মিশ্‌লে, অলার্ড থেকে ভিন্ন মত শোনাতেন। বিপ্লবপূর্বের অবস্থা সম্বন্ধে টেন্ থেকেও বলতেন। তাঁর কৃপায় ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে মোহ পাকা হয়ে গেল। বাবার আদেশে কার্লাইল, আর সেন ব্রাদার্সের দৌলতে ক্রপ্‌টকিনের অপূর্ব ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ও আনাতোল ফ্রান্সের Gods are Athirst নামে বিখ্যাত নভেল পড়ে। ডিকেন্সের Tale of Two Cities আগেই পড়া ছিল। এই সব পড়ে-শুনে বার্ক-এর মতামত বাতুলতা মনে হতো। ওধারে ইংরেজী রোম্যান্টিক সাহিত্যের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব তো ছিল ও যুগের বাঁধা প্রশ্ন। তার ওপর ভিক্টর হ্যুগোর Ninety Three। এই সব বই-এর নেশা থেকে এখনও মুক্ত হতে পারিনি। এখনও ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে আমার মোহের অবসান হয়নি। টমসন বহুদিন পরে পড়ি— চোখ খুলে যায়। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনই চক্‌মকে লেখা। তাঁরই রচনাগুলি বোধ হয় ইংরেজী ভাষার জগতে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। অবশ্য বিষয়টিও তেমনই। বিপ্লবীদের ভাষাও এমন ওজস্বিনী, দ্যোতনাময় যে, প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁদের বক্তৃতা কিংবা রচনা থেকে দু'-একটা উদ্ধৃতি থাকলেই রক্ত

চনমন্ করে ওঠে। আমার মনে হয় যেমন হিমালয় কিংবা মরুভূমি সম্বন্ধে তৃতীয় শ্রেণীর লেখা অসম্ভব, তেমনই ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে। (রুশ বিপ্লব সম্বন্ধেও খানিকটা তাই। কিন্তু চীন বিপ্লবের ট্রট্স্কি, রীড এখনও আসেনি, অন্তত আমার হাতে। দেখি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস কী হয়। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ছাড়া আর কী হবে!)

এই সেদিন ম্যাথিয়ে পড়লাম। গত বৎসর লেফেভ্র ও বছর আষ্টেক আগে ম্যাজেলাঁ পড়ি। রোবস্পিয়রকে ম্যাজেলাঁ বুঝতে পারেননি। টমসন, ম্যাথিয়ে, লেফেভ্র রোবসপিয়রের মর্ম বুঝেছেন। Reign of Terror-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম হলো। ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক তাগিদ ও সমস্যা নিয়ে যা পড়েছি তাতে মন ভরেনি।

কার-এর বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস পাণ্ডিত্যের ও অন্তর্দৃষ্টির প্রায় শেষ কথা। সহানুভূতি আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধী নয়। (তৃতীয় ভল্যুমটা পড়া হলো না এখনও)। অত্যন্ত প্রাঞ্জল লেখা, তবু চমকে উঠলাম না। কী জানি, হয়তো ইংরেজী ভাষারই দোষ, কিংবা কার সাহেবের মনের ভঙ্গিই ঐ রকম। তবু একদমে পড়া যায় এমনই সহজ, এমনই নতুন তথ্যে ভরপুর, এমনই বিষয়ের ওপর অধিকার। শুনছি তিনি একাই আরো কয়েক ভল্যুম লিখবেন। চার ভল্যুমে ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত এসেছে— পরে Socialism in one Country নিয়ে দু' ভল্যুম লেখা হবে। এ-যুগে এই ধরনের মনুমেণ্টাল কাজ সম্ভব নয় ভাবতাম। কিন্তু কার সাহেব এবং চৈনিক বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক (নীড্হ্যাম) অবাক করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অতো জেনে-শুনেও কিছু লিখতে পারলেন না। মধ্যযুগে আরব পণ্ডিতরা ঐ ধরনের বিশাল বই লিখতেন শুনেছি।

বিপ্লবের ইতিহাসে একটা ছক পাওয়া যায় নিশ্চয়। মার্কস্-এঙ্গেলস্, লেনিন্ ট্রট্স্কি, স্ট্যালিনের ও ইদানীংকার মাওৎ সে-টুং-এর রচনায় প্রায় সম্পূর্ণ হয়। ছক না হয় ধরা পড়লো, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়েছে, কোনো বিপ্লবই সিদ্ধ হয় না যেটুকু অসিদ্ধ থাকে, সেটুকু সিদ্ধ হতে চায় পরের বিপ্লবে, প্রায়ই অন্যদেশের বিপ্লবে! তাই মাত্র নিজের দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে বেশি কিছু ফল হয় না, বরঞ্চ ক্ষতিই হয়। বুদ্ধিটা হয়ে যায় সংকীর্ণ, প্রাণ হয়ে যায় আত্মপ্রসন্ন, আর ইতিহাস হয়ে যায় পিছনমুখো। ফরা-

সীদের তাই হয়েছে অনেকর মতে। আমাদেরও হবার ভয় আছে। আমাদের বিপ্লব ইমুনিক শুনে শুনে কান পচে গেল। অথচ নীরবে একটা টেকনিক্যাল বিপ্লব চলছে, অনেক দিন থেকেই, এখন পরিবর্তনের মাত্রা বেশি বেড়েছে। নন্-ভায়োলেন্স কি কলকারখানা মানে, না তার মালিক-রাই মানছে? ফ্যাক্টরির চারপাশ দেখলে, শহরের উপনগর দেখলেই বোঝা যায় যে, যা হচ্ছে তা নন্-ভায়োলেণ্ট বিপ্লব নয়। আপাতত অন্তত আমা-দের টেক্‌নিক্যাল বিপ্লব বেশই ভায়োলেণ্ট।

৩১. ১০. ৫৫

কাল আগ্রা গিয়েছিলাম। পূর্ণিমার রাতে তাজ দেখার জন্য নয়, অমনি, দিনের বেলায় আগ্রা ঘোরানো ভাই ও ভাইপোকে। যতবার আগ্রা দেখি ততবারই মনে হয়, অলডস্ হাক্‌সলের তাজ সম্বন্ধে মন্তব্যে বুদ্ধির খেলা সৌন্দর্য উপভোগের চেয়ে বেশি। তাজ সুন্দর, সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও, সুন্দর। মিলো'র ভিনাস বেশ পুরুষ্টু, পা দুটো বেশি লম্বা, তবু ভিনাস। তিলোত্তমাদের যক্ষ্মারোগ হয় শুনেছি।

একটা মজার জিনিস দেখলাম। ভেতরকার গেটের বাইরে গাড়িতে বসে আছি, এমন সময় একটা মোটরে জন আষ্টেক ছেলেমেয়ে এলো। বুশ শার্টের রঙচঙ দেখেই বুঝলাম কোন্ দেশী। গাড়ি থেকে নেমেই সারবন্দী মোটরের দিকে গেল, কোনটার কত অশ্বশক্তি, কোন্ মেক, পিক-অপ ইত্যাদি বহুবিধ টেকনিক্যাল আলোচনা চললো। একজন বললে, তার ড্যাডী এই স্পোর্টসমডেলটা তাকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু স্কুলের অন্য একটি ছাত্রের সেটা আছে দেখে সে নেয়নি। প্রায় পনেরো মিনিট পরে তারা ফাটকের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লিক্ ক্লিক্ করে বহু ছবি তুললে। ক্যামেরার টেকনিক্যাল শব্দগুলিও কানে এলো। একটা অক্ষরও বুঝলাম না মাত্র এই বুঝলাম, এখনও আমাদের নাবালক নাবালিকারা সৌভাগ্যক্রমে অ-সভ্য। তবে সভ্য হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। আমরা রেলওয়ে ইঞ্জিন দেখতে ছুটতাম, এখন এওরোপ্লেন নিয়ে খেলে। টি. ভি-ও এলো বলে।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের উপহার দেওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছিলেন। মেয়েদের বিবাহে পণপ্রথা উঠে যাবার কথা চলছে। মেয়েদের (এবং ছেলেদের) জন্মতিথি উৎসব বন্ধ করা যায় না? আগে পুতুলের বিবাহে বড়লোকরা বিস্তর খরচ করতেন। এখন তার প্রয়োজন নেই; বাচ্চারা

সবই পুতুল। এরা যখন বড় হবে তখন ঐ তাজমহলে যা দেখলাম তাই হবে। জওহরলাল মেশিন ভালোবাসেন, আর শিশুদেরও ভালোবাসেন। যে শিশু গ্যাজেট নিয়ে খেলা করবে তারা তাদের ভারতবর্ষকে এঞ্জিনীয়ারিং-এর সমস্যা হিসাবে দেখবে। সোশ্যাল এঞ্জিনীয়ারিং কথাটা আজকাল সমাজতন্ত্রে খুব চলছে। ব্যাপারটা সুবিধের নয়।

সেলাই করবার সিঙ্গার মেশিনকে গান্ধীজী পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, ওর পিছনে সিঙ্গার সাহেবের স্ত্রী'র প্রতি প্রেম ছিল। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আজ গত— রাজত্ব এঞ্জিনীয়ারদের, তাদের মূল্যবোধের এখন জয়জয়কার। বয়ার-এর গ্রেট হাঙ্গারের এঞ্জিনীয়ার নয়— মাত্র টেকনিশিয়ন। চাকরি মিলবে— আর কী চাই! পয়দাবারী বাড়বে— আর কী চাই!

১. ১১. ৫৫

বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। কোথায় পড়াশুনোর কথা ভাববে তা নয় কর্তৃপক্ষের একটা তথাকথিত জরুরি চিঠির উত্তর দিতে ডিপার্টমেণ্টের পাঁচ-ছ'জন অধ্যাপক সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ব্যস্ত রইলেন। ব্যাপারটি তুচ্ছ— ডিপার্টমেণ্টের কোন্ ঘরে কোন্ ব্যক্তি ক'ঘণ্টা ক্লাশ নেন। সেটা টাইম-টেবিলর ওপর নির্ভর করে এবং একঘরে অন্য ডিপার্টমেণ্টেরও কাজ হয়; তার ওপর টিউটরিয়াল ক্লাশের কামরা এবং তার টাইম-টেবিল তৈরি করেন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে ছোটাছুটি চললো সারাদিন। টিউটরিয়াল বস্তুটি একটি প্রকাণ্ড তামাসা, জুয়াচুরি বললেই চলে। সর্বত্রই তাই। অক্সফোর্ডে, কেম্ব্রিজে আছে, অতএব আমাদেরও থাকবে। সেখানে টিউটরিয়াল কতটা সার্থক সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ব্যাপারটা কেবল অন্ধ অনুকরণের জন্য সততাকে বলি দেওয়াই নয়, তার চেয়ে গুরুতর। এটা জানলা-সাজানোর চেয়ে খারাপ। এর গূঢ়ার্থ হচ্ছে এই— বিশ্ববিদ্যালয় আর শিক্ষাকেন্দ্র নয়, শাসনতন্ত্রের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের শাখা মাত্র। দিনে আট দশখানা এই ধরনের নিরর্থক চিঠির উত্তর দিতে হয়, হাতে লিখে। আর কেবল স্কীমই তৈরি হচ্ছে, ফল কিছুই হচ্ছে না। অধ্যাপকরা যোগী নন, যে মা ফলেষু কদাচন বলে কর্মই করে যাবেন। সাধে কী অধ্যাপকরা পলিটিশিয়ন হায় যাচ্ছেন। যাঁরা ফল চান তাঁরা দেখছেন যে, কর্তৃপক্ষের দরজায় ধন্না দিলে ফল হয়। তাঁরা দেখছেন দল না পাকালে ফল হয় না। তাঁরা দেখছেন কেবল পড়াশুনো করলে কেউ তাদের পোঁছে না, কেউ

তাঁদের কথা শোনে না, লেকচারার হয়েই দিন কাটাতে হয়, কনভোকেশনের সময় পেছনকার সীটে বসতে হয়। এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এতে কোনো ভুল নেই। যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দৌরাত্ম্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছে সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই কমিটি বসান কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্স ঢুকেছে তাই জানতে। আর প্রতিকারও সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে যান নতুন আইন বানিয়ে। তাঁবুর মধ্যে উট ঢুকলো আর বাসিন্দারা গেল বাইরে।

রেডিওতে জনকয়েক ছাত্র-ছাত্রী পড়ন্ত স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে আলোচনা করলেন। নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ স্পষ্ট হলো। আজকাল মাস্টার-দের সঙ্গে ছাত্ররা মেশামিশি করতে পারছে না। বেশ সাফ সাফ কথা শুনলাম। শুনতে শুনতে গোটাকয়েক প্রশ্ন মনে এলো। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ জমলে স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়বে ঠিক কীভাবে? ব্যক্তিগত সম্পর্কে দু'জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয় এবং অন্তত একজনের মধ্যে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়া চাই। ভালো গুরুর ভালো শিষ্য কী সর্বদাই মেলে? গুরুশিষ্য সম্বন্ধে যা গুজোব আছে তার কী সবটাই সত্য? য়ুরোপের মধ্যযুগের সে সম্বন্ধটি সব সময় মধুর ছিল না। আর আমাদের আশ্রমেও যে সবসময় সম্বন্ধটি আদর্শোচিত ছিল না তারও উদাহরণ আছে। টোলে না হয় লগুড়াঘাত চলতো না, কিন্তু পাঠশালায়, মক্তবে চলতো সকলেই জানে। আমার অভিজ্ঞতায় বলে স্নেহ ভালোবাসা পেলে ছাত্ররা ভদ্র হয়, কিন্তু তাই পেয়েই যে তারা ভালো ছাত্র হয় তা মনে হয় না। বেশিরভাগ ছাত্র মাস্টারদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, যদি আসে তো চাকরির জন্য। অতএব সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত হলে স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়বে কেন?

আমি খুব কম মাস্টার দেখেছি যাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে চান না। কিন্তু ক্লাশে সেটা অচল। লক্ষ্ণৌ-এর বি. এ. ইকনমিক্স ক্লাশে ছয়শ থেকে আটশ' ছেলে দেখেছি; এম. এ. ক্লাশেও দেড়শ থেকে দু'শ পর্যন্ত। আলিগড়ে এম. এ. ইকনমিক্স ক্লাশে প্রায় একশ। কি করে প্রত্যেককে চেনা যায়? তাদের আবার সকাল সন্ধ্যায় ল ক্লাশ। সময় কোথায় তাদের? আরেকটি কথা মনে এলো, বেশি মেলামিশির ফলে পরীক্ষার ফল ভিন্ন হবে না তো? আমার নিজের ভাগ্য ভালো এই ব্যাপারে। আচ্ছা, কোন্ মাস্টারদের সঙ্গে মেশামিশি করলে কোন্ ছাত্রদের উন্নতি সম্ভব? যাঁরা নতুন কথা বলতে পারেন, নতুনভাবে দেখতে পারেন, আর যাঁরা

নতুন কথা শুনতে চায়, ভাবতে চায়, দেখতে চায়। শেষোক্তদের সংখ্যাই বেশি মানছি। এখন এ-যুগে নতুন কথা, নতুন চিন্তার অর্থই বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা, সমালোচনা, অন্তত তাই থেকে শুরু। সমালোচনা করলে কর্তৃপক্ষ বলেন, **dangerous thought** প্রচার করছেন। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা, এমন কী স্বাধীন হবার পরও। তাতে হয়তো কিছু ভয়ংকর ক্ষতি হয় না, কিন্তু ক্ষতি হয় নিশ্চয়, মাস্টারদের এবং ছাত্রদেরও, কারণ, পরীক্ষার প্রশ্ন সেই মামুলি।

শেষ প্রশ্ন: স্ট্যাণ্ডার্ড পড়েছে তার প্রমাণ কি? মানদণ্ডটা কি? আমার একান্ত বিশ্বাস স্ট্যাণ্ডার্ড ভিন্ন হয়েছে, অতএব তুলনা করা যায় না। আমরা অবশ্য বলি উচ্ছন্ন যাচ্ছে, কিন্তু প্রমাণ কি? আমরা বলবো চোখে দেখছি পড়ছে। আমি উত্তর দেবো, আমিও দেখেছি উঁচু হয়েছে, আমারও মনে আছে একশ ছাত্রের মধ্যে ঐ গোটা তিন-চারেব স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল উঁচু, আর বাকি সব এখন যা তাই। এসব বুড়োদের কথা, গোঁড়ামির নামান্তর!

আরো একটি প্রশ্ন: যাঁরা বলছেন ছেলে ছোকরারা গোল্লায় গেল, তাঁদের নিজেদের স্ট্যাণ্ডার্ড কি গৌরীশৃঙ্গ? যাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের গলদ খোঁজেন, তাঁরা নিজেদেরই গলদ ঢাকতে চাইছেন না তো? এমন হয় শুনেছি। দেশের গোলমাল ঢাকা হয় অন্যদেশের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে; অন্তরের বিবোধ ঘোচানো হয় অন্যের সঙ্গে বিরোধে। দেশের যুবক-যুবতীর ওপর কর্তাদের এতটা দরদ আমি একটু সন্দেহের চোখেই দেখি।

২. ১১. ৫৫

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। এ-ধরনের শুকনো শীত লক্ষ্ণৌ-এ ছিল না, কলকাতা-বাংলা অঞ্চলে'তো নেই-ই। দিনে সূর্যের তাপ এখনও খর, মিঠে নয়, হয়ও না। পৌষ মাসে মাটির বারান্দায়, কী পুঁই মাচার নিচে, কাঁথা জড়িয়ে রোদ পোয়ানো, কোলে মুড়ি নারকেল কোরা, গেলাশে খেজুর রস, আর ঘরের ভেতরে ভাঁড় থেকে নলেন গুড়ের গন্ধ ভরভর, এ কেবল বাংলা দেশেই সম্ভব। অবশ্য সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জ্বরও বটে। সব আত্মকথার শৈশব অধ্যায়টিই মধুর। স্মৃতির নির্বাচন একদেশদর্শী না হলে মানুষে বাঁচতে পারতো না।

আজ আকাশ কোব্যাল্ট নীল ছিল। ঘুড়ি-পায়রা নেই বটে; কিন্তু

তোতা পাখি অসংখ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে নিমগাছে বসে, সূর্যমুখী পায় না বলে নিমফল খায়। এখানে প্রায় সব গাছই নিম, মধ্যে মধ্যে খেজুর গাছ। এম. এ. ও কলেজের "শীল" হলো খেজুর গাছ আর চন্দ্রকলা, ঈদের চাঁদ। একেবারে আরবী ব্যাপার। কিন্তু এত নিমগাছ কোত্থেকে এলো? ভারতের বাইরে কোন্ মুসলমান দেশে নিমগাছ এত প্রচুর। যতদূর জানি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নিমগাছের কোনো যোগ নেই। এইবার বুগেনভিলিয়া ফুটতে শুরু হবে। এত সুন্দর, এত রকমের বুগেনভিলিয়া কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। একজন অধ্যাপকের দাবি যে, তিনি চুয়াত্তর রকমের বুগেনভিলিয়া তৈরি করেছিলেন। আঠারো বকমের কানাড়া, দশ রকমের টোড়ি, আর বারো রকমের মল্লারের মতনই বোধ হয়।

এত বেশি বৈচিত্র্য, এত চুলচেরা.ভাগ করার প্রবৃত্তি ব্রাহ্মণ সভ্যতা ও বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতার শেষ যুগের লক্ষণ। ক্ষুধামান্দ্যের সময় স্বাদ জাগিয়ে রাখার ফন্দি হলো ঐ আচার আর চাটনির ঘটা! যে ইমন গাইতে পারে না, সে হেম-কল্যাণ গাইতে যায়! সহজ, সরল রুচির মধ্যে যে প্রসাদগুণ থাকে সেইটেই ধ্রুব, সেইটাই ক্লাসিক। বাকি সব খেয়াল।

•

সুধীন দত্তের রচনায় এত flying buttress যে তাকে গথিক বলতে ইচ্ছে হয়। অথবা, যদ্যপি, তথাপি···ইত্যাদির প্রয়োগ কি গদ্যসুলভ যুক্তির নিদর্শন, না নিগূঢ় সত্যের সম্মুখে সততাময় মনের সাবধানী প্রতিক্রিয়া? এই মন গুহানিহিত সত্তার একান্ত অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখতে পারে না, তাই অস্তিত্বের সাময়িক সততাকে ভেঙে ক্ষণ-ক্ষণ করতে চায়; অথচ বিশ্বাস চায়, তাই নিয়ম মানতে বাধ্য। এ-নিয়ম একধারে সমগ্র বিশ্বকে চালাচ্ছে। সুধীনের রচনাতে যে নিয়ম পাই সেটাও প্রায় দুর্নিবার। একধারে চরাচর বিশ্ব, অন্য ধারে ছন্দ। একধারে কসমস, অন্য ধারে ক্রাফট। দুটি নিয়মের সম্বন্ধ কি?

সুধীন, অন্যান্য কবিদের মতন বলতে রাজি নয় যে, কবিতার ছন্দ আর বিশ্বছন্দ একই বস্তু। বিজ্ঞান-সম্মত কার্যকারণ-পরম্পরাকেও সে ছন্দের মধ্যে আনতে পারে না— কোনো কবিই পারে না, যদিও সেটা কবিতার বিষয় হতে দেখেছি। তাই সুধীনের রচনায় সম্বন্ধের দুটি গুণ চোখে পড়ে। এক— দুর্নিবারতা, আর নৈর্ব্যক্তিকতা। যারা অতোটা নিয়ম মানে, তারা ব্যক্তিকে বাদ দিতে বাধ্য। এই মনোভাবকে সাধারণত 'অবজেক্টিভ' বলা হয়। সুধীন কবিতাকে, আর্টকে ইম্‌পার্সন্যাল করতে চায়। জাঁতাকলের

চাপে হতাশাই উৎপন্ন হয়। হতাশা ফ্রাস্ট্রেশন নয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও নয়, নঙর্থক নয়, সদর্থক। ত্রিশ দশকের মনোভাব বলে একে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এটা বিষাদ; এবং এর সাক্ষাৎ প্রত্যেক ক্রান্তির মূলে পাওয়া যাবে। মধ্যযুগের অবসানের ও নতুন যুগের আগমনের মুখে এই বিষাদের ছায়া থাকে। দ্বন্দ্বটির রূপ ব্যক্তিক না হলেও তার প্রকৃতি নিতান্তই মানবিক, ঐতিহাসিক। তাই মনে হচ্ছে, সুধীনের রচনাশৈলীকে ধ্রুবপদ্ধতির মধ্যে ফেলা অসঙ্গত। ধ্রুবপদ্ধতির মর্ম শান্তি, নিয়মানুবর্তিতা নয়। প্রসাদ থেকেই প্রসন্নতা, কিংবা প্রসন্নতা থেকেই প্রসাদগুণ।

সুধীনের কবিতায়, গদ্যে অর্থাৎ তার বিষয়বস্তুতে, বৌদ্ধদর্শনের ছাপ পেয়েছি। সৌতান্ত্রিক কী বৈভাসিক ততটা নয়, যতটা মাধ্যমিক। দুটি প্রধান লক্ষণ, ক্ষণিকবাদ আর ডায়েলেক্‌টিক। 'শূন্যতা'ও খানিকটা। এবং পারমিতাবোধের প্রক্রিয়াও খানিকটা পেয়েছি তার শৈলীতে— যথা, পরিমাণ ও পরিণতিতে। রচনাকে সে 'পারফেক্‌ট' করতে চায়, আর তার দ্বৈততা ও বিরোধ সংজ্ঞা পরিমাণদ্যোতক। তার ডায়েলেক্‌টিক হেগেলিয়ান নয়, মার্কসিস্ট তো নয়ই। তার কাছে সিনথেসিস নেই, অতএব স্পাইরালও নেই। এখানেও সুধীন মাধ্যমিক, সন্দেহ হয়। কিন্তু সুধীনের 'করুণা' নেই- বিষাদই আছে।

সময় নেই, নচেৎ এই বিষয়ে আরো ভাবা যেতো। একটা কথা খুব জোরে মনে হচ্ছে। বিদেশী সাহিত্যালোচনায় কোন্ কবির মধ্যে কতখানি খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাব দেখাবার রীতি সুপ্রচলিত। রবীন্দ্রনাথের রচনা-আলোচনায় উপনিষদের প্রভাব, কবীরের প্রভাব অনেকে খুঁজেছেন ও পেয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য হিন্দু দর্শনের, হিন্দু ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে বিচার বড় বেশি নজরে পড়েনি। যা কিছু তবু রবীন্দ্র-সমালোচনায় আছে, যৎসামান্য। কিন্তু অন্যান্য লেখকের বেলা কিছুই হয়নি। এটা নিতান্ত দুঃখের কথা। আমরা কি সবই পুরোপুরি বিদেশী? আরেকটি কথা। বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে— তার কারণও আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তো ভারতেরই; এবং যদিও আমরা আর বৌদ্ধ নই, তবু আমরা বিশেষত বাঙালিরা, সকলেই প্রায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। (বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরও বোধ হয় তাই ছিলেন)। শেলী থেকে এলিয়ট-অডেন-মালার্মে সকলেরই প্রভাব দেখবো, অথচ বৌদ্ধ ও ইসলামী প্রভাব নজরে পড়বে না এ কেমন চোখ! আত্মবিস্মৃতির মতন বোকামি আর নেই। আমি জনসজ্ঘী আলোচনা চাইছি না; যা আছে তার স্বীকৃতি ও তার বিচারই

চাইছি। কেবল জন-সাহিত্য, জন-সাহিত্য চিৎকার করলেই হয় না।

জন-সাহিত্য, জন-সঙ্গীত, জন-নৃত্য নিয়ে মাতামাতি করবার অবশ্য কারণ আছে। ধ্রুপদ-খেয়াল শেখা, গাওয়া শক্ত; ভারত নৃত্য অত্যন্ত কঠিন জিনিস; মেঘদূত, মেঘনাদবধ বোধের জন্য কাঠখড় চাই। 'পীপল্‌স্ আর্টে' ও-সব বালাই নেই, অন্তত, তাই আমরা মনে করি। পরিশ্রম, ডিসিপ্লিন, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের পছন্দ নয়; এবং তাঁরাই এখনকার আমরা। দ্বিতীয় কারণের উৎপত্তি প্রথম কারণেই লুপ্ত রয়েছে। সেটা হলো এই যে, ধ্রুব-পদ্ধতির আর্টে কোনো তেজ নেই মনে হয়; এবং আমরা তেজ চাই। কেবল তাই নয়; আমাদের ধারণা জীবন মানেই তেজ। 'সজীবতা' কথাটাই তার প্রমাণ। সেজন্য আমরা গানে বাজনায়, নাচে লম্ফ-ঝম্প দেখলেই বলি কী সজীবতা, কী ভিগ্যর! সাহিত্য-রচনা, বক্তৃতার বেলাও তাই। কিন্তু এটা আংশিক সত্য। আর্টের তেজ আর জীবনের তেজ এক বস্তু নয়। রাশিয়ান জন-নৃত্যের লম্ফ আর রাশিয়ান 'ব্যালের' উল্লম্ফনের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। একটাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জয়, অন্যটিতে তার ক্ষয়, তার পরাজয়। আর্টের তেজ জৈব ও আধিভৌতিক তেজের চেয়ে ম্রিয়মান হতে বাধ্য; কারণ তখন যুদ্ধের অবসান হয়েছে, জয় হয়েছে, অথচ উল্লাস নেই, এসেছে বিষণ্ণতা। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের বিষাদ যুদ্ধের মধ্যে। তার বর্ণনা সঞ্জয়ের মুখে, যুদ্ধান্তে তাই আর্ট। ট্রাইব্যাল আর্ট শিকার নয়, শিকারের পরিবর্ত; প্রিমিটিভ আর্টও তাই। প্রত্যেকটাই সোফিস্টিকেটেড অত্যন্ত।

রোমঁ্যা রোলাঁ মিকেলেঞ্জেলোর জীবনীতে তাঁর একটি প্রস্তর-মূর্তির ব্যাখ্যায় এই কথাই বলেছেন। বিজয়ী গ্ল্যাডিয়েটার জয়ের পরমুহূর্তে বিষণ্ণ। হাতের মারণযন্ত্র হাতেই রইলো, ব্যবহার আর হলো না।

গোলদীঘির এক বেঞ্চে বসে শিশিরবাবুও এই কথাই বলেছিলেন। 'সীতা'র অভিনয়-উপলক্ষে কে একজন লিখেছিলেন যে, কেষ্টবাবুর গানে কোনো জীবন নেই, এক্‌সপ্রেশ্যন নেই। তারই উল্লেখ করে শিশিরবাবু বলেছিলেন, 'কোথায় সীতা, কোথায় সীতা বলে কি কেঁদে বেড়ানো উচিত ছিল?'

আমার অভিজ্ঞতাও তাই বলে। হালিশহরের এক পাড়ার 'প্রফুল্ল'র অভিনয়ে প্রফুল্ল এতই সজীব ও স্বাভাবিকভাবে কেঁদেছিল যে, হাসির ঠেলায় যবনিকা নামাতে হলো।

তবে এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, জীবন-স্রোতের বিপক্ষে আর্টের নৌকা বেশি দিন চালানো যায় না। এও ঐতিহাসিক সত্য যে, সংকটকালে আর্টকে জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে হয়েছে, নচেৎ বাঁচেনি। তবে ঐতিহাসিকভাবেই সত্য, সৃষ্টি কিংবা উপভোগের হিসেবে নয়। এবং জীবনের অর্থ এক্ষেত্রে কর্ম নয়, কর্মপ্রবণতা— যাকে সংহতি দেওয়াটাই আর্টের ধর্ম।

১৩. ১১. ৫৫

পণ্ডিতজী এলেন গেলেন। লাভের মধ্যে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় অনেক টাকা পেলো। তিনি লাইব্রেরি আর হস্টেলের ভিত্ পত্তন করলেন। এখানকার চোখের হাসপাতাল খুব নামজাদা। ড. মোহনলালের কৃতিত্ব তারিফ করতে হয়। সেখানেও টাকা এলো কিছু। আমাদের চান্সেলার দাউদী বোরা সম্প্রদায়ের মোহন্ত। কুবের, তবে দিতে জানেন। দু'দিনে ভদ্রলোক প্রায় চার লক্ষ টাকা দান করলেন। সবচেয়ে মজা প্রতি ডিপার্টমেণ্টের কর্তাকে এক জোড়া শাল ও মিঠাই উপহার।

পণ্ডিতজীর মেজাজ ভালো। সকালে অমৃতসর থেকে উড়ে দিল্লী, দিল্লী থেকে মোটরে আলিগড় এবং প্রায় বিশ মিনিট আগে পৌছনো। গলার আওয়াজে ও মুখে একটু যেন বয়সের চিহ্ন দেখলাম। খাবার সময় কথাবার্তার সুযোগ ছিল না। ট্রাফিক কণ্ট্রোলের ঠেলায় বিকেলের চা-এ যেতে দেরি হলো।

জওহরলাল এখন লীডার অব দি হাউস ইত্যাদি— পরে তিনিই হবেন লীডার অব দি অপোজিশন। গান্ধীজীকে ভুলতে বসেছি নানা কারণে, কিন্তু জওহরলালের অবর্তমানে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে হবে ভয় হচ্ছে। নেতার নেতৃত্বের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়তা নয়, দৈনিক জীবনে বিস্মরণীয়তা।

২৩. ১১. ৫৫

ডবলিউ. এ. লিউইস-এর 'দি থিওরি অব ইকনমিক গ্রোথ' ও টি. আর. ভি. মূর্তির 'দি সেণ্ট্রাল ফিলজফি অব বুদ্ধিজম্' শেষ করলাম। সকালে ইকনমিক্স, আর বিকেলে ও সন্ধ্যায় বৌদ্ধদর্শন। এই প্রকার শ্রম-বিভাগে

আমার শরীর ও মন ঠিক থাকে। লিউইস-এর ভাষা সর্বদাই প্রাঞ্জল। এই বইখানিতে এমন একটি বাক্য নেই যা বুঝতে কষ্ট হয়। ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং মাথা ঠাণ্ডা। উপনিবেশের বিশেষত আফ্রিকার, হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল— নিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রো, এখন ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। ডোমার-হ্যারড-স্পেংলার-স্পীগেল প্রভৃতির রচনায় অনুন্নত দেশের চর্চা আছে নিশ্চয়, কিন্তু সবই যেন উন্নত দেশের এবং মাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। লিউইস-এর বইখানির বিশেষত্ব ঐখানে। কোন্ সামাজিক কারণে অনুন্নত দেশের উন্নতির পথে বাধা আছে ও উঠছে তার বিশ্লেষণ ও বিশদ বিশ্লেষণ এই বইখানিতে প্রথম পেলাম। অর্থাৎ লিউইস-এর মতে আমাদের দেশে প্ল্যানিং মাত্র অর্থনীতির ব্যাপার নয়, সমাজতত্ত্বেরও বটে। বহুদিন থেকে আমি এই কথা বলছি, কেউ শোনেনি। একজন মাঞ্চেস্টারের অধ্যাপকের রচনা পড়ে যদি কোনো ফল হয়! এক অদ্ভুত চক্রের মধ্যে আমরা আটকা পড়েছি। আমার বিশ্বাস যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে আমরা এখনও পশ্চিমের দাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্ল্যান-পীরিয়ডের পরে হয়তো দাসত্ব ঘুচবে। এতদিন অপেক্ষা করা আমার ধাতে বসে না। তবে শেকল কাটতে যেন খানিকটা রাজি হয়েছি মনে হচ্ছে।

মূর্তির বইখানি আমার খুব ভালো লাগলো। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি সহজ ভাষা। বৌদ্ধ ডায়েলেক্‌টিক যে এত তীক্ষ্ণ জানতাম না। বিদেশী ডায়েলেক্‌টিক পড়ে এসেছি। কী কপাল! নিজেকে অত্যন্ত শেকড়-ছেঁড়া মনে হচ্ছে। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যে কিছু পড়িনি, তা নয়। কিন্তু যা পড়েছি, তা প্রায় সমস্তই বিদেশীর লেখা এবং ইংরেজীতে। বিদেশী ডায়েলেক্‌টিকের সঙ্গে মাধ্যমিক ডায়েলেক্‌টিকের পার্থক্যটি আমার কাছে বেশ মূল্যবান। সব মার্কসিস্টদের এ বইখানি পড়া উচিত।

একটা নিতান্ত মোটা কথা মনে উঠলো। মাধ্যমিক কি সত্যই বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যমণি? সত্যই কি মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শনের শ্রেষ্ঠ দান, সবচেয়ে অর্থবাহী সামগ্রী? মূর্তি 'বুদ্ধিজম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তার অর্থে দ্ব্যর্থবোধ রয়েছে— দর্শন ও ধর্ম। ভালো কথা— এ দেশে দর্শন ও ধর্ম অভিন্ন। তাই যদি হয়, তবে কেবল মাধ্যমিকের দার্শনিক যুক্তি-পদ্ধতির তাড়নায় কি বৌদ্ধ ধর্মের অতোখানি প্রসার হয়েছিল? মূর্তি একটু যেন মাধ্যমিকের ওকালতি করেছেন, সন্দেহ হলো। বিদেশী মতে অবশ্য ধর্ম ও দর্শন এক বস্তু নয়। সেই হিসেবে মূর্তি ঠিকই করেছেন। (তার ওপর

বইটা থিসিস থেকে তৈরি হয়েছে।) কিন্তু তা যদি হয়, তবে মূর্তির ওকালতি ভারতীয় ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মানতে হয়। এখানে একটা গলদ আছে সন্দেহ হচ্ছে। মহাযানের সামাজিক প্রতিবেশটা পেলে খুশী হতাম। মাধ্যমিকের ধর্ম কি ছিল? অবশ্য মাধ্যমিকের ধ্যানধারণা শিক্ষার পরিচয় পেলাম। কিন্তু ক'জন লোক ঐ প্রকার 'সেণ্ট্রাল ফিলজফি'র আকর্ষণে বৌদ্ধ হয়েছিল? এই খবরটি পেলে আমি সন্তুষ্ট হতাম। আমি হয়তো অন্যায় প্রত্যাশা করছি। মূর্তি যা দিয়েছেন, সে জন্য আমি তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

অনেক সংস্কৃত কথার ইংরেজী প্রতিশব্দ শিখলাম। কুমারস্বামীর অনু-বাদের মতন নয় অবশ্য। বাংলা লেখবার সময় ব্যবহার করা যাবে।

কী অদ্ভুত অবস্থা আমাদের! বাংলা লিখি তিন পাক ঘুরে— সংস্কৃত থেকে ইংরেজী, ইংরেজী থেকে সংস্কৃত, তার পর সংস্কৃত থেকে বাংলা। ঐ তিন পাকই থেকে যায়— আজকালকার বিবাহের মতন।

২৪. ১১. ৫৫

রেডিও সঙ্গীত সম্মিলনীর কিছু কিছু গান-বাজনা শুনলাম। উদ্বোধন-সঙ্গীত মোটেই জমেনি। চন্দ্রশেখর পন্থ-এর ধ্রুপদ শুনে খুশী হলাম। চন্দ্রশেখরকে তার শৈশব অবস্থা থেকে জানি। তার মামা ও মাতামহ আমার পরিচিত ছিলেন। এলাহাবাদে হরিনারায়ণবাবুর কাছ থেকে ধ্রুপদ শিখে লক্ষ্ণৌ-এ খেয়াল শিখতে আসে। সেই সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃতে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণার কালে অসুস্থ হয়ে পড়ে। রানিখেতের কাছে দ্রোণাগিরি পাহাড়ে এক আশ্রমে থাকতো, আর ভজন গাইতো। দশ বারো বৎসর তার কোনো খোঁজ পাইনি। তার কণ্ঠ শুনে খুব ভালো, লাগলো। বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বিশুদ্ধ পদ্ধতি এবং বিশুদ্ধ ভঙ্গি। একটু যেন গলা কাঁপছিল, মনে হলো। আর হাম্বিরের মধ্যে কল্যাণ অংশটুকু যেন একটু বেশি প্রকট। তবু চমৎকার। হাম্বির নিয়ে ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি মনে পড়ছে। মেয়েদের মধ্যে যা শুনলাম, তার মধ্যে হীরাবাঈ-এর গায়নই আমার মন হরণ করে নিলে। দরবারী কানাড়ার শেষটা কেবল ঝন ঝন করছিল। পান্নালাল ঘোষের বাঁশি আর বিসমিল্লার সানাই বাজনা চমৎকার। রবিশঙ্করের সেতারের তুলনা-মূলক বিচার করতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছিলো। বিলায়েৎ, আলি

আকবর কী বাজিয়েছিল ?

জীবনে এত সঙ্গীত-সম্মিলনীতে যোগ দিয়েছি যে, আর সশরীরে যোগ দিতে ভালো লাগে না। রেডিওর মারফত অনেক গুণীর গান-বাজনা শুনতে পেয়েছি। তবু যেন নাকুর বদলে নরুণ। সামনে বসে শুনলে অনেক বেশি উপভোগ করা যায়। তবু মন্দের ভালো। লক্ষ্ণৌ-এ তবু কখনও কখনও সামনে বসে শুনতে পেতাম, লাইব্রেরি অসহ্য হলে ছুটে শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জিণকারের ঘরে যেতাম। এখানে সে-গুড়ে বালি!

এই সম্মিলনীর জন্য একটা ফরমায়েসী ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠিয়েছি। Great masters I have heard…মুখে বলে গেলাম, স্টেনো লিখে নিলে। শুনেছি ছাপা হয়েছে। আমার নিজের পছন্দ হয়নি। ওর অনুবাদ না করাই ভালো। ডিক্‌টেশনের সময় কথা আসে, চিন্তা স্থগিত থাকে, অন্তত রুদ্ধ তো হয়ই। তা ছাড়া, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আগ্রহে মন্দা পড়েছে। শুনতে ভালো লাগে, তাও সব সময় নয়, ব্যস, ঐ পর্যন্ত। একদিন মনে হতো সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার উৎসাহ মৃত্যুদিন পর্যন্ত কমবে না এবং কমে যদি তো চিত্রকলায়, সাহিত্যে, কবিতায়। এখন দেখছি কোনো গান-বাজনা শুনতে গেলেই মনে ওঠে কে কবে ঐ গান, ঐ গৎ, ঐ রাগ কীভাবে গাইতো, বাজাতো। এমন কী এক একটি স্বর সম্পর্কেও তাই। বার্ধক্যের চিহ্ন, হয়তো বা স্মৃতির ক্রিয়া সঙ্গীতেই সবচেয়ে বেশি। প্রুস্ত-এর লেখাতেও তাই দেখি। এখন মনে হচ্ছে, প্রতি আর্টের কাল-প্রত্যয় ভিন্ন। স্মৃতিরও রকমফের আছে। দুটো মিশে গেলে-ভোলা যায় না কেবল নয়, অভিজ্ঞতা জাগ্রত থাকে, পদ্মের মতন।

চিত্রের কাল একটি ক্ষণ, প্রমাণ ইম্প্রেসনিস্ট ছবি, যেটা পূর্বতন পশ্চিমী চিত্রকলার চরম পরিণতি। একটি ক্ষণ এই জন্য: আকাশকে পটে বাঁধতে হলে সময়কে টুকরো করতে হয়। দ্রুতি ও স্থান একত্রে সম্ভব নয়। ভাস্কর্যও তাই, তবে তার ধর্ম হলো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের সমবায়ে পূর্ণতার আভাস দেওয়া— যথা rondure (রণ্ডিয়র)। রোঁদ্যার তৈরি মূর্তির চারধারে ঘুরলে তবে তার ঐক্যের সন্ধান মেলে। স্থাপত্যের কাল হলো যুগ। এখানে যুগটাই ক্ষণ। চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সব কলারই ঐ এক প্রয়াস— আকাশকে ধরা, বাঁধা, সময়ের একটি গণ্ডির মধ্যে পোরা— পুরে জয় করা। সঙ্গীতের প্রাণ কাল অর্থাৎ লয়, তারই ভাঙা-গড়া। সঙ্গীতের আকাশ চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের আকাশ নয়— বাইরের বস্তু নয় যাকে কব্জায়

আনতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের আকাশ উপমা মাত্র। সঙ্গীতের দীর্ঘ অবকাশকেই আকাশ বলা হয়। ধ্রুপদে 'স্পেস' আছে, কারণ সেটা বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়।

তেমনই স্মৃতিও আকাশ ও অবকাশ, অর্থাৎ কালধর্মী। বেশির ভাগ সময় কালধর্মী। কালের স্মরণ নয়, ভিত্তিটাই কাল— প্রমাণ স্বপ্ন। তাই সঙ্গীত স্বপ্নময়। গান শুনলে মেয়েরা স্বপ্ন দেখেন শুনেছি। পুরুষেও দেখেন, তবু লজ্জায় বলেন না। কারণ, কাল চেতনাহীন, চেতনার শত্রু।

গন্ধের কলা নিশ্চয় আছে। বেশি সিগারেট খেলে সে-কলার জ্ঞান জন্মায় না শুনেছি। গন্ধ-কলা উপভোগের জন্য সিগারেট ছেড়ে মদ ধরতে পারি না।

ফুল— গোলাপ, জুঁই, বেলী, চামেলী, গন্ধরাজ…শখ গিয়েছে। আগে লোকে আমার বাগান দেখতে আসতো।

এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে বেরিয়ে এসে দেখি, একটা গাছে তিন রঙের গোলাপ ফুটেছে, সাদা, লাল, হলদে— কলম বসিয়েছিলাম। কী যেন হয়ে গেল।

আর এক বসন্তের সকাল। বোম্বাই থেকে রাতে ফিরেছি। সকালে দেখি বাগানের পশ্চিম ধারে কাঞ্চনের বাহার। পাঁচটা গাছ ফুলে ছেয়ে গিয়েছে— একটা পাতা নেই, সব ফুল। কাঞ্চন কি চেরীর জাত? বিকেলে ছাত্রদের ডাকলাম— ইচ্ছে হচ্ছিলো ছুটি দিই। পড়ে যা হয় তা তো দেখলাম— তার চেয়ে চেরী-কাঞ্চনের ফুল দেখুক। এ-বিদ্যে শুকনো। রবীন্দ্রনাথ ঠিক ধরেছিলেন, কিন্তু অন্যে ধরে রাখতে পারলে না।

২৯ ১১ ৫৫

মথুরার মিউজিয়ম দেখে এলাম। বৃন্দাবন গেলাম না। যমুনা-বিহার করা গেল। মাঝি বললে, কচ্ছপগুলো বৈষ্ণব। অত্যন্ত নোংরা শহর, আলিগড়ের চেয়ে পরিষ্কার শুনলাম। একটা মন্দিরে ঢুকলাম, মোজাও খুলে। মথুরা দেখে যদি শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে ওঠা হিন্দুত্বের লক্ষণ হয়, তবে আমি অ-হিন্দু। আমার পারিবারিক সংস্কারও হতে পারে। আমরা শাক্ত-বৈদান্তিক। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিরোধ হয়তো আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। আমাদের বাড়িতে কখনও কীর্তন গান হয়নি। রসময় মিত্র-মহাশয় আমার পিতামহের ছাত্র, হিন্দু স্কুলের অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর

নেবার পর কীর্তনে মনোনিবেশ করেন। আমার বাবা দু-তিন বার তাঁর কীর্তনের আসরে উপস্থিত হন। প্রত্যেকবারই একটা না একটা অঘটন ঘটেছে দেখে রসময়বাবু তাঁকে বলেন, 'ওহে তুমি আর এসো না।' কীর্তন ভেঙে যাওয়াতে বাবা মহা খুশি হয়েছিলেন। আমার জ্যাঠতুতো বোনের স্বামী বৈষ্ণব হয়ে যান, ফলে তিনিও হলেন। দুর্গাপূজার সময় তাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি। আমার বোন জোর করে আসেন। কর্তা-গিন্নীদের কাছে তাঁকে কী শ্লেষই না উপভোগ করতে হয়েছিল! আমার ভগ্নীপতি মোটর-চাপা পড়ে মারা যাবার খবর শুনে বাড়িতে মন্তব্য হলো, 'ধর্মান্তরের অভিশাপ ভোগ করতেই হবে।' অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। আমার বন্ধু হরিদাসকে (মডার্ন আর্ট প্রেসের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়) বাবা অত্যন্ত ভালোবাসতেন, কিন্তু 'হরিদাস' বলে ডাকতেন না, 'ওহে, শুনছো' বলতেন। একদিন শুনলাম তিনি বলছেন, 'তুমি এত ভালো ছেলে, কিন্তু নামটি বাবা অমন কেন হলো? তবে কথাটা (অর্থাৎ হরি শব্দটি) ক্লীং ক্রীং থেকেই এসেছে মনে হয়, এই যা।' খুব খারাপ লেগেছিল।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁর মৃত্যুশয্যায় কৃষ্ণভামিনী দাসীর মুলতানের রেকর্ড শোনানো। তিনি উচ্চ-সঙ্গীতের নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। ডাক্তারে বলে গেলেন বাঁচবেন না, তাই শখ মেটাতে যাই। কৃষ্ণভামিনী তখনকার বাঙালি গায়িকার মধ্যে ভালো খেয়ালী বলে পরিচিত। রেকর্ডটা মুলতানী মনে হচ্ছে। তিন মিনিটের রেকর্ড শেষ হতে না হতে তিনি বলে উঠলেন, "উই, উই, উই— কেবল তানই হচ্ছে। যার গলায় স্বর বসেনি, সুর বসেনি, সেই তান মারে। যার সরল রেখা হয় না, সেই রং চাপায়।" হয়তো ভুল, তবু একটা স্ট্যাণ্ডার্ড। প্রমথ চৌধুরীমশাইকে ঘটনাটি বলি। তিনি তারিফই করলেন।

একদিন বিজয় মজুমদারের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের বৈষ্ণব বিদ্বেষ সম্বন্ধে কথা হয়। তিনিও আমার পিতামহের ছাত্র ও আমার বাবার সহাধ্যায়ী। তিনি বললেন, "ওটা তোমাদের ভাটপাড়ার তন্ত্র-বেদান্তের ধারা। নবদ্বীপ যে নবদ্বীপ, সেখানেও তাই ছিল। আমার মামার বাড়ি (?) নবদ্বীপে। একবার ছেলে-বয়সে যাই। পাড়ায় কীর্তন হচ্ছে শুনতে গেলাম। ফিরতে দেরি হলো। দাদামশাই ডেকে পাঠালেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?' 'কীর্তন শুনছিলাম।' ভদ্রলোক বললেন, 'গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসো।' "

এ সব পুরানো কথা শোনাবার ইচ্ছা হচ্ছে। বাঙালি ভাবসর্বস্বই শুনে

এলাম। কিন্তু বাংলার কৃষ্টিতে যে একটা প্রবল যুক্তি, নিষ্ঠা ও দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির ধারা আছে, সাধারণ লোকে জানে না, মানে না। ১৯২০ কী ১৯২১ সালে গান্ধীজী একবার বাঙালিকে 'ইমোশন্যাল' বলেছিলেন। প্রতিবাদ করে একটা প্রবন্ধ লিখি। 'মডার্ন রিভিউ'তে পাঠাই। ফেরত পাই। পরে 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে বেরোয়। প্রবন্ধটি আমার কাছে নেই। আমি ঐ ন্যায়, নিষ্ঠা ও তন্ত্রের ধারা দেখাতে যাই। নিষ্ঠার ইতিহাস ঠিক দিতে পারিনি। ভাটপাড়ায় আজকাল শুনেছি নতুন পাণ্ডিত্যের প্রবাহ এসেছে। যদি কোনো ভট্টাচার্য নিষ্ঠার ধারা ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে লেখেন, তবে দেশের উপকার হয়। আধুনিক বাংলার প্রকট 'ইমোশন্যালিজম' বিজয়কৃষ্ণ থেকে আরম্ভ— শিশির-চিত্তরঞ্জন-এ বিকাশ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে চরমতা, ও কিসে পরিণতি না লেখাই ভালো। সীমান্ত (ফ্রন্টিয়ার) সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই বাংলার কৃষ্টি। শরৎকালের মেঘের মতন নক্সার বাহার। স্থিতিস্থাপকতা নেই। রবীন্দ্রনাথ একদিন বললেন, 'কি করবো বলো! আমরা যে কেবল অনুকরণ করতে পারি না।' গানের কথা হচ্ছিলো।

মথুরার স্থাপত্যই আমার মন অধিকার করে নিলে— কেষ্টো নয়, বিষ্টু নয়, রাধা নয়, গোপী নয়, ঘাট নয়, টিলা নয়, পেঁড়া নয়, পেতল নয়। দুটো জলজলে ধারণা নিয়ে ফিরলাম। (১) ভারতীয় আর্ট রিলিজিয়স নয়, অন্য আর্টের মতনই পেগান। কনিষ্ক-হুবিষ্ক রাজার মতনই দাঁড়ায়, প্রার্থীর মতন নয়, শ্রমণের মতন নয়, পূজারীর মতন নয়। মথুরার সুন্দরী, সুন্দরী মেয়ে, দেবী নয়। (২) ভারতবর্ষ গ্রহণ করতে কখনও ভয় পায়নি : হে ভগবান, আর যেন না পায়! ভারতবর্ষের আন্তরিক শক্তি তার পাকস্থলীতে, ঐ মথুরার চৌবেরই মতন। কেউ কেউ নাকি একসঙ্গে দশ সের খেয়ে হজম করতে পারে।

৩০. ১১. ৫৫

বিশ্রী লাগছে সারাদিন। এত নিয়ম-কানুন, এত বাঁধাবাঁধিতে ভালো ছেলে তৈরি হয় না। ছাত্রদের জন্য নিয়ম না নিয়মের জন্য ছাত্র? তলা যত ভুয়ো, ওপরে তত শাসন! এত অনুশাসনপ্রিয়তা দুটি দুর্বলতার লক্ষণ; স্বাধীনতাকে ভয়— যেজন্য ডিক্‌টেটারশিপের প্রয়োজন, আর আত্মবিশ্বাসের অভাব। ল' যদি আস (ass) হয়, রুলসের মিউলস হতে জৈব নিয়মে

কোনো বাধা নেই। সৃষ্টির অক্ষমতায় ও একগুঁয়ে আত্মপ্রসন্নতায় rules are mules। অথচ সাধারণে বলে .কিনা ছাত্ররা উচ্ছন্ন গেল, আর অধ্যাপকরা নিরাগ্রহ! বিশ্ববিদ্যালয়ে— যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে— অধ্যাপনা করতে গেলে মাত্র নিয়ম-কানুনে ওয়াকিবহাল হলেই খাশা চলে, পড়াশুনোর দরকার হয় না, বরঞ্চ ক্ষতি হয় সব দিক থেকে।

ব্যাপারটা গুরুতর। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বুরোক্রেসি ঢুকে সর্বনাশ করছে। এই রকম আরো বেশি দিন চললে কেবল সরকারী ডিপার্টমেণ্টই হয়ে যাবে। লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ তাই হয়েছে। ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের হাতে অনেক ক্ষমতা এসে গেল।

৪. ১২. ৫৫

অমল হোম চিঠি লিখেছে 'মনে এলো' সম্বন্ধে। তার কাছে ব্রজেন শীল সম্বন্ধে একটি গল্প শুনলাম। প্রশান্তবাবু, রাধাকুমুদ, ও রাধাকমলবাবুরা আরো অনেক কাহিনী শোনাতে পারেন। কিন্তু তাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি, বই লিখতে ও কাজ করতে এত ব্যস্ত যে, তাঁদের সময় নেই। গল্প বলাটাকে হয়তো একটু ছোট ভাবেন। অমল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে. যে, ব্রজেনবাবুর বইখানির নাম 'New Essays in Criticism'। তার একটা অধ্যায় হলো Neo-romantic movement in Literature, তার তৃতীয় সেক্‌শ্যন— The Neo-romantic movement in Bengali Literature। লেখাটা প্রথম বের হয় Calcutta Review-এ (1980—91); কীটস-এর ওপর তাঁর লেখাটা ১৮৮৮ সালের— Hyperion সম্বন্ধে লেখাটা 'based on a paper written in 1882—83।'

অমলের স্মরণশক্তি খুব ভালো। রেফারেন্সগুলো সে আবার গুছিয়ে রাখে। আমার অভ্যাস ঠিক উল্টো। আমার জীবনে যাঁদের দেখেছি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মানুষ (মেয়েমানুষ নয়) হলেন সি. ওয়াই. চিন্তামণি। ১৯২২ কী ২৩ সালে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অতুলপ্রসাদ (সেন) বললেন, 'সি. ওয়াই তোমার কিছু ট্রিক্স দেখাও।' সি. ওয়াই-এর গালভরা পান, মুখের কোণে সিগারেট, তার ধোঁয়ায় এক চোখ বন্ধ। শুরু হলো ট্রিক্স। Z অক্ষর যার আদিতে সেই সব নাট্যশালার নাম; তার পর পোপ-এদের নাম, সন তারিখ। গোকরণ মিশ্র বললেন; 'কে আর তোমার ভুল ধরতে যাচ্ছে। এখন বলো দেখি বোম্বাই হাই-

কোর্টের চীফ জাস্টিসরা কে কবে চাকরি করেছেন?' চিন্তামণি গড় গড় করে বলে যেতে লাগলেন। বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব বাধা দিলেন, 'ও-সব চলবে না। আমি একটা সাল বলছি— কোন্ কোন্ স্বনামধন্য উকিল ঐ সালে জন্মেছিল?' 'কোন্ দেশের?' 'এই অঞ্চলের।' আবার গড় গড় করে নাম উচ্চারিত হলো। অতুলদা বললেন, 'এই সালের একটা মাসে আসা যাক'— সালটা আমার মনে নেই। তারও তালিকা শুনলাম। 'এবার বলো ঠিক তারিখটা।' তারিখটাও আমার মনে নেই। চিন্তামণি দু'-'জনের নাম নিয়ে বললেন, 'And last but not least my friend on the right': অর্থাৎ অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদ খুব হেসে উঠলেন, 'এইবার তোমাকে পাকড়েছি। আমার জন্ম তারিখটা ভুল বলছো।' চিন্তামণির কালো মুখ বেগুনে হয়ে উঠলো। সিগারেটটা কল্কের মতন ধরে টান দিতে লাগলেন। প্রায় আধ মিনিট পরে চিন্তামণি বললেন, 'Go and ask your mother.'

অতুলপ্রসাদ উত্তর দিলেন, 'তার প্রয়োজন নেই।' কিন্তু তিন-চারদিন পরে অতুলদা এসে বললেন, 'ওহে ধূর্জটি লোকটাকে নিয়ে পারা গেল না। চিন্তামণির ডেট্‌টাই ঠিক।' পরে জানলাম, চিন্তামণি কোনো একটা কমি-টির সভ্য হয়ে বছর কয়েক আগে কলকাতা যান। একদিন অতুলদা'র মা ছেলের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর বন্ধুদের খাওয়ান— তার মধ্যে ছিলেন চিন্তামণি। এই হলো সূত্র।

চিন্তামণির কিন্তু গোখলের জীবনী লেখা আর হলো না। যে বই লিখে গেলেন সেটা তাঁর যোগ্য নয়।

ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীমহাশয়ের স্মরণশক্তিও অপূর্ব। তবে তাঁর ধারণা যে, তাঁর সহপাঠীর মধ্যে তাঁরই ছিল কম, সব চেয়ে বেশি ছিল এক মাদ্রাজীর। বোধ হয় দ্রাবিড়ীদের স্মরণশক্তি উত্তর ভারতীয়ের চেয়ে সাধারণত বেশি। ঠিক বলা যায় না।

তবে আমার সমবয়স্কদের মধ্যে নির্মল সিদ্ধান্তের স্মরণশক্তির তুলনা নেই। এমন কী ডিকেন্স-এর প্রত্যেক চরিত্রের নাম ধাম ব্যবহার তার মনে থাকে। দশ বছর পূর্বের 'প্রস্তাব' সে মুখস্থ বলে যেতে পারে।

নির্মলের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে প্রাণ হাতে রাখতে হয়। অমন প্রী-সাইজ মন আর কারুর দেখিনি। এই দুর্দান্ত স্মৃতিশক্তি তার উপকারেও এসেছে, অপকারেও এসেছে সন্দেহ নেই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণণেরও স্মরণশক্তি অনন্যসাধারণ তার বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি।

দশ বৎসর আগে তাঁর সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা তিনি উগরে দিতে পারেন। এখানকার অধ্যাপক হাজি হাসান সমগ্র শকুন্তলা একাই অভিনয় করতে পারেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ফোটোগ্রাফিক। ত্রিপুরারিও অনেকটা তাই।

জানি শ্রেণী বিভাগ করাটা ছেলেমানুষী। তবু আমার কাছে সব ভালো জিনিসেরই একটা গ্রেড আছে। প্রকাশ করি না। কিন্তু অমলের চিঠি পেয়ে প্রকাশ হয়ে গেল। সে আমাকে চিঠি লিখে ছেলেমানুষ করে দেয়। ১৯১১ সালে এক সিনেমায় তার সঙ্গে আলাপ হয়। 'আপনি কি করেন?' 'আজ্ঞে, আমি এফ. এ. ফেল করি।' সেই থেকে এক আবহাওয়ায় মানুষ আমরা। তার বন্ধু আমার বন্ধু, আমার বন্ধু তার বন্ধু।

বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে আজকাল পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়? বৈঠকখানাই নেই তো আড্ডা জমবে কিসে? ছেলেরা কী বন্ধুদের আজকাল বাড়ির ভেতরে আনতে পারে? আনবে কোথায়! ছেলেরা চা-এর দোকানে আড্ডা দেবে না তো কোথায় যাবে? সিনেমা আর ফুটবল দেখে কতটুকুই বা আনন্দ হয়! ননী (নীরেন) বলে মা হলো খুঁটি। হাঁ, তাঁর মা খুঁটিই ছিলেন, তাঁর একার নয়। অমন মা হয় না!

হঠাৎ যেন মনে হচ্ছে বুড়ো হয়ে গেলাম। এত পুরানো কথা মনে আসছে! শরীরটা অতোটা অপটু হওয়া নির্বুদ্ধির লক্ষণ। এ-যেন ডায়েরি হয়ে গেল!

অসুখের সময় লোকে মাগো বলে কেন? আবার 'ওগো' বলতেও শুনেছি। মা ছেলেকে, স্ত্রী স্বামীকে একটু কাবু হয়েছে দেখতে চান, অসহায় হলে বড়ই ভালো লাগে তাঁদের, কব্জার মধ্যে এসে গেল! দুর্বলের ধর্ম! কিন্তু কে বলে মা তুমি অবলে!

৫. ১২. ৫৫

আজ ক্লাশে দু'ঘণ্টা ধরে প্ল্যান্ড ডেভেলপমেণ্টের হার কীভাবে বাড়ানো যায় তার আলোচনা করলাম। ছাত্রেরা তর্কে যোগদান করছে দেখে হর্ষ হলো। কোনো টেক্‌নিক্যাল টার্ম ব্যবহার করিনি, তাই বোধ হয় সহজে বুঝলে। নিজেদের জীবন থেকেই যুক্তিটা খাড়া করেছিলাম। একটা ছাত্রেরও চোখ যদি জ্বল জ্বল করে তবে নিজেকে সার্থক ভাবি।

বাংলা দেশে— নাঃ, বাংলার কথা ভাববো না। হয়তো আমি ভুল

বুঝি, নয়তো তাঁরা ভুল বোঝেন। তবে এটা ঠিক যে, বাংলা দেশে এখনও অনেক চোখে আগুনের ফুল্কি পাওয়া যায়। বুদ্ধির তীব্রতা নিশ্চয়ই; কিন্তু কল্পনার রং মেশানো। আমার শ্বশুরমশাই প্রায় ষাট বৎসর বিদেশে থেকে বাংলায় যখন ফিরলেন তখন বলেছিলেন, 'কী মিষ্টি হাওয়া, যেন মা'র কোলে ফিরলাম।' মুচকে হেসেছিলাম। এক বৎসরের মধ্যেই মারা গেলেন।

৯৩. ৯২. ৫৫

আজ কনভোকেশ্যন হয়ে গেল। চমৎকার বন্দোবস্ত। এখানকার ছাত্ররা নিতান্ত শান্ত। একটা টুঁ শব্দ করে না। জন-পাঁচেককে অনারারী ডক্টরেট দেওয়া হলো। ইয়াজদানীকে দেওয়াতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। ভারতের এক অজন্তা নয় বহু পুরাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমানী কীর্তিকে তিনি ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছেন। অজন্তা সম্বন্ধে তাঁর বই ও ফোলিও অতুলনীয়। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস লিখছেন। ইয়াজদানী সাহেব দেশের গৌরব। উত্তরাধিকারী হলেই হয় না, উত্তরাধিকারকে ইনভেস্ট করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা পড়া হলো। আমি ধন্যবাদ দিলাম। তাঁর বক্তৃতাটি ছাপানো হবে। স্লাইডগুলো চমৎকার। অনেকে এসেছিলেন, কিন্তু ছাত্ররা ভেঙে পড়েনি। এখানে ছোট রকমের মার্কসিস্ট দল একটা আছে— তাদের কাউকে বড় দেখলাম না।

ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে এদের ঔদাসীন্য দেখে ভীষণ অস্বস্তি হয়। যারা গোঁড়া মুসলমান তারা না হয় দেবদেবীর মূর্তি দেখতে চাইবে না— এটা বোঝা যায়, কিন্তু মার্কসিস্টরা তো ইতিহাসের কিছু ধার ধারে— অন্তত তাই বলে। কিন্তু তার প্রমাণ তো পাচ্ছি না। মনিরের সোশিওলজি অব কম্যুনিজম সম্বন্ধে একটা বই পড়েছিলাম। নামটা ঠিক মনে আসছে না। ভালো লাগেনি এইটুকু মনে আছে। তিনি কম্যুনিজমের সঙ্গে ইসলামের তুলনা করেছিলেন। (ম্যালরো ফরাসী বিপ্লবী Saint Just-এর মধ্যে ইসলামী ধরনের মিস্টিক পেয়েছেন।) একটা মিস্টিক থাকলেও কাজ চলতো। কিন্তু এখানে কিছুই যে নেই, অতএব সব নিষ্কর্মা। অথচ সত্যকারের বুদ্ধিমান লোক এখানে রয়েছেন, বিশেষত অল্পবয়স্ক শিক্ষকদের মধ্যে। তাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রচুর, কিন্তু তবুও আগ্রহ রেডিয়েট করছে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের একাধিক অংশকে ভুলতে হবে।

বোধ হয়, একটু অন্যায় করলাম। দেশের অন্যান্য যুবকদের মধ্যেই বা

ক'জনের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসাহ আছে? যারা বিদেশী ফার্মে চাকরি করছে তারা এক অদ্ভুত জীব! ভালো ছেলে হয়তো সব সময় নয়, কিন্তু ভালো ঘরের, প্রতিপত্তিসম্পন্ন ঘরের ছেলে তো বটেই। কিন্তু টাকা আর টাকা, আর সাহেবিয়ানা। এক আধজনের মুখে গরম গরম কথাও শুনেছি। কিন্তু সব ভুয়ো। ভারতবাসী কী না বোঝাই যায় না। দেশের সঙ্গে তাদের যোগ যৎসামান্য। এ এক আজব শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। পুরানো আই. সি. এস. ছোকরারাও এত শেকড়-ছেঁড়া ছিল না—তারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল, পড়াশুনো ভালোবাসতো, করতে সময় পেতো। এদের সময়ই নেই। দেশের অন্য অবস্থানে এদের প্রয়োজন হবে নিশ্চয়—যখন প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের বোলবোলাও থাকবে না এবং সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় ইণ্ডাস্ট্রি সব এসে যাবে। কিন্তু ন্যাশনালাই-জেশনটা যদি শেষ কথা না হয়, যদি তার পরে সোশিয়ালাইজেশন বলে কোনো অবস্থা থাকে, তখন ম্যানেজারের দলের প্রকৃতিও বদলাবে। তখন টেক্‌নিশিয়ানরা শ্রমিকদল থেকেই উঠবে এবং তাদের মধ্যে বেশি কর্মিষ্ঠরাই ম্যানেজার হবে। এখন থেকেই তার বন্দোবস্ত হওয়া চাই। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের রূপ বদলাচ্ছে—রাষ্ট্র সমাজের কাছে চলে আসছে, নতুন শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসতে আরম্ভ করছে। তারা কি এঁরা? আমার বিশ্বাস নয়। এইপ্রকার ম্যানেজারের দল পরিবর্তনের বাধা সৃষ্টি করবে সন্দেহ হয়। এঁরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিরাগ্রহ। এঁদের সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উন্নতির একটা অবস্থায়। দেশ বদলাচ্ছে নিতান্ত দ্রুতভাবে।

সরকারী চাকরিতে যাঁরা ঢুকেছেন তাঁদের প্রথম প্রথম উৎসাহ থাকে। কিন্তু দু'-এক বছরেই খতম হয়ে যায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলাও তাই। আদর্শ আগ্রহ বজায় রাখা যে কী শক্ত যাঁরা ভুগেছেন তাঁরাই জানেন। যদি খোশামোদে উন্নতি হয় তবে কাজের দরকারই থাকে না। যদি জাত, আত্মীয়তা তার ওপর জোটে তো কথাই নেই। জেলার কর্তৃপক্ষদের প্রধান কর্ম মন্ত্রিবর্গের সন্তুষ্টি সাধন, স্থানীয় এম. এল. এ. কী এম. পি'র মন বুঝে চলা। এবং তাঁদের মন সর্বদা নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ নয়। এক্ষেত্রে আগ্রহ কর্পূরের মতন ক্ষণস্থায়ী। ছোকরা মাস্টারমশাইদের কথা তুলতে লজ্জা হয়। স্কুলের মাস্টারি ছেড়ে কলেজের চাপরাশীগিরি করতে দেখেছি; পি. এইচ. ডি. টাইপিস্ট হয়েছে তাও জানি। ৩০।৪০ টাকায় আদর্শ অক্ষুন্ন থাকে না। কলেজে সেক্রেটারি কিংবা ম্যানেজার, ম্যানেজিং বোর্ডের সভ্যের বাড়ি ধর্না দিলে যদি মাইনে বাড়ে তবে আগ্রহ নিতান্তই অবান্তর

হয়ে পড়ে। যদি কর্তৃপক্ষ অ-ব্রাহ্মণ হন তবে ব্রাহ্মণ শিক্ষকের আশায় ঘুণ ধরলো; যদি বৈশ্য হন তবে বৈশ্য শিক্ষকদের পোয়া বারো— সেঁইয়া কোতোয়াল হলে পায় কে!

তবু উৎসাহ, আগ্রহ, প্রেরণার অভাবে কেমন করে ভারতবর্ষ উঠবে জানি না। সকলের মুখেই শুনি বেশ ঘুম হয় রাত্রে। বুঝি না কেমন করে এত ঘুম আসে। রিসার্চ স্কলারদের জিজ্ঞাসা করি— কত রাত তোমার সমস্যা তোমাকে জাগিয়ে রেখেছে? তারা বেশ ঘুমোয়। এরাই মা'র অনুরোধে বিয়ে করে। ভূপেন দত্তমশাই একবার বলেছিলেন, 'আমাদের তিন পুরুষ বিবাহ করেনি— আর তিন পুরুষ না বিবাহ করাটাই দেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।' তিনি আঠারো বৎসর বিদেশে থেকে তখন ফিরেছেন এবং দেশের হালচাল ও একটি বিশেষ ঘটনা দেখে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বাংলায় হয়তো সামান্য একটু ভুল ছিল, কিন্তু মর্মটি ছিল খাঁটি।

আদর্শ অটুট রাখবার জন্য একটা মিস্টিক হয়তো চাই। অন্তত এককালে তার প্রয়োজন ছিল। মিস্টিক-এর আশ্রয় ভবিষ্যৎ। বর্তমানে ডুবে থাকলে মিস্টিক ফ্যাশানে পরিণত হয়। সব ধর্মের সব বিপ্লবের একটা মিলেনিয়াল প্রফেটিক, ইয়ুটোপীয়ান দিক থাকে। তাতে নেশা হয়, নেশায় কাজও হয়। স্বদেশী যুগে ছিল বঙ্গমাতা-ভারতমাতা। মাতৃত্বের সঙ্গে মিস্টিক-এর একটা আন্তরিক যোগ আছে। মাতৃপূজা ভারতবর্ষে সর্বত্র পাওয়া যায়, তবে বাংলা দেশে বেশি। স্বদেশী যুগে বাংলা দেশে যে নবজীবন এসেছিল তার এক প্রধান কারণ ঐ। গানে, ছবিতে, সাহিত্যে ও কর্মে এই মিস্টিক কার্যকরী হয়েছিল। বন্দেমাতরম ছিল মহামন্ত্র। গান্ধীজীর নিজের একটা মিস্টিক ছিল, দেশ সেটাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছিল। পুরোপুরি গৃহীত যে হয়নি তার প্রমাণ অনেক। ভারতমাতা কিংবা দেশপিতা তৈরি হয়নি, তাই আজ ভাষাগত প্রদেশ গঠন নিয়ে এত ভয়। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি র‍্যাশনালিজমও কিছু এসেছিল, তাই মিস্টিক ঠিক জমেনি। পরে এলো মার্কসিজমের মিস্টিক। কার্ল পপার-এর বিপক্ষে যত যুক্তিই দিন না, মার্কসিস্ট মিস্টিক-এর আশীর্বাদে জনকয়েক ভালো ছেলেমেয়ে গড়ে ওঠে। এটাও নানা কারণে জমলো না। এখন আসছে টেকনিকের মিস্টিক। সব তাতেই কাজ হয়েছে। তাই বলে মিস্টিকের বিপদ সম্বন্ধে অজ্ঞান হলে চলবে না। এর চারধারে একটা ঘোলাটে আলো থাকে যেটা বুদ্ধির আলোকে ব্যাহত করে। অবশ্য বিজ্ঞানেরও অনেক সময় তাই

অবস্থা, কিন্তু কোনো না কোনো সময় বুদ্ধির আলোতে সেটা দূর হয়। মিস্টিক সম্বন্ধে আমার নিজের দুটি আপত্তি : (১) এতে মানুষ পরিণত হতে পারে না। মানুষ নাবালকই থেকে যায়। যৌবন-পূজা এর প্রধান আচার, যেমন হিটলারের সময়, আগে থেকেই হয়েছিল। (২) এতে নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পায়। নিষ্ঠুরতার একটি অঙ্গ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হানি। তার চেয়ে সর্বনেশে ব্যাপার নিষ্ঠুরতার আবহাওয়া। মিস্টিক-এর অজুহাতে যুদ্ধ খুনখারাপি, মারপিট, জেল, অত্যাচার সব কিছুই কিছু না, সাধারণ দৈনিক ঘটনা। যেখানে মিস্টিক সেখানেই এই দেখেছি। লোকে ধর্মের দোষ দেয়— কিন্তু দোষ মিস্টিক-এর। প্রমাণ এনার্কিজম, কাঁচা কম্যুনিজম, ইসলাম-প্রসারের কোনো কোনো অধ্যায় এবং বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ, যার বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়ে' ব্যক্তি-স্বাধীনতার তরফ থেকে আপত্তি জানিয়েছেন। এই সব নানা কারণে আগত-প্রায় টেকনিকের মিস্টিক সম্বন্ধে আমি ভীত। এর বাহন হলো utility আর efficiency— সর্বনেশে জিনিস।

তবু মিস্টিক চাই, প্যাশান চাই এখন এদেশে। উন্নতি এখনই চাই, সকলের জন্য চাই, এই 'সেন্স অব আর্জেন্সি' জনসাধারণের মধ্যে ওতপ্রোত না হলে যা ছিলাম তাই থাকবো। অন্যধারে মিস্টিক-এর সর্বনাশ সাধনের অসীম ক্ষমতা। তাকে কীভাবে সংযত করা যায় এই হলো প্রশ্ন। তার সম্পূর্ণ উত্তর জানি না। তবে সমাজের ইতিহাসে আংশিক উত্তর মেলে। প্রতি সভ্যতায় একাধিক শ্রেণী 'এলিট গ্রুপ' থাকে যার কাজ একটা মিস্টিক সৃষ্টি করা, তাকে রক্ষা করা, তার প্রভাব বাড়ানো, কমানো। ঠিক কীভাবে সৃষ্টি করে তা সহজে বোঝা যায় না— আর্চটাইপ থেকে উদ্ভূত হয় কেউ কেউ বলেন। কিন্তু ঠিক কীভাবে হয় এখনও জানা যায়নি। তবে একবার তৈরি হলে তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া খানিকটা প্রকট হয়। ম্যাক্স হেব্বার, ম্যানহাইম প্রভৃতি অনেকে এই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের ব্রাহ্মণ ও চীনেদের ম্যাণ্ডারিন শ্রেণীর প্রভাব কীভাবে ছড়িয়েছিল ও কমেছিল আমরা খানিকটা জানি। তাই থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি। আমি ব্রাহ্মণ সমাজের পুনরুত্থান চাইছি না। সেটা ঐতিহাসিক হিসেবে অসম্ভব। মার্কসিস্ট যাকে 'ক্লাশ' বলেন সেই ধরনের কোনো পৃথক শ্রেণীর উদ্ভবও চাইলেই সম্ভব হয় না। অনেকের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এই নতুন ব্রাহ্মণ-ম্যাণ্ডারিন, নতুন এলিট গ্রুপ।

বিশ্বাস করতে ভালো লাগে, কিন্তু পারি কৈ? সাফ কথা এই, আমরা

নতুন মিস্টিক তৈরি করতে পারিনি। যা কিছু নিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করেছিলাম সেটা হয় বিদেশী, না হয় অত্যন্ত দুর্বল, ফিকে। তাও আমরা রাখতে পারলাম না। বুদ্ধির সততা? চরিত্রের দৃঢ়তা? ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ? বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি? আদর্শনিষ্ঠা? এর একটাও মিস্টিক নয়। জোর 'আইডিয়াল' টাইপের 'আইডিয়াল' ব্যবহার! হিন্দুত্ব? ভারতের সুবর্ণযুগ? রামরাজ্য? অখণ্ড ভারত? এর কোন্‌টা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের প্রাণের বস্তু? যে-পরিমাণে আমরা 'বৈজ্ঞানিক' সেই পরিমাণে হিন্দুত্ব প্রভৃতি ভাব আমাদের প্রাণ থেকে বহিষ্কৃত। অতএব অন্যে, অন্য মহাপুরুষ, কিংবা অন্য শ্রেণী, যদি মিস্টিক তৈরি করে দেয় তবে জোর আমরা সেটা রক্ষা করতে পারি। অবতার নিজের খেয়ালে আসেন, যান, তাই অন্য শ্রেণীর সৃজনীশক্তির ওপর বিশ্বাস রাখতে হয়। কেবল তাই নয়, এই যুক্তি অনুসারে সেই শ্রেণী থেকে যে এলিট গ্রুপ তৈরি হবে তারাই মিস্টিক-এর সর্বনাশ সাধনের শক্তিকে সংযত করতে পারবে মনে হয়। এটা অবশ্য আশা; এবং অন্য আশার চেয়ে সম্ভবতর আশা এই মাত্র।

তর্ক উঠবে, যে শ্রেণী মিস্টিক থেকে উঠলো,— এখানে উদ্ভাবনই সৃষ্টি— সে মিস্টিককে সেই শ্রেণী কেমন করে সামলাবে? উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন রাশিয়া থেকে লেখা একখানা চিঠিতে। তিনি যা আশা করে-ছিলেন সেখানে এখন তাই হচ্ছে। লোকে যাকে সেখানকার শ্রেণী-বিভাগ, বুরোক্রেসি বলে তার আদত কথা হলো এই; যারা স্রষ্টা তাদেরই একাংশের পরিণত স্তর সৃষ্টির অন্তরের ধ্বংসবীজকে নষ্ট করতে সমর্থ। তাদেরই একাংশ— অন্যের ভিন্ন স্তরের অধিকাংশ নয়।

২৪. ১২. ৫৫

ট্রেনে সহযাত্রীর বদভ্যাসগুলো অতি সহজেই ধরা পড়ে। জাতীয় চরিত্র বলে কোনো বস্তু নেই; কিন্তু জাতীয় আচার-ব্যবহার, অভ্যাস-অনভ্যাস-বদ-ভ্যাস আছে এবং সেগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাঁরা তথাকথিত সভ্য, যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে, ঠাণ্ডা গাড়িতে, এমন কী হাওয়া জাহাজে সফর করেন তাঁদেরও 'সভ্যতা' নিমেষে খসে পড়ে। ইতার্সি স্টেশনে বেলা সাড়ে সাতটার সময়ও বার্থ থেকে উঠতে অনিচ্ছা জানাতে ঢোলপুরের একজন সামন্ত আমাকে বলেছিলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বাঙালি!' সকাল আটটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকবার অধিকার আছে জানিয়েছিলাম।

আর্চার (ইবসেনের আর্চার) একবার পাঞ্জাব মেলে কলকাতায় আসছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক ভীষণ তর্ক শুনলেন। এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, খবরের কাগজওয়ালা কী একটা ব্যাপার নিয়ে এক বাঙালি সহযাত্রীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছে। আর্চার ইংরেজ সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কোথায় ?' 'বর্ধমানে।' 'সেটা কোথায় ?' 'বাংলায়।' 'That's why'— গল্পটি আমি প্রমথ চৌধুরীমহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ট্রেনে চড়তে হয়তো উত্তর প্রদেশের, বিশেষত লক্ষ্ণৌ-এর কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কাশ্মিরী ও নবাবদের সঙ্গে চড়াই উৎকৃষ্ট। আমার আন্তরিক বিশ্বাস অমন ট্রেনের ভদ্রতা অন্য কোনো প্রদেশ-বাসীর অভ্যাসে নেই। আমি যাঁদের সম্বন্ধে লিখতে যাচ্ছিলাম তাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না। নিজেদেরই নিন্দা করা ভালো, যদি নিন্দা করতেই হয়। পয়সাতে সব কিছুই আসে, ট্রেনের ভদ্রতা আসে না। হাওয়া জাহাজের জানালার পাশে বসবার জন্য মিংক-সেবল কোটপরা মহিলাদেরও ছুটতে দেখেছি, অসভ্যতা করতে দেখেছি। মনে হয় যেন মাটি ছাড়লেই অভদ্রতা এসে জোটে ; আর গতিতে সেটা বাড়ে। জেট প্লেনের কালে ভদ্রতা একেবারেই লোপ পাবে। নতুন জগতের কাল নিতান্ত অ-সামাজিক, নিতান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীময়। ভদ্রতা রক্ষার জন্য গরুর গাড়ি, পাল্কি, নৌকো— জোর জুড়ীগাড়ি, জাহাজই ভালো, তা লোকে একে ফিউডালই বলুক আর যাই বলুক। অবশ্য উটের গাড়ি নয়, যেটা রোজ সকালে সন্ধ্যায় আলিগড়ের রাস্তায় দেখি। ওটা ট্রাইবাল— সভ্যতার পূর্বাবস্থার, কৃষি-কর্মের ক্ষেত-খামারির আগের অবস্থা, মরুভূমির ব্যবস্থা। একদম অচল !

২৫. ১২. ৫৫

ট্রেনে মির্সিয়া এলিয়েড (Mircea Eliade)-এর The Myth of the Eternal Return নামে ফরাসী বইখানির ইংরেজী অনুবাদ পড়লাম। বইখানির বিলেতে সুখ্যাতি হয়েছে। ভদ্রলোক রুমানীয়ান, এখন ফ্রান্সে থাকেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি পড়েছিলেন।

তাঁর মতে ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণার ক্রমবিবর্তনে তিনটি পর্যায় আছে। (১) ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজে ইতিহাসের অর্থ আর্চটাইপাল ফর্মগুলির স্থিতি ও অনবচ্ছিন্নতা। অর্থাৎ মানুষ তখন প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টির ভাগী। এই অংশটা

পড়তে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে এলো। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ গায়ত্রী মন্ত্র ভালোবাসতেন এবং সর্বদাই এমন ঘরে শুতে চাইতেন যার পূর্ব দিক খুব খোলা। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'সৃষ্টির আদিম ক্ষণে উপস্থিত ছিলাম না, সেই অনুপস্থিতির ক্ষতিপূরণ করি প্রতিদিনের সৃষ্টির অংশীদার হয়ে।' তিনি প্রায়ই বলতেন যে, সূর্য তাঁর ভাগ্যদেবতা, রবি থেকেই রবীন্দ্র। তবে কী সূর্যই তাঁর আর্চটাইপ ছিল? সেইজন্যই কী তিনি বৈশাখের, আলোর ভক্ত ছিলেন? জানি না। সেই কারণেই কী তাঁর সৃজনীশক্তি অতো অফুরন্ত ছিল? প্রতিদিন যেন তাঁর ভাণ্ডার ভরে উঠতো। কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে যতটা মোহ আছে ততটা যুক্তি নেই। এ সেই ইয়ুং-এর কালেক্‌টিভ আন-কনসাস আর আর্চটাইপ! শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় আর্চটাইপের যে তালিকা দিয়েছেন তার একটাও কোনো দিন মনের কোনো স্তরে খুঁজে পেলাম না— অথচ ব্রাহ্মণ সন্তান!

(২) দ্বিতীয় পর্যায় হলো সভ্য সমাজের। এর মধ্যে একটি ধারা হলো চক্রবৎ আবর্তনের। চাকার মতন কাল ঘুরছে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি-যুগের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, এড্ডা (Edda), প্লেটনিক ধারণা এই ধরনের। (বৌদ্ধ ধারণা এক প্রকার ছিল না; ব্রাহ্মণরা পুরুষকারে বিশ্বাসী ছিলেন, কালাতীত হতে চাইতেন; বেদান্ত তো মিথ্যা বলেই উড়িয়ে দিলেন।) অন্য ধারা হলো চাকার পরিবর্তে লাইনের। অর্থাৎ ট্রেনে চড়ো আর সামনে এগিয়ে চলবে। এই ধারণার ভিত্তি হলো উন্নতি— প্রোগ্রেস, পরিণতি, মিলেনীয়াম। দৃষ্টান্ত— হিব্রু ও খ্রীস্টান ধর্ম। তার মধ্যে পাপ বোধ এসে ঢুকলো। অর্থাৎ ইতিহাস আরম্ভ হলো স্বর্গ থেকে বিদায় হতে, আর শেষ হবে শেষ দিনে, ভেঁপু বাজলে। তাই ইতিহাসের কাজ হলো রিডেম্পশন ও যীশুতে বিশ্বাস। এই মতের অনেক সুবিধা এবং সে সুবিধা পশ্চিম প্রাণপণে ভোগ করছেন, অন্তত এতদিন করে এসেছেন।

> A straight line traces the course of humanity from the initial fall to final redemption. And the meaning of this history is unique, because the Incarnation is a unique fact.

হেগেল-মার্ক্‌স্‌-এর পথ ডায়েলেক্‌টিক্যাল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যে, এঁদের মতবাদে ধর্মের ছাপ রয়েছে— সেই সুবর্ণযুগ— কেবল সেটা পিছনে নয়, সামনে, সেই রিডেম্পশন— কেবল যীশুতে বিশ্বাসের সাহায্যে নয়, আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে। Universal Spirit-এর প্রকাশ ঐতিহাসিক

ঘটনায়— এই ফরমুলায় হেগেল পেলেন ছুটি, আর ছুটি দিলেন এই জগতের জনমানবের দুঃখ-কষ্টকে। কিন্তু মার্কস্ এই ধরনের ফাঁকি দিতে পারলেন না। The Terror of History-র হাত থেকে মার্কসিস্ট পরিত্রাণ পেলেন বর্তমান জগতের Historical Evil-কে (ক্যাপিটালিস্ট-ইম্পিরিয়ালিস্ট সিস্টেমকে) ইতিহাসের মাত্র একটি পর্যায় ভেবে— যে পর্যায়ে উন্নতি হয়েছে, যার অন্তরেই ধ্বংসের বীজ রয়েছে, যার অবসান হবেই হবে এবং যার দ্রুত অবসানের সাহায্য করা নতুন মানুষের, তথা নতুন শ্রেণীর একান্ত কর্তব্য। অর্থাৎ ব্যাপারটা necessary ও temporary Evil।

আধুনিক মানুষের পক্ষে ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের প্রত্যয় গ্রহণ এক প্রকার অসম্ভব। দু'-চারজন যে পারবেন না তা বলছি না। আর্চটাইপ উবে গিয়েছে এবং বিশ্বাস? একমাত্র বিশ্বাস আত্মশক্তিতে ও বিজ্ঞানে। প্রতি ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ইতিহাসের ওপারে আছে এ-কথা বিজ্ঞান আমাদের মানতে দেবে? দেবে না কিছুতেই। তখন এই Terror of History-র হাত থেকে বাঁচবো কিসে? যখন ভূত থেকে কখনও কখনও ভগবান হন তখন হয়তো আশা আছে। কিন্তু সে ভগবান কি প্রেমের ভগবান?

মহাবিপদ অথচ বইখানি পড়বার সময় বিস্তর কথা মনে আসছিল— এখন ভুলে গেলাম। মনে এলোর বাইরে বহু মনে পড়লো-না থাকে— সে-বহু আপাতত লুপ্ত হয়। পরে কখনও ভুড় ভুড় করে উঠবে। যতটুকু মনে আসে ততটুকুও লিখতে পারি না। এবং সব কথাই বিশদভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আমার এই ধরনের লেখায় নেই।

২৬. ১২. ৫৫

অলডাস হাক্সলের The Genius and The Goddess ভালো লাগলো, অথচ ভালো লাগলো না। মার্টেন্স আইনস্টাইনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই আমার ভুল। কেটি মার্টেন্স-এর স্ত্রী সেই জ্যকণ্ডার হাসির নায়িকা। রিভার্স, যিনি গল্প বলছেন, তাঁর মতামত অনেকটা হাক্সলের নিজের সন্দেহ হয়। রুথ মার্টেন্স-এর কিশোরী মেয়ে রিভার্স-এর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, কাঁচা কবিতা লিখছে। কাম ও দর্শনের মিশ্রণ মুখরোচক নিশ্চয়— ভাষা চমৎকার, মন্তব্য চমকপ্রদ, তবু মন-প্রাণ দুই-ই অতৃপ্ত থেকে গেল। অলডাস হাক্সলে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসেন না সন্দেহ হয়। দরদী না হলে অবজেক্‌টিভ হওয়া যায় না। ভদ্রলোকের রাগ আছে, অনু-

রাগ নেই বলবো না, কপটতা, ভান, মিথ্যাচরণকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেললে সততার ওপর যতটা অনুরাগ প্রমাণিত হয় ততটা। বিদ্রূপাত্মক রচনার বিপদ ঐখানে। শেষে বিদ্রূপের প্রধান যন্ত্র ক্ষুরধার বুদ্ধিকে ত্যাগ করতেই হয় নচেৎ ঐ আধ-কাঁচা আধ-পাকা নভেল লেখাই সার। হাক্সলের 'মেচিওরিটি' এখনও আসেনি। খাসা লেখা, চোখাচোখা মন্তব্য, চন-মন করে ওঠে মনটা—ব্যস, ঐ পর্যন্ত। ভদ্রলোকের বয়স ৬১।৬২, কিন্তু এখনও কামমুক্ত নন। এঁর দ্বারা সাধন-ভজনের মুক্তি অসম্ভব। কে মুক্ত হলো বা না হলো তাতে অবশ্য আসে যায় না। কিন্তু নভেলিস্ট হিসেবেই তার কাছে প্রত্যাশা—সেটা ভঙ্গ হলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। এবং আমি অন্তত ভাবছিলাম যে, নতুন সংযমের ফলে তাঁর আর্টের পরিণতি হবে। তা এখনও হয়নি। একটু ঘন হয়েছে নিশ্চয়, তবে সেটা ছোট আকারের জন্য না কী আর কিসের জন্য বুঝতে পারলাম না। বইটি নভেলেট্ হলেও ছোট গল্পের মতন তীক্ষ্ণ।

২৭. ১২. ৫৫

কুমারের ধারণা যে, 'মনে এলো'র কিছু কিছু অংশ অস্পষ্ট ও খাপছাড়া হচ্ছে। যুক্তি দিয়ে ও ভদ্রভাবেই তার বক্তব্য বললে। ছেলের কাছে সমালোচনা শোনার মধ্যে একটা গৌরব বোধ আছে। তার মত এই : যে কালে 'মনে এলো' প্রকাশিত হচ্ছে তখন প্রকাশ এক্সপ্রেশনের ধর্ম রীতিনীতি মেনে চলতেই হবে—অর্থাৎ যুক্তির ফাঁক থাকলে এমন কী মূল্যবান মন্তব্য ও বক্তব্যও অসার্থক হবে। অবশ্য সব রচনার ধর্ম এক নয় এবং আমার চিন্তা লাফিয়ে চলে, পাঠক ও শ্রোতার জ্ঞান আমি ধরে নিই অনেকখানি, তবু যখন রচনা ও সেটা যখন প্রকাশিত হচ্ছে, যখন সকলে পড়ুক, বুঝুক চাইছি তখন আমার আরো বিশদ করে লেখা উচিত।

আমি এই ধরনের উত্তর দিলাম। একজনের কাছে যেটা শক্ত অন্যের কাছে সেটা সহজবোধ্য। পাঠক সম্প্রদায় বলে এমন কোনো হোমোজিনাস পদার্থ নেই যার মানসিক আগ্রহ একই ধরনের সমানভাবে তীব্র। বোঝবার ক্ষমতা ভদ্রতার খাতিরে সমপর্যায়ের মেনে নিচ্ছি। একজন সাইকলজীর ফিল্ড থিওরি জানেন, কিন্তু ইকনমিক্স-এর নতুন কথা জানেন না, তেমনই উল্টোটা। আবার কেউ বা সাইকলজি, অর্থনীতি, ইতিহাসের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত, অথচ, ছবি, গান সম্বন্ধে উদাসীন। আমি

একত্রে সকলের সন্তোষবিধান কীভাবে করবো ? যদি সব ভালো জিনিসেই আমার আগ্রহ থাকে, তবে পাঠকের সন্তোষ-বিধানের জন্য কি নিজেকে সংকীর্ণ করবো ? দ্বিতীয় উত্তর : আমি প্রবন্ধ লিখছি না, একটা বিষয় ধরে গোড়া থেকে শেষ কথা লিখছি না। অবশ্য ডায়েরির মতন খানিকটা নিশ্চয়— তাও একটু অন্য ধরনের। অমিএল কিংবা মার্সেল-এর জার্নাল-গুলিতে তাঁদের দার্শনিক মতামতের অভিব্যক্তি বেশ খোলাখুলি ; কিন্তু জীদ-এর ডায়েরিতে যে মতামত আছে সেটাকে খুঁজে বার করতে হয়। জীদ-এর ভাষা অবশ্য সহজ, কিন্তু তবু অত পাদটীকা কেন ? এই ধরনের ডায়েরিতে বিস্তর জিনিস ধরে নিতে হয়, প্রিজিউম করতে হয়। দা ভিঞ্চির নোট-বুক বোধগম্য ? আমি ফর্মের কথা বলছি, ওঁদের সঙ্গে নিজের তুলনা করছি না। ব্যাপারটা আসলে এই : নানা চিন্তা, নানা মনোভাব, নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, নানা ভয়-ভাবনার টানাপোড়েনে ব্যক্তিত্বের নক্‌সা ; সেই ব্যক্তিত্বের নক্‌সা নিতান্তই বিশেষ ; অন্য কারণে নয়, মাত্র পারমুটেশন-কম্বিনেশনের জন্য। একটি নক্‌সা অন্য নক্‌সার জুড়ি কখনও হতে পারে না। এই নক্‌সাই হলো 'স্টাইল' ; Style is the man। এখানে ব্যক্তি-ত্বের ছক্‌-ছাঁদটাই হলো আগ্রহের বস্তু। সেটার প্রতি আগ্রহ না থাকলে যত বিশদভাবেই লিখি না কেন কিছুতেই কিছুই হবে না। সহজ হবে কিন্তু আর কিছু নয়। সবই যে ঊর্ণনাভের জালের মতন জ্যামিতিক হবে, ঝক-ঝক করবে, এমন বাধ্যবাধকতা প্রকৃতির নিয়মে নেই। মৌমাছির বাসাও জ্যামিতিক, কিন্তু পাখির বাসা ? কেবল দাঁড়কাক, শকুনির বাসা না হলেই হলো। এই প্রকার ইয়ুক্লীডিয়ান মনোভাবের দৌরাত্ম্য কোনো গতিশীল মন স্বীকার করে আর নেবে না।

এত কথার পর তবু আমার যুক্তিতে ফাঁক থেকে গেল। প্রবন্ধতে, বক্তৃতাতে, কথাবার্তায় আমার মন লাফিয়ে চলে। সকলেরই বোধ হয় তাই। আর্টের কাজ, রচনাশৈলীর অর্থ ফাঁক ভরানো, ঋজু করা। এই কি একমাত্র কাজ, একমাত্র অর্থ ? তা বোধ হয় নয়। নচেৎ 'মনে এলো' সম্পর্কে এত চিঠি পেলাম কেন ? বিমলা, সাগর প্রভৃতি বিচক্ষণ সাহিত্য-রসিকরাও বলছেন লোকের মনে ধরেছে। সব পাঠকের মন সব বিষয়ে নয় অবশ্য। কিন্তু কাটাকাটি হয়ে দাঁড়ায় একটা।

২৯. ১২. ৫৫

তিনটি চিত্রপ্রদর্শনী দেখলাম। বহুদিন কলকাতার চিত্রপ্রদর্শনী দেখিনি, তাই খুব উৎসুক হয়েছিলাম। প্রথমেই ঝগড়ার গল্প শুনলাম ; মন গেল খিঁচড়ে। আমরা দলাদলি না করে পারি না। তবু ঝগড়ার পরও একটা কিন্তু থেকে যায়, খিতোয়। ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীর স্মৃতি ভেসে উঠলো। সে-চাঞ্চল্য এলো না— তবু নবীন শিল্পীর দল সে-যুগের শিল্পীদের মতনই মুক্ত হতে চাইছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, নিরাগ্রহতার, অজ্ঞতার কবল থেকে মুক্ত হতে, মুক্তি দিতে। এঁরা চাইছেন তাঁদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। প্রমাণ বিষয় নির্বাচনে ও রঙের বাহারে। জল-ধোয়া থেকে এঁরা তেলের ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়েছেন, চিত্রের চিত্র-সুলভ, অর্থাৎ চিত্রের প্রচলিত বিষয়ের গণ্ডি এঁরা কাটতে চাইছেন। এ সংকল্প জীবনের চিহ্ন। তার পরও কিছু আছে। সেটা কতটা সফল হয়েছে ধরতে পারলাম না। যেখানে ভারতীয় বিষয় ও আঙ্গিক থেকে পৃথক সেখানে বিদেশী আঙ্গিকের ছায়া পড়েছে। আর্টে দেশ-বিদেশ নেই কখন ? যখন দেশ-বিদেশের ঐতিহ্য, পরম্পরা ধুয়ে পুঁছে গিয়েছে। অন্যান্য আর্টের মধ্যে চিত্রেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যায় দেখেছি। সাহিত্যে একটু দেরিতে, কারণ ভাষা নিজের ধর্ম ছাডতে চায় না। স্থাপত্যে— গৃহ-স্থাপত্যে আবহাওয়ার জন্যে ঐতিহ্য বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকে। সঙ্গীতের পরিবর্তনে দীর্ঘকাল লাগে। পশ্চিমী সঙ্গীতের রং আমাদের সঙ্গীতে কতটুকুই বা লেগেছে! তাই দু'-তিনশ বছরের পরেও আর্টে দেশ-বিদেশ রয়েছে মানতে হয়। বরং সেটা যদি মানি তবে প্রদর্শনীর চিত্রে নবজীবনের লক্ষণ লক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, হলো কী ? অথচ এও জানি, ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির ধারা কখনও জোরে বয়নি, অজন্তার পর থেকে সে ধারায় মন্দা পড়েছে এবং চেষ্টা করলেও তাকে জীবন্ত করা যাবে না। তা যদি না যায় তবে চিত্রে দেশ-বিদেশ এক হয়েই যাক। তখন ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতাকেই কিন্তু প্রাধান্য দিতে হবে। আর যদি জীবন্ত করা সম্ভব হয় তখন প্রথামত পারম্পরিক আঙ্গিককে ধুত্তোর বলে ফেলে দিলে চলবে না। এই সব নানা কথা মনে উঠলো এইজন্য যে, কোনো প্রদর্শনীতেই একটা কোনো সূত্র কী দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেলাম না। ব্যক্তিগত চিত্রকর সম্বন্ধে ভালোমন্দের বিচার সম্ভব। মনে মনে বিচার যে করিনি তা নয়। আমি প্রদর্শনীর সার্থকতা ও উৎকর্ষ সম্বন্ধেই বেশি ভাবছিলাম। কুমারস্বামী ও ম্যালরো প্রদর্শনীর বিপক্ষে যে সব আপত্তি তুলেছিলেন তার মধ্যে অনেকগুলিই অখণ্ডনীয়।

তবু এ-দেশে এই সময়, যখন চিত্র সম্বন্ধে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের মতন কোনো সার্বজনীন আগ্রহ জন্মায়নি তখন ঐ আগ্রহ প্রসারের জন্য প্রদর্শনী চাই-ই চাই। তার পরও অন্য কথা ওঠে। ছবির বিক্রি তো বেশি দেখলাম না। আর, বিক্রি বেশি না হলে চিত্রকরেরা বাঁচবে কি করে? আধুনিক ঢঙ-এর চিত্রের না হয় একটা snob-value আছে যার মূল্য স্ববরা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অন্য সাদা-মাটা ছবির খরিদ্দার সাদা-মাটা লোক— তাদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত। সরকার মানুষ কিনতে তৎপর, ছবি কিনতে নারাজ। ও নিয়ে হা-হুতোশ করে কোনো ফল নেই। সরকারী আর্টে আর্টিস্ট-এর স্বাধীনতা খর্ব হয় এই ধরনের বড় বড় বিদেশী মতামত কপচিয়েও লাভ নেই। ঐ ধরনের সমস্যা এখনও এদেশে মাথা চাড়া দেয়নি। এখনকার সমস্যা বিক্রি বাজারের। ছবির দাম কমাতেই হবে। আমি জানি, এই প্রস্তাবে চিত্রকররা ক্ষুব্ধ হবেন— এবং তাঁদের ক্ষোভ নিতান্তই যথার্থ। আমি জানি, যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা কীভাবে খরচ করেন, ছবি কিনতেই তাঁদের যত আপত্তি। আমি জানি, একটা মনের মতন ছবি আঁকতে চিত্রকরের কত সময় লাগে, সে-সময়ের মধ্যে তাঁকে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করতে হয়। আমি এও জানি যে, ছবির দাম রুচির ওপর নির্ভর করতো এককালে। এককালে, কিন্তু এ-কালে নয়। এ-কালে ছবির বাজার আছে যেখানে দরদস্তুর হয় অন্য সামগ্রীর বাজারের মতন। লণ্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্ক-আমারস্টারডামে ছবির ব্যবসাদার আছে, চিত্রকরের গীল্ড আছে। অর্থশাস্ত্রে ধরা পড়েছে যে, ধনিকতন্ত্রে শ্রমিকের শ্রমের দান নিয়ে কোনো প্রাইস থিওরি সম্ভব নয়, কলেক্টিভ বারগেনিং— দুই শ্রেণীর সমবেত শক্তির কস্তা-কস্তির ওপরই নির্ভর করে। এই সমবেত শক্তি চিত্রকরদের গড়ে তুলতেই হবে। অনেক চিত্রকর বলবেন, হ্যাঁ, আমরা কী মুটে মজুর নাকি যে, ইয়ুনিয়ন করবো। আমরা দেবতার সন্তান— আমাদের জাতই আলাদা।' বিস্তর লোকে— বিশেষত পলিটিশিয়ানরা— সমর্থনও করবেন। তাঁরা ধুয়ো তুলবেন, 'আর্টের সর্বনাশ হলো, আর্টিস্টদের মধ্যে আবার শ্রমিক আন্দোলন কেন!' ঠিক এই ধরনের মন্তব্য সাংবাদিকদের সম্বন্ধে শোনা গিয়েছে— ভাগ্যি কোনো ফল হয়নি! নতুন আইনে কর্মী-সাংবাদিকদের নিজেদের তাগিদে তাঁরা শ্রমিক বলে পরিগণিত হয়েছেন। অধ্যাপকদের মধ্যে ইয়ুনিয়ন গঠনের প্রয়াস চলছে। পাছে সেটা সফল হয় এই ভয়ে অনেক পলিটিশিয়ানরা বলছেন, 'শিক্ষক হলেন মিশনারি— কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সব আবার কী! যেন মিশনারিরা হাওয়া খেয়ে

ধর্মপ্রচার করে, যেন তাদের সঙ্ঘ নেই। যেন অধ্যাপকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ এম্প্লয়ার-এম্প্লয়ী-এর সম্বন্ধ নয়। যেন চাকরির শর্ত নেই, যেন চাকরি যায় না! ব্যাঙ্কের কেরানিও আগে ভাবতেন যে, তাঁরা পৃথক ভদ্রশ্রেণী। সে-ধারণা ঘুচেছে তাঁদের। তবেই তাঁদের চাহিদার কিছু অংশ মিটেছে। আমার বক্তব্য এই যে, চিত্রকররাও শ্রমিক— ওয়ার্কার্স। ইণ্টেলেকচুয়াল ক্লাশ বলে পৃথক কোনো জন্তু নেই। পণ্ডিতজী ব লেন 'We are all condemned to hard labour''— কথাটা খানিকটা সত্য। বাকি সত্যটা এই We are all workers। তাই যদি হয় তবে আর্টিস্টরা সঙ্ঘ, গীল্ড, ইয়ুনিয়ান তৈরি না করে কীভাবে এই ধনিকতন্ত্রের যুগে বায়ারস মার্কেটে পরিণত করবেন জানি না। সরকারের কম্ম নয়, তোমার-আমার সাধ্য নয়, দায়িত্ব আর্টিস্টদের নিজেদের। তাঁরা যে পৃথক ভদ্রশ্রেণী সেটা ভুলতেই হবে। ওস্তাদ কী ফিল্ম-এর গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ রোজগার করছেন নিশ্চয়— কিন্তু ঐ কেউ কেউ! হাজার গাইয়ে খেতে পাচ্ছে না যে!

৩১. ১২. ৫৫

সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করা আমার স্বাস্থ্যে কুলোয় না। যে-সব ওস্তাদের গান শুনতে চাই তাঁদের মার শেষ রাত্রে। প্রথিতযশাদের মধ্যে একমাত্র বড় গোলাম আলির গান শুনতে ব্যগ্র। যা শুনেছি তাতে আশ মেটেনি। এ ক'বৎসর নাকি তিনি অদ্ভুত ভালো গাইছেন।

যাঁরা নতুন উঠছেন তাঁদের মধ্যে সালামৎ ও নাজাকৎ-এর তারিফ শুনলাম। তবে আগামী শুক্রবার জ্ঞান ঘোষের বাড়িতে তাঁরা গাইবেন ও আমি যাবো। পাকিস্তানেই এখন ভালো গাইয়ের দল— ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণীরা বাদ্যকার। শুনলাম, পাকিস্তানের গাইয়েরা কলকাতা আসতে ভালোবাসেন এবং অনেক টাকা রোজগার করেন। খুবই আনন্দের কথা। সঙ্গীতে অন্তত মিলটা থাকুক। ভারতের বাজিয়ে গুণীদের আদর পাকিস্তানে আছে কিনা জানি না। তবে উর্দু কবিদের খুবই আছে জানি। যতদিন সঙ্গীত ও সাহিত্যে এইপ্রকার কদরের আদান-প্রদান থাকবে ততদিনই মঙ্গল।

একটা সন্দেহ উঠেছে মনে। বরাবর শুনে এসেছি, বলে এসেছি যে, চারুকলাই মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। সেখানে মিল থাকলে অন্য গরমিল

বেশিদিন থাকে না। তাজমহল, দরবারী কানাড়া, গালিব-হালি তো সকলেরই উপভোগ্য ছিল— পোলাও-কালিয়ার, কিংবা সেরওয়ানি-চুড়ি-দারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। দেশী পূজা-আচ্চা, আচার-ব্যবহারও না হয় ভুললাম। তবু, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হলো কেন? কেন কাশ্মীর নিয়ে ঝগড়া? কেন পাকিস্তান হিন্দুস্থানের প্রতি রোষবশত এমন কাজ করে বসেন যেটা তাঁর নিজেরই স্বার্থের বিপক্ষে? কারা করেন, কেন করেন? পলিটিশিয়ানরা নিশ্চয়ই। ঘেন্না ধরে গিয়েছে ঐ পলিটিশিয়ান জাতটার ওপর। ১৯৫৩।৫৪ সালে পশ্চিম য়ুরোপের ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করতাম, 'তোমরা তো যুদ্ধ চাও না, তোমরা তো ডিমক্রাট, পলিটিশিয়ানরা তো তোমাদের কথা শুনতে বাধ্য, তবু তোমাদের সরকার যুদ্ধের জন্য সর্বদাই তৈরি হচ্ছেন, যার ফলে প্যারিসের রাস্তায়, সীন নদীর পুলের তলায় হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ শীতের রাত কাটিয়ে দেয়। তোমাদের দেশে সাধারণ মানুষের স্থান কোথায় তবে?' উত্তর পেতাম, সদুত্তর পাইনি। উত্তর, ভেস্টেড ইন্টারেস্টগুলোই সরকারকে চালায় এবং যুদ্ধই তাদের পক্ষে সবচেয়ে লাভবান ব্যবসা। (আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে, এই যুদ্ধের কণ্ট্রাক্টর-এর দল গত একশ-দেড়শ বছর মাত্র দেশের সর্বনাশ করে ফলেছে। ওমা, তা নয় দেখলাম। নেপলিয়নের যুদ্ধের সময় তাই, রোমের পিউনিক যুদ্ধেও তাই। আর সেদিন পড়লাম, আর্মাডা থেকে পরিত্রাণ পাবার সময়ও তাই। মহাভারতের যুদ্ধে, রাম-রাবণের যুদ্ধেও কি ওঁরা ছিলেন?) এইসব পড়ে শুনে কেবল ডিমক্রেসিতেই বিশ্বাস থাকে না তা নয়, রাষ্ট্রের ওপরও বিশ্বাস চলে যায়।

তা বলে এনার্কিস্ট হতে পারি না। বর্তমান এনার্কিস্ট লিটারেচার যা পড়েছি তাতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি। অত্যন্ত অবাস্তব, নিতান্ত অনৈতিহাসিক মনে হয়েছে। আদত কথা রাষ্ট্র ও সমাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়া চাই। স্বাধীন ভারতবর্ষের এই বিষয়ে অনেক সুবিধা ছিল। আমাদের সমাজ ছিল শক্তিশালী, আর রাষ্ট্র নতুন। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী আমাদের সচেতনও করেছিলেন। তবু কিছু হলো না। রাষ্ট্রশক্তিই বেড়ে চলেছে, আর সমাজ যাচ্ছে হুড়মুড় করে ভেঙে। ফলে স্টেটিজম্‌ই হুড়হুড় করে বাড়ছে। য়ুরোপেরও যা দশা, আমাদেরও তাই হবে। আজ না হয় পরশু। ভেবেছিলাম, আমাদের মেয়েরা রুখে দাঁড়াবে; তাও হলো না; তাঁরা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পচা বিলেতী স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে মুখে তাঁদের নাল পড়ে। রাষ্ট্রের হুকুমে তাঁরাও হাসিমুখে ছেলেদের যুদ্ধে পাঠাবেন।

কেউ বলবেন না 'যাসনি বাছা।' একে ইতিহাসের দুর্বার গতি আমি কখনও বলবো না। বুদ্ধি খাটিয়ে ইতিহাস যারা তৈরি না করতে পারে তারাই ইতি-হাসের 'গতি' কপচায়। গচ্ছতি ইতি জগৎ— এ-কথা কাকপক্ষীরাও জানে। অদৃষ্টবাদীরা মানুষ নয়। অর্থাৎ বুদ্ধি থাকলেও তারা বুদ্ধি খাটাতে রাজি নয়।

বছর দুয়েক আগে ঢাকার একটি মেয়ের মুখে অতি সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার পর রাত্রে এইসব নানা কথা মনে হয়েছিল।

কিন্তু হয়তো আমারই ভুল। সঙ্গীত-টঙ্গীত সবই হয়তো বাজে! আত্মার সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে হয়তো তার কিছুই সম্বন্ধ নেই! হয়তো আত্মা-হৃদয় সবই মিথ্যা! সত্য হয়তো শক্তি, 'পাওয়ার'। হয়তো এ-যুগের চাঁদ মুশল। হয়তো, হয়তো, হয়তো, সবই আমার 'হয়তো'।

২. ৯. ৫৬

বছর কাটলো। গত বৎসরের প্রধান ঘটনার তালিকা ও বিশ্লেষণ পড়লাম। বছর এলো, গেল, কি হলো? সতু সেনের ধারণা কিছুই হয়নি আমাদের দেশে। জনসাধারণের কাছে পৌছতে আমাদের সরকারের বহুদিন লাগবে। অথচ এই সতু ভেলোরের হাসপাতালের সুখ্যাতিতে শতমুখ। সেটি নাকি একটি আমেরিক্যান মহিলার প্রেরণায় সম্ভব হয়েছে। সে এক রোগীকে নিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের প্রত্যেকেই সজ্জন ব্যক্তি, একেবারে আপন করে ফেললে। শুনেও সুখী হলাম। এই সতু, যে ও যার আত্মীয়-স্বজন জেলে পচেছে, যার আদর্শনিষ্ঠার তুলনা নেই, তার মনোভাব কেন এমন হলো? কেন আমাদের দেশ তার চরিত্রের, বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করলে না! হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে তার Sons of the Soil নামে একটা নক্সা পড়-লাম। খাশা লেখা। সে এখন বেড়িয়ে বেড়াক, দেশের প্রকৃত বিবরণ দিক। তাকে আলিগড়ে নিজের কাছে রাখবো ভাবছি। গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরবে, আর মধ্যে মধ্যে লিখবে।

(অধ্যক্ষ) সতীশ চট্টোপাধ্যায়— যাঁর ঋণ আমি জীবনে শোধ দিতে পারবো না— তিনি আমাকে ১৯১১।১২ সালে বলেছিলেন, 'You will dig your grave by your pen.' (নামের কবর না দেহের কবর বলেন-নি।) এখন দেখছি সাহিত্যই হলো বাঙালির manifest destiny।

ভূপতি চৌধুরী একটি ঘটনার কথা আমাকে বলেন। শান্তিপুরের কাছে কোথায় এক রেফিউজি কলোনি বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ে, ভেসে যায়। সেটা

দেখতে ভূপতিকে পাঠানো হয়। সে কেবল সাহিত্যিক নয়, একজন ভালো এঞ্জিনীয়ার-ডিজাইনার-টাউন প্ল্যানার। পর্যবেক্ষণের সময় বাস্তুহারার দল তাকে লম্বা লম্বা কবিতা দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। সর্বহারা কথাটির বেশি প্রয়োগ ছিল। মোটের ওপর কবিতাগুলি— একটা নয়, অনেকগুলি মন্দ হয়নি। (মন্দ কবিতা লেখা রবীন্দ্রনাথের পর অসম্ভব— পাঠের কথা ভিন্ন।) কিন্তু ঐ বাস্তুহারা সর্বহারা কবির দল ভাঙা চালাঘর তখনও পর্যন্ত তোলেননি, বাড়ির মধ্যে জল কাদা তখনও সাফ করেননি। ইংরেজ সৈন্য ছত্রমঞ্জিলের অন্দরে প্রবেশ করছে; ওয়াজিদ আলির মা, বাদশাজাদী, ছুটে এসে ছেলেকে বললেন, বেতমীজ বে-সহবৎদের শিক্ষা দিতে। ওয়াজিদ আলি শা তখন সকালের রাগ শুনছিলেন প্রিয় ওস্তাদের মুখ থেকে। মাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আম্মা, মির্জা সাহেবের টোড়ির টুকরোটা শেষ হোক।' স্ত্রীলোক অমনই অধীর হয় তিনি জানতেন, কিংবা তাঁর মূল্যজ্ঞান বাঙালিদের মতনই টনটনে ছিল বোধ হয়। আগে কবিতা, না আগে ভাঙা চালা আর নোংরা উঠোনের সংস্কার? আগে টোড়ির টুকরো, না আগে মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা? ওয়াজিদ আলি শা'র বাংলা দেশ ছাড়া অন্যত্র নির্বাসন অ-যথা হতো। তাঁর জুতো কেউ ঘুরিয়ে দেয়নি বলে তিনি পালাতে পারেননি এ-কথাটা মিথ্যা। টোড়ির টুকরোর জন্যই রাজ্য গেল এই ঐতিহাসিক সংবাদ সেই সভার শেষ গায়ক এক শত বৎসরের ওস্তাদ আমাকে দিয়েছিলেন। আমি এই সংবাদটাই বিশ্বাস করি। আমার ধারণা পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ হেরে গেলেন নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' শুনতে শুনতে। ওটা না পড়লেও পারতেন, লোকে— অর্থাৎ ঐতিহাসিকরা বলবেন— কিন্তু আমি বলি, না পড়ে, কিংবা না শুনিয়ে, অতএব না শুনে উপায় ছিল না।

৩. ৯. ৫৬

প্রার্থনা নামে ভবানীপুরের এক সঙ্গীত-চক্রের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। জনকয়েক পাড়ার ছেলে মিলে তৈরি করেছে। হলটি মারহাট্টা নিবাসের, সুন্দর। বাংলা দেশে কিছু তা হলে গড়ে উঠেছে— ভাঙছে তবু গড়ছে। জাকর বলে একটি বোম্বাই অঞ্চলের অল্পবয়সী ছেলের গান শুনলাম। তৈরি হাত, এখনও বুদ্ধি পাকেনি। সাঙ্গীতিক বুদ্ধির [illegible] বিশেষ অর্থ আছে। তার ভিত্তি ওজন জ্ঞান, মান জ্ঞান। সেই ভিত্তির ওপর রাগের ইমারত

কতখানি উঠতে পারে তার জ্ঞান এই বুদ্ধির আরেকটি নিদর্শন। সাঙ্গীতিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ চিহ্ন হলো প্রয়োগ কৌশল। ব্যাপারটা operational আসলে। তার ওপর সৃষ্টি। এই সৃষ্টির ডিজাইন, আর্কিটেকটনিক (architechtonic) আছে। অতি ধীরে, গড়িয়ে, গড়িয়ে একটা একটা স্বর থেকে অন্য স্বরে যাওয়াটা সৃষ্টি নয়। আধ ঘণ্টা পরে না হয় অস্থায়ী শেষ হলো, কণ্ঠ না হয় পঞ্চমে এলো, বেশ লাগলো। কিন্তু কী বেশ লাগলো? সুরেলা গলা শুনলাম, ওস্তাদের ও শ্রোতার ধৈর্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল, রাগও খানিকটা খুললো। এটা যেন উদ্বোধন, আরাধনা, কিন্তু দেবী কি অবতীর্ণা হলেন? তার আগেই তাঁকে অলংকারাকীর্ণা করা হয়েছে। যদি অবতরণের আভাসও এসে থাকে তবু ধৈর্যচ্যুতি কিংবা শ্বাস ফুরিয়ে যাবার ভয়ে ওস্তাদ আরম্ভ করলেন তান, অজস্র তান, মুস্কিলের তান, সঙ্গে বাঁয়াতবলার চটাপটি। ভদ্রলোকের মেয়ে এই গোলমালে অদৃশ্য হলেন। তার পর হাততালি। সোনার সজারু বালিকা বধূ এই অবসরে মূর্ছিতা হলেন। রাগ হলো এক প্রকারের স্থাপত্য। যে ধীরে ধীরে রাগ, কিংবা গানটা গড়ে তুলতে পারে তারই সাঙ্গীতিক বুদ্ধি আছে। এরই প্রক্রিয়া হলো অঙ্গসংস্থান শব্দ-সংস্থান ইত্যাদি। এই বুদ্ধি যার নেই সে বড় ওস্তাদ হতে পারে না। আবার বলছি, বুদ্ধি থাকলেই যে বড় গাইয়ে হবে তা নয়, কারণ গান-বাজনা প্রয়োগশিল্প। মধ্য যুগের বিদেশী দার্শনিকরা যাকে, tact, prudence বলতেন সেটাই প্রয়োগশিল্পের প্রধান কথা। বেহালায়, সানাইতে, বাঁশিতে, এমন কী কণ্ঠে সেতারের অনুকরণ, কিংবা সরোদে বীণার কাজ দেখানো tactlessness, imprudence-এর চিহ্ন। অবশ্য সাধারণ বুদ্ধি থাকা চাই নচেৎ শ্রোতার সঙ্গে বনিবনাও অসম্ভব। জাফর কেন, বহু তথাকথিত ওস্তাদেরও সাঙ্গীতিক বুদ্ধির কমতি লক্ষ করেছি। আর্ট আর ক্রাফট-এর পার্থক্য, কল্পনা-প্রেরণা আর বুদ্ধি কিংবা ক্রিয়ার পার্থক্য— এ সব পণ্ডিতী বোকামি।

৪. ৯. ৫৬

এণ্টালির সাংস্কৃতিক সঙ্ঘে গেলাম। অর্ধেন্দা আর আমি ছিলাম প্রধান অতিথি। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রধান সভাপতি। ধ্রুপদী অমর ভট্টাচার্যমশাই উদ্বোধন করলেন। এঁর সঙ্গে বহু বৎসর পর দেখা হলো। বোধহয় ইনিই বাংলা দেশের শেষ পাকা ধ্রুপদী। অনেক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তায়

সুযোগ পেলাম। বিসমিল্লা সানাই বাজালে। চমৎকার। বিসমিল্লা সানাই-এর নতুন রূপ দিয়েছে। খেয়াল ও তারের যন্ত্রের সংমিশ্রণ। সঙ্গতও বাঁয়াতবলার ছাঁদে। পান্নালালও তাই করেন। সানাই, বাঁশের বাঁশির 'জান' কম, তাই অন্য সাজের আশ্রয় নিতে বাধ্য। সানাই রোশনচৌকির অঙ্গ। বাঁশির প্রতিবেশ খোলা মাঠ। বিবাহ-বাসরে রোশনচৌকির পরিবর্তে রেডিওর, ফিল্ম-এর গান হয়— আর খোলা মাঠ রইলো কোথায়? বাসর থেকে আসরে, মাঠ থেকে হাটে আনলে স্বভাবের পরিবর্তন ঘটবেই।

মণ্ডপটি চমৎকার সাজানো। এমন রুচি আমাদের সময় ছিল না। ভারতের অন্য দেশেও দেখিনি। ডাকের কাজ যে অতো সুচারু হতে পারে জানতাম না। শুনলাম পরিকল্পনাটি দেবব্রতবাবুর, কিন্তু কাজ দেশী, গ্রামের লোকদেরই, যারা বংশানুক্রমে ডাকের সাজ করে আসছে। পটভূমি মোটা পাটির— যেটা রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বিচিত্রার দেয়ালে বসান। (মোটরে বেত-পাটির রেওয়াজ কিন্তু রথীবাবু চালাতে পারলেন না।) ঠিক পিছনকার চতুষ্কোণ নক্‌সাগুলো কিন্তু আমার পছন্দ হয়নি। ডাইনের প্রোসিনিয়মের অঙ্কিত শঙ্খবাদিনীর রঙের রেশকে ভারসাম্য দিতে ও তার জের টানবার কিছু দরকার ছিল। কিন্তু চতুষ্কোণ সাধারণত দীর্ঘায়িত রেখার জের টানতে অক্ষম। চতুষ্কোণের স্থিতিস্থাপকতা ও রেখার লীলায়িত গতি সাধারণত বিরোধী। তাছাড়া দর্শকের ঠিক চোখের সামনে ঐ চতুষ্কোণের উগ্র রং-সমাবেশ ডাকের কাজের শুভ্র শুদ্ধতাকে নষ্ট করবার ভয় ছিল। সে যাই হোক, বাংলার কারুশিল্পের এমন মনোহর আধুনিক রূপ আমার চোখে পড়েনি।

আমাকে বক্তৃতা দিতে হলো। অনভ্যাসের বশে অনেকগুলি ইংরেজী কথার প্রয়োগ করলাম। খারাপ লাগছিল। রাগ-রাগিণীর চিত্ররূপের বর্ণনা ও বিচার ছিল অর্ধেন্দ্রর বিষয়। বিষয়টি তাঁর নিতান্ত প্রিয়। কিন্তু আমার প্রাথমিক সন্দেহ দূর এখনও হলো না। রাগের কাব্যরূপ ও চিত্ররূপ তার নিজের রূপের অনুবাদ মাত্র এবং সে-অনুবাদ নিতান্তই ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। গাইবার কিংবা বাজাবার সময় কোন্ ওস্তাদ ঐ চিত্র, ঐ কাব্যরূপের স্মৃতি পোষণ করেন, কোন্ শ্রোতার মনে ঐ রূপের প্রতিফলন হয়? দেশী সঙ্গীতে, বিলেতী প্রোগ্রাম-সঙ্গীতে সম্ভব খানিকটা, কেননা সেখানে গল্পের, কবিতার, সাহিত্যের, এমন কী চিত্রের আমেজ থাকে। কিন্তু রাগ বিস্তারে? স্ত্রীরূপ অতি সহজে পুরুষের আকার ধারণ করতে পারে— আর হরিণ, ময়ূর সব ছুটে পালায় এক তানে! আর ভাব? তার

রূপ সম্বন্ধে অধিকাংশ মনোবৈজ্ঞানিকরা এখনও সন্দিহান। আমার একবার, বহু বৎসর পূর্বে এই বিষয়ে জানবার ইচ্ছা হয়— কোনো কিছু স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। Psychology of musical emotions বোধ হয় সাহিত্য, চিত্র, রস ও ভাবের সমগোত্র নয়। আমার সন্দেহ রয়েই গেল। তবু অর্ধেন্দদা যা বলেন তাই মূল্যবান। আর্টে অমন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত মানুষ দেশে খুবই কম।

৭. ৯. ৫৬

কাল রাতে ঝঙ্কারের বৈঠকে সালামৎ আর নজাকৎ আলির খেয়াল শুনলাম। ওঁরা মুলতানী (পাকিস্তানের) ঘরানা। পূরিয়ার সঙ্গে কেদারা মিশিয়ে খেয়াল গাইলেন। সুরেশ চক্রবর্তী একটি চমৎকার নাম দিলেন, কেদুরিয়া। খুব হাসলাম। খুব রেওয়াজ করেছেন ওঁরা এই অল্প-বয়সে। অতো অল্প-বয়সে অতি রেওয়াজের কৃপায় কণ্ঠের মিষ্টত্ব ইতিমধ্যে কমছে। তানের বহর খুব, স্বর ও তালের ওপরও বেশ দখল। কিন্তু কিছু হলো না। হয় কেদারা না হয় পূরিয়া গাইলেই হতো, বুঝতে পারতাম, আনন্দ পেতাম। এই প্রকার বাহাদুরি কেনবার প্রয়াস আমার কাছে ছেলেমানুষী মনে হয়। ভাতখণ্ডেজী একবার একজন ওস্তাদকে হাম্বির গাইয়ে বোকা বানিয়েছিলেন। ওস্তাদ লম্বা চওড়া কথা কইছিল— যত সব কূট রাগ নিয়ে গলাবাজি কর-ছিল। পণ্ডিতজী নিতান্ত বিনম্রভাবে, করযোড়ে হাম্বিরের মতন একটি ছোট্ট, সোজা রাগ তাঁর মতো আনাড়ির জন্য গাইতে অনুরোধ করলেন। 'বেসক্ জরুর' বলে ওস্তাদ হাম্বির শুরু করলে। মুখড়াটি বেশ হলো। তার পরই স্বর থেকে ওঠবার সময় কেদারা! ভুল হচ্ছে আর পণ্ডিতজী ঘাড় নাড়ছেন, বাহবা দিচ্ছেন। ওস্তাদ না বুঝে আরো ভুল তান দিতে লাগলো। আমাকে পণ্ডিতজী পরে বলেছিলেন 'প্রচলিত রাগেরই বিস্তারে কৃতিত্ব ধরা পড়ে।' যে মেয়ে রাঁধতে জানে না সেই খানিক গুড়, লঙ্কা, মশলা ঢালে। পান সাজার বেলাও তাই। জরদা-জাফরাণ-মুক্তোর গুঁড়ো-সোনা চাঁদির পাতা মোড়া পান তীর্থযাত্রীদের জন্য। কাশীর রইসরা মুখে দেন না। মিষ্টি-চা, বাংলা কীর্তন আর অ-প্রচলিত মিশ্ররাগ একই মনো-বৃত্তির পরিচয়।

এত উপকার সত্ত্বেও সঙ্গীত সম্মেলনগুলি সঙ্গীতরুচির অন্তরের মূল্যজ্ঞানকে নামিয়ে দিচ্ছে মনে হলো।

আজ আলিগড় ফিরবো। একটু যে ভয়, মন খারাপ হচ্ছে না তা নয়। মিঠে রোদ, আকাশে-বাতাসে মাদকতা আছে এই শহরের। কলকাতায় নানা অসুবিধা, তবু, তবু এ শহরের মূল্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়নি মনে হয়। এ-শহরের ছেলে-ছোকরারা খেতে পায়নি, তবু তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় জনকয়েক তো নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, তবু নতুন কথা শুনতে চায়, চারুকলায় অনুরাগী। বাংলা দেশকে তোলা অসম্ভব নয়— Theoretically অবশ্য

১৪. ১. ৫৬

কলকাতায় হিস্ট্রি কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন দেখে এলাম; এখানে জিওগ্রাফির প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল সেমিনার দেখছি। সাধারণত, এই ধরনের সম্মেলন একপ্রকার বিরাট তামাসা। তামাসা বটে, কিন্তু মজা নেই। প্রোগ্রাম এতই ঘন যে, কারুর সঙ্গে কোনো বিষয় আলোচনা করবার সময় কেউ পায় না। কেবল খাওয়া-দাওয়া আর ঘোরাঘুরি। সামাজিক মূল্যও কমে আসছে। কে কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়! সকলেই বড়দের পিছনে ছুটছে! ছেলে-ছোকরারা যারা কাজ করছে, উঠছে, যারা উপদেশ চায়, যাদের উপদেশ দরকার, তাদের স্থান জাদুগণ্ডির বাইরে। আর যাঁরা অনুষ্ঠানকে নিজেদের হাতে রাখতে চান তাঁরা নীরবে স্বনির্বাচিত হয়ে যাচ্ছেন। কনফারেন্স না ছাই! সব 'পাওয়ার' পলিটিক্স-এর রকমফের।

তবু কলকাতার হিস্ট্রি কংগ্রেস খুবই ভালো লাগলো। কেবলই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, এতটা কেন ভালো লাগছে? এককালে ইতিহাস পড়তাম ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঐ দরজা দিয়ে ঢুকতাম, কোণে পানের দোকানে মিঠে খিলি কিনতাম, সেনেট হাউসে আশুবাবুকে দেখতাম— তারপর সব যোগ ছিন্ন হয়ে গেল। গত চল্লিশ বছরে মাত্র দু'বার আশুতোষ বিল্ডিং-এর মধ্যে গিয়েছি। একবার দ্বারিক ঘোষ বক্তৃতা দিতে নিয়ে যান, আর একবার 'খোঁজ পরিষদের' একটা সভায়। ব্যস— আর কোনো যোগ নেই। মায়া কাটানোই মঙ্গল, কিন্তু কাটে কই? এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। তা যাক গে!

সম্মেলনের দুটি জিনিস চোখে পড়লো। সজ্জার ও বেশের সুরুচি এবং বুদ্ধিদীপ্ত মুখচোখ। অনেকদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরঞ্জামে সুরুচির

পরিচয় পেলাম। আর অতোগুলি বুদ্ধিমাখানো চেহারাও অনেকদিন দেখিনি। কিন্তু সব বেঁটে মনে হলো। ছাত্র-ছাত্রীরা, অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবকের দল, তারাই যে বাস-ট্রাম পোড়ায় সন্দেহ পর্যন্ত হলো না। স্বাস্থ্যহীনও তো নয়! ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগলো। খবরের কাগজে কিছুতেই ভুল লিখতে পারে না, আর নেতারা নিশ্চয়ই ভেবে চিন্তে কথা বলেন। আমারই মরীচিকা দর্শন!

নির্মল সিদ্ধান্তের অভ্যর্থনা, ড সুরেন সেন ও পানিক্করের বক্তৃতা সবই ভালো লাগলো। নির্মল সিদ্ধান্ত বললেন, কলকাতার রাস্তায় স্বাধীনতার সংগ্রাম চলেছিল। আমারও বিশ্বাস তাই, কিন্তু বিধানবাবু কি সায় দেবেন? অনেকদিন পরে হরেনবাবুকে (রাজ্যপাল) দেখলাম। তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি। একেই বলে মানুষের মতন মানুষ!

পানিক্করের অভিভাষণে অনেক মূল্যবান মন্তব্য রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি, মুখ খুললেই নতুন কথা ঝরে পড়ে ও সেই শুনে মন চাঙা না হয়ে যায় না। কিন্তু, কিন্তু, কোথায় যেন 'কিন্তু' থেকে যায়। প্রাদেশিক মনোভাব ইতিহাসে অচল; ভারতবর্ষের ঐক্য ধরতে হবে: তার আভ্যন্তরীণ আর্য-অনার্য সভ্যতার আদান-প্রদান যে এখনও চলছে বুঝতে হবে: ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রতিবেশকে বাড়াতে হবে; কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস লিখলে চলবে না— প্রত্যেক কথাটিই মূল্যবান। কিন্তু একটি মন্তব্য ধরা যাক। প্রাদেশিক মনোভাব নিতান্ত খারাপ সকলেই জানে— ওটা মরা ঘোড়াকে ঠ্যাঙানো। কিন্তু যদি সামাজিক ইতিহাস লেখাই কাম্য হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমাজকেই টয়েনবির ভাষায়, inte'l'gible field of observation হিসেবেই মানতে হবে। তারপর অবশ্য গড়ে তোলা— সে-কাজ শক্ত, এতই শক্ত যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস-রচনার কল্পনা সরকারকে ত্যাগ করতে হলো। সমগ্র ভারতকে যদি 'ইন্টেলিজিবল ফীল্ড' ধরা যায় তা হলে সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে দাঁড়ায় কি? জাতি-প্রথা ও সংস্কৃত পুঁথিপত্রের ইতিহাস। জাতিপ্রথার ইতিহাসকে না হয় আর্য-অনার্য ইত্যাদির 'acculturation process' হিসেবে ধরা গেল, না হয় পুঁথিপত্রের, সাহিত্যের, দর্শনের ইতিহাস সব জানা গেল— তা এখনও জানা যায়নি— তবু কি ভারতের ঐতিহাসিক ঐক্য হৃদয়ঙ্গম হলো? আমার সন্দেহ হয়, অনেক কিছুই বাদ পড়ে গেল। আসল জিনিসটাই এতে কমে যায়— সেটা ভারতের মেটিরিয়াল ক্যালচরের ইতিহাস। একেই তো আমাদের ঐতিহাসিকরা সমাজতত্ত্ব ছোঁবেন না— তাঁরা নৃতত্ত্বকেও দেখতে

পারেন না— তার ওপর ভারতের মেটিরিয়াল ইকনমিক হিস্ট্রি! ও যে একেবারে মার্কসিজম্‌! তাই বোধ হয় পানিক্কর 'পিরেন' পর্যন্ত এসে থেমে গেলেন। কিন্তু ও-দেশের ঐতিহাসিকরা পিরেনকেও অতিক্রম করেছে। আমি অন্তত ১।৮টি প্রবন্ধ পড়েছি যেখানে তাঁর মধ্যযুগ ও ফিউডালিজম সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে নথির সাহায্যে নাকচ করা হয়েছে। ব্যাপারটা আমার মতে এই, ভারতের সংস্কৃতি বলে একটা বস্তু আছে। যদিও তাঁকে ঠিক ধরা ছোঁয়া যায় না। সেই সংস্কৃতির ইতিহাস সোশিওলজি অব নলেজ-এর অঙ্গ, তথাকথিত ইতিহাসের অঙ্গ নয়। সেই সোশিওলজি অব নলেজ-এর মেটিরিয়াল ভিত্তি না জানলে তার ডাইনামিক্‌স বোঝা যায় না। এবং ইতিহাস ব্যাপারটাই ডাইনামিক, রাজা রাজোয়াড়ার কীর্তিকলাপের ব্যাক ড্রপ নয়। এ-সবের ইঙ্গিত পানিক্করের অভিভাষণে নেই।

এখানে ভূগোলের আন্তর্জাতিক সেমিনার চলছে। ভারতের বাইরে ১৬।১৭টি দেশের প্রতিনিধিরা এসেছেন খুব জমজমাট। বন্দোবস্ত চমৎকার। এখানে হোটেল নেই, তাই প্রত্যেক অধ্যাপককে কিছু কিছু অতিথি সর্বদাই রাখতে হয়। আমরাও নতুন মুখ দেখবার আশায় রাজি হই। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সেমিনার বিভক্ত হয়েছে। একাধিক প্রবন্ধ শুনলাম, অনেক কিছু শিখলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের এককালে খুবই নাম ছিল। আবার এইবার থেকে হবে। একটি লেকচারার, তার আবার একটা ফুসফুস নেই, সমগ্র কনফারেন্সের কর্ণধার। যেমন পরিশ্রমের শক্তি, তেমনই বুদ্ধিমান, তেমনই মাথা ঠাণ্ডা ও কর্মিষ্ঠ। কলের মতন চালাচ্ছে। অথচ মুনীস্‌ লেকচারার এবং তাই থাকবে চিরটাকাল হয়তো, যদি অবশ্য বেঁচে থাকে। জাকির সাহেব এখানে Institute for the study of arid and semi-arid zone স্থাপনার প্রস্তাব করলেন। মিশরের একজন বিখ্যাত ভৌগোলিক বক্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গত বললেন, স্পিরিচুয়েল জিওগ্রাফি চাই। যদি ভৌগোলিক প্রতিবেশের সঙ্গে মিথ, সিম্বল, লেজেণ্ড, এমন কী দার্শনিক মনোভাব, অর্থাৎ ভূয়োদর্শনের সম্বন্ধ নিরূপণ— এই ধরনের ব্যাপার ভূগোলের বিষয় ও উদ্দেশ্য হয় তবে তার অর্থ বুঝি। কিন্তু তিনি আরো কিছু বোঝেন কথাবার্তায় মনে হলো। ভদ্রলোক মহাপণ্ডিত। আরব-বাণিজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন। বইখানি পেয়েছি। রুশ-ভৌগোলিকদের রিজিয়নাল প্ল্যানিং নিয়ে প্রশ্ন করলাম। সদুত্তর পেলাম না। ভাষার বাধাই বোধ হয়।

গোটাকয়েক কারণে প্রশ্নটি তুলেছিলাম। (১) মনে আমার পানিক্করের

বক্তৃতায় ভারতীয় ঐক্য-বোধের আবেদনের জোর ছিল। কেবল ঐক্য বললেই তো চলবে না, তার শক্তিরও একটা পরিমাণ চাই। ভারতীয় ঐক্য-বোধের জোরের চেয়ে ধর্ম, ভাষা ও জমি সংক্রান্ত ঐক্য-বোধের জোর বেশি দেখেছি, যথা, পাকিস্তান এবং অন্ধ্রদেশের জন্ম। (ভয় হচ্ছে, ভাষা-গত ঐক্য-বোধের অন্য প্রমাণ শীঘ্রই পাবো।) রুশদেশে এই সমস্যার অনেকখানি নিরাকরণ হয়েছে। তার মর্ম-কথা কর্ম-প্রেরণার শক্তির আধিক্য। অর্থাৎ নতুন জীবনের প্ল্যানিং। (২) রাশিয়ার সেই প্ল্যানিং-এর এক অবস্থায় regional planning-এর balance খোঁজা হয়। তার খবর আমরা বেশি কিছু জানি না। রাশিয়ার মধ্যে একাংশ উন্নত, অন্যাংশ অনুন্নত। তাদের মধ্যে যে লেন-দেন চলে তার মূলতত্ত্ব যা ওলীন্ বলেছেন তাই, না আর কিছু? মার্কসিস্ট অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির খবর পাওয়া যায় না। আমি জানতে চেয়েছিলাম। (৩) এস. আর. সি. রিপোর্ট পড়ে পর্যন্ত আমার প্রাণ টুগ্-বুগ্ করছে। রাধাকমলবাবু রিজিয়নালিজম নিয়ে অনেক কিছু লিখলেন, বই-এর পর বই লেখাই সার হলো, তাঁর নিজেরই উপকার হলো। দেশের লোক তাঁর ভাষা বুঝতেই পারলে না, অন্য কোনো ফলই হলো না। তারপর কোপলাণ্ড সাহেব ভারতবর্ষকে রিভারবেসিন অনুসারে ভাগ করতে চাইলেন। ভাগ হলো, কিন্তু নদীর জল নিয়ে এখনও পাকিস্তানের সঙ্গে ঝগড়া চলছে। তার ওপর এই এস আর. সি রিপোর্ট, যার মধ্যে ভৌগোলিক রিজিয়নালিজম-এর সঙ্গে ভাষাগত রিজিয়নালিজম জট পাকিয়ে রয়েছে। এখন আবার পণ্ডিতজী বলছেন, রিজিওনাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হলে ভালো হয়। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এমন দুর্দশা যে, আমরা অমনি গিলে ফেলেছি। কিন্তু ব্যাপারটি কি এই নয় যে, আমরা সমবেত কর্মের মধ্যে ঐক্য পাইনি? তাই ভাষা, জাতি, দেশ, অর্থাৎ প্রদেশ, শ্রেণী 'রিজন' প্রভৃতির মধ্যে ঐক্য চাইছি এবং পাচ্ছি, কারণ সেগুলিই তো এতদিন রয়েছে! এই ধরনের ঐক্য একপ্রকার স্বাভাবিক, তাই তার জোর এত বেশি। সংস্কৃত, সংস্কৃত করে চেঁচালে কী হবে! নব-ভারতের একমাত্র শক্তিশালী ঐক্য-বোধ আসতে পারে সমবেত সৃজনের সাহায্যে। অর্থাৎ, আমাদের প্ল্যানিং এখনও জমেনি, মাটিতে পৌঁছয়নি, শেকড় গাড়েনি। মুমূর্ষু ভীষ্ম বাঁচতে পারেন একমাত্র পাতালের উৎস থেকে যে জল ওঠে, তাই সেবন করে। কলের জলে বৃদ্ধ পিতামহ বাঁচেন না। হয়তো হবে, ভারতের ঐক্য-বোধ আসবে, কোনো না কোনোদিন আসবে নিশ্চয়। তারপর রিজিয়নাল ব্যালান্স নিয়ে মাথা ঘামাবো। রাশিয়ান

প্ল্যানে ওটা পরে আসে— যখন নিখিল সংকল্পকে কার্যকরী করা হয় তখন। (ওটা প্ল্যানের ব্রেক-ডাউন।)

এইসব ভয় ভাবনা মনে ছিল। ভূগোল ও জাতীয় সংগঠন নামে যে সেমিনার হয়েছিল তাতে যোগ দিলাম। বেশি কিছু শিখলাম না। আলোচনার স্তর উঁচু ছিল না, ঐ যেমন দেশী কনফারেন্স-এ হয় তেমনই। আরো দু'দিন চলবে, দেখি…

১৭. ৯. ৫৬

মালিক মনসুর নামে একজন গায়কের গান রেডিওতে শুনলাম। পূর্বে তাঁর নামই শুনিনি। রেডিওর কাছে কৃতজ্ঞ। রেডিওর অনেক দোষ আছে কিন্তু অ-খ্যাত গুণীকে খুঁজে বার করার এক গুণে সব দোষ ঢাকা পড়ে। শুনলাম নীলকণ্ঠ বোয়ার কাছে প্রথম নাড়া বাঁধেন, তারপর ভুর্জি খাঁ'র কাছে। আলাদিয়া খাঁ'র ঘরানাই মনে হলো। সেই মুশকিলের তান, আলাপ বাদ দিয়ে গান শুরু করা, সেই গঠন-চাতুর্য। একেবারে অন্ধ, কোনো ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। অতো শক্ত তানের মধ্যে রাগভ্রষ্ট হলো না, স্বরচ্যুতি, স্বরভঙ্গ হলো না। জয়েৎশ্রী ও নন্দ গাইলেন। অনেকদিন পরে জয়েৎশ্রী শুনলাম। আমার খুব ভালো লাগলো, কিন্তু বোধ হয় অন্যের পছন্দ হবে না। অতো ডিজাইনের কারিগরি কী জনপ্রিয় হবে? অথচ এই সত্যকারের খেয়াল। হঠাৎ চোখে ভেসে উঠলো মন্দ্রিঁয়ার একটা ছবি। যে যাই বলুন, আমাদের উচ্চসঙ্গীত নিতান্তই অ্যাবস্ট্রাক্ট— তাই বাধ, উপভোগ করা আমাদের পক্ষে খুব শক্ত নয়। নিজের এই অভিজ্ঞতা। কী জানি কেন, কথা জড়ানো সাহিত্য মাখানো, সাহিত্যিক রসে চোবানো সঙ্গীতের প্রসারে আমি একটু ভীত হয়েছি। ঐ সাহিত্যের আশীর্বাদেই মেয়েরা ঢুকে পড়েছেন, কেবল আসরে নয়, সঙ্গীতের মধ্যে। 'ও মা, কী মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে সব!' খুরশেদ আলি বলতেন, 'ঠুংরি মেয়েদের জন্য নয়।' অর্থাৎ, ঠুংরিটাও নয়।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণ কথার মাধুর্য নয়, কথা ও সুরের সঙ্গতিও ততটা নয়, যতটা গানটির ডিজাইন। কথা বাদ দিয়ে, কেবল স্বরবর্ণের সাহায্যে সুরটি গাইলেই বোঝা যায়। অবশ্য কথা অতুলনীয়, সঙ্গতিও অচ্ছেদ্য, তবু তারও অধিক হলো ডিজাইন, যেটা ধারণ করছে, অর্থাৎ ধর্ম। দক্ষিণীর এক বার্ষিক উৎসবে আশুতোষ কলেজে এই ধরনের কথা প্রমাণ সমেত

বলেছিলাম মনে পড়ছে।

প্রধানত উচ্চসঙ্গীতে রাগের একটা বড়, মোটা কাঠামো থাকে, তারই মধ্যে গাইয়ে-বাজিয়েকে বিচরণ করতে হয়। সেই সময়টুকু তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অবসর। কৃতিত্বের রং হলো ভাব, এক্সপ্রেশন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান এক একটি 'ডিজাইন', সেইটিই কাঠামো, সেইটিই এক্সপ্রেশন। তার ওপর ব্যক্তিগত এক্সপ্রেশন চাপালে বিপদ ঘনিয়ে ওঠে। হয়ে পড়ে ন্যাকামি। ন্যাকামির মানে আদিখ্যেতা, অর্থাৎ আধিক্য। আমার মনে হয়, এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুর নিয়ে ছিনিমিনি করতে দিতে গররাজি ছিলেন। দিলীপ ঠিক ধরতে পারেনি। আরো অনেকেই পারেন না। বেদমন্ত্রের উচ্চারণে শুদ্ধতার ওপর অতোটা জোর দেওয়া হতো কেন আমাদের ভাবা উচিত। ঐ প্রকার শুদ্ধতার একটা সৃষ্টির দিক আছে। যে-যুগে আর্চটাইপ তৈরি হচ্ছে, সিম্বল তৈরি হচ্ছে, তখন পুনরাবৃত্তির অর্থ সৃষ্টি, শুদ্ধ আবৃত্তির অর্থ শব্দ সৃষ্টি। একজন চীনে আর্টিস্ট একটি ছবিই জীবনভোর এঁকে গেলেন, "Until it became a masterpiece"। এনায়েৎ খাঁ'র হাতে একই পিলু, একই কাফি বহুবার শুনেছি, প্রতিবারই নতুন, প্রতিবারই সৃষ্টি। শুদ্ধতার ওপর অতোটা জোর দেবার অবশ্য অন্য একটা সামাজিক দিক আছে। ঐ জোর দিয়েই উচ্চ শ্রেণী, এলিট গ্রুপ,— যেমন ব্রাহ্মণ, উলেমা, ম্যাণ্ডারিণ, নিজেদের শ্রেণী আধিপত্য বজায় রাখে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যদি ঐ ধরনের দলীয় স্বার্থ তৈরি হয়ে থাকে, তবে তাকে ভাঙাই উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ আবৃত্তির সৃষ্টিশক্তি যেন না ভেঙে যায়। তার মধ্যে একটা ভূমিকা প্রতিষ্ঠার ক্রিয়া চলে। শব্দের সাহায্যে ঐতিহ্য বেঁচে থাকে, আবার শব্দের সাহায্যেই ঐতিহ্য পুনর্জীবিত হয়। তন্ত্রের জপতত্ত্বে অনেক গভীর কথা আছে।

ঘরানার গূঢ়ার্থ এই শব্দতত্ত্ব। তাই উজীর খাঁ'র শিষ্য আলাউদ্দিন, তাঁর শিষ্য আলি আকবর, রবিশঙ্কর, তিমির, নিখিল, এঁদের সম্বন্ধে ভুল হবার জো নেই, এঁরা কোন্ ঘরানার। আধ মিনিটেই বোঝা যায় তাঁদের জাতি। অবশ্য পার্থক্য আছে। আজ কয়েকদিন যাবত এঁদের নিজেদের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করছি। এখনও স্পষ্ট ধরতে পারিনি। তবে খানিকটা এই ধরনের মনে হয়। আলি আকবরের বাজনার প্রধান কথা ছন্দ, লয়; তার রাগিণী লয়-ময় (যেমন সৃষ্টি ব্রহ্মময়, আনন্দময়)। রাগিণী ফুটছে ছন্দিত হয়ে। তার প্রতি অংশ ছন্দে বাঁধা। তাই তার জীবন তার

শ্বাস প্রশ্বাস। নক্‌সাগুলো নেচে সামনে আসে, নেচে চলে যায়। এই ছন্দের মধ্যেই তার ভাব, এক্সপ্রেশন ছন্দই ভাব। ব্যাকানালীয়ান নৃত্য নয়, ডায়োনিশিয়ানের জাতি, আরো সুচারু। আলি আকবর, নাটকত্ব ফোটায় এই শব্দপ্রাণ বাদনের সাহায্যে। সরোদের প্রথামত ড্রামাটিক টেকনিকে সে সন্তুষ্ট নয়, সে তারও অধিক বাজায়। আমার কাছে তার বাজনার প্রতিটি অংশ মূর্ত হয়ে ওঠে। তার ডিজাইনটা এত সুন্দর যে, নিজের ছন্দের তাগিদেই সেটি রূপ পায়। ছন্দ এখানে স্রষ্টা, তার বাজনা শুনতে শুনতে বুঝতে পারি কর্তারা কেন ছন্দ নিয়ে অতো বাড়াবড়ি করতেন। ছন্দ তার ইনস্কেপ্।

রবিশঙ্কর 'হরফ', 'ফ্রেজ', 'ইডিয়ম', 'বাক্য' 'বোল'-এর রাজা। এমন স্পষ্ট হরফ, ফ্রেজ, বাক্য (সেণ্টেন্স) আমি জীবনে শুনিনি। এত স্পষ্ট, যেন মনে হয় রাগিণীর পটভূমি থেকে বেরিয়ে এসে, চোখের সামনে দাঁড়ালো। এই বেরিয়ে এসে দাঁড়ানো আধুনিক আর্টের একটি প্রধান লক্ষণ। এতে একটু পশ্চিমী আমেজ থাকে নিশ্চয়— রবিশঙ্কর পশ্চিমের অনেক ভালো জিনিস হজম করেছেন। তাঁর বাজনা শুনলে আমার পূর্ব বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে সঙ্গীত মনের অন্য স্তরের ভাষা। সাহিত্য ছাড়া অন্য, তবু ভাষা। তার হরফ, ফ্রেজ, ইডিয়ম, বাক্য থাকবেই! এই নক্‌সা ততটা ছন্দপ্রাণ নয়, যতটা ভাষাপ্রাণ। অবশ্য দু'জনের সব গুণই আছে, আমি কেবল আমার কাছে যতটুকু বিশেষত্ব মনে হয় তাই ভাবছি। রবিশঙ্করের ভাব, এক্সপ্রেশন, সিণ্ট্যাক্সের ওপর বেশি নির্ভর করে। তাই একটু বেশি ইণ্টেলেকচুয়েল মনে হয়। তার বাজনা আমার একটু বেশি মন দিয়ে শুনতে হয়। শুয়ে শুয়ে ভাবি, কী করে প্যারাগ্রাফ তৈরি করলে। দু'জনের কেউই 'ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট' নয়, দু'জনেই স্রষ্টা— নতুন রাগ সৃষ্টির দিক থেকে এবং পুরাতন রাগে বিকাশের দিক থেকে। এটা মস্ত মিল। তার চেয়েও বড় মিল যে, তারা একই ঘরানার দুই শাখা।

বিলায়েৎ-এর কথা পৃথক। এক বছরেরও ওপর তার বাজনা শুনিনি— খুবই শুনতে ইচ্ছা হয়। তাঁর পিতা আমার বন্ধু ছিলেন, আমাকে 'ভাই সাহেব' বলতেন। তাঁর পিতামহের বাজনাও আমি একাধিকবার শুনেছি। তাঁর ঘরানার সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধের প্রয়োজন। বাজনায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পৃথিবীর সব সঙ্গীতের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে এই বিলায়েৎ, এই আলি, এই রবির কৃপায়। ধন্য এমদাদ-এনায়েৎ, ধন্য উজীর-আলাউদ্দিন। ঘরানার মধ্যে একসঙ্গে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ! 'আধুনিক'

সঙ্গীত-এর কাছে বড্ডই 'পার্ভেন্যু' ঠেকে। এটা আভিজাত্যের কথা নয়, জীবনধর্মের মূল সূত্র।

সেই কতদিন আগে এডমণ্ড বার্ক পড়েছিলাম— আবার পড়তে মন চায়। সঙ্গীত-আলোচনা কথায় মারকত হয় না ঠিক। তাই ঠিক ঠিক লিখতে পারছি না।

১৯. ১. ৫৬

দিল্লী গেলাম কাজে, লাভ হলো ছবির একজিবিশন দেখে। শেরগিল ও রবীন্দ্রনাথের বহু ছবি একত্রে দেখতে পেলাম। একদিন আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ একজন বড় চিত্রকর ছিলেন, ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলার তিনিই গুরু এবং যে-কথা আমি বহু পূর্বে বলেছি, 'Tagore, a Study' বই-এ, চিত্রকলার ভিতর দিয়ে তাঁর মনের এমন সব অংশ রূপান্বিত হয়েছে যা কবিতায় হয়নি এবং যাদের সন্ধান না জানলে রবীন্দ্রনাথের সম্যক প্রতিভা কখনই বোঝা যাবে না। এ যেন ভিন্ন জগৎ, এ-জগৎ কমনীয়তার, নমনীয়তার, লিরিক মাধুর্যের নয়। এ-জগৎ অন্ধকার ভেদ করে জোরে বেরিয়ে আসছে, তাই ঘন রং। এখনও রূপ পায়নি, তাই বীভৎস, খাম-খেয়ালি, ভয়ংকর জৈব। শক্তি তার নগ্ন— denizens of the deep। মেয়ের মুখ পুরুষের মুখ থেকে, মানুষের মুখ জন্তুর মুখ থেকে তখনও বিভিন্ন হয়নি। হাঁ, ফুল রয়েছে। সেটাও আদিম, বুনো, মালির তৈরি কাটা ফুল নয়। এ ছবিতে ভয়ংকরের ছায়া রয়েছে। হয়তো অতোটা মার্জিত সভ্যতা, অতোটা বৈদগ্ধ্যের ক্ষতিপূরণ। কিংবা হয়তো প্রতিভার মূলে ভয়ংকরের ভিত্তি থাকে। রবীন্দ্রনাথ শক্তিপূজার পূজারী ছিলেন না। কিন্তু শক্তিকে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, এই দেখে আশ্চর্য লাগে। তাই বা লাগবে কেন? এইটেই তো প্রতিভার পক্ষে স্বাভাবিক। অনেক প্রমাণ মনে পড়ছে। দান্তের নরকদর্শন থেকে দা ভিঞ্চির নোটবুক, ফাউস্টের দ্বিতীয় ভাগ।

অমৃতা শেরগিল-এর অভিব্যক্তিটি নিতান্ত মধুর। প্যারিস থেকে গোরখ-পুর। একাডেমিক পদ্ধতি ছাড়বার সাহস পেলেন দেশের মাটি থেকে। শেষ দিকের ছবিতে গভীরতা আসছিল। বেঁচে থাকলে হয়তো যামিনী-দার'ই মতন মাটির ভাঁড়ে রং চড়াতেন। হুসেনের নতুন ছবিগুলিতে ডিজাইন আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি চোখে পড়লো তাঁর রঙের জ্ঞান।

সত্যই অপূর্ব। সতীশ গুজরালের ছবি খুব শক্তিশালী। ঢঙ না হয়ে যায়! যে সব ছবি পুরস্কার পেয়েছে, তার মধ্যে দুটির নক্সা পুরাতন হলেও নতুন-ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। খানকয়েক ছবি ছেড়ে দিলে সব ভালো ছবি-গুলিই রিয়ালিজম বর্জন করেছে। ভাস্কর্যের নমুনা কম— শঙ্খ চৌধুরীর একটি কাজ সত্যই উচ্চ শ্রেণীর। আবার দেখতে হবে। অনেক দেখবার পর তবে ভাবগুলো থিতোয়। আমার সামনে যামিনীদা'র একটা গলির ছবি রয়েছে। দেখে আশ মেটে না— যতই দেখি, ততই নতুন মনে হয়। অর্থাৎ ছবিটি ভালো। সেকালের ছবি নাকি বহুবার দেখলে তবেই হৃদয়ঙ্গম হয়। গভীরতার স্তর বহু। ধাপে ধাপে নেমে যাও। কিন্তু আবার ফিরে আসা চাই।

এইবার বোধ হয় আমরা আধুনিক চিত্রের মর্ম ধরতে শিখছি। বন্ধু কপুর তার বাড়িতে গার্দে বলে একজন নতুন চিত্রকরের ছবি দেখালে। পুরোপুরি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নয়— তবে ঐ জাতের। রঙের সমাবেশ খুবই ভালো লাগলো। এতদিনে একটা কিছু হচ্ছে তা হলে। তবে দিল্লী, তবে জয়পুর হাউস ঐ যা। বরদা ও মুকুলবাবু একটা নতুন বাড়ি না করে ছাড়বেন না। আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের আগ্রহ দেখে মন খুশী হলো। তারা একটা মুঘল মিনিয়েচারের বই প্রকাশ করেছেন। যেমন ছাপা, তেমনই গেট-আপ। ভাবতেই পারিনি যে দেশী ছাপা।

সব দিক থেকেই জীবনের স্পন্দন অনুভব করছি। স্বদেশী যুগের তীব্রতা হয়তো নেই— কেমন করেই বা থাকবে— ওটা ছিল বাংলা, এটা সমগ্র ভারত— তার ওপর, বয়সের মরণ-টান যাবে কোথায়?

জাকির সাহেব চিত্রকলার ভক্ত। কেবল বলছেন একটা আর্ট গ্যালারি করতে। আমাদের লাইব্রেরিতে অনেক ভালো ভালো আর্ট-এর বই ও কোলিও আছে। ছেলেদের বেশি আগ্রহ নেই— অথচ প্রতি বৎসর একজিবিশন হয়। ও জন্যে আর খাটতে পারি না। নিজে নিজে দেখি, তাতেই মন ভরে ওঠে। তবে ব্যাপারটা কম্যুনিকেশন-এর। আনন্দ না ভাগ করলে সত্যকারের উপভোগ হয় না। আমি মিস্টিক নয়।

২০. ৯. ৫৬

ইণ্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ডের বাৎসরিক বৈঠক হলো। দেশের প্রায় সব ভাইস-চ্যান্সেলারই এসেছিলেন, পুনা ও বোম্বাই ছাড়া। রাজ্যপাল শ্রী

মুন্সী উদ্বোধন করলেন। ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করলে দেশের ক্ষতি হবে তাঁর মত। সভাপতি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারেরও সেই কথা। শ্রোতারা খুব খুশী। আনন্দের একটা গোপন উৎস হলো হিন্দীর বিপক্ষ মনোভাব। এক উত্তর প্রদেশ, বিহার আর মধ্য প্রদেশ ছাড়া প্রায় সর্বত্র, বিশেষত এই আলিগড়ে সেটা প্রকট। দোষ দিই না, যে-হিন্দীর প্রচলন হচ্ছে, যে-হিন্দীর প্রসার হচ্ছে তাতে মন যায় চটে। কিন্তু সমাজ-তত্ত্বের দিক থেকে একটা কথা মনে ওঠে। এই বিপক্ষতার পিছনে একটা শ্রেণীগত স্বার্থ লুকিয়ে আছে। সেই 'আমরা ও তাঁহারা'র বিবাদ। আমরা, ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা, চিরকালই ওপরে থাকবো, আর তাঁরা, ইংরেজী না জানা, হিন্দীভাষী (এ অঞ্চলের কথাই বলছি), নিম্ন শ্রেণীরা সমাজের নিচেই থাকবেন, এ-অবস্থা বেশি দিন চলবে কি? ইং-রেজীর মাধ্যমে বেশি খবর (ইনফর্মেশন) পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান? সেজন্য চাই চিন্তা এবং সে-চিন্তার জন্য নতুন সংজ্ঞা (টার্মস), নতুনভাবে সাজা-নোর প্রয়োজন। এ কাজগুলি ইংরেজী ভাষায়, পরের ভাষায়, বই-এর ভাষায় হয় না। ব্যাপারটা দাঁড়ায় কেবল মাতৃভাষায় নয়, জনগণের মুখের ভাষায়। ইংরেজী ভাষা জনগণের মুখের ভাষা হতে যতদিন লাগবে, তার চেয়ে অনেক কম দিন লাগবে হিন্দী জনগণের মুখের ভাষায় পরিণত হতে। ভাষার তর্কে চিন্তার সঙ্গে জনগণের ব্যবহারিক জীবনের তথা ভাষার সম্পর্ক-টির বিচার একেবারেই হচ্ছে না। টেকনিক্যাল শব্দের কি হবে? সত্যেন (বোস) তার একটি চমৎকার উত্তর দেয়— হিন্দু দর্শনের টেকনিক্যাল শব্দের ব্যাখ্যাই তো এতদিন আনন্দের সঙ্গে করে আসছি ও তাতে গৌরববোধও করেছি, তবে বিদেশী টেকনিক্যাল শব্দের প্রতিশব্দের ব্যাখ্যায় আপত্তিটা কি? আমি আর একটু বলি: ইকনমিক্স-এ শত শত টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে— যে নতুন একটি শব্দ চালু করাতে পারলে সেই পণ্ডিত, ধুরন্ধর। অবশ্য নতুন শব্দ প্রয়োগের মধ্যে একটা প্রিসিশনের দিক আছে নিশ্চয়। কিন্তু এই সব নতুন কথার আভ্যন্তরীণ প্রত্যয়টি কি আমাদের কাছে বাস্তব? আমি ডজন ডজন নতুন শব্দের দৃষ্টান্ত দিতে পারি যার অর্থ মাত্র আক্ষরিক, শাব্দিক মাত্র, বাস্তব নয়, সৎ নয়। অথচ এই চলছে, এরই নাম পাণ্ডিত্য! এক প্রকার হিংটিং ছট মাত্র। ফল? এ কান দিয়ে শোনা আর ও-কান দিয়ে বেরোনো। ফল? দেশ চালাচ্ছে সরকারী লোক যারা অর্থনীতির অধ্যাপকবৃন্দের চেয়ে দেশের সঙ্গে যোগ রাখে, যোগ রাখতে বাধ্য। আমি একটা ছোট জেলায় থাকি, অর্থনীতির বহু নতুন বই

ও পত্রিকা পড়ি, কিন্তু আমি জানি যে, তহশীলদার-কানুনগোরা জেলার লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে তারা linear equation, production co-efficient counter-varling power, long-term projection, indifference curve, physical balance, Domar-Harrod equation, Cobb-Douglas theorem-এর খবর রাখে না, কিন্তু পয়দাবারীর সব খবরই তাঁরা জানেন, বোঝেন। Consumption-schedule তাঁরা তৈরি করতে পারেন না, কিন্তু সালিয়ানার খরচ-খরচা তাঁদের নখদর্পণে। কারণ তাঁরা মাটির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের ভাষা জনগণের ভাষা। আমরা পৃথক, আমাদের ভাষাও পৃথক— অতএব পৃথকই থাকা উচিত— যুক্তিটা এই ধরনের, মনে মনে, মুখে নয়; তাই কারুর মুখে ইংরেজী ভাষার ভারতীয় প্রয়োজনীয়তা শুনলে হাততালি বেজে ওঠে।

২২. ১. ৫৬

জীবনে কত ভাইস-চ্যান্সেলারই না দেখলাম। আমার কাছে আশুবাবুই দেশের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার ও শেষ। অনেক ভালো পণ্ডিত ভাইস-চ্যান্সেলার দেখেছি। জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ড. রাধাকৃষ্ণণ, অমরনাথ ঝা, সার মাইকেল গয়ার, জাকির হোসেন— কিন্তু আশুবাবুর জাতের নয়। অনেক ঘটনা মনে পড়ছে— দুটি বিশেষ করে। এই দুটো সংযুক্ত তাই বোধ হয়। অধ্যাপক সতীশ রায়, আশুবাবুর ভগ্নীপতি, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। তিনি নাকি আশুবাবুকেও ভয় করতেন না। তেমনই পরীক্ষক হিসেবেও তাঁর বদনাম ছিল— তাঁর হাত দিয়ে ফার্স্ট ক্লাশ গলতো না। আমি সেবার ইকনমিক্‌স-এ এম এ. দিচ্ছি। দিনকয়েক পূর্বে বাবা মারা গিয়েছেন, মাথাটা খালি হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, পাশের বাড়ির উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইকনমিক্‌স-এ দিতে যাচ্ছ, বেশ, বেশ— ভারি শক্ত বিষয়, পরীক্ষক কে আজকের পেপারে? সতীশ রায় নয়তো?' 'জানি না মশাই, তবে শুনেছি তিনি খান দু'-এক পেপার দেখবেন।' 'তবেই হয়েছে— পরীক্ষা দিও না।' পরে শুনেছিলাম ভদ্রলোক সতীশবাবুর কাছে একাধিকবার ফেল হয়েছিলেন। যাই হোক পরীক্ষা তো দিলাম। অর্ধেক প্রশ্ন যথামতো ছেড়ে দিলাম। শেষদিনে ফিরে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের হায়েত খাঁ লেন-এর বাড়ির উঠোনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। 'কিরে, কেমন হলো,' 'পাবো সেকেণ্ড ক্লাশ, পাওয়া

উচিত ফার্স্ট'।' যাই হোক, মাস দেড়েক পরে একদিন দুপুর বেলা কে কড়া নাড়লো— দেখি এক প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাতে ছাতা ও ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'তোমার নাম ধূর্জটি ?'

'আজ্ঞে হাঁ, আপনি ?'

'আমার নাম সতীশ রায়।'

'তুমি অমুকদিন বিকেল সাড়ে চারটায় আমার সঙ্গে লাইব্রেরির পাশের ঘরে দেখা করবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'একটু দরকার আছে, আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো।'

ঠিক সময় গিয়ে হাজির— সতীশবাবু আশুবাবুর ঘরে নিয়ে গেলেন। খালি গা', পাশে জ্ঞানবাবু দাঁড়িয়ে, সামনে রেকাবিতে সন্দেশ। সতীশবাবু বললেন, 'এই ধূর্জটি, কী বলবার বলো।'

'অঃ তুই !'

তার আগে পরিচয় ছিল।

'তোকে পড়াতে হবে জুলাই থেকে— এখন থেকে তৈরি কর— রোজ লাইব্রেরিতে আসবি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়বি— দেখিস ফাঁকি দিসনি।'

'আজ্ঞে না।'

'ভেবেছিস কী— অক্সফোর্ড— কেম্‌ব্রিজ সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই ফার্স্ট' ক্লাশ পাবি ? যা পড়গে যা।'

কিছুদিন পরে পরীক্ষার ফল বেরুলো— আমি তখন এলাহাবাদে। কলকাতায় ফিরলাম চাকরিতে যোগ দেবার জন্য। ফার্স্ট' ক্লাশ পেয়েছিলাম— কিন্তু আশুবাবুর কৃপায়। শুনলাম কিছু নম্বর কম ছিল— কমিটিতে আশুবাবু বলেছিলেন, 'ওর ফার্স্ট' ক্লাশ পাওয়া উচিত।'

রোজ লাইব্রেরি যাই, আর পড়ি। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমহার্স্ট' স্ট্রীট দিয়ে চোরাবাগানের দিকে গান শিখতে যাচ্ছি— পথে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে দেখা, বললেন, 'তাই তো হে! আমরা জানি তুমি আসছো, কিন্তু আজ বিকেলে কর্তা আরেকজনকে বসালেন। একবার দেখা করে এসো।' মনটা গেল বিগড়ে। যাই হোক, ভোর বেলা হাজির। 'কি হলো স্যার ?'

'ওরে শোন, তুই সংস্কৃত জানিস ?'

'আজ্ঞে না।'

'নিশ্চয়ই জানিস, বামনের ছেলে, ভাটপাড়ায় বাড়ি না তোর ?'

'আজ্ঞে না, পাশের গ্রামে।'

'ঐ একই কথা। তুই সংস্কৃত কলেজে এখন ঢুকে পড়, পরে নিয়ে আসবো আমার কাছে। আমার টাকা নেই জানিস তো?'

'আমি আপনার কাছে কাজ করতে চাই। আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন।'

'সে-কথা রাখবো, এখন নয়!'

তারপর মিনিট খানেক গম্ভীর থেকে বললেন, 'তুই যদি জানতিস কেন ওকে চাকরি দিলাম···তোর তো হাঁড়ি চড়ানো নেই!'

তাঁর চোখ ছলছল করে উঠেছিল। নমস্কার করে চলে আসছি হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমি লাইব্রেরিতে না হয় কাটাতাম!' বাঘের থাবাটা পিঠে পড়লো। চাকরি তিনি আমাকে দিতে পারেননি, দেননি নয়। তখনও রাগ হয়নি, এখনও অভিমান নেই। কিন্তু সেই দিন বুঝেছিলাম কত বড় হৃদয় মানুষটার। তাঁর বিপক্ষে অনেক কথা শুনতাম, পড়তাম। কিন্তু সে-সব দোষই নয়, অতো বড়ো হৃদয় অস্বাভাবিক, তাই আমরা সাধারণ লোকে সহ্য করতে পারতাম না। বিদ্বান হোন আপত্তি নেই, ভালো জজ হোন আপত্তি নেই, কিন্তু চাপরাসীকে মানুষ ভাবা, যার হাঁড়ি চড়ে না তার হাঁড়ি চড়াবার সুযোগ দেওয়ার জন্য নিজের কথার খেলাফ করা— এগুলোর ক্ষমা লোকে করবে কেন?

এই ঘটনার পরিশেষ আছে আরেকটি ঘটনায়। লক্ষ্ণৌ-এ শীঘ্রই চাকরি পেলাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে পড়ছি। ঘাড়ে থাবা পড়লো। ফিরে দেখি কর্তা।

'কিরে তুই লক্ষ্ণৌ গিয়েছিস?'

'আজ্ঞে হাঁ— তবে লাইব্রেরিতে ছুটি পেলেই আসি।'

'আমার লাইব্রেরিতে কিছু নেই, টাকা নেই, কেউ দেয় না, দেবে না, এক হাতে সকলের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। তোকে বুঝি রাধাকুমুদ নিয়ে গেল?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'সকলেই ছেড়ে চলে যাচ্ছে। Rats leave first when the ship sinks.'

'But Sir I was never on board.'

'ওরে আমি কী চাই যে, তোরা সব চলে যাস? কিন্তু কী করবো বল? কাউকে মাইনে দিতে পাচ্ছি না— ক'মাস হয়ে গেল, তারা কী করে খাচ্ছে

কে জানে! আশ্চর্য হয়ে যাই তাদের loyalty দেখে।'

খানিক পরে বললেন, 'ঠিকই করেছিস।'

এই ঘটনার পরও আরো একটি ছোট্ট ঘটনা আছে, লক্ষ্ণৌ-এর স্টেশনে কনভোকেশন অ্যাড্রেস দিয়ে ফিরছেন, স্টেশনে গিয়েছি।

'কিরে, কবে আসছিস?'

'যেদিন ডাকবেন।'

'তোর মন বসেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে?'

তাঁর চোখের আলো বদলে গেল। **Rats leave first when the ship sinks—**

আমার ইউনিভার্সিটি— আমার প্রোফেসার— আমি মাইনে দিতে পাচ্ছি না— আমার প্রতি লয়্যালটি, তারা কেমন করে খাচ্ছে, চোখ ছলছল— কোন্‌টা প্রধান? অহংজ্ঞান, না হৃদয়ের ঐক্য সাধন? নিশ্চয়ই শেষেরটা। এই ধরনের emotional identification গান্ধীজীর ছিল, নেপলিয়নের ছিল, লেনিনের ছিল, আশুবাবুর ছিল। সত্য কথা এই: তাঁর মৃত্যুর সংবাদে যতটা আঘাত পাই ততটা আঘাত আর কোনো মানুষের মৃত্যুতে পাইনি। কেন এমন হয়েছিল এখনও ঠিক জানি না। যেমন হৃদয়, তেমনই তেজ, তেমনই বুদ্ধি, তেমনই কর্মদক্ষতা— এমন সমাবেশ দুর্লভ। নিশ্চয়ই, কিন্তু আরো কিছু। সেটা কি? ক্যারিস্‌মা? তার উপাদান?

আচার্য নরেন্দ্র দেবকে বাঙালি কেবল পলিটিশিয়ান, সোশিয়ালিস্ট দলের নেতা হিসাবেই জানে, তাও বেশি নয়। তাঁর নানা দিক দেখবার ও জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মানুষ হিসেবে তিনি যাকে বলে লিবারেল; এমন কী অনেকের মতে লিবারেলের মতনই দুর্বল। নির্মম সিদ্ধান্তে আসতে অক্ষম, অপর পক্ষের যুক্তির মান্য দিতে সদা তৎপর, অন্যের অপদার্থতা জানা সত্ত্বেও ক্ষমাশীল, ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে values কিংবা principles নিয়ে মারামারি সেখানে তিনি অচল অটল। তিনি বলেন মনটা তিনি ডিমক্রেট। মহাত্মাজী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, বোধ হয় ...াত্র তাঁরই জন্য একবার মৌনব্রত ভঙ্গ করেছিলেন, তবু জীবনে ভায়ো-...েন্সের স্থান ও সামাজিক অভিব্যক্তিতে শ্রেণী-বিরোধের অস্তিত্ব নিয়ে আচার্যজী তাঁর কাছ থেকে সরে এলেন। লোহিয়াকে তিনি পুত্রের মতন

ভালোবাসেন, জয়প্রকাশ ও অশোক মেটাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, তবু লোহিয়ার প্রতি কঠিন হতে তাঁর সংকোচ হলো না, জয়প্রকাশের সঙ্গে ভূদান ও সর্বোদয় ও অশোক মেটার সঙ্গে সরকারী সহযোগ নিয়ে মতভেদ হলো। সোশিয়ালিস্ট সাহিত্যে অমন সুপণ্ডিত দেশে নাই। লেনিন তিনি তন্নতন্ন করে পড়েছেন। স্ট্যালিনিজম তিনি বরদাস্ত করেননি, কিন্তু একদিনও তাঁর মুখে ঘৃণাসূচক মন্তব্য শুনিনি। সাধারণত ভারতীয় সোশিয়া-লিস্টদের স্বাভাবিক এনার্জি সোভিয়েট, কম্যুনিজম ও দেশ-বিদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি ঘৃণায় এতটায় খরচ হয় যে, দেশকে বুঝতে, ভাবতে, নতুন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে প্রায় কিছুই বাকি থাকে না। আচার্যজীর কিন্তু তা নয়। কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন— এবং অনেক ভদ্রলোকই করে থাকেন— তবু ঘৃণার কোনো লক্ষণ তাঁর বাক্যে শুনিনি, কর্মে দেখিনি।

আমার কাছে তাঁর প্রকৃত মূল্য তাঁর মনুষ্যত্বে এবং তাঁর পাণ্ডিত্যে— দুই-এর অপূর্ব মিলনে। বৌদ্ধদর্শনে তিনি মহাপণ্ডিত, প্রায় সব মূল গ্রন্থই তাঁর পড়া। 'বৌদ্ধধর্মের রূপরেখা' বইখানি এখনও ছাপাখানায় পড়ে আছে— বেরুলে দেশের অত্যন্ত উপকার হবে। ঐ বিষয়ে তাঁর একাধিক বক্তৃতা শুনেছি— অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুচিন্তিত বক্তৃতা। এশিয়ার নব-জাগরণ ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর একটি ছোট লেখা আছে। অনেকেই জানে না। জেলে লেখা। কিন্তু আমি ঐ বিষয়ে ছয় কী সাতটি বক্তৃতা শুনি। পারফেক্ট, যেমনই তথ্য, তেমনই তত্ত্ব, তেমনই সাজানো, তেমনই ভাষা। আচার্যজীর মতন একত্রে হিন্দী, উর্দু ও ইংরেজী বক্তা দেশে নেই। দেড় ঘণ্টা তাঁর দম— এবং তার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা সত্যই অতুলনীয়।

ভাইস-চ্যান্সেলার হয়ে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টোন' বদলে দেন। প্রতিষ্ঠানটি নানা কারণে উচ্ছন্ন যাচ্ছিলো। তিনি অল্পদিনে টেনে তুললেন। ছেলেদের নিয়ম-ভঙ্গের প্রবৃত্তি বদলে গেল, অধ্যাপকবৃন্দের আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, অধ্যয়ন-বৃত্তি, গবেষণার প্রতি ঝোঁক ফিরে এলো। গত দশ বছরে যা হয়নি তা আরম্ভ হলো। সকলে বুঝলে এটা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার, গুরু-শিষ্য, জনসাধারণ-শিক্ষক শ্রেণীর যোগস্থল। বুকের ওপর থেকে জগদ্দল পাথর যেন সরে গেল, সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ক্লাব, সমিতি, বক্তৃতা, প্রদর্শনী— একটা না একটা কিছু রোজ লেগেই আছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের এক বৈঠক করেছিলেন।

পুরো এক সপ্তাহ চলেছিল। বিষয় ছিল 'ভারতীয় সাহিত্যে সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষণ ও বিচার।' দিল্লীর অনুরোধে তিনি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে গেলেন। বহুদিন তিনি কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। বিদ্যাপীঠ তাঁর মানসপুত্র— একত্রে দেশাত্মবোধ ও স্কলারশিপ চলেছে সেখানে— কর্মের সঙ্গে পাণ্ডিত্য সেখানে কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু এবার যেখানে গেলেন সেটা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। অসংখ্য কাজ, অসংখ্য দোষ, অসংখ্য সুযোগ— কাজের চাপে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষে ছেড়ে দিলেন।

আমার মতে তাঁর মতন স্কলার ও সজ্জন ব্যক্তির পলিটিক্স থেকে দূরে থাকাই ভালো ছিল। তা তিনি মানেন না— কিন্তু আমার ও অন্যান্য অনেকের তাই বিশ্বাস। তিনি একজন ভারতরত্ন, দিলে হয়তো নেবেন না, তবু, আনঅফিশিয়লি তাই। জাকির সাহেব সম্বন্ধে পরে লিখবো— এখন নয়, কারণ এখন তিনি আমার ভাইস-চ্যান্সেলার। ড. রাধাকৃষ্ণণের এই বিষয়ে কৃতিত্বের একটি দৃষ্টান্ত জানি। ১৯৪২ সালে সরকার হিন্দু ইউনিভার্সিটি তুলে দিতে চান। তাঁর একটি মাত্র কথায় সম্ভব হয়নি।

২৬. ১. ৫৬

বোম্বাই-এ গোলমাল বেধেছে। গুলি চলেছে শুনেছি। বিশ্রী ব্যাপার! যা পড়লাম তাতে মনে হয় বোম্বাই মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং তারই রাজধানী হওয়া উচিত। অবশ্য সব খবর আমি জানি না।

দুটি কথা মনে হচ্ছে। (১) ঝগড়াটা ঠিক Linguism-এর ব্যাপার নয়— অর্থাৎ মারহাট্টা বনাম গুজরাটি নয়। নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে হিন্দীর প্রসার বাড়ানো হচ্ছে, তাই প্রাদেশিক ভাষার ওপর সেই ভাষা-ভাষীর নজর বেশি পড়েছে—'ভয় হচ্ছে যে, মাতৃভাষা নষ্ট হবে। সেই ভয় প্রকাশ পেলো অন্য রূপে, গুজরাটিদের বিপক্ষে, সরকারের বিপক্ষে, আইন-কানুনের বিপক্ষে। ফলে মনে হচ্ছে যেন কেউ ভারতের ঐক্য চাইছে না, ঐক্য সাধনে বাধা দিচ্ছে। তা নয়। (২) ভাষা নিশ্চয়ই প্রাণের বস্তু, কিন্তু প্রাণ-ধারণের জন্য, প্রাণ পূরণের জন্য, প্রাণ প্রসারের জন্য অন্ন চাই, অর্থ চাই। ভাষা প্রাণ, কিন্তু অন্ন ব্রহ্ম। সেই অন্নের সন্ধান জনগণের কাছে পৌঁছয়নি। পৌঁছয়নি বলেই পাকিস্তান সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের চিন্তা এখনও র‍্যাশন্যাল-ইকনমিক নয়। অন্য ভাষায়, আমাদের প্ল্যানিং

আমাদের মনকে অধিকার করেনি। ওপর থেকে এসেছে তাই। যদি নিচের থেকে উঠতো তবে প্রাণ ব্রহ্মে লীন হতো— ভাষার ঝগড়া ছেলে-মানুষী ঠেকতো। এটা প্ল্যানিং-এর কমতি।

২৮. ১. ৫৬

শিক্ষিত-বেকার সমস্যার কথা উঠলো। খবর এই: দেশে ম্যাট্রিকুলেশন ও তার ওপর শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা আপাতত সাড়ে পাঁচ লাখ। (মোটে?)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার শেষে ঐ ধরনের বেকার আরো সাড়ে চৌদ্দ লাখ বাড়বে; অর্থাৎ প্রায় বিশ লাখ হবে। এটা আদমশুমারির হিসেব। কাজ (এমপ্লয়মেণ্ট) ঐ দ্বিতীয় যোজনার ফলে তৈরি হবে দশ লাখ পাবলিক সেক্টরে ও দু' লাখ প্রাইভেট সেক্টরে। (যদিও প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেণ্ট ঐ সময় পাবলিক সেক্টরে ইনভেস্টমেণ্টের আড়াই গুণের বেশি হবে। ব্যাপারটি মজার।) ইতিমধ্যে অবসরে, মৃত্যু প্রভৃতি বাদ দিয়ে তবু সাড়ে পাঁচ লাখের ওপর শিক্ষিত বেকার জমা হবে পাঁচ বছর পরে। অর্থাৎ এখনও পাঁচ লাখ তখনও পাঁচ লাখ? যথাপূর্বম্ তথাপরম্? বা রে প্ল্যান! অবশ্য যদি না তাদের জন্য ইতিমধ্যে নতুন এমপ্লয়মেণ্ট তৈরি করা হয়— যথা কুটিরশিল্প ইত্যাদি। কুটিরশিল্পে মাত্র দেড় লাখ এসে যাবে এই হিসেবে। আর সব কো-অপারেটিভ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল, ট্রান্সপোর্ট, আরো কত কী! খরচ হবে ১৩০ কোটি টাকা সাড়ে পাঁচ লাখ বেকারের জন্য। অর্থাৎ মাথা পিছু পাঁচ বছরে আড়াই হাজার টাকা। ছোট শিল্পের হিসেবে ৮৪ কোটিতে দেড় লাখ কাজ— অর্থাৎ দু' হাজার আশি টাকা। এ হিসেবে বেকার সমস্যা সমাধান হয় না আমার মতে। কুটিরশিল্প, ছোট শিল্প, কো-অপারেটিভের এমপ্লয়মেণ্ট পোটেনশিয়ালের পাকা খবর কারুর কাছে নেই। তা ছাড়া, যে পাঁচ লাখ সেই পাঁচ লাখ থাকলে মালটিপ্লায়ার এফেক্টের অর্থ হয় না। আপাতত আমার মনে একটা ভীষণ খটকা থেকে গেল। কো-অপারেটিভ অনুষ্ঠানের প্রসার শুনলে হাসি পাবে যারা জানে তাদের প্রত্যেকের। আমি ঐ ডিপার্টমেণ্টের বহু লোককে চিনি, দু' চারজন ছাড়া কেউ নিজের কাজে আস্থা রাখে না। আরো কড়া মন্তব্য শুনেছি ঐ ডিপার্ট-মেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চকর্মচারীদের মুখ থেকে। তবু এই পরিস্থিতিতে অন্য কী সদুপায় হতে পারে বুঝি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরে ছাত্ররা গ্রামে কী ছোট শহরে গিয়ে কো-অপারেটিভ খুলবে? মনে তো হয় না। তবে

সেকেণ্ডারি এডুকেশনের শিক্ষা যদি প্রকৃত হয়, সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ হয়, তবে সেই গ্রাম ও গণ্ডগ্রামের ছেলেরা শহরে চাকরির দিকে ঝুঁকবে না। কিন্তু তা কী হবে? উত্তরপ্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার সমিতির সভ্য ছিলাম। ঐ প্রশ্নই আমাকে উত্যক্ত করতো।

আমাদের evil paradox হলো এই: আমরা গরীব তাই হেভি ইণ্ডাস্ট্রিজ আমরা চালু করতে পারবো না, অথচ আমাদের হেভি ইণ্ডাস্ট্রিজ নেই তাই আমরা গরীব। এই প্যাচ থেকে রাশিয়া কেটে বেরিয়েছে, টোট্যালিটেরিয়ানিজমের জোরে ততটা নয় যতটা ইকনমিক থিওরির (মার্কসিজমের) প্রয়োগে। অবশ্য সেখানে অবস্থার দুর্বিপাক ছিল। (কার সাহেবের মতে সেইটেই প্রধান।) আমার মতে দুটো মিশে ঐ হয়েছে। সে-তুলনায় আমাদের থিওরি নেই, অথচ খানিকটা দুর্বিপাক আছে। আমাদের কিছু কুড়িটা বিপক্ষের দল আক্রমণ করছে না। তবু দুর্বিপাক দারিদ্র্যের। সনাতন দারিদ্র্যে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়— যদি না আমূল বিপ্লব হয়। আমাদের বিপ্লব শক-থেরাপির জাতের নয়। একটু মিঠে ছিল। তাই মিক্সড ইকনমি। ঐ কথাটিকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে। নতুন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির ব্যাখ্যান চাই। অবশ্য ভেতর ভেতর বদলাচ্ছে— তবু খোলাখুলি পলিসি, স্টেটমেণ্ট চোখের সামনে থাকলে পরিবর্তনের সুবিধা হয়। দিক পাওয়া যায়। লাঠির যে-কোনো দিক ধরে সাপ মারা যায়, সরু দিকটা ধরলে অবশ্য সুবিধে হয়। কিন্তু লাঠির মাঝখানটা ধরলে লাঠি ঘোরানোই হয়— পাঁয়তাড়াই সার, সাপ মরে না। সাপ অর্থাৎ দারিদ্র্য ও তার জারজ সন্তান শিক্ষিত-বেকার সমস্যা। ভারতবর্ষের 'ইকনমিক সমস্যা' কেমন যেন জারজ-জারজ মনে হয়।

একটা নিজের সম্বন্ধে মজার খবর শুনলাম। পুণার ইকনমিক কন্‌ফারেন্স থেকে ফিরে এসে বন্ধু বললেন, 'ডি পি. সাহাব, নতুন ইকনমিস্টরা সকলেই আপনাকে কন্‌ফারেন্সে চায়— এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা ভাবেন, আপনি সমাজতাত্ত্বিক।' এবং আরো কিছু সুখ্যাতি-অখ্যাতি। উত্তর দিলাম, আমার এক বন্ধু কাবুলে গিয়ে বাংলা গান, আর দেশে কাবলী গান শোনাতেন। যখন সমাজতাত্ত্বিকরা ধোঁয়া ছড়ায় তখন আমি ইকনমিস্ট— কারণ ইকনমিক্স-এ যতটা বুদ্ধির শাসন ততটা এক জুরিসপ্রুডেন্স ছাড়া অন্য কোনো সমাজবিজ্ঞানে নেই। আবার যখন ইকনমিস্টরা অঙ্কের ধোঁয়া ছাড়েন, তখন তাঁদের সামাজিক রিয়ালিটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি কোনো লেবেল চাই না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। একটি জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবেই

জীবন কাটিয়ে এসেছি, এখনও তাই চাই। এই আমার গুরুদের শিক্ষা। আমি মানব-জীবনের ছাত্র, তাই অল্পবয়স্ক ইকনমিস্ট কেন, অল্পবয়স্ক সাহিত্যিক, চিত্রকর, গায়ক-বাদক সকলেই আমাকে সমগোত্রের ভাবে। প্রাপ্তবয়স্কদের আমি অপমান করছি না— তাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তাঁরাও ছাত্র— তবে তাঁরা প্রধানত বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ, যা আমি মোটেই নয়। এটা বিনয় নয়, সত্য ও সত্য দম্ভ। সে-দম্ভের অন্তর্দিক হলো এই: আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, পরশু না হয় তরশু— অবশ্য তার পর নয়— প্রত্যেক যুবক-ইকনমিস্টকে আজ আমি সমাজ সম্বন্ধে যা খাপছা খাপছা বলছি, সেগুলোকেই গুছিয়ে নকসা তৈরি করতে হবে। জীবন বাদ দিয়ে পাণ্ডিত্য আমি অনেক দেখেছি ভাটপাড়ায়— আর ইকনমিক জার্নালের পৃষ্ঠায়। ও-সব বুদ্ধির চালাকি জীবন ধরে ক্যালে। অবশ্য আপাতত আমি ধোবিকা কুত্তা,- না ঘরকা না ঘাটকা। কিন্তু এই কুত্তাগুলো খুব ভালো ওয়াচডগ হয়, অন্তত গাধাকে ঘরে পৌঁছে দেয় কাপড় সমেত। এই ধরনের কথা কইলাম— ভাষা হয়তো একটু ভিন্ন ছিল!

এক বন্ধুর মুখে শুনেছি যে, প্রথম যুদ্ধের সময় রামবাগানে একটা গানের খুব চলন হয়: 'শসা-কলা নয়তো যাদু যে চিরে-চিরে ভাগ দেবো।' জ্ঞানের ভাগকরণ বুদ্ধির বেশ্যাবৃত্তি এবং তথাকথিত বিশেষজ্ঞতা রক্ষিতার সামিল। বেশ্যাদের অপমান করছি না। আমি Women of the Street পড়েছি। তাদের জীবন নিজের গণ্ডিতে সম্পূর্ণ— অর্থাৎ তাই বিশেষজ্ঞ— তারা জীবনধারায় ভাসতে চায় না— এই হলো ঐ অদ্ভুত বইখানির সারকথা। সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ আমাদের দেশে খুবই কম, ও শ্রেণী নেই বললেই চলে। যা দু'-একজন দেখেছি তাঁদের আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।

বাড়ি এসে আমেরিকান 'Poetry'-র নতুন সংখ্যায় রুদেলের কবিতার অনুবাদ পড়লাম। গঙ্গাস্নানের মতন মনটা শীতল ও দেহটা শুদ্ধ হলো। অধ্যাপকের জীবনে রবীন্দ্রনাথ কেন এলেন বুঝি না। কিন্তু যখন এসে গিয়েছেন তখন তিনি থাকবেন, ক্যাল্‌ডরের An Expenditure Tax পড়বার পরও।

২. ২. ৫৬

মার্থা গ্রেহামের সঙ্গে কথাবার্তা রেডিওতে শুনলাম। কলকাতার দৃষ্টান্ত সমেত বক্তৃতা শুনেছিলাম। বক্তৃতা দেন ভালো, কথাবার্তার ভঙ্গিটাও

ভালো, কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। লাঠি ফিরে এসে নিজেদের ঘাড়েই পড়ছে। আমেরিকাকে আমরাই এই ধরনের আধ্যাত্মিকতা, মিস্টিসিজম্ শিখিয়েছি। এখন আমেরিকানরাই এসে জল ও ধোঁয়াসমেত যোগিধর্মের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। এবং আমরা চেটে খাচ্ছি। আমেরিকানরাই এক-মাত্র দোষী নন— স্টেলা ক্র্যামরিশের ইণ্ডিয়ান আর্টের ব্যাখ্যা আমার কাছে অত্যন্ত ধোঁয়াটে লাগে। হয়তো আমিই একেবারে অ-ভারতীয়, 'নাস্তিক' হয়ে গিয়েছি। খুব সম্ভব তাই, কিন্তু কুমারস্বামীর রচনাই বা আমাকে অতো মুগ্ধ করে কেন? অবনীবাবু তো সহজ, সরল ভাষায় বোঝাতেন এবং আমরা বুঝতেও পারতাম। বোধ হয়, দেখে শুনে আমার এই ধারণা হয়েছে, আমাদের চারুকলা, শিল্প, সাহিত্যের মূল্য ঐ সবের প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। প্রথমে অন্তত সেই হিসেবে দেখি— দেখা উচিত মনে হয়— পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ক্রিয়াকাণ্ডের অবহেলা সম্পূর্ণ বোধের শত্রু। দর্শন নিশ্চয় আছে, সেটা কিন্তু পরে। Existence is prior to essence— তাই তো মনে হয়।

সম্ভবত আমি অন্যায় করছি। বক্তৃতা দিতে গেলে, গুরুগম্ভীর কেতাব, থিসিস লিখতে গেলে ঐ ধরনের বড় বড় কথার প্রয়োজন হয়। টিউটনিক প্রোফাণ্ডিটি, ইণ্ডিয়ান উইজডম, কেমন যেন ধাতে বসে না। প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষা?

৩. ২. ৫৬

বীরেনের (বীরেন গাঙ্গুলী) নিখিল ভারতীয় ইকনমিক এসোসিয়েশনের আটত্রিশতম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ পড়লাম। ছেঁদো কথা মোটেই নেই, তাজা, ঝরঝরে, মনটা জেগে উঠলো। নাম দিয়েছে **'Rethinking on Indian Economics'**। নামটি সার্থক হয়েছে। অনেকদিন ধরে সে এই ধারায় চিন্তা করছে জানি। গুছিয়ে এই প্রথম লিখলে। অবশ্য শেষ কথা নয়— অনেক মন্তব্যের যাচাই দরকার। তবু আমার খুব ভালো লেগেছে।

বীরেন এগ্রিগেট-বিশ্লেষণের গলদ কোথায় ধরেছে; পুরানো মার্জিনাল বিশ্লেষণে তার মন ভরছে না; থিওরি ও প্র্যাকটিসের পার্থক্য তাকে পীড়া দেয়; তথাকথিত ডাইনামিক বিশ্লেষণের মডেল-সৃষ্টির সঙ্গে বাস্তব জগতের পরিণতির মিল খুঁজে সে পায় না। অথচ এতদিনকার বিশ্লেষণ পদ্ধতি

ছাড়তে সে পারে না। অনুন্নত দেশের অর্থনীতির যুক্তি যে একদম ভিন্ন মানতে তার বুদ্ধিতে বাধে। তাই সে cairness (কেয়ার্নস্)-এর নন-কম্পিটিং গ্রুপকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলতে যাচ্ছে। সুখের খবর, একাধিক আধুনিক অর্থশাস্ত্রীরা ঐদিকে দৃষ্টিপাত করছেন। অতএব বীরেনের সমর্থন আছে। এই নন-কম্পিটিং গ্রুপের একটা ভাগ ধরে সে তার অভিভাষণ গঠনমূলক করে তুলেছে। সে-ভাগ হলো শহর (আর্বান) ও গ্রামের সেক্টর। বীরেনের কৃতিত্ব হলো এই দুটো সেক্টরের সম্বন্ধকে ফুটিয়ে তোলা ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেডের আধুনিক বিশ্লেষণের সাহায্যে। স্ট্যালিনের মতামত উদ্ধার করে সে অভিভাষণ শেষ করেছে। এই বিশ্লেষণে কোনো গোঁড়ামি নেই, সমাজতন্ত্রের সাহায্য নিতে সে ভয় পায়নি, যদিও সাবধানে নিয়েছে। আমার কাছে এই ধরনের নতুনত্বের সাহস অত্যন্ত মূল্যবান। অনেকে আবছা-আবছা, আলগোছে, থাপ-ছাড়াভাবে এই ধরনের কথা বলেনি তা নয়। মার্কস্ এক জায়গায় বলেছেন (ঠিক কোথায় ও কী ভাষায় মনে পড়ছে না) যে, এই শহর ও গ্রামের বিরোধ সমাজের প্রাথমিক বিরোধ। অন্যত্র কিন্তু লিখছেন যে, এই বিরোধ শ্রেণীবিরোধের নামান্তর। সে যাই হোক, terms of trade unilateral transfer, transfer-loss প্রভৃতি প্রত্যয়ের প্রয়োগ সুষ্ঠু হয়েছে। এইদিক থেকে সে গ্রামকে শহরের উপনিবেশ বলতে দ্বিধা করেনি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বীরেনের আইডিয়া ছড়াবে কি করে? সংখ্যার সমর্থনও দরকার। দু'চার জায়গায় কিছু খটকা থেকে গেল— বিশেষত শ্রমিকদের পাওনার (ওয়েজেস) বেলা। মার্শালের horizontal supply curve of labour (অর্থাৎ constant cost) কী করে গ্রাম্য শ্রমিকের বেলা বেশি প্রযোজ্য বুঝলাম না। সে লিখছে:

> In India the horizontal supply curve of labour in agriculture has prevented any relative rise in real earnings in agriculture.

তাই কি? 'curve' কি করে 'prevent' করে? ওটা না হয় ভাষার দোষ, কিন্তু ব্যাপারটা earnings না wages? Relative wages আর Relative earnings কি এক বস্তু? এ-সব ছোট আপত্তি নিশ্চয়। মোট কথা, খুব খুশী হলাম।

৪. ২. ৫৬

টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট একটি ঐতিহাসিক রচনার বিশেষ সংখ্যা বার করেছে। (৬ই জানুয়ারি ১৯৫৬)। কেমন চমৎকার লেখে— পড়তে পড়তে হিংসে হয়। 'পরিচয়' যদি আগের মতন চলতো, তবে হয়তো এই মানের লেখার প্রচলন হতো। বাংলায় 'ইতিহাস' নামে একটি ত্রৈমাসিক বেরোয়— এই সংখ্যার সমালোচনা হওয়া উচিত সেখানে। নিশ্চয় হবে। ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, জার্মানীতে ইতিহাস-রচনার ঢঙ কেমন বদলাচ্ছে, জানতে ইচ্ছে হয়। ভারতবর্ষে কী হয়েছে ও হচ্ছে মোটামুটি তার খবর পাই; অন্তত একটা আন্দাজ করতে পারি। প্রতুল (গুপ্ত) হেসে বলবে, অবশ্য গোপনে,— 'কিছুই হচ্ছে না'। নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে— তার প্রমাণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হলো না। The dog did not bark, Watson। আর কিছু হোক আর না হোক, শিবাজী-আওরঙ্গজেবের বিবাদটা থেমেছে। এবার মহাগুজরাট ও মারহাট্টা এম্পায়ারের তুলনামূলক বিচার না হলেই বাঁচি। নীহার রায় তো বাঙালীর ইতিহাস লিখে ফেললে! বক্তিয়ারের পর বাংলার কী হাল-চাল হলো, জানতে ইচ্ছে হয়। কালীপ্রসন্নবাবু রাখালবাবুর পরও কিছু লেখা যায় নিশ্চয়।

ঢাকার বাংলার ইতিহাস কেমন যেন খাপছাড়া। কেম্‌ব্রিজ হিস্ট্রীর মডেল এখন অচল। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই তা অনুভব করছেন। টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট-এর এই সংখ্যায় তার উল্লেখ ছড়ানো। আমাদের মতন অনৈতিহাসিকদের কাছে সাধারণ ইতিহাসই কদর পায়। নরেন্দ্র সিংহমহাশয় ইকনমিক হিস্ট্রীর বই লিখছেন শুনে এলাম। তিনি নিশ্চয়ই পস্টানের প্রবন্ধটি পড়বেন ছাপাবার পূর্বে। তপন রায়চৌধুরী নতুন কী লিখবে কে জানে! প্রতুল গুপ্ত এবার পেশোয়াদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসুক। ওটা প্রায় অন্ধ গলি।

৫. ২. ৫৬

এডোয়ার্ড শীলস্ দিল্লী থেকে সকালে এসেছিলেন। শিকাগোর অধ্যাপক এবং টলকট পার্সন্স-এর সঙ্গে ভালো কাজ করেছেন। আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে থিওরিস্ট কম, তাঁদের মধ্যে এই দু'জন ও মার্টন এবং হোমানকে আমার পছন্দ। একটু জার্মান গন্ধ আছে, তা হোক। শীলস ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা কী ভাবছে, কী করছে, তাদের স্থান ও ক্রিয়া

জানতে চান। সকালে অধ্যাপক হবীব, নুরুল হাসান, অমলেন্দুর (বসু) সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম— বিকেলে উঠতি বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে। ভদ্রলোক অনেক নোট নিলেন। আত্মতৃপ্তি হলো দু'কারণে: (১) আমার লক্ষ্ণৌগোষ্ঠীর সুখ্যাতি শুনে। তিনি বললেন, বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তারা এখনও জীবন্ত। বেঁচে থাক বাছারা। (২) ভদ্রলোক আমার আট-দশটি প্রবন্ধ ও দু'খানি বই পড়েছেন। মজা এই যে, প্রবন্ধগুলির— একটির ছাড়া— কোনো রিপ্রিণ্ট নেই যে, তাঁকে উপহার দেবো। তিনি নিজেই যোগাড় করে কিছু এনেছেন, তাইতে সই করে দিলাম। তাঁর অভ্যাসটি অ-ভারতীয়, আমার কাজটিও অ-ভারতীয়।

দেশাত্মবোধের ইতিহাস কীভাবে আধুনিক ভারতীয় পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে বললাম। দৃষ্টান্ত দিলাম ইতিহাস রচনা ও ইকনমিক চিন্তার। ড. নুরুল হাসান প্রথমটির ব্যাখ্যা করলে চমৎকার। হবীব সাহেব মধ্যযুগীয় ও আধুনিক মনোভাবের পার্থক্য দেখালেন। অমলেন্দু সাহিত্যের দিক থেকে কিছু বললে। কথাবার্তা তো বেশ চললো, কিন্তু আমাদের দেশে 'ইন্টেলেক্‌চুয়াল ক্লাশ' বলে কিছু আছে কি? শিক্ষকের দলকে কি নতুন ব্রাহ্মণ বলা চলে? দেশের 'আইডিয়াল প্যাটার্ন' পণ্ডিতদের দ্বারা নির্ণীত নয়, আপাতত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী দ্বারাই হচ্ছে, শীঘ্রই এঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা হবে এবং পরে টেকনিশিয়ানদের দ্বারা। ইন্টেলেক্‌চুয়াল বলতে আমি মোটামুটি গোটাকয়েক জিনিস বুঝি: সে এমন লোক যার চিন্তার ছাঁদে বুদ্ধির টানা-পোড়েন, বয়নটাই বেশি কার্যকরী হয়। সেজন্য প্রথমত অন্য প্রকৃতির মানুষের থেকে তার পার্থক্যটা নজরে পড়ে। তা ছাড়া, তার বুদ্ধি চর্চার জাত ও ধরনই এমন যে, সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সব-সময় খাপ খায় না। তার বিষয়টি দৈনিক জীবনের সাধারণ বিষয় থেকে একটু আলাদা। এইপ্রকার নানা পার্থক্যের সমাবেশে ইন্টেলেক্‌চুয়াল মানুষটিকে ভিন্ন মনে হয়। তার কার্যাবলীর ছক বেঁধে দেয় সমাজ; তাই সমাজের গঠন ও কাজ (স্ট্রাকচার ও ফাংশন) যেমন যেমন বদলায় ইন্টেলেক্‌চুয়াল দলের গঠন ও কাজও তেমনই বদলে যায়। এই সামাজিক ও কার্যগত পার্থক্য বুদ্ধির স্বভাবের পার্থক্যের সঙ্গে মিশে নির্লিপ্ততার ভাব তৈরি করে। এরই নাম ডিট্যাচমেণ্ট, নিষ্কামভাব, মা ফলেষু কদাচন ইত্যাদি, বুদ্ধিচর্চার জন্যই বুদ্ধি, ডিস্‌ইণ্টারেস্টেডনেস, নিছক পাণ্ডিত্য। ইন্টেলেক্‌চুয়ালরা বিশেষজ্ঞ নাও হতে পারেন। তাঁদের পরীক্ষা হয় জীবনের অন্য দিক, অন্য নক্‌সা, অন্য ছাঁদের দিক থেকে।

সামন্ত যুগ ও ধনতন্ত্রের যুগের ইণ্টেলেক্‌চুয়াল এক জন্তু নয়। ভারতের বর্তমান অবস্থায় সব যুগই বর্তমান, অচল নতুন যুগের দিকে আমরা যাচ্ছি। প্রথমটির জন্য ইণ্টেলেক্‌চুয়ালদের মনে ও কাজে এত সংশয়, এত বিরোধ, এত নিষ্ফলতা ও অরাজকতা। এবং এগুচ্ছি তাই পা টলোমলো করছে। কোথায় যাচ্ছি তা জানি না, তাই খানিকটা দিশাহারা।

অন্যেরা, পলিটিশিয়ানরা, বলছেন তাঁরা জানেন। অন্তত চালাবার শক্তি তাঁদেরই হাতে। এঁরা কিন্তু বুদ্ধিচর্চাকে একটু অবিশ্বাস করেন। গান্ধীযুগের আন্দোলনের প্রকৃতিই তাই ছিল। তার ওপর ইংরেজের আশীর্বাদ তো রয়েছেই। ও-জাত শুদ্ধবুদ্ধির বিপক্ষে। (ফরাসীরা তা নয়, অন্তত প্যারিসের ফরাসীরা তো নয়ই।) ইণ্টেলেক্‌চুয়ালদের সঙ্গে পলিটিশিয়ানদের যোগসাধন করছেন পণ্ডিতজী। (আর করতে পারেন আমার জানিত'র মধ্যে আচার্য নরেন্দ্র দেব ও ড. সম্পূর্ণানন্দ।) এই যোগের একটি মজার ফল লক্ষ করেছি। পণ্ডিতজীই এখন বুদ্ধিজীবীদের লীড দিচ্ছেন। বৈজ্ঞানিকরাই এখন তাঁর সংযোগ থেকে ফয়দা ওঠাচ্ছেন বেশি— ইকনমিস্ট ও সংখ্যাতাত্ত্বিকরা ওঁদের একটু পিছনে আছেন। সেজন্য বিজ্ঞানের কতটা উন্নতি হয়েছে জানি না, কিন্তু ইকনমিস্ট ও সংখ্যাতাত্ত্বিকদের কিছু যেন হবো-হবো হচ্ছে সন্দেহ হয়। পণ্ডিতজীকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি— তাঁর values গুলি আমার, আমার জাতের। তিনি আমারই to the power n.— তবু এই আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিতে চিন্তার এমন কিছু অগ্রগতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর নেতৃত্বে আমরা নীত, তাঁর গৌরবে আমরা স্ফীত হচ্ছি। এর বাইরের রূপটা আমার নজরে পড়েছে, আমার ভালো লাগেনি। তাঁর নেতৃত্ব ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর সামাজিক স্থান অত শীঘ্র যতটুকু উঠেছে ততটুকুও উঠতো না নিশ্চয়ই। তবু, তবু যেন কোথায় খিচ লাগছে, টান পড়ছে আমার মনে। কিছুদিন আগে পণ্ডিতজীকে এই ধরনের ইঙ্গিত দিই— তিনি উত্তর দেন, দোষটা কি? দোষ এই,— এতে জনকয়েক ইণ্টেলেক্‌চুয়ালের খাতির বাড়বে, বুদ্ধির চর্চা ফলাও হবে না সন্দেহ হয়। কথায় কথায় পণ্ডিতজী, কথায় কথায় আশুবাবু, কথায় কথায় গুরুদেব, কথায় কথায় বাপু, কথায় কথায় 'কর্তা' যদি কই, তবে নিজের কথা জমবে কখন, কইবো কখন? কেমন যেন ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বুদ্ধিজীবীরাই বা এতদিন কী করে এসেছি, এখনই বা কী করছি তা নয়। তবু যেন…

,অর্থাৎ দেশে ইণ্টেলেক্‌চুয়াল ক্লাশ তৈরি হয়নি এখনও— কনফারেন্সের

হাজার হাজার ডেলিগেট সত্ত্বেও। ওগুলো এখন তামাসা। হওয়া উচিত কিনা তাও জোর করে বলতে পারছি না ইচ্ছেটা হোক— তবে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, আশুবাবু, বাঙালির নামই ধরছি— এঁরা কী কেউ ইন্টেলেক্‌চুয়াল ছিলেন? না, কিন্তু পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ছিলেন। খুব পড়তেন, লিখতেন, দেশের বুদ্ধির স্তর তুলে ধরলেন— অর্থাৎ এঁরাই যা কিছু করলেন। এই হিসেবে ইন্টেলেক্‌চুয়াল ক্লাশের প্রয়োজনই দেখি না। কিন্তু ওঁরা তো ফুজিয়ামার মতন ভুঁইফোড় নন, ওঁরা পর্বতশ্রেণীর উচ্চশিখর, যার বরফের ওপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রঙিন আলো পড়ে সমতলভূমির সাধারণ মানুষের চোখ ঝলসে দেয়। এই উচ্চ শিখর ও সমতলভূমির মাঝখানে পাহাড়ের গায়ে ইন্টেলেক্‌চুয়ালদের বসতি। বেশি বরফ পড়লে উপত্যকায় নামে, সেখানে গরম পড়লে আবার উঁচুতে পালিয়ে যায়। ব্যস এই তাদের দৌড়— সাধারণত। সামুদ্রিক উপমায়, কোটি কোটি প্রবালের স্তূপে প্রবাল দ্বীপ সমুদ্র থেকে দু'-এক ইঞ্চি ওপরে ওঠে— সেই দ্বীপের মধ্যে খানিকটা মিঠে পানির পুকুর, ঢেউ নেই, হাঙর-কুমির নেই— কিছু নারকেল গাছ আর পাখি। গগ্যাঁর মতন থাকতে পার এখানে, তো মরতে হবে সেখানে। ঐ লোকটি ইন্টেলেক্‌চুয়াল শ্রেণীর চরম প্রতীক— এই তাঁর জীবনের নতুন ব্যাখ্যা। সেখানে থাকতে পারা যায় না, অথচ 'এটল'-এর নিরুদ্বেল শান্তি চাই— এই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বুদ্ধির অতিরিক্ত অনুভূতির প্রয়োজন ওঠে। আর না হয় পালান সাধারণ সার্থক জীবনের নিচে। পালাবার আরো পথ আছে, কিন্তু এইটেই প্রশস্ত। এ-যুগে এ-সভ্যতায় ইন্টেলেক্‌চুয়াল হলেন মার্জিন্যাল ক্রীচার। কিন্তু অন্য যুগে, অন্য সভ্যতায় তিনি অতো বিচ্ছিন্ন থাকবেন না— কিন্তু একটু দূরত্ব বরাবরই থাকবে, এবং থাকা উচিত। এ-যুগের স্বাধীনতাই হলো মার্জিন্যাল— যেমন রেল লাইনের ইস্পাতের সামান্য একটু ফাঁক।

৬. ২. ৫৬

খানকয়েক মজার চিঠি পেলাম। দুটি ছাত্রীর, একটি ছাত্রের। বিবাহ হচ্ছে— আশীর্বাদ চায়নি, একটু যেন কিন্তু কিন্তু ভাব, যেন অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ একটা ইচ্ছে ছিল পড়াশুনো নিয়েই থাকবে, আইডিয়া রিসার্চ নিয়েই জীবন কাটাবে। নিজেকে খানিকটা দোষী মনে হচ্ছে। এখন বুঝেছি বিবাহ হলো মেয়েদের মেনিফেস্ট ডেস্টিনি। বিবাহটাই রিপু,

কাম নয়।

একটি ছাত্রী বলতো, 'ও-সব' আমার দ্বারা হবে না, অর্থাৎ বিবাহ সংসার ইত্যাদি। অবশ্য বিয়ে হলো— বিয়ের সময় সে কী কান্না! ওমা, দু' বছর না ঘুরতে ঘুরতে দেখি কি না স্বামীকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। একদিন আমার বাড়ি নিয়ে এলো স্বামী বেচারিকে। কী ধমকানিটাই আমার সামনে তাকে না দিলে!

এ-দেশে মেয়েদের রিসার্চ করা, ইন্টেলেকচুয়াল হওয়া খুব শক্ত, প্রায় অসম্ভব। হওয়া উচিত কিনা তাই জানি না। ওদের গড়ন-পেটনই আলাদা। সমাজ? কোনো সমাজেই চায় না— চায়নি। রাশিয়ার এক মহারথীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— 'আপনি কি পার্টির, কিংবা কোনো সমিতির সভ্য?' তিনি বললেন, 'আমার ছ'টি ছেলেমেয়ে, সময় কোথায়?' উত্তরটি আমার মা-জ্যাঠাই-মা-খুড়ী-পিসীরাও দিতে পারতেন— দিতেনও।

তার অর্থ নয় ঘরই মেয়েদের জগৎ। নিশ্চয় নয়। ঘর তাঁরা গোছাতে পারেননি, এই দশ হাজার বছরে। মেয়েদের জগৎ বাইরে। বাইরের জগৎ তাঁরা নিশ্চয়ই পুরুষের চেয়ে ভালো চালাতে পারবেন। তাঁরা অন্তত হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে পারবেন না।

সারা বিকেল এ-ঘর থেকে ও-ঘরে খানকয়েক বই আনতে হিমসিম খেলাম। এক একখানা বই দেখি আর মনে পড়ে কবে কিনি, কবে পড়ি। কত বই আধখানা পড়ে ভালো লাগেনি, কতকগুলো একাধিকবার পড়েছি। কোনোটার শেষ সাদা পাতায় মন্তব্য লেখা, নিজের সুবিধে মতো নোট আর সূচীপত্র। অনেকগুলো টাটকা রয়েছে এখনও। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে প্রথম পড়ি, খুব ভালো লাগলো, পরে নিজে কিনে ফেললাম। এর মধ্যে সম্পত্তিজ্ঞান রয়েছে বৈকি! সাজাতে পারলাম না। শেলফের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানো— এ-বই ও-বই ঘাঁটা— বেশ মৌজে থাকা যায়। তার পুরো খবর দেবার সাধ্য আমার নেই। জয়েস হয়তো পারতেন। 'আর্ট' হতো না সম্ভবত। কার হাতে আর্ট হতো ভাবছি। লেস্‌লি স্টিফেন? ভারি ভারি। অগস্টিন বিরেল? মন্দ নয়। হ্যারিসন? একটু ভিক্টো-রিয়ান ওজন। ফর্স্টার? হাঁ, রস আছে। এবিংগার হারভেস্ট বইটা খুঁজে পাচ্ছি না। পান সম্বন্ধে তাঁর রচনা লক্ষ্ণৌ-এর পান খাওয়ার মতনই মুখরোচক। কাশীর পান আর লক্ষ্ণৌ-এর পান ঠিক যেন বেনারসের ঠুংরি আর লক্ষ্ণৌ ঠুংরি। পার্থক্য আছে, বোঝানো যায় না— খেয়ে ছাখ, শুনে

গ্যাখ। লক্ষ্ণৌ কত বেশি 'নাজুক'। স্বাদের পরিচয় পাওয়া শক্ত। মদ-চাকিয়ে, চা-চাকিয়েরা অনেক মাইনে পায়। বেরেন্‌সনের খাতির জগত-জোড়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাক্স বীরবম্-এর একটা প্রবন্ধ পড়ে ফেললাম। পাকে-পাকে রস। না— হলো না— কোয়ায় কোয়ায় রস। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রস দু' জাতের, আমের— একটি আঁটি বাকিটা শাঁস, আর বেদানার, দানায় দানায়। আমাদের রসশাস্ত্রেও ঐ ধরনের রসের বিভাগ আছে। অন্য বিভাগের বিচার পড়লে মধ্যে মধ্যে রস যায় শুকিয়ে। ডুর-খায়েম (?) কোথায় যেন লিখেছেন, **classification is the habit of the secondary order of intelligence**— ঠিকই।

এই ধরনের রসগ্রহণ কেবল ডিলেটান্টিজম্ নয়। ডিলেটান্টের Senses-ই প্রধান। এটা মনের আলোর খেলা। প্রমথবাবু বলতেন কোনো কিছুতে ডুবে যেতে নেই। তিনি আমাকে বের্গসঁর রচনায় দীক্ষিত করেন। পরে বের্গসঁর খপ্পর থেকে বাঁচান। আবার পড়লাম রাসেল-এর গর্তে। সেখান থেকেও উদ্ধার করলেন। ক্রোচে পড়তে বললেন— পড়লাম যা পেলাম। এবার কিন্তু নিজেই নিজেকে উদ্ধার করি। মার্কস্ তিনি জানতেন না— ওটা আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। ১৯২২ সাল থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। তবে এখনও নতুন ঘাসের খিদে যায়নি। একটু সরে দাঁড়িয়ে নিজের এই নিরুদ্দেশ যাত্রা দেখতে বেশ লাগে। পাপ বোধ নেই— দু'-একটা আফশোস আছে বড় রকমের— সংস্কৃত ও অঙ্ক বেমালুম ভুলে যাওয়াটাই প্রধান। অত্যন্ত অপূর্ণ রয়ে গেলাম!

৭.২.৫৬

এখানে যুবা বয়সের শিক্ষকদের মন নঙর্থক। জনকয়েকের ছাড়া। নঙর্থক— যদি কিছু নতুন কথা ওঠে তো সেটা অচল প্রমাণ করবার জন্য যা কিছু বুদ্ধি তা খরচ হয়ে যায়। সদর্থক— অর্থাৎ আপত্তি সত্ত্বেও পরীক্ষা করবার তৎপরতা। অত্যন্ত অদ্ভুত লাগে অল্পবয়সীদের মধ্যে মুশকিলের ফর্দ শুনতে। কারণ জানি— কিন্তু নঙর্থককে সদর্থকে পরিণত করা যায় কীভাবে? এক ধৈর্য— এই যুগে ভারতবর্ষের পক্ষে ধৈর্য নিরাগ্রহ আলস্যের নামান্তর। দুই— ডায়েলেক্‌টিক। তাতে কবে পরিবর্তন হবে বলা যায় না। না হয় সংখ্যা গুণে পরিণত হলো কোনো না কোনো ক্ষণে, কিন্তু সে গুণ বে-গুণও হতে পারে। ফ্রান্সে পুজাডিজম্ এলো— কম্যুনিস্ট দলের সংখ্যা বৃদ্ধির

পরে। [illegible] চালাতে হবে ঠিকমতো। গতি অধোগতি হতেও পারে, উন্নতিও হতে পারে। মোটের ওপর, গড়পড়তা, একটা না একটা দিকে উন্নতি হচ্ছে হয়তো বলা যায়, কিন্তু সে উন্নতিতে অধোগতির ক্ষতি-পূরণ নেই, সান্ত্বনা নেই। নঙর্থক মনোভাব সদসৎ বিচারবুদ্ধির লক্ষণ নয়, জাড্যের চিহ্ন।

জড়তা তমোগুণের মধ্যে পড়ে। কিন্তু জড়ভরত ছিলেন যোগী। তাঁর জড়তা কেবল চিত্ত নয়, দেহবৃত্তিরও নিরোধ। অন্য ধরনের জড়তা মন-বিহীন— একাধিক আমেরিকান নভেলে তার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা ক্যালিবানের বংশধর। আমাদের দেশের জড়তা গতিহীনতা — ইনার্শিয়া। স্ট্যাটিক অবস্থারও নিচে। এর শক্তি আছে কিছু না করতে দেবার। অর্থ-নীতিতে গ্রোথের চর্চা চলছে— সেখানে স্ট্যাটিক বিশ্লেষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে নাজেহাল হচ্ছি। কেন? আমার মতে তার কারণ এই: স্ট্যাটিক অবস্থাকে আমরা নির্জীব ভারসাম্যের অবস্থা ভাবি। কিন্তু এই অবস্থার জীবন আছে। সেটা বাধা দেয়। অর্থাৎ আমাদের 'থিওরি অব ইনার্শিয়া' নেই। সেইজন্য দেরাদুনে আমি বললাম ঐতিহ্যের স্বভাব বুঝতে। রাজ্য-পাল ও ড সম্পূর্ণানন্দ ভাবলেন, আমি আলিগড়ে এসে হিন্দু ও ঐতিহ্যবাদী হয়ে গিয়েছি, আমার বিপ্লবী মনোভাব ঘুচে গিয়েছে। তা নয় মোটেই। অগ্রস্থতির বাধা কী বুঝতে চাই। সব সমাজ-শাস্ত্রীদের বোঝা উচিত, অর্থ-শাস্ত্রীদের বিশেষত। এই যে প্ল্যান প্ল্যান করে মরছি তবু লোকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করছে না কেন? কিসের বাধা? কেন বাধা? এই জড়তা, এই ইনার্শিয়া— যাকে চটে আমরা স্টুপিডিটি বলি— সেইটাই প্রধান সমাজ-শক্তি। ভীষণ জোর তার, কারণ সেটা জড়, বিশুদ্ধ ম্যাটার। এবং আমাদের মধ্যে তিন ভাগ জড়, আর বাকিটা ভাব, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর র‍্যাশনালিজমের আওতায় বেড়ে উঠেছে আমাদের অর্থ-শাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, বিজ্ঞান। তারই ফলে ভাবি সব রিজন-এর প্যাঁচে ফেলবো। তা হয় না। ইকনমিক্স-এ থিওরি অব স্টুপিডিটি নেই, (সে চেষ্টা যে চলছে অবশ্য তার প্রমাণ পেয়েছি) খ্রীস্টান ধর্মে যেমন ডক্‌ট্রিন অব্‌ ঈভিল আছে। দুটোয় জড়াপট্টি খেয়ে গিয়েছে— খ্রীস্টান ধর্মের ঈভিল এখন কম্যুনিজম, কিছুদিন আগে যেমন ক্যাপিট্যালিজম।

অন্ধকারের, তমসার নিজের জীবন আছে। গিরিশ ঘোষের কবিতায়— শীকারের ভালো গল্পে— স্যঁ্যা এক-স্যুপেরির রচনায় তার খবর পাই। নিজের এক রাতের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাতে গাছের

খুঁজি অনাহত ধ্বনিতে কাঁপে। সে-ধ্বনি পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে— কানাকানি, গুজ গুজ ফুস্ ফুস্ করে— ভয়ে শেয়াল ডাকে না— নিঃশব্দ, অথচ ধ্বনির কালো জোয়ার বয়।

আমাদের বাড়িতে বহু বছর ধরে কালীপূজা হয়েছে। হালিশহরে প্রকাণ্ড শ্মশানকালীর তান্ত্রিক পূজা দেখেছি। ভয়ে বুক কাঁপতো। কিন্তু সেটা ভয়ংকরী। আমি যে জাড্যের কথা বলছি সেটা ভয়ংকর নয়, মা কালীর নয়, বলির পাঁঠার হতে পারে। বুদ্ধির মধ্যে গাধার ছবিটা মনে আসছে। 'তাও' ও শূন্যবাদের নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ সদর্থক। পশ্চিমী দর্শনের সক্রিয়তায় (activism) মানুষ ওজন জ্ঞান হারায়। কাজের পাল্লায় মানুষ ভদ্র থাকতে পারে না। কর্মদর্শন (philosophy of work) য়ুরোপের অনেক ক্ষতি করেছে। ওটা ক্যালভিনিজম্ আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল— যান্ত্রিক সভ্যতার ষড়যন্ত্র। চীনেরা ঠিক ব্যাপারটা বুঝেছিল, তাই তারা আমার মতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মার্জিত, ভদ্র, বিদগ্ধ জাত। এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। ওরা 'তাও'-এর সদর্থক নিষ্ক্রিয়তা, কিংবা নিষ্ক্রিয় সদর্থকতার উত্তরাধিকারী। ওদের বিপ্লবের অন্তরে এক নীরবতা ও শান্তি রয়েছে— সেই ভাণ্ডার থেকে ওরা শক্তি আহরণ করে। ওরা জড় নয়। তাই ওদের sense of humour অতো সূক্ষ্ম। সে-রসিকতা পরিস্থিতি-সাপেক্ষ।

দুটো উদাহরণ মনে পড়ছে। সেবার কলকাতায় নিখিল বিশ্বের ধর্ম-সভা বসলো (World Congress of Faiths)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা রচনা পড়া হয় মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথও কী একটা পড়েন মনে আসছে না। সে যাই হোক— দিন কয়েক সভা চলবার পরে, একদিন বেশ একটা তর্কাতর্কি বেধে গেল। আমরা ভাবলাম এই গেল বুঝি সব ফেঁসে। একটু আশাও করছিলাম। যখন সুর চড়েছে তখন, সভাপতিমশাই ডাকলেন চৈনিক প্রতিনিধিকে। কিমোনো পরা ভদ্রলোক, একটু খুঁড়িয়ে সামনে এলেন। বেশ খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে— 'When the waters are dirty it is best not to stir them!' আবার মিনিট-খানেক চুপ— তারপর কিমোনোটি গুছিয়ে নিয়ে পেছনের এক চেয়ারে বসে পড়লেন। সাতদিনে এই তাঁর একমাত্র বক্তৃতা। বলা বহুল্য ঘোলা জল জাদুমন্ত্রে থিতিয়ে গেল।

সেবার বিলেতে একটি চীনে ছাত্রী জুটলো। ছোট ছোট চোখের পিটপিটে চাউনি দুষ্টুমি মাখানো। বক্তৃতার সময় এ-বই ও-বই পড়তে বলি, কখনও কামাই করে না, অথচ নোট নিচ্ছে মনে হয় না। খাবার-দাবার

সময় অত্যন্ত খর্চ করে। ঘোর ক্যাথলিক—অথচ বাবা সিকিং-এর মস্ত প্রোফেসর, এক ভাই এঞ্জিনীয়ার, আরেক ভাই জেনারেল—এ-মেয়ে দেশে ফিরবে না। বলে আমার ধর্মাচরণে বাধা ঘটবে। আমার খুব রাগ হতো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতাম কর্মপ্রবাহে ঝাঁপ দেওয়াই মনুষ্যোচিত ব্যবহার, কর্তব্য— স্ত্রীজনোচিত তো বটেই— তা ছাড়া মেয়েদের ধর্ম-টর্ম হয় না। মা জ্যাঠাইমারা জপ করবার সময় বলতেন, "আরেকটা মাছ ভাজা খা— ওতে 'ফস্ ফস্' আছে।" মেয়েটি নীরবে শুনতো। দেখলাম ওকে কচ্ছপে কামড়েছে। যাই হোক, দেশে ফিরছি, মেয়েটি ছাওয়া জাহাজে সময় কাটাবার জন্য একটি ছোট্ট বই উপহার দিলে। জাহাজে বসে খুলে দেখি এই লেখা:

> The pursuit of book-learning brings about daily increase. The practice of Tao brings about daily loss. Repeat this loss again and again and you arrive at inaction. Practice inaction, and there is nothing which cannot be done.

তারপর নাম সই 'কন্তাসম' ইত্যাদি। এ মেয়ে চীনে, পেকে ক্ষীর। ভারতীয় হলে চোখে দু'-এক ফোঁটা জল থাকতো। আমাদের জড়তা এ জাতেরই নয়। লোকে বলে, আমরা ভাবি খুব স্পিরিচুয়াল। ছাই! বিশুদ্ধ ও জড়।

এবার ভাবছি রোজ সন্ধ্যার সময় গাছের তলায় আরাম-কেদারায় শুয়ে পাতা আকাশ আর তোতা পাখি দেখবো। একবার প্রায় মাসখানেক ঐ করেছিলাম, এক সাধুর নির্দেশে। কিন্তু একলা নীরবে থাকার কী জো আছে! যে-কাজ করি তাকে কাজ বলি না, সেটা ফাস্।

৮. ২. ৫৬

সরকারী চাকুরিতে ভালো ভালো নতুন বৈজ্ঞানিক, ইকনমিস্ট, সংখ্যাবিদ্ ঢুকে পড়েছে। মোটা মাইনে পায়, তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে চায় না। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র এত মাইনে, গবেষণার এত যন্ত্রপাতি, এত সুযোগ সুবিধা দিতে পারে না। সরকারী ল্যাবরেটারিতে পড়াতে হয় না সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা থেকে ত্রিশ ঘণ্টা। এবং সবচেয়ে বড় কথা, একবার ঢুকে পড়লে কাজ সম্বন্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। একটা বড় প্রোজেক্ট

এলো, তার এক অংশ তুমি পেলে, লাইব্রেরি নিয়ে পড়ে থাকো; কিছু নোট লেখো ভালো, বাইরের কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে না, কেননা সবই গোপন। অতএব আন্তর্জাতিক কাঠগড়ায় তোমার কাজের যাচাই নেই। যা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেটা নিচু গ্রেড থেকে ওপরের গ্রেডে ওঠবার জন্য। সেটা অনিবার্য। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি এবং সরকারের খ্যাতি। দু'দিক থেকেই নতুন কাজে বিশেষ লাভ নেই। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ গোপন রাখার কিছু মানে আছে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের ইকনমিস্ট গোষ্ঠীরও (প্যানেল) রচনাগুলি সিক্রেট। সরকারের প্রতি ডিপার্টমেন্টেই প্রায় আজকাল বহু ইকনমিস্ট নিযুক্ত আছেন। তাঁদের কাজও গোপন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি ওপরের আদেশানুসারে প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ এই সব গবেষকদের বিশেষ কোনো স্বাধীনতা নেই। ছোট সমিতিতে তাঁদের মধ্যে বয়স্করাই মুখ খুলতে পারেন। অথচ ডিমক্রেসির অর্থ এই : যে খবর সরকারের কাছে আছে ও আসছে সেই পুরো খবরের ওপর আমার-তোমার পুরো অধিকার আছে। স্ট্যাটিস্টিক্স সেইজন্য হলো ডিমক্রেসির প্রধান অস্ত্র। অথচ সরকার একে নিজের ব্যবহারে লাগাতে চায়। আমেরিকার বহু দোষ আছে, কিন্তু তার সরকারের সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা সরকারী রিপোর্টে ও স্ট্যাটিস্টিক্সেই পেয়েছি। আমাদের সরকারের প্রকৃত সমালোচনা অডিট, এস্টিমেট প্রভৃতি রিপোর্ট ভিন্ন অন্য কোনো সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায় কি? মনে তো পড়ছে না। দ্বিতীয় Evaluation report-এ দু'-একটা সাফ সাফ কথা ছিল। ইভ্যালুয়েশন করবার জন্য একটা প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টেরই দরকার হতো না যদি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিমক্রেটিক সত্য সন্ধানের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বোধ হয় আমরা এখনও পুরোপুরি ডিমক্রেটিক হইনি; ভারতের এই পরিস্থিতিতে হয়তো বাড়াবাড়ি আত্মবিশ্লেষণ ভালোও নয়, জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস তো চাই। সব মানি, কিন্তু এটা বদভ্যাসে দাঁড়াতে পারে। তার লক্ষণও পেয়েছি। তা ছাড়া, সরকারের আর কংগ্রেস পার্টির কাজ যেন এক হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারী গবেষকদের আর্থিক অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থা মঙ্গলকর নয়। তাদের মধ্যে হতাশা দেখেছি। অনেকেই দোকান সাজানো পছন্দ করছেন না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁরা মাথা এখনও ঘামাচ্ছেন না বটে, কিন্তু ভেবে দেখলে তাঁরাও হয়তো বলবেন যে, নিজের মতো নতুন কাজ করবার স্বাধীনতা তাঁদের কমে আসছে।

অন্য দিকে বে-সরকারী চিন্তা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান এই কয়টি.—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়। আমি যতটুকু জানি ও যেটুকু জানি তা যদি বলি, তবে বন্ধুরা চটে যাবেন, এমন ইউনিয়নের নিয়মভঙ্গ হবে। কাকে কাকের মাংস খায়ও না। তবে, নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন চিন্তা নতুন গবেষণা যে হচ্ছে না সকলেই জানেন। আমার বিশেষ বক্তব্য এইটুকু আমাদের রিসার্চ এখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক— হিরোইক, রোম্যান্টিক, নামজাদা অধ্যাপকরা এই বিষয়ে এখনও সচেতন নন। অথচ এ-যুগে হিরোইক রিসার্চ কেবল অসম্ভব নয়, অনৈতিহাসিক। এখন দল বেঁধে কাজের যুগ। তারো বেশি; রিসার্চটাকেই সোশ্যালাইজড না করে উপায় নেই। প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে বাদ দিচ্ছি। আর চিন্তা? কই এমন কিছু নজরে পড়েনি। ভারি মজার ব্যাপার ঘটছে। গবেষণার ঠ্যালায় প্রাথমিক বিষয়ের চিন্তা প্রায় অ-সামাজিক কাজ হয়ে উঠলো। একে 'ফিলজফাইজিং' নাম দেওয়া হয়।

(২) এক একটি পলিটিক্যাল পার্টির একটা না একটা ছোট্ট-খাট্টো গবেষণা-কেন্দ্র আছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রই এখন যা কিছু কাজ করে। একটু একতরফা, তবু ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। সোশ্যালিস্ট পার্টির খোঁজ পরি-ষদ এখন নিখোঁজ। কম্যুনিস্ট পার্টির রিসার্চ সেক্সন এখনও গঁদ আর কাঁচির ওপরই নির্ভরশীল।

(৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিসার্চ সেক্সনই এখন দেশের উৎকৃষ্ট গবেষণা-কেন্দ্র। এর পার্টি লাইন নেই; তথ্যগুলিও নির্ভরযোগ্য; এবং প্রবন্ধগুলিও সারবান।

(৪) ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সব কাজ জানি না। তবে যেটুকু জানি তাতে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল।

(৫) বাকি রইলো আমাদের সংবাদপত্র ও পত্রিকা। 'ক্যাপিটাল', 'কমার্স', 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' আর 'ইকনমিক উইকলি' আমি প্রায়ই পড়ি। এর মধ্যে শেষেরটিকেই আমার সবচেয়ে পছন্দ। হয়তো অন্যগুলির চেয়ে বেশি তথ্য দিতে পারে না, কিন্তু 'ইকনমিক উইকলি'র এমন সংখ্যা দেখিনি যাতে অন্তত একটা প্রবন্ধ আমাকে ভাবিয়ে তোলেনি। চিন্তার খোরাক শচীন চৌধুরী জোগান দিতে জানে। সে একটি চমৎকার গোষ্ঠী তৈরি করেছে,— সব নতুন বুদ্ধিমান অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিকরাই সে-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কেবল সমাজতত্ত্বেরই দিক থেকে তার সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ভারতীয় গ্রাম্যজীবনের বিশ্লেষণ অপূর্ব। দেশে সে গবেষণার নতুন ধারা খুলে দিলো। (এ-কথা সায়েবে মানে।) বাংলা সরকার ছাপিয়েছেন

কৃপা করে— ফলে বড় কেউ বইখানি পড়তে পায় না।

দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ সংখ্যায় বিশেষজ্ঞদের রচনা বেরোয়। যে কাগজের পয়সা আছে সেই পারে। রবিবারের সংখ্যায় একাধিক ভালো লেখা পড়েছি। হয়তো গবেষণা নয়, তবু পাঠ্য।

(৬) নানাপ্রকারের চেম্বার্স অব কমার্সেরও রিসার্চ সেক্সন আছে। যা-কিছু লেখা আমার চোখে পড়ে, তাতে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাই না। এখনও দেশী ধনিকতন্ত্র এমন অপক্ব যে, অবজেকটিভ ছাঁচ দিতেও ভয় পায়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও সংখ্যা সরকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক গবেষণার প্রায় সবটুকুই তাই। দু'-একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরা সংগ্রহ করছেন নিশ্চয়। কিন্তু সব যেন ছেঁড়া ছেঁড়া।

(৭) ল্যাজের দিকে রেডিওর বক্তৃতা। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য— এ-সব বক্তৃতা শুনি। মনে হয় পলিটিক্যাল লেকচার শুনছি। ভালোর সংখ্যা নিতান্ত কম। কোথায় বি বি. সি-র থার্ড প্রোগ্রাম— আর আকাশবাণী! সবই প্রায় বাণী! প্ল্যানিং সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি কিন্তু ভালো। আমরা 'টক' দিতে জানি না— অত্যন্ত ডাইড্যাক্‌টিক। সবই প্রায় ধর্মোপদেশ, সার্মন। অর্থাৎ বিষয়ের ওপর কম দখলের ফাঁক ভরাই উপদেশের মাটি দিয়ে।

৯. ২ ৫৬

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কীভাবে সাজানো যায়, তাই নিয়ে প্রায় বিনিদ্র অবস্থায় কাটছে। কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছি না। **University Grants Commission, Planning Commission,** আর **Inter-University Board** এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের যদি একটি যুক্ত সমিতি বসে ও অনবরত সারা বছর ধরে কাজ করে যায়, তবে কিছু আশা থাকে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে না মনে হয়। অন্যদিকে আমাদের মিথ্যা দম্ভ, রোম্যান্টিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব কিছু কমবে। সত্যই আমরা এই নতুন দেশের জন্য বেশি কিছু করে উঠতে পারছি না। আর্থিক দৈন্য জানি— সব জানি— পঁচিশ বছর যে লেকচারার ছিল সে হাড়ে হাড়ে জানে। তবু সন্দেহ হয়, আমাদের কর্তব্যের হানি হচ্ছে। এ-অবস্থায় সাহিত্য, সঙ্গীত, ছবি, গল্পগুজোব কিছুই সান্ত্বনা দিতে পারছে না। কেবল কফি আর সিগারেটই চালাচ্ছি। কিছুই যেন হলো না।

অথচ কিছু চাই। নচেৎ দেশ ডুববে।

১০. ২ ৫৬

আজ সারা বিকেল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের খসড়াটা পড়লাম। এক চটকায় গোটা কয়েক ধারণা ভেসে এলো। মন দিয়ে বহুবার পড়লে হয়তো মতামত তৈরি হবে। আপাতত ধারণা মাত্র। সবটা দৈনিকে বেরিয়েছে কি না জানি না।

প্রথম প্ল্যানের খসড়ার চেয়ে এটার আকার ছোট। একটু যেন তাড়াতাড়ি লেখা। বিশ্লেষণের অংশ যৎসামান্য, নেই বললেই চলে।

যাদের কাজ নেই তাদের কাজ হবে না। নতুন যারা আসবে তাদের কিছু কাজ জুটবে। কিছু নিশ্চয়, কিন্তু কতটা নিশ্চয় বলা হচ্ছে না। এক কোটি আন্দাজ মাত্র। ছোট ইণ্ডাস্ট্রি ও কুটীর-শিল্পের কাজ তৈরি করবার কতটা ক্ষমতা, তার হিসাব পাকা কি? ছোট ইণ্ডাস্ট্রির বহু সংজ্ঞা দেখেছি—কোন্‌টা ধরবো? বিদেশী কর্জ ও সাহায্যের হিসেব প্ল্যান-ফ্রেমের হিসেবের দ্বিগুণ। কোন্ ভরসায় দ্বিগুণ হলো? যে-কারণ দেখানো হয়েছে, সেটা ফিকে আশা মাত্র। ইনফ্লেশনের ভয় এবার যেন একটু বেশি পেলাম। অতোটা সব খরচের প্রায় আধখানা গ্যাপ সামলাতে পারবো কি? অবশ্য শেষ ভরসা র‍্যাশনিং। খসড়ার মধ্যে এমন অনেক কথা রয়েছে, যা থেকে মনে হয় যেন স্রোতটি একটানা নয়। দোটানার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা নেই— যথা ১৯৪৮ সালের পলিসি পরিবর্তনের ইচ্ছা। তবু দোটানার লক্ষণ দেখলাম। "Rapid industrialisation is thus the core of development"— একধারে, আর অন্য ধারে ছোট ইণ্ডাস্ট্রি এবং কুটির-শিল্পের উন্নতির সাহায্যে কনজিউমার গুডস যথারীতি বাড়ানো। দুটোর মধ্যেকার ফাঁক 'ইন্টেগ্রাল ডেভেলপমেণ্ট'— এই কথা দিয়ে 'পেপারিং' করা হয়েছে। 'ইন্টেগ্রাল' শব্দটির বহু প্রয়োগ সন্দেহজনক।

> It is not enough in the context of planning to think merely in terms of a balance between supplies and demands in aggregate terms, what is required is balance between requirements and availabilities, especially of key resources at all stages. A great deal of continuous technical and statistical is necessary for the purpose.

(২ তারপর নতুন সমস্যার উল্লেখ এক লাইনে আছে।) বেশ কথা— অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণ অচল। খুব মানি। দ্বিতীয় বাক্যটিও মনোহারী। আমার এইখানে একটি ছোট্ট কথা মনে উঠছে। আমার মতে **what is required is not balance, but a little unbalance.**

যা থেকে সামলানো যায়, যেটা হোঁচট খাওয়ায় না। এইভাবের ঈষৎ সামান্য অ-সমতা গতির ধর্ম। এক বছরের হিসেবে নিশ্চয়ই ব্যালান্স— কিন্তু এক পাঁচ-বছরের পর যদি অন্য পাঁচ-বছর আসে এবং আসবেই, কারণ কাল নিরবধি, তবে 'অ্যাভেলেবিলিটিজ', অর্থাৎ প্রোডাকশনের দিকেই ঝোঁক দিতে হবে। 'রিকোয়ারমেণ্টস' তো বেড়ে চলবেই— লোক-সংখ্যা কিছু কমছে না, আমরা বাণপ্রস্থও নিচ্ছি না এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন আরম্ভ হলে থামেও না। অবশ্য key resources at all stages-এর 'অ্যাভেলেবিলিটিজ' কথাই বলা হয়েছে এখানে। তার বৃদ্ধিতে সময় লাগে— ততদিন? 'প্রোডাকশন গুডস'-এর 'অ্যাভেলেবিলিটিজ' বাড়াবার জন্য 'কনজিউমার গুডস'-এর 'অ্যাভেলেবিলিটিজ'-এরও দ্রুত হারে বৃদ্ধি চাই, নচেৎ ইনফ্লেশন অনিবার্য। এখন দেখা গিয়েছে যে, একই ক্যাপিট্যালের ব্যবহারে কিছুকাল পর্যন্ত ছোট কারবার ও কুটীর-শিল্পের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ক্যাপিট্যাল গুডস-এর উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি, কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল টাইমের পর শেষেরটা হুড়মুড় করে বেড়ে যায়। অতএব ব্যাপারটা ইণ্টেগ্রেশন নয়, ফেজিং অর্থাৎ ঐ ক্রিটিক্যাল টাইম-এর একটা হিসেব চাই— সেটা কী পাঁচ বছর মোটামুটি ধরা যায়? এ সম্বন্ধে আমরা আপাতত অজ্ঞান। কিন্তু তাই বলে কী 'ইণ্টেগ্রাল' শব্দের দ্বারা এই ফেজিং, এই সিকুয়েন্স, এই ক্রিটিক্যাল টাইম-এর কথা চাপা দেবো? ইণ্টে-গ্রেশান-এর অর্থ যদি 'সামেশান'ই হয়, তবে অর্থশাস্ত্রীদের তার গলদ জানা আছে। আগে ছিল মিক্সড্ ইকনমি— অর্থাৎ এমন খিচুড়ি যে, চাল ছিল ডালের সতীন। এখন হলো ইণ্টেগ্রাল ইকনমি— দুই সতীনের ভাব। কয়েকদিনের জন্য বেশ। কিন্তু দুই সতীনে এক জোট হয়ে যদি বৃদ্ধ স্বামীকে বিধ্বস্ত করতে আরম্ভ করে তবে স্বামী বেচারার প্রাণ থাকবে? ইনি ডান পা উনি বাঁ পা টিপছেন— স্বামী হাঁপাচ্ছে।

এ যেন একটা কথার প্যাঁচে পড়ে গেলাম। ছাত্রদের থিসিসে দেখেছি, শেষ অধ্যায়ে যেখানে কী করা সম্ভব লিখতে হয়, সেখানে আর কিছু না বলতে পেরে লেখে কো-অপারেশনই একমাত্র উপায়। 'ওরে বাপু, প্রাইভেট সেক্টর আর পাবলিক সেক্টর, তোরা ঝগড়া করিসনি— সবই

ইন্টেগ্র্যাল; সবই ভারতমাতার অংশ।' 'ওরে বাপু, ক্যাপিটাল গুড্স ইণ্ডাস্ট্রি আর কটেজ এ্যাণ্ড হাউসহোল্ড ইণ্ডাস্ট্রি— তোদের মধ্যে ঝগড়ার কোনো কারণ নেই, সবই ইন্টেগ্রাল প্রোডাক্শন-এর যোগান দিচ্ছিস।' এটা পলিটিক্যাল গৃহকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি, তাই এর ভিত্তি কম্প্রমাইজ। অথচ বলতে হবে ইকনমিক দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয় প্ল্যানিং-এর চতুর্থ (এইটেই প্রথম) উদ্দেশ্য—

Reduction of inequalities in income and wealth and a more even distribution of economic power!

খাশা! ইনকাম অ্যাণ্ড ওয়েলথ দুই-ই আছে, কিন্তু প্রপার্টি কথাটির নামোল্লেখ নেই। এ সম্বন্ধে আমি যত বিলেতী বই ও প্রবন্ধ পড়েছি তাতে জানি ইনকাম অ্যাণ্ড ওয়েলথ এর দারুণ অসমতা ফিস্ক্যাল মেজার্স দিয়ে খানিকটা কমালেও যতক্ষণ প্রপার্টির আরো মৌলিক ও আরো সাঙ্ঘাতিক অসমতা কমানো না যায় ততক্ষণ আয় ও ধনের বিভাগটা প্রায় তেমনই থাকে, তার গঠনমূলক পরিবর্তন হয় না। বরঞ্চ অসমতা বেড়ে যায়। অন্য উপায় ক্যাল্ডরের মতানুসারে ব্যায়ের ওপর জবরদস্ত কর বসানো। সেটা তো মার্শাল, পিগু, কীন্স বলছেন সম্ভব নয়। ক্যাল্ডরের মতে ইনকাম-এর অর্থ ব্যাপক হওয়া চাই; তার মধ্যে ক্যাপিটাল গেনস্ এ্যাণ্ড আদার ক্যাজুয়েল রিসিপ্টস্ আসা উচিত; এবং তার ওপর অ্যান্নুয়েল ট্যাক্স এসেস্ড অন প্রপার্টি। এই দুটো আনলে তবেই ইনকাম ট্যাক্সের যা কিছু ন্যায়সঙ্গত (ইকুয়িটি) সার্থকতা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তিনি জোর করেই বলছেন যে, ইনকাম-এর এমন কোনো অবজেক্টিভ সংজ্ঞা সম্ভব নয় যার দ্বারা খরচ করবার ক্ষমতা (স্পেণ্ডিং পাওয়ার) মাপা যায়।

ডিস্ট্রিবিউশন অব ইকনমিক পাওয়ার সম্বন্ধে খসড়াটি নীরব। এ-নীরবতা ভয়াবহ। অর্থনৈতিকেরা এ নিয়ে মাথা ঘামান না বলেই কি? অথচ সবই তো শেষে পাওয়ারের ভাগ বাঁটোয়ারা।

১২. ২. ৫৬

নতুন আমেরিকান কবিতা কিছু পড়লাম। নতুন কবিরা বোঝাতে চান না, বুঝতে চান। এই ধরনের মন্তব্য সেসিল ডে লিউইস একবার কোথায় যেন করেছিলেন মনে হচ্ছে। তা হলে কম্যুনিকেশনের সমস্যা রইলো না। অবশ্য কবি সর্বক্ষণই জানেন যে, প্রকাশ হওয়া চাই। কিন্তু বোঝবার

প্রয়াসের সরস্বতা, তার ক্রিয়া পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। প্রয়াস ছটফটানিও হতে পারে। সে যন্ত্রণা প্রকাশেরও রস আছে, তবে সেটা শান্তিরস নয়। প্রাজ-এর 'রোম্যান্টিক এগনি'— বইখানিতে তার যাবতীয় সমালোচনা পড়েছি। কিন্তু সাধারণত এই যুগের পাঠক সেই টর্চারকে (torture) প্রতিভার সার্থকতা ভাবে— ভাবাই সহজ। বোদলেয়ার, লিওপার্ডি প্রভৃতির কবিতা উপভোগে (অনুবাদে) আমার নিজের এই গণ্ডগোল হয়েছে। যথাযথ বর্ণনাই যদি সার্থকতা হয় তবে অন্য কথা। কিন্তু কী জানি কেন, বোধ হয় ভারতীয় বলেই, সার্থকতার রস আসলে শান্তিরসই মনে হয়। লরেন্সের নভেলের চেয়ে তাঁর গল্প, তাঁর গল্পের চেয়ে চিঠি, তাঁর চিঠির চেয়ে তাঁর কবিতা এবং তাঁর কবিতার চেয়েও তাঁর ইটালী ভ্রমণের নক্‌সা আমার ভালো লাগে। যতই মানুষ শান্ত কেন্দ্রের দিকে এগোয়, ততই যেন সে সার্থক হয়। অনেক স্থলেই তাই দেখেছি ; দর্শনে পাস্‌কাল আর কীয়েরকে-গার্ড, দু'জনেরই আত্মা মথিত। তবু পাস্‌কাল শান্ত, কীয়েরকেগার্ড অশান্ত। গান, নাচ বাজনাতেও তাই— বহু আধুনিক সঙ্গীত পরীক্ষা, নৃত্য পরীক্ষা, বাদ্য-পরীক্ষা শব্দের, দেহের, আলোড়ন মাত্র। সমুদ্র মন্থনে অন্তত এক ছটাক অমৃত না উঠলে চলবে কেন ? স্পেণ্ডার একে 'স্টিল সেণ্টার' বলে-ছেন। কিন্তু স্টিল মানে স্ট্যাটিক নয়। তার মধ্যে আণবিক শক্তি থাকে, যদি ভাঙতে পারা যায় তবেই স্ফুরণ। তার পর সংহতি আনতেই হবে। মিকেলেঞ্জেলোর ছবি ও ভাস্কর্যে অদম্য শক্তির স্ফুরণ ও সংযম দুই-ই আছে, তবু যেন কোথায় অতিরঞ্জন থেকে যায়। রোলাঁ মিকেলেঞ্জেলোর জীবনীতে তার ব্যক্তিমূলক কারণ দেখিয়েছেন। তবু যেন···ওস্তাদ যখন গাইছেন তখন তাঁর কণ্ঠের নালী ও শিরা ফুলে উঠছে, কপাল থেকে ঘাম ঝরছে···এই ধরনের খানিকটা যেন। কষ্টের দাগ গায়ে মেখে রয়েছে যেন,— প্রসবের চিহ্নের মতন। বোঝাতে গেলে দাগ মুছে ফেলতে হয়। এরও বিপদ আছে ; না বুঝে বোঝানো সাধারণত অত্যন্ত ঝরঝরে হয়। এমন বক্তৃতা, এমন দর্শন, এমন রচনা, এমন চিত্র, এমন কবিতা সংখ্যায় অল্প নয়।

আবার বেশি বুঝলে না কী মানুষ বোবা হয়ে যায়! রমণ মহর্ষির নীরবতার গল্প শুনেছি। বোঝা আর বোঝানো— কবিতায় দু'-এর সামঞ্জস্য কী ভাবে সম্ভব ঠিক ধরতে পারছি না।

সার্থকতা হলো 'there-it-is-ness'— অর্থাৎ এই তার আদি, এই তার অন্ত। গ্রহণ করো ভালো— না গ্রহণ করো তার ক্ষতি নয়, তোমারই।

১৭. ২. ৫৬

প্রবোধ (বাগচী) গেল ; আবার মেঘনাদও গেল। দু'জনেই এক রোগে। মনটা বড় বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। মেঘনাদের সঙ্গে শেষ কথাবার্তায় মনে হয়েছিল যে, সে দেশ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে। বিশেষত বাংলা দেশ সম্বন্ধে। আমি আপত্তি জানাই। প্রমাণ শুনতে তার কত কৌতূহল ! রেডিওতে শুনলাম তার political views extreme ছিল। কোন্ ভদ্রলোকের ছেলের political views extreme না হয়ে থাকতে পারে ! সব কংগ্রেসওয়ালা হবে, ভুঁড়ি বাড়বে, আর বহুমূত্রে ভুগবে, আর যা হচ্ছে তাই ভালো হচ্ছে বলতে হবে ! মেঘনাদ ল্যাবরেটারির বাইরেকার মানুষও হতে পারতো— দরকার হলে। এবং দরকার আছে।

প্রবোধ ভারতীয় বিদ্যাব স্কলার— রীতিমতো স্কলার। সেখানে তার ফরাসী বুদ্ধি বিচার। তার বাইরে তার অন্য একটা রাজ্য ছিল যার ভিত্তি বিশ্বাস। কত আড্ডাই না জমেছে তার বাড়ি ! 'পবিচয়ে'র সে ছিল এক প্রধান স্তম্ভ। প্রমথ চৌধুরীমহাশয় তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর সৌজন্যে, বিনয়ে, সংযত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়নি এমন লোক দেখিনি। ভাইস-চ্যান্সেলারি না করতে হলে আরো কিছু দিন বাঁচতো।

একে একে বাংলার দেউটি নিবছে। এই সব লোকের এই বয়সে যাওয়া অন্যায় ! সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ থেকে আরম্ভ। বাংলা শব্দটাই উবে যাচ্ছে যখন, তখন আর এতে দুঃখ করে লাভ নেই। পূর্ববৈয়া হয়েই থাকা যাবে।

২৫. ২ ৫৬

শাহানশা ইরাণের বাদশা-বাড়ির সামনে দিয়ে কনভোকেশন প্যাণ্ডেলে গেলেন। জানালা দিয়ে ছাত্রদের ঘোড়সওয়ার আর মোটরগাড়ির শোভা-যাত্রা দেখলাম। সারাদিন উৎসব চলবে— যোগদানের ইচ্ছে নেই, সামর্থ্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয়টি (তাজের কিছু নিচে) দেখাবার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। জাকির সাহেব অসুস্থ অবস্থায় তদারক করছেন শুনলাম। ভার-তীয় সরকার পৃথিবীকে জানাচ্ছেন ভারতে মুসলমানদের কত যত্ন কত কদর। ছেলেরা জয়গান করছে শুনতে পাচ্ছি। শোভাযাত্রায় ওস্তাদ হয়ে উঠছি আমরা। অবশ্য ডিসিপ্লিনও হওয়া যায়, মজাও পাওয়া যায়। তবে ঐ তামাসা ! একটি রোমান যুগের কথা মনে উঠছে।

আচার্য নরেন্দ্র দেবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় যৎসামান্য ইঁট ও লাঠি চলেছিল— একজন কনস্টেবলের চোখ গিয়েছে ও একজন অধ্যাপকও শুনছি মার খেয়েছেন। চমৎকার! অথচ তিনি যখন লক্ষ্নৌ-এর ভাইস চ্যান্সেলার, দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে ছাত্ররা একদিনের জন্যও অভদ্রতা করেনি। কেন এমন হয়। অথচ এখন তো সেখানে শিক্ষক ভাইস চ্যান্সেলার! এলাহাবাদেও তাই ছিল, তবু সেখানেও কেলেংকারি!

কফি খাবার সময় আচার্যজীর কথা মনে হলো। একটু অবসর পেলেই, একটু সুস্থ হলেই, যখন তখন আমার বাড়ি আসতেন— সময় নেই অসময় নেই কফি। তারপর বই-এর কথা, দেশ-বিদেশের কথা, কত কথাই না হতো। ১৯২৫ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, পরে ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি তাঁর কাছে কত ঋণী তা আমিই জানি এবং বোধ হয় আরো দু'-একজন জানেন। তাঁর সম্বন্ধে লিখতে আমার হাত কাঁপে— অনেকে অনুরোধ জানিয়েছেন লেখবার জন্য, কিন্তু কলম চলছে না। যদি কখনও বর্তমান মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারি তবে লিখবো। তাঁর বিনয়ের, তাঁর সদাচারের, তাঁর বৈদগ্ধ্যের, তাঁর বুদ্ধির, বিদ্যার, সমবেদনার, তাঁর দার্শনিকতার, চারিত্রিক দৃঢ়তার ও নিতান্ত নম্র স্বভাবের বহু দৃষ্টান্ত আমার জানা, তবু বোধ হয় গুছিয়ে লিখতে পারবো না। পণ্ডিতজী ঠিকই বলেছেন, এমনটি আর হয় না, কেবল দেহই তাঁর দুর্বল ছিল। সম্পূর্ণানন্দজী ইঙ্গিত করেছেন পলিটিক্সে তাঁর আসা উচিত হয়নি। আমিও তাঁকে বহুবার এই কথা বলেছি। তিনি তা মানতেন না। তিনি বলতেন প্রথমে তিনি পলিটিশিয়ান পরে তিনি অন্য যা কিছু। এখন মনে হচ্ছে আমাদের পলিটিক্সে জনকয়েক অমন অবাস্তব, নন-পলিটিক্যাল জীব থাকলে মন্দ হতো না। চেলাপতি ন্যাশন্যাল হেরাল্ডে লিখেছে তাঁর জীবনে মাত্র দু'জন লোক ছিল যাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে ফেরবার সময় মনে হতো পবিত্র হয়েছি, উন্নত হয়েছি। আমারও তাই মনে হতো। অথচ তাঁর সঙ্গে অনেক অবাঞ্ছনীয় লোক দেখা করতে যেতো এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত ভদ্রতা করতেন। তারা যেতে চাইছে না, ডাক্তার অধীর হয়ে উঠছে, তাদেরও কোনো বক্তব্য নেই, কেবল মতলবই আছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন, ওষুধ শুঁকছেন, আর হাসি মুখে কথা কয়েই যাচ্ছেন। একবার তাঁকে বলেছিলাম, 'আপনার অসুখ আমি ধরে ফেলেছি' 'কী সেটা?' 'আপনার goodness— ওতে হাঁপানি বাড়ে।' হেসে উত্তর দিলেন, 'অর্থাৎ দুর্বলতা?' 'যাই নাম দিন!' 'লোকে বলে আমি দুর্বল, কিন্তু মোক্ষম জায়গায় দুর্বল নই। ওটা

আমার ডিমক্রেসি !' 'তা হলে বলুন রাশিয়ায় হাঁপানি নেই !' বাস্তবিকই তিনি মূল ব্যাপারে অটল ছিলেন, অন্যত্র ছিলেন নিতান্ত নম্র, না বলতে পারতেন না। কড়ি ও কোমলের অমন সমন্বয় দুর্লভ !

কাল টিন্‌বার্গেন এসেছিলেন। বক্তৃতা দিলেন, সারাদিন কথাবার্তা হলো প্ল্যানিং নিয়ে। যেমন বিদ্যা তেমনই বিনয়। অথচ বিদ্যা সবক্ষেত্রে বিনয়ী করেও না দেখেছি। আমার একান্ত বিশ্বাস বিদ্যার ভূমি goodness—(তার বাংলা কি ?) অন্তরে সৎ না হলে বিদ্যায় ফাঁকি থেকে যায়। স্বার্থপর পণ্ডিত দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গিয়েছে। কিন্তু চরিত্রের গলদ পাণ্ডিত্যে প্রতিফলিত হবেই হবে— ভদ্রতার খাতিরে সমালোচকরা নীরব থাকেন। আচার্যজীর এই moral basis-এর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের মজ্জায় মজ্জায়। সাধারণত এই ধরনের লোক 'লিবারেল' হয়— কিন্তু আচার্যজীর সোশিয়ালিজম ছিল বৈজ্ঞানিক। মূলত তিনি ছিলেন র‍্যাশনালিস্ট এবং পলিটিক্‌সে মার্কসিস্ট হিউম্যানিস্ট। তিনি লেনিনের সব লেখাই পড়েছিলেন। লেনিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ— গান্ধীজী ও কার্ল মার্কসের পরেই বোধ হয়।

২৬ ২.৫৬

ওয়াল্টার উইস্কফ্‌-এর The Psychology of Economics পড়লাম। খুব মজার, কিন্তু ছাত্রদের জন্য নয়। অর্থশাস্ত্র ঘাঁটবার পর, বহুদিন পর বইখানির বক্তব্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হতে পারে। বক্তব্যটি এই : অর্থনীতির মতামত ও আঙ্গিকের ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের সামাজিক অবস্থার অভিব্যক্তির সম্বন্ধ নিগূঢ়। এই যুগে মানুষ পৃথক ও একাকী হয়ে পড়েছে ; সমাজের কাছ থেকে কোনো আত্মপ্রতিষ্ঠার সমর্থন পাচ্ছে না ; ফলে বিরোধ ও আতঙ্ক (anxiety) বাড়ছে ; তাই তার সমন্বয়ের ও শান্তির জন্য উপযোগী মতামত সে তৈরি করে, তাতে বিশ্বাস করে। এই বক্তব্যের প্রমাণ লেখক আডাম স্মিথ থেকে আধুনিক অর্থশাস্ত্রীর রচনায় উদ্ধার করেছেন। আমার অন্তত অবিশ্বাস নেই। তবে আমি বলি এই ধরনের ব্যাখ্যা সব সামাজিক বিজ্ঞানের বেলাই খাটে। শ্রম-মূল্যের অবনতির ইতিহাস, ইকুইলিব্রিয়াম বিশ্লেষণের অভ্যুদয়, র‍্যাশনালিজমের উত্থান-পতনের বর্ণনা মনোজ্ঞ। রিকার্ডোর দোটানা অবস্থা আমাদের অপরিচিত নয়। ড্রুকমান গত যুদ্ধের সময় র‍্যাশনালিটির ক্ষয় দেখিয়েছিলেন। উইস্কফ্ তারই জের

টানছেন অলিগপলি, প্রভাক্ট ডিফারেনসিয়েশনের বিচারে এবং অন্যান্য প্রকারের কন্‌সিউমার ও প্রডুশারের ব্যবহারে। তাঁর মতে মডেল ভৈরিটাও একরকমের ইর‍্যাশনাল ব্যবহার। আমার মতে ওটা র‍্যাশনালিটির চরম পরিণতি। ওর মধ্যে অযুক্তি লুকিয়ে আছে এইভাবে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ইউটেলিটেরিয়ানিজমের দর্শন অনুসারে ধরে নিতেন মানুষ সত্যই, যথার্থই যুক্তি অনুসারে চলে, অর্থাৎ সে হিসেবী। এখনকার মডেল-বিজ্ঞার ভাবেন মানুষ 'যেন' হিসেবী— অর্থাৎ, ধরা যাক সে হিসেবী, প্রথমে গোটাকয়েক ব্যাপারে, পরে আরো বেশিতে। সত্যকারের হিসেবী আর 'যেন' হিসেবী— এই ফাঁকে যুক্তির ওপর অবিশ্বাস, তার কৃতিত্বে সন্দেহ ধরা পড়ছে। ভেইভার অনেক দিন আগেই এই 'যেন'র বিশ্লেষণ করেছিলেন। সে যাই হোক, পড়ে মজা পেলাম— বিশেষত ইকনমিক্‌সে male (labour) আর female (land) principle-এর দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখে। ফ্রয়েড প্রভৃতির বিশ্লেষণে তা হলে কিছু উপকার আছে! কিন্তু নয়মান পড়ে (এখনও বুঝতে পারিনি) নতুন ইকনমিস্ট রথচাইল্ডের একটা বক্তব্যে সায় দিতে ইচ্ছে হয়— এখনকার ইকনমিক্‌সে নিউটন, ডারুইন চলবে না; ফ্রয়েডও অচল; এখন কেবল ক্লজউইৎসের যুদ্ধের থিওরি অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজি অব পাওয়ার। বাস্তবিকই তাই; এখন থিওরির চেয়ে পলিসির ওপরই ঝোঁক; অর্থাৎ সবই এখন কলেক্‌টিভ বার্গেনিং-এর ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। তাই মনে হয় কর্তৃপক্ষের ও অর্থনীতিবিদের মধ্যে মহারথীদের ল্যাসওয়েল, ব্রেডি পড়া উচিত। আমাদের প্ল্যানিং-এর ঐখানে একটা মস্ত গলদ রয়ে গেল। Mixed Economy হলো সেই উনবিংশ শতাব্দীর balance of power। এখন না হয় প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের co-existence বললাম। কনফিউসাস যাই বলুন না কেন, নাম বদলালে কি ধাতু বদলায়? তাই সোশিয়ালিজম-এর সার কথা strategic heights অধিকার করা— অর্থাৎ শক্তির বণ্টন, শক্তির খেলা— কেবল নয়মানের দাবা খেলা নয়, যুদ্ধ। উইস্কফের শেষ মন্তব্য এই :

> Thus economics has come a long way : from the symbols of labour value, harmony, and equilibrium, through the stage of rational, economic man and markets, to an interpretation which uses strategy : and warfare as analogies for economic behaviour and represents economic laws as probabilities A picture of the individual, the

economy, and the universe emerges, full of uncertainties, without ethical guide posts, relativistic, probablistic, and appropriate to the precarious situation of mankind in midtwentieth century.

গত পঞ্চাশ বছরে একটা যুদ্ধহীন বছর যায়নি— যুদ্ধের ছায়া তো চিন্তা-ধারায় পড়বেই। মার্জিন্যালিস্টদের বুদ্ধি ও যুক্তিসর্বস্ব ব্যক্তি এখন গত। অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডে তখনকার আবহাওয়ায় ব্যক্তি না থাকলেও তাকে আবিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল। এখন তার প্রয়োজনও নেই। মার্ক্স, নেতার ব্যক্তিত্বও এখন ঘুচলো— নেতৃত্বও এখন কলেক্টিভ। এ-ক্ষেত্রে বীরেন গাঙ্গুলী যাকে group dynamics বলছে তারই চর্চা উপযোগী। আমি তাকে dynamics of power বলতে চাই।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জুভেনেল, বাংলার লাট অ্যাণ্ডারসনের শক্তি-বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ল্যাসওয়েলের study of power থেকে আরম্ভ করাই ভালো। বইখানি পাচ্ছি না খুঁজে— কেউ পড়তে নিয়ে গিয়েছে, আর ফেরত দেয়নি। কিংবা হয়তো জঙ্গলে, অর্থাৎ আমার লাইব্রেরিতে কোনো শেলফের কোণে লজ্জায় আত্মগোপন করেছে। হাজার হোক— দেশটা গান্ধীর, রবীন্দ্রনাথের তো। তার ওপর জওহরলাল বলছেন, পৃথিবীতে আমরা শান্তি আনতে চাই, শক্তির দ্বারা নয়, শান্তিপ্রিয়তার দ্বারা।

৫. ৩. ৫৬

দু'দিন দিল্লীতে বেশ কাটলো। প্ল্যানিং কমিশনের রিসার্চ প্রোগ্রামের আলোচনার পর সর্দার গুরবচন সিং-এর সেরামিক্স ও শ্রীসত্যেন ঘোষালের নতুন দেশী-বিলেতী ছবির প্রদর্শনী দেখলাম। সর্দারজীর প্রয়াস নিতান্ত মূল্যবান। দেশী রং ব্যবহার করছেন। রং মেশাতে তাঁকে অনেক পরীক্ষা করতে হয়েছে। নীল রং খোলেনি কিন্তু। ডেলফট্ ব্লু যে দেখেছে তার চোখে নেশা জড়িয়ে থাকবেই। দু'জন ছাত্রীর কাজ সুচারু। লোকজন দেখতে এসেছে এই যথেষ্ট। সত্যেন ঘোষালের পোর্ট্রেটগুলি বেশ। অন্য-গুলি কেমন যেন মনে বসলো না। আরো মনোযোগ দিয়ে দেখলে হয়তো বসতো। সন্ধ্যার সময় প্রদর্শনী যাওয়াটাই ভুল হয়েছে।

প্রশান্তবাবুর দিল্লীর বাড়িতে গেলে আরাম, সুখ, আনন্দ সবই পাই। ঘাসের ওপর, চীড় গাছের নিচে, অজানা পাতাবিহীন হলদে ফুলের গাছের

পাশে বসে থাকলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। তার পর বাছা বাছা লোকেদের সঙ্গে পরিচয়, কথাবার্তায় বুদ্ধি সজাগ হয়। সব চেয়ে আরাম পাই যত্নে। দিল্লীতে এত কাজ থাকে যে সময়ই পাই না। পৃথিবীর সেরা ইকনমিস্ট আর সংখ্যাতাত্ত্বিকদের প্রশান্তবাবুই কেমন করে জোগাড় করেন ভেবে পাই না— অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মাথা খুঁড়লে পায় না কাউকে— টাকা নেই। দিল্লী-কলকাতার Statistical Institute সত্যকারের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কাজ করছেন। প্রকৃত বিশ্বভারতী। প্রশান্তবাবু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে ফলবান করছেন দেখে প্রাণ সতেজ হয়ে ওঠে।

এবার দু'জন আমেরিকান অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হলো। পল বারান স্ট্যানফোর্ডের অধ্যাপক। তাঁর লেখা যেখানে বেরোয়, খুঁজে পড়ি। দিল্লী যাবার আগের দু'দিন ধরে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁরই একটা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করলাম। ভদ্রলোক খুবই কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন তার মধ্যে ধোঁয়া সৃষ্টির প্রয়াস নেই! সাফ সাফ মোটা কথা। অন্তর্দৃষ্টি আছে গ্রোথ ও প্ল্যানিং সম্বন্ধে। লোকটিকে আমার খুব ভালো লাগলো— একদম অনবদমিত— যা সত্য ভাবেন তাই খোলাখুলি বলেন। এ-ধরনের আমেরিকান দু'-একটি দেখেছি। ভালো 'স্পেসিমেন'। এঁকে ভারতবর্ষে আনতে একবার ইচ্ছা প্রকাশ করি— হয়ে ওঠেনি। তাঁর মতামত অবশ্য আমেরিকা সহ্য করে না— ভদ্রলোকের ছাত্রই নেই, যে রিসার্চের জন্য টাকা চাইলেই পাওয়া যায়, সে টাকা তাঁর কাছে আসে না— অর্থাৎ একপ্রকার একঘরে। অথচ কেউ কিছু করতেও পারে না। জার্মানীতে জন্মকর্ম, এখন আমেরিকান। আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তা তাঁর মনে ধরেনি। আমারও ধরে না, তাই বোধ হয় সহজে ভাব হলো। পোডিয়া অন্য ধরনের জীব, আসলে রুমানিয়ান, এখন আমেরিকান। নিতান্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ— বারানের সঙ্গে তর্ক হলো। ভদ্র তর্ক রাত একটা পর্যন্ত।

বারানের কাছে খুব একটা সমর্থন পেলাম। প্ল্যানিং-সংক্রান্ত আমার চিন্তা সুবিখ্যাত ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের চিন্তার সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না, অথচ সাহস-ভরে কিছু বলতেও পারি না। মনে মনে কিন্তু জানি যে, মূলে আমার কোনো ভুল নেই। এ-এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা! আত্মপ্রত্যয় আছে, অথচ কোথাও যেন নেই! বুর্জোয়াদের এই সাবধানী মনোভাব সুপরিচিত। কিন্তু ঠিক তাই কি? সে যাই হোক, বারান আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করুক আর নাই করুক আমার মনে খানিকটা বিশ্বাস এনে দিলে। বড়ই দরকার ছিল।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর যখন বয়স তখন ইংরেজীতে আমার প্রথম বই লিখতে আরম্ভ করি। বইখানি কোনো পত্রিকায় সমালোচনার জন্য পাঠাইনি। আমার মতে যাঁরা ঐ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষী সেই বারোজনকে পাঠাই। তাঁরা প্রত্যেকেই চিঠিতে তাঁদের মন্তব্য জানান। বিদেশীর মধ্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বের্গসঁ, হলডেন, হবহাউস, কেসারলিঙ, ক্লেমেণ্ট ওয়েব প্রভৃতি চিঠি লিখেন। আত্মবিশ্বাসও এলো, কিন্তু ডক্টরেট নেওয়া হলো না, ভাবলাম আর কী দরকার! ছুটো মজার ব্যাপার মনে পড়ছে। তখনকার ইংরেজ (স্কচ্) ভাইসচ্যান্সেলার বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, একজন নাবালক লেক্চারার— যে আবার গান-বাজনা শুনে ও ছবি দেখে বেড়ায়— সে আবার রাসেল প্রভৃতির কাছ থেকে চিঠি পাবে! বোধ হয়, রাধাকুমুদ-বাবু কিংবা নির্মল (সিদ্ধান্ত) তাঁকে বলেছিল। তিনি ডেকে পাঠিয়ে চিঠি দেখতে চাইলেন। মাথা গেল গরম হয়ে। তাঁর অবিশ্বাসের ছায়া চোখে ও ভাষায় ফুটে উঠেছিল। আমি বললাম, ব্যক্তিগত চিঠি দেখাতে পারবো না, দেখাতে চাই না। তখন নরম হয়ে বললেন, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, যদি দেখাও খুশী হবো। পরের দিন দেখালাম। চোখ ছানাবড়া, চায়ে নিমন্ত্রণ, আর বাসি কেক ভক্ষণ।

আরেকটি কথা মনে পড়ছে। আমার বাবা হলডেনের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। বলতেন, 'ত্থাখ দেখি, এধারে লর্ড-চ্যান্সেলার, আবার যুদ্ধমন্ত্রী, আবার দার্শনিক, স্কলার, সব একত্রে···এই না হলে মানুষ!' আইনস্টাইন তিনিই বোঝেন। বাবা জানতেন না যে, হলডেন আইনস্টাইন বোঝেননি। সে-যাই হোক, বাবার কথা স্মরণ করে হলডেনকে একখানি বই পাঠাই। যখন কালো বর্ডারে একখানা চিঠি এলো তাঁর কাছ থেকে (তাঁর বৃদ্ধা মা কিছুদিন আগে মারা যান), তখন বাবাকে চিঠিখানি দেখাতে ভীষণ ইচ্ছা হলো। তখন তিনি কোথায়! এ-সব স্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য নিতান্ত ভিক্টোরিয়ান নিশ্চয়, তবু স্ট্যাণ্ডার্ড সামনে থাকলে সেখানে পৌঁছতে ইচ্ছে হয় এবং অগ্রসর হবার পথে আত্মবিশ্বাস জন্মায়, আর যাঁরা স্ট্যাণ্ডার্ড উঁচু করে ধরেন, তাঁদের কথা মনে এলে চোখে জল আসে।

আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন খুব। কিন্তু সেজন্য স্ট্যাণ্ডার্ডও চাই। এখন-কার ব্যক্তিগত স্ট্যাণ্ডার্ড কি? বড় চাকরি? কর্মকুশলতা? হেবার (Weber) একেই বোধ হয় আইডিয়াল টাইপ বলেছেন।

পোলিশ আর্টের প্রদর্শনী দেখলাম। ফরাসী যুগের কথা ছেড়ে দিলে, মনে

হয় যেন ভীষণ বিষাদের ছায়া সমগ্র পোলিশ আর্টের ওপর থাকে। সোশিয়াল রিয়ালিজম-এর যুগে বড় বিশেষ কিছু হয়নি মনে হলো। ইদানীংকার ছবিতে আধুনিকতার পরশ লেগেছে— কিন্তু আলগোছে। ভাস্কর্য, এচিং ও কাঠের খোদাই চমৎকার— বলবান, সমর্থ। এমন সাজানো প্রদর্শনী এদেশে দেখিনি। শুনলাম কাঠকাটরা, আলো, স্ট্যাণ্ড, সবই পোলাণ্ড থেকে এসেছে। আমাদের প্রদর্শনীগুলি জঘন্যভাবে সাজানো হয়। হিংসে হলো। রাষ্ট্রপতি ভবনের স্থায়ী প্রদর্শনী চোখে দেখা যায় না। ভাগ্যিস কেউ যায় না!

৬. ৩ ৫৬

মিকোয়ানের বক্তৃতা পড়লাম। স্ট্যালিনের রচনা ক্লাসিক নয় তাও শুনছি। খ্রুশ্চেভের রিপোর্ট থেকে মনে হচ্ছে যে, তিনি মিকোয়ানের চেয়ে সাবধানী, অতো খোলাখুলিভাবে স্ট্যালিনের সমালোচনা করতে চান না, অথচ গত বৎসর মনে হয়েছিল যে তিনি ম্যালেনকভের তুলনায় স্ট্যালিনপন্থী। মস্কোতে একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি— তোমরা এত স্ট্যালিন-উপাসক কেন? উত্তর ছিল মজার: ভারতবর্ষে গান্ধীর কত ছবি আছে? কতবার তোমরা তাঁর নাম গ্রহণ করো? অথচ গান্ধী দেশকে গড়ে তোলবার সময় পাননি। স্ট্যালিন দেশকে গড়ে তুলেছেন, নাৎসি পশুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমাদের কৃতজ্ঞতার কারণ যথেষ্ট নয় কি? তার পর ছাত্রটি একটি গল্প বলে, যখন মস্কোর ওপর জার্মান গোলা বেশি বর্ষণ হচ্ছে তখন স্ট্যালিন ক্রেমলিনের দেয়ালের মাথায় রাস্তার ওপর বেড়াতেন, দাঁড়াতেন, মুখে পাইপ থাকতো— আর আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হতো যে, মস্কো শত্রুর হাতে পড়বে না।

আরেকটি ঘটনার স্মরণ হচ্ছে। সুধীনের (দত্ত) বাড়ি— তখন বোধ হয় রাত দুটো কী তিনটে। এম. এন. রায় সে রাতে রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার আলোচনা করছিলেন— দু'-একটি মজার ব্যাপারও বলেছিলেন। সুধীন ও আরো দু'-একজন স্ট্যালিনবিরোধী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্ট্যালিনের বিপক্ষে কড়া মন্তব্য শুনে তিনি বললেন, 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে স্ট্যালিনের স্থান রাশিয়াতে লেনিনের চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ বেশি— তবে এ-কথা বলা চলে না।' এখন স্ট্যালিন ভোলার পর্যায়। কাকে মনে রাখবো কাকে ভুলবো এই নির্বাচন পার্টি যদি করে দেয় তবে তো গিয়েছি!

কেবল তাই নয়, তখনই সবাইকে মনে করতে হবে, তখনই সকলকে ভুলতে হবে। অবশ্য অন্য দেশেও খানিকটা তাই হয়— যেমন জার্মানদের য়িহুদী অত্যাচারের কথা লিখতে এখন বারণ নেই বটে, তবে লেখা সমীচীন নয়— একজন ইংরেজের লিখে চাকরি গেল। পার্ল হারবারের উল্লেখ আমেরিকান কাগজে থাকে না। রুজভেল্টের নিউ ডীল ও নিউ ডীলার এখন অপাংক্তেয়। স্মৃতিশক্তি এখন প্রোপাগাণ্ডার ঠেলায় সোশিয়ালাইজড হয়ে গিয়েছে। হাই প্রেসার অ্যাডভার্টিজমেণ্টের কাজই হলো ব্যক্তিগত স্মৃতিকে অন্যের হাতে সমর্পণ করা।

ব্যাপারটা দাঁড়ায় কৃতজ্ঞতায়। যে-যুগে পরীক্ষামূলক, সবই 'রেলেটিভ', যে-যুগে 'অ্যাবসলিউট'-এর মূল্য নেই, যে-যুগের প্রাণ বিজ্ঞান, টেকনলোজি, যখন পুরাতন যন্ত্রের ব্যবহার মানেই প্রতিযোগিতায় অসার্থক ও ক্ষতি, সে-যুগে কৃতজ্ঞতা অসামাজিক গুণ। তবু মনে হয়, কৃতজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞানের (wisdom— আমাদের দর্শনের ভাষায় বিজ্ঞানের) প্রাণবস্তু। ঐতিহ্যের আদি ভাব কৃতজ্ঞতা। রাশিয়ানরাও কৃতজ্ঞ— ভাবে স্ট্যালিনকে টপকে লেনিনের প্রতি। ওদের স্মৃতি লাফিয়ে চলে, পিছনে পীটার আইভান পর্যন্ত। স্মৃতি কী এতটাই খাপছাড়া?

১৮. ৩. ৫৬

ঝড়বৃষ্টির পর আলিগড়ও সুন্দর দেখাচ্ছে। এ ক'দিন ভূতের মতন খাটলাম, তাই বোধহয় আজ বিকেলে যব, গম, সরষেভরা দিগন্তব্যাপী মাঠ অতো ভালো লাগলো। মোটর রাস্তায় রেখে খালের ধার দিয়ে পশ্চিম মুখো পাড়ি দিলাম। চোখে রঙের নেশা ধরলো। অনেকের ধারণা, শিক্ষা, সভ্যতা, সবই প্রকৃতির বিপক্ষে। প্রথমে তাই, তারপর প্রকৃতিকে শিক্ষা ও সভ্যতার বুকের 'মধ্যে টেনে আনতে হবেই হবে। বাইরের প্রকৃতি থেকে এতটা বিচ্যুতি অন্তরের প্রকৃতি বেশিদিন সহ্য করে না। আর্ট এই ক্ষতি-পূরণ করতে অক্ষম। এই ভেবে রানিখেতে যেতাম— এখন থেকে দেরাদুন যাবো।

জীবনের গত বিশ-ত্রিশ বছরে একটা ফাঁক বেড়েই যাচ্ছে। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, দোল, কিছুতেই যোগ দিতে পারি না। বারোয়ারিতে মোটেই আনন্দ পাই না। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে এই সব পাল-পার্বণ অনুষ্ঠানের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল!

বারাসত থেকে নীলগঞ্জে যাবার রাস্তা সোজা। দু'পাশে মাঠ, বিল, আর দূরে দূরে গ্রাম। ভোরে গিয়েছি, সন্ধ্যায় গিয়েছি, দুপুরে বটগাছের তলায় ঘুমিয়েছি। বুড়ির বাগানের, তিনকড়িবাবুর বাগানের আম, আর ক্ষেতের আখ চুরি, আর সরস্বতী পুজোর দিন ভোরে যবের শীষ আনতে যাওয়া, শিশিরে ধুতি ভেজা, রাতে কলপুকুরে যাওয়া— এককালে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ ছিল বলেই এখনও বেঁচে আছি। য়ুরোপে শুনলাম, বারাসত বদলে গিয়েছে। ট্রেভর হলের বাগানে কি কাঁঠালি-চাঁপার গাছটা এখনও আছে? শেঠপুকুরের পশ্চিম ধারের ঢিবির ওপর বকুল গাছগুলো? স্কুলের জামরুল গাছগুলো? কামিনী গাছগুলো? ফাটকের ঝাউগাছে কি এখনও বাদুড় ঝোলে? না, কলেজ হয়ে সব গিয়েছে? কোথায় আলিগড় জেলার প্রান্তরের আকাশে বাদুড় উড়লো, আর পঞ্চাশ বছর আগে ন'শ মাইল দূরের একটা ছোট্ট মফস্বল শহরের গাছপালা আর বাদুড়ের কথা ভেসে এলো। পুরানো রেকর্ডে কোনো পিন বসালে কী বেজে ওঠে, তার পাত্তা পাই না।

১৯. ৩. ৫৬

রাশিয়ায় মানসিক পট-পরিবর্তনের সামাজিক কারণ কেউ দেখাচ্ছেন না। গোটাকয়েক অব্যবহিত কারণ বোঝা যায়। রুশের আত্মবিশ্বাস এসেছে, তার শক্তি এতই বেড়েছে যে, শত্রুরা তাকে সহজে ঘায়েল করতে পারবে না সে বুঝেছে, অতএব যুদ্ধ এখন হচ্ছে না সে জানে। এ অবস্থায় কড়াকড়ি নিষ্প্রয়োজন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই মনোভাব স্বাভাবিক; রাষ্ট্রের ব্যবহার ক্ষেত্রে কিন্তু অতোটা সহজ নয়, কারণ অনুষ্ঠান অনেকদিন পর্যন্ত নিজের গতিতেই চলে এবং রাশিয়ায় চলবেও। অতএব এই ব্যাখ্যার দ্বারা কতটা যথার্থ পরিবর্তন আর কতটা পুরাতনের জের তার পরিচয় হয় না। অনুষ্ঠানের মানসিক বিশ্লেষণের দোষ ঘটে। রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে কিছু বদল হয়েছে কি? কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় এই কয়টি প্রতিজ্ঞা থাকে: (১) রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে না, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র ও সমাজ এক না হয়ে যায়। (২) যতদিন না হচ্ছে, ততদিন রাষ্ট্র ও পার্টি (দল) এক, অর্থাৎ পার্টি রাষ্ট্র চালাবে। (৩) পার্টি অবশ্য শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের। (৪) তাদের মধ্যে শ্রমিকরা বল্লমের মাথা। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই: শ্রমিক শ্রেণী শক্তি-কেন্দ্র, পার্টি সেই শক্তির বাহক, রাষ্ট্র তার প্রধান যন্ত্র ও সমাজ তার কর্ম-

ক্ষেত্র। ইকোয়েশনটা এই ধরনের: সমাজ=নতুন শ্রেণী=শ্রমিক=দল =রাষ্ট্র=সমাজ। ঐ equal to, ঐ identity-তে গোল বাধে। ঐতিহাসিক কারণে কোনো একটি term প্রবলতম হয়ে যায়। বিপ্লবের সময় নতুন শ্রেণী ও শ্রমিক, তার সঙ্গে সঙ্গে দল ও সোভিয়েট বাড়লো, পরে দল, তার পর প্ল্যানিং-এর সময় থেকেই রাষ্ট্রের প্রকোপ। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র সর্বস্ব। যুদ্ধান্তরে পুনর্গঠনের সময় কিন্তু সমগ্র সমাজের শক্তির প্রয়োজন হয়। তার ওপর যদি আর্থিক উন্নতির হার বাড়াতে হয়, তখন সমাজকেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রগঠন ইতিমধ্যে কঠিন হয়ে উঠেছে। তাকে নমনীয় করতে পারে এক দল— কারণ দলের সঙ্গে সমাজের যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই দলের মধ্যেই ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রকোপ এতই বেড়েছে যে, তার আভ্যন্তরীণ শক্তি— যার আনুষ্ঠানিক নাম ডিমক্রেসি— ক্ষীয়মান। অতএব স্ট্যালিন-পূজা বন্ধ হওয়া চাই। ঐ ছেঁদা দিয়ে সমাজ-শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছিলো— বিদ্যুতের বহতায় যেমন হয়। এক যুগে স্ট্যালিন ছিলেন ট্র্যান্সফরমার, পরে স্ট্যালিন-পূজা হয়ে উঠলো সমাজ-শক্তির বহতার স্রবণ-কেন্দ্র। ফলে রাষ্ট্র সমাজের নিকটে আসবে মনে হচ্ছে।

আরেকটি কথা: রাশিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে টেকনিশিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। চার্চিল এই বিষয়ে সকলকে সাবধান করেছেন। তা করুন গে— রাশিয়া আর আমেরিকা এই বিষয়ে একই পথের পথিক। আমেরিকা এখনও এগিয়ে রয়েছে, তবে দ্রুতির হার রাশিয়ার বেশি হয়ে যাচ্ছে। তাতে পৃথিবীর লাভ বই ক্ষতি হবে না। সে যাই হোক, রুশ সমাজে এর জন্য একটা ভীষণ পরিবর্তন ঘটেছে। এই টেকনিশিয়ান শ্রেণী, যার মধ্যে শ্রমিক, কলেকটিভ ফার্মের কর্মী, দলের সরকারী চাকুরে, স্কুল-কলেজের মাস্টার, বৈজ্ঞানিক এবং আত্মরক্ষার সাজ-সরঞ্জামের জন্য অগুণতি লোকজন সব রয়েছে— এরা একটা নতুন সামাজিক স্তর। এরা সেই পুরানো শ্রমিক-কৃষক নয়,— এরা শিক্ষিত, কর্মঠ, দেশ-প্রেমিক হয়েও ঐ শিক্ষারই কৃপায় এদের দৃষ্টি দেশাতিরিক্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজনীন, সাধারণ। (রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই হবে বুঝেছিলেন— 'রাশিয়ার চিঠি'তে পরিষ্কার লেখা আছে। ভদ্রলোকের দূরদৃষ্টি দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। শ্রীঅরবিন্দও বহু পূর্বে এই কথা লিখেছিলেন মনে পড়ছে। হাতের কাছে সে রচনাটি নেই— আমার ভুলও হতে পারে)। এই মিডল ক্লাশ পার্টির রূপ ও ধর্ম বদলে দিয়েছে। ডায়েলেক্‌টিকের চমৎকার দৃষ্টান্ত। কোথায় সেই রুশ মুজিক-বারিন, আর কোথায় এই টেকনিশিয়ান-স্টাকোনোভাইট!

আরো একটি মার্কসিস্ট ব্যাখ্যা সম্ভব বোধ হয়। এতদিন রুশ ইকনমিতে গোটা দু'-এক আন্তরিক বিরোধ ছিল : এক, শহর-গ্রাম, আর দুই, উৎপাদন (প্রোডাক্‌শ্যন) ও উৎপন্ন সামগ্রীর বিস্তার-বণ্টন (ডিস্ট্রিবিউশন)। এই দুটি বিরোধের প্রধান রূপ রাষ্ট্র ও গ্রামীণ কৃষকের বিরোধ। সেই বিরোধ কাজ করছিল কলেক্টিভ ফার্মের বাজার ও আর বাইরেকার প্রাইভেট বাজারের বিরোধের ভেতর দিয়ে। ভার্গাকে আমি এই বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি বলেছিলেন যে, সাধারণ গৃহস্থ (তাঁর স্ত্রী) তখনও ১৯৫২।৫৩ সালে প্রয়োজনীয় জিনিসের শতকরা ত্রিশ ভাগ খরচ করেন খোলা বাজারের পণ্যে। দিয়াকভ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপত্তি জানান, বলেন আরো কম, নাম মাত্র। আমি শহরের স্টেট মার্কেটের ঠিক বাইরে রীতিমতো খোলা বাজার দেখেছি— সেখানে ডিম, সব্জি, দুধ বিক্রি হতে দেখেছি। কেবল তাই নয়, ভোরবেলা গয়লা দুধ দুইয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে তাও জানি। এসব জিনিসের দাম একটু সস্তা। দিয়াকভ কঠ্‌ঠর কম্যুনিস্ট। সে যাই হোক— এই ব্যাপারটা গভীরতর বিরোধের লক্ষণ মাত্র। সেটা হলো এই : গ্রাম হয়ে উঠছিল শহরের উপনিবেশ— সর্বদাই terms of trade গ্রামের বিপক্ষে যাচ্ছিলো। অতোটা বাড়াবাড়ি হতো না যদি শহরে তৈরি উৎপন্ন সামগ্রী— যেটা অত্যন্ত দ্রুত তালে বেড়ে চলছিল— গ্রামে প্রসারিত হতো। তা হয়নি নানা কারণে। একটা হলো, রাশিয়ান ট্রান্সপোর্টের দুরবস্থা। যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য খাল কাটা আর বিদ্যুতের ব্যবহার। এই হিসেবে রাশিয়া ও চীন এক গোত্রের ও ভারতবর্ষ ভাগ্যবান। যে কারণেই হোক, ইংরেজ রেল-রাস্তা তৈরি করেছিল এবং আমরা সেগুলি পেয়েছি। অবশ্য আমাদের প্রোডাক্‌শ্যন-ডিস্ট্রিবিউশনের সমস্যা অন্য ধরনের— আমাদের ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার জন্য বাড়ছে, উৎপাদনের চাপে নয়। অর্থাৎ মূলত রাশিয়ার বর্তমান সমস্যা সেই মার্কস্‌-কথিত realisation problem। এটার সমাধান আছে, হচ্ছে ও হবে। রাশিয়া বেশ মজার জায়গা হয়ে উঠলো। তার বর্তমান অবস্থা-পরিবর্তনের ব্যাপারে হতভম্ব হবার, আগেই বলেছিলাম, মনোভাবের স্থান নেই। যা মন্তব্য পড়েছি, সবই ভাসা-ভাসা। আচার্য নরেন্দ্র দেব থাকলে বিশদ ব্যাখ্যা শুনতে পেতাম। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মন্তব্য এখনও জানতে পারিনি। ওঁরা একটু অপ্রস্তুতে পড়েছেন মনে হচ্ছে। মানুষ কতবার মতামত বদলাবে!

৩০. ৩. ৫৬

দিল্লী-বম্বে ঘুরে এলাম। অনেক ভালো-ভালো লোকের সঙ্গে দেখা হলো, কথাবার্তা হলো। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় UNESCO-র তরফ থেকে এক সেমিনারের বন্দোবস্ত করেছিল। বিষয় ছিল মোটামুটি এই: পুরাতন সংস্কৃতি ও এই যান্ত্রিক যুগের সম্বন্ধ। আমার ওপর ভার ছিল আর্ট ও সাহিত্যের দিকটা। একটা রচনা পড়লাম— ঠিক অভিভাষণ নয়, গোটা-কয়েক সমস্যার ইঙ্গিত বলা চলে। নীরদ চৌধুরীকে অনেক দিন পরে দেখলাম। তার মতামতে সন্দেহের লেশ মাত্র থাকে না এবং সে সর্বাঙ্গ দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করে। অদ্ভুত মানুষ! তার সঙ্গে কখনও এক-মত হতে পারিনি, অথচ তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও চারিত্রিক বলকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি। যথার্থ don— ভুল ডাকে ভারতে জন্মেছে। আরো অনেকে বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু সমাজতত্ত্বে কাউকে পোক্ত দেখলাম না। তিন-চারবার বলতে হলো তিন দিনে। তার ওপর এক সন্ধ্যায় হংসরাজ কলেজে আর একটি বক্তৃতা। শরীর ও মন নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আমার পক্ষে সভা-সমিতিতে আর ঐ ধরনের হৈচৈ করা পোষায় না।

লাঙের সঙ্গে আবার ঘণ্টা দু-তিন প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলাম। তাঁর মতামত মোটেই উগ্র নয়— অথচ মনে হলো দ্বিতীয় প্ল্যানের ড্রাফ্‌টে হতাশ হয়েছেন।

হফ্‌স্ট্রা বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবাসীরা কি বিদেশীর সম্পর্কে সত্যই humanly interested?' আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার ধারণা একটু বেশি রকমেরই। হফ্‌স্ট্রার মতন বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও সহৃদয় মানুষ দুর্লভ। তাঁর দেশে ও এখানে তাঁর ছাত্ররা তাঁকে একরকম পূজা করে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের সভাপতি ও অন্যান্য তিন-চারটি ছাত্র আমাকে কফি খাওয়াবার সময় তাই বললে। তারা বীরেনকে (গাঙ্গুলী) অত্যন্ত ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তাঁর ইঙ্গিতে ছাত্ররা অসাধ্য সাধন করতে পারে শুনলাম। শুনে খুবই খুশী হলাম। বীরেন সাধু। তার মাথা এত ঠাণ্ডা যে, হিংসে হয়। ড রাও-এর এক মন্তব্যের সে এমন ভদ্র ও নরমভাবে প্রতিবাদ করলে যে, কী বলবো! অধ্যাপকের মধ্যে এমন লোক এখনও আছে, দেখে আশা হয়, গৌরব হয়। অথচ প্রায় ত্রিশ বৎসর পড়াচ্ছে। ড রাও-এর মধ্যে ধর্মভাব ফুটে উঠেছে দেখলাম। অব্যাহতি নেই। আমার এখনও আসেনি— তাই নিয়ে রাও ঠাট্টা করলে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদাবোধ রয়েছে বললে। এক এক সময় সন্দেহ হয়,

আমারও মধ্যে আছে। আবার মনে হয়, ওটা middle class virtues নয় তো? যদি হয়ও বা, তবে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নয়। Something is not done ভাবটা থাকলে অনেক সময় রক্ষা পাওয়া যায়। কফি হাউসে অপরিচিত ছাত্রদের সঙ্গে বসে গল্প করতে বেশ লাগলো। অপরিচিত মনেই হলো না।

বোম্বাইয়ের সেমিনারের বিষয় ছিল গ্রাম ও শহরের সম্বন্ধ। অনেকগুলি গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়া হলো। ড. শ্রীনিবাস, ড. কাপাদিয়া ও শ্রীমতী আচার্য নিজের নিজের survey-র সিদ্ধান্ত যা বললেন, তাতে আমার ধারণা ইদানীং জাতিভেদ জ্ঞান যে বাড়ছে, তার সমর্থন পেলাম। আশ্চর্য এর বাঁচবার ক্ষমতা। গ্রাম যাচ্ছে, যৌথ পরিবার গিয়েছে, অথচ জাতিভেদ কমছে না, বরঞ্চ বাড়ছে। বিহারে, অন্ধ্রদেশে, তামিলনাদে, মহীশূরে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে অত্যন্ত বেশি। জওহরলাল কিছুদিন আগে বিহারের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তিনি জাতিভেদ ভেঙে দেবেন। এসব কথা তাঁর নরম হৃদয়ের লক্ষণ। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, ইসলাম, ব্রাহ্মসমাজ, আর্য-সমাজ পারেনি, ইংরেজ আমলের কোনো আইনকানুনই পারেনি। সক্ষম কেবল অর্থনৈতিক পরিবর্তন, যার ফলে শ্রেণী উঠবে, জাতিভেদ যাবে। তার চিহ্ন খুব স্পষ্ট নয়। আমার এক মুসলমান বন্ধু তাঁর ছোট ভাইয়ের বিবাহে একটু কুণ্ঠিত হয়েই বলেছিলেন, 'এই আমাদের পরিবারে প্রথম অ-ব্রাহ্মণ মুসলমানের মেয়ে এলো।' তাঁর বৃদ্ধা মার মন একটু খুঁতখুঁত করেছিল, তবে আজকালকার ছেলে, তায় বিলেতফেরত বলে বেশি আপত্তি করেননি। 'আমার মা খুব লিবারেল' মন্তব্যটিও শুনেছিলাম।

নারায়ণ ও অরুণা আসফ আলির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। অরুণা এখন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। নারায়ণ তার নতুন থিসিস বললে। ন্যাশনাল হেরাল্ড-এ কম্যুনিস্ট পার্টি-লাইন কী হবে তাই নিয়ে গোটাকয়েক প্রবন্ধ লিখেছিল তারই জের। অসম্ভব বুদ্ধিমান লোক— ঐ একমাত্র মেনন যে জীবনে কিছু করতে পারলে না। ওর সঙ্গে কথা কইলে মাথা চনমন করে ওঠে।

দিলীপকুমার (অভিনেতা) মন দিয়ে শুনছিল। ছেলেটিকে আমার খুব ভালো লাগলো। রোজই দেখা হতো। মোটেই নষ্ট হয়নি, ভারি sensitive মন। অভিনয় নিয়ে ভাবে। দিলীপকুমারের ধারণা, মেয়েরা অতি সহজে যে-পার্ট করছে তার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে, পুরুষে তা পারে না, তার বুদ্ধি-বিবেচনায় আটকায়। তথ্য হিসেবে ঠিকই মনে হলো।

কিন্তু ফলে অভিনয় হয় কী না, সে কথা আলাদা। ভাবের তন্ময়তা আর্টের শত্রু, খানিকটা ডুব দিয়ে সাঁতার কাটা, খানিকটা সাঁতার কেটে ডাঙায় ওঠা, ডাঙায় উঠে কাপড় ছাড়া, গা মোছা, সেজেগুজে সহজ হওয়া— রঙ্গমঞ্চ, গঙ্গার ঘাট, নদীবক্ষ নয়, স্রোতে গা ভাসানো নয়। হালিশহরের রঙ্গমঞ্চে প্রফুল্লের দশ মিনিট ধরে ডুকরে ডুকরে কান্নার জন্য যবনিকা ফেলতে হয়েছিল। দিলীপকুমারের ধারণা, বুদ্ধি-বিচার একপ্রকার বিপত্তি। আত্মসচেতনতা অবশ্য ভিন্ন জিনিস।

অধ্যাপক নয়রাট দেখা করতে এলেন। সেই বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান পণ্ডিত নয়রাটের পুত্র। এখন আমেরিকাবাসী, টাটা স্কুল নিয়ে এসেছে সোশ্যাল রিসার্চের উচ্চ পদ্ধতি শেখাবার জন্য। ভারি মজা লাগলো এই এক পুরুষে আমেরিকানের মনোভঙ্গির পরিবর্তন দেখে। ভাষায় আমেরিকান ভঙ্গি এসে গিয়েছে, উচ্চারণ এখনও বিদেশী এবং তথ্যের জন্য তত্ত্বকথা আলোচনা ত্যাগ করতে এখনও অভ্যস্ত হননি। ধরতাই বুলি এসে গিয়েছে, কিন্তু চিন্তাশক্তি এখনও চাপা পড়েনি। আমার বক্তব্য ছিল এই: গবেষণার পদ্ধতি (টেকনিক) গবেষণার বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে ; গবেষণার বিষয় দেশের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত না হলে থিসিস লিখে ডক্টরেট পাওয়াই সার হবে এবং দেশের সমস্যা তার ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব বিদেশী পণ্ডিতের কাছে সাহায্য নেওয়ার অর্থ যতটা ভাবা যায় ততটা নয়— এই ছিল আমার ইঙ্গিত— ইঙ্গিতের চেয়েও একটু বেশি। ভদ্রলোক সেটা সহজে ধরতে পেরে ঠাণ্ডাভাবেই উত্তর দিলেন। সময় একটু অধিক লাগলো বটে, তবু উত্তরটি যুক্তিপূর্ণ। তিনি কীভাবে রিসার্চ টেকনিক শেখাচ্ছেন বললেন। আলিগড়ে নিমন্ত্রণ করবো ভাবছি। ভিয়েনা কী ছিলো আর এখন কী হয়েছে ভাবলে দুঃখ হয়। অস্ট্রিয়ান স্কুলের চিন্তাধারায় টিউটনিক দোষ কম, ফরাসী গুণই বেশি। অপেরার জন্য ?

৩১.৩.৫৬

উণ্ডহাম লিউইস্-এর The Human Age-এর দ্বিতীয় অংশ Monstre Gai ও তৃতীয় অংশ Malign Fiesta শেষ করলাম। সেই পুরানো Childermass-এর জের। লিউইস্-এর জোর ভাষা একটু যেন দমেছে। স্যাটায়ার পেকেছে, অর্থাৎ চরিত্রগুলো নিজের বলে দাঁড়িয়েছে। Third City ও Dis-এর বর্ণনা ভয়ংকর, পড়তে পড়তে গা গুলিয়ে ওঠে। পাপে

জড়ানো অথচ বিবেক-রক্ষা এই খ্রীস্টান সমস্যা ঠিক বুঝি না। এক্‌জিস্‌টেন-সিয়ালিস্টরা যাকে involvement বলেন, সেটা কী এই? তাঁদের অ্যাব-সার্ড আর এঁর স্যাটায়ার কী এক পদার্থ। দান্তের 'পারগেটরি' আর 'ইনফারনো'র কথা কেবলই মনে পড়ছিল। তাঁরই আধুনিক সংস্করণ? যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে যে, সর্বজনগৃহীত বিশ্বাসের কাঠামো এই যুগে, অতএব এই বই-এ না থাকার জন্য লিউইস্‌-এর রচনায় করুণা নেই। Lewis lacks compassion। তাই তৃতীয় শহর আর শয়তানের রাজ্য এই পৃথিবীরই বর্তমান সভ্যতার উপসংহার। পুলম্যানের ট্র্যাজেডি তাই। তবু সেই ট্র্যাজেডী গ্রীক কিংবা মধ্যযুগীয় ট্র্যাজেডির মতন চিত্তকে শুদ্ধ করে না। হাতের কাছে 'ডিভাইন কমেডি'র নতুন অনুবাদ ছিল, গোটাকয়েক অংশ উল্টে-পাল্টে দেখলাম। অতো অল্প কথায় কতখানি, আর এখানে অতো বেশি কথায়, অতো চেঁচিয়ে কত কম! যতটা সুখ্যাতি পড়েছিলাম, ততটার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে। নরক, বিবেক— এ সব ঠিক বুঝি না। ভারতীয় সংস্কার ভিন্ন? মরিয়াক, গ্রেহাম গ্রীন প্রভৃতি কাল্পনিক নভেলিস্টদের রচনা খুবই উপভোগ করি, কিন্তু কেমন যেন হৃদয়ঙ্গম হয় না। বাংলা ভাষায় ঐ ধরনের বৈষ্ণব নভেল, তান্ত্রিক নভেল বলে কিছু নেই। বৈষ্ণব কবিতা, তান্ত্রিক বেতাল পঞ্চবিংশতি এককালে ছিল। এখন লেখা হলে পড়া যেতো— হয়তো তাও বুঝতাম না। মনটাই জগা-খিচুড়ি, খানিকটা হিন্দু, খানিকটা অ-হিন্দু, পশ্চিমী— কোনো 'সেন্স্‌ অব বিলংগিঙ' নেই। হিন্দু গোঁড়ামি দেখলে সায়েব, আর উগ্র সায়েবিয়ানা দেখলে ভারতীয়! এই একশ বছর ধরে খিচুড়িভোগ চলছে দেশে। নিরুপায়!

জাকির সায়েব সন্ধ্যার সময় এলেন। ঘণ্টা দুই গল্প হলো। অবসর নিয়ে পড়াশুনো করবেন আর লিখবেন এই আশা প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য যতদিন একেবারে নষ্ট না হচ্ছে ততদিন তাঁকে ভারতের সেবা করতেই হবে। তাঁর আদর্শবাদ, মহাত্মাজীর কাছে শিক্ষাদীক্ষা, দেশপ্রেম তাঁকে অব্যাহতি দেবে না। পণ্ডিতজীও ছাড়বেন না। অত্যন্ত সেন্সিটিভ মাইণ্ড, তাই কষ্ট পান। এ লোক আলিগড় ছাড়লে বিপদ, আবার সব ঢিলে হয়ে যাবে। লক্ষ্ণৌ-এর অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। আমরা কলেক্‌টিভ লিডারশিপ গড়ে তুলতে পারিনি। ইংরেজদের হাজার বছর লেগেছে— তাও যতটা বলে ততটা নয়। সেখানেও দশবারটা অ-সাধারণ গুষ্টি এখনও নেতৃত্ব করে পড়ছিলাম। ভারতবর্ষ অবতারের দেশ— এটা প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়। গ্রাম-

পঞ্চায়েত তো এককালে ছিল শুনি! এখন প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানের আকার, সংখ্যা বেড়েছে; একই মানুষ বহু অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে; ফলে কোনোটার সঙ্গেই প্রেম হয় না। তা ছাড়া এই ধরনের অ-বাস্তব, অ-সামাজিক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দেহ-মন-প্রাণকে, সমগ্র মানুষকে অধিকার করে না। কেষ্টার ব্যাগার খাটা! অনেক শিক্ষকের মুখে শুনেছি, ঐ মাসে তিনশ টাকার জন্য যতটুকু আইনানুসারে লেকচার দিতে হয় তাই দিলেই যথেষ্ট— তার বেশি কোনো দায়িত্ব নেই। জৈব প্রয়োজন থেকেই সব আগ্রহ ওঠে জানি; কিন্তু ওঠবার পর আগ্রহ ভিন্ন হয়; এক একটি আগ্রহ (ইণ্টারেস্ট) পেশায় (অকুপেশনে) দানা বাঁধে, পৃথক সত্তা গ্রহণ করে, তাইতে চরিত্র (পার্সনালিটি) পাকে, ফলে বিশেষ মূল্য (ভ্যালুজ) তৈরি হয়— ডাক্তার-দের, উকিলদের, এঞ্জিনীয়ারদের, মধ্যযুগের শিল্পীদের যেমন হয়েছিল। সেই মূল্যগুলো যখন ব্যবহারে (কোড্ অব্ কণ্ডাক্ট) পরিণত হয় তখন ব্যাপারটা সহজ হয়ে ওঠে নতুন লোকের পক্ষে। আমা-দের দেশের শিক্ষাকেন্দ্রে তেমন কিছু হয়নি। পুরানো আই. সি এস. দলের একটা কোড্ ছিল। আমরা এখন সব কিছুই করতে পারি, ইন্সিওরেন্স থেকে পাটের দালালি পর্যন্ত (ইন্সিওরেন্সটা গেল বোধ হয়)। অবশ্য প্রথম থেকেই কোড্ করলে সর্বনাশ; অধ্যক্ষ হাতে মাথা কাটবেন। সব দেশেই মাস্টারদের মধ্যে নোংরামি আছে— অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজেও খুব— কিন্তু এতটা কি? এখানেও কম বেশি আছে, তবু যেন গড়পড়তায়, তুলনায়, বিলেতের চেয়ে এদেশে একটু বেশি। অথচ আমাদের দায়িত্বও বেশি নয় কি? আমরা যে নতুন জাত। কেবল দায়িত্ব বেশি চাই নয়, সেন্স অব্ আর্জেন্সিটাও। কিন্তু কোনোটাই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। যেকালে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে কাজ হতো সেকাল গত, কবরস্থ দশ হাত মাটির তলায়। এ-যুগ হিরোয়িক যুগ নয়, রোম্যান্টিক যুগও নয়, টীম-ওয়ার্কের যুগ। কিন্তু টীমই তৈরি হচ্ছে না। এখনকার টীম্, মানে যারা একত্রে ভোট দেবে, তা যে-কোনো উদ্দেশ্যেই হোক। ল্যাবরেটারিতে সকলে মিলে একযোগে, এক প্ল্যানের ছকে কাজ করছে তো শুনি না। আর্টসের ডিপার্টমেণ্টে, ফ্যাকা-ল্টিতে সবাই একাকী, প্রত্যেকেই হিরো। আর না হয় হিরোর পার্ট চাই! উপায় কি? জানি না। চোখ কান বুজে পড়ে যাও, পড়িয়ে যাও, লিখে যাও— ব্যস্। দশের কথা দেশের কথা ভেবেছো কী মরেছো?

কামুর 'মিথ্ অব্ সিসিফাস্' চমৎকার লাগলো তাই। এর অনেক অংশ

R'ebel-এর আগের লেখা, কিন্তু ফরাসী জানি না বলে পরে পড়লাম। অনেক ব্যাপারে সায় আছে আমার। আত্মহত্যা ছাড়া— তা এও একপ্রকার আত্মহত্যা বৈ কি! এ-যুগের মানুষ অ্যাবসার্ড, এ-যুগের যুক্তি অ্যাবসার্ড। যারা লাফ মেরে ওপারে গেল, ভগবদ্‌বিশ্বাসী হলো তারা শান্তি পেলো, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে। কেউ বললে বুদ্ধির জয়ের পরে বিশ্বাস, কেউ বললে গোড়া থেকেই বুদ্ধির হার— সেই একই কথা। জ্ঞান বুদ্ধি ছাড়াও যায় না, অথচ চার ধারে অজ্ঞানতা, irrationality; এবং দুটোর মোকাবিলা, মুখোমুখি— তাই anguish, তাই অতো হাত পা বেঁধে মার খাওয়া। এই ভয়ংকর অবস্থা গ্রহণ না করে উপায় নেই, অথচ করলেও সুখ শান্তির জলাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশ্বাস, গান্ধীরও ছিল তাই। আমাদের, আমার, নেই।

শান্তি বর্ধনের 'লিটল ব্যালে গ্রুপ'-এর পঞ্চতন্ত্র দেখে এলাম বোম্বাই-এ। মোটামুটি বেশ। আইডিয়াটি ভালো। নাচ, পোশাক কেমন যেন! সঙ্গীতে কিছু ফিল্মী সুর ঢুকেছে। থীমটা বন্ধুত্ব, অথচ প্রোপাগাণ্ডা নয়। বর্ধন মারা গিয়ে দেশের ক্ষতি হয়েছে। তাঁর স্ত্রী চালাচ্ছেন। ওঁদের স্কুলটা চলছে এখন। প্রথমে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল। বোম্বাই শহরের অনেকেই কালচারের ভক্ত। ভয় হয়। নব্য ধনীরা উৎসাহী হয়ে কালচারের সর্বনাশ করছেন দেখেছি। যাঁরা বলেন সঙ্গীতে 'ইণ্টারেস্টেড', আধুনিক সাহিত্যে 'ইণ্টারেস্টেড', লোক-সঙ্গীতে, অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিতে 'ইণ্টারেস্টেড' তাঁরা ভদ্রলোক, নিতান্ত ভদ্র, কিন্তু সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলার পক্ষে নিতান্ত ভয়ংকর। এইসব হস্তী-হস্তিনীদের কাছ থেকে কালচারের সহস্র হস্ত দূরে থাকাই ভালো। 'ইণ্টারেস্টেড' 'ইণ্টারেস্টিং', কথাগুলি নিতান্ত ভুয়ো, ছেঁদো, অন্তঃসারশূন্য, এমন কী ডাহা মিথ্যা। বক্তৃতা দেবার পর ঢুলুঢুলু চোখে ভি-চোলী আর চকচকে শাড়ি, রঙিন ঠোঁটে শীৎকার করে উঠলেন 'হাউ ইণ্টারেস্টিং'! বুঝলাম একবর্ণ বোঝেননি, আর ছে···লি করছেন। তবু মিষ্টি কথায় উত্তর দিতে হবে! এঁরা পার্টিতে অতো মিথ্যা কথা কন কেন? আমাদের মা পিসী মাসীরাও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলতেন, বাধ্য হয়ে। এঁদের বাধ্যবাধকতা কি? পুরুষদের মিথ্যেতে সাধারণত একটা আশাপূরণ থাকে, একটা কল্পনার খেলা থাকে, কিন্তু এ কেবল যাদু ডালা। পৃথিবীতে মিথ্যার অনেক প্রয়োজন আছে— না থাকলে লক্ষ্ণৌ লক্ষ্ণৌ হতো না— কিন্তু এইপ্রকার ইণ্টারেস্টেড হবার, 'হাউ ইণ্টারেস্টিং'

বলার সামাজিক উদ্দেশ্য কি ঠিক ধরতে পারছি না। বোম্বাই-দিল্লীর নব্য সমাজ সৃষ্টি করা? হবে বা! সে যাই হোক এই 'ইণ্টারেস্টিং' শব্দটি শুনলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

৫. ৪. ৫৬

শহরের হরতাল নতুন সেলস্ ট্যাক্সের বিপক্ষে। আমার সিগারেট ফুরিয়েছে— কোনো সিগারেটই হয়তো পাওয়া যাবে না। অর্ডিন্যান্স জারি করে নতুন ট্যাক্স চাপানো হলো। উপায় ছিল না— নচেৎ সব মাল গায়েব হয়ে যেতো। আমাদের বণিক-সম্প্রদায়ের মুখ বড় মিষ্টি, কিন্তু তারা সামাজিক প্রগতির শত্রু। এঁদের শক্তি কত বেশি এঁরা আমাদের বুঝতে দেন না সব সময়। কিন্তু যখন বোঝান তখন হাড়ে হাড়েই বুঝি। প্রতি পরিবারে এঁদের পঞ্চমবাহিনী আছে— বাড়ির গৃহিণীরা। আত্মাশক্তি ও বণিকশক্তি একত্রিত হলে কোনো প্ল্যানেরই এমন পৈতৃক শক্তি নেই যার আশীর্বাদে সেটি সার্থক হতে পারে। অবশ্য অর্ডিন্যান্স নামটাই জঘন্য। উত্তরপ্রদেশের লেবার এন্‌কোয়ারি কমিটি একবাক্যে সিফারিশ্ করলে যে, মজুরদের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকার কম কিছুতেই হবে না। সেটা মাত্র কানপুরের কাপড়ের কলে চালাতে সেক্সন ১৪৪-এর সাহায্য নিতে হয়েছিল। (১৪৪ না অর্ডিন্যান্স মনে পড়ছে না) অদ্ভুত দেশ, অদ্ভুত শহর কানপুর!

শুনেছি শাক-সব্জি পাওয়া যাবে না। না পাওয়া যাক, ফল? তাও মিলবে না। রুটি মাখন ডিম? তাও না। সম্পূর্ণ হরতাল। অবশ্য বেশি দাম দিলে সবই পাওয়া যাবে শুনছি। তাই দেওয়া যাবে। কিন্তু মুরগির ডিমের দাম এত বাড়ে কেন? এর ইকনমিক্‌সটা কখনই ধরতে পারিনি। ম্যালথাসের ব্যাখ্যা অচল। মার্কস্ যতদূর মনে পড়ছে এ সম্বন্ধে নীরব। কীন্‌সের কন্‌জাম্পশান ফাংশান? উঁহু। হীক্‌স? নাঃ। জার্নালগুলো ঘাঁটতে হবে। সিম্পেথেটিক রাইজ নয় তো? মুরগির ডিমের দাম কমে বাড়ে কেন তাই জানি না অথচ অর্থনীতির অধ্যাপক! অল্প সময়ের বিশ্লেষণে আমার খানসামা বিশ্বাসী কিন্তু। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই: অর্থনীতিতে যে প্রাইস থিওরি আছে তার সাহায্যে সংসার চলে না, অন্তত আমার সংসার চলে না। মেয়েরা আর বেনেরা সংসার চালায়— জেনে চালায় কিনা জানি না, তবে চলে তাঁদের কৃপায়— অর্থাৎ তাঁদের না

হলে চলে না। হগ্ সাইকেল-এর মতো এগ-সাইকেল আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে হবে এশান্ রশীদকে— সে বিলেত থেকে বিজিনেস্ সাইকেল-এর থিওরি শিখে এসেছে।

নানাপ্রকারের 'দায়িত্বহীন' মন্তব্য মনে উঠছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং অসম্ভব, যতক্ষণ এই ট্রেডিং সার্ভিস করায়ত্ত না হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের দিক থেকে বলা চলে আমাদের বণিক সম্প্রদায় অর্থাৎ ছোট-বড়-মঝারি বণিক সম্প্রদায়ের কায়েমী সত্ব অগ্রগতির অন্তরায়। সেল্স ট্যাক্স না বাড়ালে ডেভেলপমেণ্টের টাকা আসতো কোথা থেকে? অবশ্য পদ্ধতি সম্বন্ধে ও দু'-একটা অন্য ব্যাপারে আমার খুব আপত্তি।

মার্কেণ্টিলিজম, কমার্স ক্যাপিটাল সম্বন্ধে যে সব বই পড়েছি তাতে মনে হয় না যে, আমাদের এই বণিকের দল কোনো ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করছেন না। এঁদের সঙ্গে তাঁদের কোনো মূলগত মিল নেই। অর্থনীতির বই-এ পড়েছি স্পেকুলেশন সব সময় নিরর্থক নয়, বাজারের দিক থেকে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ ব্যাপারই অন্য। অবশ্য পৃথিবীতে সবই দরকারি, বিষধর সর্প থেকে খাণ্ডারবাহিনী শাশুড়ী পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থের পক্ষে ওকালতি করা যায়। কালাবাজারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও ওকালতি শুনেছি ও পড়েছি। তবু মনে হয়, এগুলো না হলেও চলতো। কেবল তাই নয়, এগুলো অন্যায়, গান্ধীজী বলতেন, চরিত্রের দিক থেকে, আমি বলি আর্থিক ডেভেলপমেণ্টের দিক থেকেও। ব্ল্যাকমেলিং দেশে বেশ চালু হয়ে উঠলো। অথচ বলছি সোশিয়ালিস্ট প্যাটার্ন। ঠিক বুঝি না।

যে যাই বলুক, প্ল্যানিং মানে ফিজিকাল কণ্ট্রোল, মালের উৎপাদনের ওপর ও তার বিতরণের ওপর। আপাতত সম্ভব নয় জানি, তবু…।

৬ ৪ ৫৬

ফরাসী দেশে ফ্যাশিজম নতুন রূপ নিয়েছে— Poujadism-এ।

ঐ বণিক সম্প্রদায়ের ট্যাক্স দেবার অনিচ্ছা থেকেই সেটা ফুটে উঠলো।

ফরাসী দেশের Poujadism-এর প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত গোটাকয়েক ভালো প্রবন্ধ পড়লাম। ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াটা ফরাসীরা আর্টে পরিণত করেছে। কেবল ইনকাম-ট্যাক্সই নয়, প্রত্যেক ট্যাক্স। শাসনপদ্ধতি অতোটা কেন্দ্রীভূত হলে ফাঁক থেকে যাবেই। এই কেন্দ্রীকরণ চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে চলছে। সেণ্ট্রালাইজেশনের বিপদ ঐখানে। যারা

পড়ে সৎলোকেরা, মধ্যবিত্ত কেরানিরা। তারা সেইজন্য সরকারের ওপর যায় চটে।

আমাদের দেশেও ঐ বিপদের আশঙ্কা আছে। ইনকাম ট্যাক্সের কত যে ফাঁকি চলছে এখানে তা কহতব্য নয়। একজন বললেন, প্রতি বৎসর একশ কোটির কম নয়। তাঁর বলবার অধিকার আছে। এটা যদি সত্য হয়, তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার জন্য পরের কাছে হাত না পেতে দেশের মধ্যেই একটু কড়াকড়ি করলেই তো হয়! যখন শুনি অমুকের কাছে অতো লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স হিসেবে পাওনা এবং সরকার তাঁর অর্ধেক নিতে রাজি হয়েছেন— 'সমঝোতা' হয়েছে, তখন মনে হয় গরীব অধ্যাপক না হয়ে বড়লোক ব্যবসাদার হলেই পারতাম। যুদ্ধের সময় দেখেছি যে, বড়লোক হওয়া খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

আমার বদ্ধ ধারণা দেশে যথেষ্ট অর্থ আছে। রাজা-রাজোয়াড়ার, মেয়েদের, মোহন্তদের কাছে বিস্তর সোনা রুপো হীরে জহরত আছে। ইনকাম ট্যাক্সে ভীষণ ছ্যাঁদা রয়েছে। বণিক সম্প্রদায় সেলস্ ট্যাক্সে খুবই ফাঁকি দেন, ক্রেতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। রাষ্ট্র যে সর্বসাধারণের এটা আমরা এখনও বুঝিনি। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া বাহাদুরি ভাবি। ফরাসীরাও রাষ্ট্রকে আপন ভাবে না। পুলিশকে আমরা এখনও শত্রু ভাবি— ফরাসী-রাও তাই ভাবে।

পার্লামেণ্টারি ডিমক্রেসি ফরাসীদের কাছে, আমাদেরও কাছে বিদেশী সামগ্রী। ফ্রান্সে ফিনান্স ক্যাপিটালের প্রভাব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালের চেয়ে বেশি। নিচে ছোটখাটো বণিক আর চাষী। প্রথম অবস্থাটি আমাদের নয়। কিন্তু এক জায়গায় মিল আছে, সেটা বুরোক্রেসির ক্ষমতায়। ফ্রান্সের সব প্ল্যানের তলা ফুটো করে দেন ওঁরা, আর ডোবান ফিনান্সিয়াররা। আমাদের প্ল্যান, যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই প্ল্যানে ঘোরতর অবিশ্বাসী। আমেরিকায় রুজভেল্টের নিউ ডীল কর্মচারীদের হাতেই খতম হয়, পিছনে থাকতেন ওয়াল স্ট্রীটের ফিনান্সিয়ার। অথচ রুজভেল্ট দেশের বাছা বাছা লোক নিজের চারপাশে জুটিয়েছিলেন। প্রশান্ত-বাবু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একত্র করলেন, প্ল্যানফ্রেম তৈরি হলো— কিন্তু, কিন্তু হুঁকো নলচে গেল বদলে, রইলো কেবল কল্কেটি। খাশা বন্দোবস্ত! পণ্ডিতজী কী বলবেন জানি— আস্তে আস্তে এগুতে হবে, সকলকে নিয়ে, দেখা যাক কী হয় In the ultimate analysis তাই হবে, আপাতত খেটে যাও, we are doomed to hard labour!

৭. ৪. ৫৬

কাল ভাইভা পরীক্ষা নিলাম। এরা কীন্‌স না পড়ে ডিলার্ড পড়ে, সরকারী রিপোর্টের বদলে বাজারের সস্তা টেক্সট বই ঘাটে; দু'রকম মাল্টিপ্লায়ারের পার্থক্য জানে, কিন্তু কোন্ অবস্থায় কোন্‌টা খাটে, তাদের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা কি, এদেশে সেগুলি সচল না অচল, কিছুই জানে না। তিনটি dissertation কিন্তু মন্দ নয়—একটার বিষয় ছোট শহরের সোনা-রূপোর কারবার, দ্বিতীয়টির আলিগড়ের কাঁচা ও পাকা আড়তের লেনদেন, আর তৃতীয়টির এই শহরের ঘরবাড়ির সমস্যা। এই ধরনের বাস্তব গবেষণার সাহায্যে যদি কিছু ইকনমিক্‌স তৈরি হয়! থিওরি শিঁকেয় তুলে রাখতে হবে না, মাত্র বাস্তব জগতের ওপর আপাতত বেশ দিনকয়েক জোর দিতে হবে, তবে যদি কিছু হয়।

শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ যদি আমার হয়ে লেখে, তবে যে ক'টা কথা খাপছা খাপছা মনে আসছে, সেগুলো অক্ষরে ধরা পড়ে।

(১) পাপ মানতে গেলেই ভগবান মানতে হয় এবং সে ভগবান দু'মুখো। (২) দু'মুখো ভগবান নিতান্ত পলিটিক্যাল জীব। (৩) আপত্তিটাই বা কি? এযুগের ভগবান ন্যাশনাল নিশ্চয়, কিন্তু ইখ্‌নাটনের মোনোথিয়ীজম্‌ও তো ইম্পিরিয়াল ছিল! (৪) ভগবান মানবো না, পাপ স্বীকার করবো, অনন্ত মানবো না ক্ষণ মানবো, সংসার দুঃখময় মানবো না কষ্ট পাবো, নিয়ম মানবো না পরিবর্তন চাইবো, ন্যাচরাল ল মানবো না অথচ স্টোইক হবো, বিশ্বসত্তা নেই আত্মসত্তা আছে, আত্মা নেই আত্মীয় খুঁজবো—এই হলো আধুনিক মনের দ্বন্দ্ব। বিভক্ত মন নিয়ে মানবিক ঐক্যসাধন অসম্ভব, সম্ভব কেবল কোল্ড ওয়ার। বিজ্ঞানের দোষ নয় কিন্তু। বিজ্ঞানের জন্যই আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। বরঞ্চ বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনতায় বিশ্বাসই জন্মায়। অবশ্য বিজ্ঞানের ঐক্য হলো পোটেনশিয়াল ইউনিটি। ওপেনহাইমার লিখেছেন পৃথিবীর যাবতীয় দ্বৈততা (গ্রেট অ্যান্টিনোমিস) মানুষকে বিভক্ত করেছে ও সেই সঙ্গে একত্রিতও করেছে। একমত। (৫) বাস্তবিকই কি দ্বৈততা? বোধ হয় তার চেয়েও গভীর—অ্যালিনেশন, সৃষ্টি থেকে ভোগের বিচ্ছিন্নতা। তাই নিরানন্দ, দুঃখ? (৬) উপনিষদের আনন্দ, রবীন্দ্রনাথের আনন্দ—ধরা যাক এক—ব্যাপারটা কি? ভোগের নয়, সৃষ্টির শুনেছি। কিন্তু সৃষ্টিরই বা আনন্দ

কি? প্রতিদিন ভোরবেলা সূর্যোদয় দেখি, আনন্দ হয় আমার, সূর্যের আবার আনন্দ কি? অথচ প্রতি প্রত্যূষে নতুন সৃষ্টি হচ্ছে, লাল করবীর রং বদলাচ্ছে, নিমগাছের ফুল ঝরছে, কচি পাতা গজাচ্ছে, ডালিম গাছ ফুলে ভরে উঠলো। আমার ভালো লাগলো, আনন্দ হলো আমার। উদ্দেশ্যহীন প্রকাশ, বিস্তার, স্ফুরণ, এই আনন্দ? না, মেয়েটি প্রথম মা হচ্ছে। তার চোখে আলো পড়েছে, দেহপূর্তি হচ্ছে, একে আনন্দ বলবো? প্রকাণ্ড ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন, সুপার কনস্টেলেশন হাওয়াই জাহাজ, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের গদ্য, পঞ্চাশতলা স্কাইস্ক্রেপার, রাইটের স্থাপত্য— আনন্দ পাই, ঠিক যা চাইছে তাই হচ্ছে বলে— ফাংশান্যাল। উপনিষদের আনন্দ এ জিনিস নয়। শক্তির বিকাশে যে আভা প্রকাশ পায়, তাকেই আনন্দ নাম দেবো? কথটার বর্তমান অর্থ আমাকে বুঝতে দিচ্ছে না। আনন্দ, আনন্দময় কোষ, আনন্দলহরী, আবার সাঁওতাল পরগণায় বাঙালি বাবুদের আনন্দধাম। বিয়ের কনের আনন্দপট আর আনন্দনাড়ু, আর বোম্বাই অঞ্চলের আনন্দী রাগ, বিজয়ার দিন আনন্দা লবণ, সবই নন্দ ধাতুর খেলা।

নলিনী (গুপ্ত) বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তিনি তাঁর 'নব্য বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান' পাঠিয়েছেন। তাঁর যে আমাকে মনে আছে দেখে মনটা কেমন করে উঠলো। অনেক রাতে প্রমথ চোধুরী মহাশয়ের বাড়ি থেকে ফিরতাম। কে বলে বাংলা সাহিত্য মরেছে, কে বলে বাঙালি চিন্তা করে না? কী গভীর মানুষ এই নলিনীবাবু! কী অদ্ভুত ঘন ভাষা, চিন্তা, আর ব্যালান্স! পাণ্ডিত্য এর হজম হয়ে গিয়েছে। অন্য স্তরে থেকে ভাবা আর লেখা। অথচ সেদিন বর্তমান বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি লম্বা প্রবন্ধ পড়ছিলাম— নলিনীবাবুর নামোল্লখ নেই। আমি বৈজ্ঞানিক নই অধ্যাত্মজ্ঞানীও নই, অতএব তথ্য ও তত্ত্বে কতটা সত্য, আর কতটা ভুল বুঝতে পারলাম না। সত্যেন (বোস) কি বলে? অধ্যাত্মজ্ঞানের দিক থেকে কে বলতে পারে? কিন্তু পৃথক পৃথক সমালোচনা করলে চলবে না। দুটোর ওপরই সমান অধিকার যার আছে সেই পারবে, যদি অবশ্য সে লিখতে জানে। আমার কোনো অধিকারই নেই— কেবল কৃতজ্ঞ হবার অধিকারই আছে।

৯. ৪. ৫৬

এক চুমুকে অমলের (হোম) 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' শেষ করলাম। গলার

কষ্টটা বেঞ্জইন ভেপারে যাচ্ছিলো না, হঠাৎ চলে গেল।

অমৃতসরে মোতিলালজীর ভ্রূকুঞ্চন, রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নেওয়া, সি. এফ. এণ্ডরুজের গুরুদেবের চাহনিকে ভয়, শমী 'তাহার পরে আর ফিরিল না,' এগুলো অনন্ত মুহূর্ত। এদের ভেতর দিয়ে যে মূল্যজ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে সম্মান দেওয়া প্রকৃত শালীনতার লক্ষণ। মনে রাখা, মনে করিয়ে দেওয়া— এইটাই ঐতিহ্যের প্রাণ-প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা। মার্সেল তাকে বলেন উইজডম, আমরা বলি ঋণ-শোধ।

কিন্তু শোধ কিছুতেই হয় না। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, মোতিলাল, জিন্না এঁরা বিপ্লবী মানুষ— ইতিহাস তাঁদের খুলেছে আবার বেঁধেছে। বেঁধেছে, কারণ এঁদের ক্রিয়াকলাপ সাময়িক প্রতিবেশের আশীর্বাদে ঘটেছিল। খুলেছে, কারণ এঁদের প্রতিবাদ দুই স্তরের, মৌলিক প্রতিবাদ নিয়তির বিপক্ষে এবং সেই মৌলিক প্রতিবাদের বিপক্ষে মানবিক প্রতিবাদ। দুটো এক হয় যখন, তখন মন, কাজ, সব ঝকঝকে তরতরে, lucid।

কামু লিখেছেন :—

> Opposite the essential contradiction, I maintain my human contradiction. I establish my lucidity in the misdt of what negates it. I exalt man before what crushes him and my freedom, my revolt and my passion come together then in that tension, that lucidity and that vast repetition.

এখনও টেনশন চলছে, এখনও দেশে-বিদেশে অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি চলছে— নেই লুসিডিটি— কারণ প্যাশান নেই। বোধ হয় আফ্রিকায় আছে— কামু একপ্রকার আফ্রিকান, তাই বোধ হয় কিছু বুঝেছেন। আগামী ইতিহাসের ঋণ পরিশোধ হয় না, চক্রহারে সুদ বেড়েই যাচ্ছে। পুরানো কথার অর্থ ঋণ পরিশোধের প্রয়াস। তার মধ্যে একত্রে থাকবে ঐ ফ্রীডম, ঐ রিভোল্ট আর ঐ প্যাশান। বাকি সব বৃদ্ধের বকবকানি!

১০. ৪. ৫৬

জন গ্যান্টারের 'ইন্‌সাইড আফ্রিকা' প্রায় শেষ হলো। প্রায় নয়শ পৃষ্ঠার বই, কিন্তু ঝরঝর তরতর করছে। একটা অংশ বাদ পড়ে গেল তবু। মোটামুটি

একটা ছবি পেলাম। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব আফ্রিকান স্টাডিজে উপদেষ্টা হয়ে বন্ধু হফ্‌স্ট্রা এসেছেন। আফ্রিকার সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। গ্যাণ্টারের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ভিন্ন অন্যত্র যে আলোড়ন চলছে, তার প্রকৃতি জাতীয়তাবোধ, ন্যাশনালিজম। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেশিয়ায় সেটা একপ্রকার শ্বেতজাতির ন্যাশনালিজম। গ্যাণ্টার কোলোনিয়ালিজম বরদাস্ত করেন না মোটেই এবং এই মন্থনের পর অমৃত উঠবে না গরল উঠবে, সে সম্বন্ধে চিন্তিত। গরল অর্থে তিনি কম্যুনিজমই বোঝেন। তিনি অবশ্য বলছেন, কম্যুনিজমের আশঙ্কা নিতান্ত কম। কিন্তু শঙ্কা আসার কথাই ওঠে না। যদি নির্যাতিত মানুষ প্রোপাগাণ্ডার জোরেই কম্যুনিস্ট হয় ভাবা যায়, তবে অবশ্য অন্য কথা। আমার এই ধরনের খোঁজাখুঁজি নিতান্তই অ-বৈজ্ঞানিক মনে হয়। অথচ গ্যাণ্টারের রিপোর্ট অদ্ভুত রকমের 'অবজেক্টিভ'। এই 'অবজেক্টেভিটি'র মধ্যে কতই না গোঁজামিল থাকে। চরিত্রাঙ্কনে গ্যাণ্টারের সমকক্ষ দুর্লভ। শোয়াইৎসার, নাসের, এনক্রুমা প্রভৃতির রূপ যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এলো। কত মজার খুঁটিনাটি ঘটনাই না আছে বইখানিতে। একেবারে শ্যেনদৃষ্টি। ঠিক এই ধরনের 'রিপোর্টাজ' খাঁটি আমেরিকান সৃষ্টি। এমন রসালো, জীবন্ত, চলন্ত রূপ, অথচ নির্বাচিত ঘটনাই আশ্রয়— ভূয়োদর্শন থেকেও নেই— একটা মোটামুটি লিবারেলিজমের অন্তঃশীল টান রয়েছে। আরেকটুকু ওপাশে ঠেলে দাও তো এরেনবার্গ, আর ওপাশে দাও তো দিনের, সপ্তাহের, পক্ষের, মাসের ইতিহাস। নতুন আর্ট। গভীর বিশ্লেষণ চেয়ো না কিন্তু। এই মহাভারত কে পড়বে জানি না! গ্যাণ্টার যদি আর পাঁচ বছর পরে এদেশে আবার আসেন তো মন্দ হয় না। তাঁর চোখ দিয়ে নতুন করে নিজেদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। পণ্ডিতজী থাকতে যেন আসেন।

১১. ৪. ৫৬

আজকের ডাক-এডিশনের 'ন্যাশনাল হেরাল্ড'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবরের শীর্ষক 'সোভিয়েট লীডারস্ এনগেজমেণ্টস ইন ইউ কে রেসট্রিক্টেড'— আর কালকের দিল্লী এডিশনের স্টেটস্‌ম্যানের ৬ পৃষ্ঠায় ৬ স্তম্ভের নিচে সেই একই রয়টারের খবরের শীর্ষক হলো 'Wider contacts with British people desired, Soviet Leaders U. K. visit' খবর এক, দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

দুই-ই অবজেকৃটিভ, দুই-ই সত্য খবর। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' ইঙ্গিত দিচ্ছে, গতায়াতের স্বাধীনতা কেবল রাশিয়াতেই খর্ব হয় না, ইংলণ্ডেও হয়। আর 'স্টেটস্‌ম্যান' ইঙ্গিত দিচ্ছে, রাশিয়ান নেতারা ইংরেজ জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, অতএব সাবধান। শেষেরটি উহ্য। 'স্টেটস্‌-ম্যানে'র সাজানো বেশি 'অবজেকৃটিভ' মনে হওয়াই স্বাভাবিক—প্রায় নিউট্রাল। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড'-এর সাজানোটি ক্রিটিকাল মনে হবে—কিন্তু ক্রিটিসিজম্‌টাও অবজেকৃটিভ। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পাঠকের চোখ খোলে, 'স্টেটস্‌ম্যান' চোখের সামনে রাখে। দুটো উদ্দেশ্য ভিন্ন।

'স্টেটস্‌ম্যানে'র এক চমৎকার শিল্প চাতুর্যের কথা স্মরণ হচ্ছে। তারিখ ঠিক মনে নেই। আবাদি কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ এবং সোশিয়া-লিস্টিক প্যাটার্নের প্রস্তাব যে পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা 'বক্স'-এ একজন ডুবুরি বরফ ভেঙে ওপরে উঠছে এই ছবিটা ছিল। তার তলায় লেখা 'দি কোল্ডেস্ট পিকচার'। এই বিদ্রূপটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। অনেকদিন ছবিটা তুলে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম তারিফ জানাবো। হয়ে ওঠেনি, কাটিংটা হারিয়ে গিয়েছে, তাই হয়তো কিছু ভুল হতে পারে।

রুশ কম্পোজার শস্‌টাকোভিচ সম্বন্ধে ডেসমণ্ড শ-টেলার লিখছেন :

> The tenth symphony represents a new and masterly synthesis of those alternating moods— broading melancholy, bitter irony, bursts of frantic exuberance— which in combination make him seem something of a modern Hamlet.

খাসা ভাষা, কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না। বিষাদ, অদম্য স্ফূর্তি— জানি, আবদুল করিমের ও ফৈয়াজ খাঁ'র গানে, এনায়েৎ খাঁ'র সেতারে, আলা-উদ্দিনের সরোদে পেয়েছি, কিন্তু তিক্ত শ্লেষ-বিদ্রূপ রসটা কি? তার ওপর হ্যামলেট! এ-ধরনের সাহিত্যিক সমালোচনা উপভোগ্য নিশ্চয়, যেমন নেভিল কার্ডুসের ক্রিকেট আর ডারুইনের গলফ্‌ সম্বন্ধে রচনা। সঙ্গীত আলোচনায় বার্নার্ড শ সমাজতাত্ত্বিক, আর নেভিল কার্ডুস সাহিত্যিক। তাঁরা সঙ্গীতের আঙ্গিক সম্বন্ধেও জ্ঞানী নিশ্চয়, তবু তাঁদের রচনার প্রধান আকর্ষণ সাহিত্যের। খানিকটা অনিবার্য নিশ্চয়, তবু একটা মস্ত ফাঁক থেকে যায়।

আমাদের সঙ্গীত আলোচনাতেও এই ব্যাপার ঘটছে। দেশী, বিদেশী

পত্রিকায় যে সব সঙ্গীত আলোচনা পড়ি, তাতে আমার সঙ্গীত উপলব্ধির বিশেষ সাহায্য করে না। বোধ হয়, ঐ ধরনের সাহিত্যধর্মী আলোচনা আমাদের সঙ্গীতে প্রযোজ্য নয়। আমাদের রাগের একটাই mood, তার বৈচিত্র্য তালে ও অলংকারে, তাও আঁটঘাট বাঁধা। সেদিন দেখছিলাম এক ইংরেজী দৈনিকের সঙ্গীত সমালোচক পূরিয়ার ঠুংরি চেয়েছেন। এ যেন কচি খোকার সোনার পাথরবাটিতে কাঁঠালের আমসত্ত্ব চাওয়া। হয়তো বড়মানুষের আদুরে ছেলে চাইলে পায়। কিন্তু রসভঙ্গ করা যেন সত্যের অপলাপ মনে হয়। তা ছাড়া রাগের mood ঠিক মানবিক নয়, ওটা নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক। কথা দিয়ে রাগের mood কিছু বদলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— তাও বেশি নয়। রাগের মধ্যে bitter irony কী করে ঢোকে জানি না। এগুলো শ্রোতার আরোপ। কারুর রামায়ণ শুনলে সীতার বিরহে দুঃখ হয়, আবার কারুর হারানো রামছাগলের কথা মনে ওঠে। শ্রোতার মানসিক অবস্থা এতই বিচিত্র যে, তার ওপর বিশ্বাস রাখা চলে না। তা ছাড়া বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিই তো আর্টের একটি প্রধান কাজ! সঙ্গীত আলোচনা টেকনিক্যাল হলেই সঙ্গীতের উন্নতি হয়, প্রসার অবশ্য না-ও হতে পারে। কিন্তু প্রসারের জন্য কি প্রকৃতিকে বিসর্জন দেবো ?

একবার ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের আসরে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়। বোধ হয় তাঁকে সম্মানপত্র দেওয়া হচ্ছিলো। যেমন সুকণ্ঠ, তেমনই পার্সনালিটি, তেমনই হিন্দী ভাষণ! একেবারে রাজযোটক! ভাষণে তিনি বললেন, রাগ-রাগিণীর লিঙ্গভেদ, বয়সভেদ পর্যন্ত আছে— ভাব ও রসভেদ তো রয়েইছে। এবং গেয়ে দেখাতে লাগলেন। সকলেই স্বীকার করলে আছে এবং রয়েছে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কী জানি কেন দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় চাপলো। বললাম, পর্দার আড়াল থেকে যদি গাওয়া হয়, তবে কী পুরুষ স্ত্রী, বয়স কি বোঝা যাবে? অন্য লোকে যদি কেবল সারেগামা দিয়ে রাগটি প্রকাশ করে, তবে, যদি তাল বদলানো যায়, তবে? এই ধরুন বলে রামকেলী আর কালাংড়ার ধ্রুপদী রূপ দেখালাম. শব্দ না ব্যবহার করে, তাল না দেখিয়ে, মাত্র আ আ দিয়ে। তারপর রামকেলী ও কালাংড়ার দ্রুত রূপ দেখালাম ঐভাবে। শ্রোতারা ভাবভেদ ধরতেই পারলে না। তারপব কালাংড়ার একটা বিদ্যাসুন্দরী টপ্পায় সারগম গাইলাম, পরে কথা-বিহীন 'কাদের কুলের বউ'। ভাবভেদ প্রকট হলো শ্রোতাদের কাছে। কোনো রাগের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিনি। এই রকমভাবে মেঘ ও সারং-এর তথাকথিত ভাবগত পার্থক্য যৎসামান্য দেখানো সহজ।

আমি রাগ-রূপের কথাই বলছি, শব্দসম্পন্ন গানের ব্যাপারই অন্য। সেখানে bitter irony আনা যায় কথার মাধ্যমে। তবে কেমন লাগবে বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হয়তো পারতেন, যদি তাঁর হৃদয়ে তিক্ততা থাকতো। তা ছিল না। এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তমহাশয় যতদূর জানি, সঙ্গীত রচয়িতা নন।

মার্কাস স্টোনের অভিমান, মৃত প্রভুর জন্য কুকুরের বিছানায় মুখ রেখে কান্না, দোলায় চড়া, মোহিনী, আয়েগা আযেগা আয়েগা—এ হলো কুমুদার (রাধাকুমুদ) চা খাওয়া, অর্থাৎ চায়ে দু'-এক ফোঁটা দুধ আর ছ' চামচ চিনি। আলিগড়ে একজন ভদ্রলোকের কাছে গল্প শুনেছিলাম— 'ক চামচ চিনি দেবো?' 'যাতে চামচটা খাড়া থাকতে পারে।' এ আবার চিনি নয় গুড়। ছবি, গানে গুড় ঢাললে খোকাদের ভালো লাগে। আর্ট আর যাই হোক, jam নয়। কীর্তন তাই এখনও বরদাস্ত হলো না। আম মানে দশেরী— সফেদা— ল্যাংড়া— সোবির খাশ— আর ভারতীয় ঐক্যসাধনের জন্য জোর অ্যালফন্সো। মধুচুষী, বেগমবাহার, ভূতো বোম্বাই, সিঁদুরে, গোলাপখাশ আম নয়। বেশি মিষ্টি, বেশি সুন্দর—একটু যেন বেশি বেশি। সামনে, একটা মাদ্রাজী আম রয়েছে – খানসামা পছন্দ করে এনেছে। এটা আম নয়. ঐ ধরনের মুখ পার্টিতে দেখেছি।

আমের আম্রত্ব বুঝতেন চৌলাখীর নবাব, কদর পিয়ার এক বংশধর। আর বুঝতেন ঠুংরি ও পান-জর্দা। ভালো গানের সময় তিনি গলে যেতেন, নিজেকে সামলাতে পারতেন না। একদিন সকালে কৈসারবাগের এক নবাব-বাড়িতে গান গাইছেন কাশীব বিদ্যাধরী। অমন ভৈরবী অনেক দিন শুনিনি। নবাব সাহেব পাশে বসে, সাড়া নেই, শব্দ নেই, আহা নেই, বাহবা নেই, একেবারে গুম। গান থামলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবাব সাহাব, তবিয়ত কেমন? বাড়ির খবর ভালো তে.?' গম্ভীরভাবে বললেন, 'আজকের কাগজ পড়েছেন?' কিছুই বুঝলাম না। 'ছোট সাহেবের বক্তৃতা পড়েছেন?' 'পড়েছি। কিন্তু…' 'কাল কৈসারবাগের বার-দোয়ারিতে আমের নুমায়েশ খেলা হয়েছিল। সেখানে লাট সাহেব কিনা বললেন যে, বোম্বাইয়ের অ্যালফন্সোর তুলনা হয় না!' তখন বুঝলাম। 'আচ্ছা, আপনিই বলুন, উনি আমাদের মেহমান, অতিথি, অতিথি এসে আপনাকে বললেন যে, আপনার পিলাও ভালো নয়, আপনার মুসল্লম ভালো নয়। এ কী রকম আদর!' তারো অতিরিক্ত কিছু ছিল। চুপি চুপি

আপন মনে বললেন, 'ইয়ে কভী হো শক্তা!' অর্থাৎ দশেরী, সফেদা, সমর-বেহেস্ত, বাদশা পসন্দ্— এদের সঙ্গে তুলনা কী সম্ভব হতে পারে, মানুষে করতে পারে! আবার আস্তে আস্তে বললেন, 'বোম্বাইয়ে শুনেছি, লোকে বিবিকে তুম্ বলে ডাকে। তাই হবে বা!' লাট সাহেব বোম্বাইয়ের লোক। নবাব সাহেবের সেদিন ঠুংরি শোনাই হলো না। এটা লক্ষ্ণৌ-এর সুখ্যাতি নয়, অন্য শহরের অখ্যাতি নয়— এটা মাত্র রসবিচার, যে-রস গেঁজে যায়নি, তাড়ি হয়নি, গুড়েও পরিণত হয়নি।

১২. ৪. ৫৬

আমাদের উর্দু'র অধ্যাপক শেখ রশীদ সিদ্দিকী রসজ্ঞ ব্যক্তি। হাল্কা প্রবন্ধে তিনি সিদ্ধহস্ত। নিতান্ত আস্তে কথা কন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। প্রায় রোজই বাগান থেকে ফুল পাঠান, আর কলেজে এসে দুটি গার্ডেনিয়া দেন। বছরের প্রথম সরবে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন, এক সায়েরীর সঙ্গে। একদিন বলছিলেন উত্তর প্রদেশের বৈদগ্ধ্য এটাওয়া স্টেশনের ওপারে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, উনাও পর্যন্ত। তাই থেকে ভঙ্গি, উচ্চারণ, কহন-সহন প্রভৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বন্ধে কথাবার্তা চললো। এ এক রকম U ও non-U শ্রেণীর ভেদ-বিচার।

ছেলেবেলায় বাংলা দেশের, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার পার্থক্য বোঝা যেতো। প্রমথ চৌধুরীমহাশয় বলতেন, কৃষ্ণনগর শ্রেষ্ঠ। বিজয় মজুমদারমহাশয় বলতেন কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত গঙ্গার দু'ধার। রাজশাহী-পাবনা বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে এক বিশেষ কালচার দেখেছি। কেবল তাই নয়, বাগবাজার-শ্যামবাজার আর কালীঘাট-ভবানীপুর এক ছিল না। বালিগঞ্জের দ্রুত পরিবর্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। রাস্তায় হাঁটলে নিজেকে বিদেশী মনে হয়: বাংলা দেশের কেন্দ্রগুলি সব লোপাট হয়ে গেল। একজন পুরানো বেহারি ছাত্র বললেন, ভাগলপুর আর গয়া এখন সব একাকার। কাশী বোধ হয় কাশীই রয়ে গেল, বিশ্বনাথের কৃপায় বা!

কারণ আছে। কিছু কারণ জানি। তবু, পরিবর্তন বিষাদময়। দুর্গন্ধ নালা আর কে চায়! তবে ভদ্রতা, শালীনতা, বৈশিষ্ট্য ছিন্ন-ভিন্ন হলে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।' বয়সের চিহ্ন? দোষই বা কি তাতে? Graciously যদি বৃদ্ধ হওয়া যায়, তবে বিক্ষোভের কারণ নেই। এলিয়ট maturity of manners-কে কালচারের অঙ্গ বলেছেন। বুড়ো খোকা বুড়ো খুকি না

হলেই হলো, আর স্বর্ণযুগের জন্য হা-হুতাশ না করলেই হলো। ব্যাপারটা কালাতিপাতের স্বীকৃতির সঙ্গে কালের অধীনতা অস্বীকার। কালের টানা-পোড়েন পাকা হলে চরিত্র খাপী হয়। কালচার আর ক্যারেক্টার এইখানে এক। ইন্দিরা দেবীকে মনে পড়ছে। আরেকজন পুরুষকে, যিনি আমার আত্মীয় ছিলেন।

১৩. ৪. ৫৬

আজ কি চৈত্র-সংক্রান্তি? আজই তো জেলেপাড়ার সঙ বেরুবে? আজই না চড়ক-পুজো? ছেলেবেলায় একবার চড়কের মেলায় যে দৃশ্য দেখেছি, ভাবলে এখনও ভয় হয়। একত্রে নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর। পিঠে মোটা লোহার কাঁটা ফুটিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘোরা, একতলা উঁচু জায়গা থেকে ইঁট-কাঁটা ভরা গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, বুকে রক্ত বইছে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চক্ষু আর কাপড় রক্তবর্ণ, আর গলায় মোটা সুতোর মালা। মেলা বসতো মুসলমান জোলা তাঁতি পাড়ায়, খেতাম কদমা আর পাঁপর। এককালে ছিল বৌদ্ধ অনুষ্ঠান। এখন মনে হয়, তন্ত্রের অংশও ছিল। বৌদ্ধ-জয়ন্তীর ঘটা হবে শীঘ্র, কিন্তু শেষ দিকে বাংলা দেশে ব্যাপারটা জঘন্য হয়ে উঠেছিল। অতো বড় ধর্মের জন্মস্থানেই অতো অবনতি ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। সমাজটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। খড়দার মেলা, ফুলের মেলা, চড়কের মেলা, কুলুটির মেলা, পেনেটির মেলা, অনেক মেলা দেখেছি— গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। বারোয়ারি অভব্য নিশ্চয়, কিন্তু ও-রকম অভদ্র নয়। আমার ছাত্রাবস্থার বন্ধু জ্যোতিষ জেলেপাড়ার সঙকে ভদ্র করে তুলেছিল। অমৃতবাবু জ্যোতিষের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখে দিয়েছিলেন একবার। জানি না, এখন কেমন চলছে। দিল্লীতে যে শোভাযাত্রা হয়, তার মধ্যে ব্যঙ্গ থাকে না এবং সামাজিক ব্যঙ্গের ভেতর দিয়েই জনসাধারণের চাপা দুঃখ-কষ্ট দুর্ভোগের সামাজিক প্রকাশ সম্ভব হয়। একমাত্র Shankar's Weekly যথেষ্ট নয়। অবশ্য এই ধরনের সামাজিক মুক্তির মধ্যে ওপরকার শ্রেণীর চালাকি থাকে, বিরোধের বিষদাঁত এতে ভেঙে যায়, বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন কি আমরা বিপ্লব চাইছি? দিল্লীতে জেলেপাড়ার সঙ দেখালে মন্দ হয় না। রামলীলার কর্ম নয়। দেবাসুরের যুদ্ধ, সৎ-অসতের লড়াই একটু যেন বেশি রকমের অবাস্তব। আমাদের পার্লামেণ্টে যখন বাস্তব সমালোচনা সহজ নয়, তখন জেলেপাড়ার সঙের ওপরই নির্ভর করতে হয়

দেখছি। সরকারী কর্মচারী— ব্যুরোক্রেসিকে ঠাট্টা করার অমন স্থযোগ আর কি আছে? বিশেষত যখন আইন তাদের সাহায্য করছে। প্রত্যেক সঙ সামাজিক এবং anti-legal, anti-bureaucratic। সঙের হাসি মোটা, চওড়া, খোলা, ঠোঁট-বাঁকানো নয়— বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রূপ নয়, প্রাণখোলা হাঃ, হাঃ, হাঃ। ব্যাপারটা বেশ ডিমক্রেটিক অর্থাৎ mediocre— জমবে ভালো।

গ্রেহাম গ্রীন-এর লেখা অত্যন্ত আঁটসাঁট ; ভাষা ও গল্পের মিলন সম্পূর্ণ ; বেগে চলে পরিণতির দিকে। 'The Quiet American'-ই বোধ হয় আঁটের দিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ নভেল। একটি অবান্তর কথা নেই। গাঢ়-বন্ধতা বিস্ময়কর। তবু, আমেরিকান পাইল, যিনি নায়ক, যেন আবছা রকমের। বোধ হয় সেইটাই গল্পের ট্র্যাজেডি। তাঁর তুলনায় ইংরেজ ফাউলার নিতান্তই পরিণত, স্পষ্ট মূর্ত। ফুয়ঙ্— যিনি নায়িকা— হাল্কা অথচ দৃঢ় রেখা ও রঙে রচিত। উপভোগের স্তর তিনটি ; (১) এশিয়ার পটভূমিতে আমেরিকার কার্যকলাপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। ব্যাপারটা পলিটিকাল হয়েও পলিটিকাল নয়। এশিয়ার জটিল পরিস্থিতি, পাইল বুঝতেই পারে না। কেতাবী আদর্শবাদের তাড়নায় সে Third Force তৈরি করতে যায়, আবার সেইজন্যই সে ফুয়ঙ্‌কে বিয়ে করে আমেরিকান বানাতে চায়। দুটি ক্ষেত্রেই তার অক্ষমতা প্রমাণ হলো। বেচারি খুন হলো, আর ফুয়ঙ্ ফাউলারের কাছে ফিরে এলো। ফাউলার নিজেকে রিপোর্টার বলছেন, অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিউট্রাল। 'এ যুদ্ধ আমার নয়।' বুদ্ধিমান, পরিণত য়ুরোপীয়ানের মনোভঙ্গি এই রকমই মনে হয়। এইখানে য়ুরোপীয়-আমেরিকানের মনোভাবের বৈষম্য পরিস্ফুট। পাইল ধার্মিক (moral) আর ফাউলার বৈজ্ঞানিক ও sophisticated। (২) ফাউলারেরও ধর্ম আছে, নিজেকে রিপোর্টার অর্থাৎ সিনিক বললে কী হবে! এই ধর্মের সমস্যা হলো involvement— অর্থাৎ জড়িয়ে পড়বো কী না। হীরের মতন এর গোটা কয়েক ফ্যাসেট্ আছে। একটা হলো, দক্ষিণ এশিয়ার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের দলাদলি থেকে সরে দাঁড়ানো। গ্রীন এখানে অনেকটাই সার্থক। আরেকটি হলো ফুয়ঙ্, যাকে তিনি ছাড়তে চান না, যার জন্য স্ত্রীর কাছে ডাইভোর্স চান। স্ত্রী প্রথমে সম্মতি দিলেন না। পরে যখন দিলেন তখন পাইল খুন হয়েছে এবং ফাউলারের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। তৃতীয়টা হলো, পাইলের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর যোগ। সেটায় পুলিশ কেস্ ঠিক হয় না, তবু সে ব্যাপারে ফাউলার morally involved। চতুর্থ ফ্যাসেট হলো, পাপ ও

বিবেকের সেই ক্যাথলিক ধারণা। এটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে না বোঝার জন্য উপভোগে আমার কোনো বাধা হয়নি। গ্রেহাম গ্রীনের ইদানীংকার নভেল পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, তিনি ক্যাথলিসিজমের বাহ্য রূপ, আচার, আড়ম্বর, বিশ্বাস থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁচেছেন, যেখানে ব্যক্তিত্বের সার্বজনীন মূল্য তার সামনে জ্বল জ্বল করছে।

(৩) তৃতীয় স্তর নিছক সাহিত্যের। রিপোর্টার এখানে সাহিত্যিক। দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধের এমন অপূর্ব, সংযত বর্ণনা আমার চোখে পড়েনি।

ওদেশে পাকা ক্যাথলিক হয়েও যদি নভেলিস্ট হওয়া যায়, যেমন মরিয়াক, গ্রেহান গ্রীন— ঈভলীন ওয়াফ্‌কে ধরছি না, তিনি সমান স্তরের নন,— তবে এদেশে তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, সুফি নভেলিস্টই বা হবে না কেন? উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক গল্প, বৈষ্ণব ও সুফি কবিতা আছে। 'বিসর্জন'কে তান্ত্রিক নাটক বলা যায় কি? তারাশঙ্করের একটা ছোট নভেলের প্লটে তান্ত্রিক সাধনা স্থান পেয়েছে বটে, তবু যেন ঠিক বসেনি। বৈষ্ণবী নভেল না লিখতে যাওয়াই ভালো, একেই আমরা ভাববিলাসী। তান্ত্রিক নভেলের সম্ভাব্যতা খুব বেশি। কোনো কাপালিককে নায়ক করতে বলছি না, কিংবা কপালকুণ্ডলার অনুকরণও চাইছি না। তবে মনে হয় শক্তিমন্ত্রের মধ্যে (মন্ত্রশক্তি নয়) অনেক নাটক-নভেলের বীজ রয়েছে।

২৬ ১ ৫৬

নিজের দেহ নিয়ে অন্যে পরীক্ষা করছে দেখলে বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাসের চেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপর অবিশ্বাস হয়। বিজ্ঞানের বাহাদুরি চিরটা কাল শুনে এলাম, কিন্তু বেশি দেখলাম বৈজ্ঞানিকের, বিশেষত ডাক্তারের অসার্থকতা। কেন এমন হয় ভাবছি। মনে হচ্ছে, ব্যক্তির সজ্ঞান সহযোগ না থাকলে বিজ্ঞানই বা কী করবে, বৈজ্ঞানিক-ডাক্তারেরই বা দোষ কী! কেবল ব্যক্তির নয়, সমাজেরও সহযোগ প্রয়োজন। মাত্র রোগ সারানোকেই ডাক্তারি বিদ্যার চরম পরিণতি যে ভাবে, সে বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান।

শুনেছি প্রতি মানুষের বিশেষত্ব আছে, সেটা তার নিজস্ব, একান্ত unique……যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে জ্ঞানপ্রকাশ জোহরি মারা গেল। এত লোকে ভালোবাসতো তাকে, সত্যই ভালোবাসতো, কই কেউ তার যন্ত্রণার

এক তিল ভাগ নিতে পারলে না তো! মানুষের খাঁটি নিজস্ব সম্পত্তি যন্ত্রণা, তার অংশীদার কেউ হতে পারে না। যীশু কাল্পনিক অংশীদার, তাও যন্ত্রণার নয়, মানসিক পাপের। ধর্মের অনেকখানি আবেদন এই অংশীদারের সন্ধান, অবতার থেকে গুরুবাদ পর্যন্ত। যন্ত্রণার ভাগবাঁটোয়ারা হয় না, অথচ মানুষ চায় হোক। মিথ্যা চাহিদা— তাই ধর্মের মধ্যে অনেকখানি আত্মপ্রবঞ্চনা রয়েছে। জীবনে এই ধরনের দু'-একটা দামী জিনিস সোশ্যালাইজড্ হয় না দেখছি। অবশ্য তাদের ইতিহাস আছে।

বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রণা কমে, কিন্তু সোশ্যালাইজড্ হয় না। এই-খানে বিজ্ঞানেরও প্রবঞ্চনা। অসভ্য জাতির যন্ত্রণাবোধ কম, বিজ্ঞানের দৌলতে নয়, ট্রাইবালিজমের জন্যেও নয়। বাঙালির মেয়েকে প্রসবের তিন ঘণ্টা পর রান্নাঘরে ঢুকতে দেখেছি, আবার আধ মাইল দূর থেকে প্রায় সারারাত গোঙানিও কানে এসেছে। আর্থিক অবস্থার তারতম্যে এর ব্যাখ্যা হয় না। শিক্ষা, অভ্যাস, প্যাভলভ্— মানতে পারি, তবু যন্ত্রণা নিজস্ব। ভাগ্যিস্ আত্মা আমাদের নিজস্ব নয়, হলে ভাবতাম আত্মাই যন্ত্রণা।

সচ্চিদানন্দের আনন্দ কতটুকু?

খুকু (শ্রবণা) স্কুলের মধ্যবার্ষিক পরীক্ষান্তে দেখা করতে এলো। বয়স দশ কী এগারো। বছর দুই পরে ম্যাট্রিক দেবে। সাতটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। পড়তে হচ্ছে পঁচিশখানি বই। একে শিক্ষা না পীড়ন বলবো! সব বাচ্চাদেরই কি এই দশা? না আমার এই পচা তিন-পুরুষের অধ্যাপক বাড়িরই কেবল? বাঙালি মেয়েদের এই ধরনের শিক্ষায় বাংলার সর্বনাশ হবে। এত পাঠ্যপুস্তক পড়ে পরীক্ষা দিলে একটি বাচ্চা হবার পর যক্ষ্মা না হয়ে যায় না। ছোট্ট মেয়েকে দেখলে আমার মন যত বিষণ্ণ হয়, অতো বিষণ্ণ কিছুতে হয় না। মেয়েদের মা'রা বলেন কী মিষ্টি মুখ আর হাসি— আমি দেখি দুঃখ, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, ক্ষোভ, রোগ, শোক, অভিমান, অপরি-ণতির হতাশার চিহ্ন। বুদ্ধদেব অনেক কিছুই দেখেছিলেন— বাঙালি ছোট্ট মেয়ে তো দেখেননি, দেখলে সারনাথে ফিরতেন না, ঐ গয়াতেই প্রাণত্যাগ করতেন।

২৭. ৪. ৫৬

একটি মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে সন্দেহবাদ জন্মায় না। সেজন্য অন্তত দুটি বিরোধী মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া চাই। কেবল তাই নয়, দুটি শক্তিশালী দল বিপরীত সত্যকে সমর্থন করবে। সেই থেকে সত্য সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠবে— এবং তারই ফলে এপিস্টেমলজি— সক্রেটিস অর ডেকার্ট। বিদেশী ইকনমিক্‌সের ইতিহাস এই ধরনের প্রাথমিক তত্ত্বসন্ধান পেয়েছি। ভারতে মহাত্মাজীরই ছিল একমাত্র। তাই পাগলামি মনে হতো, এখনও হয়। প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের মতবাদের বৈপরীত্য থেকে কি কোনোপ্রকার epistemology of economics উঠবে না? পার্লামেণ্টের এবারকার বৈঠকে দু'জন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মুখ থেকে প্ল্যানিং সম্পর্কের আলোচনায় philosophy কথাটি বেরিয়ে গেল। রবিন্‌সের শিষ্যরা কী বলবেন জানি না! যে যাই বলুন না কেন, শেষে মানুষকে এমন অবস্থায় আসতে হয়; যেখানে প্রাথমিক প্রতিজ্ঞাকেই অস্বীকার করা ছাড়া গতি থাকে না। গান্ধীজী তাই করেছিলেন— তাঁর মনে গোটাকয়েক সাংঘাতিক প্রশ্ন জেগেছিল এই ইকনমিক্‌স সম্পর্কে। উত্তর দিতে পারেননি অবশ্য। তবু ব্যাপারটা সক্রেটিক। আমরা ছাত্রদের প্রশ্ন করি, তাইতে রোজগারও করি, কিন্তু সত্য বলতে কী, আমাদের মনে কোনো সন্দেহই ওঠে না। বড়ই বিশ্বাসী জীব আমরা। হয়তো কৃষ্ণও কারুর কারুর মিলেছে, কিন্তু এ-কালাবাজার মথুরার সে-কালার প্রেমের বাজার নয়।

আমার মনে প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টর— দুই সেক্টরের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উঠেছে। পাবলিক সেক্টরের দয়ায় কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কাঠামো খাড়া করা যায়— কিন্তু সোশিয়ালিজম্‌ না আসতেও পারে। আর সন্দেহ হয়েছে এই যে, প্রাইভেট সেক্টরের তাগিদ মুনাফা বৃদ্ধি নয়, আশা-মরীচিকা। এখানে সব বো, বে, বা-র খেলা— কালে সবই হবে, হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে, আবার হবে। কী যে হবে তা জানি না। হওয়ার নাম ক্যাপিটাল বৃদ্ধি। চীনেরা যখন ওষুধ কিনতে পেতো না, তখন প্রেস্‌ক্রিপশনটা জলে ধুয়ে সেই জলটা রোগীকে খাইয়ে দিতো। ফল যে হতো না তা নয়। আমাদেরও হচ্ছে। আমি চাই দেশের প্রত্যেক শিক্ষক আর যুবক সন্দেহশীল হোক। নতুন এপিস্টেমলজি না হলে নবজীবন জমে না— প্রমাণ ওদেশের সপ্তদশ শতাব্দীতে ছড়ানো। (মুঘল আমলের নবজীবনের পেছনে বৃন্দাবন গোঁসাইদের তত্ত্বজ্ঞান মনে হয় ছিল— কতটা ও কীভাবে জানি না। কে বলতে পারেন

তাও জানি না। যাঁরা দার্শনিক, তাঁরা ঐতিহাসিক নন এবং যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা রসতত্ত্বের ধার দিয়ে যান না পাছে ভিজে যান।)

২৮. ৪. ৫৬

ডাক্তার-বদ্যি দেখছে। আরো দেখবে। খরচের কূলকিনারা নেই। সরকারী বন্দোবস্ত, নিয়ম-কানুন না হলে কিছুই হবে না। রাশিয়ায় আমাকে পাঁচজন অধ্যাপক পরীক্ষা করলেন, কত প্লেট নিলেন, কিছুই খরচ হলো না। বিদেশী ও বিদেশী অধ্যাপক বলে বিশেষ খাতিরও দেখালেন না। ওখানকার রীতিই তাই। ক্লিনিকে আমার পূর্বে ও পরে দুটি গ্রামের মেয়ে ছিল, চাষীর ঘরের। ইংলণ্ডেও ডাক্তারকে টাকা দিয়েছি, এখানকার তুলনায় অনেক কম। ওয়েলফেয়ার স্টেটের সঙ্গে সোশিয়ালিস্ট স্টেটের পার্থক্যের জলজ্বলে প্রমাণ ডাক্তারিতে, রোগ ও রোগীর প্রতি ব্যবহারে।

আমার হঠাৎ মনে হলো এ-দেশে কোনো চালাক হাতুড়ে যদি মাত্র পেটেণ্ট ওষুধের মোড়কগুলি পড়েন, তা হলেই তিনি এক্সপার্ট নাম কিনে বত্রিশ টাকা ফী আদায় করতে পারেন। ক্যাপিটালিজমের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া এই পেটেণ্ট ওষুধের বিক্রিতে ও ব্যবহারে। ক্যাপিটালিজম বলতে আমরা ভাবি লোহা আর কাপড়ের কারখানা। কিন্তু ওষুধের ব্যাপারে ক্যাপিটালিজম হাজার গুণ বেশি মারাত্মক। পেটেণ্ট ওষুধ আর ইন্‌জেক্‌শন না দিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার হতে পারে না, রোগীদের পছন্দ হয় না। তাঁদের দেহ ও মন এমন হয়েছে যে, তা না হলে রোগও সারে না। মন পর্যন্ত দুষ্ট হয়েছে আমাদের। একেবারে বামুনে শয়তানী।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম। বরাবরই দুঃখকষ্টের সময়, পড়লে, লিখলে ভুলে থাকি। আগে পড়লেই চলতো, এখন কিন্তু কাগজ-কলম চাই। লিখি আর না লিখি, আঁচড় কাটি। খুব কম লেখকই যথার্থ সান্ত্বনা দিতে কিংবা যন্ত্রণার উপশম করতে পারে। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা যখন নিজস্ব বস্তু, তখন তার উপশম নিজের হাতে—অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে হাতের কাজে। মোক্ষ সাধনার একটা পাকা ভিত্তি দৈহিক সক্রিয়তা। বিধবাদের রান্না করা, ঘর মোছা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজগুলি কেবল ফিউডাল পরিবারের কর্তার নিষ্ঠুরতার চিহ্ন নয়। অকুপেশনাল থেরাপিতে কাজ হতে দেখেছি।

অন্তত এই হিসেবে শিক্ষক সম্প্রদায়ের শ্রমদানে আমি অবিশ্বাসী নই। একবার প্রায় বিশ্বাসী হয়েছিলাম। শ্রমদান সপ্তাহে জন বার-চোদ্দ

ছাত্রসমেত কোদাল দিয়ে একটা নালা চাঁছলাম। রাজ্যপাল আর মন্ত্রী আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এ হলো কী! নালা চাঁছার পর কোদাল হাতে ছবি তোলা, তারপর কিছু জলযোগ, তাতে বেশি খরচ হয়নি। কিন্তু যে মাটি চেঁছে খানার ধারে রেখেছিলাম, অর্থাৎ আমার তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা রেখেছিল, সব এক পশলা বৃষ্টিতে যথাস্থানে ধুয়ে এলো। আমার কপালে বিশ্বাস টিকে না— বিশ্বাস করেছি কী মরেছি। তাই জোর, 'মনে হয়' বলি, 'মনে এলো' লিখি।

এই প্যারাগ্রাফটি লিখে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

> What are the basic categories of the sociology of knowledge? Concepts represent interpretative responses to given situations. We are actually dealing with four variables: (1) the situation, such as a community, a nation, a revolution, or a class, which we attempt to interpret, when we respond to it; (2) the individual who is peculiarly involved in the situation and accordingly forms an image of it. Such involvements may include occupational aims, political aspirations, kinship ties, economic rivalries and alliances, in short, a multitude of overlapping group attachments; (3) the image which individuals or groups adopt; (4) finally, the audience to which the image is conveyed, including its peculiar understandings, symbols to which it responds. The four factors of ideation must be considered as inter-dependent variables.— Karl Mannheim: Essays in the Sociology of Culture. Introduction p. 2.

২৯. ৪. ৫৬

আজকার প্রধান খবর যদি লিখতাম, তবে ডায়েরি হতো। অবশ্য মনের ওপর খবরের ধাক্কার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, তার সম্বন্ধে মন্তব্য, সবই ডায়েরিতে চলে। আমি ঠিক ডায়েরি লিখছি না, যদিও ঐ ধরনের রচনার প্রতি

আমার একটু মোহ আছে। 'দাদার ডায়েরী' দিয়েই 'সবুজ পত্রে' আমার হাতে খড়ি। দেশী-বিদেশী বহু ডায়েরি পড়েছি, পীপস্ থেকে জীদ্, মার্সেল পর্যন্ত। আমিয়েল-এর জার্নাল আমি সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের কৃপায় পড়তে পাই। মাণ্ডালে জেলে অন্তরীণ বাসের সময় ভারত সরকার তাঁকে খান-কয়েক মূল্যবান বই পড়তে বাধা দেয়নি। (গ্যেটের Poetry and Truth, Conversations with Eckerman এবং কার্লাইলের Past and Present প্রভৃতিও তাঁর কাছে ছিল, মাণ্ডালে থেকে নিয়ে এসেছিলেন।) আমিয়েল খুব ভালো লেগেছিল মনে আছে। তার ওপর, আর্নল্ড-এর Essays in Criticism-এ যখন সুখ্যাতি পড়লাম তখন থেকে এই ডায়েরি পড়বার ও লেখবার ঝোঁক এলো। কেইসারলিঙ ও রবীন্দ্রনাথের ইদানীংকার রচনা একটু বেশি দার্শনিক। তবু চমৎকার। নিছক রিপোর্ট ও দার্শনিক ডায়েরির মাঝামাঝি অনেকখানি স্থান রয়েছে— আমি তারই মধ্যে ঘোরা-ফেরা করি।

দেহ-মন ঐ টাইম-স্পেসের মতনই ব্যাপার— যমজ গোছের, ডিপথঙ বলা চলে। খানিক দূর পর্যন্ত মন শক্ত করা যায় নিশ্চয়। কিন্তু দেহকে করায়ত্ত করবো যে ভাবে, সে দাম্ভিক অহংকারী। তা যদি সম্ভব হতো, তবে সাধুদের কর্কট রোগ, বহুমূত্র হতো না। শোনা যায় পরমহংসদেবের নিদ্রাবস্থায় তাঁর গায়ে যদি কেউ টাকা পয়সা ছোঁয়াতো, অমনি গায়ের সে জায়গাটা কুঁচকে যেতো। অথচ তাঁরও ক্যান্সার হলো, তাইতে তিনি মারা গেলেন। অতো বড় যোগীর যদি ঐ অবস্থা হয় তবে চলতি দেহ ও মনো-বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রতিজ্ঞাকেই অদল-বদল করতে হয়। আমার ধারণা, 'সোমা'ই ভিত্তি, সাইকী তার ওপর রং চড়ানো। কাঁচা বুনিয়াদের ওপর স্কাইস্ক্রেপার তোলা শক্ত। শুনেছি, রাইট সাহেব থল-থলে কাদার ওপর ইমারত খাড়া করেছিলেন টোকিওতে। সেই রকম হয়তো দু'-একজন যোগী ঋষি কাঁচা দেহের ওপর আত্মজ্ঞান খাড়া করতে পারেন। এটা কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের বাইরের ব্যাপার। আত্মজ্ঞানে মৃত্যুভয় হয়তো গেল, আরো অনেক কিছু হলো। কিন্তু যে যন্ত্রণায় মৃত্যু অনিবার্য, তার বেলা আত্মজ্ঞান অক্ষম। হিন্দু খ্রীস্টান আদর্শবাদ— এ একপ্রকার আদর্শবাদ ছাড়া আর কি?— পৃথিবীর জীবনের সংসারের অনেক নীরেট সত্যকে বুঝতে দেয়নি। অবশ্য সেজন্যও তাকে ত্যাগ করাও যায় না। এ যুগের হিন্দু ভারতবাসীর এই এক মানসিক দ্বন্দ্ব!

মানুষ বোধ হয় শান্তিস্থিতির জন্য একটা সিদ্ধান্ত চায়। ভূত, ভগবান,

অবতার, গান্ধী, অ্যারিস্টটল, একোয়াইনাস, পোপ, সর্দার, ডিক্টেটার, আদর্শবাদ, বস্তুবাদ, ইজম্— একটা না একটা তৈরি সিদ্ধান্ত পেলে অনেক আরাম। উইলিয়ম জেমস লেকচার দেবার সময় আবোল-তাবোল বকে গেলেন, শ্রোতৃবৃন্দের একজন শেষে প্রশ্ন করলে 'তা হলে আর আপনার সিদ্ধান্তটি কি?' জেমস উত্তর দিলেন, 'বিশ্বের কি অন্তিমকাল এসেছে যে, আমাকে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিতেই হবে?' এর মোদ্দা কথাটা হলো এই— সত্তা একটা প্রোসেস— স্থায়ু নয়, substance নয়। এই ভূত-বিজ্ঞানের আদিম প্রতিজ্ঞা। বুঝলাম— প্রোসেস মানে তো চলা? চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি— কিন্তু কতদিন মানুষ চলবে? শৃঙ্খলে বাঁধা গ্যালি-স্লেভের অবস্থা মানুষের। সেও স্থির নয়, স্থাণু নয়, কিন্তু কার নৌকো কে চালায়! অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের ঘুরপাক খাওয়ার মতন— কাফকার 'কে'র মতন।

৩০. ৪. ৫৬

খাশা বন্দোবস্ত ডাক্তারদের। কথাবার্তা বন্ধ, চা-সিগারেট বন্ধ, বিদেশ যেতে হবে অস্ত্রোপচারের জন্য। মা বলতেন, দশ বারো বছর পর্যন্ত নিরীহ ছিলাম— সত্যেনও (বোস) বলে ঐ বয়সে ভীষণ লাজুক ছিলাম। হয়তো ছিলাম। তাহলেও পঞ্চাশ বছর কথা কইছি, অনর্গল, দিনে দশ-বারো ঘণ্টা নিশ্চয়, স্বপ্নে বক্তৃতা দেওয়াটা ছেড়েই দিলাম। আর সিগারেট-চা-কফির ইয়ত্তা নেই। হিসেব এই রকম: দিনে পঁচিশটা সিগারেট চল্লিশ বছর, তিন কেৎলি চা— পেয়ালা হিসেবে যারা খায় তারা ডিলেটান্ট— প্রায় বিশ বৎসর, আর কফি দু' কেৎলি প্রায় পনেরো বছর। অতএব আপসোস নেই। ভগবানের রাজ্যে ন্যায়বিচার নেই কে বলে! কিন্তু বেচারা লপচু কোম্পানি আর কফি হাউস কী দোষ করলে? এটা বোধ হয় চা-কফি বাগানের শ্রমিকদের অভিশাপ।

যে মানুষ ট্রাউজারসের ক্রীজ, ধুতির কোঁচা, পিরানের রং, কলমের কালি, লেখবার কাগজ, বই সাজানো প্রভৃতিতে ঈষৎ অদল-বদল হলে রসাতল করে, সে মানুষকে সংকটের সময় পাথর হয়ে যেতে দেখেছি। আবার শক্ত-সমর্থ লোক মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কেঁদে আকুল। আমার ধারণা, ছোটখাট্ট ব্যাপারে নার্ভাস হওয়া ভালো, শক্তি সঞ্চিত থাকে বড় ব্যাপারের জন্য। যদি বড় ব্যাপার না ঘটে তবে অবশ্য সবই বরবাদ। কিন্তু সত্যই তা

কি? Fussiness-এর একটা সামাজিক মূল্য আছে। নতুন বৌকে নিয়ে fuss না করলে বেচারির অভিমান হয় না? বুড়ি ঠাকুমা মারা যাচ্ছেন, অর্থাৎ গিয়েও যাচ্ছেন না— এক্ষেত্রে নাতি নাত-বৌদের fuss করা ছাড়া আর কী কর্তব্য বুঝি না। বড়গিন্নির চাবি হারিয়েছে, ছোটগিন্নির নেল-পালিশ পাওয়া যাচ্ছে না, ওধারে মেজগিন্নির চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর সেজগিন্নির অম্লশূল চাগাবো চাগাবো করছে। নাতির জন্য মাগুর মাছ আসেনি, এ সব নিয়ে চেঁচামেচি না হলে সংসার কিসের? Fuss করো না, worry করো না উপদেশ ঝেড়ে আমেরিকার পত্রিকা খালাস— কিন্তু না করলে সমাজ চলে না, পরিবার রাখা যায় না, সংকীর্ণ অর্থে তো অসম্ভব। না, না, ওয়ারি, ফাস, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক বস্তু। বাড়াবাড়ি না করলেই হলো— অর্থাভাবে কেই বা করছে! তার ওপর ঘুমের ওষুধ তো রয়েইছে। রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে কী fussটাই না করলেন! কিন্তু না করলে রামায়ণ ও মেঘনাদ বধ লেখা হতো না, আর রামরাজ্য পরিষদও তৈরি হতো না।

এই সব নানা কারণেই পার্শি থিয়েটারের পৌরাণিক ড্রামার মধ্যে একটা কমিক থাকতো। ভূমাতে আনন্দ, কিন্তু ছোটতে মজা। সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নেই, তার কারণ তাঁরা জ্ঞানী ছিলেন। রসতত্ত্ব নিয়ে অতো fuss না করলে নিশ্চয় বহু অপাঠ্য ট্র্যাজেডি ও নভেল লিখে ফেলতেন।

আজকাল অর্থশাস্ত্রীরা তুচ্ছ ব্যাপারে fuss করছেন বলেই না উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির হার তাঁদের অজানিতে অতোটা বেড়ে গেল! আমার তো মনে হয় fuss-এর জন্যই আমরা বেঁচে আছি, নচেৎ সব ক্যাল্‌ভিনিস্ট হয়ে যেতাম।

সে যাই হোক, কথা বন্ধ তো মনও বন্ধ হোক। যা নিয়ে কথা কওয়া যায় না, আড্ডা-আসর জমানো যায় না, তার অস্তিত্ব মন স্বীকার করে না। ব্রহ্ম আছেন, কারণ তাকে নিয়ে মজলিস হয়— প্রমাণ উপনিষদ আর ঋষি-দের সভা। আর ভগবান তো রয়েইছেন, প্রমাণ ধর্মব্যাখ্যা কীর্তন ইত্যাদি। ডাক্তারের উপদেশগুলোকে গম্ভীরভাবে নিতে পাচ্ছি না।

ইতি—ধূর্জটিপ্রসাদ

ঝিলিমিলি

উৎসর্গ

টেডিকে

খুকুদা

মুখবন্ধ

'ঝিলিমিলি' অর্থাৎ আলো পড়েছে স্ফটিকের ওপর, আর তাইতে রং খুলেছে। অনেক রকমের রং, বেগুনি থেকে লাল পর্যন্ত, কিছু আবার আবছা-আবছা। বাহার খানিকটা আছে, হয়তো কম। বাহার খোলে পাঠকের চোখে; চোখ না থাকলে খুলবে না। আবার যদি স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙে, তবু মন আছে বলে সেটা 'সুদৃশ্য'। অতএব মনের বাহাদুরি খুবই। পাঠকের মন যদি না থাকে, তবে 'ঝিলিমিলি' হবে পরকলা।

'ঝিলিমিলি' কিন্তু ঠিক 'মনে এলো' নয়। 'মনে এলো' নিতান্ত পুস্তকাশ্রিত, বই পড়বার ঠিক পরের লেখা— এমন-কী সমসাময়িকও বলা চলে। সেখানে বই-এঁর কথা ও চিন্তা জুড়ে রয়েছে। 'ঝিলিমিলি'তে বই নেই বলছি না, আছে। কিন্তু বই পড়ার অনেক পরের কথা এতে স্থান পেয়েছে। এই কালাতিপাতের জন্য কিছু চিন্তার খোরাক পেয়েছি। অবশ্য চিন্তা মানে সারিবদ্ধ চিন্তাধারা নয়; মনের গোকুলে কখনো কখনো যে কথা উঠেছে, তাই লিখেছি। বেশি বাড়ালে থিসিস হয়ে যেতে পারত। অতটা কালক্ষেপণ করা বোধ হয় উচিত হতো না। তারও যথেষ্ট মূল্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু সেটা এখানকার উদ্দেশ্য নয়।

আর একটি বক্তব্য: অত বিভিন্ন বিষয়ে মনযোগ দিই কেন প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথম জবাব আগেই দিয়েছি— এই আমার স্বভাব। অর্থাৎ আমি যাঁদের সঙ্গে ঘর-বসত করেছি, যে-যে ধরনের যা যা বই পড়েছি ও পড়িয়েছি, সে সব আমার মনে আঘাত করেছে। অতএব এগুলি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। সোজা কথা এই, নিজেকে ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ করতে মন চায় নি। দ্বিতীয় কথা এই: অন্তত বিভিন্ন সামাজিক চিন্তাগুলিকে আমি গ্রথিত একত্রিত সমন্বিত করতে চেষ্টা করেছি। এটা দুঃসাহস, এক প্রকারের দম্ভ। সামাজিক যোগসাধন করতেও পারিনি। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিনি, সহজ ভাবেই সে চেষ্টা করেছি। এক হিসেবে ঠিক চেষ্টা করিনি, সহজে যতটা হয়, ততটা হয়ে গেছে। অবশ্য বেশির ভাগই হয় নি। তবে এই একত্র সমা-

বেশের আন্তরিক ইচ্ছাই হলো আমার প্রথম ও শেষ কার্যকরী মনোভাব। তাই বহু জিনিস জুটে গেছে।

আমার শেষ বক্তব্য : তারিখ অনুসারে লেখবার উদ্দেশ্য প্রধানত পৃথক ভাবে সাজানো, যদি না দার্শনিক কিংবা সাহিত্যিক রোজনামচা না হয়। আমার উদ্দেশ্যই অন্য রকমের, অতএব প্রত্যেকটির ভিন্ন রূপ দিতেই হবে। অবশ্য সব জায়গায় তা পারিনি ; একই রকমের কথা এসে গেছে, যথা সঙ্গীতে। তা ছাড়া, একটি গোপন সূত্রও আছে। সেটা পাঠকরাই বার করুন না! যদি তাঁরা খুঁজে না পান, তবে আমি হয়ত বলব যে ছ-খানা পুরোদস্তুর বই ছাড়া আমার ষোলখানি বই 'ঝিলিমিলি'রই রূপান্তর।

আমার ভাই অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ ও ছেলে কুমারপ্রসাদ লেখার সময় আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

৩১শে অগস্ট
১৯৬১

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদের অনুরাগী পাঠকদের কাছে একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে। গ্রন্থরচনার শেষ তারিখ ২১. ২. ৬০ ; ঐ বছর গ্রীষ্মকালে প্রকাশকের তরফ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বইখানি প্রকাশ করতে বিশেষ উৎসুক হন। কথা হল, 'ঝিলিমিলি' কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হবে, তারপর গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবে। এখানেই বছর খানেকের ওপর দেরি হয়ে গেল। অবশেষে মণীন্দ্র রায় উৎসাহিত হয়ে 'অমৃত' পত্রিকায় বইখানি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপলেন। শেষ হলো ১৯৬১, অগস্ট মাসে। তখন মূল রচনার যে অংশগুলি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশকালে বাদ দেওয়া হয়, সেগুলি পুনর্যোজিত করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বেশ কিছু সময় গেল। ইতিমধ্যে পূজার সময় থেকে গ্রন্থকারের চরম স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ১৯৬১, ৫ই ডিসেম্বর তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তারপর প্রায় চার বছর বাদে এই বই অবশেষে প্রকাশিত হলো। নানা কারণবশত এই যে বিলম্ব, তার জন্য সকলেই দুঃখিত।

'ঝিলিমিলি' অসুস্থ অবস্থায় লেখা। কুমারপ্রসাদ ও আমি উভয়ে চেষ্টা করেছি, যাতে অনবধানতার ত্রুটি না থেকে যায়। মুখবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ 'ঝিলিমিলি'তে তাঁর বক্তব্য এবং সমগ্র মানস ও রচনা-ভঙ্গি সম্পর্কে মন্তব্য করে গেছেন। সুতরাং ঐগুলি তাঁর শেষ কথা বলে ধরে নেওয়া যায়।

৩০. ১০. ৬৫ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৩. ৫. ৫৭

এক বছর কাটল। কেমন ভাবে ঠিক জানি না। এই না-জানার মধ্যে বুদ্ধির অংশ নেই। তার অতিরিক্ত কী আছে, তাও জানি না। ভগবদ্ বিশ্বাস এখনও জন্মাল না। অন্য লোকের পক্ষে ব্যাপারটা বিশ্বাসেরই অন্তর্গত মনে হয়। মা-ঠাকুমা অভ্যাস তৈরি করেন। আর না হয়, বিপদে পড়ে বিশ্বাস জন্মায়। আমার মনে এমন কোনো বিশ্বাস তৈরি হয়নি। মা-ঠাকুমা, বাবা-কাকা কিছুই শেখান নি? এবং বিপদ? সেটা মৃত্যুকালীন বিপর্যয়ের মধ্যেও এমন কোনো ভীতিপ্রদ আশঙ্কায় উপস্থিত হয় নি, যার কৃপায় ভগবানের প্রতি প্রত্যয় সৃষ্ট হয়। বোধ হয়, বিপদ আরো ঘনাবে। হয়তো বিপদ থেকে সহজে অকুতোভয়ে উত্তীর্ণ হবো। এ সম্বন্ধে জানবার কোনো আগ্রহ নেই।

সাধারণত হিন্দুদের মধ্যে দেবদেবীতে বিশ্বাস আছে, কিন্তু ভগবানের ওপর বিশ্বাস নেই বললেই চলে। আর যদি থাকে তো নিতান্ত নৈর্বক্তিক অ্যাবস্ট্রাক্ট ধরনের। ভগবানের প্রত্যয় হলো রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির মাধ্যমে। পরে এক হয়ে যায়, যেমন গান্ধীজীর বেলায়। অন্য ক্ষেত্রে ততটা নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রথমে উপনিষদের ব্রহ্ম, পরে মানুষে পরিণতি। দুটোর মধ্যে মিল পাই না। আমাদের বেলা ঐ দেবদেবী পর্যন্ত।

মনোবিকলনের মতে ধর্মের আদিতে ভয়, পরে পাপবোধ। হিন্দুদের ও-সব বালাই নেই। আমার মনে অন্তত পাপজ্ঞান নেই। কখনও পাপী হয়েছি বলে মনে পড়ে না। অন্যায় করেছি নিশ্চয়ই, কিন্তু সে জন্য পাপী কখনও হইনি। অন্যায় না করলে হতো নিশ্চয়। কিন্তু অন্যায় করেছি ভেবে নিজেকে পাপী ভাবিনি। মনোভাব আমার নিতান্ত নর্মাল।

পাপবোধ না থাকার দরুণ সংস্কৃত সাহিত্য নিরঙ্কুশ হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতে, সাহিত্যে-নাটকে সমস্যা আছে নিশ্চয়। কিন্তু য়ুরোপীয়ান সাহিত্যে সমস্যার আদিতে পাপবোধ যেন জমাট বাঁধা। এক হিসেবে আমাদের সমস্যার যেন ধার নেই। যতটুকু আছে, ততটুকু সমাজজ্ঞান এবং

সেইটুকুই হলো ধর্ম। তার অতিরিক্ত যেটা, সেটা আমাদের নয়। তার নাম 'evil' এবং তারই কারসাজি। আমাদের ধাতে 'evil' নেই। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তির সঙ্গে বিরোধ ছিল। এবং সেটাও এক রকমের 'evil', 'eumenidies'-এর বিপক্ষে। কিন্তু নিয়তির বিপক্ষেও বিরোধ না থাকার দরুণ ভারতে ট্র্যাজেডি খুলল না, এবং আমার মনেও জমল না। বোধ হয়, সেইজন্য জীবদ্দশায় বিশেষ কোন ভয় পাই না। মৃত্যুতে 'মিসট্রি' আছে, ভয় নেই। অদ্ভুত হিন্দু সংস্কার।

২০. ৫. ৫৭

খ্রীস্টান-দর্শনে essence আর existence-এর বিরোধ খুব জটিল। সেটা প্রায় হাজার বছর চলেছিল। মধ্যে সরে গিয়েছিল, এখন টোমিস্টরা এবং এক্জিসট্যানশিয়ালিস্টরা চালাচ্ছেন। কোন্‌টা পূর্বের, কোন্‌টা পরের? আমার ধারণা— সত্তাই প্রধান, যদিও process-টা, ক্রিয়াশীলতা, এতে আটকায়। স্বভাব হলো বুদ্ধিসম্মত নিদান, সত্তা তাই থেকে জন্মায়। আমি আছি, এই আমার প্রথম জ্ঞাতব্য, প্রথম ভবিতব্য, তারই ফলে বিমূর্ত প্রত্যয়। যদি স্বভাবকে প্রধান, প্রথম ও একান্ত ভাবতাম তাহলে নতুন সৃজন সম্ভব হতো না। যা ছিল তারই প্রকাশ হতো, তারই সম্ভাব্যতা থাকত, তাইতেই শেষ হতো।

নতুন কিছু হয় কি না? এইখানেই process-এ বিশ্বাসী হতে হয়। কখনও কখনও একেবারে নতুন দেখা যাচ্ছে।

Essence (সত্তা) আর Existence (স্বভাব) ছাড়া অন্য প্রত্যয়, process, (চলন্ত ক্রিয়াশীলতা) রয়েছে। এমন কী process ছাড়া অন্য কিছু নেই মনে হয়। যাকে constant (সনাতন) বলি, সেটাও চিরন্তন নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে কিছু নেই। স্থায়ীর মধ্যেই গতিশীলতা রয়েছে।

অর্থাৎ essence আর existence-এর বিরোধ এ যুগের নয়। এ-যুগের সমস্যা process-এর।

২১. ৫. ৫৭

আমার ধারণা যুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা চলবে না, কারণ তাতে

পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ গেল-গেল ভাবটা দেখাতে হবে। এই হোল brinkmanship। সেই সঙ্গে শান্তিমূলক পারমাণবিক চেষ্টাও চলছে ও চলবে। কোন্‌টা বেশি চলছে? যেন মনে হয় যুদ্ধের দিকটা দ্রুতভাবেই এগুচ্ছে। যুদ্ধ চালাবার জন্য যে খরচাপাতি হচ্ছে, তাই দেখে মনে হচ্ছে যে লোকসানের ভাগটা অত্যন্ত বেশি। খরচ না থাকলে অবশ্য সবটাই লাভ হতো। অথচ যুদ্ধ না থাকলে শান্তি আসত না। যুদ্ধ আর শান্তি— এ-দুটির দ্বৈত সম্বন্ধ। আর্থিক আর সামরিক ব্যাখ্যার কোনোটিকে ত্যাগ করা যাচ্ছে না। উনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণ-সুযোগে আর্থিক ব্যাখ্যার জয় হলো। আমরা অত্যন্ত র‍্যাশনাল হলাম। এ-যুগে আমরা ইর‍্যাশনাল হয়েছি, তাই সামরিক ব্যাখ্যা প্রধান মনে হচ্ছে। সকলে যদি সোশিয়ালিস্ট হয়ে যায়, তবে সামরিক ব্যাখ্যা আপনা থেকেই উঠে যাবে। ইতিমধ্যে তাই চলবে এবং তারই ফলে, অনেক দিন, বহুদিন পরে, বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি পারমাণবিক বোমার চেয়ে কার্যকরী হবে। যদি না ইতিমধ্যে আমরা উন্মাদ হয়ে যাই।

৬. ৭. ৫৭

আজকাল মনে হয় যে, মনের ভেতর থেকে কথা উঠছে। আমার কথা? খানিকটা তাই, খানিকটা নয়। এক এক সময় কথা অস্পষ্ট। অ-রূপ, চেষ্টা করলেও রূপ ফোটে। তখনও রূপ যায় বদলে। যা মনে ছিল সেটা হলো 'মনে এলো'। কথার সাহায্যে রূপ? বাক্য বিনা অর্থ? কখনও কখনও বাক্যহীন রূপহীন শব্দ মনে ওঠে। শব্দও নয়, অমনই অনাহত। বেশির ভাগ লোকের তাই হয় নিশ্চয়। কথাই পরে আসে। ভেতর থেকে জন্মালেই সাবজেক্টিভ হয়ে ওঠে না। সাবজেক্টিভ-অবজেক্টিভ কথাগুলির মানে নেই। একই স্তরের ভিন্ন দিক। আমার কিন্তু মনে হয় স্তর এক, দিক অন্য। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অস্তিত্বে অপূর্ণতা থাকে; অস্তিত্ব হলো পূর্ণ।

২১. ৮. ৫৭

General Education সবেমাত্র আরম্ভ হচ্ছে। সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক (humanities) এইভাবে ভাগ করা হলো। ভাগের পর কীভাবে

জোড়া দেওয়া হবে? এতে সমস্যার সমাধান হয় না।

একটা গোড়ার কথা: প্রথম জীবনে প্রাথমিক সমস্যা থেকে ওঠাই ভাল। তার সমস্যা তার পর, তার আগে নয়। ধরা যাক, সর্বপ্রথমে ছাত্র তার বাবা-কাকাদের গুড়ের ব্যবসায়ে জন্মেছে। ব্যবসার খানিকটা সে জেনে নিলে। তার পর গুড় থেকে আখ, আখ থেকে জমি, ক্ষেত-খামার, তারও পর উদ্ভিদ্-বিদ্যা— এই রাস্তায় চললো। চলতে চলতে জ্ঞান-বৃদ্ধি হলো। পরে ধারণা ও প্রত্যয় জন্মাবে। এই উপায়ে জ্ঞান বাস্তব হয়, নচেৎ জ্ঞান হয় প্রত্যয় এবং প্রত্যয় হয় শুকনো।

এই ধরনের কথা জনকয়েক কর্মীদের বললাম, কিন্তু কেউ শুনলে না। আমার আগ্রহ গেল কমে। মৌলিক শিক্ষা দেশে জমছে না কেন? আমাদের শিক্ষার দোষ হলো প্রত্যয়বাদ, সে-শিক্ষার গোড়া থেকে শেষ অবধি প্রত্যয়। বাস্তব জীবনযোগ থেকে প্রত্যয় আসবে, তা না হয়ে উল্টোটা। এই জীবন-সংযোগ, life-crien ation-এর ভিত্তি সামাজিক, তার অভাবে আমাদের শিক্ষা নিতান্ত অ-সামাজিক হয়ে গেছে। General Education নিয়ে কি হবে? সবই থিওরি! আর না হয় নিছক তথ্য, জেনারেল ইনফরমেশন।

২. ৯. ৫৭

ভারতবর্ষের মহামানবদের জীবনী-লেখা অত্যন্ত অ সম্পূর্ণ ব্যাপার। উত্তরাধিকারসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকালের জীবনীতে বাপ-মা সম্বন্ধে দু-চারটি কথা থাকে। বিদেশে কিন্তু অন্য রকম। সেখানে তিন পুরুষ ত থাকেই, তার বেশি পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়। অথচ এ-দেশে কুলজী-সাহিত্য রয়েছে অনেক দিন থেকে; সেখানে বিবাহ, পৌরোহিত্য ও শ্রাদ্ধ-পরম্পরা আছে। কিন্তু পিতা-মাতার কৃষ্টি-পরম্পরার খবর নেই। গোষ্ঠীর পদ-গৌরব নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু তার ঘাত-প্রতিঘাত নেই। গান্ধীজীর বাবা, রবীন্দ্রনাথের মা— এঁদের কোনো হিসেব নেই; অথচ তাঁরা ছিলেন। সংসারের চাপে তাঁরা ছিলেন সাধারণ, কিন্তু সাধারণ জীবনের কী কোনো ইতিহাস নেই? ছোট মা, ছোট বাবা নিয়ে কী অ-সাধারণ জীবন চলে না?

২০. ১. ৫৮

বহু পূর্বে 'মনোবিজ্ঞান' নাম দিয়ে 'উত্তরা'য় একটা গল্প লিখি। অসিত হালদার— আমার বহু পুরোনো বন্ধু রাগ করে চাঁদা ফেরত নিলেন। লিখেছিলাম ফ্রয়েডের বিপক্ষে, ভাবলেন স্বপক্ষে। ফ্রয়েড নিয়ে লিখেছি এত বাড়াবাড়ি, পছন্দ হয়নি। এখনও হয় না। অসিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রইল। তবু এখন আশ্চর্য লাগে, তার এত রাগ কেন হয়েছিল। এটাই কী ফ্রয়েডিয়ান ব্যাখ্যা? চল্লিশ সালের ঘটনা আমার মনে হঠাৎ এলো কেন? আঘাত পেয়েছিলাম বলে?

২১. ১. ৫৮

একটি ছোট গল্পের প্লট মনে এলো। এক বিধবা মায়ের চার মেয়ে। তিনটির বিবাহ হয়েছে সুবিধের নয়, ছোটটির হয়নি। অনেকদিন হয়ে গেল তবু বিয়ে হচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করেও হচ্ছে না। কারণ কি? মা চেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়েছেন। মায়ের অসুখ করে, প্রত্যেকেরই অসুখ করে। গল্প এইটুকু। এই থেকে আরম্ভ···শেষে মেয়েটিকে মা একদিন খেয়ে ফেললেন। কোথাও পড়েছি কি?

দু-রোখা জামিয়ার; একটা সোজা অন্যটি বাঁকা। এই ধরনের লেখা ভাল লাগে। শরৎচন্দ্রের 'সতী'।

২২ ১. ৫৮

বই পড়ার স্বভাব বদলেছে। খুব অল্প বয়সে বই গিলতাম। তারপর পড়তাম, অনেকটা না বুঝে। তারও পরে পড়তাম ও বুঝতাম, সঙ্গে সঙ্গে। সেটা বয়সের সঙ্গে, সতীশ চাটুয্যে ও প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদে। কখনও বা পড়ার চেয়ে বেশি বুঝেছি, এই সময় বই লিখি। কিন্তু গড়পড়তা বেশি বোঝার চেয়ে বেশি পড়েছি। যা লেখা হয়নি, তার সংখ্যাই বেশি। সেগুলো কি হলো? সব ভুলে গেলাম? তা অবশ্য হয় না, কিছু থেকেই যায়। তথ্য নয় নিশ্চয়। জ্ঞান, 'উইস্‌ডম' কতটা থাকে জানি না। বিস্তর জিনিস ভুলে যাই, প্রায় সব। কিন্তু একটা পলি পড়ে থাকে সন্দেহ হয়। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অনেকটা কমেছে, কিন্তু বুদ্ধির শেষে একটা কিছু থেকেই যায়। কথাটা সামান্য কিন্তু সামান্যটাই মনে থাকে। অতগুলি ক্যাসিরার পড়লাম,

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, কৃষ্টির পদ্ধতি, জ্ঞানের পদ্ধতি, ইতিহাস, সৌন্দর্য-জ্ঞান, সব কিছুই দেখলাম, দাঁড়াল সেই প্রতীক-কল্পনায়। প্রতীক সম্বন্ধে আরও একাধিক বই পড়লাম, কিছু চিন্তাও করেছি, ক্যাসিরারের রচনায় নতুন কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছি। কিন্তু মোটামুটি যেটা, সেটা সামান্য। যৎসামান্য নয়, সামান্য। পূর্ববর্তী প্রতীক-কল্পনার বুদ্ধিধারা নিশ্চয়ই খুলেছে। তৎসত্ত্বেও এই বয়সের পর, নতুন বিপ্লবী চিন্তার সাক্ষাৎ পেলাম না মনে হয়। সামান্যটা গড়ে ওঠে যুগের পর, একজনের দয়ায় না। ব্যাপারটা মনে হয় সর্বসাধারণের ; তাদেরই হাতে ভাঙে-গড়ে, ওঠে-নামে।

তবু বলি, ক্যাসিরারের মতন জনকয়েকের লেখা আবার পড়তে ইচ্ছা হয়। চাহিদা আমার মিটল না।

২৩. ১. ৫৮

কবিতায় সুর বসান উচিত? ইয়েট্‌স বলতেন— নয়। তাঁর ছন্দ অপূর্ব কিন্তু পিচ্‌ ছিল না। কবির ভাবকে গানে অনুবাদ করা বৃথা— ইয়েট্‌সের মতে। অর্থাৎ কবিতার ছন্দকে সঙ্গীতের ছন্দে পরিণত করা অন্যায়।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় সুরে বসান চলে। রবীন্দ্রনাথের গানে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য দুটি মুহূর্ত আছে— এক, কবিতা ও সঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী মিলন। আর দ্বিতীয়,— কখনও কবিতা প্রথম, পরে সুর ; আবার কখনও সুর প্রথম, কবিতা পরে। একটি মুহূর্তের অঙ্গাঙ্গী মিলন নিতান্ত কম, আমি রবীন্দ্রনাথে তা পেয়েছি। বেশির ভাগ সময়ে কবিতা প্রথম, পরে সুর। পরে সুর আসা সময়-সাপেক্ষ। প্রথমে সুর আসবার সময় একটা গুনগুনানি ওঠে। অ-জানিত অবস্থা থেকে ওঠে মনে হয়, কিন্তু জানিত সুর থেকেই আসে। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে জানিত সুরই বেশি, যদিও রবীন্দ্রনাথের বেলা খানিকটা নতুন। গুনগুনানির ওপর জারিজুরী। কোন্ শব্দ, কোন্ ছায়া, কোন্ ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে, দেখতে হয়। রেডিওতে খুব কমই ধরা পড়ে। হিন্দী ও উর্দু কবিদের আড্ডায় আরো কম। সুর ও কথা যখন এক হয়, তখনই লাগডাঁট।

ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বে কবিতাই সঙ্গীত। কবিতায় সৌন্দর্যতত্ত্বের ছড়াছড়ি। সঙ্গীতে তা নেই, অন্তত আমার জানার মধ্যে নেই। এক অবশ্য 'সুহৃদয় হৃদয়বেত্তা' রয়েছেন। সর্বত্রই রসিক বিদগ্ধজনের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু সঙ্গীতরসিক নেই বললেই চলে। সঙ্গীতশাস্ত্রের শাস্ত্রাংশ ছেড়ে দিলে, রসের

দিক থেকে যেন কিছুই থাকে না। অবশ্য শুদ্ধ সঙ্গীতে কাব্যরস নেই কিন্তু অর্থসঙ্গীতে থাকতে বাধ্য। সেটা নিয়েই বা কতটুকু কাজ করা হলো?

২৯. ১. ৫৮

মন নেওয়া-দেওয়া চলে না; হয় নেওয়া, না হয় দেওয়া। তাও আবার নেওয়াই হয়, দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। স্বার্থপর? বোধ হয় তাই। নিজত্ব-বস্তু একটা থাকা চাই। সামাজিক লেন-দেন সমান-সমান নয়। একজন অন্যের চেয়ে বেশি; সেই বেশিটাই স্বার্থপর।

৩০. ১. ৫৮

এ বছর শীত এলো না দেখছি। আলিগড়ের নুমায়েস-এর সময় বৃষ্টি পড়বেই পড়বে, শুনতে পাই। এবার কী হয় দেখা যাক। সারা বছর এই ক'দিনের নুমায়েস-এর জন্য আলিগড়ের লোক অপেক্ষা করে। ছেলেমেয়েদের কী ফুর্তি! দলে দলে লোকজন চলছে। বেশ লাগে। পাড়াগাঁয়ের ও নিম্ন-বিত্তশ্রেণীর লোকেরাই কেনে, বড়লোকেরা দিল্লী-লক্ষ্ণৌ থেকেই জিনিসপত্র আনে। শহরে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, কিন্তু উগ্র নয়। মুসলমানদের ভেতর শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষাকৃত কম মনে হয়। সামাজিক ডিমক্রেসি মুসলমানদের ভেতর একটু যেন বেশি। খাওয়া-পরা যেন এক। আমার ড্রাইভার ব্রাহ্মণ, অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু আমার মুসলমান বাবুর্চির সঙ্গে এক কোঠায় থাকে, ভিন্ন ঘরে। পৃথক হয়েও মিল, মিল হয়েও পৃথক নয়। এখন ত তাই দেখলাম। অনেক আগে এই ছিল; গত পঞ্চাশ বছরে অন্য হয়েছে।

মধ্যে ড. ব্যানার্জির বাড়ি যাই। বিস্তর রেকর্ড আর বিস্তর ফণীমনসা দেখলাম। অদ্ভুত লাগল! পুরোনো রেকর্ডের মধ্যে গহরজানের গান শুনলাম, ঠিক তেমনটি আর জমল না। আর কত রকমের ফণীমনসা! একজন বললে ভারতবর্ষে নাকি অত ক্যাক্‌টাস-এর সংকলন আর কারও নেই। একটা বড় ফুল দেখলাম, সাদা ফুল। আমার লক্ষ্ণৌ-এর বাগানে প্রায় পঁচিশ বছর পর ফুটেছিল। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এলো, অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের গান শুনলাম। নোটেশন থেকে সুর তোলা হয়েছে।

আচ্ছা, লজ্জা আসে কেন? সহজ নয় বলে? আজকাল মিশতে পারি না, আগে পারতাম, অত্যন্ত সহজে। ফর্স্ট'র ব্যক্তিগত সম্বন্ধ চান; পান না বলে, না, পারেন না বলে? বয়সের সঙ্গে সহজভাবটা কমে যায়।

১. ২. ৫৮

ধরা যাক, গল্পের ছাঁদ নেই, চরিত্রের আমেজ নেই। কেবল ঘটনা চলেছে, সময় অতিবাহিত হচ্ছে। গল্প লেখকের মন একজোড়া চোখ যেন চাইছে না, যেন একটা সমগ্র চোখ চাইছে, এবং সেই প্রকাণ্ড বিশ্বজনীন চোখ প্রতি জিনিসটি লক্ষ করে; বিষয়, আকার-প্রকার, আকাশ-বাতাস, তার প্রত্যেক বস্তুকে রূপ দিচ্ছে। অথচ তার কোনো গুণ নেই, কোনো ভাব নেই। পাঠকের মনে এই বিশ্বজনীন চোখকে ফুটিয়ে তুলতে হবে উপস্থিতির দ্বারা, অর্থের সাহায্যে নয়। নব্য বাস্তববাদে এই ধরনের কথা পেলাম।

উপস্থিতির মধ্যে অর্থ থেকেই যায়, অর্থ থাকতে বাধ্য। অবশ্য লুকিয়ে রাখাই ভাল, নচেৎ ধর্মের আকার ধারণ করবে।

তবু এই ধরনের লেখা চেষ্টা করা যায়। বিশেষ চোখ নয়, সাধারণ চোখ। অর্থ নয়, উপস্থিতি।

১২. ২. ৫৮

একটি কথা বারবারই মনে আসছে। শ্রেষ্ঠ আর্টের নিদর্শন শান্তি। তবু শান্তিতে তদবস্থতা নেই। ক্রিয়াশীলতাই আছে। কিন্তু তার মধ্যেই বিরতি। রবীন্দ্রনাথে শান্তি বেশি; রিল্‌কে-তে শান্তি কম, একটু বেশি রকমই কম। শেক্সপীয়ার ও গ্যেটে-তে শান্তি ও অশান্তির সুসমঞ্জস সমাবেশ। উপনিষদে বিরোধ নেই। গীতায় দুয়ের সম্বন্ধ। উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণ পৃথক, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শান্তি, তার পরেও শান্তি। উপনিষদ ছেড়ে দিলে, গীতা, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্য পুরাণে অশান্তি রয়েছে অনেকখানি। যুদ্ধ আর শান্তি; একাধারে বিরোধ, অন্যধারে আত্মার স্বপ্রকাশ। সেটা হিন্দুর হিন্দুত্ব। চীনে কবিতা-দর্শনে বিরোধ কম; প্রকাশ আছে, কিন্তু আত্মার নয়। সেজন্য বুদ্ধ-ধর্ম, কনফুসিয়স আর লাও-তাওই দায়ী।

১৩. ২. ৫৮
রবিশঙ্করের অর্কেস্ট্রায় খাম্বাজ শুনলাম। তিনটি জিনিস লক্ষ করলাম ; (১) এক নতুন ডিমেন্‌শান ; (২) যন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যবহার, যাকে টিমবার বলে ; (৩) গতির মধ্যে বক্রতা।

চন্দ্রশেখর পন্থের কণ্ঠে কেদারার ধামার ভাল লাগল। উদাত্ত কণ্ঠস্বর। ধামারের গতি বুঝতে যেন দেরি লাগল, আগে অত্যন্ত সহজে বুঝতাম ; সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানর মতন।

আলি আকবর বাগেশ্রী বাজালেন, সুরকারীর চেয়ে লয়কারী বেশি। বিস্তর অ-প্রচলিত ও নতুন রাগ চলেছে কেন ? আনন্দের উপভোগ কি কমে আসছে ? ওস্তাদের ভৈঁরো বাহার আর রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভৈরবী আমার পছন্দ হতো না। নতুনত্বের আস্বাদে এক ধরনের আনন্দ আছে, কিন্তু সেটা রসের নাও হতে পারে। এক প্রকার ইনটেলেকচুয়েল বাহাদুরি।

আলাপে সাহিত্য-ভাব ব্যতীত অন্য সুরগত ভাবের ছবি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সাহিত্য ও চিত্রভাবই প্রায় সব, কিন্তু সুরভাবও রয়েছে। আমি প্রায় দশ-বারোটা গান পেয়েছি যেগুলোতে সুরের দিকটাই সব— তার মধ্যে বেশির ভাগ নতুন সৃষ্টি, দু-চারটি পুরাতন। তাকে কথা-বিহীন সুরই বলা চলে। চিত্র-বিহীনকে abstract design নাম দিলে অন্যায় হবে না।

১৪. ২. ৫৮
আজ আবার গানের কথা মনে উঠছে। ছেলেবেলায়, কাশিমবাজারের রাধিকা গোঁসাই-এর গান শুনি। একজন সুন্দর যুবক সঙ্গে গাইলেন। অমন সুন্দর চেহারা দেখা যায় না। নাম শুনলাম গিরিজাবাবু। দুজনে ধ্রুপদ গাইলেন। রাগ ঠিক মনে নেই, তবে চাল মনে আছে। কাশিমবাজারের পর রাধিকাবাবু আবার কলকাতায় এলেন। সঙ্গে প্রায়ই মহিমবাবু থাকতেন। কিন্তু একত্রে দুজনের গান বেশি শুনতে পাইনি, আট-দশবার ছাড়া। মহিমবাবুর কণ্ঠের তুলনা মেলে একমাত্র অঘোর চক্রবর্তীর। মহিমবাবুর জোয়ারী ছিল অপূর্ব ; যেন এক চাক ভোমরার বাসা। অঘোর-বাবুর কণ্ঠ তখন পড়ে এসেছে, তবুও তার তুলনা হয় না। গোল, ভরাট তার সপ্তকে যাওয়া আসা নিতান্ত স্বাভাবিক। নাকি সুর একেবারে নেই,

চিড় খায় না, জোয়ারী গমগম করছে। বিষ্ণু দিগম্বরেরও কণ্ঠ ছিল অদ্ভুত। তাঁর অবস্থাও আমি যখন শুনি তখন পড়ে এসেছে, কেবল ভজনই গাইছেন। দুবার তাঁর মুখে খেয়াল শুনি— শেষবার ভূপেন ঘোষের বাড়িতে, ভোরবেলা ভৈঁরো। সে ভৈঁরো আর কখনো শুনিনি, শুনবও না।

কণ্ঠ হয় তারের, না হয় বাঁশির। অঘোরবাবু, বিষ্ণু দিগম্বর, মহিমবাবু, জ্ঞান গোঁসাই, ফৈয়াজ খাঁ এদের কণ্ঠ তারের। আর চন্দন চৌবে, রবীন্দ্রনাথের ছিল বাঁশির। বাঁশির কণ্ঠে ধ্রুপদী গান চলে না, চলে তারের কণ্ঠে। আমাদের সঙ্গীতে প্রশ্রয় পেয়েছে তারের। বাঁশির আওয়াজ খোলা হাওয়া, মাঠে-ঘাটে, নির্জনে ; তারের আওয়াজ দরবারে। বাঁশিতে কারুণ্য, উদাস ভাবটাই বেশি।

২২. ২. ৫৮

মৌলানার মৃত্যু হলো। সত্যিকারের অভিজাত। বিদগ্ধ পুরুষ। হাতের সিগারেট তোলা পর্যন্ত নিজস্ব, স্বতন্ত্র। আচার্য নরেন্দ্রদেবকে 'আরে ভাই' বলে সম্বোধন করতেন। অমন সুন্দর ভঙ্গিতে কে ও-দুটি কথা বলতে পারে। দরাজ হাত! নীচতার গন্ধ পর্যন্ত নেই। জেলে বসে স্ত্রীর জন্য সরকারে টাকা পর্যন্ত চাইলেন না। এই প্রকারের objectivity কুত্রাপি দেখিনি। 'প্যাশান' জমে ক্ষীর হয়ে গেছে। ও জাতটাই চলে গেল। মৌলানা কিন্তু তিতিবিরক্ত হয়ে অবিশ্বাসী হননি।

বিদ্যাসাগরের একাধিক রচনা পড়লাম। খুব wit! যেখানে wit সেখানেই ভাষা সবল, এমনকী নিতান্ত ইদানীংকার! বাচস্পতি মশাই-এর সঙ্গে খুড়ো-ভাইপোর ঝগড়াটি চমৎকার। প্রায় চলতি কথা। আবার একটি তিন বছরের মেয়ের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। রাইমণির কথা শুনতে গলা কেঁপে ওঠে। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতিতে ছন্দের এক অদ্ভুত দোলা পাই— যেন ধ্রুপদ শুনছি।

প্রমথ বিশী মহাশয় একটি চমৎকার উপাদেয় প্রবন্ধ লিখেছেন। সবটাই ভালো, কেবল লজিক্যাল আর প্রাকটিক্যাল দুটি একধর্মী নয় কি? বোধ হয় এম্পিরিক্যাল বললে চলত— র‍্যাশনালিস্ট বলা যায় না। সে যাই হোক্, বিদ্যাসাগরের মতো এমন মহৎ ব্যক্তি ভূ-ভারতে দুর্লভ। বিদ্যাসাগরের মধ্যে মনে হয় যেন খানিকটা সিনিসিজম এসে গিয়েছিল— অবশ্য বাল-বিধবা সম্বন্ধটি ছাড়া। কিংবা সিনিসিজম কেবল ভাষারই মারপ্যাচ। তার

মধ্যে ভাষার ফন্দি আছে অনেকখানি। ভেতর-ভেতর বোধ হয় বিদ্যাসাগর একটু বেশি সেন্টিমেণ্টাল, ভাবপ্রবণ ছিলেন, সেটা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কখনও কখনও বোধ হয় উল্টো কথা কইতেন। অবশ্য পুরোপুরি সিনিক্যাল কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়, এক ইয়াগো হওয়া ছাড়া। জোর পেসিমিস্ট বলা চলে। তাও টাইনের মতন নয়। বিদ্যাসাগর ভগবদ্‌-বিশ্বাসীও ছিলেন না। অসম্ভব কাজের লোক এই পুরুষটি, অর্থাৎ এম্পিরিসিস্ট।

১. ৩. ৫৮

ভোরবেলা, একজন একটু সংস্কৃত কবিতা পড়েন। ঠিক বোঝা যায় না। একটু গোপনে কোণের ঘরে। শুয়ে শুয়ে চা খেতে খেতে কয়েকটা সংস্কৃত শব্দ কানে আসে। অত্যন্ত বাংলা ঘেঁষা। আজ তিন দিন কানে আসছে— ক' দিন থাকবে বলা যায় না।

হঠাৎ মনে হলো, মারা গেলে এই রকম বাংলা শব্দের সুর করে সংস্কৃত ভাষা আর শোনা যাবে না। সংস্কৃত না পড়াই ভালো। সংস্কৃত ছন্দে মৃত্যুর ছাপ আছে।

১৭. ৪. ৫৮

রাত্রে বাইরে শুই। রোজার জন্য অনেক ভোরে সাইরেন বাজে। ছাত্র অধ্যাপক রোজা মানে না। অন্তত বেশির ভাগ লোক। তবু দেখাতে হয়। পরীক্ষার সময় লুকিয়ে এসে অন্যত্র চা খায়। ভাঙাটাই স্বাভাবিক। নিয়ম ভাঙলেই আজকাল কম্যুনিস্ট।

নিমগাছের বাহার খুলছে। নিমগাছে সাতদিনে পাতা ঝরে, নতুন পাতা গজায় আর তার পরে ফুল ধরে। সুন্দর, তীব্র গন্ধ, সবুজ ধরনের। আমার জোয়ান গাছটা ফুলেলা হয়ে উঠল। অদ্ভুত মাদকতা।

হঠাৎ মনে ওঠে গোটা কয়েক বিস্ময়। লক্ষ্ণৌ-এর বীরবল সাহানী রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া আর আমলতাশের লাল ও হলদে। আমার বাগানে গ্রীষ্মের প্রথমে তিন-চার রকমের কাঞ্চন, কোনো পাতা নেই, সবটাই ফুল। রানিখেতের রাস্তায় চেস্টনাট, ঘোড়ানিমের বাতিদান আর আলিগড়ের বুগেনভিলিয়া— এরা সব গরমে ফোটে। আর বর্ষায় কেয়া আর কাশ। কী অপূর্ব ভারতবর্ষ! এত সূর্য, এত আলো, এত রং, এত

গন্ধ !

ছবি দেখি আরো বেশি। নৈসর্গিক দৃশ্যে মহত্তের আস্বাদ পাই। হয়ত আকাশ বৃহৎ, তাই। ছবিতে রূপের অনুভূতি, নিসর্গে রূপ নেই, ভূমাই সব। অবশ্য কালের মহিমা অপূর্ব— একবার মাত্র দেখেছি। দাদার সঙ্গে অনেক রাত্রে নারানপুরে যাচ্ছি। ঘনঘটা করে বৃষ্টি নামল, সঙ্গে গরুর গাড়ি আসছিল, তাই গেল মাত্রালের দিকে। তারপর চলতে লাগলাম দুজনে, পথ হারিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে রইলাম রাস্তার ধারে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল হঠাৎ ধারে সান-বাঁধান ভাঙা পুকুর দেখলাম। শুনেছিলাম একজন আত্মহত্যায় মরেছে পুকুর পাড়ে। জমাট অন্ধকার। রাস্তা ফুরিয়ে গেল। সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকার দেখতে লাগলাম। এক ঘণ্টার রাস্তা কিন্তু ভোরবেলা বাড়ি পৌঁছলাম। এ-কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অস্তিত্ব ছিল না— অন্ধকারের অস্তিত্ব ছিল, তার গুণ ছিল না, দোষ ছিল না, কেবল তাই ছিল।

২০. ৪. ৫৮

আলিগড়ে নতুন বই-এর দোকান খোলা হলো। এই প্রথম বিস্তর ছাত্র-ছাত্রী দোকানে আসছে। পরীক্ষা, গ্রীষ্মের ছুটি এসে গেল— তবু আসছে। অনেক নতুন বই দেখছি। কিনতে চাই না, তবু না কিনেও থাকতে পারি না। প্রত্যহ যাই, উল্টে-পাল্টে দেখি, বেশ লাগে। আগে লক্ষ্ণৌ-এ বই-এর দোকানে রোজ সন্ধ্যায় যেতাম, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম, রোজ সন্ধ্যায় বই কিনতাম, কেনাতাম। এখন আর সামর্থ্যে কুলায় না।

আমার লাইব্রেরির এক অংশ এক বিশ্ববিদ্যালয় কিনতে চান, কিন্তু কেন-বার কথা উঠলেই প্রাণটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। পড়ে কিছু হয় না, না পড়েও উপায় নেই। অথচ বইগুলি আমার আর থাকবে না ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগে। কখন কোন্ মুহূর্তে পাতা উল্টোতে ইচ্ছে হয় জানি না। বই হাত থেকে চলে যাওয়া— এটা এক রকমের মৃত্যু।

৫. ৫. ৫৮

বার্ট্রাণ্ড রাসেল, ক্রুশ্চেভ, আর ডালেস— এদের পত্র-বিনিময় পড়লাম।

ডালেস নীতিপ্রধান লোক, ক্যালভিনিস্টিক ; ক্রুশ্চেভ বিশ্বাস করেন ঐতিহাসিক নিয়তিতে, আর রাসেল মানেন তর্কবুদ্ধিতে। কোথাও কারুর সঙ্গে মিল নেই। লেখাটাই বৃথা।

জওহরলাল কাজ থেকে অব্যাহতি চাইছেন। এগারো বছর মন্ত্রিত্ব করেছেন। একটু বিরাম চাই বৈ কি! কংগ্রেসের স্রোতে ভাঁটা পড়েছে, জওহরলাল বোঝেন, মানেন না। ধনকুবেরদের কাছ থেকে টাকা নিলে সংসার সুচারুরূপে চালান যায়, কিন্তু কংগ্রেস উদ্ধার হয় না। মহাত্মাজী ঠিকই ধরেছিলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই ভাবতে যে জওহরলালের আশীর্বাদে কংগ্রেস ধনকুবেরদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিলে! প্যাটেলের হাতে এ কাজটি ছেড়ে দিলেই ভালো হতো। অবশ্য জওহরলাল একলা থাকতে পারতেন না। তাঁর কাজই হলো সমালোচকের দৃষ্টি। কিন্তু এরই ওপর দৃষ্টিভঙ্গি আসছে। সেই জন্যে কাজ থেকে অব্যাহতি নেই। তাই দু'য়ের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

এই অঞ্চলে বহু মানুষের সঙ্গে মিশেছি। পন্থজী জ্ঞানী ও সুবিবেচক; রফি আহম্মদ বুদ্ধিমান, অত্যন্ত প্রখর স্মরণশক্তি-সম্পন্ন; আচার্য নরেন্দ্রদেব সত্যকারের পণ্ডিত ও নিরালম্ব পুরুষ; সম্পূর্ণানন্দ যথার্থ কৃষ্টিমান, আর জওহরলাল দোষে-গুণে পুরো মানুষ। বুদ্ধি বৈদগ্ধ্য আর কৃষ্টি, সবই আছে, অথচ কোথায় একটা দুর্বলতা আছে, কোথায় যেন একলা, বন্ধু নেই, তাই নাবালকদের সঙ্গে মেশা চাই। জওহরলালের বন্ধুত্ব হতো না, তাই তিনি প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারলেন না।

জওহরলালের গুণে আমি বরাবরই মুগ্ধ। গুণের কথাই মনে আসে। একদিন তাঁর অবর্তমানে তাঁর সুখ্যাতি করছিলাম। নরেন্দ্রদেব বললেন 'এখনও?' আশ্চর্য হয়ে যাই। মোড় ঘুরিয়ে বললেন, 'দোষেগুণে।' রাত্রে বাড়ি এসে ভাবলাম। মনে হলো জওহরলালের কথার বাঁধ যেন কম। কিন্তু ভাবে বাঁধ নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই বাঁধই তাকে বেঁধে রাখে। জওহরলাল logical নন, বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্যিক।

জওহরলালের বক্তব্যের ভাষা কিছু অগোছাল। ভাববার সময় নেই— আগেও অমনি ছিল, এখন যেন আরও বেশি। কিন্তু মন অত্যন্ত স্বচ্ছ, অত্যন্ত সৎ। বৈজ্ঞানিক মনোভাব? ঠিক তা বোধ হয় নয়, যদিও বিজ্ঞানের প্রশংসা করেন একটু বেশি, অর্থাৎ ইতিহাসের চেয়ে। পুরোপুরি সাহিত্যিকও নন, যদিও লেখা তাঁর আশ্চর্য ভালো। Scientist নয় scientific, যেন socialist না হয়ে socialistic। অর্থাৎ এও হয়, ও-ও হয়।

তাতে ঠিক কাজ চলে না। ইন্টেলেকচুয়্যাল হওয়া যায়। অথচ বুদ্ধির সাহায্যে এই ভাবেই জীবন চালাতে হয়। সর্দার প্যাটেলও বুদ্ধিমান ছিলেন, তবে তাঁর সামনে সিদ্ধান্তের মীমাংসা হতো চটপট। জওহরলালের সিদ্ধান্তে আসতে হয় দেরি লাগে, আর না হয়ত ঝটিতি। প্রায়ই বলেন, তর্কের সীমা নেই। গান্ধীজীরও সামনে বিস্তর সমস্যা উঠত। অতি সহজে নম্র অথচ বজ্রকঠিন ভাবে উত্তর দিতেন আর শেষ-বেশ উত্তর খুঁজতেন ভগবানের কাছে। তাঁর শেষ-বেশটা ছিল আধ্যাত্মিক। ফলে কাজ হতো অনেক। ধর্মবিশ্বাসের অন্তরে নাকি কার্যকরী শক্তি আছে। জওহরলালের সে-বিশ্বাস নেই; তাঁর কৃতিত্বে নিদান নেই। ওটা আত্মিক, চারিত্রিক।

৯. ৫. ৫৮

মৃত্যু নঙর্থক। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মৃত্যু মিথ্যা। ব্যক্তিগত জীবনের পর যে জীবন, সে জীবন আমার কাছে নেই। তারপর অন্য জীবন থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন থাকে না, সব সরে যায়। এই সরে যাওয়া, অগ্রস্থতি হলো কাল, তার দর্শন কালপ্রত্যয়। সে প্রত্যয়ের গোড়ায় থাকে গ্রীনউইচ, তার পর ঋতু, তারও পরে সমাজ, শেষে আবার দর্শনও পৃথক হতে বাধ্য। তারও শেষে, যুক্তির দিক থেকে, কাল-প্রত্যয় থাকে না। অতএব মৃত্যু নিরর্থকই মনে হয়।

১০. ৫. ৫৮

রবীন্দ্রনাথের বার্ষিক জন্মতিথি উদ্‌যাপন বাংলা দেশেই আছে। বিদেশেও বাঙালিদের মধ্যেই যা কিছু হয়। অন্য দেশের অন্য অবাঙালির মধ্যে প্রায় নেই বল্লেই চলে। যৎসামান্য জওহরলাল আর গোপাল রেড্ডির মুখ থেকেই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শুনতে পাই। গুজরাতীদের মধ্যে কিছু কিছু আছে; অন্ধ্রদেশীয় ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে মাত্র দু-চারজন। কংগ্রেসের মধ্যে কালচারের কোনো সম্বন্ধ নেই, গান্ধীজীর সময় ছিল না, স্বদেশী যুগে বাঙালিদের মধ্যে ছিল। এখনও সামান্য কিছু কালচার, বোধ হয়, বাঙালিদের মধ্যে রয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই সে কালচার। রবীন্দ্রনাথের পরের যা কালচার, সেটা প্রথমত রাবীন্দ্রিক।

অথচ বাংলার কালচার নিয়ে অন্যে একটু হিংসে করে। Emotional integrity কী এই ভাবে হয়? অন্য দেশের কালচার উন্নতি করছে শুনলে অত্যন্ত খুশী হই, কিন্তু তাঁরা হিংসে করেন কেন? বাঙালির দাম্ভিকতা অনেক কমেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হিংসে ত' হবেই। তার আর উপায় নেই। তৎসত্ত্বেও তাঁর বার্ষিক জন্মতিথি নিয়ে আমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছি। পনের দিন কবিপক্ষ!

১৫.৫.৫৮

কলকাতা শহরকে জওহরলাল দুঃস্বপ্ন বলেছেন। তাই মনে হয়। কিন্তু দুঃস্বপ্ন ওঠে কেন? গরহজমে নিশ্চয়ই। উদ্বাস্তুর দল বাংলা দেশকে জর্জরিত করেছে। চাকরি নেই লক্ষ লোকের, মানুষে শিক্ষা পাচ্ছে না; আরও কত কী! কিন্তু গরহজম কেন? গরহজম হয় বেশি খাওয়া, আর বেশি না-খাওয়া থেকে। বাংলা দেশে, দু-চারজন ছাড়া, বেশিই না-খাওয়া থেকে। অথচ পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা অন্ন সংগ্রহ করে নিয়েছে, আর আমরা পারিনি। প্রথম কারণ মনে হয়, জমি-সর্বস্বতা। তাছাড়া, কলকাতা ছাড়া বড় শহর নেই এবং সেই কলকাতায় অবাঙালিরা ঢুকে পড়েছে। বেহারী পাঞ্জাবী গুজরাতী মাড়োয়ারী, উত্তর প্রদেশীরা কলকাতায় ছেয়ে গেল। তার ওপর বঙ্গভেদের বন্যা। এ অবস্থায় সবারই মত বদলায়। এখনও যে বাংলা দেশ দুঃস্বপ্ন সত্ত্বেও টিঁকে আছে, এই যথেষ্ট।

আমার এক এক সময় মনে হয় বাংলা দেশে শতখানেক পলিটেকনিক খুললে মন্দ হয় না। এখানে একটা সুবিধা— প্রায় সকলেই মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত। সে সম্প্রদায় থেকে পলিটেকনিকের দিকে মোড় ফেরান যায়। পলিটেক-নিকের অন্যাংশে চাষ। প্রথমে ঠিক খেত-মজুর নয়, সেটা পরে। শহর আর গ্রামের সংযোগ ভিন্ন উপায় নেই। গ্রাম, গ্রাম থাকলে চলবে না, আর প্রকাণ্ড শহর প্রকাণ্ড শহর থাকলেও চলবে না। গ্রাম থেকে ছোট শহরে পরিণত হতে হবে। ছোট শহর অর্থে small town বলছি না; এটা decentralised economy-র মতন। এই হলো আমার মতে দেশের ডাইনামিক্‌স।

১৭. ৫. ৫৮

Predicticn-এর বৈজ্ঞানিক অর্থ ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক নয়। তার অর্থ কোনো বর্তমান বক্তব্যের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তব্যটুকু। ভবিষ্যদ্বাণীর বক্তব্য শেষের দিকে; অর্থাৎ সেখানে যুক্তির ধারা ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। Prediction থেকে exp'anation— ব্যাখ্যা জন্মায়। পূর্ব-ব্যাখ্যান Prediction থেকে নয়। দর্শনের পূর্বে পূর্ব-ব্যাখ্যান ছিল; ক্রমে দর্শনের সঙ্গে পূর্ব ও পরের দূরত্ব কমে আসছে। দূরত্ব প্রায় শেষ হয়েছে বিজ্ঞানে। তবু কিন্তু থেকে যায়, এবং সেইখানেই গণ্ডগোল বাধে। একদল বলছেন, বিজ্ঞানের সবখানেই prediction, ব্যাখ্যা বলে কোনো জিনিস নেই। আরেক দল বলছেন, ব্যাখ্যা আছে, যদিও তর্কের শেষ নেই। বিজ্ঞানের শেষ আর দর্শনের শেষ এক বস্তু নয়। বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া শেষের পূর্বকার। কিন্তু মানুষ ব্যাখ্যা চায়, আমি চাই, পাই না। Prediction আর explanation এক বস্তু নয়, পৃথক বস্তু।

২১. ৫. ৫৮

অষ্টআশি বছরে যদুনাথের মৃত্যু হলো। বহু আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু তাঁকে বহন করতে হয়েছে। তবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বুদ্ধির পরিশ্রম করে গেলেন। একেই বলি মানুষ! ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষ! কিন্তু লেখার চেয়ে বলবার শক্তিই বেশি মনে হয়। চোখের সামনে ইতিহাস ভেসে উঠত। লক্ষ্ণৌ-এর বড় ইমামবাড়ার কাছে একটা মসজিদকে কী অদ্ভুতভাবে আরঙ্গজেবের হাত থেকে তুলে ধরলেন! তবু সবচেয়ে বেশি ছিল চরিত্রের দৃঢ়তা। আশুতোষকে তিনি দৃঢ়ভাবেই ঘৃণা করতেন— সেটা তাঁর উচিত ছিল না। তবু চরিত্রের জন্য তাঁর ত্রুটি সকলে মাপ করতেন। বড় ঐতিহাসিক ত' বটেই, কিন্তু সাহিত্যে ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। প্রায় ত্রিশ বছর Time's Literary Supplement পড়ে গেলেন।

কবিতার আলোচনা দিয়েই কবিতা সম্ভব— স্পেংগলারের এ মন্তব্য চলে না। কবিতার আলোচনাটা কি? তার মধ্যে থাকে নিশ্চয়ই কবিতা, কিন্তু তার সঙ্গে আশে-পাশে রয়েছে সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি। সেগুলো মিলে হলো idea, সেই ideas আবার এসে জোটে কবিতার ওপর। প্রথমে একত্র পরে ভিন্ন, আবার একত্র, নতুনভাবে। এই হলো সৃষ্টির ত্রয়ী-বিচার।

কবিতার সঙ্গে ছবি। আবার ছবির সঙ্গে কবিতা। ছবির মধ্যে 'ছবিত্ব'

আছে নিশ্চয়, কিন্তু বিশুদ্ধ ছবিত্ব বলে কিছু আছে কিনা বুঝি না। Cubism, abstract art? তাতে কিন্তু আশ মেটে না, ছবিত্ব মিশে যায় অছবির সঙ্গে। Cubism-এর cube হলো ব্লক, সেটাও স্থাপত্যের অঙ্গ, বিশুদ্ধ ছবি নয়। ইস্পাতের তার দিয়ে আজকাল যে ছবি আঁকা হয়, তার মধ্যেও আছে রেখা। সে রেখার মধ্যে ছবি আর স্থাপত্য দুই-ই রয়েছে। তারও সঙ্গে architecture, জ্যামিতি প্রভৃতি। বিশুদ্ধ কবিতাও ঠিক সেই কারণেই হয় না। যেটা মনে হয় বিশুদ্ধ কবিতা, সেটা হলো সঙ্গীত এবং সেটাও বিশুদ্ধ সঙ্গীত বা যন্ত্র-সঙ্গীত নয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছবি সুর ইত্যাদি মিশে যায়। শুধু তাঁর ছবির বেলায় একটু আলাদা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে সুর আসছে না, কথাও আসছে না, কেবল অবচেতনা। আর ছবি আসছে— তার বেশি নয়। Archetype? সেটাও বিশুদ্ধ নয়। আর্টের বিভাগ শেষে, গোড়ায় নয়। সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম কথা অ-খণ্ড সত্য। সেটা বোধ হয় ছন্দ।

ধ্বনির প্রথম আঘাত থেকে প্রায় সব আর্টের জন্ম। প্রায় এইজন্য,— যে ছবি, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের ধ্বনি কোথায়? যদি না অবশ্য ধ্বনিকে শব্দের অন্যরূপে ব্যবহার করা চলে! সঙ্গীতে কবিতায় ধ্বনি রয়েছে নিশ্চয়। আমাদের সৌন্দর্যতত্ত্ব কবিতা-সর্বস্ব। অন্য তিনটির আদি কথা দৃষ্টি। ভারতীয় আর্ট ঠিক দৃষ্টিপ্রধান নয়, স্থাপত্য ভাস্কর্য চারুশিল্প সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনে দৃষ্টি নেই, ধ্বনি আছে। গুহ্য-ধর্ম ধ্বনির অন্তর্গত। কিন্তু metaphysics কথার ধ্বনি। তাই আমাদের metaphysics দুর্বল। (হঠাৎ মনে হলো, ধ্বনির পিছনে ছন্দ নেইতো? দেখতে হবে, এখন পেলাম না।)

২২. ৫. ৫৮

এইটা নিয়ে উনিশখানা বই লিখলাম। আরো দু একটা লেখা চলত, যদি স্বাস্থ্যে কুলোত। কী লিখেছি তাই জানি না। তবে বোধ হয় একটা মোটা ধারা আছে। তাকে Personality বলা চলে— নভেলে তাই, সমাজতত্ত্বে তাই, অর্থনীতিতে তাই, ইতিহাসেও তাই, সঙ্গীতেও তাই। এরই আশেপাশে কার্ল মার্কস্। আমার জীবনে মার্কসিজম্-এর প্রভাব বেশি। দশ-বারোটা প্রবন্ধ ছাড়া অর্থনীতি সম্বন্ধে বেশি কিছু লিখতে পারি না, মাথা নেই, এবং মার্কসিজম্ ছাড়া অন্য অর্থনীতিতে অবিশ্বাসী। এমন কী কীনস্‌কেও গ্রহণ করতে পারলাম না। (এখন আলিগড়ের আবু সালিমই একমাত্র কীনস্‌কে

পুরোপুরি বিশ্বাস করে, এমন কী অনুন্নত দেশের অবস্থা সত্ত্বেও।) সমাজ-তত্ত্বে ইতিহাসে মার্কসিজম্ চলে, তাই এখনও লিখি। আমার নভেলেও তাই আছে। নিজেকে Marxologist বলা চলে। ভারতবর্ষে সে বস্তু বিরল, তাই আমিও বিরল।

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে লিখে আসছি। থিতিয়েছে কিনা তাই জানি না। যে-সব বই লিখেছি তার প্রায় অনেক কথাই মনে নেই। অনেক বই আমার কাছেই নেই। চোখে পড়লে হঠাৎ মনে পড়ে— নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকে। বই লেখবার পরই ভুলে যাই, মনে থাকে না। এই চলে আসছে চিরকাল। পাঠকের প্রতি নজর করি নি, পাঠকও আমার প্রতি নজর করেন নি। পাঠক-লেখকের সম্বন্ধ নিতান্ত আলগা, আলগোছা, আবছা গোছের। অবশ্য আমার চিন্তাধারা চলেছে এবং বেশির ভাগ পাঠকের চিন্তাধারা কম, নিতান্ত কম, নেই বললেই হয়। তাই আমার-তোমার সম্বন্ধটি প্রায় ছিন্ন হয়েছে আমার লেখায়।

আমার কোনো লেখাই থাকবে না, তার থাকা উচিতও নয়। চিন্তার গতি নিয়েই আমার কারবার। চিন্তা নেই, আমিও নেই। চিন্তার দানা বাঁধত তো আমিও থাকতুম। স্বল্পক্ষণের জন্যই বেঁচে থাকা। স্বল্পক্ষণের জন্য যারা ভাববে, তারা আমার কথা মনে রাখবে— তার বেশি নয়। এটা বোধ হয় দম্ভ হলো!

২৪. ৫ ৫৮

'পুতুল খেলা' দেখলাম। বহুরূপী দলকে আমি শ্রদ্ধা করি। অভিনয় ভালো, finish ভালো, প্রযোজনা ভালো, সব দিক থেকেই চমৎকার।

আমার কাছে Dolls' House বইখানি হাতের কাছে নেই, তবু যেন মনে হচ্ছে 'পুতুল খেলা' ঠিক বাঙালি নয়। তপন, বুলু, ডাক্তার, কেষ্ট ও কৃষ্ণা ঠিক যেন কেমন কেমন, অথচ বাংলা ভাষায় কথা কইছে। ডাক্তার বিদেশী, বুলু বিদেশী, তপন আরো বিদেশী। আসল কথা, ইবসেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের য়ুরোপীয় মানুষ। 'পুতুল খেলা'র বুলু নিতান্ত সরল, তার ওপর আঘাত এলো গুরুতর, তারই ঘায়ে স্বামী ত্যাগ করলে এবং স্বামীও সেটা মেনে নিলে। বাঙালি সমাজে এত দূর চলে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে-নভেলে স্ত্রী বড় একটা স্বামী ত্যাগ করে না— এটা তাঁর বাঙালিত্ব (আজকালকার নভেলে নাটকে করছে কি ?)। তপন

সামাজিক, ঘরোয়া মানুষ সংসার চালায় মোটা ধারায়, বুর্জোয়াভাবে। সে বুলুকে বুঝতে পারে না, চায়ও না। ঐ ভুলের মধ্যেও সংসার চলত,— টোল খাওয়া, চিড় খাওয়া সত্ত্বেও। এই ভুলের মধ্যেই ট্র্যাজেডি। Doll's House গেল ভেঙে, কিন্তু বাঙালি নাট্যকারের হাতে ভাঙত না।

তাই মনে হয় 'পুতুল খেলা'র তপন, বুলু উভয়েই অতিরঞ্জন করেছেন। অভিনয়ের দোষে নয়, নাটকের দোষে। বুলুর সরলতা, তপনের সামাজিকতা একটু যেন অত্যধিক। বুলুর সরলতা একটু কম হলেও চলত। তপনের সাধারণতা একটু বেশি। অবশ্য সাধারণ লোকের সাধারণত্ব কাটান কঠিন।

অভিনয়ের প্রথম অঙ্ক একটু দ্রুত। দ্বিতীয় অঙ্ক ঠিক ঠিক, তৃতীয় অঙ্ক আবার দ্রুত। তৎসত্ত্বেও 'পুতুল খেলা' আমার খুবই ভালো লেগেছে। ইবসেনের নাটকের গঠন অপূর্ব।

২৫ ৫· ৫৮

রবিশঙ্করের সেতার আর আল্লারাখার তবলা শুনলাম। তিলক-শ্যামটি চমৎকার। জাপান থেকে রবিশঙ্কর অনেক জিনিস শিখে এসেছেন। ওস্তাদী গান-বাজনাকে আকারে ছোট করতে চাইছেন, বিলেতে ছোট, জাপানে আরো ছোট। বিদেশী সঙ্গীতকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। আমিও করি। কিন্তু একটা বিপদ আসতে পারে। ছোট করতে গিয়ে সঙ্গীতের কারুকার্য যেন নষ্ট না হয়ে যায় এবং কাঠামোটি যেন অটুট থাকে। নতুনত্বও তিনি করছেন এবং সেজন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু নতুন রাগের সব রূপ কি খুলেছে? যেমন মোহনকোষটি? এটা যেন খাপ খায়নি, একেই ত চন্দ্রকোষ বরাবরই খাপছাড়া। অবশ্য অনবরত শুনলে সুমধুর হবে নিশ্চয়। অভ্যাসের ফলে কী না হয়!

আল্লারাখার হাত কড়া মনে হলো! বীরু মিশ্রের বাঁয়ার কাজের তুলনা নেই, খলিফা আবিদ হোসেনের না ধিন্ ধিনা অনবদ্য। লক্ষ্ণৌ-কাশীর চালই ভালো লাগে। আমার মতে এবং বোধ হয় অনেকেরই মতে, ভারতের শ্রেষ্ঠ তবলিয়া থেরাকুয়া আহমাদ জান। আল্লারাখা চমৎকার বাজান, তবে বাঁয়া একটু কম বলে। বয়সের সঙ্গে হয়ত বাজনা জমবে।

২৭. ৫. ৫৮

যে-ইকনমিক্স পৃথিবীতে যেভাবে চালু হচ্ছে, সেটা আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। রাশিয়া-চীনের ইকনমিক্স গ্রহণ করি, কিন্তু পুরোপুরি নয়। যেখানে দারিদ্র্য সেখানেই আমার মিল। আমার বিশ্বাস যে ভারত প্রভৃতি দেশের ইকনমিক্স ও সোশিয়লজি হলো দারিদ্র্য। অপরিণত অবস্থার (underdeveloped) ইকনমিক্স হলো সৃষ্টির পরম্পরা। এক হিসাবে নতুন কিছু নয়, যেটা হচ্ছে সেটা হবে কিংবা একটু বেশি করে হবে, সেদিক থেকে পরম্পরার গতিহার একটু বেশি, তার চেয়ে নয়। গতিহার একটু বেশি হলে ভালো, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ কিছু নতুনত্ব নেই। কিন্তু (undeveloped) অনুন্নতর ইতিহাস হলো দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের পরিণতি সম্পূর্ণ নতুন রকমের। অপরিণতর ইকনমিক্সে দারিদ্র্য ঘোচে না, ক্রমোন্নতি ঘটে, তার ফলে অধিক অধিকতর হবে, উন্নত অবস্থা অ-পরিণত অবস্থার চেয়ে অধিক থাকবে, কিন্তু নীচু থাকবে আরো নীচুতে, তুলনায় অধিকতর নীচুতে। এই ধরনের উন্নতি আমার কাছে নিরর্থক। আমি সম্পূর্ণ নতুনত্ব চাই, যে নতুনত্ব kind-এর। গান্ধীজীর প্রাথমিক সমস্যা কিন্তু তাই। সে যাই হোক, আমি অনুন্নতর ক্রমবর্ধমান পরিণতি চাই না, দারিদ্র্য-মোচন চাই, সোজা কথা এই।

কিন্তু ভারতের কোনো ইকনমিস্টই তা চান না। অমিয় দাশগুপ্ত থেকে অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী পর্যন্ত। অবশ্য তাঁদের কথাই আমাদের ভারতবর্ষ মেনে নেবে। আমার কথা মানবে না, এইজন্য আমি ইকনমিস্ট হতে পারলাম না।

২৯. ৫. ৫৮

হারীত (—কৃষ্ণ দেব) শহরের উচ্চতম তাপের দিনই আমার কাছে বেড়াতে আসে। একবার ১১৫ হয়েছিল, এবার ১১১। ইচ্ছে করে আসে না, আপনি আসে। অমৃতলাল বোসের গান সম্বন্ধে গল্প হয়। আমি শুনি, সে-ই বলে যায়। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, বড় ভয় হয়, যদি কিছু না মনে করেন।' অমৃতবাবু বললেন, 'নির্ভয়ে বলো।' অনেক সংকোচের পর হারীত প্রশ্ন করলে, 'আজ্ঞে আপনি অল্প বয়স থেকেই থিয়েটার করতেন…।' 'কাপড় নামিয়ে মই তুলে রাস্তায় রাস্তায় প্ল্যাকার্ড লাগাতুম।' 'তা নিশ্চয়ই লাগাতেন, কিন্তু ওদের সঙ্গে

তো মিলেছেন-মিশেছেন। কখনও কখনও একটু বেশি মিশে ফেলতেন না?' বলেই হারীত জিভ কাটলে। অমৃতবাবু উত্তর দিলেন, 'মিশেছি, খুবই মিশেছি। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের মতন বলতে পারি: I am surprised at my moderation.' (এটা ক্লাইভ, না ওয়ারেন হেস্টিংস?)

অমৃতবাবুর সত্যবাদিতা ছিল অসাধারণ! হেরম্ববাবুর মতো, কিন্তু অন্য ধরনের। তাঁর অবশ্য প্রধান গুণ তাঁর নাগরিকতা। অত্যন্ত ভালো জামা-কাপড়, ফতুয়ার পাঞ্জাবি (সেটা পাঞ্জাবি নয়, মুচ্ছুদ্দির মতন পোশাক), ধুতি চুনট করা, আর চুলের কী অদ্ভুত পরিপাটি বাহার। সেই সঙ্গে অম্বুরী তামাক। আর চলত কথার ফোয়ারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে গল্প করেছি, কিছুতে আর ফুরোত না। একটু-আধটু রসাত্মক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তা না হলে জমে না। রবীন্দ্রনাথের সে বালাই ছিল না। ছেলেবেলায় আদিরসাত্মক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বোধ হয় মুখে বলেননি, অন্তত জানতাম না। আমি তাঁকে 'ওগো গোলাপবালা' গাইতে অনুরোধ করি— সে বহুদিন পূর্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'একটা বয়সের পর যে-সব গান কবিতা লিখতাম, তার অনেকগুলিই ভুলে যাওয়া ভালো।' সে গানটি আর গাইলেন না।

১১. ৫. ৫৮

পুরুষ কেবল, পরম, নিরালম্ব, নিরাশ্রয়ী; স্ত্রী সাম্বন্ধিক।

> It is man's function to be absolute, to act in an absolute fashion or to give expression to the absolute. Woman's sphere lies in her relativity. Kierkegard— The Banquet.

অতএব আত্মহত্যা পুরুষের, মেয়েদের আত্মঘাত। এর বেশি স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে বলা চলে না।

২. ৬ ৫৮

বই মধ্যে মধ্যে পড়ি, কিন্তু সে সম্বন্ধে লিখতে চাই না। আজ কিন্তু লিখছি। Duditsnev-এর Not by Bread Alone নিয়ে মাতামাতি করতে কানে বাজে। স্ট্যালিন-পারিতোষিকের চেয়ে ভালো নিশ্চয়, এমন কী Sologub

ও Sholokhov-এর চেয়ে ভালো। তার কারণ এই: অন্যগুলোর সমস্যা সম্পূর্ণ মানবিক, ডুদিস্নেভ নিতান্ত আপেক্ষিক।

Moth(r'ant-এর Desert Love আমার কাছে নিতান্ত উপাদেয়। চরিত্রাঙ্কণ চমৎকার। সাধারণ লোকের মনস্তত্ত্ব এবং অ-সাধারণ লোকের বিচারবুদ্ধি দুটিই নির্মমভাবে দেখিয়েছেন। পুরুষ-স্ত্রী সম্বন্ধের অত সূক্ষ্ম বিচার এক ফরাসীরাই পারে।

S. (Simone de) Beauvoir-এর Mandarin শেষ করতে পারলাম না। কী বলতে চাচ্ছেন বুঝি না, তবে অসম্ভব বুদ্ধিমতী।

পেয়ারীলালের দু ভল্যুমে Last Phase শেষ করলাম। ভারি সুন্দর লাগল, চমৎকার লেখার কায়দা। কিন্তু একটা যেন খটকা বাধছে, গান্ধীজীর চরিত্রে কি কোনো দোষ নেই? অমন নিভাঁজ পবিত্রতা যেন বিসদৃশ ঠেকে। গান্ধীজীর চরিত্রে ভুল স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু দোষ? সেটা নেই। গান্ধীজীর জীবনে যদি খ্রীস্টানী গন্ধ থাকে এবং সেটাই স্বাভাবিক, তবে evil জিনিসটা কোথায় গেল? Last Phase-এ সুনীতির যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে, কিন্তু evil? হিন্দুদের মধ্যে evil নেই অবশ্য, কিন্তু গান্ধীজী কী বিশুদ্ধ হিন্দু?

Von Mises-এর Theory and History বুদ্ধিপ্রধান বই। কিন্তু বুদ্ধিমানের বই নয়। চটে লেখা। A well-crafted petition for cold war.

Camus-র Fall অত্যন্ত, যাকে বলে, উজ্জ্বল লেখা। Fall কেন, Ascent বলাই ভালো। Judge Penitent উগ্র খ্রীস্টান। Camus শেষে না খ্রীস্টান ধার্মিক হয়ে যান!

আজকাল বই পড়া, লেখার মধ্যে গড়পড়তা অভিজ্ঞতাই ফুটে ওঠে। এক হিসেবে ভালো। কিন্তু বিচারের পদ্ধতিটা কমছে মনে হলো। অবশ্য বিচারের ফলটাই শেষ অবধি দাঁড়ায়। Gide-এর ডায়েরিতে অভিজ্ঞতার অংশই বেশি, যদিচ আদান-প্রদান, কথাবার্তা তর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। Amiel-এর সবটাই অভিজ্ঞতা, নিছক অভিজ্ঞতা।

মোটামুটি দুই প্রকারের ডায়েরি হয়— অভিজ্ঞতাপ্রধান আর ঘটনাপ্রধান। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ একই ধরনের, সবই Montaigne থেকে। পার্থক্য উনিশ-বিশ।

১০. ৬. ৫৬

নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রদত্ত Camus-র বক্তৃতা পড়লাম। ছোট্ট গাঢ়-সম্বদ্ধ এবং সবচেয়ে বড় কথা, সৎ ও sincere। সত্য আর স্বাধীনতা এই দুটি জিনিসের প্রতি তাঁর প্রধান আগ্রহ। এই ধরনের অ-বাস্তব সংজ্ঞা তাঁর কাছে নিতান্ত বাস্তব, আত্মীয় হয়ে উঠল। Silence-টা কি? স্ব-অবলম্বী একক? সব আঁধারের মধ্যে একটি আলো? একটি মানুষ একা— কথাটার কোনো মানে হয় না। কারণ সে অন্যের বিপক্ষে একা, একটু বিপক্ষতা নিশ্চয়ই, কিন্তু সবটা নয়, প্রধানও নয়। সামাজিক সম্বন্ধ উত্তীর্ণ হয়ে বাইরের মানুষ অতিক্রান্ত পুরুষ, তবেই স্বাধীন। সৎ বস্তুটি স্বাধীনতারই অঙ্গ।

Thomas Mann-কে Proust-এর সঙ্গে একাসনে বসাতে চাই না। Mann সম্পূর্ণ নতুন জগৎ সৃষ্টি করেন। Proust-ও অবশ্য তাই। কিন্তু Mann ঘটনার বাইরে থেকে শুরু করেন, অন্তরে সমাপ্তি। Proust শুরু করেন ভেতর থেকে, এবং ভেতরেই শেষ। এই অন্তরের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিটা কী অপূর্ব! অবশ্য Death in Venice-এর দৃষ্টি আভ্যন্তরিক। শেষ নভেল Felix Krull, এ-যুগের Don Juan। Mann এবং Proust উভয়েই সৃষ্টি করেন। পুরানো টাইপ নয়, নতুন, তবু টাইপ। রবীন্দ্রনাথ মনে হয় টাইপ সৃষ্টি করতে পারেননি। সে হিসেবে তিনি খর্ব। বাংলা দেশের, ভারতের শ্রেষ্ঠ নভেলিস্ট, তবু যেন কিছু খাটো। আসল কথা— রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথই বেশি, যতটা উচিত ছিল তার চেয়েও বেশি। অর্থাৎ তিনি মোটেই impersonal নন। একদিন গোপনে স্বীকার করেছিলেন: 'আমার সব চরিত্রই রাবীন্দ্রিক্।'

১০. ১১. ৫৮

Boris Pasternak-এর Dr Zhivago পড়লাম। আশ্চর্য এই যে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগল পড়তে। শেষ করেছি এই যথেষ্ট।

Pasternak নিয়ে অত্যন্ত গোলমাল চলছে। আমার বিশ্বাস সুইডিশ একাডেমিতে cold war শুরু হলো; তারপর থেকে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের চূড়ান্ত অভদ্রতা। ফেউ লেগেছে বিস্তর। ভদ্রলোকের সহ্যশক্তি অসম্ভব। তিনি এই গালাগালি সত্ত্বেও দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন না। অবশ্য তাঁরাও তাঁকে মেরে ফেলেননি। পৃথিবীর মধ্যে যদি জঘন্যতম বস্তু থাকে ত সে কোল্ড ওয়ার!

বইটি কিন্তু ভালো, এবং বিশেষ রকমের ভালো। অর্থাৎ গত ত্রিশ বৎসরে যে-সব রাশিয়ান বই রাশিয়া থেকে বেরিয়েছে, তার মধ্যে একাধিক বই পড়েছি, এবং তার সবগুলিই অপদার্থ। সবই একছাঁচে ঢালা, এবং ছাঁচও নিতান্ত বাজে। কিন্তু এই বইখানির সম্পদ চরিত্রগত। এই হিসেবে বইটি ক্লাসিকাল।

কিন্তু একটা কথা মনে হয়। ১৯১৭ সালে বিপ্লব বাধল। সে বিপ্লব ঠিক ক্লাসিকাল নয়, মত-গত। সে-মত সমগ্র মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মত-গত বিপ্লব পাস্টারনাকের মনে বসেনি, একটা আবছা ছায়া এসেছে মাত্র। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, অত বড় বিপ্লব লোকটির উপর দিয়ে আলতো আলতো এলো, আর চলে গেল! বিপ্লবের নীতিমূলক দিকটাই চোখে পড়েছে।

শেষ দিকের কবিতাগুলি অনবদ্য। জিভাগোর অবনতিটাও অদ্ভুত, কিন্তু লারা-র সঙ্গে প্রেম খাপছাড়া। নিসর্গ চিত্রগুলি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সেই দিক থেকে খুবই লিরিক্যাল।

টলস্টয়, দস্তয়েভস্কী, তুর্গেনিভ, গর্কি প্রভৃতির লেখার সঙ্গে জিভাগো-কে সমপর্যায়ে ফেলতে রাজি নই। আসল কথা— জিভাগো অবনতির ইতিহাস, অন্যরা পরিণতির। ওটা পাকবার পরের অবস্থা, সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে পচা গলা। জিভাগো detumescence-এর চিহ্ন।

২৫. ১১. ৫৮

জওহরলালের ছিন্নপত্রের মধ্যে অন্যের লেখা পত্রই বেশি। সব মিলিয়ে গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের রাজকীয় ইতিহাস পাওয়া যায়। অবশ্য খবর সব পুরাতন, কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য তার বেশি। চিঠিগুলির মধ্যে গোটাকয়েক বিষয়গত, আর কয়েকটি ব্যক্তিগত। অবশ্য ঠিক নিছক ব্যক্তিগত নয়, কারণ সুভাষের সঙ্গে জওহরলালের বিবাদ প্রাথমিক, মেজাজগত বৈষম্যের সঙ্গে বিষয়গত বৈষম্য মিশে গেছে, যদিও জওহরলালের বাচনভঙ্গি একপ্রকার ব্যক্তিসম্পর্ক-রহিত। লোদিয়ান-এর চিঠি কয়খানি রাজকীয় মনোভাবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তবে অবশ্য মনে হয় লোদিয়ান ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাইতেন না। অ-রাজকীয় চিঠির মধ্যে সেরা সরোজিনী নাইডুর— এডোয়ার্ড টমসনের নয়, বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরও নয়। টমসন সাহেব বেশি কথা কন। মতিলাল ও গান্ধীজীর চিঠি চমৎকার, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। মতিলাল বুদ্ধিমান, এবং

গান্ধী জ্ঞানী। জওহরলালের খান দু-এক চিঠি সত্যই অতুলনীয়। য়ুরোপ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের হয়ত তুলনা থাকতে পারে, কিন্তু এ-যুগে য়ুরোপের অমন বিশদতর বিবরণ ও ব্যাখ্যা ভারতবাসীর মধ্যে আর কারুর নেই। সে জওহরলাল কি এই জওহরলাল ?

৩. ১. ৫৯

আমার মধ্যে এক মজার জিনিস লক্ষ করছি। চিন্তা আসছে, উঠছে, যাচ্ছে, কিন্তু প্রকাশ, ভাষা, বক্তব্য ছোট্ট। কেন এমন হলো, আগে ছিল না, এখন হচ্ছে। গোটা কয়েক কারণ টের পাচ্ছি :

(১) পৃথিবীর ধারাই তাই। ভাবনা সব পাতলা হয়ে যাচ্ছে, mass culture গড়ে উঠেছে, এমন সব চিন্তা আসে না যাতে দানা বাঁধতে পারে। তাই ভাষা যেন যথার্থ রূপ পাচ্ছে না। আমার ভাষা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে।

কথাটা অবশ্য ঠিক, কিন্তু দুনিয়ার দুরবস্থা কি আমার স্বভাবে বেশি ধরা পড়ে ?

(২) স্বাস্থ্যভঙ্গ। সত্য, কিন্তু সবটা নয়। চুপ করে থাকলে ভাবনা বরঞ্চ বেশিই ওঠে।

(৩) হয়ত আমার বলবার কথাই নেই। সেটা সম্ভব। আগে কি ছিল ?

(৪) বাক্‌হীন প্রতিবিম্ব, nonverbal image মানি। অ-বাকের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। যেটা ব্যক্ত নয় সেটা নেই— এ-কথা মানি না। বিশুদ্ধ mu ic কি ? কথাবিহীন-সুর ত নিশ্চয়ই আছে।

এ-বিষয়ে ভাবতে হবে।

১৩. ৩. ৫৯

ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলি ফুটে ওঠে। 'ভাষার সংযোগ দীর্ঘ। অর্থাৎ সংযোগটাই দীর্ঘ, ভাষাটা নয়। ভাষা ছোট্ট, মন্ত্রের মতন। রবীন্দ্রনাথে সংযোগটাই প্রধান ; উপনিষদের ভাষা মন্ত্রের মতন। গীতায় দু-এর মিলন। বাংলা ভাষায় কথা বেশি ; অত্যন্ত বেশি। সংস্কৃতে নিতান্ত কম, অবশ্য সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের অনেকাংশ ছাড়া। সাহিত্যে অবশ্য বাঁধুনি বাঁধতেই হয় ; তবু ভিন্ন ভিন্ন রীতি আছে, তার সেরা বিদর্ভরীতি। আর বাংলায় গৌড়ীয়

রীতি।

আমার 'মনে এলো'র লেখা ঠিক সাহিত্য-পদবাচ্য নয়, কাটাকাটা ছেঁড়া ছেঁড়া লেখা। তার মধ্যেকার সংযোগ কম। তবে অবশ্য নতুন ধরনের সাহিত্য হতে পাবে। ভাষার অন্তরে বক্তব্য আছে, তার বেশি সংযোগ 'বক্তব্যে'র মধ্যে নেই।

আমার 'মনে এলো'র ভাষাটা কি? 'বক্তব্যে'র ভাষা তবু বুঝতে পারি। সংযোগ আর ভাষা, এই দু-এর মিশ্রণে বাক্। কত রকম বাক্ই না হতে পারে।

২১. ৪. ৫৯

তিন বছরে Co-operative service ঠিক হয়ে যাবে শুনছি। যাবে কি? মানুষ কোথায়? তিন বছরের স্থানে দশ বছর লাগবে। তা না হয় লাগুক, না হয় জওহরলালের পরেও লাগুক, তারপর? Joint co-operative আসবে। সে জানোয়ারটি কী বুঝি না। Commune, collective farm তবু যেন বোঝা যায়।

মোদ্দা প্রশ্ন— বিপ্লবের পরে উন্নতি, না আগে, না সঙ্গে সঙ্গে? সত্য কথা এই: আমাদের বিপ্লব এখনও হয় নি, এখন হতে আরম্ভ হচ্ছে। তাই এত গোলমাল, এত কষ্ট। লোক ঠিক এখনও স্বাধীন হয় নি। তবে ধীরে ধীরে হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে, দু-এর সঙ্গেই ডিমক্রেসি— বিপ্লবের পরেও নয়, শেষেও নয়।

২২. ৪. ৫৯

ভারতের কম্যুনিস্ট দলের মর্যাদাজ্ঞান কম। আজ বিশ বছর কী ভুলটাই করে গেল! ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাস যদি করতেই হয়, তবে dignified হওয়াই ভালো নয় কি? কম্যুনিস্টরা অত সোজা সরল ভাবে বুঝতে যায় কেন, বোঝাতে চেষ্টা করে কেন? কাজ করতে গেলে কিছু simplification করতে হয় জানি। কিন্তু পৃথিবীটা নিতান্তই বাঁকাচোরা। যেটা সরল, সেটা ভাবপ্রবণও হতে পারে।

২৫. ৪. ৫৯

'লু' চলতে আরম্ভ হয়েছে। আলিগড়ের নিমগাছ সবুজে ভরে গেল। আবার সবুজ ফুলের গন্ধ! রাতের গন্ধ তেজে ওঠে। ভোরবেলা কাতারে কাতারে টিয়া পাখি উড়ছে। আমার মনে হয় টিয়া পাখি অ-ভারতীয়।

অনেক রাতে লাল-নীল আলোর আকাশ-প্রদীপ উড়ে গেল। হাওয়াই জাহাজ নিশ্চয়। কয়েক বছর আগে এইখান দিয়ে একবার এসেছিলাম মনে পড়ে।

২৯. ৪. ৫৯

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে শোপেনহরের মতামত কিন্তু গ্রহণ করি। বিশেষ কিছু রূঢ় মন্তব্য বলে ত মনে হয় না। শিশু-সন্ততি লালন-পালন করা অর্থাৎ জাতির (species) ক্রিয়া তা তাঁদেরই কর্তব্য এবং মোটামুটি বলতে হয় যে এঁদের বয়স হলেও কথাবার্তায় একটু ছেলেমানুষী। বয়সের অনুপাতে যেন তাঁদের প্রবীণতা হয়নি। এক-এক বিষয়ে একজন ভারি পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিমতী। কিন্তু শেষ-বেশ গড়পড়তা তাঁরা যেন নাবালিকা অর্থাৎ পঞ্চাশ হলেও পঁচিশ। একটা বয়সের পর যেন তাঁরা আটকে যান, বাড়তে চান না। সে যাই হোক, মরে গেলে আবার যদি জন্মাতেই হয়, তবে মেয়ে না হয়ে জন্মানই ভালো। অত কষ্ট, অত অত্যাচার সহ্য হবে না। অবশ্য জন্মাতে হবেই এমন কিছু বাধ্য-বাধকতা নেই।

মণ্টু (দিলীপ) তখন ছেলেমানুষ। এখনও তাই, তবে তখন তার বয়স বছর পঁচিশ হবে। তার থিয়েটার রোডের বাড়িতে সকালে গিয়ে হাজির। মণ্টু বরাবরই একই ধরনের, সে মেয়েদের সুখ্যাতি শুরু করে দিলে। আর সে কী সুখ্যাতি! আমি কিন্তু আস্তে, নম্রভাবে সে সুখ্যাতির ছোট্ট একটা জবাব দিলাম। মণ্টু বল্লে, 'আচ্ছা বেশ! রবিবাবু ত' মেয়েদের ভালো করেই জানেন, তিনি এখন কলকাতা এসেছেন, চল, তাঁর মতামত জেনে রাখাই ভালো।' 'তাই চল।' যথা ইচ্ছা তথা কাজ, তখনই ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম চিৎপুর। ঘরে ঢুকেই মণ্টু বল্লে 'রবিবাবু কি কবিতা লিখছেন?' মণ্টু ঝোঁকের মাথায় ঠাণ্ডা মাথাতেও, কবিকে সামনেই রবিবাবু বলে ফেলত। কবি বল্লেন চোখ নামিয়ে (এ রকম মেয়েলি চোখ নামান আর কারুর দেখিনি) 'আমাকে তুমি অত সন্দেহ কর কেন বলত দিলীপ?' জবাব না দিয়ে মণ্টু অনর্গল বক্তৃতা চালালে— মেয়েদের মমতা, স্নেহ, দান, নম্রতা,

আরো কত কী! আমি ছিলাম চুপ করে বসে। কবির সামনে তখন আমের থালা সাজান। তাঁকে আম খেতে, আম শুঁকতে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না যে কবি আম খেতেন। সে যাই হোক,— আমাদের সামনে আম তুলে ধরলেন, জোর করে খাওয়ালেন, তারপর স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বললেন, একটি কথা এই : 'জীবজগতে মেয়েরা বীজ বহন করে, লালন করে, সেবা করে ; সেখানে পুরুষদের কাজ সামান্য। সৃষ্টির কাজে (creative work) মেয়েরা কিন্তু বীজ বপন করে, পুরুষে করে পালন।' (এই কথাটি বহুবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন)। আমি ত শুনে উল্লসিত। মণ্টু কিন্তু বলতে লাগল, 'দেখলে ত, রবিবাবু কী বলেন! ঠিক আমার কথা যেন কপি করেছেন। একেই না বলে কবি!' ইত্যাদি, প্রভৃতি— আজ ভাবছি সেদিনের দুপুরবেলায় একই লোক দুজনকে দুরকম রায় দিলেন? না একই মতের?

হাতের গঠন-সৌষ্ঠব কীন্‌স (Keynes)-এর চোখে খুবই পড়ত। রবিবাবুর ছাড়া আমার কাছে অন্য মানুষের হাতের গড়ন ধরা পড়ে না। অথচ ছবিতে ডুরার, দ্য ভিঞ্চি, এল গ্রেকো, রোদাঁর হাত আমাকে পাগল করে দেয়। এল গ্রেকোর হাত লম্বা, শিখার মতন, দ্য ভিঞ্চির হাত মেয়েলী, ভগবানের নির্দেশে নয়, মানুষের অভিযোগে। রোদাঁর হাত ভগবানেরই। রবিবাবুর হাতে কাজ করা যায় না, অভিজাত শ্রেণীর, প্রত্যঙ্গটি যেন রেখায়িত হয়।

হাসি দেখেছি রামেশ্বরম আর লুভ-এ। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। একটা অ-পার্থিব, অন্যটি পার্থিব। বুদ্ধ-মূর্তিরও প্রতি অঙ্গে হাসি— হাসি শান্তিতে করুণাতে গলে গেছে। হোগার্থের চিংড়ি মাছওয়ালী আনন্দে ফেটে পড়ে, কিন্তু সে পৃথিবীর।

অনেক দৃশ্য ভেসে এলো। অটার-লুর শরৎ-হেমন্তের রঙের ভিয়ান, অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চের গাছ আর মাঠ, কেম্ব্রিজের ব্যাক্‌স্‌, King's Chapel, ফ্রান্সে Notre Dame আর Chatres, ইটালীর ব্রেনার পাস, টিরোলের ইনসব্রুক্‌, প্রাগ-এর পাহাড়, রাতের হাওয়াই জাহাজ, কায়রোর আলো— আরো কত কী ওদেশের। আরো কত এদেশের। এ-সব মনে এলো নয়, এগুলো বর্তমানের। লিখতে গেলে মনে এলো, হয়ত মনের সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ভাষাই তাই। কিন্তু যখন আসে তখন সেগুলিই মন। মনে এলো নয়. মনে পড়ে নয়, মনে ওঠে নয়। এগুলো মন, মনের নয়। ভা৩৮২

গেলে, একটু পৃথক হয়েই যায়। বিশেষ থেকে বিশেষণ। উইট্‌গেনস্টাইনের মধ্যে তর্কই বেশি!

রেডিওর মারফত বড়ে গোলাম আলির গান শুনলাম দুবার। অনেক আগে শুনেছিলাম। এবার মন দিয়ে শুনতে পেলাম। আমার যন্ত্রটাও ভালো। আর গোলাম আলি সত্যিই ভালো গান। অত্যন্ত সুকণ্ঠ, নিতান্ত মেজাজী, প্রত্যেকটি combination সম্পূর্ণ, কথা ও সুরের, বাক্য ও রাগের চমৎকার সমাবেশ, গঠন সুচারু, ধরার কায়দা অপূর্ব, বন্দেশ চমৎকার।

তবু যেন খিচ রয়েছে। পাঞ্জাবী বুলি আমার ভালো লাগে না। একটু যেন স্থিরতার অভাব, অথচ বেশি দ্রুত নয়। মধ্য লয়। প্রত্যেক গানটি রাগে বাঁধা, তবু যেন নিরালম্ব রাগ পেতে চাই। গোলাম আলি গান গায়, মনে হয় যেন রাগ সৃষ্টি করে না, কথাই যেন প্রথম। (রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করছি না।) সুর নিতান্ত যথার্থ, তবু যেন কথা-প্রধান গান। মোস্তাক হুসেনের অস্থায়ীতেও কথা, তবে সেটা নিতান্ত অ-প্রয়োজনীয়, না থাকলেও চলত। আমির খাঁর আস্থায়ীও খুবই ভালো। কিন্তু সে যেন ঘুমিয়ে পড়া গান এবং ঘুম ভাঙবার পর অজস্র ঝড়ের মতো তান। মধ্যেকার গঠন নেই যাকে construction বলে। বিলায়েৎ হুসেন নিষ্ঠুর নির্মমভাবে সত্য, কিন্তু তার এখনকার গানে রস-কষ নেই। নিয়ার হুসেন খাঁ চলেন সর্প-গতিতে— আর পলুস্কার ছিলেন অত্যন্ত competent, তার বেশি কিছু নয়। এঁরা সবাই খাসা, তবু যেন ফৈয়াজ, আব্দুল করিম, নসীরুদ্দীন, রজ্জব আলি, ওয়াহিদ খাঁ, এমন কী এখনকার কৈসার বাইও যেন অন্য ধরনের, অন্য জাতের। (কৈসার বাই ছাড়া) সেকালের গাইয়েরা রাগ গাইতেন, গান গাইতেন না। ফৈয়াজ ইচ্ছা করলে গানও গাইতে পারতেন। যাই হোক, এতৎসত্ত্বেও বড়ে গোলাম আলি সত্যকারের বড় গাইয়ে। আজকাল গোলাম আলিকে ছেড়ে দিলে ভীমসেন যোশীই প্রধান মনে হয়। কী অদ্ভুত সুর ও sense of proportion.

বালজাক আর ফ্লবেয়ার— দুজনের লেখা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু রুচি পৃথক। বালজাক যেন জীবনকে ছিঁড়ে কুটে ফেলছেন; ফ্লবেয়ার ছুরি দিয়ে dissect করে দিচ্ছেন। ফ্লবেয়ারের সবখানি যেন আর্টিস্ট। বাল-জাকের হাত কাঁচা, মানুষ কাঁচা, গা থেকে ছিঁড়তে গেলে গা থেকে রক্ত বেরোয়, ঘাম ঝরে, ভালো-মন্দ গন্ধ আসে। ফ্লবেয়ারের ত্রুটি ছিল না।

একটা অক্ষর পঞ্চাশবার বদলাতেন, কিন্তু পঞ্চাশবার বদলে আবার সেই প্রথমবার। বালজাকের প্রথমবারই শেষবার। তাঁর প্রতিভা যেন বেশি। ওস্তাদি গান আর পল্লীসঙ্গীত।

প্রভাতকুমার (মুখোপাধ্যায়) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি গভীর কথা বলেছেন : 'আসল কথা, তাঁহার শোক বা সুখ কোনোটাই মনে স্থায়ী রেখাপাত করিত না— তাদের ভাবাবেগের পূর্ণ প্রকাশের জন্য— তাহা শোকই হোক বা সুখই হোক, তাহাদের উদ্‌বোধিত করিবার জন্য যতটুকু আঘাত (stimuli) প্রয়োজন হইত; ততটুকু তিনি সহ্য করিতেন— তদতিরিক্তকে আমল দিতেন না। এই নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি অন্যকে দুঃখ দিয়াছেন। তাঁহার দুঃখ intellectual emotion-এর আর একটি রূপ মাত্র, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র; তারপর সৃষ্টি-সুখ সম্ভোগ হইয়া গেলে বিস্মৃতির চির পাথারে স্মৃতি ডুবিয়া যাইত।'

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য কিন্তু প্রভাতবাবুর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। তিনি প্রমাণসহ দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ দুঃখে কাতর হতেন। আমার বিশ্বাস যে প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথের স্বভাব জানতেন। কতখানি জানতেন জানি না কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে প্রভাতবাবু ঠিক।

মন থেকে পুঁছে যায় না, কিছু থাকেই থাকে, তবে পাতলা হয়ে যায়। কতক্ষণ? যতক্ষণ বুদ্ধিবৃত্তি সম্বল রয়েছে। না হয় নিছক বোকামি। তিনি বুদ্ধি দিয়ে হজম করে নিতেন, তাই সহজে মনে হতো ভুলছেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন (জ্যোতিবাবু সম্বন্ধে) আমাকে বলেছিলেন : আমার দাদার মতন দাদা হয় না। কথা বলতে গিয়ে চোখ আর কণ্ঠ বদলে গেল।

আমাকে শীঘ্রই আলিগড় ছাড়তে হবে, সাড়ে চার বছর হতে চলল, আর ছ' মাস আছি। লাগল কী রকম? সর্বপ্রথম, কৃতজ্ঞতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে অত্যন্ত সদ্‌ব্যবহার করেছেন। ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রকার ব্যবহার হতো না। আমাকে পড়াতে হয়নি, দু বৎসর ছোটখাট সেমিনার নিয়েছি. আর ডিপার্টমেণ্টে রিসার্চ চালাতে হয়েছে। দিনে ঘণ্টা তিন-চার ডিপার্টমেণ্টে থাকতুম।

ফল কী হয়েছে? এই ক'বছরে ছয়-সাতজন লেকচারারকে বিলেত পাঠালাম। তাদেরই বাহাদুরি, আমার নয়। আমি দরখাস্ত দিতে ও

যেতে সাহায্য করেছি। এরা কিছু নিয়ে ফিরেছে— য়ুরোপ আমেরিকা থেকে ইকনমিক্স শিখেছে নিশ্চয়। ডিগ্রী পেয়েছে এবং দুজন ছাড়া অন্যে ডক্টরেট পায়নি। ভালই, ডক্টরেটে নিতান্ত একপেশে হয়ে যায় এবং শিক্ষার পক্ষে সুবিধের হয় না। অর্থাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড বেড়েছে এবং তারই ফলে ছেলেদের কিছু উন্নতি হয়েছে।

তারপর? সেইখানেই সমস্যা। তারা দু-এক বছরেই ঢিলে পড়ে গেল। আলিগড়ের অমনই অপূর্ব হাওয়া যাতে academic life বাঁচতে পারে না। কারণ কী ভাবছি। কারণ, আলিগড়।

আলিগড়ে ১৯৫১ সালে লোক ছিল এক লাখ প্রায় সত্তর হাজার— এখন বোধ হয় দুলাখ অন্তত। অতএব লোক নেহাত কম নয়; এ থেকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়। আগে ছিল সত্তর-আশি হাজার, তখনও কলেজ থাকতে যা, এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের আশীর্বাদে তা। কারণ দুটি:

(১) শহরের মধ্য দিয়ে ট্রেন দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। একধারে হিন্দু, অন্য ধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মুসলমান। এধারে মুসলমানের জোর হাজার দশেক, তাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ত। এত কম সংখ্যা নিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় চলে না। শহরের সব ছাত্রদের প্রায়ই ধর্মসমাজ, বারসেনী ও আগ্রা বিদ্যালয়ে চলে যায়। জোর শতকরা ত্রিশজন হিন্দু ছেলে শহরের ওপার থেকে এখানে আসে। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শতকরা ত্রিশজন পাঞ্জাবী শিখ হিন্দু এবং অন্য প্রদেশের হিন্দু।

(২) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ছেলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিরাগ্রহ, এবং অল্পসংখ্যক পাকিস্তানী। আমরা সকলেই নিরাগ্রহ, ছাত্ররা চাকরির জন্য আগ্রহশীল। কিন্তু নিরাগ্রহতা এখানে একটু বেশি। এদের level of aspiration নিতান্ত কম। বলেন চাকরি পান না; কিন্তু একথা ঠিক কি?

আলিগড়ের মুসলমান শিক্ষকরা ত প্রায়ই বিলেত যাচ্ছেন। I. A. S. P. C. S. প্রভৃতিতে মুসলমান ছাত্র যাচ্ছে না। তারা প্রথমত ভয়ে যাচ্ছে না, এবং দ্বিতীয়ত যে সব সম্প্রদায়ের পরিবার থেকে এরা উঠেছে, এদের মধ্যে শিক্ষা কম। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি দেবার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় শেখায়নি, দু চারটি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখাচ্ছে।

যারা নিরাগ্রহ তাদের কয়েকজন ছাত্র (এবং শিক্ষকও) হালকা রকমের পাকিস্তানী। খেলাধুলায়, জেনারেল আয়ুবের বেলায়, কাশ্মীরে, পাঞ্জাবের নদীতে, নানা প্রকারে পাকিস্তানের ওপরে এদের একটা আন্তরিক টান

রয়েছে। সেটা স্বাভাবিক, কারণ ইসলাম ধর্মে জমির চেয়ে ধর্মটাই বেশি। এঁদের মধ্যে যাঁরা গভীর ভাবে পাকিস্তানী, অথচ ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে চাইছেন না কিংবা সুবিধা নেই, তাঁরা কী করে ভারতবর্ষের প্রতি আগ্রহশীল হবেন? সেটা প্রত্যাশা করাই যায় না। জন পঞ্চাশ ছাত্র ও শিক্ষক কম্যুনিস্ট— তাদের অধিকাংশই কাগুজে-কম্যুনিস্ট। এবং এরা প্রত্যেকেই বোধ হয় ভারতবাসী। মুসলমানদের কম্যুনিজম হলো বেশির ভাগ সময় ব্যক্তিগত পরিবারের বিপক্ষতাচরণ। সংখ্যায় বেশি জমাৎ-দলের। এঁরা প্রায় শতখানেক। এবং অনুচারী আরো বেশি। এঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে চান, সেই সঙ্গে ইসলামী ইকনমিক্স, ইসলামী পলিটিক্স, ইসলামী সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি। অন্তত দুখানা মাসিক ও পাক্ষিক কাগজও বেরোয়। কম্যুনিস্টদের কাগজ নেই। তবে অন্য কাগজ যেন বামপন্থী। উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ রয়েছে। ভাষার দিক থেকে কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু গোল বাধে উর্দু কালচারে। সে বস্তুর এখনও নাম দেওয়া হয়নি। তবে অনেকের ধারণা আছে যে, উর্দু কালচার বলে একটা বস্তু আছে। সেখানে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান পৃথক। হিন্দুর হিন্দী কালচার, সেটা অত্যন্ত উগ্র এবং মুসলমানদের উর্দু কালচার, যেটা ভারতে এখনও ভাসা-ভাসা রয়েছে কিন্তু রয়েছে নিশ্চয়।

আমি চাই Composite culture— ভারতীয় কালচার। সেটা আলিগড়ের কুষ্টিতে জন্মাচ্ছে না। এখানে আলিগড়ে ছেলে তৈরি হওয়া আপাতত অসম্ভব। পরে হয়ত হবে। এই আশাতেই বসে আছি। তবে আমি বেঁচে থাকব না এই যা।

লক্ষ্ণৌ ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়— অন্তত এই দুটির অবস্থা সাংঘাতিক। কথায় কথায় writ, কথায় কথায় সত্যাগ্রহ। অবশ্য সকলেই ভারতবাসী ও হিন্দু। তফাৎ কিন্তু এইখানে; আলিগড়ের অবস্থা জোয়ার-ভাটার মধ্যকারের অবস্থা, মনে হয় পুকুরের জল; লক্ষ্ণৌ-বেনারস দুটি পতনোন্মুখ। লক্ষ্ণৌ-এর পতন শিক্ষকের কৃপায়, বেনারসের পতন শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়ের জন্য। বয়স হলে কী হয়, লক্ষ্ণৌ এর শিক্ষক বালক মাত্র। এমন জঘন্য পলিটিক্স কোথাও আছে কিনা জানি না, অবশ্য বেনারস ছাড়া। সে হিসেবে আলিগড় স্বর্গ। আলিগড়ে secular politics নেই, religious politics আছে। লক্ষ্ণৌ বেনারসে caste politics.

কোথা থেকে রক্ষা পাবে জানি না। কংগ্রেস কী সর্বনাশটা না করেছে। শিক্ষায় দোষ ছিল বিস্তর, কিন্তু কংগ্রেসের জন্যে শিক্ষার মধ্যে যে-সব দোষ

বর্তেছে সে গুণের ঘাট নেই। আন্দোলনের সময় ভালো-মন্দ ছিল, তার খানিকটা political, কিন্তু সে পুরানো আন্দোলন মরেছে, নতুন আন্দোলন আসেনি, এরা প্ল্যানিং-এ বিশ্বাসী নয়। এ অবস্থায় নতুন শিক্ষা জন্মাবে কি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নির্দেশে?

কমল ফোটে পুট করে, কলি-পিছু নয়। জাত উঠবে সমগ্রভাবে, প্রায় একই সময়ে ও প্রায় সম্পূর্ণভাবে। এ দেশে প্রথমে রাজনীতি, তারপর অর্থ-নীতি, তারও পরে সমাজনীতি এবং শেষকালে বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি। বাংলাদেশের স্বদেশী যুগে কিন্তু প্রথম দিকে সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি গোড়ায় ছিল। এখনও আছে এখানে রবীন্দ্রনাথের জন্যে। দেশ এগিয়ে চলছে, কিন্তু একই সময়, সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে নয়। প্রথমে physicist, পরে engineer, আরো পরে economist তৈরি হচ্ছে। আমাদের উন্নতি organic নয়।

১৯১৯ সালেই বোধ হয় কলকাতা য়ুনিভার্সিটিতে গেছি। সতীশ রায়ের ঘরে ব্রজেন শীল ও বিজয় মজুমদারকে দেখলাম। আমার বয়স অল্প, কিন্তু অনেক কথা হলো। বাড়িতে এসে বললাম, 'দু তিন জন বড় লোকের সঙ্গে দেখা হলো।' বিজয় মজুমদারের কথা উঠতে বাবা বললেন, 'কথায় কথায় আমার বিষয় উল্লেখ করতে পার, আর বাবার বিষয়েও।' বেশ কিছু দিন পরে সেইখানে দেখা। আস্তে আস্তে বাড়ির কথা পাড়লাম, প্রথমে বড় জ্যাঠা-মশাই, পরে কাকা, তারপর মেজ জ্যাঠামশাই, শেষে বাবার কথা। এত যে তার ইয়ত্তা নেই। ১৮৮৩-৮৪ সালে নারানপুরে পূজোর দালানে খাওয়া, পূজোর সময় পরিবেশন, পূজোর দালানের মাথায় পায়রা, পিসতুতো ভাই, পিসেমশাই, মায় পাড়াপড়শীর খবরা-খবর, যাদের নাম পর্যন্ত আমি জানি না, সকলের খবর নিলেন। পিতামহের নাম নিলেন— অসম্ভব সুখ্যাতি! পরে বাবা। বাবা অল্প কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছেন। বিজয় মজুমদার ছিলেন অন্ধ। 'তুমি আগে কিছু বললে না কেন?' চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়তে লাগল। আমার গালে হাত বোলাতে লাগলেন।

তারপর অনেকবার বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমার ছেলেকে নিয়ে গেছি, আমার ভাইও (বিমলাপ্রসাদ) গেছেন। তাঁর সঙ্গে সব সময় পণ্ডিতী আলোচনা করেছি। আমার কিন্তু মনে হয়, তিনি কেবল দিগগজ নন, সরল অকপট মানুষ, আর থেকে থেকে উঠছে প্রাণখোলা, অট্টহাসির রোল। আর মনে পড়ে তাঁর অত্যন্ত বেসুরো গান, এবং আমার গালে হাত

দেওয়া।

বিজয় মজুমদার, সতীশ চাটুয্যে আর সত্যেন (বোস)— তিনজনের বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় বেশি উন্নত।

একজন পণ্ডিত ব্যক্তি প্রায় চল্লিশখানি বই লিখেছেন; এবং এখনও লিখছেন, প্রতিদিন লিখে চলেছেন। (প্রায় পঞ্চাশখানাও হতে পারে।) পঞ্চাশ বছরে তাঁর লেখার বিরাম নেই। চল্লিশখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়, প্রায় একই বই চল্লিশ ভাবে লেখা। ভেবে-চিন্তে লিখলে তবু এক-আধখানা বই বেরুত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জমি পতিত রাখতে হয়, নচেৎ ফসল ফলে না। আমি পারি না, লিখেই যাই। তাঁর ছিল অসীম প্রাচুর্য, তবু……

আমার জমিতে জাকারাণ্ডার নীল ফুল এসেছে। পাশের বাড়িতে পাঁচটি জাকারাণ্ডা, অনেক করবী, বিস্তর বুগেনভিলিয়া। আমার গাছে বেলী চামেলির গন্ধ ভুরভুর করছে। মিসেস রায়ের বাগানে কনকচাঁপা স্বর্ণচাঁপা কাঁটালীচাঁপা। ভারতীয় ফুলের কী গন্ধ! এম এন রায় দেশী ফুল অত্যন্ত ভালবাসতেন। দেরাদুন ফুলে ভরা। এক সময় মার্চ মাসের শেষে লাট-সাহেবরা আসতেন; এখন মহারথীরা আসেন না— এঁদের ফুলের শখ নেই। দেরাদুনের গাছপালা নষ্ট হয়ে গেল, গ্রীষ্মের তাপ বেড়েই চলেছে, সে সৌন্দর্য আর নেই। তবু যা আছে তা উত্তর ভারতে কোথাও নেই। পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে যে-সব দৃশ্য আছে তার তুলনা নেই। শহর অবশ্য নিতান্ত পাঞ্জাবী, সেইজন্য sophisticated.

একবার গুজব শুনেছিলাম দেরাদুনে মুসলিম কলেজ করবার চেষ্টা হয়। আলিগড়েই রইল, কারণ আলিগড়ের আশেপাশে অনেক মুসলমান রাজা-তালুকদার ছিলেন। আলিগড়ে বুগেনভিলিয়া জন্মেছে, শিক্ষা কিন্তু ঠিক জন্মেনি।

এক কালে যুবাবয়সে, অত্যন্ত অধীর হতাম। বন্ধু এখনও আসছেন না রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি ব্যাকুলভাবে। এখনও এলেন না; তারপর এলেন, ব্যগ্রতা যেন ঝরে গেল। এখন অত অধীর হই না।

অনেক রকম কাল-প্রত্যয় হয়। বন্ধুর জন্য অপেক্ষা; সময় যেন আর কাটতে চায় না; বন্ধু এল, সময় ত্বরিতে কেটে গেল। একই কালের দুই ক্ষণ। ঘড়ির কাঁটা যেন অন্য কালের। সেটা গ্রীনউইচের নিয়মে চলে— তার ছন্দ প্রায় এক। প্রায়, কিন্তু ঠিক নয়। ঝড়ের দিনে জন্মাল, দড়ি কেটে

সময় মাপল, কোনোটা গ্রীনউইচ নয়, অথচ ঠিক। ঋতুর কাল আলাদা। আবার আলোর কাল? তারও পরে অনন্ত মুহূর্ত অর্থাৎ অতিপাত নেই, গোটা আস্ত সম্পূর্ণ। যোগীর কাছে অনন্ত। না একটিমাত্র অনন্ত? বিস্তর অনন্ত রয়েছে মনে হয়। ক্যানটর কি বলেন?

১৫. ৫. ৫৯

আজ প্রমথ চৌধুরীর কথা কেবলই মনে উঠছে। ১৯১৫ সাল থেকে মাখা-মাখি; তারও আগে মোরাবাদীতে দেখা-সাক্ষাৎ। মোরাবাদী গেলাম জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি ধ্যানে বসেছেন। এলেন একজন, সুদর্শন মস্ত গোঁফ ও আলখাল্লা পরা। চৌধুরীবাড়ির লোক মনে হলো তাই— এবং নাম প্রমথ চৌধুরী। 'সবুজপত্রে' বিপিন পালের সমা-লোচনা শুনলাম ও করলাম। একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল। সামনে দেখি, পিয়ার লোটির 'Disenchanted.' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন লাগল?' 'তুমি পড়েছ?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ' 'কোন্ জায়গায়?' অপ্রস্তুতে পড়লাম, কেমন যেন সংকোচ লাগল। যা মনে এলো তাই বল্লাম। তার পরই খেতে বললেন। বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ দুটো যেন জলজ্বল করছে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, এখনও তাই, যে কাউকে কোনো দিন সম্পূর্ণ সুখ্যাতি করেননি। ভালবাসা তাঁর কাছে যা পেতাম, তা গুনে গুনে। এক অতুল (গুপ্ত) বাবুকে ছাড়া; তাঁকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সুখ্যাতি করেছেন, স্নেহ করেছেন এবং খাতির করেছেন। পেয়েছেনও। তাঁর স্বভাবই ছিল সমালোচকের, critical। বিশেষ বিশেষ লেখা তাঁর খুবই ভালো লাগত। 'বহুৎ আচ্ছা ইয়ে তুহারী কাম' ইত্যাদি কথাগুলি বলতেন, যথা— কেদারবাবুর 'পেন-সানের পর' অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে' এবং সৈয়দ আয়ুবের প্রবন্ধ সম্পর্কে। আমার লেখার সুখ্যাতি তাঁর কাছ থেকে শুনিনি, তবে তিনি মন দিয়ে পড়তেন, কাটতেন-কুটতেন, একরকম দাঁড় করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, 'ধূর্জটি আগে কথা কও, পরে লেখো'। অনেক পরে এলিয়ট সম্বন্ধে Criterion-এ এই ধরনের মন্তব্য করেন; 'দু ধরনের লেখা লেখে— এক চিন্তার আগে, অন্যটি চিন্তার পরে। পরেরটাই ভালো।' আমার তা ঠিক মনে হয় না। অল্প বয়সে চিন্তার পূর্বে লেখা আসে, কখনও কখনও সেই সঙ্গে। চিন্তার পর যে লেখা জন্মায় তার মধ্যে ক্রিয়া অধিক হয় জানি, কিন্তু তারপর লেখা আর হয়ে ওঠে না। একপ্রকার আলসেমি আসে। বয়সের

সঙ্গে চিন্তার পরই লেখা হয়, সাধারণত।

আজ ক' বৎসর প্রমথবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনতে পাই। এখন বলছেন যে রবীন্দ্রনাথের পরই তাঁর লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য। (অবশ্য অবনী ঠাকুরের লেখা কোথায়?) অন্তত দুখানি সমালোচনার বইও বেরিয়েছে। এমন কোনো সমালোচনা নেই যার মধ্যে প্রমথবাবুর সুখ্যাতি নেই। কিন্তু এ অবস্থা ছিল না। মাত্র দু-চার জন নবীন যুবক ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার কদর করতেন। অন্যে যারা ছিলেন তাঁরা পছন্দও করতেন, অ-পছন্দও করতেন। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে তাঁর লেখা, সাহিত্য ও মানুষ সম্বন্ধে লোকে অবিচার করতেন। একা 'শনিবারের চিঠি' নয়, অন্যত্রও বীরবলী ভাষা, বীরবলী রুচি, খানিকটা ফরাসী স্টাইল এবং চৌধুরী-বাড়ির আভিজাত্য অর্থাৎ দাম্ভিকতা ধরা পড়ত। তাঁর রচনাশৈলীর ওপর লোকের কোনো মমতা ছিল না। এখন উল্টো হাওয়া বইছে। খুবই ভালো। তিনি চোদ্দ বছর বয়সে লিখতে আরম্ভ করেন, আর তারপর লিখলেন পঞ্চাশ বছর। মাথা পাকতে দেরি লাগেনি, কিন্তু সাধারণ লোকের বুঝতে দেরি লাগল। এখনও কি সকলে বুঝতে পেরেছেন?

বাংলা সাহিত্যে belles letters-এর চলন নেই। ইংরেজী সাহিত্যে আছে কি? Augustin Birrell-ই বোধ হয় একমাত্র, আর খানিকটা Hilaire Belloc, তাও তিনি ফরাসী। ফরাসী সাহিত্যে আছে প্রচুর। ঠিক প্রবন্ধের সমষ্টি নয়, অথচ প্রবন্ধ, ঠিক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়, অথচ ব্যক্তিসম্পর্কজনিত। প্রবন্ধ ছাড়া আরো অনেক জিনিস রয়েছে, যেমন ছোট গল্প, কবিতা, কিন্তু প্রধান নয়। যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে belles letters ব্যক্তিসম্পর্কের একটা কোনো বিশেষ সাহিত্যিক রূপ, বৃহৎ রূপ নয়, ছোট্ট-খাট্ট রূপ রয়েছে, কিন্তু তাইতে উজ্জ্বল। প্রমথবাবুর সাহিত্য এই অঙ্গের। রবীন্দ্রনাথের মতন monumental নয়। তিনি ছিলেন নৈসর্গিক, প্রমথবাবুর ছিল বাগান ও তৈরি বাগান। ও-দুটোর জাত পৃথক, দুটোকে সমপর্যায়ে রাখা চলে না।

'ছোট গল্প' ও 'ফাল্গুন' প্রভৃতি কয়েকটি রচনা ভিন্ন তাঁর বেশি লেখাই পুরোপুরি সাহিত্য-রসাত্মক নয়। অর্থাৎ তার মধ্যে মোটামুটি 'কাব্য'-রস নেই, সবই গন্ধ-গন্ধী। গদ্যের রস ব্যাখ্যাপ্রসূত। সেটা বাক্য থেকে ওঠে, বাক্যতেই নামে। কথার মধ্যে সিম্বল আসে কবিতায়, যেখানে প্রতি সিম্বল

পৃথক ও ঘন। গদ্যে তা নেই— সেখানে সিম্বল যদি থাকে ত ছড়ান ; ছড়ান সিম্বল সিম্বল নয়। প্রমথবাবুর কবিতাতেও সিম্বল নেই— অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কবিতা, কিংবা হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিতা। তাঁর কবিতা যেন বাক্য, টুকরো বাক্য। সবই যেন wit, রসঘন গদ্য, প্রাঞ্জল, ভাবের ইঙ্গিত নেই, নিতান্ত স্পষ্ট।

তাঁর গল্পের স্টাইল এবং প্রবন্ধের স্টাইল একই। কিন্তু গল্পেতে একটা fantasy পাই। 'চার ইয়ারি কথা'য় একটা ভূতুড়ে ভাব, 'নীল লোহিতের স্বয়ম্বর', 'বীণা বাই', 'ফরমায়েশী গল্পে'ও তাই, fantasy। স্টাইল এক, কিন্তু গল্প হলো তর্কের বাইরেকার জিনিস। সেখানে খামখেয়াল।

আমি কতখানি প্রমথবাবুর কাছ থেকে পেয়েছি ? প্রায় সবখানিই, কুঁচিয়ে কাপড় পরা থেকে, সিগারেট খাওয়ার ধরন চলন-বলন, সবই। রচনারীতি ? তাও তাঁর, তবে ঠিক সম্পূর্ণ তাঁর নয়। 'দাদার ডায়েরী' 'ধরতাই বুলি', 'নর্মাল'— এ সব লেখা আমার নিজের, তিনি বদলে-সদলে বোধ হয় দেননি। সবুজ পত্রের অন্যান্য লেখায় তাঁর হাত আছে। সবুজপত্রের লেখা ছাড়া তিনি অদল-বদল করেননি। তবু তাঁর ছাঁচ থেকে গেছে। অন্যত্র কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর। আমি তাঁর ছাত্র। তাঁর কাছে কেমিস্ট্রি পড়তাম, আর যাগ-যজ্ঞের ব্যাখ্যা শুনতাম। প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমার মনে বসে যায়। তাঁর ভঙ্গি না পেলেও তাঁর মনোভাব কিছু আমি পেয়েছি। গত বৎসর 'বসু-মতী'তে একজন আমার 'বক্তব্য' নিয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। এমন যথার্থ লেখা আমি কম পেয়েছি। তিনি বলেছেন যে, আমি রামেন্দ্রসুন্দরের শিষ্য-পরম্পরা। তিনি ছাড়া এ-কথা অন্য কেউ লেখেননি, আমিই কেবল জানতাম। তবু আমি প্রমথবাবুর শিষ্য। রামেন্দ্রসুন্দর আর প্রমথবাবু, দুজনের কাছেই আমি ঋণী ; প্রমথবাবু সর্বতোভাবে, রামেন্দ্রসুন্দর গোপনে।

ঐতিহাসিক জ্ঞান নিয়ে যেন একটু বাড়াবাড়ি করে আসছি। সাহেবে বলে, ভারতের ইতিহাস-জ্ঞান কখনও ছিল না। ভীষণ আপত্তি করেছি। কখনও কখনও মনে হয় আজকাল, যেন না-থাকাই ভালো ছিল। উপনিষদের ঋষিদের কী জীবন-চরিত লেখা হতো ? তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান, যতটা সঞ্চয় ততটা, এর বেশি নয়। জ্ঞান-সঞ্চয়ের ইতিহাস কিছু নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু জ্ঞানের পূর্বেকার ইতিহাস নিতান্ত কম। শিক্ষা অবশ্য ছিল, কিন্তু অধ্যয়নের অংশ তার ফলের চেয়ে কম। জ্ঞান পাওয়াটাই শেষ-বেশ। নাট্য-কারের পিছনে কী আছে জানতে যেন চাই না; এইটাই মঞ্চ, এইটাই সনাতন, এইটাই বর্তমান। ইতিহাস নিয়ে অত মাতামাতি কেন? সেটা এ-যুগের রোগ। আমি নিজে এ-রোগে দুষ্ট। আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে এখন ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছুই ভালো লাগে না।

ইতিহাসের নিয়ম বিজ্ঞানের নিয়ম থেকে পৃথক। অটারলু'র আগের রাত্রে নেপোলিয়ন পচা আলুর বড়া খেয়েছিলেন (যদি সত্য হয়); সেটা হবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম, ঐতিহাসিক নিয়ম নয়। তফাতটা মাইক্রো আর ম্যাক্রো নিয়ে— একটা একক, অন্যটা গড়পড়তা। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্বন্ধ হলো গড়পড়তা, মোটা গতিহার, যার সঙ্গে একের, প্রত্যেকের হার মেলে না। কখনও মনে হয় যে, প্রত্যেকের গতিই নেই, যেন স্থাণু। ইতি-হাসের গতি ও গতিহার আছে, যদিও সেটা বোঝা শক্ত।

মার্কসিস্ট ইতিহাসের প্রধান বক্তব্য এই গতিহার। কিন্তু কম্যুনিজমের ওপর এতই রাগ যে তার জন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক মার্কসিস্ট-ইতিহাসের প্রধান বক্তব্যটি ত্যাগ করতে তৎপর। ইসায়া বার্লিন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কিন্তু মার্কসিজম্ ছাড়তে গিয়ে পপ্পারের গর্তে পড়ে গেলেন। বুদ্ধিমান, অতি বুদ্ধিমান, যার পশ্চাৎভাগে এই ধরনের দড়ি পড়ে।

এক এই উপনিষদের ঋষি, তার ইতিহাস নেই; আর মার্কসিস্ট ইতি-হাস, সত্যকারের ইতিহাস, তার গতি ও গতিহার আছে— এই দুটোর সমন্বয় কী ভাবে?

আজ শিবনারায়ণ রায় বললেন যে, ইসায়া বার্লিনের Inaugural Address পপ্পার থেকে নেওয়া। বার্লিনের নতুন লেখা পড়িনি, তাঁর অন্য সব লেখা পড়েছি। কিন্তু মনে হয়, বার্লিন সুন্দরভাবে বেশি কথা কন। পপ্পার-ও মানি না, তিনি ইতিহাসের নিয়ম-কানুন স্বীকার করেন না। অনেক ভুল আছে স্বীকার করি, তৎসত্ত্বেও ইতিহাসের একটা-না-একটা নিয়ম আছে জানি। তা যদি হয়, তবে social engineering হলো ইতিহাসের অন্তর্গত, তার বাইরে নয়।

আমার চার হাজার বইয়ের মধ্যে ঠিক এক হাজার, শুধু Economics-এর বই বিক্রি করে দিলাম। মাত্র একশ' রেখেছি। তার বেশি পড়তে পারব

না। তবু প্রিয় জিনিস হাত থেকে বেরিয়ে গেল। একটু আপসোস আছে, দুঃখ ঠিক নেই।

ছেলেবেলা থেকে বই কিনে আসছি আর পড়ছি। প্রায় স্কুল থেকেই আরম্ভ হলো। শিয়ালদা স্টেশনে ছ' আনার জিনিস আট আনায় জর্জ এলিয়টের Adam Bede কিনলাম। তারপর মেকলের ইতিহাস, এখনও আছে। কলেজে সেন ব্রাদার্স, প্রথম খোলে কলেজ স্ট্রীট আর বৌবাজারের কোণে, তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে উঠে এলো। বিদেশী সাহিত্য আর ইতিহাস কিনেই পড়তাম। ভোলা সেনের মৃত্যুর পর সে দোকানে আর ঢুকিনি। তারপর থেকে বুক কোম্পানি। কত ধরনের বই-ই না কিনেছি। প্রফুল্ল ঘোষ, সতীশ বাগচি প্রভৃতি দু-এক জনের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু তাঁদের বাদ দিলে আমাদের বন্ধুরাই সবচেয়ে বেশি বই কিনতেন। অঙ্ক ছাড়া সব বিষয়ের বই-এর প্রতি আমাদের মমতা ছিল। লক্ষ্ণৌ-এ যখন এলাম, (বুক কোম্পানির বই লক্ষ্ণৌ-এ বসেই কিনতাম) তখন নতুন করে তিনটি এবং পরে আরেকটি, বই-এর দোকান খোলা গেল বলতে হবে। লক্ষ্ণৌর এই চারটি ভিন্ন কলকাতার দুটি আর বোম্বাই-এর দুটির সঙ্গে আমার কারবার ছিল। বোম্বাই-এর Co-operators Book Depot ইকনমিক্সের শ্রেষ্ঠ দোকান। এর পর বিলেতী বই ত আছেই। এত বই জমে গেছে, এত নিয়ে কী করব! অথচ ছাড়তেও মন চায় না! দেরাদুনে বসে মাত্র দু হাজার বই রাখব ভাবছি। আর্ট, সাহিত্য, ইতিহাস এবং সভ্যতা, আর কিছু সামান্য ইকনমিক্স ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে।

বই পড়া weariness of the flesh জানি, কিন্তু না পড়েও ত গতি নেই! প্রায় বছর দুই অকর্মণ্য ছিলাম। এখন আবার যেন ভালেই লাগছে। কাজ না করে থাকতে পারব কি?

দেরাদুনের বাড়ি থেকে দৃশ্য অপূর্ব। ঠিক পাশেই বেদের ঋষিপর্ণা (রিস্‌পান্না) সামনে চারধারে হিমালয় আর শিবালিক। নদীতে জল নেই, কিন্তু বর্ষা নামলে পাগলের মতন পাহাড় থেকে হুড়মুড় করে চলে আসে। নদীর ওপারে শালের বন, তারই পরে সবুজ পাহাড়, তারও ওপর দু'সার বনহীন পাহাড়। চোখে পড়ে তিনটি পরত—আলো খুললে চারটি, এমন কী পাঁচটি। আজ দুদিন মেঘ ছিল, সামনের পাহাড় ঘন নীল হয়ে গেল, আধ ঘণ্টা পরে আবার সবুজ, ঘন সবুজ, হঠাৎ দেখি পাটল। পর্দায় পর্দায় রঙের বাহার—থিয়েটার দেখছি। মানুষের দৃষ্টি দিয়েই প্রকৃতি দেখে, প্রকৃতি দিয়ে

ছবি দেখে না।

(কথাটা কিন্তু কেমন লাগল ? নৈসর্গিক দৃশ্যে কী মানুষ এক কোণে থাকবে, না থাকবে না ?)

বাড়ির সামনে শুকনো নদী, আর ও-পাশে বন। কিন্তু সেই বনের মধ্যে **Cheshire Home.** ভদ্রলোক যুদ্ধের সময় হাওয়াই জাহাজের বিখ্যাত চালক ছিলেন। হঠাৎ ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ভারতের দুঃস্থ ব্যক্তিদের সেবা করতে মন দিলেন। অদম্য শক্তি! একটা মানুষে এত কাজও করতে পারে ! লোকজন জুটছেও অনেকে।

কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কত দিন চলবে ? সমবেত কাজের দাম এ-যুগে বেশি। মানুষ নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, দশটা, অর্থাৎ সমবায়। ইতিহাসে চলাটাই যদি শ্রেয় হয়, তবে কার্য হবে একত্রে।

ছোট্ট ছোট্ট অভিজ্ঞতা, ছোট্ট ছোট্ট জ্ঞান, ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা, এই সব মিলে-মিশে মালা গাঁথা। বৌদ্ধধর্মের দানা বাঁধা, আত্মা নেই। কোথা থেকে সাতত্য আসে কে জানে ? ওটা কি কেবল cons'ruct মাত্র ?

অন্ধকারে বসে ছিলাম। একটা জোনাকি এলো। আলোয় ভরে গেল। হিন্দীতে বলে, জুগনু। আমার এক বন্ধুর অতি সুন্দরী ছোট্ট মেয়েকে জুগনু বলে ডাকতাম। একবার বহু বৎসর আগে, বোধহয় ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময়, দার্জিলিং থেকে পাহাড়ী ট্রেনে চড়ে নামছি, তিনধরিয়া আর শুখনার মাঝামাঝি জায়গাটায়; শুখনার জঙ্গলের কাছ বরাবর রাত্রি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটাও থামল, লোকজন সব নিঝুম নিস্তব্ধ; হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি এল, লক্ষ লক্ষ জোনাকি, কিন্তু আলো হয়ে উঠল না, বনের অন্ধকার আরো ঘন কালো হয়ে গেল। আলো যেন মিইয়ে দিয়েছে, কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। অনেকক্ষণ গাড়ি চুপ করে থামবার পর আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো।

১৯০৯-১০ সালের দৃশ্যটি মনে এলো। সে দৃশ্য গত পঞ্চাশ বছরে একবারের বেশি মনে ওঠেনি। মনের মধ্যে রেকর্ড থাকে, পিন গাঁথলে মনে পড়ে যায়। কিন্তু পিনটা গাঁথল কখন ? পঞ্চাশ বছর বাদে হঠাৎ মনে পড়ল কেন ?

আমেরিকান অধ্যাপকরা বেশি কথা কন। সবচেয়ে বেশি সমাজতাত্ত্বিকরাই। এত অবান্তর কথা কখনও শুনিনি। **Organisation Man, Lonely**

Crowd প্রভৃতি বই একশ পৃষ্ঠায় লেখা চলত। নতুন কী বলছেন বুঝি না। কিন্তু বুঝতে আর বোঝাতে চাইছেন— এইটাই বড় কথা। মাথার ভেতর গিজ্ গিজ্ করছে, কমই দানা বাঁধে, কোনোটা বাঁধে না। অনেকটা জীব-জগতের ব্যাপার। মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোক, ঘটনা নিয়েই খেলা, ধর্মের খেলাও আছে, কিন্তু মরমী কবিতা নয়। ঠিক আইডিয়াও সেই রকমই। স্পিনোজা, লাইবনিট্জ, ডেকার্ত, লক এঁরা স্বল্প কথার লোক। আরো অল্প, নিতান্ত অল্প উপনিষদের কথা। চীনে দর্শন অত্যন্ত স্বল্প। অবশ্য ব্যাখ্যার দর্শন অত্যন্ত ছোট্ট। বড় ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকবেই। আমার নিজের ইচ্ছা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বুঝতে চাই, বোঝাতে চাই না। বুঝতে চাওয়াটাই বোধহয় অব্যক্ত।

আজকাল যেন একটু সংকীর্ণ হয়ে আসছি। আগে অত্যন্ত কথা কইতাম, এখন আর ভালো লাগে না। বক্তব্য যেন ঘন হয়ে আসছে। 'মনে এলো'র লেখাটা যেন এই পর্যায়ের ঘন, খাপছাড়া নয়। গত এক মাসে মাত্র একশ কথা কয়েছি। বেশ চুপচাপ বসে আছি। লোকজন খুব কমই আসে, তাঁরা নিজেরাই আলাপ করেন, আমি শুনি, বিরক্ত হয়ে চলে যান বোধ হয়। শুনে বাক্য আসে না। আমার আমেরিকান হওয়া আর হলো না।

ভালো লাগা, ভালো না-লাগা, এ দুটি ভিন্ন আরেকটি তৃতীয় স্তর আছে। তাকে বোধহয় আমি good বলি ; ছেলেটি ভালো নয়, good ; বইটি ভালো নয়, good ; ছবি ভালো নয়, good— ইত্যাদি। Good-এর অস্তিত্বই পৃথক।

আরেকটি সত্তা, যেমন শুখনার জঙ্গলে জোনাকি, বারাসতের বাড়িতে চিলকোঠায় রাত্রে শুয়ে বেহাগ গাওয়া, ভগবান সহায়, সত্যেন বোস এদের কেবল অস্তিত্ব। দোষ নেই, গুণ নেই, নিছক অস্তিত্ব ; sublime নয়, strange নয়, romantic নয়, lyric নয়, কেবল আছে। সেইটাই তাই, তার বর্ণনা নেই, বর্ণনার প্রয়োজনই নেই। একটা ফুল ফোটে তাই সব, তার নাম জানি না, তবে কেবল আছে। তা নিয়ে পাগল হবার দরকার নেই— এটা ভালোমন্দর ওপারে। মঙ্গলের অস্তিত্ব আছে, কেবল থাকাটাই অস্তিত্ব, কিন্তু প্রতি অস্তিত্ব স্বতন্ত্র।

রাজগোপালচারি Conservative Party (স্বতন্ত্র দল) খুলছেন। আমাদের parliamentary democracy নিতান্ত ব্রিটিশ। অতএব Conservative Party কেন হবে না? মোদ্দা কথা এই, মাদ্রাজ ভারতের বিপক্ষে, এ অবস্থায় মাদ্রাজ ভারত থেকে বহিষ্করণ না করে কিংবা বহিষ্কৃত

না হয়ে conservat've party হিসেবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। এটা মন্দের ভালো।

অবশ্য মিনু মাসানী, জয়প্রকাশ, রাজাজী, রামমনোহর লোহিয়া অল্প-বিস্তর জওহরলালের বিপক্ষে। এঁরা প্রত্যেকে কম্যুনিজম, সোভিয়েট-তন্ত্র, চীন প্রভৃতির ঘোরতর বিপক্ষে। এঁদের পক্ষে চীন-রাশিয়াকে ঘৃণা করা ভারতকে ভালোবাসার চেয়ে অনেক বেশি। ব্যাপারটা হলো, ম্যাকার্থি মারা গেছেন কিন্তু তার ঝাপট্টা উগ্রভাবেই চলছে। ব্যক্তিগত সমবায়ের স্বপক্ষে যত সব মন্তব্য তৈরি হচ্ছে তাদের প্রায় সবগুলিই ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বপক্ষে, এবং সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিলেতী উনবিংশ শতাব্দীর। এঁদের একজনও সমবায়ের মূলসূত্র বোঝেন নি বলে মনে হয় না। এঁরা সমবেত— ব্যস্ এই পর্যন্ত। এখানে স্বতন্ত্র-দল আর P.S.P. ইত্যাদি এক।

তার মানে নয় যে জওহরলালের, কংগ্রেসের, সরকারের কোনো দোষ নেই। যথেষ্ট দোষ আছে। তৎ-সত্ত্বেও জওহরলালের উদ্দেশ্য সাধু। তাঁর সততা পরিষ্কার, ঝক্‌ঝক্‌ করছে। ভুল করেন, আবার দোষ স্বীকার করেন না। সরকার তবু করেন, তাও জওহরলালের জন্য। তিনি না থাকলে সরকার নিজেদের চোখে তখন অতিমাত্রাই ঠিক, যখন ভুল তখন প্রায় সর্বান্তঃকরণেই ভুল। এই ভুল ও ঠিকের, কালো ও সাদার মাঝামাঝি কিছু জিনিস নেই। তার তুলনায় জওহরলাল লিবারেল। স্বভাবে উগ্রপন্থী, কিন্তু কার্যে নয়। Lib.ralism-এর দোষগুণ তাঁর ভেতর আছে। অবশ্য জওহরলাল ও Pep Group-এর কংগ্রেস দল ভিন্ন সব কংগ্রেসম্যানই মনে-মনে স্বতন্ত্র পার্টির লোক।

আমি পলিটিক্যাল জীব নই, কেবল ভালোভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চাই। সব পার্টির সঙ্গেই আমার যোগ আছে। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেছি; কম্যুনিস্টদের অনেককে আমি চিনি জানি, দু-চারজনকে ভালোবাসি; পি-এস-পির নেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সকলের দোষ-গুণ কিছু কিছু জানি। Con.ervative Party-র একজনকে ছাড়া কাউকে চিনি না। বাংলাদেশের দু'চারজন ছাড়া বেশি লোক এ দলে ভিড়বে না। আমি বোধহয় তাঁদের নাম জানি।

২২. ৬. ৫৯

সত্যেন (বোস) মুসৌরি থেকে আমার কাছে দেরাদুনে এল। সঙ্গে তিনটি অধ্যাপক-ছাত্র নিয়ে। দুদিন পরে চলে গেল। জন পঞ্চাশেক Theoretical Physics-এর তরুণ ও অ-তরুণ অধ্যাপক নিয়ে এক মাস ধরে মুসৌরিতে রোজ আলাপ-আলোচনা করলেন। সত্যেনের মতে বাঙালি ছেলেদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভালো ছেলে মনে হলো। হুমায়ুন কবিরের ছেলে ও অল্লাডি কৃষ্ণ স্বামীর ছেলে খুব বুদ্ধিমান, এই দুটিকে বিশেষ করে তার মনে ধরেছে। এক মাস সত্যেন তাদের নিয়ে খুব খেটেছে।

আমি প্রশ্ন করলাম, বিজ্ঞানে আপনারা সারাদিন সমস্যা নিয়ে সমালোচনা করেন। Social Science-এ সে ধরনের সমস্যা সর্বক্ষণ চলে না। বোধ হয় অর্থনীতিতে যাদবপুর ও দিল্লীতে কিছু হচ্ছে। অন্যত্র বোধহয় না। বি. এ এম. এ পাস করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সমস্যামূলক শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে। Social Scienee-এর শিক্ষা problem-centred নয়, নিতান্ত পুরানো বই ঘাঁটা তাও নয়, তৃতীয় শ্রেণীর text book নিয়ে নাড়া-চাড়া। বক্তৃতাকে সেমিনারে পরিণত না করা ছাড়া উপায় নেই।

কেরালার ব্যাপারটা একটু যেন গুরুতর মনে হচ্ছে। আট-দশ জন গুলি খেয়ে মরে গেল— জিনিসটা ভালো লাগছে না। নম্বুদ্রিপাদ অতিশয় মাথা-ঠাণ্ডা লোক; ইন্দিরা গান্ধী পিকেটিং বন্ধ করতে বলছেন; বিপক্ষের দল অর্থে ক্যাথলিক কম্যুনালিস্ট, anti-communist। জওহরলাল কেরালায় যাবেন — একটা নিষ্পত্তি হবেই হবে। সত্যকারের বিরোধ বাধল কম্যুনিস্ট আর অ্যান্টি-কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে। মুখে চলবে ডিমোক্রেসি, দাঁড়াবে Cold War। যেটা আমেরিকায় ছিল, পাঁচ বছর বাদে ভারতবর্ষে জোরে এলো। ভারতবর্ষ অসভ্য জায়গা হয়ে উঠলো। যাবেই বা কোথা?

Cold War থামবে কিসে? ব্যক্তিগতভাবে লিবারল হওয়া ছাড়া উপায় কি!

৮ই মে তারিখের Times Literary Supplement-এ আমার বইয়ের একটি ছোট রিভিউ বেরিয়েছে। সুখ্যাতি কিন্তু নিরর্থক।

২৩. ৬. ৫৯

নবেন্দু (বসু) বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অল্পই লিখেছে, মাত্র দুখানি। কিন্তু অত সুন্দর বই দুর্লভ। কী রকম ভাবে বাংলা কাব্য বুঝতে হয় তার বিশদ ব্যাখ্যা সে করেছে। যাকে কাব্য-পরিচিতি বলে, তা এখানেই পাওয়া যায়। অল্প বয়সে মারা গেল। আমি ছিলাম তার 'বড়দা'। উনাও-র গঙ্গায় তার সৎকার করলাম। গঙ্গার পুলের নীচে, ট্রেনের ধারে, তাকে দাহ করা হলো। বালুর ওপর চড়া, তাইতে আগুন দেওয়া হলো, মাত্র দশ-পনের মিনিটে পুড়ে গেল। একবার জলে উঠল— তার পরই শেষ! এত অল্পতে নিঃশেষ হয়ে যায়! সেখান দিয়ে যখন যাই তখন চোখ বুজে ফেলি, লক্ষ্ণৌ-এর তার বাড়ির কাছেও তাই। তার কথা ভাবতে প্রাণটা ছাঁৎ করে ওঠে।

প্রফুল্ল ঘোষ মশায় আমাকে বলেছিলেন, 'নবেন্দুর মতো সাহিত্য-রসিক দুটি নেই। সত্যই তাই, তার মধ্যে নিষ্ঠা ছিল। কিন্তু বাঙালিরা তাঁকে চিনলে না— এটা বড় দুঃখ!

রবীন্দ্রনাথ, অজিত চক্রবর্তী, মোহিত মজুমদার, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং নবেন্দু— এঁরাই যথার্থ কাব্য-সমালোচক। ভিন্ন সুরের, ভিন্ন শ্রেণীর, ভিন্ন ধরনের। তবু তাঁরা কাব্যকে ভালবেসেছেন, বুঝেছেন এবং (সুধীন্দ্র ছাড়া) অন্যকে বুঝিয়েছেন। সুধীনকে বোঝা একপ্রকার snobbery! সব চেয়ে স্বচ্ছ লেখা নবেন্দুর। গদ্য-ছন্দ সম্বন্ধে নবেন্দু সামান্য লিখেছে, কিন্তু সেটা মহামূল্য।

২৪. ৬ ৫৯

এখনও গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের নাম কথায় কথায় মনে ওঠে। দিনে একবার নেই যে তাঁদের কথা মনে পড়ে না। তার পরেই বোধহয় অরবিন্দ। শেষে আসে আরেক জন চতুর্থ ব্যক্তি, কৃষ্ণপ্রেম।

গান্ধীজীর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিপক্ষাচরণ করেছি। মরণের পর কিন্তু বুঝলাম। তাঁর মৃত্যু অ-ভারতীয়, সমগ্র বিশ্বের বস্তু। রবীন্দ্রনাথকে ১৯১০ থেকেই বুঝেছি তিনি মহৎ। মৃত্যুর আক্রমণে মহৎ, কিন্তু ব্যক্তিগত মৃত্যু সম্পর্কে সেটি প্রহেলিকা। উপনিষদ ও personality দুটোই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু দার্শনিক সমন্বয় পাননি। আর অরবিন্দ, তিনি মহাপুরুষ, তাঁর সব কথাই শুনি, কিন্তু অনেক জিনিস গ্রহণ করতে পারি না। তিন-জনেই ভগবান মানতেন। আশ্চর্য লাগে যে লেনিন ভগবান মানতেন না।

জেনেও তিনি মহৎ। মানুষ হিসেবে এঁরা একশ্রেণীর।

আমি কিন্তু একজনকে জানি যে মোটেই মহামানব নয়, মহাপুরুষ নয়, মহাত্মা নয়। মানুষ, স্থিতপ্রাজ্ঞ বুদ্ধিদীপ্ত এবং আত্মজ্ঞানী। ভক্তিমান, কীর্তন গায় ও ভগবানের নাম নেয়, তবু মহাপ্রাণ। তার সঙ্গে ১৯২২ সাল থেকে আলাপ, আলাপের চেয়ে বেশি। কত আলোচনা করেছি, তার কৃষ্ণ-ভক্তিকে ঠাট্টা করেছি। সে কিন্তু আমার কাছে এলেই গা জুড়িয়ে যায়, আমার জঞ্জাল দূর হয়, নতুন, ঠাণ্ডা মানুষ হয়ে যাই, ভেতরকার সমস্যা সরে যায়। সে কেষ্টঠাকুর মানে, পূজো করে; আর আমি সম্পূর্ণ অন্য জীব। তবু যেন এক। আমাদের ঐক্যের সন্ধান জানি না, কিন্তু ঐক্য আছে এই জানি। নাম তার Nixon, বনাম কৃষ্ণপ্রেম। Spiritualityটা ভগবদ্ভক্তির চেয়ে উঁচু জিনিস মনে হয়।

২৫. ৬. ৫৯

সত্যানন্দ যোশী বলতেন, চারজন মানুষ গান শুনতে শুনতে 'ম্যস্ত' হয়ে যান; রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, অতুলপ্রসাদ সেন এবং আরেক জন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক পাগল হ'তেন না, মশগুল হ'য়ে যেতেন, চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে শুনতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাইতেনও। গান্ধীজীর পাশে বসে (দিলীপের বাড়িতে) আবদুল করিমের গান শুনেছি। তাঁকে 'ম্যস্ত' হতে, কী মশগুল হতে দেখিনি। গান বন্ধ হবার পরই টাকা তুলতে লাগলেন, আর মেয়েরা হাত থেকে গয়না খুলে দিতে লাগল। গান্ধীজী যাবার পর সোমনাথ (মৈত্র) একটা গল্প শোনালেন, তিনি তখন আম্বালাল সারাভাইয়ের বাড়িতে পড়াতেন। একদিন আম্বালালের স্ত্রীর ওখানে গানের বৈঠক হয়, গান্ধীজী আসেন। (বোধ হয়) মোরাদ আলি বীনকার বাজাচ্ছিলেন। আম্বালালের স্ত্রী গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল?' গান্ধীজী উত্তর দিলেন: 'It is sweet indeed, but it is not so sweet as the music of my Charka.' গুজরাতিতে এই কথা বলেন।

সেদিন ঐ আসরে শরৎচন্দ্র ও অতুলপ্রসাদও ছিলেন। এমন মণিকাঞ্চন যোগ কখনও দেখিনি। সেইদিন সকালে শরৎচন্দ্রকে ডাকতে গিয়ে দিলীপ বল্লে, 'মস্ত ওস্তাদ! আপনাকে আসতেই হবে।' শরৎদা উত্তর দেন, 'মস্ত ওস্তাদ! কিন্তু থামে ত?'

অতুলপ্রসাদই 'ম্যস্ত' হ'তেন। একেবারে পাগল হয়ে যেতেন, গান

শুনতে শুনতে কোলের ওপর ফরাস টেনে নিতেন, আর 'ওয়া-ওয়া' শব্দ !

আরো দু'একজনের ব্যাপার জানি। গোলাগঞ্জের নবাব, যিনি ঠুংরি শুনতে শুনতে গলে যেতেন। আর একজন সেই লক্ষ্ণৌ-এরই এক অজানা বন্ধু। এক পুরানো বুড়ো বাড়ি, শহরের এক ভাঙা পল্লীতে। আমীর খাঁ সুহা সুখরাই গাইছিলেন। গান থামবার পর এত ভিড়ের মধ্যে একজন অতিবৃদ্ধ লোক ময়লা চুড়িদার পায়জামা আর কুর্তা পরে উঠে এসে ওস্তাদের সামনে হাজির হলেন, আর 'ওয়াহা, ওয়াহা' ডাক ছাড়লেন। তার পরই ওস্তাদের গালে চুমু খেয়ে ধীরে ধীরে উঠে নিজের আসনে সমাসীন হলেন। লক্ষ্ণৌ-এ এ জিনিস ছিল।

তানকারীর সময় আমীর খাঁ মাথা চুলকোতেন এবং মাথায় ও গালে থুতু মাখতেন। কিন্তু সত্যি গুণী, বাঘের মতন রাগকে কামড়ে ধরতেন। হায়দ্রাবাদের তানরাজ খাঁর ভাইপো— অন্তত তাই শুনেছিলাম। একদিন সকালে ললিত গান। মম্মন খাঁর সারেঙ্গীতে আর আমীর খাঁর গানে যে ললিত শুনেছি তার তুলনা হয় না। ললিত অত মিষ্টি জানতাম না। আলাউদ্দিনেরও ললিত শুনেছি, কিন্তু যেন অত মধুর নয়। সে কী দুই মধ্যম !!

আলাউদ্দিনের, নাসীরুদ্দিনের আর মম্মন খাঁর কেদারা আর কোথায়ও শুনতে পাব না। মম্মন খাঁর শুদ্ধ মধ্যম যেন জমে গেল, সেইটাই তাঁর জমি, তাঁর স্বর, তাঁর প্রাণ।

এর সব শুনে 'মস্ত' না হয়ে আর থাকা যায় না।

২৬. ৬. ৫৯

কথাটা খাঁটি : 'But science does not grow non-science in stages ; for all its imperfections a science is science from the first question asked.' ইকনমিক্স ধীরে ধীরে বিজ্ঞান হয়ে ওঠে না, খানিকটা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া যায়। অঙ্ক দিয়েও পুরোপুরি বিজ্ঞান হয় না। আমার ধারণা এই, এখন অঙ্কের সাহায্যে ইকনমিক্স হচ্ছে, তার পরে আর হবে না। তারপর সমাজতত্ত্ব আসবেই আসবে। অবশ্য অনেক দিন পরে।

একসঙ্গে এক মানুষের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন জিনিস লক্ষ করেছি। গিরিজা-

পতি (ভট্টাচার্য) তিনটের সমন্বয় করেছে, বিজ্ঞান, বাংলা ছন্দ আর শিকার। কবিতা ও ছন্দ নিয়েই তার প্রতি আমার প্রথম আকর্ষণ; তার মাতামহের কাছে সংস্কৃত ছন্দের একটা বই ছিল, তাই পড়ত এবং তারপর সত্যেনের (বোস) মুখ থেকে রবীন্দ্রনাথ পড়া। তারপর বিজ্ঞান এল প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, সেখানে রিসার্চ করত। দুটো এক হলো কী করে বুঝি না, বোধ হয় অঙ্ক ও জ্যামিতির ব্যাসকূট থেকে। শিকারের ঝোঁক এল অল্প-বয়সে জন্তু-জানোয়ারের শখের জন্য। বড় বৈজ্ঞানিক, বড় ছান্দসিক হতে পারল না, তাই শিকার শুরু হলো। একটি মাত্র বাঘ শিকার ছাড়া অন্য কিছু করতে পারলে না। বড় হতে পারলে না, হলো কিন্তু একজন ভদ্রমানুষ। ক'জনই বা ভদ্র হয়?

কোনো মানুষ কখনও আর্টিস্ট হয়ে জন্মায় না; সব মানুষই কখনো, কোনো সময় আর্টিস্ট হয়। এরিক গিল ও ডেভিড জোন্স-এর এই কথাটি মানি।

তা যদি হয় তবে আর্টিস্ট হয় না কেন? কুশিক্ষার দোষে, পিতা-মাতার ও শিক্ষকের দোষে।

শিক্ষার বেশির ভাগ স্বকীয়। অসিত (হালদার), অবনীবাবু ও ওকাকুরার কাছ থেকে কিছু পেয়েছিল, বাকিটা নিজের? কতখানি ও কতটা নিজের? নিজের যেটুকু সেটা হলো mystic..l আর . b t:act অংশ।

রোয়েরিক-এর পাহাড়ের ছবির রং চমৎকার, কিন্তু বেশি mystica'! মান্ড্রিয়ান-এর :.bs ract art অপূর্ব। তার সবটাই ডিজাইন। মান্ড্রিয়ান আমাকে মুগ্ধ করে— অশুদ্ধ রং আর শুদ্ধ ডিজাইন, দুটো মিশে ঠিক যেন বিশুদ্ধ intellec'ual নয়। পিকাসোর পেঁচা একটা abstraction। প্যারিসে একটা পিকাসোর চায়ের বাটি দেখি— বিশুদ্ধ p'asticity।

যামিনী রায়ের তিনখানা ছবি আমার কাছে আছে, তার মধ্যে একটা গলির। যত দেখি ততই নতুন মনে হয়। ভাল ছাপার মধ্যে একটা মাতিস-এর Odalisque, আর একটি ওয়াক-এর Chanticleer আছে। Odalisque-এর বর্ণ সমাবেশ একটু আলংকারিক, জাপানী। Chanticleer-এর মোটা রেখার টান একটি ওপরে অন্যটি নীচেয়। আজকাল যেন কিছুর অভাব দেখি। অসিত হালদারের অলিন্দ যেন বেশি কালো হয়ে গেছে। দুটি মেয়ের গতিভঙ্গি ও খোঁপায় চাঁদের আলো— কিন্তু sentimental নয়। আরো একটি পাহাড়ী মেয়ের ছবি, অল্প বয়সের একটি মেয়ের আঁকা, কিন্তু ললিত সেন (লক্ষ্ণৌ-এর অধ্যক্ষ) যেন মুখটা সবই বদলে দিয়েছিল।

বসে বসে ছবির প্লেট দেখি— একজিবিশন দেখতে ইচ্ছে হয় না। মাল্‌রো-র কথাই মনে হয়।

২৮. ৬. ৫৯

হঠাৎ খেয়ালের মাথায় হৃষীকেশ আর লছমনঝোলা দেখে এলাম। স্বর্গদ্বারটি সত্যই মনোরম দূর থেকে। লছমনঝোলার সামনে বোকা পাঁঠার গন্ধ। ঝোলার চারধারে জঘন্য সন্ন্যাসী আর কুষ্ঠরোগী। হৃষীকেশে বাঙালি মেয়ে দেখলাম— কেবলই ভিক্ষা চাইছে। তীর্থস্থানে কোনো সৌন্দর্য নেই। দেবতাত্মা হিমালয়ের বদলে ঘৃণাত্মা হিমালয়। অবশ্য এ অংশটি হিমালয় নয়, টেহেরি। রোমের রাস্তায় সাধু, আবার হৃষীকেশেও সাধু। রোমের সাধু জামা পরে, এখানকার সাধু ন্যাংটো। এত গরমে নগ্নতাই শোভা পায়।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছিলাম। প্রায় আট-দশ হাত দূর পর্যন্ত হলদে তিংলীর (প্রজাপতি) ঝাঁক খুব খেলা করছে।

সন্ধ্যার ঝোঁকে বৃষ্টি নামল। পাহাড়ী স্রোতের নদী বইছে জোরে। পূবের জানালা দিয়ে টেহেরির পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আর বাঁ পাশের জানলা দিয়ে মুসৌরী পাহাড়। শালবনের ভেতর দিয়ে ঘোলাটে মেঘ আর মেঘলা আলো। পূব দিকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এখনও পুরো অন্ধকার হয়নি। ঘন নীল, কত রকমের নীল, সবুজ গাঢ় হলো। নীল তিন রকমের, সবুজ চার! হাজার চারেক ফুট থেকে মেঘ নামতে শুরু হয়েছে। একটা পাহাড়ের ওপর থেকে চুনের প্রকাণ্ড চ্যাঙড় পড়েছে। সরকার চুন তুলতে দিয়েছে। এটা মহাপাপ!

২৯. ৬ ৫৯

কেরালা নিয়ে গোলমাল পেকে উঠল। যদি কম্যুনিস্ট দল ছেড়েই দেয় তবু কংগ্রেস-পি এস. পি -মুসলিম লীগ-নেয়ার-ক্যাথলিক দল একত্রে বসবাস করতে পারবে না, দুদিন পরে ভেঙে যাবে। Election-এ জিতবে কিনা বলা যায় না, এখন হয়ত কম্যুনিস্ট দল জিতবে না। কিন্তু তারা এখন

ছাড়বে কেন? কেরালার কংগ্রেস বোকামি করেছে। পি. এস. পি.-রা কেবল মন্ত্রিত্ব চান শুনেছি। কিন্তু নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করা কোন্‌খানে সঙ্গত? সর্বত্রই অন্যায় কিছু হয়েছে, কিন্তু কতটা অন্যায় হলে নিয়ম বিরুদ্ধ আচরণ করা চলে? যদি কেরালায় কম্যুনিস্ট দলকে ছেড়ে দিতেই হয় ত' বাংলায় অন্ধ্রদেশে কী ছেড়ে কথা কইবে?

দেরাদুনের অত্যন্ত কাছে, রাজাজী sanctuary-তে মোড়ের মাথায় সন্ধ্যা-বেলায় একটা বাঘ বেরিয়েছে। মোটরের সামনে এসেছিল, তারপর আসতে আসতে চলে গেল। শুনলাম গোটা পাঁচেক আছে। আমি একটাও দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে হয়, আবার হয়ও না।

রাজপুরে, রথীবাবুর বাড়ির সামনে, একটা গুল বাঘা রাস্তা পার হয়ে প্রায় রোজই সন্ধ্যার ঝোঁকে বনের মধ্যে চলে যায়। আমি তাকেও দেখিনি। কিন্তু কেন এত বাঘ আসছে? অতো বাঘ আমার ভালো লাগে না।

৩০. ৬. ৫৯

মা'র কাছে শুনতাম, সবই কর্মফল। আমি ঠিক বুঝি না, লোকের মুখেই শুনি। আচ্ছা যদি কর্মফলই হয় তবে কোটি কোটি অস্পৃশ্যরা সকলেই কর্ম-ফল ভোগ করে কেন, কোটি কোটি লোক গরীব কেন?

সত্যই এর উত্তর পাই না। যদি কার্য-কারণ সম্পর্কই থাকবে তবে একজনের একবার থাকবে, জন্মের পর জন্ম বরাবরই থাকবে না, একত্রে সকলেরও থাকবে না। কর্মফলের সঙ্গে জন্মান্তর জুড়ে আছে। জন্মান্তর একটি বিশ্বাস, কার্য-কারণ সম্বন্ধ ব্যক্তিগত।

১. ৭ ৫৯

শিশিরবাবু (ভাদুড়ী) মারা গেলেন প্রায় সত্তর বছর বয়সে। বাংলাদেশের তুলনায় যথেষ্ট নিশ্চয়, তবু মনটা খারাপ হয়ে যায়। স্কটিশ চার্চে জুলিয়াস সীজার আর এক সপ্তাহে তিনটি একই ধরনের পার্ট, যোগেশ জীবানন্দ আর নিমচাঁদ—প্রায় সবগুলিই দেখেছি, মাইকেল মধুসূদন ছাড়া। ১৯০৭।৮ সাল থেকে থিয়েটার দেখে আসছি। অনেক বড় অভিনেতা দেখেছি, কিন্তু

তাঁর মতন কেউই নন। হয়ত আমার ভুল। শেষে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরনের cynicism অনেক দিনই ছিল। ওটা প্রথমে রপ্ত করেছিলেন, পরে অভ্যাস হয়ে যায়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত খেয়েছেন; আবার দিয়েওছেন হয়ত, কিন্তু বেশির ভাগ পাওয়াই। গুরুদাসবাবুর কথা মনে উঠছে, আজ কিন্তু লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। শিশিরবাবুর সঙ্গে শরৎবাবু, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার, গিরীশবাবু প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথাই কয়েছি। প্রত্যেক কথাটি নতুন। তার ভেতর মাইকেলের অঙ্গ ছিল। অভিনয়ের স্মৃতি মনে থাকবে না, স্বপ্ন হয়েই থাকবে।

৫. ৭. ৫৯

দু'জনের নীরবতায় সত্যকারের বিনিময়; তিনজনের কথোপকথনে জমে আড্ডা; পাঁচজনে বসে পঞ্চায়ৎ; এবং আরো বেশিতে ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে ওঠে ডিমক্রেসি, আর না হয় একস্তম্ভ সমাগম। ভিড়ের পরিমাণই বেশি; প্রথমটা সংখ্যামূলক, পরে গুণাত্মক।

৭. ৭ ৫৯

নিতান্ত conc.ete ভাবে আজকাল বাংলা ভাষায় লেখা উচিত। রবিবাবুর প্রভাবে ভাব এত বেশি আসে যে তা থেকে দূরে থাকাই ভালো। অনেকটা হেমিংওয়ের মতন, নেহাত না হয় গ্রাহাম গ্রীন। প্রমথবাবুর সাহায্য নেওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি।

আজকালকার আমাদের নভেলিস্টরা রূপকে concrete করতে গিয়ে realist কিংবা natural:st করে তুলেছেন। ভাবের পরশ এখনও লেগে রয়েছে, তাই román:ic rcalism, যেমন মানিক বন্দ্যো'র লেখা। আমার বিশ্বাস, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত real:st নয়, concrcte হওয়া।

আমাদের চলন-বলন ক্রিয়াপ্রধান নয়, আমাদের বিশেষ্যও কম, সবই যেন বিশেষণ! কৃ-ধাতুকে বাদ দিয়ে সোজাসুজি বিশেষ্যকে ক্রিয়াতে পরিণত করা যায় কি না, দেখতে হবে।

Concrete হওয়ার অর্থই হলো নিষ্ঠুরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া। পরে ব্যক্তিসম্পর্কতা থাকে ত' দেখা যাবে। আমেরিকান কবিদের অনেকেই ভীষণ নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু mood একটা থেকেই যায়। mood নিয়ে কিন্তু

আরম্ভ করা অন্যায়— লেখবার সময় অন্যায়।

এইখানেই বুদ্ধির খেলা। প্রকৃতিতে বিশ্বাস অচল। বুদ্ধি দিয়েই concrete হতে হবে। 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা'— তাদের প্রধান কথা, stream of consciousness ততটা নয় যতটা romantic প্রভাব থেকে concrete-এ আসা। আশ্চর্য! তিন-চারজন ছাড়া কেউ ঠিক বোঝেননি— বুঝলে সুবিধে হতো। দেশের পাঠক, শিক্ষিত পাঠক, realism চায়।

সিরিল কোনোলি বড় লেখক নয়, তবু তাঁর Unquiet Grave-এ অনেক concrete লেখা রয়েছে। ইংরেজরা গাছপালা আঁকে ভালো। আমাদের সাহিত্যে গাছপালা নেই, আর না হয় ভাবে গদগদ; যেমন বিভূতি বন্দ্যো'র লেখা।

৮. ৭. ৫৯

বিশুদ্ধ জলের ইনজেকৃশন অত্যন্ত পীড়াদায়ক। সেজন্য কিছু নুন দিতে হয়, শতকরা '৮ থেকে ৩ পর্যন্ত। তেমনই বিশুদ্ধ মুক্তা শ্রেষ্ঠ নয়, সুন্দর মুক্তায় মেশান থাকে। বিশুদ্ধ কবিতার মধ্যে সঙ্গীত এসেই যায়। মালার্মে বলতেন, বিশুদ্ধ কবিতা হলো বিশুদ্ধ সঙ্গীত। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মধ্যে বাখ্-এর ফিউগ্, বেঠহোফেন নয়। Abstract painting-এ রং থাকে।

১০. ৭. ৫৯

আমার জীবনে একটি মাত্র 'স্ত্রী'লোক দেখেছি— ইন্দিরা দেবী। নিতান্ত সংযত; ভাঙবেন ত মচকাবেন না। অন্য স্ত্রীলোক মেয়েমানুষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ মাত্র।

১০. ৭. ৫৯

লক্ষ্ণৌ-এ তেত্রিশ বৎসর থাকলাম। লক্ষ্ণৌ-এর দিনগুলি ভালোভাবেই কেটেছে। কয়েকজন যুবক কিন্তু বিশ্বাস করতে চান না; যে মানুষ বিশ বছর লেকচারার ছিলেন, তাঁর মনে কি ছাপ পড়েনি।

বিশ বছর লেকচারার ছিলাম মনেই পড়েনি। আমার ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর সেরা য়ুনিভার্সিটিতে যে সব লেকচারার আছেন, আমি যেন তাঁদের দলেই থাকি। I am the minimum lecturer in a first rate University in Europe— এই আমার বিশ্বাস ছিল। লেকচারার হওয়াটা সম্মানের কথা, তার বেশি হতেও চাইতাম না। অন্যে আমার চেয়ে বেশি কর্মশীল তাও বোধ হয় জানতাম না, বীরবল সাহানীকে ছাড়া। সামান্য দু একটি ঘটনা ছাড়া মনেই পড়ে না যে লেকচারার হয়েছি বলে সম্মান কম পেয়েছি। সাহিত্য ও সঙ্গীতে আমি তাঁদের সমানই ছিলাম, হয়ত কখনও কখনও বেশি। অতএব আমার তিলমাত্র আপসোস ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎ চাটুয্যে, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির সঙ্গে তুলমূল্য হিসেবে মিশতে পারতাম, কোনো তফাৎ থাকত না। গানের আসরে ত জগন্নাথক্ষেত্র! বাহবা দিয়েই এক হয়ে যেতাম। গানের আসরেই বোধ হয় সত্যিকারের ডিমক্রেসি পেয়েছি। লক্ষ্ণৌ-এ সাহিত্য ও গানের আসরে ঐ ডিমক্রেসির জন্যই যা কিছু শ্রেণীবিভাগের ক্ষতিপূরণ হয়েছে। যে লক্ষ্ণৌ-এর মুশায়রা দেখেছে, সেই জানে এই কথা।

তার পরে রীডার, প্রোফেসার হয়েছি, প্রথম ভুজঙ্গভূষণ মুখুজ্যে ও দ্বিতীয় আচার্য নরেন্দ্রদেবের জন্য। নিজে থেকেই এসেছে, আমি জানতাম না। অতএব আমার কাছে শ্রেণী-বিভাগের মূল্য নেই।

কিন্তু অন্যত্র আছে ও ভীষণভাবেই আছে। সেটা জানি notionally, সেই থেকে আমি অবশ্য আমার মত গড়ে তুলেছি। আমার সোশ্যালিজম সম্পূর্ণ বুদ্ধিসুলভ। সেটা দোষের?

১১. ৭. ৫৯

'সবুজপত্রে'র প্রায় সব রচনায় প্রমথবাবুর হাত থাকত— কেবল রবীন্দ্রনাথের ও অতুলবাবুর বেলায় নয়। 'পরিচয়ে'র জন্য এক-আধজন ভিন্ন সুধীন্দ্র অন্য কারুর রচনা সম্পাদন করতেন না। দুটো সম্পাদনের রীতি পৃথক। প্রমথবাবু একাই একশ; সুধীন্দ্র একের মধ্যে অনেক এবং অনেকের মধ্যে এক, কিন্তু সে একত্ব মানুষ হিসেবেই দেখা যেত। দুজনই খেয়ালী, দুজনেরই আগ্রহ ক্রমেই কমে যায়। দুজনের লেখা বয়সের সঙ্গে আর সে-রকমটি থাকেনি; কারুর কম, কারুর বেশি, যেমন পরশুরামের হয়েছে। সুধীন পুনরুদ্ধার করছে জানি; সে হিসেবে ত্রুটি সংশোধন করছে। কিন্তু

ভুল-চুকের মধ্যেও মজা ছিল। এত নির্দোষ লেখা কী পোষায়?

১২. ৭. ৫৯

এক বৎসর প্রায় নতুন বাংলা বই পড়িনি। বিশেষ লাভ হয়েছে কি? কিসেরই বা লোকসান? দু তিন বছরে সারা বাংলাদেশে চিত্রে একটা পথের পাঁচালি বেরিয়েছে— তার উর্ধ্বে না হয়েছে সাহিত্য, না ছবি, না সঙ্গীত, না ভাস্কর্য না কিছু। তাই ত মনে হয়। অবশ্য ভুল হতে পারে, এবং দেশের ইতিহাসে দু-তিন বছর নগণ্য। কিন্তু ১৯০৫-৬ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত, এত বৎসরের মধ্যে একটা-না-একটা কিছু হতোই। এক একটা বৎসর ফলত যেন কাঁঠালের মতন। তবু তার প্রতি বিশ্বাস এখনও আমার যায়নি। নীরদ চৌধুরীর কিন্তু গেছে।

কোনো এক সময় একত্রে কাঁঠালের মতন এত ফল ফলে কেন? যেন খানিকটা প্রাকৃতিক নিয়ম। হয় ত্রিশ বার না হয় একশ বার। একশবার হলো বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ পর্যন্ত। গত ত্রিশ বৎসরে সেই রবীন্দ্রনাথ থেকে গান্ধী, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাব ও জওহরলাল। জওহরলালকে বাদ দিলে প্রত্যেকেরই আশেপাশে অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের গাঁদি লেগেছিল। তারপর থেকেই ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে পলিটিক্‌স চর্চা আরম্ভ হলো। দেশে কেবল পলিটিক্‌স আসা মানেই কালচারের ক্ষতি। পলিটিক্‌সের অর্থই হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে কারবার এবং তার বেশি নয়। তা যদি হয়, তবে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলে না। যদি আমাদের Welfare State হয়, তবে কালচারের ক্ষতি হবে। আমাদের এতদিনকার কালচারের প্রধান কথা বিপক্ষতা, non-conformity, dissent। কিন্তু তারপর অনেক পরে কালচারের ভবিষ্যৎ বোধ হয় সোশ্যালিজম।

পঞ্চদশ কী ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপ ও এশিয়াতে একটা সনাতন পদ্ধতি (perennial philosophy) ছিল। এক এক করে য়ুরোপে কমতে লাগল। এশিয়াতে এখনও রয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই কমে যাবে। যদি বিজ্ঞান ও যন্ত্রের জন্য সনাতন পদ্ধতির ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে দোষটা কিসের? ক্ষতি ত বটেই, কিন্তু লাভও অনেক। আমার বিশ্বাস দুটোর সামঞ্জস্য চলে না—

দুটোর ধর্মই আলাদা।

১৭. ৭. ৫৯

স্বামীর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে স্ত্রী না হয় ঘুমিয়ে পড়ে, না হয় রান্নাঘরে কাজ করতে যায়— অর্থাৎ চরমকালে অন্য কর্মে ব্যাপৃত থাকে। প্রায়ই এই ব্যাপারটা দেখেছি। কেন এমন হয়? রোগীকে সেবা করে অনেক দিন রাত-জাগার পর ঘুমিয়ে পড়া স্বাভাবিক। কিংবা, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রোগী যেন আরামে ঘুমুচ্ছে মনে হয়, তাই ভেবে স্ত্রী কখনও কখনও সংসার করতে চলে যায়। আমার মনে হয়, সে সময় মাথায় কিছু থাকে না, যেন বোকা হয়ে যায়। তখন অভ্যস্ত কাজের দিকে মন পড়ে। পুরুষদের কিন্তু তা হয় না। মৃত্যুটা তাদের স্বার্থপরতা।

১৮. ৭. ৫৯

লক্ষ লোকে বই লেখে, কোটি লোক কথা কয়। সব কথাই দামী নয় নিশ্চয়। তবে কেন এত লেখে? সুখের ব্যাপার এই যে, কোটি কোটি লোক লেখে না। সকলেই যদি লিখত তবে পড়ত কে? লিখতে পারে না, এইটাই চরম সুখ। লিখতে গেলেই ছাপতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। পড়া বন্ধ করার প্রথম সুবিধা অবশ্য বেশি লেখা, কারণ যারা লেখে তারা অন্য বই পড়ে না। যেমন রাধাকমলবাবু। প্রায় পঞ্চাশখানা বই লিখেছেন, অন্যের বই পড়বেন কখন?

কত তৃতীয় শ্রেণীর বই-এর কত না শ্রাদ্ধ করেছি! এবং সত্যি কথা বলতে কি, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ বইই অধ্যাপকদের রচনা! কীন্‌সের লেখায় তবু নতুনত্ব আছে (সুইডিশ ইকনমিস্টদের কথা ছেড়ে দিলাম)। তার পর হ্যারড্, তাঁকেও বোঝা যায়। তারও পর, ধরা যাক, কুরিহারা, কিন্তু তৎপরে কত ভারতীয় ব্যাখ্যার অবতারণা! সেটা সহ্য হয় না, কিন্তু পড়তে হবে, নচেৎ নতুন হওয়া যাবে না! এই রকম চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণীর অধোগতি অসহ্য! এ-সবের দরকার নেই, কিন্তু করতে হয়।

১৯. ৭. ৫৯
খুব বৃষ্টি পড়ছে। রাত্রে আধঘণ্টার জন্য বন্ধ হলো। দুটো জোনাকি উড়তে লাগল— যেন প্রজাপতি। পাগলের মতন উঁচু থেকে নীচুতে, আর নীচু থেকে ওপরে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আবার অন্য জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, লাফিয়ে লাফিয়ে, নাচতে নাচতে— ভারি মজা! জোনাকি কি রাতের প্রজাপতি? জোনাকির আলো সব্জে নীল রঙের।

২০. ৭ ৫৯
পূর্ণিমার চাঁদ সবুজ। একটা ছোট্ট ইংরেজী কবিতায় পড়েছিলাম— মনে আসছে না— বেড়ার ধারে চাষার মুখের মতন?

কী আশ্চর্য! শুভ্রতা ঠিক দেখিনি, বা দেখেছি মেলভিলের Moby D.ck-এর whi'eness of the white থেকে। সেটা বোধ হয় প্রকৃতির শুভ্রতার চেয়ে অনেক বেশি রকমের শুভ্রতা। শেক্সপীয়ারের পরেই বোধ হয় মেলভিলের ভাষার বাহাদুরী।

২১. ৭ ৫৯
রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা বাঙালিরা যে নতুন কিছু না করে থাকতে পারি না।' পারি না-র রি-টায় দীর্ঘ ঈ-কার টেনে দিয়েছিলেন। বিস্তর দৃষ্টান্ত দিলেন; শেষে গানের কথা হলো, নিধুবাবুর টপ্পা থেকে যদুভট্ট আর গোসাঁইজী পর্যন্ত। নিধুবাবু ত বুঝলাম, অর্থাৎ টপ্পা, সেটা সোরি মিঞা থেকে ভাঙা। কিন্তু বাকী এঁরা? রবীন্দ্রনাথের মতে এঁরাও নিজস্ব বাঙালিভাবে ধ্রুপদ গাইতেন।

বোধ হয় তাঁর কথাই ঠিক। রবীন্দ্রনাথ ত নিজেই, ভীষ্মদেব পর্যন্ত তা-ই। ভীষ্মদেবের নতুনত্ব ছিল সম্পূর্ণ স্বকীয়, বাদল খাঁ সত্ত্বেও, এবং বাদল খাঁ নিজে কখনও গাইতেন না, হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। ভীষ্মদেবের স্বকীয়তা ছিল 'টপ্ খেয়ালে' এবং টপ্পার অঙ্গই ছিল বাংলাদেশের। এমন নতুন ধাঁচে সেটা বসাত যে তার অনুকরণ করা যেত না। আজকালকার অল্পবয়স্ক গায়কবৃন্দ ভালোই গাইছেন, কিন্তু তাঁরা যেন অন্য লোকের মুখ থেকে তুলে নিচ্ছেন। হয় বড়ে গোলাম আলির, না হয় আমীর খাঁর। ভীষ্মদেবের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল।

আজকাল ভীষ্মদেব আর গায় না। কিন্তু দুপুর বেলা তার রেকর্ড বেতারে শোনা যায়। আমি সত্যই সেজন্য কৃতজ্ঞ। আমার দুঃখ, রবীন্দ্রনাথ ভীষ্মদেবের গান শোনেননি। প্রথমে হারমোনিয়মের সঙ্গে গাইত, পরে অত্যন্ত আস্তে, মিষ্টি করে; এবং আরো পরে, তানপুরোর সঙ্গে। কণ্ঠও আগের তুলনায় আস্তে হয়ে যায়। আওয়াজ ছিল অদ্ভুত। সবটাই তার নিজস্ব। বহু বৎসর পূর্বে রাজশাহীতে ব্রজেন মৈত্রের বাড়িতে প্রায় পাঁচ ছ ঘণ্টা গান গায়, খুব আস্তে আস্তে। জ্ঞান গোঁসাই-এর মতন গুরুগম্ভীর গমকতান ছাড়া আর সব জিনিসই সে কণ্ঠে আনতে পারত। কেন এই বয়সে গান ছেড়ে দিলে। শোনা যায়, ধর্মের জন্য। বিবেকানন্দও ত গাইতেন।

২২. ৭. ৫৯

একজন সুন্দরী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে ক'জন দেখেছেন?' ধীরে ধীরে চার পাঁচজনের নাম করলেন। আমি একজনকেও দেখিনি, তবে দু এক জনের নাম শুনেছি। বিলেতে এই রকম সুন্দরীর নামডাক হতো, ডাকের সুন্দরী। এ-দেশে কিন্তু তা হয় না— এঁরা সকলেই অসূর্যম্পশ্যা। সুন্দর পুরুষের নাম তবু ছিল। অমৃতবাবু (বোস) বলতেন, গাড়িতে জ্যোতিবাবু চলেছেন, রাস্তার মোড় থেকে দেখতে যেতুম। ('রবীন্দ্রনাথ নাকি সুদর্শন ছিলেন না!) ভারতবর্ষে সৌন্দর্যের কদর নেই, অথচ শুনেছি কামশাস্ত্রের বচন! আমরা মোটেই দেহগন্ধী নই। কিন্তু Miss Mayo!

ইদানীংকার ছেলেমেয়েদের ঠিক মনে ধরে না। তাদের মধ্যে অনেক ভালো ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই আছে, মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু গড়পড়তা, তাঁদের একটা দোষ আছে। কোথায় যেন seriousness-এর অভাব, একটা যেন puritanism-এর খাঁকতি। যেন গোঁড়ামি নেই, ব্রাহ্মগিরি যেন কম। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু একরোখামির জন্য অনেক কিছু গুণও বর্তে ছিল। যথা— জগদীশ বোস, হেরম্ব মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য থেকে বীরবল সাহানী, প্রশান্ত মহলানবিশ, নির্মল সিদ্ধান্ত, সুশোভন সরকার পর্যন্ত। ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু হয়ে গেছে, এবং বাঙালি হিন্দুও

উত্তর ভারতে সর্বত্র পাঞ্জাবীরা ছেয়ে ফেলেছে। তাদের জন্য আমাদের বহু উপকার হয়েছে, তারা নিজেদের উপকার ত করছেই। এমন বলিষ্ঠ জাতি ভূ-ভারতে নেই। জিনিস হিসেবে খায় ভালো, এবং আরো বেশি, কাপড় পরে ভালো। পড়াশোনার ওপর ঝোঁক যেন একটু কম, দিল্লী ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু হচ্ছে। সেটা ঠিক ভালো কী মন্দ বুঝি না, বাংলার মতন না হলেই ভালো। কর্মের দিকটা একটু বেশি জাগ্রত, পরে কী হবে বোঝা যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক নিয়ে কি বেশি দিন চলবে? সকলেই যদি কন্‌ট্রাক্‌টার হয়, তবে এঞ্জিনীয়ার কে হবে? তবে তাও নাকি হচ্ছে।

২৩. ৭. ৫৯

আমাকে একজন প্রশ্ন করলে, 'তুমি আগেও ভালো গান শুনেছ, এখনও শুনছ। দুটোর মধ্যে, তোমার মতে তফাতটা কি ও কেন।'

ভালো কী মন্দ বলা চলে না। দুটো, ভেবে দেখলে, দু রকমের। দুজনেই যদি ছায়ানট গায় তবে মনে হয় গড়পড়তা, একই রকমের দাঁড়াবে। তবে ব্যাপার হলো এই: দুজনে ঠিক একই ছায়ানট গায় না, একজনে অন্তত ছায়া কিংবা নটমল্লার গাইবে, তানের সময় কিছু বদলে যাবে। সেই জন্য ঠিক একই রকম হবে না। সেখানে না হয় ছায়া তৈরি হলো; যদিও ছায়া জিনিসটা বুঝি না। তার ওপর চাপান হলো, ধরা যাক, ছায়া-কুসুম। অতএব মোটা থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম তৈরি হলো ইত্যাদি। নতুনত্ব করতে গেলেই এই পন্থা, আর না হয় বিদেশী প্রভাব। মিশ্রণের এই বিপদ। সরল থেকে জটিলতার আশ্রয় নিতেই হয়।

এতদিন এই সরলতার অর্থ ছিল প্রায় পঞ্চাশটা রাগ। তারও বেশি ছিল, কিন্তু পঞ্চাশটা রাগেই কাজ চলত। এই ক'টা প্রধান রাগেরই ব্যবহার হতো; অতএব প্রত্যেকটা রাগই ভালোভাবে, সম্পূর্ণভাবে গাওয়া হতো। আমরাও তাই পঞ্চাশটা রাগের প্রত্যেকটিকে চিনতাম, এবং তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হতাম। অপ্রচলিত রাগ শুনতাম কখনও কখনও, কিন্তু সেগুলো অদ্ভুত বলেই।

এখন কিন্তু তা হয় না— পঞ্চাশখানার বদলে পাঁচশখানা। সেই পাঁচশ-খানার প্রত্যেকটি অবশ্য সুচারুরূপে ব্যবহৃত হয় না, তার প্রত্যেকটি established হয় না। Established হবার জন্য সময় চাই, এখন কিন্তু বিশ

মিনিটেই শেষ! রাগের চেহারাটা হয়ত দশ মিনিট কেন, পাঁচ মিনিটে ধরা পড়ল। কিন্তু ধ্যানরূপটি? তার আবহাওয়াটা? তার climate-টা। পাঁচশ গানের প্রত্যেকটির climate তৈরি করা অত্যন্ত শক্ত; পঞ্চাশখানার প্রত্যেকটির climate তবু সোজা। একেই আমি অধিষ্ঠান বলি।

দ্বিতীয় কথা এই: পুরাতন রাগের গঠন ধীরে ধীরে ওঠে; তার একটা গঠন-প্রক্রিয়া আছে। এবং প্রত্যেক গঠন-ক্রিয়ার এক-একটি পকড়, এবং সেই পকড়ের নানা রকমের রীতি-নীতি। নতুন রাগের গঠন-প্রক্রিয়া অদ্ভুত— সামান্য একটি কী দুটি স্বরের তফাতে যা কিছু ঘটল। এত অল্পতে construction হয় না, design হয় না। মিস্ত্রী হওয়া যায়, এঞ্জিনীয়ার হওয়া যায় না। কিন্তু এই অল্পেতে যে নতুনত্ব সেটুকু বাহাদুরি। তাই নতুন রাগের সুর পাওয়া যায়, প্রিয় হয় না।

আমার তৃতীয় কথা এই: বাহাদুরিটা ঠিক আসল নয়। বাহাদুরির জন্য সৌন্দর্যটি ঠিক প্রকাশ পায় না। অদ্ভুত রকমের একটা combination সৃষ্টি করলাম। চমৎকার লাগল নিশ্চয়, কিন্তু মজাটা অন্য ধরনের। মোটা-মুটিভাবে বলা চলে— একটা ছেলেমানুষী বুদ্ধির cleverness, আর অন্যটা সত্যকারের আনন্দের। বাঁয়া তবলাতে যেমন খলিফা আবেদ হোসেন আর চতুরলালের বাজনা।

ব্যাপারটা হলো যে আগেকার গানে স্থিরতা আছে, সৌম্যতা আছে, শান্তি আছে: এখনকারের গানে অস্থিরতা, চঞ্চলতা, অধীরতা রয়েছে। এবং সেইটাই স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্যে সমাজে, সর্বত্রই দ্রুতভাবে চলেছি; কোথায় চলেছি জানি না তবে চলেছি। তাই যথার্থ না হলেও যথা-অর্থ। জীবনের গতি দ্রুত হচ্ছে, নতুনত্ব করতে যাচ্ছি, পঞ্চাশটার বদলে পঞ্চাশখানা গান শোনাচ্ছি, গাইছি, তাই শান্তি থাকছে না। আমার একটু অস্বস্তি লাগে।

এ কালের গানের নিন্দা করছি না। এ-গান আমার ভালই লাগে, তবে মধ্যে মধ্যে অস্বস্তি হয়। এত জটিল কেন, অত বাহাদুরি কেন, এত clever কেন? আগেও খানিকটা ছিল, কিন্তু এত বেশি বোধ হয় নয়।

২৪. ৭ ৫৯

ভারতবর্ষ নিয়ে এত গৌরব করা কেন! দর্শনে ভারতের সমকক্ষ গ্রীস,

স্থাপত্যে ভারতের সমকক্ষ ইজিপ্ট, ভাস্কর্যে ভারতের সমকক্ষ আবার গ্রীস। চিত্রে অজন্তা ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। অবশ্য গানে পশ্চিমী গানের চেয়ে আমাদের গান বেশি ভালো বলতে পারব না। সাহিত্য আমাদের এক-পেশে; রইল বাকী কারুশিল্প। সেটা অবশ্য ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব। আর ভালো হকি আর কুস্তী। বেশি দিন হকি কিন্তু আর চলবে না। কুস্তীটাও তাই। জাপানি কুস্তী অদ্ভুত! অতএব এত বড়াই চলে না।

২. ৮. ৫৯

কেন্দ্রীয় সরকার কেরালা থেকে প্রাদেশিক সরকার তুলে নিলে। সে-অবস্থায় না নিয়ে হয়ত উপায় ছিল না। কিন্তু অবস্থাটা হলো কেন, হতে দিলো কেন, জানা গেল না। আমার মাথায় কিছুতে আসছে না যে সাধারণ লোক কম্যুনিস্ট পার্টিকে এতটা ঘৃণা করে। অতখানি ঘৃণা সত্য যদি না হয়, তবে শক্তি পাওয়া-ই সর্বপ্রধান। তাও আবার প্রধানত পোলিটিকাল পাওয়ার। রাজ্য চাই কম্যুনিস্টদের হাত থেকে পেতে। তা না হয় হলো। কিন্তু কে ও কারা শক্তি পাবে? বিমোচন-সমিতি, পি. এস. পি., কংগ্রেস, ক্যাথলিক, মুসলিম লীগ—একত্রে মিলে? তাও না হয় হলো, একত্রে একজোটে না হয় কম্যুনিস্টদের তাড়ান গেল। তখন তারা একত্রে, একদল হয়ে, থাকবে কি করে? বিমোচন-সমিতি শীঘ্রই লোপ পাবে। থাকবে ক্যাথলিক, পি. এস. পি. আর কংগ্রেস। পি. এস. পি. কংগ্রেসের সঙ্গে বোধ হয় এক হয়ে যাবে, কিন্তু লেজুড় হয়ে থাকবে ক্যাথলিক-সম্প্রদায়। ক্যাথলিক-সম্প্রদায় যে কী-বস্তু তা আমরা কি জানি? দাঁড়াবে এই—ক্যাথলিক আর নন-ক্যাথলিকের দল। এ রকম religious polarisation আমাদের দেশে আসছে—কিন্তু সেটা কি ভালো?

৭. ৮. ৫৯

সঙ্গীতের সাহায্যে সম্পূর্ণ সঙ্গীত ব্যাখ্যা করা যায় না।
চিত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ চিত্র ব্যাখ্যা করা যায় না।
সাহিত্য দিয়ে সাহিত্য-ব্যাখ্যাই সম্ভব।

সাহিত্যের সাহায্যে সঙ্গীতের ব্যাখ্যা সাহিত্যিক ব্যাখ্যা।

সাহিত্যের সাহায্যে চিত্রের ব্যাখ্যা সাহিত্যিক ব্যাখ্যা।

সাহিত্যের সাহায্যে সাহিত্যিক ব্যাখ্যাই যথার্থ।

Schweitzer যখন বাখ্ সম্বন্ধে লেখেন, তখন সাঙ্গীতিক ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, পারেন না।

Romand Rolland যখন বেঠ্ হফেন, মোৎসার্ট সম্বন্ধে লেখেন, তখন তিনি প্রধানত সাহিত্যিক।

আঙ্গিকের ব্যাখ্যায় যতটুকু সাহিত্য ততটুকু রাখতেই হবে। Neville Cardus, Robertson Glasgow এবং Arlot-এর লেখায় অত্যন্ত তফাত। Cardus-এর লেখা অপূর্ব, কিন্তু তাতে ক্রিকেট কম, সাহিত্য বেশি।

সাহিত্য অন্য সব কলাবিদ্যাকে গিলে ফেলেছে।

১৭. ৮. ৫৯

আমি আজ ড. প্রকাশ ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম: সত্য কথা বলতে কি, ১৯১৫-১৬ সাল থেকে লিখছি, এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লিখেই যাচ্ছি। ফল কী ফলেছে! অথচ দেখছি, অনেকেই আমার পুরানো কথা তুলে নিচ্ছে। ভাষা দিয়ে নয়, ভাব দিয়ে। ১৯২৩-২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে যা লিখেছি, ১৯৫০ সালে তারই পুনরাবৃত্তি পাই। যাকে ঝাল খাওয়া বলে তাই হচ্ছে। অবশ্য আমার নিজের কথা মনেই থাকে না। সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতিতেও তাই। তাই আমার মনে সন্দেহ হয়েছে যে, এতদিন যা লিখে আসছি তা সব বরবাদ হলো।

প্রকাশ কিন্তু অন্য কথা শোনালে। সে বল্লে যে, ফল ফলেছে। তবে তার প্রধান কথা এই, 'গত চল্লিশ বৎসর প্রায় বাংলার বাইরে রয়েছেন। বছরে একবার, দুবছরে একবার কলকাতা যান; অতএব বাংলার সঙ্গে আপনার যোগ দৈহিক নয়, মাত্র মানসিক। যে সব ছেলে আপনি তৈরি করেছেন তারাও বাঙালি নয়। তারা কেবল অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব জানে, সাহিত্য তারা বোঝে না। অতএব আপনার পারদর্শিতা তারা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলার বাঙালি ছেলেদের শিক্ষিত সম্প্রদায়রা অনেকেই আপনার লেখা পড়ে, মন দিয়েই পড়ে, বুঝতে সকলে না পারলেও তারিফ করে। বরবাদ হয়েছে বলা যায় না।'

সত্যিই তাই— বাংলা দেশ থেকে আমি অনেকদিনই আলাদা। লিখি বাংলা, কিন্তু কিছু আড়ষ্টভাবে। যেন কাটা-কাটা, ছাড়া-ছাড়া। ভাষার

দোষ রয়েইছে। প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে আজকাল অনেকদিন মিশিনি। মজার কথা মনে হলো— একবার লক্ষ্ণৌ-এ প্রবাসী বাঙালিদের দ্বিতীয়বার সম্মিলন হলো। আমি তখন আলিগড়ে। যাবার জন্য নিমন্ত্রণপত্রও পেলাম না। একজন সাহিত্যিকের কাছ থেকে একটা পত্র পেলাম। লিখ-ছেন যে, তিনি আমাকে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা গ্রহণ করেননি। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দুঃখিত হয়েছিলাম— আমি কি কিছুই লিখিনি? তার পরই ভুলে গেলাম। এতই ভুলে গেলাম যে, পাঁচ বছরে মনেই পড়ল না।

মন থেকে এই ধরনের self-pity সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বোধ হয়, এই শেষ।

২৭ ৮. ৫৯

আজ হঠাৎ আমার সরকারী কাজে ইস্তফা দিলাম। দুটি কারণে: (১) সরকার আমাকে কোনো কিছুই সাহায্য করছে না। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সাহায্য পাইনি। একলা কতদিন এ ভাবে কাজ করব?

(২) কিছু না করে থাকার একটা মোহ আছে। কিছুই না করে কিছুকাল থাকতে চাই। আগের তুলনায় আমার শরীর ভালোর দিকে যাচ্ছে মনে হয়। নিশ্বেস ফেলতে একটু যেন কম কষ্ট হয়, সেই সুযোগে আরো একটু আরাম পেতে চাই। প্রায় চল্লিশ বছর অধ্যাপনা করলাম, এবার একটু জিরোবার সময় এসেছে। অবশ্য কেদারবাবুর 'পেন্‌শনের পর' হবে না ত? আপাতত ইস্তফা দিয়ে মনে যেন শান্তি পেয়েছি। তিলমাত্র ক্ষোভ নেই।

দেরাদুন গিয়ে কিছু ক্লাসিক সাহিত্য পড়া যাবে। অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্ব নয়। ইতিহাস, ছবি ও গান— এ-কটা জিনিস থাকবেই।

৬ ৯. ৫৯

"মনে এলো'-র রচনা বই-এর সম্পৃক্ত। এখন কিন্তু তা নয়। বই-এর অতিরিক্ত, অথচ খাঁটি দর্শন নয়। মাথার পিছনে বই নিশ্চয়ই আছে, কারণ পরমহংসদেব ছাড়া অন্য কোনো মানুষ নেই যাঁর চিন্তা, ভাবনা বই থেকে জন্মায় না। অ-শিক্ষিত মানুষের কাছে চিন্তার বালাই নেই। (অবশ্য

শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও অনেকেই তাই। অশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে ভাবনা ওঠে, চিন্তা ওঠে না।) তবু বই-এর অজুহাতেই চিন্তা। বেশি পড়লেই কিন্তু চিন্তা যায় গুলিয়ে, তখন আর খেই থাকে না। খেই ছাড়াবার জন্ত বই কিছুকালের জন্য বন্ধ করতে হয়। তার পরেও কিন্তু কখনও-কখনও চিন্তার খোরাক জোটে না। তখন চুপ করে থাকাই ভালো। তারিখের মধ্যে বহু ব্যবধান আছে। অর্থাৎ, মধ্যে মধ্যে চিন্তা আসে, কিন্তু চিন্তার সাতত্য আসে না। সতত চিন্তার অর্থই হলো দর্শন। তাই মনে হয়, আমার চিন্তার অন্তরালে দর্শন নেই। দার্শনিক মনোভাব আছে।

শুদ্ধ অবচেতনা বলে কি কিছু বস্তু আছে? আমার মনে হয় নেই। বেশির ভাগই সংস্কার, না হয় অধীত বিদ্যা। স্টাইনবেকের লেমি নামে এক চরিত্র আছে, সেটা বোধ হয় বিশুদ্ধ অবচেতনা; কিন্তু সে একজনকে টিপে মেরে ফেল্লে। ফক্‌নার-এর দক্ষিণী চরিত্রের নিগ্রো কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন। ফ্রয়েডের মধ্যেও বোধ-বিশুদ্ধ অবচেতনা নেই, ego, super-ego-র সঙ্গে মেশান। ইয়ুং-এর মধ্যে হয়ত আছে। কিন্তু collective unconscious কী বস্তু ঠিক জানি না। আমি ব্রাহ্মণ হয়েও কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এই ধরনের কথা গ্রহণ করতে পারিনি, এখনও পারছি না।

মানুষ যখন কোনো অধীত বিদ্যা গ্রহণে পরাঙ্মুখ, তখনও অভ্যাসের বশে আরো বই পড়ে, আরো বিদ্যা অর্জন করে। কিন্তু বই পড়বার পর না-পড়ার মধ্যে হয়ত একটা স্বাধীনতা আছে, এবং সেই স্বাধীনতার আশীর্বাদে অ-শুদ্ধ অবচেতনা আশ্রয় করে। নীচে থেকে ওপরে ওঠে, কিন্তু ওপরে ওঠা থেকে নীচুতে যায় না। অবশ্য, নীচু আর ওপর বলে কোনো জিনিস নেই— এগুলো কথার কথা।

৭. ৯. ৫৯

ফ্রান্সে একটা সত্যকারের intellectual class আছে, তিন চারশ বছর ধরে চলে আসছে। এখনও চলছে এবং আরো কিছুকাল চলবে। জার্মানিতে professional class রয়েছে, কিন্তু intellectual class নেই। ইংলণ্ডে intelligent men and women আছে— কারণ বোধ হয় তার empiricism। ভারতে একদল ব্রাহ্মণ ছিল, এখন নেই। কলকাতা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ঝলক উঠেছিল, আজ তা খুঁজে পাই না। রাশিয়ায় দেখছি techno-bureaucrat ছেয়ে ফেলেছে। সাহিত্যিকদের চেয়ে সংখ্যায় তারা বেশি।

মনে হচ্ছে। আমেরিকায় কিন্তু বেশির ভাগ managerial class, চায়নায় বোধ হয় কোন নতুন দল তৈরি হয়নি। এককালে mandarin ছিল— এখন নেই। এটা মোটামুটি— অবশ্য তাইতেই কাজ চলে যায়।

১৫. ৯ ৫৯

আলিগড়ে নিমগাছ আর তোতাপাখি— দুটো মিলে 'নিমতোতা'। তোতা নাম যেন কেমন ধারা! নিমতোতা নামটি বেশ।

অনেক নিমগাছ এখানে, কিন্তু কোনো উপকারে আসে না। অন্তত আমি ত দেখিনি। তোতাপাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে, দেখতে খাসা। তবে একটু যেন ঘাড়-কুঁজো, আর আওয়াজ যেন একটু রুখ্‌খু। তা হোক। নিমগাছের ছায়া নরম, একটু বেশি নরম, নীচে ভিজে গন্ধ।

১৬. ৯. ৫৯

দালাই লামা এলেন আর গেলেন। থিমাইয়া এলেন আর গেলেন। ভারত-চীনের ব্যাপারটা হয়ত ঘুচে যাবে। খানিকটা খবরের কাগজের চালাকি, কিন্তু এ দিকে কোলড্‌ ওয়ার আরো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। খ্রুসচভ আমেরিকা যাচ্ছেন, তাতে অবশ্য ফল হবে। বছর পাঁচেক লাগবে মনে হয়। ভারতে culture-lag যেন বেশি। কী অসম্ভব রকমের বোকামি করছেন এঁরা। ভারতের কম্যুনিস্ট দল, অন্তত নম্বুদ্রিপাদ সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন, এই প্রথম। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তাঁদের বোকামির অন্ত নেই।

১৯. ৯ ৫৯

খ্রুসচভ-এর বক্তৃতা ভালোই। আদর্শবাদীর কথা নয়, খাঁটি বস্তুতন্ত্রের কথা। বস্তুতন্ত্রের অধিক এই ব্যাপারটা। তবু বস্তুতন্ত্রের ওপর থেকেই উঠেছে। মোটেই ইয়ুটোপিয়ান নয়, একেবারেই নয়। তৎসত্ত্বেও খ্রুসচভের wisdom cool নয়, স্ট্যালিনের যেমন ছিল। তাঁর স্বভাবই অন্য। একটু যেন বেশি কথা কন। Cold War কমাবার জন্যই বেশি কথার প্রয়োজন ঘটে হয়ত! যদি ইচ্ছা করতেন, স্ট্যালিন না কথা কয়েও সেটা থামিয়ে

দিতে পারতেন। তাঁর নিষ্ঠুরতার সীমা নেই, তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লোকটি বড়।

২০. ৯. ৫৯

আজ হঠাৎ বীরবল সাহানীর কথা মনে উঠছে। কেন জানি না, অমনি। ১৯২২ সাল থেকে আলাপ। প্রথম থেকেই বন্ধুত্ব, শেষকাল পর্যন্ত। সকলেই বলে যে, পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বোটানিস্ট। জানি না, তবে যথার্থ পণ্ডিত বুঝতে পারতাম। ইংরেজী বলত চমৎকার। Palebotanical Institute-এ তার প্রথম ও শেষ বক্তৃতা, আমার মতে, ইংরেজী সাহিত্যে দুর্লভ। অত্যন্ত সংযত তার ভাষা। লোকে জানত না, বাংলা দেশও চিনত না। বাংলা দেশে কজনই বা অ-বাঙালিকে চেনে! বীরবলের স্বভাব নিতান্ত বালসুলভ, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলো আর আঙুল নিয়ে খেলা করত। ছবি ভালবাসত। পণ্ডিতজী আর বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে খুবই সৌহার্দ্য। আলমোড়া জেল থেকে জওহরলাল অনেক দিন পরে বেরুলেন, খালিতে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বীরবল আর তাঁর স্ত্রীকে। দুজনই কেম্‌ব্রিজ।

একটা কথা মনে পড়ে। শীতকালের সন্ধ্যাবেলায় লক্ষ্ণৌ-এর নদীর ধারে একলা বেড়াতাম। একদম তেমনই গেছি। সামনে হেড্‌লাইট জ্বলে উঠল— দেখি বীরবল। তার বাড়ি ছিল নদীর ধারে। গাড়ি বাড়িতে রেখে আমার সঙ্গে বেড়াতে লাগল। অনেক পরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বীরবল, অত পলিটিক্‌স কেন কর?' চুপ করে থেকে বল্লে, 'কেন করি তোমাকে বলি।' অনেক কথাই বল্লে। ব্যাপার এই, আত্মরক্ষার জন্য তাকে পলিটিক্‌স করতে হয়েছিল, না করলে সে মারা যেত। 'এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, ছাড়তে চেষ্টা করি, পারি না।' অত্যন্ত দুঃখ হলো।

কয়েক বৎসর পরে, দুদিনের জন্য অসুখে পড়ল। বিশ্বাসই করিনি যে অত অসুখ। দুদিনেই শেষ। দাহের সময় পাশে ছিলাম। তার পর বীরবলের কোনো খবর রাখিনি, রাখতে চাইনি। তার মৃত্যু একটু অভাবনীয়। ভারতে যে চার-পাঁচজন অধ্যাপক আছেন বা ছিলেন, বীরবল তাঁদের মধ্যে একজন। সত্যকারের ভালো মাথা।

২২. ৫. ৫৯

সত্যেন (বোস) দিল্লী থেকে এসে দেখা করে গেল। ক' ঘণ্টার জন্য, যতটুকু আসে ততটুকুই ভালো। ১৯০১ সালে তার সঙ্গে পরিচয়, এখনও ঠিক তাই। অনেক কথা তার সম্বন্ধে বলতে চাই, পেরে উঠি না। মণ্টুর (দিলীপ) মতন ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি না; তার একটা record-এর sense রয়েছে, আমার নেই। আমার স্মৃতি বিশ্বাসযোগ্য নয়, এবং লিখে রাখতেও পারি না। আমার মন অবশ্য এলোমেলো নয়; আমার time-sequence-টা ঘড়ির কাঁটা দিয়ে চলে না। তাই সত্যেনের সম্বন্ধে কেবল একটা কথাই মনে হয়,— সত্যেনের মতন একসঙ্গে হৃদয় ও মস্তিষ্কের অতটা উন্নত ব্যবহার কোথাও দেখিনি। তারই মধ্যে কিন্তু আবার বলি, হৃদয়টা আরও বড়— একটু কম হলেই চলত।

অঙ্কে, ফিজিক্সে, কেমিস্ট্রিতে, সে দিগ্‌গজ। শুনেছি, নিজে জানি না। দুবার Mathematical Physics সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়, কিছুই বুঝলাম না। একটা কেবল আশ্চর্য লাগল; প্রায় দুই ঘণ্টা বলে গেল ইংরেজীতে, একবারো 'আমি' কথাটা ব্যবহার করলে না— it can be argued, it may be often said, one can state— ইত্যাদি। খুব ভিড় হয়েছিল প্রত্যেকবার; কিন্তু সেখানে আমিই একমাত্র নালায়েক।

কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছি। আমি সেবার ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছি। পরীক্ষার কিছু পূর্বে আমার মেজ ভাই-এর মৃত্যু হলো, আর আমারও অসুখ হলো। এক সপ্তাহের জন্য প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম। আমার ছোট ভাই বিমলা আমাকে বই পড়ে শোনাত। একদিন ভোরবেলা সত্যেন এসে হাজির। ভোরবেলাই আসত। বল্লাম ইজিপ্ট পড়েছি, কিন্তু এসিরিয়া হিটাইট প্রভৃতি কিছুই মনে আসছে না। আসুর-বানিপালের ৯২টা আর আসুরিহীসের ৮২টা— কোন্‌টা কী মনে নেই— কিছুই আসছে না। সত্যেন চুপ করে থেকে বল্লে, 'দে আমাকে।' দিলাম, সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে জিনিসটা ঠিক করে দিলে। তারপরে পরীক্ষায় তিনটি প্রশ্ন এলো, এবং ভালোই লিখলাম। কিছুদিন পরে ড. গৌরাঙ্গ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা। তিনি Ancient East পড়াতেন, টাইপ করা ছাঁকা লেখা আমাদের মুখে বলতেন, আর আমরা লিখে নিতাম, অর্থাৎ অন্যে লিখে নিতো। একদিন টাইপের কাগজ আনতে ভুল হয়েছে। তিনি নীরব। আমি বল্লাম, 'সার, আজ একটা বাঘের গল্প বলুন।' সে যাই হোক গৌরাঙ্গবাবু অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পরীক্ষার পর

জিজ্ঞাসা করলেন, 'ধূর্জটি, আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেছি তোমার খাতা পড়ে। কখনও তো আমার ক্লাশে আসতে না, Ancient East পড়েছো বলে মনেও হয় না, অথচ লেখাগুলি বেশ ভালোই হয়েছে!' উত্তর দিলাম, 'সত্যেন পড়িয়ে দিয়েছিল।' 'ও, সত্যেন! তাই বল!'

এই রকম ছোটখাট জিনিস। মাথার ব্যবহার বিশেষ কিছু দেখিনি, কিন্তু তার সবটাই মাথা। দেখেছি কিন্তু বেশি হৃদয়বৃত্তির। কত লোককে অজানিতে টাকা দিয়েছে, কত উপায়ে অন্যকে সাহায্য করেছে। মুখে মুখে পড়িয়ে দিয়েছে, কেউ বিপদে পড়লে তার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে, বন্ধুর ভাই যক্ষ্মারোগে বেশ্যাবাড়িতে পড়ে আছে, তাকে হাসপাতালে তুলে এনেছে, বন্ধুর বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে আপন করে নিয়েছে। একদিনের কথা মনে হলো। সেবার Indian Science Asscciation-এ এক বাৎসরিক সভায় সভাপতিত্ব করছে। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের লাট ওয়েভেল সাহেব সকলকে খানা দিলেন। সেদিন সত্যেনই প্রধান অতিথি, আশা করেছিলেন সে এসে পৌছবে। রাত নয়টা পর্যন্ত এল না— অবশ্য তার পরেও নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল এই: দুপুরবেলা একজন পুরাতন হিন্দু স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তারই সঙ্গে টাঙ্গা চড়ে তার বাড়ি হাজির, এবং সেইখানেই সারাদিন সে আর তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করলে, রাত্রে খেয়েও এলো। ওয়েভেল সাহেবের সঙ্গে আর দেখা হলো না। পরের দিন লেডি ওয়েভেল জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হলো Sailcr boy— এলে না কেন? আমরা সব তোমার জন্যে বসেছিলাম।' আমতা আমতা করে একটা জবাব খাড়া করলে। সে-ক'দিন কলকাতার চাঁদনী থেকে একটা টুপী কিনে সারাদিন মাথায় পরেছিল। জামা কাপড়েরও সেই দশা। জ্ঞান মুখুয্যে সেই খবরটি দেয়।

এই রকম স্বাভাবিক ভাবে সে অ-স্বাভাবিক ব্যবহার করত— এখনও করে। স্বভাবটাই মেয়েমানুষের— কিন্তু ন্যাকামি বরদাস্ত করতে পারে না।

লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত আর তথাকথিত পণ্ডিত দেখেছি। দু'একজন ছাড়া আর সবাই পলিটিসিয়ান, কেউ বেশি আর কেউ কম। (কলকাতায় শুনেছি কেউ কেউ অসম্ভব পণ্ডিত আছেন, এবং তাঁরা পলিটিসিয়ান নন।) দু'ধরনের পলিটিসিয়ান পাওয়া যায়; এক ব্রিটিশ সরকারের বিপক্ষে, আর, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। ইংরেজ এখন আপাতত নেই, অতএব কংগ্রেসেরই বিপক্ষে বেশি। আসল কথা কিন্তু অন্য। আমাদের প্রধান ব্যবহার হলো

শিক্ষা, এবং শিক্ষাই হলো প্রধান ব্যবহার, শিক্ষাই হলো বুদ্ধির পরিচর্যা। বুদ্ধির চর্চা করে হৃদয়ের ওপর মেউড়ি পড়ে। হৃদয়ের অ-ব্যবহার আমাদের স্বভাবে খুবই চোখে পড়ে। অবশ্য সংসারযাত্রায় খানিকটা ঢাকা থাকে। হৃদয়ের এই অ-ব্যবহারের অনেকখানি ব্যবহার খোলে শক্তির, পাওয়ারের, কাজে। কারণ বর্তমান যুগে দায়িত্বহীনতার বদসে সমাজ যেন অধিকার-প্রমত্ত হয়েছে, এবং অধিকারের অর্থই হলো শক্তি, 'পাওয়ার', অর্থাৎ পলিটিক্স। সত্যেনের মধ্যে 'পাওয়ারে'র তিলমাত্র আকর্ষণ নেই। সে বিদ্যাবুদ্ধি আর হৃদয় নিয়েই কাটিয়ে গেল। সে 'পাওয়ার' বোঝে না, তাই মনে হয় বিশ্বভারতী থেকে চলে এলো। এবং বোধ হয় জওহরলাল, হুমায়ুন কবীরের কাছে অনেক খাতির পেয়েও, তার যথাযোগ্য, অন্তত বাংলাদেশে, খাতির হয়নি। তার মনুষ্যত্ব কোথায় ও কতখানি, আমরা ঠিক জানি না। ছেলেরা ভালোবাসে, এক হিসেবে যথেষ্ট। আবার অন্য হিসেবে নয়, এবং সেইটুকুই দুঃখ।

২৪. ৯. ৫৯

আলিগড় ছেড়ে যাচ্ছি এক সপ্তাহের মধ্যে। এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকদের attitude কি?

পাঁচ বছর রইলাম মুসলমানদের সঙ্গে। লক্ষ্ণৌ-এ ও বহু বৎসর। আমি ত' কিছুতেই হিন্দু মুসলমানদের পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না— সবই যুবক, ছাত্র, শিক্ষক। এর বেশি কিছু চোখে পড়েনি।

কিন্তু একটা নতুন জিনিস উঠছে শুনছি। নাম 'জামাৎ' অর্থাৎ ইসলামের অভ্যুত্থান। কোনো ধর্মের অভ্যুত্থানই আমার পছন্দ নয়। ইসলাম ধর্মের বই কিছু কিছু পড়েছি। তাতে মনে হয় আজকালের ইসলাম দু-ধরনের, এক মধ্যযুগীয় আর অন্যটি উন্নতিশীল। খাঁটি মধ্যযুগীয় মনোভাব আমি বুঝতে পারি না। উন্নতিশীল ইসলামের মধ্যে শাশ্বত অংশটি ছেড়ে দিলে কি থাকবে? (যদি অবশ্য শাশ্বত বলে কিছু থাকে?) সেটা কেবল common ethics। তার মধ্যে spirituality-র অংশ কতটা জানি না— ধার্মিকেরা বলেন, আছে। আমার মতে spirituality is chastened ethics।

২৯. ৯. ৫৯

Arts বলে একদল বস্তু আছে; কিন্তু Art বস্তুটি কি arts-এর সাধারণ গুণনীয়ক? Art নিয়ে যা বিজ্ঞান— এবং সেটা বিজ্ঞান— তাকে আমরা নন্দনতত্ত্ব বলি— সেটা তত্ত্ব। নন্দনতত্ত্ব থেকে arts-এর কোনো একটি অংশ Art হতেও পারে, নাও হতে পারে। হতে পারে এইজন্য যে সাধারণ থেকে বিশেষ জন্মায়। কিন্তু হতেও পারে না এই জন্য যে সৌন্দর্যতত্ত্বর চাপে কোনো একটি অংশ মারা যায়। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং বিশেষ বিশেষ কলাকে একত্রিত করেছিলেন, যথা চিত্রাঙ্গদা। নন্দনতত্ত্বকে তিনি কিন্তু বিশেষ স্থান দেন নি, তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। অবশ্য তাঁর লেখাই অবরোহী, deductive, সেজন্য নন্দনতত্ত্ব তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। বস্তুত তাঁর লেখাই synthesis মনে হয়। সাধারণত অবশ্য নন্দনতত্ত্ব থেকেই একটা না একটা art-criticism শুরু হয়। সে দুটো আলাদা রাখাই ভালো ভিন্ন ভিন্ন কলাবিদ্যার চর্চাই শোভন। তারপরে সৌন্দর্যতত্ত্ব।

ভারতীয় সঙ্গীতে musical criticism নেই বল্লেই হয়, আছে পদ্য-সংক্রান্ত সৌন্দর্যতত্ত্ব। বিদেশী সঙ্গীতে সবই আছে। কিন্তু যেন চিত্রানুগ, চিত্রই যেন বেশি। এবং সেটা স্বাভাবিক, কারণ কানের অভ্যাস এ যুগে কমে গেছে, চোখের অভ্যাসই খুব বেশি, যথা বিজ্ঞানে। আলাদা করে দেখাই ভালো মনে হয়। জীবনটা স্বল্প। সত্যই কি জীবনটা তাই?

২৬. ৯. ৫৯

যা কিছু লিখেছি পড়েছি, তাই থেকে মনে হয় যে আমার মন বড়ই সন্দেহাকীর্ণ। যেখানে deductive, সেখানেই বিশ্বাস জমে ওঠে। Inductive হওয়ার অর্থই বোধ হয় scepticism।

বুদ্ধ, যীশু, অন্যান্য মিস্টিক একই ধরনের যেন কথা বলেন। ঠিক বুঝতে পারি না। শ্রীঅরবিন্দর Divine Message-এর রচনাগুলি কিন্তু যেন বুদ্ধিপ্রধান। এটা মনে হয় উচিত নয়, কিন্তু···। বিবেকানন্দর সৃষ্টিও যেন প্রধানত রাজযোগের, তাও নয় অবশ্য, তবু···। কষ্টও পাই, তা হোক গে। মনটাই যেন viscus···। স্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, ভারসাম্য নেই, কাদাও নয়, থকথকে।

২৮. ৯. ৫৯

বন্দরনায়েক মারা গেলেন। মারা যাবার সময় আততায়ীকে করুণা করতে বলে গেলেন। একটা অসম্ভব রকমের ঐতিহ্য তাঁর ভেতরে বসে গেছে। পরে বৌদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় সিংহলের সমস্যা মনেই আসে না। কিন্তু খবরের কাগজে বোধ হয় মাতামাতি করবে। সেটা হবে অন্যায়।

২৯. ৯. ৫৯

আজ নাসীর খাঁর (?) মুখ থেকে, 'সওতন ঘর নাজা, হা মোরে সৈঁইয়া' শুনলাম। প্যাঁজ-রশুন ছাড়া এ ঠুংরি-দাদরা আর কারুর গলা দিয়ে নাবে না। আদত কথা, কথার উচ্চারণ, তারপর কণ্ঠের আওয়াজ, দুয়ে মিলে এক অদ্ভুত সমাবেশ হয়। খেয়ালে আধারঙ-সদারঙের ঢং কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, যদিও আমার কাছে অন্তত মুসলমানের কণ্ঠেই বেশি ভালো শোনায়। রামকৃষ্ণ ভাজে আর ফৈয়াজের গায়ন পৃথক হলেও দুই-ই চমৎকার, তবু যেন ফৈয়াজেরই আরো বেশি মনোহারী। ধ্রুপদে কিন্তু হিন্দুরই আধিপত্য। অবশ্য গোয়ালিয়রের ওমরাও খাঁ, জাকরুদ্দিন, আলাবন্দে, নসীরুদ্দিনের ধ্রুপদ মন দিয়েই শুনেছি। তাদের মুখের সংস্কৃত উচ্চারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ, নসীরুদ্দিনের নামই ছিল পণ্ডিত নসীরুদ্দিন। তৎসত্ত্বেও হিন্দুদের মুখের ধ্রুপদ যেন 'শুদ্ধ বাণী, শুদ্ধ আচার', যেন প্রক্রিয়াটিই বিশুদ্ধ। ঠুংরি-দাদরা প্রভৃতি মুসলমানদের।

বহু বৎসর পূর্বে মির্জাপুরের কাছে বিরহী গ্রামে যাই। সীতা যখন লঙ্কায় যাচ্ছেন তখন পায়ের নূপুর ফেলতে ফেলতে উড়ে গেলেন, রামচন্দ্র সেই নূপুর কুড়িয়ে পান, তাই নাম 'বিরহী'। সেখানে যা কাজরী শুনি, তার তুলনা নেই। বেশির ভাগই ঝাঁপতালের ওপর। বারাণসী, ফৈজাবাদেরও কাজরী খুবই ভালো। চৈতী কিন্তু হিন্দুদের। সেটার মধ্যে লোকসঙ্গীতই প্রধান বটে, কিন্তু তারা রীতিমত sophisticated। লক্ষ্ণৌ-এর গা ঘেঁষে গেছে এরা। একবার কৈসার বাইয়ের ঠুংরি নিয়ে আলোচনা করি— সেটা যেন বোম্বাই-এর ঠুংরি। উত্তরপ্রদেশের ঠুংরি, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌ-এর ঠুংরি, অন্য ধরনেরই, বেনারসের ঠুংরি থেকে কিছু পৃথক। মীরা ব্যানার্জির পাঞ্জাবী 'পানি ভরেলি' আর রোস্নন বাই-এর বেনারসী 'পানি ভরেলি'— দুটোয় আকাশ-পাতাল তফাত। 'আলাবেলি' কথার উচ্চারণই আলাদা, 'ঝমাঝম'

অন্য জাতের। রোস্থলান বাই-এর 'পানি ভরেলি' যদি না শুনতাম, মীরা ব্যানার্জির 'পানি ভরেলি'ই ভাল লাগত। রোস্থলন বাই বেনারসের লোক, একটু কাশীর গন্ধ আছে। কিন্তু তাঁর আদতই হলো মুসলমানী। কাশীর বিদ্যাধরী, সিদ্ধেশ্বরী, কমলেশ্বরী এমন কী গিরিজা দেবীও চমৎকার গান। কিন্তু রোস্থলনের ঠুংরি, দাদরা, কাজরীর সমকক্ষ কুত্রাপি নেই। বহুকাল পূর্বে এক ছিলেন মৈজুদ্দিন— তিনি non-pariel। ঠুংরির তিনি ছিলেন বাদশা। মৈজুদ্দিনের ঠুংরি এবং রমজান মিঞার টপ্পা মনে করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি। তাঁদের সম্বন্ধে একবার ভেবেছিলাম কিছু লিখব, কিন্তু বিধি বাদ সাধলে।

৩০. ৯. ৫৯

আজ তিরিশে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯। ৩৫ বৎসর ইউনিভারসিটিতে কাজ করলাম, এবং আরো তিন বৎসর সরকারের নোকরি। শেষ বছর বিনা মাইনের economic adviser। চিরটা কাল উত্তরপ্রদেশে। এ দেশের গ্রীষ্মকালে বড় বেশি গরম, তাছাড়া সবই ভালো। এদের ভদ্রতা, কথাবার্তা চাল-চলন, ব্যবহার একটু যেন উঁচু ধরনের। এদের ভদ্রতার মানই উঁচু। পরশু থেকে যে ক'দিন বাঁচব সে ক'দিনের বেশির ভাগটা দেরাদূনে থাকব, যদিও সেটা এখন পাঞ্জাবী শহর।

অন্যকথা মনে উঠছে। ভারি মজা লাগে। প্রায় চব্বিশ বৎসর লেকচারার ছিলাম, বছর দুই পরে রীডার, তার পরই প্রোফেসার এবং শেষে ডিপার্টমেন্টের কর্তা। এগুলো লক্ষ্ণৌ-এ। তার পর আরো পাঁচ বছর আলিগড়ে— সেখানেও কর্তা। তবে লেকচারার ছিলাম বেশির ভাগ সময়। কিন্তু আমার ওপর তিলমাত্র আঁচ পড়ে নি, দু'একদিনের ঘটনা ছাড়া। কর্তা হয়েও কর্তৃত্ব করতে পারিনি। ব্যাপারটা আমার ধাতেই বসেনি।

বই পড়াটাই আমার ধর্ম। পুরোদস্তুর বই খান-পাঁচেক লিখেছি, অন্য সব টুকরো, ছিটেফোঁটা, প্রবন্ধের সমষ্টি। কখনও কখনও, কোথায় কোথায় কিছু সারবস্তু আছে নিশ্চয়। আমি বলতাম :

> **We are third raters, trying desperately to be second rate. I want to remain a lecturer because I deserve a lectureship in a free India. My maximum should be that and nothing more.**

কিছু আদর্শবাদ ছিল নিশ্চয়, কিন্তু আমি জানতাম না। I took it in my stride.

নানা বিষয়ের বই পড়েছি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি। কিছু বিজ্ঞানও। কেন পড়েছি তা জানি না। ভালো লেগেছে তাই পড়েছি— পড়বার জন্য পড়িনি।

পড়ার মধ্যে বিস্তর দোষ ছিল। সংস্কৃত পড়তে পড়তে ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে আমার শিক্ষক ছিলেন সতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি Honours Standard-এ অঙ্ক কষাতেন। তাও ছেড়ে দিলাম। অনেক দূর এগিয়ে ফ্রেঞ্চও ভুলে গেলাম। এ তিনটি আমার প্রধান দুঃখ।

বিস্তর অন্য দুঃখও আছে। লোকে বলে আমি বুদ্ধিসর্বস্ব। তা ঠিক নয়। বুদ্ধি মানে যদি Aristotelian syllog'sm হয়, তো আমি ঠিক সেই হিসেবে লজিক্যাল নই। বরঞ্চ আমার মন ডায়লেকটিকাল। সুধীনের (দত্ত) মনও ডায়লেকটিকাল, সে 'যদিচ', 'তথাপি', 'যদ্যপি', ইত্যাদি দিয়ে নিজেকে বাঁধে। আমি বাঁধি না, চলি ; সুধীন চক্রবৎ খানিকটা ঘোরে। ভাষায় আমার বাক্য পরিষ্কার খোলে না, লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে, যাকে বলি staccato। সুধীন harmonic, contrapuntal।

লেখায়, বাক্যে আমার বিস্তর দোষ আছে। আমি বাঁধি না— চলি, এইটাই আমার প্রধান কথা। তার দোষগুণ আছে, গুণের চেয়ে দোষই বেশি। এই চলার পথে অনেক দুঃখ এসে জোটে। দুঃখ ঠিক বলব না, বলব বাধা-বিপত্তি।

পড়েছি কিছু নিশ্চয়, এবং সেই সঙ্গে পড়িয়েছি। রোজ দুঘণ্টা, তারপর এক [ঘণ্টা ?] টিউটরিয়াল। প্রফেসার হয়ে অবধি সপ্তাহে ঘণ্টা ছয়েক। প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রী আসত। বই-এর কথাই বেশি কইতাম, গল্পগুজোবও রোজই চলত। (বুদ্ধদেববাবু আমার সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল।) ভালোমন্দ শিক্ষকও আসতেন। কত রকমের ছেলে-ছোকরাই না আসত ! (পরীক্ষা দেবার পর বিয়ে করে রাত্রে টাঙ্গায় চড়িয়ে বউ নিয়ে হাজির। সে রাত্রে দুজনকে আলাদা জায়গায় শোয়ালাম। পরের দিন সকালে চা খেয়ে অন্য দেশে পালিয়ে গেল। এখন বড় চাকরি করছে।) গত তিন বছর আলিগড়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারতাম না, তাদের পড়াইনি, সামান্য টুকিটাকি সেমিনার নিতাম, গল্প করতাম।

শুনেছি তিন-চার দশক ছাত্রদের আমি 'মানুষ' করেছি। কথাটা ভুল, মানুষ আমি করিনি। এতদিনে মাত্র গুনে চার-পাঁচটি ছাত্র পেয়েছি। তারা

এক হিসেবে মানুষ নয়, বাঁদর। অর্থাৎ তাদের স্বভাবে ভারসাম্য নেই। বাকী সব সাধারণ, ছা-পোষা লোক, চাকরি করে খায়, উন্নতি করে ইত্যাদি। তার বেশি নয়। দেখা করতে আসে অনেকে বলে 'উয়ো জমানা গুজর্ গিয়া'। জানিনা গিয়েছে কিনা। তবে বদলেছে নিশ্চয়। প্রত্যেকেই বলছে প্রতি বৎসর standard পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু competitive পরীক্ষায় বছরে অন্তত দশ-বারটা ভালো ছেলে বেরুচ্ছে দেশ থেকে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না। সাধারণে ইংরেজী শিক্ষার বহর কিছু কমেছে; নীচে থেকে ওপরে ঠেলা মারছে বোধ হয় হিন্দী। হিন্দীর জন্য standard কমেছে বলা যায় কি? ওঠা-নামা ব্যাপারটা অতটা সাংখ্যিক নয় যাতে গুণগত হতে পারে। গুণগত এখনও নয় বলেই মনে হয়। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু এখনও গুণগত হয়নি নিশ্চয়। সবই ভালো ছেলে বেরুচ্ছে তা নয়, কিছু আসছে মনে হয়। গড়পড়তা শতকরা প্রায় ৪১ জন নিম্নশিক্ষা পাচ্ছে শুনলাম, বিশ বছরে ৬০ হবে। তখন গুণে পরিণত হবার সুবিধা হবে। ব্যাপারটা এই: ভারতে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব হলো না, তখন কেবল পরিবর্তনের হার কিছু বদলাতে হবে— তার বেশি কিছু না। এই সব ভেবে-চিন্তে মনে হয়, 'উয়ো জামানা চলা গিয়া' কথাটা এক রকম ভাববিলাস।

আর একটা কথা মনে আসে। আমি ঠিক অধ্যাপক নই। অধ্যাপকীয় মনোভাব আমার আছে নিশ্চয়; তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিপ্রবণতা; আরো বেশি সন্দেহাকীর্ণতা। শেষে দাঁড়ায় অনধ্যাপকীয়তা। সে বস্তুটা কী ভেবে পাই না। প্রথম কথা, অনেকগুলি বিজ্ঞানকে একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা, যেটা ঠিক অধ্যাপকীয় বিশেষজ্ঞতা নয়। সেজন্য ছেলেদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়েছে জানি। নিজের ক্ষতি আরো।

গান আমাকে অধ্যাপকীয় মনোভাব থেকে অনেক বাঁচিয়েছে। যদিও গানে পাগল ছিলাম তবু যেন সেটা বুদ্ধির দিক থেকেই ফুটে উঠেছে।

আমি প্রথম প্রথম emotive value গ্রাহ্য করিনি। পরে বোধ হয় করেছি, তবে অন্যভাবে। সাহিত্যিক emotion আমার মনে বিশেষ স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথে সাহিত্য ও সঙ্গীতের হরগৌরী মিলন আছে। মোটামুটি প্রধানত musical emotionই আমার প্রাণে সাড়া দেয়। সে musical emotionগুলি আমার অধ্যাপকীয় মনোভাবের অতিরিক্ত। গান নয়, ছবি, আকাশ-বাতাস, নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমি অন্য রকম হয়ে যাই। বৃষ্টি এলো ঝমঝম করে, ছেলেদের ছুটি দিয়েছি। কোকিল ডাকলেও তাই, শীতের আমেজেও তাই, গাছের পাতা ঝরলেও তাই— কেবল ছুটি দিতে

চাইতাম, কিন্তু বেশি দিতে পারতাম না। রাধাকমলবাবু সামান্য বকতেন, কিছু নয়, নিজের বই নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

গল্প, কথাবার্তা— সাধারণ মানুষের অপেক্ষা অনেক বেশি কথা কইতাম; যাকে 'কিস্‌সা' বলে তা করতাম না। আড্ডাই দিতাম, তবে অন্যভাবে। অন্যের কথাও শুনতাম। তবে নিছক গাল-গল্প হতো না এবং সেইখানেই পার্থক্য ছিল। সাহিত্যিক বাক্যভঙ্গি ছিল সেই পার্থক্যের সম্বল। তাতে ধার থাকত একটু বেশি। বন্ধুরা দুঃখিত হতেন না, মজাই পেতেন। অফিসিয়াল লেকচার দিয়েছি, কিন্তু কথাবার্তার ধরনেই আমার লেকচার হতো। তার ফলে আমার অনধ্যাপকীয় মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। যা ইচ্ছা হয় তাই বলতাম, ভালোমন্দ সব কিছুই। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, সব টেনে আনতাম। দৃষ্টান্ত দিতাম সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি থেকে। যা মনে এলো তাই করেছি, কেউ বাধা দেয়নি।

স্বাধীনতা পেয়েছি খুবই বেশি। তার ফলে অনধ্যাপকীয় ভাবটাই বেশি এসেছে। সাধনা কিছু হয়ত করেছি। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন কখনও করিনি। এতে ক্ষতিও হয়েছে, লাভ হয়নি যে তাও বলতে পারি না।

১. ১০. ৫৯ রাত্রি

এতগুলো বিদায় সম্ভাষণ পেলাম। খুবই আশ্চর্য ঠেকছে। আলিগড় এত ভদ্র জানতাম না। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি, প্রত্যেকেই চমৎকার ব্যবহার করলেন। ভাইস চ্যান্সলার বড় পার্টি দিলেন। অমলের (বোস, ইংরেজীর প্রোফেসার) বাড়ি খেলাম রাত্রে। নিতান্ত নিজের মানুষ মনে হলো। সেখানে কিন্তু একটা বোকামি করে ফেল্লাম, যেটা উচিত ছিল না। হিমাংশু মুখুজ্যের সঙ্গে (ধর্মসমাজ কলেজের অধ্যাপক) পুরাতন কথা তুলছিলাম। হঠাৎ বলে ফেল্লাম, 'আচ্ছা, এত বৎসর সাহিত্য করছি, বড় সাহিত্যিক নই, ছোট সাহিত্যিক, তবু প্রবাসী বাঙালির অধিবেশনে সাহিত্যিক সভাপতি হলাম না কেন? লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আলিগড়ে এসেছি, সেখানে দ্বিতীয়বার সাহিত্য-বাসর বসেছে, সেবারও সভাপতি হওয়া দূরের কথা নিমন্ত্রণ পর্যন্ত পেলাম না। ব্যাপারটা কী জানো? ব্যাপারটা snobbery। গানের সভাপতিত্ব নিশ্চয়ই একবার করেছি, কিন্তু সাহিত্যে কী কিছুই করিনি?' এ-কথা আমার বলা নিশ্চয়ই উচিত হয়নি, মনে রাখলেই পারতাম। হঠাৎ কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়লাম।

৪. ১০. ৫৯

রাজপুরে অনেক সন্ন্যাসী থাকেন। রাস্তা দিয়ে যান দেখি। থাকবার মতন জায়গা বটে; বেশি ঠাণ্ডা নয়, গরমও নয়। সামনে, চারধারে পাহাড়, আর দূনের উপত্যকা। সংসার ছেড়ে অনেকেই থাকেন, দু'একজন ছাড়া। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সংসার ছেড়েও সংসারী। একেবারে ছেড়েছুড়ে দিয়ে নির্জনে গুহায় কিংবা বরফের ওপর থাকা সেটা এক হিসেবে logical। আমি কিন্তু একজন ঘোর বৈদান্তিক দেখেছি তিনি গ্রামে, পুকুরের ধারেই থাকতেন। কিন্তু সংসারী না হয়েও সংসারী, এ যেন empirical গোছের। তবু, যা পারা যায় তাই ভালো। পৃথিবী থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো, মন্দের ভালো।

৫. ১০. ৫৯

ঝিরঝিরে হাওয়া; Corot-র ছবি; চিরুণী চেরাও নয়; স্থাপত্যের কোনোটির সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না। সঙ্গীতে নিশ্চয়ই আছে— মোৎসার্ট; রবি ঠাকুরের কয়েকটি গানে, যেন মোলায়েম— আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্যকালীন, হাল্কা হাওয়ার মতন, কখন আসে কখন যায়। হেমন্তের কল্যাণ নয়, শীতের শেষও নয়; বসন্ত যেন এলো বলে। আইভি কম্পটন বার্নেট, দ' লা মেয়ারের রচনার মতন। তাই মনে হয় ঠিক যেন Corot-র ছবি।

১৫. ১০. ৫৯

স্বতন্ত্র দল-কে ঠিক বুঝি না। ছেড়ে দিলেই ঢুকে যায়, কিন্তু অজানিতে আপনি আসে। আদত কথা এই: এঁদের কর্তারা চালাক লোক। এক ধরনের বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই। কিন্তু পুরোপুরি বুদ্ধিমান নয়। পুরোপুরি বুদ্ধিমান হবার জন্য প্রগতিশীল হওয়া চাই। অবশ্য প্রগতিবাদের মধ্যে অনেক জুয়াচুরি আছে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর দিক থেকে একটা উন্নতিশীল অংশও আছে। এবং তাকে অন্যথা করাই যায় না। স্বতন্ত্র দলের কর্তারা যেন পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, সেজন্য এঁরা চালাক। পুরোপুরি বুদ্ধিমান নয়। রাজাজী চালাক এবং বুদ্ধিমান। তবে বুদ্ধির চেয়ে চালাকিটাই বেশি। মুন্‌শীও তাই, তবে রাজাজীর চেয়ে নীচু স্বরের।

কতবার না পট-পরিবর্তন করলেন! আর মাসানি? তিনি কেবলই মাসানি। তাঁর anti communism হলো P. S. P-র বংশধর। সে যাই হোক। এই ক'জন ছাড়া বোধ হয় Freedom of Free Enterprise-এর দলের। (ক-জন ছাড়া নাও হতে পারে।) পুরানো রাজা-রাজোয়ারা, সামন্ত, বড় বড় চাকরের দল—এঁরা সব স্বতন্ত্র পার্টিতে জুটবে। সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল, ইংলণ্ডের conservative party-ও নয়, তারও কম। হয়ত অন্য কথা মনে হবে।

১৬. ১০. ৫৯

ফ্রয়েড নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা মনে হয় অবান্তর। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাম নিশ্চয়ই কিছু ছিল, তবে অতিশীঘ্র সেটা sublimated হয়ে গেছে। আগেকার কবিতায়, নভেলে অন্তত বারচারেক, আর বোধ হয় কখনও ছোট গল্পে কাম ছিল, কিন্তু অন্য সাহিত্যের তুলনায় লঘু। অবচেতনার খেলা নিশ্চয়ই, কিন্তু অবচেতনা থেকে কাম, কিংবা কাম থেকে অবচেতনা এবং কাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, এই ধরনের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের বেলায় অচল। যদি অবচেতনা বলতে হয় ত' তাঁর চিত্রে, কিন্তু সেখানে হয়ত কাম খুঁজে পাওয়া গেলেও sublimation-এর রূপটাই যেন বেশি চোখে পড়ে। ভারতীয় সমাজে এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। আমাদের সমাজ-চিন্তা sublimation-এরই পরিপন্থী। বিবাহটা নিতান্তই সামাজিক আচার, সেজন্য অবচেতনা দৈহিক কামে পরিণত হয়নি। আমার মতে এটা এক রকমের ভালোই হয়েছিল। অনেকে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিতান্ত abstract। গোরা, ঘরে-বাইরে কী Lolita-র মতন হবে।

২৫. ১০. ৫৯

দিল্লী থেকে রেডিও শুনলাম শ্রীরাগ সম্পর্কে। বিসদৃশ লাগল শুনে যে পুরানো শ্রীতে শুদ্ধ রেখাব ও শুদ্ধ ধৈবত লাগে। আগে যাই থাক না কেন, 'নতুন' শ্রীতে কোমল রেখাব, কোমল ধৈবত ও পঞ্চম বাদী থাকা চাই। ধৈবত অতিকোমল বলতেও রাজি। ভালো ওস্তাদের কাছে গৌরী, মালিগৌরীও শুনেছি। গৌরী বলতে তিনকড়ি ও আমার দাদা ত্রিপুরার

কণ্ঠে 'পাগল বাবা পাগলি আমার মা' যা শুনেছি, তার তুলনা নেই। 'মার নাম শ্যামার' মধ্যে শ্যামা বলবার সময় দাদার গলা কেঁপে উঠত। এ রকম কণ্ঠ এক দিলীপ ছাড়া আর কারুর গলায় আসত না, যদিও গান কারুর কাছে শেখেনি। দাদা হালিশহরের সিদ্ধেশ্বরীতলার ঘাট থেকে 'পাগল বাবা পাগলি আমার মা' গানটি গাইছে, আর আমরা নদীর ওপার থেকে সে গলা শুনতে পেতাম। এত জোর যে ঘরের কাচের দরজা ঝন ঝন করে উঠত। দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেল, আর গাইত না।

ছয় রকমের শ্রী শুনেছি, শ্রী, পুরবী, পূরিয়া, পূরিয়া-ধ্যানশ্রী, মালিগৌরী ও গৌরী প্রত্যেকটি আলাদা। তারপর অন্য রাগিণীর সঙ্গে আদান-প্রদান। পুরবা কিংবা পূরবী-কল্যাণ গিরিজাবাবুর মুখেই শুনেছি। বেশি মেলা-মেশা পছন্দ করতাম না, তবে কানের অভ্যাস, অনেকদিন রপ্ত হয়ে গেলে সবই সহ্য হয়। বর্ণসংকর অতটা ভালো লাগে না, যা হচ্ছে।

আজ, কাল দুদিন ধরে রেডিওর গান শুনলাম। গত সপ্তাহে রেডিওর সঙ্গীতও শুনেছি। লাগল ভালো কিন্তু সেদিন রেকর্ডে রামকৃষ্ণ ভাজে, বন্দু খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, তারপরে হীরাবাই ও তাঁর বোন সরস্বতী রাণে। রামকৃষ্ণর কাফী কানাড়ার জাতই আলাদা। বন্দু খাঁর সারেঙ্গীও পৃথক শ্রেণীর। ফৈয়াজ তখন মৃত্যুমুখে। তৎসত্ত্বেও ফৈয়াজ। হীরাবাই কিন্তু সে শ্রেণীর নয়। অত্যন্ত সুকণ্ঠ, আবদুল করিমের গায়কী। (আজকাল না কী শুনছি ওয়াহিদ খাঁর শিষ্য!) মারাঠিদের গঠন-চাতুর্য খুবই বেশি, তবে যেন একটু যান্ত্রিক হয়ে যায়। আমার মতে কৈশর বাই-ই বর্তমানের শ্রেষ্ঠ গায়িকা, এক এক সময় মনে হয় বোধ বা আর্টিস্ট হিসেবে বড়ে গোলাম আলির চেয়েও বড়। কণ্ঠে নাকি সুর মোটেই নেই, আ-আ করে গান এবং আলা-দিয়া খাঁর তানেরই মতন তান-কর্তব ভাঙতে ভাঙতে ওপরে ওঠে। অনেকের মনে হয় তাঁর তান একঘেয়ে, আমার মনে হয় তা নয়, মোটেই নয়, তবে একই ধরনের। রামকৃষ্ণ ভাজের প্রত্যেকটি কাজই নতুন, স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন।

বিনায়ক রাও পটবর্ধনের বিলাসখানী শুনলাম। তার মধ্যে শুদ্ধ মধ্যম মাত্র দুবার শুনলাম। জমল না। অনেকদিন আগে শুনেছি, ঠিক কোথায় মনে পড়ছে না। টোড়ী গাইতে গাইতে বিলাস খাঁ ভুল করে শুদ্ধ মধ্যম দিয়ে ফেল্লেন, আকবর বাদশা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তানসেন বল্লেন, 'বিলাসখানী বন্ গিয়া'। গল্পটি গল্প, কিন্তু অতদিনে শুনে শুনে বিলাসখানী টোড়ী আমাদের ধাতে বসে গিয়েছে, আমাদের আর ভুল হয় না।

পটবর্ধন গাইলেন ভালোই, শুদ্ধ, তবু যেন গঠন-শৈলিতে ফাঁক ছিল। আমার মনে হয় অত্যন্ত উঁচু পর্দায় গাওয়ার ফলে এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো কোনো গান নীচু পর্দায় গাইতেই হয়, যেমন মিঁয়া কি মল্লার, টোড়ী, দরবারী কানাড়া ; চড়িয়ে গাইতে হয় আড়ানা পরজ, ইত্যাদি।

বোম্বাইএ আবদুল করিমের প্রভাবই বেশি, যাকে বলে ছড়াছড়ি। সাও-য়াই গন্ধর্ব থেকে রাজগুরু পর্যন্ত সবই আবদুল করিমের শিষ্য। অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠ। অবশ্য, আবদুল করিম নিজেই বন্দেশী তৈরি করেছেন।

মালবিকা (কানন) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা গান গেয়ে থাকে। তার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছে, রবি রায় শ্রীকৃষ্ণ রতনঞ্জনকারের প্রিয় শিষ্য, তবু যেন একটু আলাদা। মালবিকা সত্যই ভালো গাইছে।

কী জানি কেন বন্দেশী গানই ভালো লাগে। আজকাল শুনতে পাই কম। তবু কিছু বড়ে গোলাম আলি, আমীর খাঁ, নিশার হুসেন খাঁর কাছেই পাওয়া যায়। এরা আমার মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর, এখানকার প্রথম শ্রেণীর।

দিলীপ, বকুবাবু আর সচ্চিদানন্দর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। প্রশংসার যোগ্য। আশ্চর্য! মন থেকে পুঁছে গিয়েছিল। সচ্চিদানন্দের মতন হিন্দী ও উর্দু উচ্চারণ দেখা যায় না। যাকে enunciation বলে সেটা তাঁরই ছিল। আর ছিলেন ঘোরতর বাবু। যখন কলকাতায় থাকতেন, ভিড় পড়ে যেতো। বাঙালির মতন গলা মিষ্টি কোথাও হয় না।

২৭. ১০. ৫৯

আমার বাড়ির ওপরই শুক্‌নো নদী, বর্ষা ছাড়া জল থাকে না। জমির ওপর মধ্যে মধ্যে সৎকার করে ; মাটিতে পোঁতে, মরা পোড়ায়। আমার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, তবু বেশ দেখা যায়। পুলিসে কিছু করতে পারে না, লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ শেষ করে। শেষ আর কী! আধখানা ফেলে চলে যায়। আমার স্ত্রীর অবস্থা ভাবা যায় না। তিন চারদিন মড়ার মতন পড়ে থাকে, এক একবার উঠে নদীর দিকে কাঠের পুতুলের মতন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এবার দেখলাম দুদিন মাত্র— ক্রমে বোধ হয় থাকবে না, পুলিশে বন্ধ করে দেবে।

আমার একবার এমনি হয়েছিল। আমি তখন ছেলেমানুষ, স্কুলে পড়ি বারাসতে। শীতের রাত্রে পুলিসের বড় কর্মচারী মারা গেলেন। কখন মারা গেছেন টেরই পাইনি। হঠাৎ চোখ খুলে বিছানার মধ্য থেকেই শুন-

লাম দূরে কুড়ুল কোপানির শব্দ হচ্ছে— বিছানার পাশে বাবা, মাকে যেন দেখতে পেলাম না। মনে হলো বাঁশ কাটার শব্দ, কেউ বোধ হয় মারা গেছে; সিদ্ধেশ্বরবাবুই নিশ্চয়, তার পর কী ভীষণ চিৎকার। তার পরের সারাদিন পর্যন্ত চোখ বুজে পড়ে রইলাম, কিছুতেই বিছানা থেকে উঠলাম না। অনেক বৎসর ধরে গভীর রাতে ঐ বাঁশ কাটার শব্দ কানে আসত। মৃত্যুর শব্দ ক্রমেই ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। সব ফুরিয়ে যায়, কিন্তু এই পঞ্চাশ বছর পরে হঠাৎ গভীর রাতে বাঁশ কাটার শব্দ কানে এলো।

২৯. ১০. ৫৯

দ'গল আর জোন অব আর্ক এক গোত্রের মনে হয়। দুজনের কর্ম resistence-এর ঘোরফের। প্রধান কথা দুজনের এই, ফ্রান্সের নীচু অবস্থা থেকে ওপরে তোলা। ফরাসী দেশের sovereignty, তার glory তার prestige, দুজনেরই একই কর্তব্য। দ'গল তাই চেয়েছিলেন, তাই আমেরিকান ও ইংরেজ তাঁকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, এখনও করেন। অত্যন্ত দাম্ভিক মানুষ, কিন্তু সেটা কি ব্যক্তিগত না জাতীয় দম্ভ? তৎসত্ত্বেও নিতান্ত কর্মী পুরুষ। Democratic freedom চান না, চান বোধ হয় human freedom। Fraternity কেউ চান না দেখছি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চায় freedom of the individual। তার মানে কম, আমাদের দেশে। খেতে পাই না ত' আবার মানবিক স্বাধীনতা! ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

৩০. ১০. ৫৯

আঁদ্রে জীদ দেখছি দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। ভালেরি, মরিয়াক, এদের সমকক্ষ নয়। কারণ বোধ হয় জীদ খাপছাড়া, তাঁর মধ্যে সত্যকারের সত্যতা নেই। ভালেরি অন্য জিনিস, যেটা বলতে চান, সেটা পুরোপুরি বলেন, বুঝতে পারি না সেটা অন্য কথা। ভালেরি অখণ্ড নন, তাঁর কাছে বহু জিনিস, নূতন চিন্তা আসে এবং যেটা আসে সেটা সমগ্রভাবেই আসে। নূতন চিন্তা যেসব আসে, সেগুলো হয়ত সাধারণের জন্য নয়। বুঝলো না বুঝলো তাতে ভালেরির আসে যায় না। জীদের ধারণা সম্পূর্ণ নতুন নয়, সাধারণের রকমফের। Pederasty-ও নতুন নয়, যেটা রয়েছে তাকেই সাজান। এমন কোন্ লেখা জীদে আছে সেটা সত্যই অভিনব? ভালেরিতে আছে।

মরিয়াকের জগতই ভিন্ন, জগতটাই নিজের জগৎ। মারলো-ও তাই, এমন কী তার নন্দনতত্ত্বে। ঠিক নন্দনতত্ত্ব বলা যায় কি ? বোধ হয় art-history এবং art-criticism-এর সমন্বয়।

ইংলণ্ডে অবশ্য আঁদ্রে জীদের মতনও গদ্য লেখক নেই। কবিতায় অবশ্য আছে, এলিয়ট আর গ্রেভস। আজ ক'মাস ধরে Times Lit. Supplement-এ বার-চোদ্দজন লেখকের স্কেচ্ বেরুচ্ছে। তাঁরা বোধ হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকও নন। ইংলণ্ডের এবংবিধ পতন হলো কেন ? Angry Men, Beat Generation— এঁরা নিতান্ত নিম্ন স্তরের লেখক। অবশ্য ইংলণ্ডের প্রচার হলো কেন ? কারণ বোধ হয় এই যে এমন propaganda পৃথিবীর কুত্রাপি নেই। তবে দশ বছর পরে ধরা পড়ে সে,— 20's 30's 40's and 50's-এর কাছে। ফ্রান্সে কিন্তু বহু দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক রয়েছে।

ভারতবর্ষ ? রবি ঠাকুর, প্রেমচাঁদ, ভারতী গত। বাংলা দেশে দ্বিতীয় পর্যায়েরও লেখক নেই মনে হয়। পরশুরাম লিখে যাচ্ছেন নিশ্চয়, তবে তাঁর সে লেখা আর নেই। তারাশঙ্কর এখনও competent novelist হতে পেরেছেন কি ? জানি না। আমরা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর লেখক হতে চেষ্টা করছি। ফ্রান্স, এমন কী ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় আমরা সত্যই বিশেষ কিছু নয়। তাদের তুলনা ছেড়ে দিলে আমরা চমৎকার।

২. ১১. ৫৯

যাকে আমি শেষ কথা বলি সেইটাই মনে আসছে।

আমরা মধ্যযুগের মানুষ, অর্থাৎ Sidgwick, Marshall, Taussig, Bastable পড়ে মানুষ হয়েছি। এই ছিল ১৯৩৫ পর্যন্ত। তার বছর পাঁচেক আগেই পৃথিবীর দুরবস্থা হলো, আর Keynes লিখলেন General Theory। একেবারে চমকে উঠলাম। তাঁর আগেও ছিল Treatise, খুবই ভালো লেখা, কিন্তু তারই ফলে Marx গেল ভেসে। Keynes তাকে underworld of economics-এর দরজায় হাজির করলে। অত্যন্ত দাম্ভিক লোক Keynes। কিন্তু Swedish economists-রা দেখলেন যে কীন্স ছাড়াও তাঁদের দু-চারটে কথা আছে। আমেরিকানরা post-Keynesian শুরু করলেন, এবং তার বেশি ভাগ অঙ্ক। ইতিমধ্যে কিন্তু অনুন্নত পৃথিবীর লোকেরা বুঝলে যে Keynes যেন একটু অন্য ধরনের, তাদের ইকনমিক্সের সঙ্গে Keynesian ইকনমিক্স খাপ খাচ্ছে না। এখন কিন্তু post-Keynesian ইকনমিক্সই

চলছে।

একটা কিন্তু প্রকাণ্ড জিনিস বাদ পড়ে গেল। Schumepeter একজন বড় ইকনমিস্ট, Keynes-এর মতনই। তিনি Marx-কে সমালোচনা করতেন, তবে সমঝে। তিনি Marx-কে great man বলে ফেলেন। অবশ্য রাশিয়া, চায়না ইত্যাদিরা Marx-কে মানছে। আর পশ্চিম য়ুরোপ আর আমেরিকায় মানছে না, সকলেই post-Keyncsian। আমাদের কাছ থেকে Marx বাদ পড়ে গেল।

ভারতের কি অবস্থা? সবই আমরা Keynesian। পুরোপুরি Keynesian নয়, অথচ, তবু Keynesian। আমরা অবশ্যই Marxist নই। Keynes-এর সঙ্গে Marx-এর রফা করতেও পারিনি। পণ্ডিতজী Marx-কে (Marxism কে?) পুরাতন বলে ঘোষণা করেছেন। (তাঁর Surplus Value না পড়ে?) অবশ্য আমরা তাই মেনে নিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতিভূ। অথচ এক হাজার কোটি লোক, দু'হাজার কোটিরও বেশি অনুন্নত পৃথিবী, Marx-এর অনেক কথাই ত' নতুন! আমরা নতুন মানছি না। কেন এমন হলো?

৪. ১১ ৫৯

Tama, একটা জাপানী poddle-এর ছবি, Manet-র আঁকা। Manet-র অনেক ছবি দেখেছি, এটা কিন্তু চোখে পড়েনি। কাল রাতে প্রথম দেখলাম। আজ সকাল থেকে দেখছি। কালো-সাদা কুকুর, কাঠের জানলা, দু-ধারে ডাণ্ডা, একটা ডাণ্ডা বাঁকাভাবে রাখা। কুকুরটি ছোট্ট, চোখ দুটি লাল, তারই সামনে এক টুকরো কাপড় পড়ে আছে, তার ধারটাও লাল, বাক্যটা কালো। চোখ আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। চারটি পা-ই সোজা দাঁড়ান, চুল ভরা, সর্বাঙ্গে চুল। Tama অত্যন্ত জীবন্ত, dynamic।

এ-ধরনের poodle বড্ড yap-yap করে। খ্যাঁক খ্যাঁক করছে সর্বদা। কিন্তু এখানে চুপ করে আছে, জিবটা বেরিয়ে রয়েছে। জিব লাল, কাপড়ের ধারও লাল। তিনটি লালে ছবিটা জ্বল-জ্বল করছে। কালো আর লালের অপূর্ব সমাবেশ। বোধ হয় Velasquez-র Infanta Margareta থেকে কুকুরটি Manet ধার করেছিলেন, Wilenski বলছেন। আমার তা মনে হয় না। এটা যেন নিজস্ব।

১২. ১১. ৫৯

এক মাসেরও বেশি প্রতি সন্ধ্যায় ঘণ্টা দু'এক ধরে কলকাতা থেকে রেডিও শুনি। অনেক দিন যাবৎ কলকাতা কেন্দ্র শুনিনি। কলকাতায় আওয়াজ স্পষ্ট হচ্ছে। হাজার মাইল দূর থেকে তাই।

পল্লীমঙ্গল মোটের উপর ভালোই। বেচু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ ও উচ্চারণ চমৎকার। যাঁরা দিল্লী থেকে বাংলায় খবর বলেন তাঁদের চেয়ে ইনি অনেক ভালো। দু-চারটি দোষ আছে। (১) কথার মধ্যে অনেক গান ঠিক খাপ খায় না। অনেক সময় গ্রামোফোন-সঙ্গীত পল্লীমঙ্গলের সঙ্গে কখনও কখনও মেলে না। (২) 'গোবিন্দ' একটু একঘেঁয়ে, অন্য চরিত্র নেওয়াই উচিত মনে হয়। (৩) মধ্যে মধ্যে একাধিক বক্তৃতা কেবল বক্তৃতা। পল্লীমঙ্গলের ভাষাই ব্যবহার করা ভালো। (৪) এক এক সময় ভিন্ন ভিন্ন পর্বগুলি মীড়ের মতন মোলায়েম হয়ে যায় না। যেন staccato থেকে যায়। তৎসত্ত্বেও বেশ, অনেক রকমের জিনিস এতে থাকে।

বাংলায় খবর বলা সত্যই কঠিন। বাংলার কথ্যভাষা ক্রমেই শক্ত হচ্ছে, এবং সেজন্য উচ্চারণও আকণ্ঠবদ্ধ। এক হিসেবে দেখতে গেলে এটা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হচ্ছে বলা চলে। অবশ্য অন্য দিক থেকে মনে হয় যে বাংলা ভাষা দুভাগ হয়ে গেল, এক মধ্যবিত্তের বাংলা, আর যে বাংলা গ্রামের লোকে ব্যবহার করে। হিন্দীও তাই হচ্ছে, অত্যন্ত সংস্কৃতবহুল হয়ে পড়ল। ঠিক কী হওয়া উচিত জানি না। দেশজ বাংলা চালু করলে মন্দ হয় না। সংস্কৃত শব্দ দেশজ শব্দের অন্তরালে ব্যবহার করলেই ভালো হয়— প্রথম থেকেই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হবে না। খবরের কাগজের ইংরেজী অনুবাদ থেকে বিশুদ্ধ বাংলায় পরিবর্তন করা যায় বটে, কিন্তু বাংলা ঠিক করা যায় না। জগাখিচুড়ী একটু হলোই বা! সাধারণ লোকে কি দিল্লীর কৃত বাংলা পড়ে বুঝতে পারে? মনে হয়, পারে না।

সাড়ে আটটার সময় মধ্যে মধ্যে যে খেয়াল গান হয়, সেগুলি বেশ। দ্বিতীয় শ্রেণীর। তার বেশি নয়। আরম্ভ করেন চমৎকার। কিন্তু দ্রুত তান কর্তবের সময় স্বরচ্যুতি ঘটে। আসল কথা, আমরা বড় 'আতায়ী', যার-তার কাছে গান শিখে ছেড়ে দিই, ওস্তাদ হয়ে যাই। এঁদের গঠনের অভাব খুবই। আস্থায়ীর দিকটা খাসা, তারপর গঠন নিতান্ত দুর্বল। এ ভুল মারাঠিরা করে না কিন্তু, তাদের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁধা-ছাঁদা, তার ফলে একটু mechanical হয় অবশ্য।

আধুনিক গান? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনোটাই বুঝি না। রাগ?

কোনো রাগ নেই, রাগের মিশ্রণও নেই, একটু আবছাগোছের ছবি ভেসে ওঠে, তাও কখনও কখনও। আধুনিক গান এত কাঁদে কেন? আর যখন কাঁদছে না, তখন নাচছে এবং তাও খেমটা। বাঙালি মেয়েরা কেন এ গান শেখে! কারা এদের গান শেখায়? নতুনত্বের কি এতই মোহ? নতুনত্ব নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু নতুনত্বের পর একটা কিছু নতুন ভাব ফোটা ত চাই! তা হচ্ছে না; এরা নতুন, অত্যন্ত নতুন এবং নতুন ছাড়া আর কিছু নয়।

একদিন সংস্কৃত-ভাঙা বাংলা বক্তৃতা শুনলাম। মন্দ লাগল না। হিন্দীর মাধ্যমে আরো চলবে।

কয়েকদিন পরে একটা চমৎকার হিন্দী ভজন শুনলাম। এঁর নাম সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়— খাসা হিন্দী, গানও পাকা। এত ভালো ভজন ইদানীং বোধ হয় শুনিনি।

১৪. ১১. ৫৯

দিলীপ 'স্মৃতি-চারণ' শেষ করল মনে হচ্ছে। সত্যেন, কৃষ্ণপ্রেম এবং শেষের লেখাটি ভালো। অলৌকিক রহস্য আমার মাথায় আসে না। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে পণ্ডিচেরী প্রয়াণ আমার অনেকটা জানা। কিন্তু জয়দা (জয়গোপাল মুখুয্যে) দিলীপকে কী বলেছিল জানতাম না। মণ্টু ঠাকুরের সঙ্গে রফা করতে চায়, জয়দা বলেছিলেন। রফা শেষ পর্যন্ত মণ্টু করেনি। মণ্টুর পণ্ডিচেরী যাওয়াই উচিত ছিল।

সে পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে ভালো করেই মিশেছিল। আমার কাছে সেইটাই খুব বড়। বিলেত থেকে ফিরে আসার সময় ও তার পরে যে গান গাইত তার তুলনা নেই। বিশেষত তার বাবার গান— 'আজি তোমার কাছে ভাসিয়ে যায় অন্তর আমার'-এর কি তুলনা মিলবে? 'রাঙা জবা' গাইবার সময় ফুল ফুটিয়ে দিতো। এটাও বড়। উৎকৃষ্ট বই পড়ত, এবং বই পড়ে ভাবত। এটাও বড়। সে বলে ধর্মের আহ্বান তার কাছে প্রথম। সেটা আমি বড় হয়ত বলেছি, কিন্তু সবচেয়ে বড় হয়ত বলিনি। তার মধ্যে একাধিক দোষ হয়ত আছে, আমি কিন্তু দোষ দেখিনি। দম্ভ হয়ত ছিল শুনেছি। কিন্তু সেটা ছেলেমানুষি বাচালতা মাত্র। তার মতন সরলতা আমি কোথাও দেখিনি। মোট কথা সে vital plane-এর লোক, খাঁটি সাত্ত্বিক নয়, প্রাণবান। এমন বিশুদ্ধ প্রাণবান লোক আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশের সে একজন 'উত্তম' পুরুষ।

১৫. ১১. ৫৯
'When you reach the Polodes, tell them that the great Pan is dead', Paxos-এর দ্বীপ থেকে এক শব্দ শোনা গেল, 'Great Pan is dead', Plutarch-এর এই কথাই শেষ।

কখনও মনে হয় ইলিজাবীথান যুগের ইংলণ্ডে, অন্তত Midsummer Nights Dream-এ একটা প্রতিধ্বনি এসেছিল, কিন্তু তার পরেই শেষ—আর হয়নি, Pan আর এলো না।

"The poet says, 'dear city of Cecrops', Wilt thou not say, 'dear city of God?' " মার্কাস অরেলিয়াসের কথাটা কানে বাজছে। Dear City of God একটা কবিতা। পৃথিবীতে যত কবিতা আছে সে সব সূর্যমণ্ডলেই থাকতে পারে, ছায়াপথের অন্তরালে নেই। সেখানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা।

১৬. ১১. ৫৯
আত্মজীবনী লেখা এ যুগে সম্ভব নয়, অর্থাৎ সত্যকারের আত্মজীবনী। রুশোর পর থেকে শেষ, এবং বোধ হয় মনটেন-এ প্রথম, যদিও মনটেন আত্মজীবনী লেখেন নি, personal essay-ই লিখে গেছেন। জীবনের সব ঘটনা বলা যায় না, এমন কী সর্বপ্রধান ঘটনাগুলিও। কামের দিকটা কখনও প্রকাণ্ড, কখনও তুচ্ছ। ভারতবর্ষের সে দিকটা নিতান্ত কম, বাৎস্যায়ন সত্ত্বেও। সেটা সামাজিক বিধিব্যবস্থায় চাপা পড়ে, কিছুই থাকে না। যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রোমান্টিকভাবে জীবননির্বাহ করেন তাঁরা অবশ্য একথা স্বীকার করবেন না। ভারতবর্ষের অনেকাংশ জীবন কামের দৈন্যে নিতান্ত সাধারণ হয়ে উঠেছে এবং বোধ হয় সেইজন্যই আত্মজীবনী লেখা একেবারে অসম্ভব।

কামাতুর লোকের জীবন আজকাল একপ্রকার নভেল হয়ে পড়েছে। নভেলের এত ছড়াছড়ি আশ্চর্য লাগে। রুশোর আত্মজীবনী এখন ত এক প্রকারের নভেল। চেলিনি, ক্যাসানোভা, পীপস্ প্রত্যেকেই নভেল লিখেছেন।

বাকী রইল মনটেন। তাঁর প্রত্যেক লেখাই personal essay। অবশ্য সে আমি ছোট-আমি নই, বড়-আমি, কিন্তু বিশ্বদর্শনের ভূমিকায় নয়। মনটেন এমন একটি স্তরের মানুষ, যার উচ্চতা ও গাম্ভীর্য তাঁরই যোগ্য; সেখানে তিনি নিতান্ত ব্যক্তিগত।

১৭. ১১. ৫৯

সৈয়দ আয়ুব স্ত্রী-পুত্র সহ এখানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে। কিন্তু তিনি সত্যই অসুস্থ, তবে সামলে উঠেছেন। তাঁর ছেলের নাম পুষণ— খাসা নামটি।

আয়ুবের সঙ্গে আলাপে যা বুঝলাম তা এই : সে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চায়, পুরোপুরিই চায়। সমাজ তার কাছে বাঁধা, তার সমাজ বুদ্ধিগত। আমার সমাজ বুদ্ধিগত এবং সংসারগত। আয়ুবের সংসার, সমাজবোধ বোধ হয় নেই, তার সমাজ সম্পূর্ণ নিজস্ব। তার কাছে cultural freedom-এর অর্থ আছে। আমার কাছে তার মূল্য কম, কারণ আমার উপর সংসারের চাপ রয়েছে। তবে সমাজবন্ধন যাচ্ছে, যদিও এখনও যায়নি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নষ্ট হতে বসেছে, কিন্তু election-এর সময় তারা জাঁতাকলের মতন চেপে রয়েছে। নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় এখনও যায়নি। বিবাহ ব্যাপারে নীচের স্তরে বন্ধন কিছু ছিল না, কিন্তু আচার যথেষ্ট রয়েছে। যদিও তার রূপ বদলেছে— ওদের মেয়েরা পেটিকোট পরে। আয়ুবের পৃথিবী বিদেশী। তার cultural freedom বুঝতে পারছি না।

১৮. ১১ ৫৯

নামজাদা লেখকের নাম পড়ি, ধরা যাক রাসেল। অসম্ভব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু ইংলণ্ড চলছে, পশ্চিমী সভ্যতা চলছে, পৃথিবী চলছে তাঁর কথায়? চালায় politician-রা, তাঁদের সম্পর্কে বুদ্ধির সম্পর্ক কম। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এমন কী নিতান্ত জনসাধারণ মানুষেরা যুদ্ধ চাচ্ছেন না। কিন্তু পলিটিশিয়ানরা চাচ্ছেন। তাও তাঁরা বলছেন তাঁরা ঠিক চাইছেন না, তবে, কারা চাইছেন? অবশ্য একদল লোক আছেন যাঁরা শস্ত্রের ব্যবসা করেন। তাঁদের পরও অন্য কথা আছে। এঁদের চেয়ে বেশি দায়িত্ব ভাবাবেশের (emotions)। ভাবাবেশ দেশে এলে যুদ্ধ তৈরি হতে বিলম্ব হয় না। তার বিপক্ষে রাসেলের বুদ্ধি কি করবে? ডিমক্রেসীর সামনে ভেসে যাবে! জনগণের এই ধরনের ডিমক্রেসী থাকবে না, থাকতে পারে না! হয়ত অন্য ধরনের ডিমক্রেসী উঠবে। রাশিয়ার জনগণ শান্তি চায়। কিন্তু ক্রেমলিন? সেটাও চাচ্ছে না— চমৎকার কথা! হয়ত এদের ডিমক্রেসী আর ওদের ডিমক্রেসী অন্য রকমের। জানি না, হয়ত, কিংবা হয়ত বা নয়।

১. ১২. ৫৯

সুচিত্রা মিত্রের উচ্চারণ-ভঙ্গি এবং গীতি-ভঙ্গি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গায়ন তারই কণ্ঠে সবচেয়ে মধুর, অবশ্য ইদানীংকারের ভেতর। সে-ই আ-করে তারই গান গায়। সবচেয়ে ভালো গান সে-ই গেয়ে থাকে। নির্বাচন তারই শ্রেষ্ঠ। সব গান সকলের মুখে জমে না। তার গলায় প্রাণ ভরে যায়।

অঞ্জলি সুরের শ্যাম কল্যাণ বেশ লাগল। আস্থায়ী ও তান কর্তব ভালো। তার যদি বিয়ে হয়ে না থাকে এবং সে যদি ভালো ওস্তাদের হাতে পড়ে, তবে সে গাইয়ে হবে। তীব্র মধ্যমটি স্বচ্ছ, শুদ্ধ মধ্যম একটু যেন আড়ষ্ট। দুটি মধ্যমের উপযুক্ত সমাবেশ যেন হলো না। তবু বেশ। লালচাঁদ বড়ালের মুখে শ্যাম-কল্যাণ শুনেছিলাম; তখন খুবই ভালো লাগত।

কিছুতেই আধুনিক (বাংলা) গান পছন্দ করতে পারছি না— অশ্রাব্য।

২. ১২. ৫৯

আমার বন্ধুর মেয়ে মারা গেল। লক্ষ্মী মেয়ে, এম এ, দর্শনে প্রথম শ্রেণী প্রথম; সীজারেয়ান অপারেশনের পর রক্তহীনতা থেকে তাকে বাঁচাতে পারা গেল না। মা-বাপের এক সন্তান। দুঃখের অবধি নেই। প্রাণটা যেন কেঁদে উঠল। কিন্তু কেন? দুঃখ এই ছোট সংসারে, সূর্যমণ্ডলে দুঃখ নেই, সেকালের নিয়ম, তারও শেষে গ্যালাক্টিক পরিবেশ, সেখানে দুঃখ নেই, সে-সংসারের নিয়ম পর্যন্ত হয়ত নেই, যদি থাকে তবে তার নিয়ম অন্য রকমের, সেখানেও দুঃখ নেই। তবু এ-যুগের নিয়ম দুঃখের। তিনটে ভিন্ন পরিমণ্ডল।

৭. ১২. ৫৯

'রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র...' এবং-এর মানে বৈপরীত্য, অনুযায়ী কিংবা সুতরাং। তিনটি তিন রকমের মনোভাব প্রসূত, কিন্তু একত্রে 'এবং' বলা হয়। বৈপরীত্য অর্থে সম্পূর্ণ পৃথক এবং বিরোধাত্মক, অনুযায়ী হলো পারস্পর্য। সুতরাং মানে খানিকটা পৃথক খানিকটা মিল। এখানে এবং-এর অর্থ কি?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎদা'র দেখা হয় প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে, কমলালয়ে। আমি সেখানে উপস্থিতছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সেদিন সকালে কোনো বিদেশ থেকে ফিরেই ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সন্ধ্যায় দেখা

করতে এলেন। আমরা অনেকেই জুটেছি। শরৎদা শিবপুরের গায়ক মন্মথ দত্তকে নিয়ে এলেন, কিন্তু বোধ হয় জানতেন না যে রবীন্দ্রনাথ আসছেন। একটু দেরি করেই রবীন্দ্রনাথ এলেন। শরৎদা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আসতেই তামাক ছেড়ে উঠে সোজা পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লেন, 'আমি শরৎ।' একটু স্মিতহাস্যে বল্লেন, 'শরৎ?' একটু নীরব থেকে বল্লেন, 'তোমার লেখাই একমাত্র পড়ি।' এটা বোধ হয় ভদ্রতাই মনে হলো। কিন্তু এইটুকু বলবার পরই আরম্ভ করলেন, 'কিন্তু আমার কিছু বলবার কথা আছে।' তারপর আরম্ভ হলো বস্তুতান্ত্রিকতা, তার শেষ কথা। শরৎদা বল্লেন, 'আমি বহুবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছি।' একবারের কথা। এখনও মনে পড়ে, তখন শরৎদা নতুন নেশা করতে শিখেছেন, নেশার ঝোঁকে রুটির সঙ্গে গুড় না খেয়ে রেড়ির তেল খেয়ে ফেল্লেন। বাবা একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় মারলেন এবং তারই ফলে প্রথম পলায়ন। রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, তিনি এ-সব কিছুই দেখেননি, শালের পর্দার ভেতর থেকে উঁকি মেরে বজরা থেকে ও-পারের মানুষ দেখা মাত্র। প্রমথবাবু বল্লেন, 'এই ঠিক, এইটাই বাহাদুরি।' মন্মথ দত্তের গান শুরু হলো, কথাবার্তাও থেকে গেল। শরৎদা কথাবার্তার মধ্যে একটু অন্তরালে গেলেন, বোধ হয় আফিমের লোভে।

তা হলে দাঁড়াল এই যে দু'জনের সম্বন্ধ বিপরীত। অবশ্য আমরা সকলেই জানি, দিলীপও লিখেছে, যে শরৎদা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভীষণ ভক্ত। কিন্তু ভক্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা দুর্জয় অভিমান ছিল। প্রমাণ হয় গান্ধী নিয়ে, কিন্তু অভিমানটা ছিল প্রথম। রূঢ় আলোচনা তিনি মৌখিকভাবে করতেন। বই ফেরত নিয়ে তিনি প্রথম চলে আসেন। তবু ছিল ভক্তি, ঠিক শ্রদ্ধা নয়। এই শ্রদ্ধার অভাবই হলো বৈপরীত্যবোধের প্রথম কারণ, তারপর লেখার বৈপরীত্য। শরৎদা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ এবং গোরা বহুবার রপ্ত করেছিলেন, তবু শরৎদার চমৎকারিত্ব রবীন্দ্রনাথের নয়, বঙ্কিমের সংস্করণ। সংস্করণই বলতে হবে; তাই বোধ হয় হিন্দীভাষীরা শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রধান বলেছেন।

শরৎদা রবীন্দ্রনাথের অনুযায়ী নয়, বঙ্কিমের। শরৎদা এবং রবীন্দ্রনাথ—দুজনের জাত আলাদা। গেটের সঙ্গে ক্লপস্টক।

১০. ১২. ৫৯

ভাব উঠল সকলের আগে; তারপর কথিত বাক্য এলো; তারও পরে লিখিত

ভাষা। যদিও ভাব, বাক্য, ভাষা মিলে-মিশে যায়, তবু তিনটে জিনিস কালানুসারে অন্তত পৃথক থাকে। ভাবের রূপ পায় বাক্য ও ভাষায়। এই-খানেই গলদ। ভাব বস্তুটা অস্পষ্ট, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ। সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা থেকে অভ্যুদয় হলো বাক্য ও ভাষা; তার মধ্যে বাক্য হলো অপেক্ষা-কৃত কম অস্পষ্ট; সেই বাক্য সম্পূর্ণ হলো আবার; সেই সম্পূর্ণতা থেকে এল আবার লিখিত ভাষা। সেটাও আবার অস্পষ্ট; কিন্তু আরো কম, কিন্তু তবু থাকল আবার সম্পূর্ণতা। যোগী-ঋষিদের কথ্য ভাষা শুনেছি। তাঁদের কথা হয় অ-কথ্য, না হয় parable। অনেক সময় তাঁদের গম্ভীর গম্ভীর কথা নিতান্ত ছেলেমানুষি। রামকৃষ্ণদেবের parable ছিল অতুলনীয়। যোগী-ঋষিদের মৌনী হওয়াই ভালো। আর না হলে যন্ত্রসঙ্গীত বাজান উচিত। তাঁদের হয় একতারা না হয় তানপুরাই ঠিক। স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবের সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীতের মিলই বেশি— কথ্য ভাষায় যেন বিধর্ম হয়ে যায়।

১৭. ১২. ৫৯

অতিথি এলেন, খাওয়ালাম-দাওয়ালাম, সাধ্যাতীত যত্ন করলাম, তাঁরাও কৃতজ্ঞ হলেন, এমন কী আদর-আপ্যায়নে অভিভূতও হলেন। তাঁরা এলেন, তাঁরা গেলেন, কিন্তু কিছু কি থেকে গেল? আফ্রিকা-আরব দেশ থেকে যখন অভ্যাগতরা এখানে আসেন, তখন অবশ্য আদর-যত্ন করি। কিন্তু আমাদের মনে, তাঁদেরও মনে, সাড়া পড়ে না। কিন্তু আমেরিকা-রাশিয়া থেকে যদি কেউ মহাপুরুষ পদার্পণ করেন, তখন দুজনের মনে না হোক একজনেরও মনে আশা-ভরসা জেগে ওঠে। আমরা মুখে কিছু বলি না, কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করি অর্থ, টাকা। তাঁরাও হিসেব কষেন, মুখে কিছু বলতে চান না। পৃথিবীর বড় বড় দেশের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা টাকা চাইছি এবং তাঁরাও দিচ্ছেন, হিসেব করে। লেন-দেনের মধ্যে ভদ্রতা নিশ্চয়ই কিছু আছে, কিন্তু তারও বেশি ব্যবসা-বুদ্ধি। অতিথিদের সম্ভাষণ করছি, আর চাইছি টাকা! কালচার-বিনিময় নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা টাকার লেন-দেন। এর মধ্যে রয়েছে অ-ভদ্রতা।

আমি জানি উন্নত দেশের কাছ থেকে অবনত দেশ ধার নেবেই নেবে। আমেরিকার কাছে ইংরেজ, ফ্রান্স, জার্মানী, দক্ষিণ-আমেরিকা ধার নিয়ে-ছেন, এখনও নিচ্ছেন; আফ্রিকার অধমর্ণতার ত' কথাই নেই। ধারের চোটে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ স্বাধীনতার নামে পরাধীন হয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষেরও এই দুর্দশা— খাদ্য আমাদের জুটছে না, তার ওপর industria-l:sation-এর চাহিদা, তারও ওপর সংখ্যাধিক্য। ইকনমিস্টরা এই মোটা কথাগুলি তুললেও এতটা ধার নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের po'itical স্বাধী-নতা হ্রাস পাচ্ছে না কি? এঁরা বলেন pclitics is not our pigeon.

না হয় লোহা-লক্কড়ের অতটা দরকার ছিল না, না হয় ডি ভি. সি, ভাকড়া নাই হতো, না হয় শাক-মূলো খেয়েই থাকতাম, না হয় মানুষ দিয়েই কাজ চালাতাম। আধুনিকতার যুগে শুনেছি এ-সব দরকার। আমারও মন চায়, প্রাণ চায়, আমিও আধুনিক, কিন্তু মনের নীচে প্রাণের তলায় একটা কিছু আছে যার অভাবে আধুনিকতা মেলে না। গান্ধীর কথা মনে হয়, স্বাধীন হতে আমরা পারলাম না।

২০. ১২. ৫৯

আবার আমার মনে হচ্ছে যে কলকাতা শহরে intellectual class তৈরি হলো না। ভালো মন্দ জানি না, তবে বুঝলাম, হলো না। বছর দশেক মাত্র 'পরিচয়ে'র আড্ডায় কিছু হয়েছিল। আর বোধ হয় হয়েছিল খানিকটা রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের কোনো একটা সময়ে। সে যাই হোক ত্রিশ সালের পর আর হয়নি। অনেক কারণ আছে— ইদানীংকার একটি কারণ এই— বাংলা দেশে জন দশ-বারো লেখক একটা ছুটি গোষ্ঠী বানিয়েছেন, এবং তাঁরাই লেখকদের বৃত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছেন, বাকী অন্যদের কিছুই থাকছে না। এঁদের লেখার মূল্য বিশেষ কিছু নেই, অর্থ আছে। যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক হতে পারতেন, তাঁদের লেখা বাজারে কাটতি হয় না। প্রথম শ্রেণীর ত নেইই। সুধীন দত্তের গদ্য ও পদ্য সামান্য কিন্তু বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু তার snob-valu:-ই বেশি। বিষ্ণু দে আর একজন ইনটেলেকচুয়াল, তাঁর বই কাটে না। অবশ্য তিনি লিখে যাচ্ছেন। অথচ সেই দশ-বারো-জনের লেখার অন্ত নেই। শুনলাম একজনের আগামী চতুর্থ বইখানি দাদন খাটছে। এ-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের স্থান কোথায়? অন্তত হাজার দুয়েক কপি ত বিক্রি হওয়া চাই! তা হচ্ছে না। এই রকম racket হলে intellectual class-ও সৃষ্টি হতে পারে না। সমাজ উচ্ছন্ন যাচ্ছে। কিন্তু ফরাসী দেশের সমাজও তাই। আজ থেকে নয়, প্রায় পঞ্চাশ বছরের ওপর। তবু সেখানে intellectual class আছে, এবং হচ্ছে। ফ্রান্সে অবশ্য সবই বাড়াবাড়ি, কিন্তু এখানে ত কিছুটা হওয়া উচিত ছিল!

২৫. ১২. ৫৯

বড়দিনের ছুটি। কিন্তু আকাশে বাতাসে ব্যস্ততা নেই। আমি অবশ্য যেতে পারিনি, কিন্তু বাজারে শুনলাম চাঞ্চল্য নেই। আমরা না হয় খ্রীস্টান না হলুম, কিন্তু বড়দিনের ছুটিটা মারা গেল কেন? ইংরেজের সবই রয়েছে, কিন্তু বড়দিনের ছুটিটা গেল কেন? সব প্ল্যানিং-এর কাজে পাগল হয়ে আছে নাকি! অথচ শুনেছি যে কেরানিরা কাজ করতে চান না। দশ-বারো দিন তাঁদের বড়দিনের ছুটি দিলে মন্দ হয় না। কাজ তাঁরা যখন কিছুতেই করবেন না, বেশি ছুটি দিয়ে দেখলে হয়!

২৭. ১২. ৫৯

আজ রিপন কলেজের কথা মনে আসছে। আমাদের সময় 'সুরেন্দ্রনাথ' কলেজ হয়নি। সে সময় রিপন কলেজেরই নামডাক ছিল। প্রেসিডেন্সী, স্কটিশ চার্চ, সিটি, বঙ্গবাসী প্রভৃতি কলেজ থেকে রিপন কলেজে পড়তে আসতো। বিকেলের দিকে কৃষ্ণকমলবাবু অধ্যাপকদের ঘরে এসে বসতেন। বিপিনবাবু তাঁর কথা লিখেছেন। আমরা জনপাঁচেক ছেলে ঘরের কোণে বসতে পেতাম। ব্যোমকেশ মুস্তাফী, জ্ঞান ঘোষ, এমন কী ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইও আসতেন। রামেন্দ্রসুন্দর যাগযজ্ঞের খসড়া করছিলেন, সে সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলবাবু অনেক কথাই বলতেন। একবার যেন মনে পড়ে যে, তিনি গুরুদাসবাবুর D. L -এর পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তখন তিনি মাত্র B. A.— উপযুক্ত পরীক্ষকের অভাবে তিনি বাকী পরীক্ষা দিলেন না। একটি কথা কিন্তু পরিষ্কার মনে পড়ে— কোনো একটা ব্যাপারে তিনি দু লাইন সংস্কৃত কবিতা উদ্ধার করলেন, কিন্তু কে লিখেছে তা তিনি জানেন না; খাবার কিংবা মুদীর দোকান থেকে একটা পাতা উড়ে এল, সেই পাতা থেকে এই কবিতাটি মনে ছিল। সেটা প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে! এই ঘটনাটি আমার সামনে ঘটে।

রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক কথাই মনে আসে। আমার জীবনে তাঁর প্রধান দান হলো বৈজ্ঞানিক উপায়— methodology। আজ কিন্তু সেটা মনে আসছে না। যা আসছে তা জানকীবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। প্রগাঢ় বল্লে কিছুই বলা হলো না, অভিন্ন হৃদয়। জানকীবাবু ও ক্ষেত্রবাবু একই স্কুলে পড়তেন বোধ হয়। এনট্রান্স পরীক্ষার পর জানকীবাবু বল্লেন, 'খেতা, শুনলাম একজন কাঁদি থেকে ফার্স্ট হয়েছে, চ' তাকে দেখে আসি।' দুজনে গেলেন, বোধ হয় হিন্দু হোস্টেলে, কথাবার্তা বিশেষ কিছু হলো না। জানকী

বল্লেন, 'কিন্তু চোখ দুটো ভয়ানক জলজ্বলে। But, I shall disclose the bracket next year।' তিনি ও রামেন্দ্রসুন্দর নাকি দুজনে একত্রে প্রথম হন। ক্ষেত্রবাবু তার নীচে ছিলেন। জানকীবাবু যাত্রায় দুয়ার্কি দিতেন, বেহালাও বাজাতেন, আর ক্ষেত্রবাবু বাজাতেন ঢোল আর পাখোয়াজ। তৎসত্ত্বেও জানকীবাবু বইয়ের পড়া পড়তেন, আর ক্ষেত্রবাবু ঘুমুতেন। আমাদের কলেজে কার্মাইকেল সাহেব এলেন— গুরুদাসবাবু একটা গান বাঁধলেন, 'এস রাজপ্রতিনিধি বঙ্গশিরভূষণ, হইনু আমরা ধন্য পেয়ে তব দরশন'— জানকীবাবু গৌড়-সারঙ্গে গান বেঁধে দিলেন, আর দিলেন ক্ষেত্রবাবু পাখোয়াজে ঝাঁপতাল। গানের সুরটা মোটেই সুবিধে নয়, তবু গুরুদাসবাবু।

ক্ষেত্রবাবু মারা গেলেন। ঘাটে নিয়ে গেলাম। এসে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এলাম। তিনিও বিছানায়। চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন, 'বেদান্ত তার মতন কেউ বুঝতো না। সেই ছিল প্রধান।' আমার মনে পড়ে, হাত নীচু করে মাথা লুকিয়ে সনম্র হাসা, সামান্য লজ্জিত হয়ে রামেন্দ্রবাবু তাঁর ভাষা সংশোধন করছেন। ক্ষেত্রবাবুর ঠাকুরাণীর কথার মতন? অমন সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় বেদান্ত চর্চা বাংলা ভাষায় হয়নি। আজকাল তাঁর লেখা বাংলা দেশে জানেই না।

জানকীবাবু আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। তবে ইংরেজী ঠিক কিনা তাই জানি না। ক্লাসের ছেলেরা তাঁকে সংস্কৃত ক্লাসে যেতে বলতেন, আমি জানি, তিনি দুদিন গিয়েছিলেন, না শুনে পড়িয়েও ছিলেন। আমাদের ইংরেজী ক্লাসে একদিন property কথাটায় আটকে গেলেন— পরের ছয় দিন ঐ property-র ব্যাখ্যা চলল, Hindu, Moslem, English Laws of property নিয়ে। আরেকদিন Wordsworth-এর Intimations আরম্ভ করলেন। বল্লেন, ইংরেজরা Wordsworth বোঝে না— হিন্দুরা বোঝে; এবং তারই ঝোঁক চলল প্রায় দুই সপ্তাহ। জানকীবাবু কোনো জিনিসও শেষ করতে পারতেন না— Tempest-এর এক act, Wordsworth-এর দুটি কবিতা, আর Carlyle-এর একটা লেকচার। এই নিয়ে দু বৎসর কাটল। বিষয় শেষ করতেন না, বিষয়গুলি জানতেন। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক— নীল প্যাণ্টালুন, তার ওপরে নোংরা শার্ট, তারও ওপর একটা ছেঁড়া শাল— মুখ ধুতেন না, দাড়িও সব সময় কামাতেন না, কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে অন্য ট্রামে চড়বার জায়গায় হাইকোর্টে চড়ে বসতেন, তাঁকে মসজিদ স্ট্রীটে পৌঁছে

দিয়ে আসত। আর ডান হাতে থাকত নস্যি। এই লোক অনর্গল ইংরেজী ও সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। দর্শনে জ্ঞান ছিল অসাধারণ, আমি কিন্তু দর্শনের লেকচার শুনিনি।

বিপিন বাবু ছিলেন ইংরেজীতে এম.এ, পড়াতেন ইতিহাস। আমি ইতিহাস তখন পড়তাম না কিন্তু তবু তাঁর ক্লাসে যেতাম। তাঁর মতন ইংরেজী বলিয়ে আমাদের সময় ছিল না, এক পার্সিভাল আর, এম. ঘোষ ছাড়া। তিনি ছিলেন discipline-র পক্ষপাতী. কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল করুণ।

এর পরে এলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। অত্যন্ত লাজুক, কিন্তু কী অদ্ভুত তাঁর পাণ্ডিত্য। ইংরেজী, ইতিহাস ও দর্শনে ছিল তার সমান ব্যুৎপত্তি। অতটা পণ্ডিত ধরা যেত না, কিন্তু পরিচয় পেলে তার অবধি থাকত না।

এই ধরনের encyclopaedic mind-এর ছোঁয়াচ আমাদের মনে লেগেছিল। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন খামখেয়ালি, eccentric। ইদানীংকার অধ্যাপকেরা বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত normal, অর্থাৎ খবরের কাগজে পলিটিক্স করেন, আর একাধিক বাচ্ছা হয়। আমাদের eccentric হওয়াও হলো না। অবশ্য সেজন্য লেখাপড়ায় পাগল হওয়া চাই।

১. ১. ৬০

বছরের প্রথম দিন। হলো কি কিছু, জানি। কি হবে তাও আন্দাজ করতে পারি। হলো কি? চাঁদে ছেঁদা: আর আফ্রিকার বিপ্লব। আন্দাজ করি, আফ্রিকার বিপ্লব আরোও দ্বিগুণ বাড়বে, এবং ইন্দোচীনে গোলমাল কমবে। শান্তি আশা করি খানিকটা পাব। কিন্তু আফ্রিকায় বালির ফাঁদ নয়, এবার চোখের বালিও নয়, এবার রক্তে বালি। আফ্রিকা টগ্‌বগ করে ফুটছে। কাগজে কিন্তু বেশি চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে কেবলই জওহরলাল। বিংশ শতাব্দীর মানুষ প্রথম অর্ধাংশে রাশিয়ান. আর বাকী অর্ধাংশে আফ্রিকান? আজ ত্রিশ বৎসর বলে আসছি, এখনও বলছি। ইংরেজ অত্যন্ত ধূর্ত, Commonwealth করে ফেলছে, এবং ফেলবে— কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে? চলবে না, চলবে না। Dark Anger-এর সামনে white danger থাকবে না, কিছুতেই থাকবে না। কলকব্জা বাড়বে নিশ্চয় অনেকখানি, কিন্তু tradition ভাঙতেও একশ বছর। তারপর দেখা যাবে।

৩. ১. ৬০

বোম্বাই-এ ডাক্তারের চাহিদা বেশি নয়, মাদ্রাজেও তাই ; দিল্লীতে কিছু বেশি : কিন্তু কলকাতায় তার শেষ বেশ নেই। এখানকার ডাক্তারদের ফীজ অনেকেরই বত্রিশ, আরো বেশি চৌষট্টি, আরো বেশি শুনেছি একশ বারো। তার ওপর রক্ত পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা ইত্যাদি বত্রিশ আর চৌষট্টি। বিশেষজ্ঞ-দের একই। একবার একদিনের রোগীর পাল্লায় পড়লে একশ টাকা ! ইংলণ্ডে, সুইজারল্যাণ্ডে কলকাতার অর্ধেক, রাশিয়ায় কিছুই লাগে না। শুনেছি ভিয়েনাতেও অনেক কম। কলকাতার ডাক্তারী ইকনমিকসটা কি ? Competition কি বোম্বাই, লণ্ডনে নেই ? এমন উগ্রভাবে ধনিকতন্ত্রের শোষণ আর কোথাও বোধ হয় দেখিনি। আমি কেবল ডাক্তারদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই সোশিয়ালিস্ট হব। আমরা কি নিরঙ্কুশভাবেই এই অত্যাচার সহ্য করে যাব !

৫. ১ ৬০

'সহজ সুরে সহজ কথা শুনিয়ে দিতে তোমায়
সাহস নাহি পাই।'

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই বক্রোক্তি করে গেলেন। কিন্তু বিদেশী আলংকারিক বলেছেন, poetry, direct and oblique। সপ্তদশ ও প্রথম অংশের অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু ইংরেজ direct poerty-ই লিখেছেন ! Pope-এর লেখা কবিতা হবে না কেন ? তাঁর রচনা প্রায় সবই ত' direct statement। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে রোমান্টিক কবিতার প্রতি যে ভয়ংকর ঝোঁক এসেছিল তার জের এখনও কাটেনি, প্রমাণ Dylan Thomas। T. S Eliot-এর Quartets একটু যেন পাষাণ ভাঙছে। গদ্য যখন অত্যন্ত ঘন হয় তখন সেটা কবিতার কোঠায় ওঠে, শেকসপীয়রের গদ্যের মতন। বাংলা কবিতায় statement-এর কবিতা লক্ষ করেছি, কিন্তু ঘন নয়, যথা জীবনানন্দের রচনায়। এই ঘনত্বটা কি ? চিনি থেকে মিছরি। এটা অবশ্য উপমা ; তার বেশি কিছু কি বলা যায় ? Classic, romantic, তারও বেশি, wise— নয় কি ?

৬. ১. ৬০

রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষে জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ লিখলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না ভালো হয়েছে কিনা। দু-চারটে বক্তব্য মনে এলো— গুছিয়ে লিখতে পারছি না।

তাঁর সঙ্গীতের বিশেষত্বটুকু কি? ভাষায় অবশ্য সঠিক বলা অসম্ভব। ব্রাহ্ম-সঙ্গীত প্রভৃতি বাদ দিচ্ছি। এ-ছাড়াও প্রায় হাজার দুয়েক গান আছে যেখানে কথা ও সুর মিশে রয়েছে। মিশে থাকার পরও গোটা কয়েক গান থাকে যেখানে কথা ও সুর একদম এক হয়ে যায়। এদের সংখ্যা কম নিশ্চয়। কিন্তু সঠিক বিশেষত্বটি এদেরই নিয়ে। এক এক সময় মনে হয় সেগুলি বাউল, নিতান্ত ভদ্র বাউল। আবার মনে হয়— 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ার সম্বৃত অম্বর', 'ঝর ঝর বরিষে' প্রভৃতিতে কথা ও সুরের ঐক্য রয়েছে। আবার মনে আসে, অত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োজন কিসের? 'ছাদে গো নন্দরাণী' ত রয়েছে! আবার বাউলে ফিরে এল না কি?

আমার বক্তব্যটা হলো এই: কথা ও সুর যদি একই হয়, তবু তাদের অতিরিক্ত সুর কি? অতিরেক হলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুচারু সমাবেশ, তাইতে ওতপ্রোত হলো অর্থ। অর্থ মানে হলো ভাবের খেয়াল, mood। এই mood নিয়েই রবীন্দ্রনাথের বাহাদুরি। mood মানে রাগের type নয়, প্রত্যেক গানের বিশেষ mood।

৭. ৯. ৬০

গ্যেটের সাহিত্যে রসিকতা নেই, বস্তুত আমি জানি না; অত্যন্ত গুরু গম্ভীর। রবীন্দ্রসাহিত্যে রসিকতা খুবই আছে।

গ্যেটে রং, আলো, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তা করেননি, তবে শখ ছিল খুব। বিশ্বপরিচয় লিখলেন, কিন্তু কবিতা করে।

গ্যেটের জীবনই সর্বস্ব, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথের ছিল আত্মপ্রকাশ এবং তাইতে আত্মার আনন্দ; গ্যেটের ছিল আত্মজ্ঞান। এ ছাড়া দুজনের তফাত কোথায়?

১০. ১. ৬০

ডায়েরির পাতা নয়, ভাব আসছে যাচ্ছে, কোনোটা লেখার অক্ষরে আটকা পড়ে, অনেকে পড়ে না। যেটা আটকায় সেটা হালকা। তৎসত্ত্বেও এই হালকা বাঁধনেই একটা গাঢ়তা থাকে। সহজ ভাব, কিন্তু লেখাটা ঘন যেন। কিন্তু ঘন, গাঢ় মানে dense নয়, compact। দু' চারটে কথার সমাবেশ মাত্র। বক্তব্য ছোট হওয়াই চাই।

ফরাসীরা যাকে maxim, apothegm বলে তাও ঠিক নয়। Wit থাকলে ভালো হয়, না হলেও চলে। Aphorism কি ঠিক তাই? Rest is slicnce—wisdom-এর মতন, মন্ত্রের মতন ছোট্ট। আমার লেখা ছোট হয়ে আসছে নিশ্চয়— তবু wise হতে পারি নি। Witgenstein-এর মতন লিখতে ইচ্ছে হয়!

১৫. ১. ৬০

কামু মারা গেল মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে। নোবেল প্রাইজের কথা মনেই আসছে না, এলো না-এলো বয়ে গেল। প্রায় তাঁর সব লেখাই পড়েছি। Plague-এর মতন ইস্পাতের কলম দিয়ে লেখা, etching যেন! কামু কম্যুনিজম ছেড়ে দিলেন, হয়ত ছিলেনই না কোনো দিন; এলজিয়ারসের Colon দল পছন্দ করতেন না মোটে: ফ্রান্সের existentialist, Sartre এদের সঙ্গে তর্ক করেছেন। একটা অসম্ভব রকমের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। সাধারণ লোকের মতন ভাবধারা, কিন্তু সত্যকারের intellectual। অ-সাধারণত্ব আর intellectualism এক বস্তু নয়।

ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সাধারণ ভাবধারা সত্ত্বেও কামু নিতান্ত একাকী। Intellectualism-এর পরিণতি এই ভীষণ একাকিত্ব। Plague-এর পর ঠিক ধরনের নভেল বেরিয়েছে কি? দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, অবশ্য আর কোনো কারণ নেই, কিন্তু হয়ত কারণ ছিল, তাঁর দুর্নিবার একাকিত্ব। নভেলিস্ট হতে গেলেও অতটা সম্পূর্ণ একাকী হওয়া চলে কি?

১৬. ১. ৬০

জার্মানীর মধ্যে দুটি পৃথক সত্তা আছে। প্রথমটি হলো বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমান্ সঙ্গীত ও সাহিত্য, দ্বিতীয়টি হলো একটা কালো; অন্ধকার, অ-সভ্য

টিউটনিক, ল্যাটিন স্বচ্ছতার বিপরীত, মধ্যযুগীয়, এমন কী primitive। গ্যেটে, শিলার, বেঠোফেন, মোটামুটি অ-জার্মান: অন্যদিকে হার্ডারের জার্মানী, ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মলৃটকে, বার্ণহার্ডি, তারই সঙ্গে ট্রীসকে, রোজেনবার্গ, শেষে হিটলার। পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদী হত্যা! (এ-জাতকে ক্ষমা করা যায় না।) দুটোর সমন্বয় করা সম্ভব নয়।

ইতিহাস অন্য কথা বলে হয়ত, কিন্তু যেন ইচ্ছা হয় না। এক এক সময় মনে হয় সেই টিউটনিক জাতির Seigfried, সেই তার Wagner, সেই তারই Clausewitz, তারই Bismarck, তারই Hitler। প্রেমের তলোয়ার। আবার নাৎসী উঠল— আমেরিকানরা কী করেন দেখা যাক। Democratic Process সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে জার্মানীতে! রাশিয়ানরা বুঝেছিল, কিন্তু তারা বুঝতে পারলে না, এবং বুঝতে দিলে না।

১৭. ১ ৬০.

মনের দিক থেকে খ্রীস্টপূর্ব সভ্যতা অপেক্ষা বর্তমান সভ্যতার কোনো উন্নতি হয়েছে কি? একটা axial period হয়েছিল নিশ্চয়; ৬০০।৫০০ খ্রীঃ পূঃ এর সময় মানসিক সভ্যতা একেবারে উল্টেপাল্টে যায় নিশ্চয়। আর হয়েছে সপ্তদশ-শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত: আমাদের আবহাওয়াও উল্টে যাবে। ভাবের দিক থেকে অবশ্য নয় মনে হয়। যদি বদলায় তবে আমাদের উপায় কি? বিংশ শতাব্দীর প্রেম এভাবে চলা উচিত নয়। অন্তত প্রেম নিয়ে নভেল লেখা আজকাল সম্পূর্ণ অচল। সৌহার্দ্য নিয়ে কাজ চালাতে হবে, যথা হেমিংওয়ে।

২০. ১. ৬০.

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে উচ্ছন্ন গেল। কাশী, এলাহাবাদেও তাই বল্লেই হয়। আলিগড়ে তহবিল নিয়ে গোলমাল চলছে, সে সম্বন্ধে একটা সরকারী কমিটি বসেছে। যদি ধরা যায় যে, এটা ছাত্রবিক্ষোভ, তাহলে টাকা খরচ করলেই চলবে, অর্থাৎ ছেলেদের হোস্টেল, খেলাধূলো, টিউটরিয়াল ও মাস্টারদের সংখ্যা বাড়ালেই কিছু উপশম হবে। কিছু— কারণ চীনের ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু খরচ করতেই হবে; আমাদের defence budget নেহাত ছোট নয়। তাই মনে হয় এই ছাত্র-বিক্ষোভটা অপেক্ষাকৃত ছোট— ছাত্রেরা আসবে, যাবে।

ব্যাপারটা কিন্তু বস্তুত এই— দেশে mass-culture আরম্ভ হয়েছে। এই অর্ধ-শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে দেশ কি উন্নত হবে? আমাদের সিনেমা, আমাদের সাজসজ্জা, আমাদের চলন-বলন, আমাদের image হলো mass-culture-এর image। গ্যাসেট য়ুরোপে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে যা লিখেছিলেন, এই অর্ধসভ্য অনুন্নত দেশে তাই এল। এ থেকে ঠেকানো যাবে না; যদি না দেশে একটা ঘোরতর বিপ্লব বাধে। সেটা হবে না, আমরা সেটা চাইও না। অতএব এই চলবে। ছাত্ররা উন্মাদের মতন একটা না একটা শিক্ষককে দোষী করবেই করবে, সত্য-মিথ্যা তারা যাচাই করবে না। তাদের অবস্থা রুগ্নের মতন, পাগলের মতন, দুঃস্বপ্নের মতন, অর্থাৎ অর্ধ-শিক্ষিতের মতন। এ কয়দিন লক্ষ্ণৌএ যা হয়েছে তাকে দুঃস্থ মনের লক্ষণই বলা যায়; তাদের culture হলো Borstal Culture।

শুনলাম বিজ্ঞানের ছেলেরা না-কী অন্য রকমের। যদি তা হয় তবে ল' কলেজ আর আর্টসের ছেলেদের কিছু খাটিয়ে নিতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু তারা কি খাটবে? এদের জন্য টিউটরিয়াল করা বিড়ম্বনা। আমার কাছে ২০ জনের প্রতিদিন টিউটরিয়াল থাকত! আমি পারতাম না, তারাও পারত না।

কী করা যায় ভেবে উঠতে পারি না। এ-ধরনের ডিমক্রেসীতে বিশ্বাস হারাচ্ছি।

২১. ১. ৬০

রেমব্রাণ্ট, হল্‌স্‌, হবেমা, স্টীন, ভার্মিয়ার-এঁরা হল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বসেও খেতে পেলেন না। হবেমাকে ত ছবি আঁকা ছাড়তে হয়েছিল। হুক্‌ এবং রুইসডেল— এঁদের ছবি তাঁদের সমসাময়িকরা পছন্দ করতেন না। ফণ্ডেল, ওলন্দাজদের শ্রেষ্ঠ কবি, রেমব্রাণ্টের ছবি মোটেই কদর করতেন না। অথচ শুনেছি যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজদের জনসাধারণ ছবি কিনতেন, বিক্রি করতেন, ব্যবসা করতেন; সে যুগের সাধারণ লোক ছবি collect করতেন। তবু সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টদের অন্ন জুটত না। অতি অল্প বড় আর্টিস্টরা ছবি থেকে লাভবান হয়েছেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর আন্তরিক বিবাদ আছে।

রাশিয়ার কিন্তু অন্য কথা; অবশ্য, সেখানে ভালো ছবি মোটে হচ্ছে না। তা না হোক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছবিরও চাহিদা খুব বেশি এবং ওখানে দর কষাকষি নেই, competition নেই। তবু, তবু, ওখানে প্রথম

শ্রেণীর ছবি হচ্ছে না কেন? regimentation? জারের সময় তাই ছিল; আর যদি জারের সময় cultural freedomই ছিল তবু সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে, ঐ ধরনেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী ছবি জন্মাত কেন? রাশিয়ায় সাহিত্য শিখরে উঠল, চিত্র না ওঠবার কারণ কি? দুটো কিংবা তিনটে আর্ট একত্রে ওপরে উঠতে পারে না?

২৩. ১. ৬০

সত্য কথা লেখা অসম্ভব দেখছি। ভদ্রতায় অত্যন্ত বাধে। তাই ভাসা-ভাসা লিখতে হয়; তার বেশি আমার দ্বারা লেখা চলে না। বোধ হয়, কারুরই চলে না। এড়িয়ে চলতে হয়। অথচ কোনো একদিন সত্য কথা লিখতেই হবে। আজ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুরাবস্থা হলো কেন? কিছু না কিছু সত্য কথা না লিখে উপায় নেই। প্রথম দিন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছি, আমাদেরই হাতে এটা গড়েছি, আলিগড়ে যাবার সময় থেকে এর পতন শুরু হয়েছে। ত্রিশ বৎসর লাগল গড়তে, চার বৎসরে হলো অবনতি, এবং বাকি পাঁচ-ছয় বৎসরে ধূলিসাৎ।

প্রথম প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তার Vice-Chancellor-এর জন্য। প্রথমে এলেন জ্ঞান চক্রবর্তী। তাঁর একটা অভিজাত মর্যাদাজ্ঞান ছিল। তাঁর সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা Executive Council-এর সভ্য থাকতেন। শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ ছিল কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়নি। দোষত্রুটি ছিল না বলছি না, কিন্তু মোটের উপর আমরা প্রথম থেকেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছি। এবং সেই বাজারে প্রায় পনের বছর আমরা কাটালাম। তার পরে আমাদের ঠিক অবনতিও হয়নি, উন্নতিও হয়নি। কিন্তু সেই সময় থেকে, আরও পরে, আমাদের অবনতি শুরু হয়। একজন Vice-Chancellor এলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেন না; সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতেন না। ছাত্ররা কী করছে না করছে, শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্বন্ধ রাখছে কি না, জানতেন না। ভদ্রলোক ছিলেন সামন্তপন্থী। বেলা এগারটা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন, এবং ঘুম থেকে উঠে পুতুল খেলতেন। অবশ্য সে সময়টা ছিল বিপ্লবের যুগ। কিন্তু কিছুদিন পরে এলেন আচার্য নরেন্দ্রনাথ। তিনি আমাদের সুবর্ণযুগ। ছাত্র ও শিক্ষকদের, তাদের মধ্যে ভাল শিক্ষকদের, সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হলো। অত ছাত্র-শিক্ষকদের, মধ্যে কত না অনুষ্ঠানের সুযোগ

হলো ; প্রতিদিন সভা-সমিতিতে আমরা যেতাম, আমরা কেউ দিনের বেলা ঘুমোতুম না, সারাদিন পড়তাম, পড়তাম, আলাপ-আলোচনা করতাম। সন্ধ্যার সময়ও তাই। মধ্যে মধ্যে আচার্যজী অসুখে পড়তেন, কিন্তু কী অসম্ভব পরিশ্রমই না করতে পারতেন। সপ্তাহে ২।৩ দিন আবার ছাত্রদের পড়াতেন। অনেক politics করেছেন জীবনে, কিন্তু একটি দিনের জন্য তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাতে হস্তক্ষেপ করেননি। আমি Arts Faculty-র পাঁচ বৎসরের ওপর লেকচারারের নির্বাচন-সমিতির সভ্য ছিলাম, প্রায় চল্লিশ জনের ওপর আমরা তাঁদের নির্বাচন করতে হতো, কিন্তু বোধ হয় দুজন ছাড়া তাঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর, এবং সে দুজনেই একটু কিন্তু কিন্তু করেছিলেন। এই ধরনের অধ্যক্ষ আমাদের ছেড়ে কাশী বিদ্যালয়ে চলে গেলেন। মৌলানা আজাদ পণ্ডিত জওহরলাল এবং শ্রীপ্রকাশ তাঁকে বল্লেন যে, লক্ষ্ণৌ বেশ চলছে, কাশী উচ্ছন্ন যাচ্ছে, আপনি সেইখানে যান। কাশী বিদ্যাপীঠের ওপর তাঁর ভীষণ ঝোঁক ছিলো। তিনি কাশী বিদ্যাপীঠেরই ছিলেন অধ্যক্ষ, সেই প্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁর প্রিয়। কিন্তু কাশী বিদ্যালয়ে থাকতে পারলেন না, তিনি অত্যন্ত sensitive লোক, তাই তাঁকে চলে আসতে হলো। তাঁর শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ল।

তাঁর পরেই এলেন আচার্য যুগলকিশোর, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (দু বৎসরের জন্য) এবং সুব্রহ্মণ্য আয়ার। এঁদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না। তবে আলগোছে দুকথা না বলে থাকতে পারছি না। এঁদের প্রত্যেকের সময় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠল পলিটিকস, যাকে খেউড় বলে। মাত্র দুজন ছাড়া বাইশ জন Executive Councilor একজন মন্ত্রীর হাতের পুতুল। Academic Council-ও প্রায়ই তাই হয়ে উঠল। লেখাপড়া গেল উঠে, এল কেবল তরফদারী। সেই সঙ্গে অনেক পুরানো লোক চলে এলেন। আমি যখন আলিগড় যাই তখন তেরোজন বয়স্ক অধ্যাপক অবসর গ্রহণ করলেন। ছেলেছোকরাদের দল ওপরে উঠল। আমি নিজে কুড়ি বৎসরের ওপর লেকচারার ছিলাম। এখন পাঁচ বছরেই রীডার আর প্রোফেসার। এটা হলো কেন? তাঁদের ঠেকিয়ে রাখা যেত যদি অধ্যক্ষ এবং তাঁর বন্ধুরা তাঁদের অত সহজে ঠেলে না তুলতেন। আমরা দু-দলই দায়ী, কিন্তু যদি বেশি দায়ী হয় এঁরা। দু'একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ছাড়া পনেরো বছরের পূর্বে রীডার-প্রোফেসার হওয়া কিছুতেই উচিত না। না খেতে পেয়ে লেকচারার থাকা মঙ্গল।

অনেক কথা আমার বলা উচিত ছিল, কিন্তু বন্ধুবাৎসল্যের জন্য পারলাম

না। ছাত্রদের কেন দোষ দিই? গোড়ায় গলদ আমাদেরই। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর লোক, এবং তৃতীয় শ্রেণীতেই থাকব। সেই তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকদের ছাত্ররাও চতুর্থ শ্রেণীর হবে। তাঁদের হচ্ছে Mass Culture। কোনো উপায় নেই। এই থাকবে। উপায় বাৎলে দিতে লোকে বলে। কিন্তু না দেওয়াটাই উচিত। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর এক চীনে পণ্ডিত বল্লেন, 'কাদাটা থিতোতে দেওয়াই ভালো।'

লিখতে লিখতে মনে হলো বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার মনে দুঃখ না হওয়াই উচিত। ছাত্র ও শিক্ষক মিলে-মিশে যাবে, সরকার একটা সমিতি বসাবে, কিছুই হবে না, ছাত্ররা আবার অসভ্যতা করবে— এই চলল। উগ্রতা একটু বেশি বাড়বে— এই যা!

২৯. ১. ৬০

আকাশে-বাতাসে একটা মধুর চাঞ্চল্য দেখলাম। ইডেন উদ্যানে খেলার ভিড়; আমিও শুনছি। কানপুরে জিতেছি, কিন্তু তার বেশি আর পারব না। ক্রিকেট খেলা এখন feudal নয়; এটা space-এর খেলা। প্রকাণ্ড জমি, একদিন থেকে পাঁচদিন, সময়ও বড়; outfield প্রকাণ্ড। আর বাইশজন খেলোয়াড়, তারা খেলে, তারা জেতে, তারা হারে, কখনও কখনও draw হয়। সবচেয়ে মজা হলো it is cricket, অর্থাৎ কী হবে বলা যায় না। একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে দুই দলের। সেই জন্যে চঞ্চলতা। বাংলায় রেডিও সমাচার মন্দ লাগল না।

৩১. ১. ৬০

এক অদ্ভুত মজার কথা! একটি ছেলে এল, তার 'মনে এলো' ভালো লেগেছে; তাকে আমার ডায়েরি পড়তে দিলাম। উল্টে-পাল্টে পড়লে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নাম দেবো?' অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লে লেখাটা গুরু-গম্ভীর, কিন্তু নাম দেওয়া উচিত হাল্কা।' 'কি হওয়া উচিত?' আবার চুপ করে থেকে বল্লে, 'নিভৃত চিন্তা'। আমি বল্লাম, 'কালীপ্রসন্ন ঘোষের বইখানার নাম তাই।' 'তা হলে, হালকা নামই রাখুন…নাম হবে 'ঝিলিমিলি।' আশ্চর্য এই, আমিও ঠিক 'ঝিলিমিলি' নামই রেখেছি। ছেলেটি আমার এই নাম জানত না। দুজনের এই অভূতপূর্ব নামকরণ দেখে অবাক লাগল। ঝিলিমিলি নামটা বেশ লাগছে। আলো, সূর্য, পরকলা

—আলো হলো মনের, সূর্য হলো আলোর, আর পরকলা হলো আলো ও সূর্যের প্রতিবিম্ব। 'মনে এলো' বই-এর রচনা। 'ঝিলিমিলি' হলো মাত্র মনের অভ্যাস।

আমাকে একজন বললেন, 'আপনার পুরনো কথাগুলি সাজিয়ে লিখুন না? অনেক লোকের ভালো লাগবে নিশ্চয়। তারা অনেক কথা জানতে চান।'

আমি উত্তর দিলাম, গুছিয়ে লেখা আমার সাধ্যাতীত। খান পাঁচ-ছয় গুছিয়ে লিখেছি, বাকী সব প্রবন্ধ। আর এখন লিখছি টুকরো টুকরো। দ্বিতীয় কথা এই— 'ভালো লাগবে নিশ্চয়' কথাটির অর্থ নেই! আমি জানি যে, পাঠকবৃন্দের ভালো লাগবে না। জোর চার-পাঁচশ জন পড়বে, তার বেশি মোটেই নয়। এই পাঁচশ জনের নিশ্চয়তার মূল্য কি? যদি পাঁচ হাজার হতো, তবে সংখ্যা গুণে পরিণত হতো। তৃতীয় কথা— লেখা ঘনতর হয়ে আসছে। মন্ত্রের মতন লেখাই আমার আদর্শ। অতএব গল্প বলে কি হবে? রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জওহরলাল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রফি আহমদ কিদওয়াই, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ড. কাটজু, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ-চন্দ্র, অতুল গুপ্ত— এঁদের সম্বন্ধে অনেক লিখতে পারি। এ-ছাড়া সত্যেন বোস, মেঘনাদ, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখুজ্যে, বীরবল সাহানী, রাধাকুমুদ, রাধাকমল, নির্মল সিদ্ধান্ত, অউধেশ নারায়ণ, করম নারায়ণ, ড. রাও, কোশাম্বী প্রভৃতিরও নাম যে করতে পারি না তা নয়। তাঁরা আমার মনেও আসেন। কিন্তু অত কথা কেনই বা লিখতে যাই। তাঁদের জেনেছি, চিনেছি, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি এই যথেষ্ট। তা ছাড়া ব্যাপারটা এই, ঠিক সত্য কথা কি তাঁদের সম্বন্ধে বলতে পারি? কলমের চাপে, তার খোঁচায় একটু ত বদলে যাবেই। আমি চাই হুবহু সত্য কথা বলতে— তা পারিনা।

তাই কেবলই মনে হচ্ছে, বুঝি বা ভদ্রতায় আটকাল? সে-যুগের লেখা ছিল ভদ্র। বাংলা সাহিত্যের লেখা মোটামুটি এখনও তাই। আমি সেটার ব্যতিরেক করতে পারি না।

৭.২.৬০

সুধীন (দত্ত) আমাকে বল্লে, এলিয়টে Christian Grace অপেক্ষা উপনিষদের অংশই বেশি। চমকে উঠলাম। তবে সে যা বলছে, তার মধ্যে বিস্তর কথা রয়েছে। তরে মতে, এলিয়টের মূল বক্তব্য Love, প্রেম, Grace নয়। কিন্তু প্রেমের অন্তরালে ত Grace রয়েছে। অবশ্য প্রেম

বস্তুটা আরো বড়। তাও না হয় হলো কিন্তু উপনিষদে প্রেম, Love জিনিসটা নেই মনে হয়। সে বল্লে, আছে। বই পড়ে দেখতে হবে। আছে ওজস্‌, জিজ্ঞাসা, জ্ঞান ও সর্বশেষে শান্তি। এলিয়টের মধ্যে আছে জিজ্ঞাসা, কিন্তু জিজ্ঞাসার অবসানে রয়েছে বিরোধের অস্তিত্বে জ্ঞান এবং জ্ঞানের শেষে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নয়। উপনিষদের শান্তি আনন্দময়। আনন্দ ফিরে এসে শান্তিতে পরিণত হলো? আদত কথা এলিয়টের জ্ঞান দর্শন ন। কী সেটা বুঝতে পারছি না। ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। সুধীন ভাবিয়ে তুলেছে।

১৮. ২. ৬০

'অঙ্গার' দেখে এলাম। এ-ধরনের নাটক বাংলাদেশে আছে বলে মনে হয় না। অন্য ভাষায় আছে না কি? নাট্যমঞ্চের সাজসরঞ্জাম যাকে production ও stage-craft বলে, চমৎকার। শেষ দৃশ্যটি অপূর্ব। নাটকত্ব রয়েছে— কিন্তু আমার বলবার কথা আছে। দফা-পিছু সাজাচ্ছি

(১) প্রথম দৃশ্যেই দিনু'দা মারা পড়ল। আরম্ভটা খাসা, কিন্তু প্রথম দৃশ্যের শেষেই মারা গেল কেন? তার চরিত্রটা এক হিসেব সম্পূর্ণ। যদিও অসম্পূর্ণ হয় তবে তার দরকারই কি ছিল?

(২) রূপা নিতান্ত অপরিণত, এবং তাই রয়ে গেল। মানুষ, যদি মেয়েমানুষ, সর্বদাই অপরিণত থাকবে এমন কথা জীবনে চলে; নাটকে চলে না। নাটকে পরিণতি চাই।

(৩) হাবিলদার (উৎপল দত্ত) অসম্পূর্ণ। পরিণতি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বিরোধ, যেটা পরিণতির অঙ্গ, ভাল করে ফোটেনি। পরিণতিটা যেন হঠাৎ হলো। মারধোর করবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন, আবার বলি, জীবনে সম্ভব। কিন্তু নাটকে নয়!

(৪) বিনুর বোনের কোনো কারণ নেই— না থাকলে চলত। বিনুর মার সঙ্গে সংসার চলত।

(৫) আগের তুলনায় গান, তারপর সাহিত্য, নাটকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে থাকে। অঙ্গারে কম, তবু আছে। বাঙালি পাঠকদের কি সাহিত্য না হলে চলে না? হাবিলদারের বুকে তার মেয়ের ফটো রাখা আর তাই

নিয়ে চেঁচান, শোভন নয়। এই রকম বহুবার। নিষ্ঠুরভাবে সে-সব কেটে দিলে চলত।

(৬) মোদ্দা কথা, 'অঙ্গার' একত্রে সাহিত্য ও নাটক, বিশুদ্ধ নাটক নয়। নাটকে কর্ম, action থাকত প্রধান, সাহিত্যের জন্য বর্ণনা এল। তাই শেষ দৃশ্যের বর্ণনা অতিরিক্ত। এত action সত্ত্বেও বর্ণনা এসেছে। সাহিত্যের অংশ এই হিসেবে বেশি।

তবু 'অঙ্গার' ভালো বই। Little Theatre Group-এর এই সব ছেলেরা ভালো অভিনয় করে (এক রূপা ছাড়া, মোটে তাঁকে মানায়নি, লেখাটারও দোষ আছে)। বিনুর মা সনাতন, বিনু এবং দু'চারটি পার্ট সত্যই খুব ভালো। নাটক হিসেবে এ-গুলি সম্পূর্ণ ও পরিণত। বাহাদুরি আছে সনাতনের, এবং তারই পরে বিনুর মা'র। দলের (Group) গোছান বেশ। কয়লার খন্দরে যখন ডুবে মরছে, তখন মানুষ এক হয়ে গেল। সনাতন সকলকে এক করে ফেল্লে। পাগল হয়েও গোটা মানুষ। সনাতনই নাটকের নায়ক।

অত্যন্ত ভালো লাগল অনেক ছোট্ট-খাট্ট কথা। চাঁছাছোলা কথাবার্তা, নিতান্ত স্বাভাবিক, সেই জন্যে সত্যকারের আর্ট। গোটাভাবে অবশ্য তা নয়।

তাই বলছি 'অঙ্গার' ভালো লেখা, এবং ভালো অভিনয়। এই ধরনের জিনিস বাংলায় নেই। এবার কি সত্যই বাংলা নাটকের মোড় ফিরবে? উৎপল দত্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রায় এক মাস চলছে, আশ্চর্য হয়েছি।

১৯. ২. ৬০

হিন্দু-চীন ভাই-ভাই ত' খতম হলো। সেই সঙ্গে তাদের হাজার-হাজার বছরের কৃষ্টি, গত পাঁচ-দশ বছরের পরিকল্পনারও দেখছি শেষ-বেশ। অশোক মেটা, মাসানি— প্রভৃতিরা দুটোই মেরে দিলেন না কি? তা যদি হয় ত অত্যন্ত অন্যায়। আমি এখনও বলব চীন সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে mature সভ্যতা এবং এখনকার চীন পরিকল্পনা চিন্তা করবার জিনিস, সেটা আমরা নিই কী না নিই। চীনেরা এতটা মূর্খতা না করলেই পারত— আমরা ত' ভাবপ্রবণ আছিই। কিন্তু বুদ্ধি দিয়েই ত' দেখতে হবে। অবশ্য বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিমানদের জন্যই বুদ্ধি— নয় কি?

কেন জানি না, বহুদিন পরে, দু'-তিন বৎসরের ওপর, Zurich-এর কথা মনে হচ্ছে। একজনের কথাই বেশি আসে। হাসপাতালে একজন মহিলা এলেন, একটু বেশি সাজসজ্জা, একটু বেশি রঙমাখা, কানে বেশি লম্বা দুল, আঁট-সাঁট স্কার্ট, বয়স কিন্তু বেশি। আমাদের নিতান্ত পরিচিতের মধ্যে। শুনতাম. উচ্চারণ করতে ত পারতাম না। পাঁচ মাসের মধ্যে সপ্তাহে দু'বার করে বিকেল চারটেয় আসতেন, এক ঘণ্টা আমার ডান হাত ধরে বসে থাকতেন চুপ করে, কেবল বলতেন, নিশ্চয়ই সেরে যাবে। ফিরে আসবার সময় দু'বার নিজের মোটরে সারা Zurich ঘোরালেন। এতদিন নীরবে বসে থাকতেন, এইটুকুই জানি। পরে শুনলাম, ছ'টা ভাষায় অভিজ্ঞ, তাই অতিথিসৎকার করতেন এবং তাই থেকে রোজগারও ছিল। এত নম্র; এত ভদ্র! এত কর্মদক্ষ! ফিরে এসে একটা চিঠিও বোধহয় লিখেছিলাম। উত্তর পাইনি। কিংবা হয়ত চিঠিই লিখিনি। নাম মনে আসছে না। কিন্তু মেয়েটি অদ্ভুত! গুণই প্রকাশ পেত, ব্যক্ত হতো না। অবিশেষ ভাবি, হয় বিশেষ।

২১. ২. ৬০

দুঃখ খুব বড় দুঃখ, নিতান্ত কমই আসে— আসেই না। যখন এল তখন মৃত্যু, বিরহ, না বোঝার দুয়ার দিয়েই এল। কিন্তু মৃত্যু, বিরহ ক'দিনের জন্যেই বা! না-বোঝার আঘাত প্রায় জন্মাবধি। সেটা ক্ষমা করা যায়, ভোলা যায় না।

এক হলো, আমরা এখনও ইংরেজের দাস, দাসানুদাস, তস্য দাস, ইংরেজী ছাড়া পড়ি না, ইংরেজী ছাড়া ভাবি না। ইংরেজেরই অনুকরণ করি— তাই আমাদের এই culture-lag। দাস মনোভাব আর culture-lag— এই দু-এর সাহায্যে আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লোকে বলবে Marx পড়লেও, এমন কী পড়লেই (এ দুটো এক নয়) আমরা দাস হয়ে যাব। এক শ' বছর ইকনমিক্‌স, ষাট-সত্তর বছর marginal ultility-র দাসত্ব করেছি! Marxism-এরও ত' কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সে যাই হোক একটা বড় কথা: Keynes ত্রিশ বৎসরে post-Keynesian, non-Keynesian, anti-Keynesian হয়েছে; Marxism-এ অন্তত দু' হাজার কোটির অনুন্নত অর্থনীতিতে প্রায় একশ বছর এখনও চলছে। ব্যবধানটি ইচ্ছাকৃত? Marx-এর greatness এবং Keynes-এর talent,

বড় talent— এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই কিছু আছে। মূল কথায়, বক্তব্যে Marx ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন, না দিলে Cold War কেন? Keynes-এর মূলের এক অংশ তাই ছিল; যে অংশটি নাড়া দিতে পেরেছেন সেখানে Joan Robinson, leftist Keynesianism. অর্থাৎ Marxist পন্থী। তার বেশি নয়

এই আমার মনে হয়।

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

[পুস্তক-সমালোচনা]

পুস্তক-পরিচয়

Impression of Soviet Russia and the Revolutionary World
—DEWEY.

Dreiser looks at Russia—DREISER.

One looks at Russia—BARBUSSE.

রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ।

রাশিয়া সম্বন্ধে লম্বা লম্বা সংখ্যার তালিকা প'ড়ে মন যখন বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে, তখন খানকয়েক ভদ্রলোকের পাঠোপযোগী বই-এর সন্ধান পাওয়া গেল। প্রত্যেক বইখানি প্রতিভাশালী ব্যক্তির লেখা। বিখ্যাত দার্শনিক Dewey দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নতুন শিক্ষাপদ্ধতি শিখতে ও শেখাতে। চীন, মেক্‌সিকো, নব্যতুর্ক ও রাশিয়াতে শিক্ষা নিয়ে প্রধানত যে-সব পরীক্ষা চলছে তারই আলোচনা ক'রে তিনি নিজের দেশের সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলি সস্তা-দামে পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। রাশিয়া-সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বেশ বড়। Dewey-র লেখা অনেকেই পড়েছেন, দর্শন-সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্বজনবিদিত। তার মূল্য যাই হোক না কেন, ভাষার প্রাঞ্জলতা, forthrightness এবং মতামতে একটা সাধারণ-বুদ্ধির পরিচয় থাকার দরুণ তার সব লেখাই ভারী উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে। কোন উপজীবিকার সাহায্যে দেহ ও মনের গঠনকেই তিনি শিক্ষা বলেন; তাঁর মত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে জীবজগতের নিয়মানুসারে ব্যক্তিকে খাপ খাওয়ানই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজকে যখন উন্নত করতে হবে, তখন জীবনের সাফল্যকে বাদ দিলে চলবেই না। আজকালকার সমাজ গণতন্ত্রমূলক হয়েছে, অতএব ভাববিলাসী সাহিত্যিক কিংবা দার্শনিকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা দুষ্কর; বিজ্ঞান শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা, এবং এই বিজ্ঞান-শিক্ষার দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে মিলিত করা যাবে। Naturalistic মনোভাবই শিক্ষিতের একমাত্র উপযুক্ত মনোভাব। প্রত্যেক ভাবকে ব্যবহৃত করলে যতদূর টেঁকে ততদূর পর্যন্ত তার মূল্য দেওয়াই প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র মানসিক কর্তব্য। ব্যবহারিক জগতের বাধাবিপত্তিকে স্বীকার ক'রে জয় করাই চিন্তার ধর্ম। এই ধরনের গোটাকয়েক মূলকথা সোজা ভাষায় বলার জন্যই Dewey-র এত প্রতিপত্তি। পলিটিক্সে তাঁর মতগুলি আমেরিকাবাসীরই উপযুক্ত — তিনি voluntary association-এর ভক্ত, সবজান্তা, সর্বময় কর্তা একটা

State-কে বিশ্বাস করেন না, কেননা তার সাহায্যে কোন মানুষ যথার্থভাবে শিক্ষিত হ'তে পারে না, তার নিজের ধর্ম-অনুসারে ফুটে উঠতে পারে না। এক ওষুধে সব রোগ সারতে পারে, তিনি বিশ্বাস করেন না— প্রত্যেক সমস্যার ভিন্ন নিরাকরণ হওয়া উচিত, কেননা প্রত্যেকটির social milieu আলাদা আলাদা। এ হেন মন ও মত নিয়ে Dewey সাহেব রাশিয়া গিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং আদান-প্রদানে যে মতগুলি বই-এতে ফুটেছে সেগুলির সঙ্গে অন্য একটি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের— আমাদের কবির মতেরও মিল রয়েছে। দুজনেই শিক্ষক, দুজনেরই অনুরাগ এক, দুজনেরই সিদ্ধান্ত এক।

অন্য দুজন নভেলিস্ট রাশিয়া বেড়াতে যান। একজন আমেরিকান Theodore Dreiser যিনি আজ নয় কাল নোবেল প্রাইজ পাবেন, অন্যজন Henri Barbusse, ফ্রান্সের নামজাদা লেখক ও Communist, একটু ভদ্র হ'লে ইতিপূর্বেই তিনি নোবেল প্রাইজ পেতেন। বই দুখানার নামেই লেখকদের চরিত্রগত পার্থক্য ধরা পড়ে— Dreiser looks at Russia এবং One looks at Russia। একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন, অন্য ব্যক্তি সাধারণেরই একজন হ'য়েই দেখেছেন। দুজনেই সাহিত্যিক ব'লে রাশিয়ার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ছবিগুলি চমৎকার হ'য়েছে। গ্রামের লোকে কী করছে, মজুরের দল কারখানার ভেতরে ও বাইরে কী ভাবছে, কী ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করছে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাট ঘটনার মধ্য দিয়ে একটা বড় আদর্শ কী ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, এই সবের খুঁটিনাটি বর্ণনা বই দু'খানিকে সাহিত্যের কোটায় তুলে ধ'রেছে। Barbusse আগে থেকেই communist, অতএব হয়ত অনেকে তাঁর মন্তব্যগুলি গ্রহণ করবেন না। কিন্তু তাঁর লেখা এত convincing যে, অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। কোন স্থানেই তাঁর পূর্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস নেই। রাশিয়া তাঁর কাছে earthly paradise হ'লেও, সে স্বর্গের বর্ণনা একজন ফরাসী সাহিত্যিকের। ড্রাইসারের চোখে রঙিন চশমা ছিল না, সাদা চোখেই তিনি দেখেছেন— এবং যা প্রত্যক্ষ দেখেছেন তাই লিখেছেন। তাঁর নভেলের যা গুণ ও দোষ সবই এই বইখানিতে বর্তেছে— তিনি সবই একটু epically দেখেন— তাঁর পটটি প্রকাণ্ড, দৃষ্টি সূক্ষ্ম নয়, প্রসারিত, ভাষা অমার্জিত বল্লেও হয়। কী ক'রে মানুষের ভাগ্যচক্র ধীরে অথচ নিষ্ঠুরভাবে ওঠে পড়ে তিনি ভাল ক'রেই জানেন। একজনের বুদ্ধি ক্ষুরধার, অন্যের প্রাণ মস্ত বড়, একজনের কলম ভোঁতা, অন্যের কলমে ইস্পাতের নিব, — একজন Latin, অন্যজন American,— একজনের চিত্রে অবকাশ বেশী,

অন্যের পটভূমি খুঁটিনাটি দিয়ে ভর্তি, একজনের বর্ণে আছে উজ্জ্বলতা, অন্যের বর্ণে আছে জ্বালা, দাহকতা, তবু তাঁদের সিদ্ধান্ত এক।

শেষে গেলেন কবি। তিনি আবার সত্তর বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে জন্মেছিলেন। পরাধীন দেশে, দুঃখী দেশে জন্মালে যে আশা নিয়ে বিদেশ-ভ্রমণে, বিশেষ ক'রে, বিশ্বের তীর্থভূমি রাশিয়ায় লোকে যায় তাঁরও সেই আশা ছিল। তার ওপর কবির চোখ হিন্দু দার্শনিকের, তাঁর অন্তরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা বাইরের আবরণ ভেদ করবার ক্ষমতার চেয়ে বেশী। স্বভাবত তিনি অবসরের মহিমা উপলব্ধি করেছেন, কীর্তনও করেছেন। তিনি আবার বড় জমিদার, পরশ্রমজীবীর একজন। কিন্তু অন্য জমিদারের মতন তিনি জমিকে শোষণ না ক'রে জমিতেই জমির টাকা বপন করেছেন। আমাদের চাষীর কল্যাণ কিসে হবে, কিসে তাদের অভাব মোচন হবে, কিসে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হবে, তাদের ঋণের মাত্রা কিসে কমবে, দেহের ওজন, মনের ফুর্তি কিসে বাড়বে তিনি যত ভেবেছেন আমাদের দেশে আর কেউ অত ভেবেছেন কি না জানি না। শুধু ভাবা নয়, কাজও করা, প্রজাদের দিয়েই কাজ করান, সমবায়-পদ্ধতির দ্বারা, স্কুল-পাঠশালা, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক-স্থাপনের দ্বারা। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, ক্ষমতা ছিল অল্প, সাহায্য করবার লোক ছিল কম, বাধা-বিপত্তিও ছিল বিস্তর। কবি আবার শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মার্কা শিক্ষার দোষ কোথায় বুঝেই তিনি শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন— সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে, বিদ্যালয়কে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থানীয় ক'রে ব্যবহারিকজীবনের কার্যকুশলতাকে আশ্রয় ক'রে, প্রত্যেক মানুষের সৌন্দর্যলিপ্সা স্বাভাবিক উপায়ে জাগিয়ে দিয়ে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আশার অনুরূপ ফললাভ হয় নি। তিনি জীবনে কেবল অন্যের মুখে 'ডিফিকাল্‌টিসে'র দোহাই শুনেই এলেন। শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য গবর্নমেণ্ট টাকা দিতে পারছে না, রাজত্ব চালাতে হবে, অতএব "ল ও অর্ডারে"র জন্য, পুলিশ ও সৈন্য-বিভাগের জন্য সব টাকা চাই, বড় সাহেবদের জন্য মোটা টাকা চাই, দেশের লোকে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, তবু শোষণ-কার্যের বিরাম নেই, দেশের লোকের আত্মশ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, পেটে অন্ন নেই, মগজে শিক্ষা নেই, লোকের হাত পা বাঁধা, তার পর লাঠি চার্জ, আবার তার চেয়েও কঠিন অসহ্য অপমান, সাইমন সাহেব ও পাদ্রীদের হাত থেকে— এই সব দেখে শুনে কবির প্রাণে, দেশের সত্যকারের দায়িত্বজ্ঞানী জমিদারের প্রাণে, দেশের প্রকৃত শিক্ষকের প্রাণে বড় বেজেছে। তারই সুর এই চিঠিগুলিতে বাজছে। আর একবার এই রকমই বেজেছিল— জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর পেয়ে। অন্য

লোক হ'লে চিঠিগুলো নেহাৎ পেট্রিয়টিক হতো, কিন্তু তিনি ব'লে তাঁর চিঠির মধ্যে অন্য জিনিসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধান আছে, স্থিরসন্ধান আছে, এই চিঠির মধ্যে রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের, একত্রিক কৃষিপদ্ধতির, তার ললিতকলার, তার শিক্ষা-পদ্ধতির, তার কল্যাণ-সমিতির, শিশু-সমিতির, স্বাস্থ্য-সমিতির, তার যন্ত্রশালার, তার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, কম্যুনিস্টদলের একাধিপত্যের দোষ-গুণের, তার ধর্মের, তার কর্মকুশলতার, তার প্রচণ্ড সমবেত চেষ্টার, পিছিয়ে পড়া জাতের জন্য সমবেদনার, এক কথায় সন্ধান আছে, আমাদেরই মত ধর্মান্ধ, অশিক্ষিত, বন্ধন-জর্জর জাতিকে মুক্তি দেবার ইতিহাসের। রাশিয়ায় যে ঘটনাটি ঘটেছে তার মর্মকথাটি এত স্পষ্ট করে আর বোধহয় কেউ বলেনি। হয়ত Dewey, Dreiser, Barbusse-এর মর্মগ্রহণ করবার প্রয়োজন ও তাগিদ কবির চেয়ে কম ছিল, তাঁরা স্ববশ-জাতির লোক, আমাদের মতন অপমানজর্জরিত দীন-হীন জাতের লোক নন। হয়ত তাঁদের ফিলসফি নেহাতই এই জগতের। তাঁদের সমাজ জীবিত, তাঁরা সাহস ক'রে আশা-ভরসা ক'রতে পারেন, দাবী করতে পারেন, ভারতবাসী কিছুই পারে না, সেই জন্যে হয়ত কবির প্রাণে বেশী বেজেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য সাহস এই ব্যক্তির! সত্তর বৎসর বয়সে কী শেখবার ক্ষমতা! কী বিনয়! কোথায় গেল তাঁর Philosophy of Leisure? কোথায় গেল তাঁর সেই Green-এর idealistie notions of property? কোথায় গেল তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ? কোথায় গেল তাঁর স্বর্গীয় তুলনা—সমাজটা প্রদীপের মতন, ওপরে আলো, নীচে অন্ধকার? কোথায় গেল তাঁর aristocratic isolation? তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে কি সব দিয়ে আসতে হয়? সত্য কথা তা নয় কিন্তু। তীর্থস্থানে কাউকে কিছু দিতে হয় না—শুধু বাইরের আবরণ ছাড়তে হয়, তবেই মানুষের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে। দেশের প্রতি এত টান, শিক্ষার জন্য এত ব্যাকুলতা, যারা জমি চাষ ক'রে সেই জনসাধারণের প্রতি এত সমবেদনা, দেশের কল্যাণের জন্য এত ব্যগ্রতা তাঁর অন্য কোন লেখায় আছে কি-না স্মরণ হচ্ছে না। রাশিয়ার সোভিয়েট-তন্ত্র জানতে গিয়ে কবির সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'ল, এইটাই প্রধান লাভ।

অন্য লাভ যথেষ্টই হয়েছে। যে লেখকদের নাম করেছি তাঁদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কবির সিদ্ধান্তের যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রধান মিল হ'ল এই যে, মানুষের মন ব'লে কোন একটা অপরিবর্তনীয় বস্তু নেই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মন ত বদলে যায়ই। কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাতের হাতে মানুষের সুখ-দুঃখকে ছেড়ে দেওয়া মূর্খতা, সময়ের ও শক্তির অপব্যবহার। অতএব rational control এর-প্রয়োজন রয়েছে।

এতদিন যে চালনা-পদ্ধতি চলছিল তার প্রধান দোষ এই যে, তার মূলে ছিল একটি কোন শ্রেণীর স্বার্থ, সমগ্র সমাজের কল্যাণ তার পিছনে কাজ ক'রত না। অথচ বিপদ এই যে, সাধারণের হাতে কল্যাণের ভার দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নিজেদের কল্যাণ কী তাই তারা জানে না ব'লে কার্যত তারা সেই শক্তিশালী শ্রেণীর হাতে গিয়েই পড়ত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কল্যাণ-সাধনের এক উপায় সাধারণের শিক্ষা। সে শিক্ষা কেরানি তৈরি করবার যন্ত্র নয়। তার সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ নিবিড়, সমাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, সে শিক্ষা সর্বাঙ্গীন এবং মনকে জাগিয়ে দেয়, ভাবতে শেখায়, কাজ করতে বলে; তার দ্বারা মূঢ়তা লোপ পায়, ধর্মান্ধতা ঘুচে যায়, মনে বল আসে, মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ব্যক্তির মন যুক্ত হয়। সে শিক্ষা concrete বটে, কিন্তু শুধুই practical নয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তৃত ক'রবে কে? জার নয়, পুরোহিত-পাণ্ডার দল নয়, পরশ্রমজীবী মধ্যস্থ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নয়, ক'রবে এমন একটি রাষ্ট্র যেটি সম্পূর্ণভাবে সর্বসাধারণের প্রতিভূ। কার সর্বসাধারণ? যারা হাত দিয়েই হোক, আর মাথা দিয়েই হোক জগন্নাথের ভাঁড়ারে কিছু এনে হাজির ক'রেছে। যারা কিছু না এনে ভোগের প্রত্যাশা করে, তাদের সাধারণের মধ্যে স্থান নেই। সমাজের উদ্দেশ্য ঠিক হ'ল, উপায় পাওয়া গেল, বাধা-বিপত্তি সরান হ'ল, যন্ত্র এল, বাকি রইল শিক্ষা বিস্তারের পন্থা, এবং শেখবার জন্য উদ্যম। পন্থা অনেক রকমের হ'তে পারে এই বিংশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞানের দৌলতে আছে, সিনেমা, ভ্রমণ, ল্যাবরেটরি, ম্যুজিয়ম, খবরের কাগজ, রেডিও। সবগুলিকে কাজে খাটান হ'ল। এখন, লোকের মধ্যে উদ্যম আনা যায় কিসে? উদ্যম আসে না কিসে? মানুষ ত স্বার্থপর হ'য়েই জন্মায় সকলে বলেন, তবু মানুষ শিক্ষিত হ'তে চায় না কেন? এক কারণ মানুষ স্বার্থ-সম্বন্ধে সচেতন নয়। অতএব স্বার্থ-সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রতে হবে। তার স্বার্থ ভোলাতে হবে স্বার্থের দ্বারা। ছোট জমি চাষ ক'রে লাভ হয় না দেখাতে হবে, একত্রিক সমবেত চাষই লাভের ব্যবসা দেখাতে হবে—তবেই তারা ছোট জমি ছাড়বে। কার্ল মার্কস্ বলেছিলেন যে মজুররাই, চাষীরাই জিনিসের দাম তৈরি করে, অতএব জিনিসের ওপর অধিকার একমাত্র তাদেরই। তৈরি মত পাওয়া গেল, তারই সাহায্যে হতাশ মনকে আশান্বিত করা হ'ল। ইতিহাসই, তাদের দিন আগত ঐ, ব'লে দিলে। প্রোপাগাণ্ডা চলল খুব জোরেই। হয়ত সব লোকে একটি মতের ছাঁচে ঢালাই হ'ল, তাতে হয়ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রইল না, কিন্তু সাধারণের উপকারে সে অপকারটুকু ঢাকা পড়ল। আশা করা যায়, যখন সমগ্র দেশটা আত্মস্থ হবে, তখন যে শিক্ষা স্বাধীন-চিন্তা শিখিয়েছে তারই

দ্বারা মনের বৈচিত্র্য পুনরভিষিক্ত হবে। যতদিন না হয়, ততদিন প্রোপাগাণ্ডার, একটি দলের একাধিপত্যের ও অধিনায়কত্বের প্রয়োজন রয়েছে, এবং ততদিন সে প্রয়োজনের মূল্য স্বার্থান্ধ ব্যক্তির মতবৈচিত্র্যের প্রয়োজনের মূল্য অপেক্ষা বেশী। অতএব নিঃসহায়তার, দৈন্যের, দুঃখের অবসান হয় শিক্ষায়। কিন্তু আবার স্বজাতির সমস্যা সমগ্র মানবজাতির সমস্যার অন্তর্গত। বিশ্ব-ইতিহাসের ভৌগোলিক পর্দা উঠে গিয়েছে। "দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট ক'রে দেখতে পাচ্ছে, এইটেই মস্ত কথা"। তাই রাশিয়া জগতের তীর্থভূমি। তাই কবির "রাশিয়ার চিঠি" একটা মস্ত কীর্তি।

আর একটি কথা মনে ওঠে। ভারতবর্ষে কম্যুনিজম সম্ভব কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিষী দিতে পারেন, অন্যে পারে না। তবে রাশিয়া-সম্বন্ধে কোনো ভাল বই পড়লে মনে হয়, 'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ'?

পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৮

পত্রাবলী—ধর্ম ও বিজ্ঞান—শ্রীদিলীপকুমার রায়, বীরবল ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত; মূল্য এক টাকা।

Science and Human Experience—Herbert Dingle, (Williams & Norgate).

The Scientific Outlook—Bertrand Russell, (George Allen & Unwin Ltd.).

Brave New World—Aldous Huxley, (Chatto & Windus).

য়ুরোপ ও আমেরিকায় গত কয়েক বৎসর ধ'রে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সীমানা নিয়ে যে-তর্ক উঠেছে, প্রথম বইখানি তারই জের টেনেছে বাংলা দেশে। বইখানিতে যে-কয়েকটি প্রবন্ধ (প্রবন্ধ ছাড়া এদেরকে চিঠি বলা যায় না) ছাপা হয়েছে, সেগুলি ইতিপূর্বে নানা মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের মনকে সর্বপ্রথম সজাগ করে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকেই এই ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ ও সমন্বয় নিয়ে বিদেশী ভাষায় লেখা অনেক বই পড়েছিলেন। কিন্তু বিদেশী ও স্বদেশী ভাষায় চিন্তা করার মধ্যে অনেক তফাত আছে বিশ্বাস করি, সেইজন্য 'পরিচয়ে'র মারফত সমগ্র বাঙালী পাঠকদের এই বইখানি পড়তে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধের কথা শুনলেই পরশুরামের চিকিৎসা-সংকটের কথা মনে হয়। বৈদ্য-হাকিমের টোটকা, এলোপ্যাথের কড়া দাওয়াই, এবং

হোমিওপ্যাথের জল-পড়া খেয়ে রোগী সারুক আর নাই সারুক, তার আর্থিক অবনতি ও মানসিক অবসাদ যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। যখন লক্ষ করি, আমাদের দেশের মনকে কুসংস্কার কী ভীষণভাবে ঘিরে রয়েছে, যখন দেখি ধর্মের নামে যত রকম ফাঁকি সম্ভব ততরকম ফাঁকি আমাদের শিক্ষিত সমাজের অগ্রণীরা নিজেদের মনকে দিতে ত্রুটি করেছেন না, তখন মনে হয় বর্তমান ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক মনোভাব এমন-কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-তন্ত্রের যতটা প্রসার হয় ততটাই মঙ্গল। পরে কী হবে, বিজ্ঞানের প্রভাবে সমাজের গোটাকয়েক মূল্যবান জিনিস নষ্ট হবে কি না, ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একটা অমানুষিক গড়পড়তার চাপে নষ্ট হবে কি না, মধ্যাহ্নসূর্যের সমীকরণে বৈচিত্র্য তার রঙ খোয়াবে কিনা— এ সব ভাবতেও ইচ্ছা করে না। হয়ত লোকে আবার একটা নতুন রকমের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হবে— প্রমথবাবুর কথা অনুসারে ; সমাজ হয়ত বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাবিধি ও তাদের স্বার্থজড়িত মত প্রচারের তাড়নায় একটা নিষ্ঠুর ও শক্তিশালী সঙ্ঘের অধীনে গিয়ে পড়বে— হাক্‌সলি ও রাসেলের কথামতো ; তবুও ভারতবর্ষের অনেক উপকার হবে ভেবে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বহুল প্রচার সম্বন্ধে ভীত হই না। মনে হয়, এ দেশে বিজ্ঞান ছাড়া কোন উপায় নেই। আশুফললাভের আশায় আমি অনেকটা ছাড়তে রাজী। একটা রবীন্দ্রনাথ, একটা জগদীশ, একটা রামণে আমি নিশ্চিন্ত নই। আমাদের average নেহাতই নীচু, তাকে তুলতে হলে বিজ্ঞানেরই সাহায্য নিতে হবে, ধর্মের নয়। রাসেল সাহেব যে average-এর ভয় দেখিয়েছেন তাতে কাবু হই না, কারণ, average death-rate যত বেশী হোক না কেন, সে মৃত্যুহারের জোরেই কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু অবধারিত নয়—নচেৎ হিন্দুসমাজের রক্ষক বৃদ্ধের দল এখনও বেঁচে রয়েছেন কেন? Average মানে বড়র মাথা কেটে বেঁটের মাথায় জুড়ে দেওয়া নয়— এই কথাটি জানলে বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের সর্বনাশ হবে ভেবে অ-সাধারণ ব্যক্তির খেদ করার ততটা প্রয়োজন থাকে না।

আমার মনের কথা লিখলাম। তবুও ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধটুকু থেকেই গেল। বিরোধটার প্রকৃতি জানতে হ'লে ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রসম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। Dingle সাহেব বোধ হয় হগ্‌বেনের ভাষা গ্রহণ ক'রেই বলছেন— বিজ্ঞানের অর্থ হচ্ছে **the recording, argumentation and rational correlation of those elements of our experience which are actually or potentially common to all normal people** বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই সাধারণ অভিজ্ঞতা, যা নিয়ে আলোচনা করা যায়, যাকে

প্রকাশ করা যায় অন্যের কাছে। ধর্মের সংজ্ঞা তিনি দেন নি— শুধু বলছেন যে, এর ক্ষেত্রে হচ্ছে private, এবং বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ক্ষেত্র যে-কালে আলাদা তখন প্রত্যেকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন, এই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু গোল বাধে এইখানে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস যদি এই সাধারণ অভিজ্ঞতার কোন একটি অংশ নিয়ে তৈরি হয়, কিংবা কোন মানুষ যদি তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যেভাবে সত্য ঠিক সেই ভাবে সত্য বিবেচনা করেন, তাহ'লে বিরোধ অনিবার্য। এই যেমন, পৃথিবী ছয় দিনে তৈরি হয়েছিল, ভগবান সকল মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এ সব স্থলে বিজ্ঞানের দাবী ধর্মের চেয়ে বেশী। এই রকম একাধিক প্রকার বিরোধের বিষয় উঠতে পারে। প্রত্যেক বিষয়ে বিজ্ঞানের attitude আলাদা।

"In considering the relation of science to religious creeds, then, we must recognise three attitudes which science can take, according to the character of the creed in question : it can make a final pronouncement, it can reserve judgment, or it can influence the probability with which a praticular dogma is invested."

অতএব সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান-বাক্য গ্রাহ্য নয়। অন্য দিকে থেকে, ধর্মও বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ ধর্ম এই সাধারণ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন মতামত জাহির করছে, ততক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা ধর্মের পক্ষে খুবই সাজে। ভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে Dingle-এর এই মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য।

"The individual man may correlate his own experiences, whether of common or individual nature in a single whole with complete validity, and if in so doing he fiinds the assumption of God necessary, his position in adopting it is impregnable".

তাই ব'লে ভগবানকে potentially common experience-এর বিষয় মনে করতে পারার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই ; তা করতে হ'লে তাকে দাঁড়াতে হবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অন্যান্য অভিজ্ঞতারই মতন কোন অভিজ্ঞতার ওপর। God of Reason ব'লেও কিছু একটা থাকতে পারে। বিজ্ঞানের কাজ শুধু correlation নয়, augmentation of experience-ও বটে, এবং এই সূত্রে বিজ্ঞান

hypothesis ব্যবহার করে, যেগুলি সত্য ব'লে প্রমাণিত হওয়ার পরে সাধারণ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। এই হিসাবে hypothesis of God হয়ত পরে আবশ্যক হবে, পদার্থবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় যদিও তার কোন সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। যদিও হয়, তাহ'লে সে ভগবান না হবেন কেষ্ট ঠাকুর, না হবেন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। জীন্‌সের ভগবান তাঁর নিজের দার্শনিক সংস্কারের দ্বারা তৈরি, তাঁর বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং সাধারণ পাঠকের তর্কবুদ্ধি দ্বারা সে ভগবান প্রতিষ্ঠিত হন নি। এডিংটনের mind-stuff-ও ঐ ধরনের ব্যক্তিগত সংস্কার মাত্র। রাসেল ঠাট্টা ক'রে ঠিকই লিখেছেন—

"It is, I suppose, natural that every man should fill the vacuum left by the disappearance of belief in physical law as best as he may, and that he should use for this purpose any odds and ends of unfounded belief which had previously no room to expand. When the robustness of Catholic faith decayed at the time of the Renaissance, it tended to be replaced by astrology and necromancy, and in like manner we must expect the decay of the scientific faith to lead to a recrudescence of pre-scientific superstitions."

এ ভয়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। নচেত এডিংটন্ ধর্মের ধ্বজা তুললেন অণুর পাগলামি দেখে, আর জীন্‌স এক আজব ভগবান খাড়া করলেন সেই একই অণুর ভদ্র ব্যবহারের ওপর! নচেত কোন্ এক বিশেষ বিশ্বাসের দ্বারা জীবনটা সমগ্র ও সার্থক হ'য়ে উঠল তারই পরিচয় না দিয়ে দিলীপকুমার আশ্রয় খুঁজতে যান এই সব দার্শনিকদের কাছে! এ সব বিষয়ে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতাই হল একমাত্র আশ্রয়। অন্যের কাছে তার মূল্য ভিন্ন হতে বাধ্য, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া চলে না। সেই জন্য মনে হয়, critical mysticism ব'লে একটা মত তৈরি হওয়া অসম্ভব নয়।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে আর-একটি বিরোধের বিষয় রয়েছে। অনেকে সন্দেহ করছেন, বিজ্ঞান যে ভাবে কার্যকারণ-সম্বন্ধ বেঁধে দিয়েছে তাতে ব্যক্তির পক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন স্বাধীনতাই থাকছে না। এডিংটনের Physics has gone off the gold standard প্রভৃতি শ্রুতিমধুর বাণী সত্ত্বেও, বিজ্ঞান এখনও একটা ব্যক্তিসম্পর্করহিত কার্যকারণ-সম্বন্ধের দ্বারা পরিচালিত হবে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 'পরিচয়'-এর পূর্বের সংখ্যায় Planck-এর The Universe

in the Light of Modern Physics বইখানির মূল বক্তব্য সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। Planck-এর বক্তব্য এতই মূলবান যে, তাঁর বই থেকে কয়েক লাইন তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা।

"In my opinion, therefore, it is essential for the healthy development of Physics that among the postulates of this Science, we reckon, not merely the existence of law in general, but also the strictly causal character of this law··· Further, I consider it necessary to hold that the goal of investigation has not been reached until each instance of statistical law has been analysed into one or more dynamic laws."

এটা determinism-এর কথা। আমি ভাল করেই জানি যে, দার্শনিকের determinism আর বৈজ্ঞানিকের determinism ঠিক এক বস্তু নয়, যে-অর্থে দার্শনিক determine কথাটি ব্যবহার করেন, বৈজ্ঞানিক সে-অর্থে ব্যবহার করেন না। কিন্তু সাধারণে এই পার্থক্যকে শ্রদ্ধা করেন না; অর্থশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব-বিদেরাও করছেন না। তাঁরা হয়ত ঠিক কথাই বলেন, কিন্তু তাঁরা যে কারণ দেখান সেটা ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। তাঁরা বিজ্ঞানের ভুল দেখান, মানুষকে যে বৈজ্ঞানিক এবং সংখ্যাশাস্ত্রের নিয়মে আবদ্ধ করা যায় না, কখনও যাবে না, কেননা তার পুরুষকার প্রবল, এই সব দোহাই পেড়ে। 'But the question of free-will is not concerned with the question whether there is such a definite connection, but whether the person in question is aware of this question।' এই জ্ঞানটুকু ব্যক্তিগত, অর্থাৎ মানুষের গোপন কথা— কিন্তু fact। সেইজন্য এডিংটনের, জীন্‌সের ঝুটা ধর্মবুদ্ধির চেয়ে প্ল্যাঙ্কের ethical law-এর প্রতি আস্থা আমার কাছে বেশী যুক্তিগত ব'লে মনে হয়। Ethical law-এ বিশ্বাস করলেই বিজ্ঞানের বাঁধাধরা কার্যকারণ-সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হবার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা মানতে হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠছে— বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে বিরোধগুলি রয়েছে তাদের সমন্বয় হবে কিসে? সভ্যতা কিছু চিরকাল বিরোধের মধ্যে অবস্থান করতে পারে না। যাঁরা সভ্যতা বলতে মানুষেরই সভ্যতা বোঝেন তাঁরা বলেন যে, একমাত্র ব্যক্তিই এই সমন্বয় সাধিত করবে। আমার মনে হয় যে, অলড্যুস্ হাক্সলি ও রাসেল এই ব্যক্তিগত মানবধর্মে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানব-সমাজের যে যে দোষ বর্তাতে পারে তাই দেখাতে গিয়ে, বিশেষ ক'রে শেষ

অধ্যায়গুলিতে রাসেল যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাই দেখে মনে হয় যে, তিনি মুখ্যত বিজ্ঞানের নৈয়ায়িক হ'লেও বাস্তবিকপক্ষে নীতিবিদ্ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। সমাজে থাকতে হ'লে যে সব values-এর ওপর জোর দিতে হয় তার এত চমৎকার বিবরণ ইংরেজী সাহিত্যে আর কোথাও পড়েছি ব'লে স্মরণ হয় না। একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তির জীবনের মধ্যেই বিজ্ঞান তার স্বরচিত নিয়তির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে, এবং সেই মুক্তির সাহায্যে মানুষ এক নতুন সমাজ-ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে— এইটাই হ'ল রাসেলের সমন্বয়। হাক্সলিও রাসেলের সমধর্মী। বিজ্ঞানের standardisation, যার প্রতীক হচ্ছেন হেনরী ফোর্ড, মানুষের ওপর বৈজ্ঞানিক সমীকরণের চাপ, যার প্রতীক হ'ল ওয়াট্‌সন, বৈজ্ঞানিকের অত্যাচার যার প্রতীক হ'ল Controller— এ সবের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে Barnard ও Savage, পুরুষ ও স্ত্রীর ভালবাসা, আত্মবলিদান, দুঃসাহস, মানুষের খামখেয়াল, শেক্সপীয়র, অর্থাৎ সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি গোটাকয়েক মামুলী জিনিস। বিজ্ঞানের অত্যাচারের বিপক্ষে মানুষ যদি এখন থেকে সাবধান না হয়, তাহ'লে তার কী দুর্দশা হবে যদি কেউ ভাবতে চান তবে তিনি যেন হাক্সলির বই পড়েন। আজ পর্যন্ত হাক্সলি যত বই লিখেছেন তার মধ্যে এইটাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ রকম নিষ্ঠুর বই সচরাচর চোখে পড়ে না। এত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমরা খানিকটা সহৃগুণ প্রত্যাশা করি। হাক্সলির কিন্তু সহৃগুণ নেই। কিন্তু সব দোষ সহ্য হয় যখন Savage-এর 'I come to bring you freedom' মহাবাক্যটি মনে পড়ে। হাক্সলির বইখানির সাহিত্যিক দোষগুণ দেখাবার স্থান অন্যত্র, তাই শুধু ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ সম্পর্কে তাঁর মত যতটুকু আলোচনা করা যায় তারই আভাস দিলাম। ২৮৩ পৃষ্ঠায় Savage বলছে, 'But I like the inconveniences'। Controller বল্লেন, 'We don't, we prefer to do things comfortably'? Savage তার উত্তর দিলেন, 'I want God. I want poetry; I want real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin! 'In fact,' said Mustapha Mond, 'you're claiming the right to be unhappy!' 'All right, then,' said Savage definatly, 'I am claiming the right to be unhappy!' মোস্তাফা মণ্ড অসুখী হবার অর্থ বোঝাবার পরও যখন Savage বল্লে 'I claim them all,' তখন 'You're welcome' ছাড়া মণ্ডের মুখে কোন উত্তর জোগাল না। বৈজ্ঞানিক-ব্যবস্থাপত্রে অন্য কোন উত্তর লেখা আছে কিনা জানি না।

যে উপায়ে সমালোচনা শেষ করলাম তাতে অনেকে সন্দেহ করবেন যে হয়ত

বা আমি হাক্সলির মতো **'Truth is a menace, science a public danger'** বলছি। আমার মত তা নয়। আমার মত এই যে, নির্মমভাবে তর্কবুদ্ধি খাটালে যে অবস্থাতেই আসা যাক না কেন সেই অবস্থাতেই দাঁড়াবার সাহস থাকা চাই, তবেই মানুষ সৎ হয়। সৎ হ'লেই ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ মিটে যায়।

পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯

The History of the Russian Revolution—By Leon Trotsky. (Victor Gollancz) 3 volumes.

১

বিংশ শতাব্দীতে বেঁচে, ক্ষোভ করবার বিশেষ কোন কারণ নেই আমার বিশ্বাস হয়েছে। কিছু না হোক, মহাযুদ্ধ ও তার কর্মভোগ, রুশিয়ান বিপ্লব ও তার ফলে নব্য-রুশিয়ার অভ্যুত্থান, চীন, ভারতবর্ষ ও মুসলমান প্রধান দেশের নব-জন্ম, বিজ্ঞানের প্রসার, এবং শ্রমিকদলের আত্মপ্রতিষ্ঠা ত' লক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি! এইগুলির মধ্যে যে কোন ঘটনা পূর্বের যে কোন শতাব্দীর যে কোন যুগকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারত। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে প্রত্যক্ষ ঘটনার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের অসুবিধা হয়। সমসাময়িক ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বের নিগূঢ় কার্যকারণ সম্বন্ধটি পরিস্ফুট হয় না। যা চোখের সামনে ঘটছে তাতে স্বাধীনতা পূর্বাপর পারম্পর্যের বাইরে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হয়, তার মধ্যে অতীতের রেশ নেই; ভবিষ্যতের আভাস নেই; সে কেবল স্বপ্রধান। যার পূর্বস্মৃতি নেই তার আবার ইতিহাস কি? ইতিহাস ত' স্মৃতিশাস্ত্রেরই একটি রূপ! অতএব সমসাময়িক ঘটনা হয় কোন দাগ না রেখে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়, না হয় দৈনিক খবরের কাগজের পুরানো তাড়ার মধ্যে আত্মগোপন করে। সাধারণ লোকের পক্ষে ইতিহাসের ধারা বর্তমানের বালুচরে লুপ্ত হয়। কিন্তু অ-সাধারণ ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। অ-সাধারণ ব্যক্তি অর্থে প্রকৃত ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিকের কাছে ঘটনাবলীর মধ্যে কোন বিরতি নেই, একটি ঘটনা অন্যটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, শ্যামদেশের যমজের মতই। অতীত বর্তমানের মধ্যে ওতপ্রোত, অতীত-বর্তমানের কৃপায় ভবিষ্যৎ প্রাণবন্ত। ইতিহাসের এই তন্ময়তা, এই অন্তর্ভূতি না বুঝলে সমসাময়িক ইতিহাস বোঝাও যায় না লেখাও যায় না। এক কথায় প্রত্যেক ঐতিহাসিকের একটি দেখবার ভঙ্গি অর্থাৎ দর্শন থাকা চাই। ইতিহাসের যতপ্রকার দর্শন হয়েছে তার মধ্যে মার্কসের সংশোধিত হেগেলের মতবাদই বর্তমান সভ্যতার উপযোগী। ট্রটস্কীর ইতিহাস পূর্বোক্ত মতবাদসম্মত।

শ্রেণীবিরোধের দ্বারা জরাজীর্ণ রুশিয়ান সমাজের পুনর্গঠন, এবং সোভিয়েটরূপী নব্য-অনুষ্ঠানের সাহায্যে জনসাধারণের স্বহস্তে মাত্র আটমাসের মধ্যে রাজ্যের সমগ্র ভার গ্রহণ এই হল ট্রটস্কীর প্রতিপাদ্য। বিষয়বস্তুর পরিবর্তে প্রতিপাদ্য বলবার অর্থ এই যে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী, জুলাই ও অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে যে ঐক্য আছে সেটি ঐতিহাসিক ন্যায়ের সঙ্গতি, ঋতুর পরির্তন নয়।

মার্কসের মতবাদকে গ্রহণ করেই ট্রটস্কী এই আটমাসের ঘটনাবলীকে গ্রথিত করেছেন বলে ট্রটস্কীর মতন লোকের প্রতি অবিচার করা হয়। ট্রটস্কীর নিজস্ব দেখবার ভঙ্গিও আছে, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নতুনত্বও আছে। ট্রটস্কী একজন সাহিত্যিক এবং উঁচুদরেরই সাহিত্যিক। সাহিত্যের দিক থেকে এই বইখানির মূল্য খুব বেশী। বিপ্লব-যুগের গতির দ্রুতহার তাঁর লেখায় দ্রুততর হয়েছে; বিপ্লব-যুগের নায়কত্ব তাঁর সজ্জিত ঘটনা-বিন্যাসে ধরা পড়েছে; এই অ-সাধারণ যুগের নায়কবৃন্দের চরিত্রগুলি তাঁর কলমে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বইখানি একটি উৎকৃষ্ট চিত্রশালা, সুশ্রী-বিশ্রী মহান ও ক্ষুদ্র, কোন চরিত্রই বাদ পড়েনি এবং সবগুলিই জীবন্ত। লেনিন থেকে আরম্ভ করে চাষী, মজুর ও পদাতিক সকলের ওপরই তাঁর সমান দৃষ্টি, কারুর ওপর জ্বালার, কারুর ওপর কৃপার, কারুর ওপর ভক্তির, কারুর প্রতি ঘৃণার; সে দৃষ্টির জোরে সকলেই যেন অতীতের কবর থেকে লাফিয়ে উঠে এসেছে। এই প্রাণদানের দৃষ্টি মার্কসের কোন শিষ্যের আছে বলে মনে পড়ছে না। মার্কসেরও ছিল না, কেননা তিনি আর সব কিন্তু হতে পারেন, আর্টিস্ট তিনি নন। কোন মতবাদকে অনুকরণ করলেই আর্টিস্ট হওয়া যায় না, যদিও আর্টিস্ট হতে গেলে নিজের একটা মত থাকা চাই, কিংবা পরের মতকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করা চাই যাকে নিজের মতই বলা চলে। ট্রটস্কীর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির বেশী সুখ্যাতি করতে গেলে লোকের মনে একটা ভুল ধারণা আসতে পারে। ইতিহাসকে যদি মহামানবের লীলাভূমি হিসাবে দেখা যায়, তা হলে পোর্ট্রেট আঁকার বিশেষ সুবিধা হয়। যেমন কার্লাইলের হয়েছিল। কিন্তু যদি কোন ঐতিহাসিক মহামানবে বিশ্বাস না করে জনমানবে বিশ্বাস করেন তবে তাঁর চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে বিশেষ অসুবিধা। গল্পলেখক ও নভেলিস্ট এ অসুবিধা অতিক্রম করতে পারেন ও করেছেন, যেমন টলস্টয়, বিশেষত তাঁর "ওয়ার এণ্ড পীসে"। সেখানে নেপোলীয়নকে ছোট করে একটি অজ্ঞাতকুলশীল সৈনিককে বড় করা হয়েছে, তার ওপর আলোর সমগ্র উজ্জ্বলতা নিক্ষেপ করা হয়েছে। আলোক-সম্পাতের পাত্রনির্বাচনে টলস্টয়ের আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সত্যের অপেক্ষা মতবাদের প্রতিশোধের ক্রিয়াই বেশী। তবু টলস্টয় বড় লেখক, তাই রক্ষা! ট্রটস্কীর নায়ক

কোন ব্যক্তি নয়, জনসাধারণ। তাঁর ইতিহাস জন-সাধারণের ক্রীড়াভূমি। তিনি কার্লাইলের মতন অতিমানবে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে কোন ঘটনাই Special Creation নয়। তিনি নিয়তিতে আস্থাবান। তাঁর মতে নেতা হচ্ছেন পূর্বতন ইতিহাসের সৃষ্ট পুরুষ। এমন কি লেনিনও তাঁর মতে আকস্মিক ঘটনা নন। এই ধরনের মত পোষণ করলে চরিত্রাঙ্কন অতিশয় শক্ত হয়ে ওঠে। অতীত ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যোগ দেখাতে গেলে চরিত্রের বিশেষত্ব অঙ্কন করা যায় না। ট্রটস্কীর হাতে এই শক্ত কাজটি কিন্তু অতি সহজ হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে আমরা জনসাধারণের বিপ্লবী মূর্তি দেখতে পাই। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, ভয় ভাবনা,প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তন, তার আশা ভরসা কিছুই আমাদের কাছে গোপন থাকে না ; অথচ সেই সঙ্গে লেনিন, কেরেন্‌স্‌কী, মিলিউকফ, কর্নিলভ, স্ট্যালিন, ক্যামনেভ, বুকানান ছবির ফ্রেম থেকে নেমে এসে বিপ্লবের মঞ্চে বিচরণ করতে থাকে। এ যেন টিন্‌টরেটোর ছবি দেখছি, হগার্থের নকশা দেখছি। কোন একটি বিশেষ এবং বিপরীতধর্মী মতকে অমন দৃঢ়ভাবে পোষণ করার সঙ্গে এমন চরিতাত্মক অন্য কোথাও সম্ভব হয়েছে কিনা জানি না। সাহিত্যের দিক থেকে ট্রটস্কীর বই সম্বন্ধে অন্য কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এ ছাড়াও ট্রটস্কীর অন্য ধরনের নিজস্ব রয়েছে। সেটি মতের দিক থেকে কার্ল মার্কস যতদূর পড়েছি তাতে Dual Power, (বীরবলের দ্বু-ইয়ার্কী বনাম কার্টিসের ডায়ার্কি) স্থায়ীবিপ্লববাদ, কিংবা law of combined development-এর স্থির-সন্ধান পেয়েছি বলে মনে হয় না। অবশ্য আছে, কিন্তু অত স্পষ্টভাবে নয়। এও মনে হয় না যে কার্ল মার্কস কোন পিছিয়ে পড়া জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। বরঞ্চ তাঁর মতে রুশিয়ার মতন শেষ বেঞ্চের জাতির আমূল পরিবর্তন সবার শেষেই হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল শ্রেণীবিরোধের ফলে ইংলণ্ডে ও জার্মানীতেই ধনীসম্প্রদায় সর্বপ্রথম হার মানবে এবং শ্রমিকের জয় হবে। তা না হয়ে রুশিয়াতে হল। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার ব্যাখ্যা হয়ত কার্ল মার্কসের মতের মধ্যেই ছিল— কিন্তু সাধারণের অজ্ঞাতে। ট্রটস্কীর লেখায় সে ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার অন্তত প্রথম পরিচয়। ব্যাখ্যাটি হল এই— রুশিয়ার মতন কৃষিপ্রধান দেশের মধ্যে সম্ভোপভোগী শ্রেণী সবল হয়ে উঠতে পারেনি, সেইজন্য একধারে শহরের অল্পসংখ্যক ধনী ও অন্যধারে শ্রমিকচাষীর মধ্যে অন্য কোন শ্রেণীর অন্তরায় ছিল না, এবং সেইজন্যই বিরোধের স্বরূপ অত শীঘ্র অত উগ্র এবং সমগ্র-ভাবে ফুটে উঠতে পেরেছিল। মার্কসের মতে যে ধারাটি বহু শতাব্দীতে বিস্তৃত, সে ধারাটি আটমাসেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ ঘটনা ঘটল নানা বাধা সত্ত্বেও,

কেননা ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লবের ফলভোগ করলেন বিপ্লবীর দল নয়, স্যোশিয়াল ডেমোক্রেট মেনসেভিক ক্যাডেটের দল, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। জুলাই মাসে জনসাধারণ বুঝতে পারলে যে Dual Power তাঁদের জন্য নয়। তাঁরা যে ক্ষমতা অর্জন করেছেন সেই ক্ষমতার মুখোশ প'রেই ডিমক্রাসীর ধুরন্ধরগন নিজেদের শ্রেণীর ক্ষমতাবিস্তারে ব্যস্ত। সেই থেকে সোভিয়েটরা লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের শত্রুদের মুখোশ খসাতে লেগে গেল, শক্তি অর্জন করে নিজেদের হাতেই রেখে দিলে। তারা নিতান্তই সাবধানী হল। "দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অন্যের কাছে রাখে?" বিপ্লবের নিয়মই হল এই, ঘুমোলেই ক্ষমতা চুরি হয়ে যায়, তখন দ্বিগুণ খাটুনী। ট্রটস্কীর মতে সার্থক বিপ্লব মানে স্থায়ী বিপ্লব। যে সব জাতি নিতান্ত অসমভাবে অগ্রসর হচ্ছে, যেসব দেশের এক কোণে কলকারখানার প্রাদুর্ভাব, বাকী সর্বত্র আদিম যুগের কৃষি ও পশুপালন, যে সব জাতির এক শ্রেণী অত্যুন্নত, বাকী সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিতান্ত গরীব তারা সকলে ট্রটস্কীর law of combined development এ আশান্বিত হবে। তর্কের খাতিরে একে law না বল্লেও একে বড় ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে দেখতে বাধে না। আর কিছু হোক আর না হোক এই তথ্যে বিশ্বের বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক নিয়তির দুর্নিবার গতিকে শ্রদ্ধা করা হয়েছে। পুরোপুরি দুর্নিবার নয় অবশ্য, কেননা নিয়তির নিয়মকে জানলেই নিয়তিকে অতিক্রম করা যায়। আজ যদি ট্রটস্কীর হাতে বিপ্লব নিয়তির আকার ধারণ করেও থাকে তা হলেও তাঁর লেখায় বিপ্লবের যে তথ্যগুলি ফুটে উঠেছে তাদের সাহায্যে দেশ কাল ও পাত্রানুযায়ী জনসাধারণের কর্তব্য ও স্বাধীন প্রচেষ্টার ধারা নির্ধারণ করা শক্ত হয় না।

তা হলে এ বইগুলিকে কি বলব— ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, না খবরের কাগজের বাদানুবাদ? একদল বলছেন—একে ইতিহাস বলাই চলে না, কেননা মতগুলি পক্ষপাতদুষ্ট, খানিকটা সত্য, কেননা উত্তমপুরুষ ব্যবহার না করলেও অনেক স্থলে লেখকের পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে, বিশেষ করে স্ট্যালিনের বিষয়ে। কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট, হওয়া সত্ত্বেও মেকলের ইতিহাস উচ্চশ্রেণীর ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। তা ছাড়া একটা কথা মনে রাখতে হবে যে রুশ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নায়কের পক্ষপাতদুষ্টবর্ণনাও পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকের খনি। পরের কোন লেখকই এই বইখানিকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না, ভেতরকার খবর জানতে হলে ট্রটস্কীর বর্ণিত কাহিনীর কাছে হাত পাততেই হবে। এক দল ট্রটস্কীর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামতে আপত্তি তুলেছেন। সে আপত্তির জবাব আছে। ট্রটস্কীর সমাজতত্ত্ব পুরাতন সমাজভঙ্গের এবং নূতন সমাজ গঠনের। আমরা সমাজ-

তত্ত্ববিষয়ক যে সব গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত সেগুলির বিষয় সমাজরক্ষা। সামাজিক বিপ্লবের বিষয়ে এমন উৎকৃষ্ট বই বোধ হয় আর কখনও লেখা হয়নি।

ট্রটস্কীর দর্শনের সঙ্গেও পুরাতন জড়বাদের পার্থক্য আছে। জনসাধারণকে অমন গভীরভাবে ভালবাসা জগতের কল্যাণচিন্তায় অমন গভীরভাবে নিমগ্ন হওয়া, চিন্তার সঙ্গে কর্মের অমন অঙ্গাঙ্গি মিলন, সুদূর ভবিষ্যতের আশায় অমন সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধপরিকর হওয়া, নিষ্কাম কর্মের অমন দুর্দম প্রেরণা, সংজ্ঞার অমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ইতিহাসের নিয়মগুলির অমন অদ্ভুত আবিষ্কার, এবং তাদের ওপর চরম বিশ্বাসস্থাপনের পরও সজ্ঞপুরুষকারের ওপর অমন প্রগাঢ়শ্রদ্ধা— এ-সব গুণগুলি আদিম জড়বাদের সৃষ্ট নয়, ফরাসী জড়বাদীরও নয়। দর্শনের কৃপায় যদি এই গুণগুলি উৎপন্ন হয় তা সে দর্শনের যা নাম হোক না কেন আমাদের সেটি শ্রদ্ধার্হ। বইখানির সাহিত্যিক গুণের কথা পূর্বেই লিখেছি।

আর খবরের কাগজের বাদানুবাদ? বার্নাড শ এবং ওয়েলসের কৃপায় নাটক-নভেলেও জার্নালিজমের ছোঁয়াচ লেগেছে। এতে ভয় পাবার কথা নেই। শুদ্ধ আর্টের দিন গিয়েছে সমাজকে ত্যাগ করে, সমসাময়িক ইতিহাসকে বর্জন করে বড় সাহিত্য হয় না এবং সমসাময়িক সে-ইতিহাস বাদানুবাদে মুখরিত। যে দর্শন জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছে সে দর্শন জীবনে কালান্তরে দলীয় দর্শন হবেই হবে। যে মৃত তার সম্বন্ধেই দুটি মত থাকতে পারে না, যে বেঁচে আছে তারই সম্বন্ধে ভাল-ভাবে বেঁচে আছে কি মন্দভাবে বেঁচে আছে এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে।

প্রত্যেক বাঙালী পাঠককে তিন ভলুমের এই বইটি পড়তে অনুরোধ করি। লেখার গুণে কাজটা খুব শক্ত হবে না। এ বইটা সেইশ্রেণীর যে শ্রেণীর বই ইতিহাস তৈরি করতে সমর্থ। এই ক্ষুদ্র সমালোচনায় বইটির মহত্ত্ব প্রকাশ করতে পারলাম না। সেজন্য আমি অবশ্য লজ্জিত নই, আমি শুধু অপারগ।

পরিচয় শ্রাবণ, ১৩৩০

The Reconstruction of Religious Thought in Islam—By Sir M. Iqbal (Oxford University Press). The Mystical Life—By Roger Bastide (Jonathan Cape). An Examination of the Mystic Tendencies of Islam in the Light of the Quran and Traditions —By Prof. M. M. Zuhuruddin Ahmad Andheri (Bombay). The Transformation of Nature in Art—By A. K. Coomerswamy Harvard University Press).

জাপানী চন্দ্রমল্লিকার সৌন্দর্য দুভাবে উপভোগ করা যায়, এক, সব কুঁড়ি ছেঁটে মাত্র ফুল ফুটিয়ে, এবং একটিও না ছিঁড়ে সব কুঁড়ি ফুটতে দিয়ে। প্রথম উপায়ে ফুলটি হয় বড়, তখন তার অতিকায়ত্বই হয়ে ওঠে আনন্দের মাত্রা ও উপাদান। দ্বিতীয় উপায়ে ফুলের আকার ছোট হয়, কিন্তু ক্ষুদ্রতার ক্ষতিপূরণ সম্ভব গুচ্ছের বিচিত্র সম্ভারে। মহাত্মাজী ও হিটলারের কাণ্ড দেখে এবার মালীকে বলেছি—মহাকায় এক-এ আর কাজ নেই, গোছাই কর। তাই বইগুলির একত্র সমালোচনা করছি, নচেৎ প্রত্যেক বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা সম্ভব, উচিতও বোধহয়, কিন্তু মেজাজের উপর হাত নেই। মহাত্মাজীর বাণপ্রস্থের পর কংগ্রেস সাধারণ-তন্ত্রের পাল্লায় যখন জন-সাধারণ বিধ্বস্ত হচ্ছে বুঝব, তখন আবার না হয় প্রত্যেক বইএর মর্যাদা অনুসারে পৃথক সমালোচনা লিখব। তার পূর্বে নয়।

য়ুরোপে ধর্ম নিয়ে আলোচনা একটু বেশী রকমেরই চলছে। যুদ্ধের পর ধর্ম-সংক্রান্ত আগ্রহাতিশয্যের মধ্যে একপ্রকার স্নায়ুবিকার বর্তমান ছিল। কিন্তু এখন যা দেখছি সেটা ধাতস্থ প্রকৃতির স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা, এর মধ্যে না আছে বাচালতা, না আছে প্রতিক্রিয়ার অবসাদ, না আছে প্রতিবাদের তীব্রতা। পৃথিবীর আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে এই মনোভাবের কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ সুস্পষ্ট নয়। এই ঔৎসুক্য বণিক-সম্প্রদায়ের স্বার্থপ্রসূত নয়, শ্রমিক-সম্প্রদায় ও জনসাধারণকে ঠকাবার ফন্দী নয়, মূর্খদের আফিং সেবন করানো নয়। এই কৌতূহলকে নির্যাতিত, প্রপীড়িত, পদদলিত দরিদ্রের যুক্ত্যাভ্যাস বলতে কুণ্ঠা হয়। এই নতুন ধারার পিছনে আছে সেই প্রচণ্ড শক্তি যার জোরে য়ুরোপ অত বড়। তাকে জ্ঞানের গরজ কিংবা আজকালকার মনোজ্ঞ ভাষায় বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বলা চলে।

য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা বিরুদ্ধভাব চলে আসছিল। জ্ঞানের অর্থ ধরা হয়েছিল দর্শন, এবং দর্শন বলতে অন্তর্মুখিনতা ও আদর্শবাদই সাধারণে বুঝত। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ-বিজ্ঞানের কৃতিত্ব ও কীর্তি কমানোর জন্য সাধারণের কাছে অর্থ গেল বদলে। অন্তর্মুখী হল বহির্মুখী, ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর, আদর্শবাদ হল রিয়ালিজম। কিন্তু যে সভ্যতা জীবন্ত সেখানে কোন মতই চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাই যুদ্ধের পূর্ব থেকেই Aliotta-র ভাষায় একটা Idealistic Reaction against Science আসছিল। যুদ্ধের মধ্যেও এই প্রতিক্রিয়া লুপ্ত হয় নি, তবে ভিন্ন ও বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। আজ রূপটি সহজভাব ধারণ করছে মনে হয়। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগই য়ুরোপীয় ধর্মালোচনার প্রধান প্রেরণা।

এ দেশেও পরা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু কোন পার্থিব জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। বিজ্ঞান বলতে আমাদের শাস্ত্রে বিশদরূপে জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই সূচিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র বিদ্যা ওদের অপরা বিদ্যার সামিল হল। কারণ সূচনা লুপ্ত হওয়ার মতন সহজ কাজ আর নেই। আমরা আজ য়ুরোপীয় উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও mechanistic মনোভাবকে বরণ করেছি। লাভ কতটা হয়েছে জানি না কিন্তু ক্ষতিটা সুস্পষ্ট। আমরা আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে ঘৃণা করতে কিংবা হেসে উড়িয়ে দিতে শিখেছি, নতুন নতুন কলকব্জা, নতুন থিওরীও তৈরি করছি না; আমাদের মধ্যে যাঁরা ওদেশের খবর রাখেন তাঁরা এডিংটন জীন্স পড়ে সমগ্র বিজ্ঞানেরই গলদ দেখছেন, এবং হাঁচি টিক্‌টিকির ব্যাখ্যা করছেন হাইসেনবার্গের মতামত দিয়ে, ওদের গরজ জ্ঞানের, আমাদের তাগিদ মাত্র আত্মসম্মানের। যে জাতি সর্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে আমরাও বৈজ্ঞানিক হতে পারি, আমাদেরও ধর্ম আছে এবং সে ধর্মের সঙ্গে তোমাদের আধুনিকতম বিজ্ঞানের গরমিল নেই, মিল আছে, সে জাতির পক্ষে নতুন চিন্তা করবার অতিরিক্ত শক্তি থাকা অসম্ভব। আমাদের চিন্তা বদ্ধ রয়েছে। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য হল শুদ্ধভাবে চিন্তা করা— তাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন? যে বইগুলি পড়ে আমার ঐ সব কথা মনে উঠেছে সেগুলিতে স্বচ্ছ চিন্তার ছাপ বর্তমান। একই ধরনের ছাপ নয়, কোথাও বেশী, কোথাও কম— কিন্তু আছে— এইজন্যই আমি কৃতজ্ঞ। লেখকদের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য যে এক, তাও বলছি না।

স্যার মহম্মদ ইকবালের মতে ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানের কোন আন্তরিক বিরোধ নেই। কারণ হল দুটি— The birth of Islam is the birth of the inductive intellect, এবং কোরানে আছে constant appeals to Reason, History, Nature and Experience। যুক্তির দিক থেকে যেমন ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই concrete, finite এবং objective মনোভাব, ইতিহাসের দিক থেকে তেমনি গতিশীলতা, অভিজ্ঞতার দিক থেকে তেমনি স্বাধীনতা, প্রকৃতির দিক থেকে তেমনি ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য এবং পর্যবেক্ষণ-শীলতা। বলা বাহুল্য এই হিসেবে বর্তমান বৈজ্ঞানক সভ্যতার সঙ্গে প্রকৃত মুসলমান সভ্যতার কুটুম্বিতা স্থাপন সম্ভব। আরব-সভ্যতার দানের কথাও আমরা সকলেই জানি। ডাঃ ইক্‌বালের প্রতিপাদ্য হল এই:

The truth is that the religious and scientific processes though involving different methods, are identical in their final

aim. Both aim at reaching the most real and to both the way to pure objectivety lies through what may be called the purification of experience.

এই মন্তব্যটির অর্থ পরিষ্কার করবার জন্য অভিজ্ঞতাকে তিনি শ্রেণীবিভাগ করেছেন as a natural fact, significant of the normally observable behaviour of reality and experience as significant of the inner nature of reality। প্রথমটির জন্য যেমন অভিজ্ঞতার পূর্বতন মানসিক ও দৈহিক ঘটনা বুঝতে হবে, দ্বিতীয়টির জন্য তেমন অভিজ্ঞতারই আন্তরিক সামঞ্জস্য। তারপর ডাঃ ইক্‌বাল বলেছেন :

The scientific and the religious processes are in a sense parallel to each other. Both are really descriptions of the same world with this difference only that in the scientific process the ego's stand point is necessarily exclusive whereas in the religious process the ego integrates its competing tendencies and develops a single inclusive attitude resulting in a kind of synthetic transfiguration of his experiences.

এই synthetic tarnsfiguration-ই হল ধর্মের গূঢ় কথা— এবং এই— জন্যই ডাঃ ইক্‌বাল বর্তমান Psychology of Religionকে— বিশেষত নব মনোবিজ্ঞানের Analytical Psychologyকে অসম্পূর্ণ বিবেচনা করেন। A careful study of the nature and purpose of these really complementary processes shows that both of them are directed to the purification of experience in their respective spheres—অর্থাৎ বাহ্যিক ও আন্তরিক ব্যবহার। পূর্বোক্ত উপায়ে ডাঃ ইক্‌বাল পরীক্ষামূলক জ্ঞান এবং বিশদ জ্ঞানকে সমন্বয় করেছেন। ডাঃ ইক্‌বালের উৎকৃষ্ট ভাষা, অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ডাঃ ইক্‌বাল বলেছেন যে বর্তমান মুসলমান সমাজে ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ Constant Appeal of Nature, History, Reason and Experience মর্মে মর্মে গ্রাহ্য করা একান্ত কর্তব্য। আমার বিশ্বাস এই কর্তব্যটি হিন্দুসমাজেও মধ্যে মধ্যে স্মরণ করলে মন্দ হয় না। কোরানের ব্যাখ্যায় ডাঃ ইক্‌বাল কতটা নৈষ্ঠিক কিংবা শাস্ত্রানুযায়ী আমার বিচার করবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ইসলাম সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যা বিদেশী বই পড়েছি তার জোরে আমি তাঁর বর্ণনার সমর্থন করিতে পারি।

Bastideএর বইখানির সার্থকতা এই যে তাতে mystical অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখা হয়েছে— 'the book is planned to be one of pure science'। বলা বাহুল্য যে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের অর্থ ই হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একাধিক প্রকারের, তার মধ্যে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ পূর্বে থেকেই বিচার করা চলে না— ক্ষেত্রানুযায়ী বিচার সম্ভব। Bastide যেটি অবলম্বন করেছেন তাকে তুলনামূলক পদ্ধতি বলা চলে। ফ্রান্সে এই পদ্ধতির অবলম্বনে উৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে— যেমন Masson-Ourselএর Comparative Philosophy। খ্রীস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ও হিন্দু (লেখক শেষোক্ত দুটি ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বোধ হয় বিশ্বাস করেন না) মিস্টিক্‌দের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করে বাস্টিড্ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

Indeed in all Mysticism, there is an indentical psychalogical experiences···I am almost inclined to make this experience consist of a certain [কপি দুষ্পাঠ্য] sentiment in which there are two distinct elements : on the one hand [কপি দুষ্পাঠ্য] of depersonalization, or annihilation of the self, which being emptied [কপি দুষ্পাঠ্য] normal thoughts and emotions causes the mystic to feel that he is liviry life quite different from his usual one. On the other hand he does not to cause of this lose himself in an utter void : other emotions and thoughts [কপি দুষ্পাঠ্য] within him. But he does not feel them to be his own : they seem [কপি দুষ্পাঠ্য] to him and he submits to them passively.

The crises and raptures which are part of mistical experience [কপি দুষ্পাঠ্য] not constantly recuring facter of Mysticism but something that is merely ephemeral. Its versessence is that it is *a method of life and knowledge* an attempt by man to conquer man, and an effort towards *negation* [দুষ্পাঠ্য] *as towards liberation*. Finally, it is an heroic attempt to *transcend* [দুষ্পাঠ্য] and the world, and then, if the transcendent is found, to apprehend it [দুষ্পাঠ্য] triumphant intuition.

এই দুটি ধারার প্রকৃতি এবং ইতিহাস আলোচনার পরে বাস্টিড্ বলেছেন যে মিস্টিক অভিজ্ঞতার প্রথম অবস্থায় নানাপ্রকার স্নায়ুবিকার জুড়ে থাকলেও পরিণত অবস্থায় সেগুলি খসে যায়।

Italicised অক্ষরগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি— প্রথমত একটি উপায়, তারপর জীবন-যাত্রার এবং জ্ঞানের উপায়, শেষে এই জীবনকে অতিক্রম করার উপায়। বাস্টিডের effort towards negation as well as towards liberation, ডাঃ ইক্‌বালের purification of experienceএর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্তরের বস্তু হলেই যে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত হল, কিংবা বিজ্ঞানের বস্তু ও পদ্ধতি থেকে পৃথক হল, এমন কোন কথা নেই। Introspection যে পদার্থবিজ্ঞানেরও সুপরিচিত পদ্ধতি একথা আজকাল সবাই জানে এবং Experimental Psychologyতেও প্রশস্তরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার খবর পাওয়া যায় Woodworthএর Contemporary Schools of Psychologyতে। Woodworth যাকে Existential School বলছেন, পদ্ধতি লক্ষ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে Introspectionএর দোষগুলি তর্কবুদ্ধির সাহায্যে দূর করা সম্ভব। আদৎ কথা— শুদ্ধ পদ্ধতি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুদ্ধির দুটি উপায়— এক ন্যায়তর্ক বিচার— দ্বিতীয় যন্ত্র। Mysticismএও তাই বলা হয় চিত্তশুদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে নিজেকে নিয়ে (সাধনা), অতএব এখানে বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। বাস্টিড্ যাকে subconscious বলেছেন সেটা নির্বুদ্ধির ভাণ্ডার নয়।

তা হলে Mysticism এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পদ্ধতি হিসাবে অর্থাৎ methodologically, পার্থক্য কম। উপকরণ নিয়ে পার্থক্য আছে। আর আছে লাভে— [দুষ্পাঠ্য] oneslf and the world, and then, if the transcendent is found, to apprehend it with a triumphant intuition। এখানেও আমি মিল পাই। আইনস্টাইন অঙ্ক কষবার সময় কি নিজের ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করেন না? তাঁর যে intuitionএই সত্যের সাক্ষাৎ হয়, এবং সাক্ষাৎ হলে তিনি যে অতিরিক্ত আনন্দ পান এ কথারও প্রকাশ আছে। তাই আমার মনে হয় Mysticismএর বিশেষ দাবী অতিক্রমে নয়, ডাঃ ইক্‌বালের ভাষায় synthetic transfiguration of experienceএ। এই অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমন্বয় ও পরিবর্তনের quality বিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই— কারণ সকলেই মানে যে Mysticismএর অভিজ্ঞতা বই পড়ে হয় না, তা অর্জন করবার জন্য সাধনা করতে হয়। তবে জহরুদ্দিন আহমদ সাহেবের সুফী Mysticismএর বর্ণনা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে হয়ত বা এই নতুন synthesis, transformationএর quality আরো ব্যাপক আরো গভীর ভাবের সমন্বয়। মিস্টিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা শক্ত, কেবল সদৃশ কোন অভিজ্ঞতার ভাষায় আভাস দেওয়া যায়। সুফী কবিতা পড়লে মনে হয় যেন নসীরুদ্দীন, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ স্বর, এনায়েৎ-

হাফেজের শুদ্ধ টিপ্ শুনছি। কোন ভুল চুক্ নেই এর মধ্যে; একেবারে খাঁটি জিনিস।

ডাঃ কুমারস্বামীর মতে আর্ট ও মিস্টিসিজ্‌মের অভিজ্ঞতা সদৃশ্য অভিজ্ঞতা নয়, একই অভিজ্ঞতা। তিনি অনেক দিন থেকে বলে আসছেন যে ভারতবর্ষের সৌন্দর্যতত্ত্ব ও চর্চার পিছনে আছে যোগ। এই বইখানিতে তিনি সেই পূর্বমতের সমর্থন করেছেন ভারতবর্ষ চীনদেশের আর্টের দৃষ্টান্ত দিয়ে। ঐত্তরেয় ব্রাহ্মণের (৬, ২৭) সূত্রই হল, কুমারস্বামীর মতে, এশিয়ান আর্টের মূলতত্ত্ব।

"It is in imitation (অনুকৃতি) angellc (দেব) works of art (শিল্পানি) that my work of art (শিল্প) is accomplished (অধিগম্যতে) here ; for example, a clay [তুস্পাঠ্য] a brazen object, a garment, a gold object, and a mule-chariot are 'works [তুস্পাঠ্য]. A work of art (শিল্প) indeed, is accomplished in him who eomprehends.

. For these (angellic) works of art (শিল্পানি, viz. the metrical silpa texts).are [তুস্পাঠ্য] of the self (আত্ম-সংহৃতি) ; and by them the sacrificer likewise [তুস্পাঠ্য] himself (আত্মাণম সংস্কুরুতে) in the mode of rythm (ছন্দোময়).

আত্ম-সংস্কৃতি আর ডাঃ ইকবালের purification of experience একই বস্তু। অতএব বিজ্ঞান, গুহ্যধর্ম এবং সৌন্দর্য-চর্চার মধ্য দিয়ে একই ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। চীনদেশের কলাবিৎও ঠিক ঐ কথাই বলেন, একই ভাবে প্রকৃতিকে দেখে চলেছেন। অল্প কয়দিন পূর্বে আনন্দরাজ মূলক-এর [?] ভারতবর্ষীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে একটা বই পড়ি। তাতেও এই imitation of Natureএর অর্থ একই প্রকার দেওয়া হয়েছে। ডাঃ কুমারস্বামীর বইখানিতে Meister Eckhart নামে যে ব্যক্তির মত আলোচিত হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন মধ্যযুগের য়ুরোপের বিখ্যাত যোগী। তাঁরও বক্তব্য যে অন্তর্জ্ঞেয় জ্ঞানসত্ত্বরূপ চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত, কিংবা স্বপ্নবৎ হয়ে যে রূপ গ্রহণ করে তাকেই কলাবিৎ ও শিল্পী অনুকরণ করে, তারই প্রতিকৃতি [হল] চারুকলা কিংবা কারু শিল্প। এক্ষেত্রে চারুকলা এবং শিল্পের কোন প্রভেদ নেই, এবং চীনদেশের ও মধ্যযুগের সৌন্দর্যতাত্ত্বিকের মধ্যেও তিলমাত্র পার্থক্য নেই। Eric Gill তাঁর নতুন বই Artএ একই কথা বলেছেন। ধ্যান মূর্তিই সকল আর্টের মূল, এবং ধ্যানের পদ্ধতিতেও সেই চিত্তশুদ্ধির আদর্শ।

বর্তমান যুগের Lipps প্রভৃতির বই-এর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে আজকালকার অনেক য়ুরোপীয় মনীষীরাও বিশ্বাস করেন যে এই

empathy ভিন্ন প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণে আর্ট তৈরি হয় না। য়ুরোপের সৌন্দর্যতত্ত্ব আজকাল এই মধ্যযুগীয় মনোভাবের বশবর্তী হয়ে পড়েছে। Maritain-এর Art and Scholasticism বইখানি এই প্রসঙ্গে পরিচয়ের পাঠকবর্গকে পড়তে অনুরোধ করছি। য়ুরোপে— বিশেষত ফ্রান্সে আজকাল Neo-Thomsimএর ধুম লেগেছে— কারণ বোধহয় এই যে বর্তমানে Art, Science, Philosophyএর মধ্যে শরিকি বিবাদে জ্ঞানের যৌথ-পরিবার আজ বিধ্বস্ত।

আমার বক্তব্য এই যে আর্টে ও বিজ্ঞানে প্রকৃতির যে Transformation সাধিত হয় সেটি বৈজ্ঞানিকের এবং যোগীর মনোভাব ভাল করে আলোচনা করলেও চোখে পড়বে। কেবল তাই নয়,— যেমন যোগ-পদ্ধতিতে, তেমনিই বিজ্ঞানেও চিত্তশুদ্ধি, purification of experience না হলে কোন প্রকার সত্যেরই আভাস পাওয়া যায় না। এবং এই purificationএর সাধনায় তর্কবুদ্ধির ও পরীক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। উপকরণে পার্থক্য থাকলেও পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই। অন্তত আমার চোখে আপাতত ধরা পড়ছে না।

পরিচয়, কার্তিক, ১৩৪১

The Chinese Renaissance—By Hu Shih. (The University of Chicago Press).

সান্ ইয়াৎ সেনের পরই চীন দেশের নেতাদের মধ্যে হু শি-র নাম ও খ্যাতি। বর্তমান কালের চৈনিক নবজীবনের মূলে রয়েছে তাঁরই প্রতিভা। দর্শন, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর দানই সর্বশ্রেষ্ঠ। চীন যুবকের আধুনিক মনোভাবের জন্য যদি কোন একটি ব্যক্তিকে দায়ী করা সম্ভব হয়, তবে তাঁকেই করতে হবে। দর্শনে তিনি Deweyর শিষ্য, সাহিত্যে তিনি যুক্তিবাদী ও রিয়ালিস্ট, ভাষায় তিনি ডিমক্রাট, সর্বসাধারণের কথিত ভাষায় (pei-hua) তিনি নানান রকমের পুস্তক-প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়েছেন। শিক্ষাতত্ত্বে, সমাজ-সংস্কারেও তিনি অগ্রণী। নিজে খ্রীস্টান, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়েও স্বদেশের কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান। বিদেশীরা হু শি-কে পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবেই দেখেন। এমন লোকের বক্তৃতাগুলি যে উচ্চশ্রেণীর হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

তাঁর ভাষায় তাঁর মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করছি :

If I have any thesis to present, I want my readers to understand that cultural changes of tremendous significance

have taken place and are taking place in China, in spite of the absence of effective leadership and centralised control by a ruling class, and in spite of the deplorable necessity of much undermining and erosion before anything could be changed. What pessimistic observers have lamented as the collapse of Chinese Civilisation, is exactly the necessary undermining and erosion without which there could not have been the rejuvenation of an old civilisation. Slowly, quietly, but unmistakably, the Chinese Renaissance is becoming a reality. The product of this rebirth looks suspiciously accidental. But, scratch its surface and you will find that the stuff of which it is made is essentially the Chinese bedrock which much weathering and corrosion have only made stand out more clearly—the humanistic and rationalistic China resurrected by the touch of the scientific and democratic civilisation of the new world."

উদ্ধৃতাংশে হু শি-র বিনয় এবং উন্নতিবাদ বড়ই উপাদেয়।

বইখানি উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমার খারাপ লেগেছে। পড়তে পড়তে আমার মন সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠেছিল। মনকে সজাগ করবার ক্ষমতাটাই লেখকের গুণ। কিন্তু বিমর্ষ হয়ে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়াটা কি পাঠকেরই দোষ?

হু শি-র বক্তব্যে আমার ভীষণ আপত্তি আছে।

(১) নবজীবনের সঙ্গে economic ঘটনার কোন যোগসূত্র আছে কি থাকতে পারে বইটা পড়ে কোন সন্দেহ পর্যন্ত হয় না। অথচ চীনের এই জাগরণ যে আর্থিক শোষণ ও দৈন্যের জন্যই হয়েছে সকলেই জানেন। এই বিষয়ে Tang Leang-Liর বিশ্লেষণ হু শি-র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও বিশ্বাসযোগ্য।

(২) যদিও হু শি বলেছেন যে চৈনিক নবজাগরণ চৈনিক কৃষ্টির 'প্রস্তর-শয্যার' ওপরই সংঘটিত হয়েছে তবু হু শি-র ব্যাখ্যা পড়ে ও মনোভাব দেখে মনে হয় যে তাঁর ধারণা যে সে জাগরণ কেবল পশ্চিমী সভ্যতারই উত্তেজনায়। সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলে এমন কৃতজ্ঞতা ও অতিভক্তির প্রয়োজন থাকত না। পশ্চিমী সভ্যতার দিগ্‌বিজয় সম্বন্ধে হু শি একেবারে নিঃসন্দেহ— যেন সেটা প্রকৃতির নিয়ম।

(৩) আধুনিকতাতেও হু শি-র বিশ্বাস নিতান্ত প্রগাঢ়। বইখানির কোন ছত্রে valuationএর চিহ্ন নেই। আধুনিকতা বলতে তিনি বিজ্ঞান ও সাধারণ-তন্ত্রই বোঝেন। তাঁর মতে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক মনোভাব চীনাদের পক্ষে গ্রহণ করা নিতান্তই সহজ— কারণ চীনারা বরাবরই rationalistic, এবং গত তিন শত বৎসরের critical scholarship-এর চর্চায় নিতান্তই মানবিক এবং ইহজাগতিক হয়ে উঠেছে। সাধারণতন্ত্রেও হু শি-র বিশ্বাস ঐ ধরনেরই। সামুরাই ছিল বলে পশ্চিমী সভ্যতার সারাংশ গ্রহণ করতে জাপান যেমন তৎপরতা দেখিয়েছে তেমনি তৎপরতা অভিজাত-সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অভাবে চায়না দেখাতে পারেনি বলে হু শি-র মনে আপসোস আছে। কিন্তু আপসোস পুষে বসে থাকবার লোক তিনি নন, তাই popular speechএর সাহায্যে জনগণকে জাগাচ্ছেন।

আমাদের দেশেও প্রায় সমগ্র নব-পরিশীলনের একটি উৎস এখনও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ Gilbert Murrayর পত্রের উত্তরে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। পশ্চিমী সভ্যতার দান, বিজ্ঞানের দোষ-গুণ, পূব-দেশের বিশেষত ভারতের ঐতিহ্য এবং নতুন-সংস্কার গ্রহণ করবার শক্তি ও তার সীমা, পূর্ব ও পশ্চিমের আদান প্রদান— এই সব বিষয়ে আলোচনা তিনিও করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রফেসর নন, এবং তিনি চিঠিই লিখেছেন, পাঠ্যপুস্তক লেখেননি। সেইজন্য তাঁর চিঠিতে systemএর অভাব আছে। কিন্তু পড়ে যেন সন্দেহ হল, পত্রলেখকই ঠিক বলেছেন, যেন তাঁর বোঝবার ক্ষমতা আরো বেশী, পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধ তিনিই ধরেছেন, বিজ্ঞানের সীমা তিনিই নির্ধারণ করেছেন, যেন তিনিই a better humanist। (Open Letters—East and West. International Institute of Intellectual Co-operation, Paris 1935).

(৪) বইখানিতে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষ রয়েছে। ৮৫ পৃষ্ঠায় পাঁচ দফা আপত্তি রুজু হয়েছে। পর পর লিখছি :

Celibacy, mendicancy, ascetism and self-sarcrifice and suicide abstruse mythology and metaphysics, hair-splitting differentiations, most selfish and anti-social scheme of salvation, and for what end ? Forsaking of the family and desertion of all one's duties to the state—

এ-সবই চৈনিক মনোভাব ও মানবধর্মের প্রতিকূল। কী করে চীন সভ্যতা এই বিষ উদ্গীরণ করল তার বর্ণনাও আছে। প্রধান উপায় হল সনাতন— কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।

"The native religion of Taoism, which rose in the centuries after the gradual invasion of Budhism, was a revival of the old Sinitic religion of the people under the influence of the impact of Budhist ideas and practices. First unconsciously, and then fully consciously, Taoism undertook to kill its foreign rival by imitating every feature of it."

অর্থাৎ দেশী অবতার তৈরি হল—লাওৎসে— তারপর ত্রয়ী, ধর্মসূত্র, স্বর্গ নরক কিছুই বাদ গেল না— তবে সবই স্বদেশী—Buy Chinese। অবশ্য তাও-এর সঙ্গে অত্যাচার এবং অত্যাচারের সঙ্গে Zen-ধর্মও মিশেছিল ;— মেস্‌মেরিজমের সঙ্গে আর্সেনিকের মতন। Zen-ধর্মও নাকি খাঁটি দেশী, অর্থাৎ অ-ভারতীয় ? চীনের দার্শনিক ইতিহাসে কিন্তু উল্‌টো কথাই পড়েছি। Arthur Waleyর "The Way and its Power" একটি উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক গ্রন্থ। তাও-ধর্মের অন্য ব্যাখ্যা এতে রয়েছে। Waley সাহেবের মতে তাও-ধর্মে বিদেশী বিশেষত ইরাণী, গ্রীক ও ভারতীয় প্রভাব আছে। তৃতীয় শতাব্দীর ধর্মগ্রন্থে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও পৌরাণিক উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত হল এই :

I see no reason then to doubt that the Chinese technique of self-hypnosis may have been supplemented in the third century, particularly towards its close by hints from abroad. But we are not at present in a position to prove that this was so." (পৃঃ১১৫)

'Holy mountain-men' ঋষি এবং যোগাসন ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় পদ্ধতির সাথে যোগের চিহ্ন Waley লক্ষ ও নির্দেশ করেননি। তাও-ধর্মের এই সামাজিক-ব্যাখ্যা বড়ই নতুন।

অবশ্য হু শিও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কে ঠিক কথা বলেছেন জানি না। আমার ভারতীয় অভিমান হয়ত আছে— কিন্তু সেটা হু শি-রই ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আক্রোশ-প্রসূত। পশ্চিমী-সভ্যতার প্রতি অমন শিশুসুলভ বিশ্বাস না থাকলে ঐ প্রকারের যুক্তি লেখা যায় না। তবে হু শি আমেরিক্যান শ্রোতার কাছেই বলেছিলেন— এই যা কথা!

পুনরায় লিখছি— বইখানি খুবই ভাল— কিন্তু আমার মোটের উপর ভাল লাগল না। যে-টুকু ভাল লেগেছে সেটুকু হল তাঁর সমাজ-তত্ত্ব সাধনা ও শিক্ষা, যদিও সেটি আমেরিক্যান পণ্ডিতের সমাজতত্ত্ব— অর্থাৎ clssificatory,

synthetic নয়। হু শি-র বিনয় চৈনিক-বৈদগ্ধ্যেরই উপযুক্ত। তাঁর মতন কৃতী ও যোগ্য ব্যক্তির বর্ণনায় নিজের নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই দেখে খুশী না হয়ে থাকা যায় না।

পরিচয়ের পাঠকবর্গকে তৃতীয় অধ্যায়টি পড়তে অনুরোধ করছি। তাতে সাহিত্যিক-বিপ্লবের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। সেই সঙ্গে Scrutiny-তে Richardsএর ঐ বিষয়ের প্রবন্ধটি যদি মনোযোগ সহকারে তাঁরা পড়েন তা হলে অন্যান্য উপকারের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর বিচিত্র দান সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার উপকারটিও সংসাধিত হবে।

পরিচয়, কার্তিক, ১৩৪২

Studies in the Land Economis of Bengal— By Sachin Sen. (The Book Company Ltd.)

Land Problems of India— By Radhakamal Mukerji, Calcutta University Readership Lectures. (Longmans)

আমাদের দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে প্রতীতি জন্মেছে যে জমিই আমাদের সভ্যতার ভিত্তি। চাষবাস ও জমিদারবর্গের মধ্যকার সম্বন্ধই আমাদের অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধের নিয়ন্তা এবং ভূমি ও ভূম্যাধিকারীর ন্যায্য সংযোগই সকল উন্নতির ভূমিকা। আজ ধনোৎপাদনের নতুন উপায় ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছে নিশ্চয়, তারই ফলে ভারতবর্ষের কোথাও ধনিকতন্ত্রের এবং শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণের পর দেখা যায় যে তাদের শিকড় জমিতেই বিস্তৃত। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষ কাঁচামাল রপ্তানির দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী করতে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত শ্রমিকরা প্রধানত গ্রামবাসী ও চাষী থাকবে, ততদিন ধনতন্ত্র ও শ্রমিক-সমস্যার সাথে জমির যোগ অক্ষুণ্ণ থাকতে বাধ্য। এতদূর পর্যন্ত বোধহয় বলা চলে যে ধনতন্ত্রের রূপ-পরিবর্তনও নির্ভর করবে জমিস্বত্বের প্রকৃতি-পরিবর্তনেরই ওপর। আমাদের বড় ছোট জমিদার মাত্রেই মধ্যস্বত্বোপভোগী। তাঁদের বর্তমান দৈন্যদশার জন্যই তাঁরা ভূমির ওপর অধিকার ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। চাষী সম্প্রদায়ের অবস্থাও নিতান্ত খারাপ। সকলে মিলে চাকরীর প্রার্থী— শিক্ষিতেরা গবর্নমেন্টের অফিসের দ্বারে, এবং নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতেরা কলের ফাটকে হত্যা দিচ্ছেন। লোক-সংখ্যার দিক থেকেও জমির সাথে যোগের গুরুত্ব ধরা পড়ে। একে জমি হচ্ছে টুকুরো, তার ওপর অন্ন-সংস্থানের জন্যে উপায় সঙ্কীর্ণ, কুটির-শিল্প নেই বল্লেই চলে, তাই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্য

একাধিক সভ্য জাতির অপেক্ষা কম হলেও এদেশে এক বিষম সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাই দেখি—কাঁচামাল রপ্তানী করাটাই যেন আমাদের একমাত্র কাজ, তাতেই বোম্বাইএর কলাধিপতির বিক্ষোভ এবং আরো অনেকের অভিমান, সেই রপ্তানি ও আমদানীর মূল্যের পার্থক্যটুকু আবার দেশে থাকেনা; আমরা চাই দেশে রাখতে; জমি থেকে বিতাড়িত যাঁরা অথচ চাকরী যাঁদের হাতে আমলকীর মতন, নয়, চাঁদেরই মতন তাঁরা হয়েছেন ভীষণ অসন্তুষ্ট। তাঁদের অসন্তোষই নাকি রাজনৈতিক আন্দোলনের খোরাক যোগায়; তাঁদের সন্তোষ-বিধানেরই জন্য আজ সরকার বাহাদুর বদ্ধপরিকর। অতএব জমি আমাদের পায়ের তলায় এবং সর্বপ্রকার সম্বন্ধের অন্তরে। রক্তে এবং আকাশেও, কারণ শহরে কিছু পয়সা করেই জমি-জারাৎ করব সকলেই ভাবে, এবং সর্দার পাটেল বাহাদুরের মতে—তাঁর মতটি যে কত শক্তিশালী আমি জানি— স্বাধীন ভারতের অধিবাসীরা মূলত চাষী। গুজরাটী চাষীকেই এখানে আদর্শ হিসাবে ধরতে হবে, প্রাদেশিকতার নিদর্শন হিসাবে নয়। তদ্‌ভিন্ন মন্ত্রীর দল প্রায় সব প্রদেশেই জমিদার শ্রেণীর। তাঁরা শহরবাসী হলেও তাঁরা যে জমিদার সেই জমিদার। অর্থাৎ ভোট তাঁদের প্রজার, এবং মনোভাব জমির অধিকারীর। প্রজা-পার্টি প্রভৃতির কথা নাই উল্লেখ করলাম।

পূর্বোক্ত মন্তব্য যদি সত্য হয় তবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল জমির অধিকার, উন্নতি প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করা। চিন্তা করা— জমি চাষ করা নয়, কারণ এদেশের জমিতে ফসল না জন্মালেও একাধিক সমস্যা জন্মাচ্ছে। সেই সমস্যাগুলির নিরাকরণ চাই। যাঁরা নিরাকরণে তৎপর তাঁদের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম। সেই কমের মধ্যে ডাঃ রাধাকমল শীর্ষস্থানীয়। শচীন সেন মহাশয়ের স্থান তাঁর নিম্নে। তাঁদের পুস্তক দুইখানি ঐ হিসেবে এক গোত্রের নচেৎ একত্র সমালোচনার গুণগত সীমা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

বিষয়-ক্ষেত্রের পার্থক্য অবশ্য লক্ষণীয়। শচীনবাবু বাংলা এবং রাধাকমলবাবু সারা ভারতবর্ষের জমিস্বত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অন্যত্র হয় আপেক্ষিক-চিরস্থায়ী, না হয় রায়তোয়ারী, দু একস্থানে 'ভাই-চারা' এবং বেডেন-পাওয়েল যাকে জয়েন্ট-ভিলেজ বলেছেন তাই। অতএব শচীন বাবু প্রধানত ১৮৮৯ সালে এবং তার পরবর্তী কালেই আইনসম্মত বন্দোবস্তের ইতিহাস নিয়েই ব্যস্ত। রাধাকমলবাবুর পটভূমি অত্যন্ত ব্যাপক, এবং মাত্র প্রজাস্বত্ব-আইনের ক্রমবিকাশ লেখাই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। শচীনবাবুর ইঙ্গিত অর্থ-নৈতিক, রাধাকমলবাবুর সামাজিক। দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শ ব্যবস্থার ধারণাও সম্পূর্ণ

পৃথক। শচীনবাবু জমিদারী আইনের সংশোধন চান— বিশেষত প্রজাস্বত্ব-আইনের, কারণ তাঁর বিশ্বাস যে প্রজাস্বত্ব-আইনের জন্যই আজ জমিদারবর্গের এবং দেশের বর্তমান দুরবস্থা। রাধাকমলবাবু চান প্ল্যানিং এবং দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপের প্রবর্তিত নিতান্ত আধুনিক উপায়। শচীনবাবু একটি নতুন প্রপীড়িত, অবদমিত, নিষ্পিষ্ট শ্রেণী আমাদের সমাজে আবিষ্কার করেছেন—নাম তার জমিদারবর্গ। রাধাকমল বাবুর সে কৃতিত্ব নেই। শচীনবাবু কেন্দ্রিক শাসন-পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী— তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার প্রাণ হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাধীনতা। রাধাকমলবাবুর বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের না হলেও, এবং তিনি কম্যুনিস্ট কিংবা আমলাতন্ত্রবাদী না হলেও তাঁর মতবাদ গৃহীত হবার জন্য বর্তমান শাসন প্রক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন চাই। শচীনবাবুকে তাই বলে বর্তমান ব্যবস্থার তরফদার এবং রাধাকমলবাবুকে বিপ্লবপন্থী ভাবা অত্যন্ত ভুল হবে। শচীনবাবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপোষক হলেও, তার দোষ সম্বন্ধে সদাজাগ্রত, এবং রাধাকমলবাবু প্ল্যানিংএ আস্থাবান হলেও তাঁর মূল্যবান সৃষ্টি-নির্দেশের কার্যকরী ভবিষ্যৎ নিয়ে মাতামাতি করতে প্রস্তুত নন।

পুস্তক দু'খানি সত্যই আমাদের অমূল্য সম্পদ। শচীনবাবুর বইএর প্রত্যেক ছত্রে সযত্ন পরিশ্রমের পরিচয় আছে। তিনি প্রায় সব রিপোর্টগুলিই ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর ব্যাখ্যাতেও কোন কারচুপী নেই। তবু তাঁর সঙ্গে আমি অনেক ক্ষেত্রেই একমত নই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যত গুণই থাক, তবু তারই জন্য, প্রধানত, দু'তিনটি ক্ষতি হয়েছে স্বীকার করতে হবে; (১) গ্রামের যৌথ-অধিকারের সঙ্কোচ, এবং (২) 'দর-দর'-ধারে মধ্য-স্বত্বোপভোগীর সৃষ্টি। এবং অনেকে সন্দেহ করেন যে হিন্দু-মুসলমানের বর্তমান সমস্যার মূল হিন্দুদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পূর্ব-প্রতিষ্ঠা এবং তার রক্ষা, অন্যধারে মুসলমানদের মধ্যে সেই সম্প্রদায়ের অভাব এবং পরবর্তী বিকাশের জন্য স্বার্থ-পার্থক্যই যদি হয় তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে, আংশিক ভাবে, বাংলা দেশের একটি সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী করা অযথা নয়। পরিচয় মাসিক হল, অতএব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এইটুকু বলে শেষ করি যে রাধাকমলবাবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সামাজিক ইতিহাসের এবং অন্যান্য প্রদেশ ও দেশ-বিদেশের ভূমিগত ও সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন, এবং তাঁর বিবরণ সেই জন্যই অত্যন্ত সার্থক। বিচার এবং রায়ের আপীলে তিনি জিতবেন কিনা বলা আমার সাধ্যাতীত।

শচীনবাবুর পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে আমার তিনটি আপত্তি আছে। শচীনবাবু

'নজীর' দেখান নি, যেটা দেখান খুবই উচিত ছিল। তাঁর পুস্তকের মধ্যে পুনরাবৃত্তি আছে। বইখানিতে কোনো সূচিপত্র নেই। আমার বিশ্বাস যে পুস্তকের অধ্যায়-গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা। রাধাকমলবাবুর পুস্তকে প্যারাগ্রাফগুলি যথাযথ ভাবে বিভক্ত হয় নি, এবং তাদের হেডলাইনগুলির বড় বড় অক্ষর আমার খারাপ লেগেছে। বাংলা দেশে ওর চেয়ে ভাল ছাপায় আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। বই দু খানির দামও একটু বেশী।

সে যাই হোক— শচীনবাবুর এবং রাধাকমলবাবুর বই না হলে আমাদের কারুর চলবে না। মত-পার্থক্য থাকবেই— কিন্তু তাই বলে বই দুখানির সার্থকতা কমবে না। রাধাকমলবাবুর কাছেও আমাদের অনেক শেখবার আছে— তাঁর বিশেষ দান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করি।

পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৪৩

Soviet Communism—A New Civilisation ?—By Sidney and Beatrice Webb (Longmans) 2 vols.

দুই ভলুমের বইখানিকে আলোচ্য বিষয়ের বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হয় না। একে সোভিয়েট সাম্যবাদ, তায় লেখকদ্বয় ওয়েব-দম্পতি, অতএব বইখানি যে ইংরেজী ভাষায় লেখা সমাজতত্ত্বের একখানি উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ইতিমধ্যেই পরিগণিত হয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সোভিয়েটতন্ত্র সম্বন্ধে যতপ্রকার প্রশ্ন উঠতে পারে তার উত্তর যতপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় থাকতে পারে তার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা লেখকদ্বয় দিয়েছেন। ওয়েব-দম্পতির তথ্য সংগ্রহের প্রতি মোহ চিরপরিচিত, কিন্তু সে মোহ সাবধান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা বিশুদ্ধ বলেই আজকালকার প্রত্যেক ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদই তাঁদের গুরু-স্থানীয় মনে করে। অমানুষিক পরিশ্রম, অপক্ষপাত ভূয়োদর্শন, তীব্র সত্যানু-সন্ধিৎসা, সাবধান সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি সহজ বোধগম্য ভাষা আমরা বরাবরই তাঁদের কাছে পেয়েছি এবং প্রত্যাশা করি। প্রায় ১১৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে এমন কোনো বাক্যের সাক্ষাৎ পাইনি যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে ওয়েব-দম্পতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের আজীবন সাধনার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তাঁদের তথ্যানুরাগ এখনও অক্ষুণ্ন, এই আমার ধারণা অতএব, সেই দিক থেকে তাঁদের বিশ্বকোষী গ্রন্থের সমালোচনা কারুরই সুসাধ্য নয়।

সমালোচনা সম্ভব একমাত্র সিদ্ধান্তের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে। লেখকদ্বয়ও তাই প্রত্যাশা করেন, নচেৎ বইএর নামকরণে 'একটি নতুন সভ্যতা'র পর

জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকত না। নানা তর্ক-বিতর্কের পর ওয়েব দম্পতি স্বীকার করছেন যে সোভিয়েট-তন্ত্র এক প্রকার নতুনতর সভ্যতা এবং এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়বে দেশবিদেশে, অর্থাৎ কম্যুনিস্টের বিশ্বাস কার্যে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। মাত্র এইটুকুই বিচারের ক্ষেত্র। অন্তত ভারতবাসীর পক্ষে; কারণ একাধিক ভারতবাসীর ধারণা যে ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার সভ্যতার আঙ্গিক পরীক্ষিত হয়েছিল, তার কাঠামোটা এখনও বর্তমান এবং মার্কস-কল্পিত বিশ্ব ইতিহাসের দুর্নিবার নিয়তির পরিক্রমণে সেই কাঠামো হয়ত বা সামান্য পরিমাণে বাধাও দিতে পারে। অন্য ভাষায় বলা চলে, সোভিয়েট-কম্যুনিজম যদি একপ্রকার সভ্যতা হয়, তবে ওয়েবদ্বয়ের স্বীকারোক্তি অনুসারে অন্য একটি সভ্যতার মাপকাঠিতে তার বিচার সম্ভব। এইখানে বলে রাখা ভাল যে লেখকরা মার্ক্সিস্ট নন, কোনো মার্ক্সিস্ট কিংবা কম্যুনিস্ট 'সোভিয়েট-কম্যুনিজম' কথাটি ন্যায়ত প্রয়োগ করতে পারেন না, কারণ, তাঁর মতে কম্যুনিজমই একমাত্র সভ্যতা, বাকি সব বর্বরতা, অর্থাৎ সভ্যতার পূর্বাবস্থা। ন্যায়ের যুক্তি না তুললেও চলত, কারণ কে না জানে যে ওয়েবরা ফেবিয়ান? যখন তাঁরা সোভিয়েট-তন্ত্র আলোচনা করছেন তখনও তাঁরা ফেবিয়ান। এমন কি এতদূর পর্যন্ত বলা চলে যে কয়েক বৎসর পূর্বের নিজেদের রচনার (A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain) ও কল্পনার বাস্তব পরিণতি হিসেবেই যেন সোভিয়েট পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, নতুন বইখানিতে। রাশিয়ায় গোঁড়া কম্যুনিস্ট বোধ হয় আজকাল কেউ নেই, তাই বইখানি সম্বন্ধে ট্রট্স্কীকার [?] মতামত একটু কঠোর হবে ভয় হয়। হয় রাশিয়া 'ফেবিয়ান' হয়ে আসছে, না হয় ওয়েবদ্বয় রাশিয়ায় ফেবিয়ান-কল্পনার রূপ দেখেছেন। সে যাই হোক না কেন, গোঁড়া কম্যুনিস্ট এবং গোঁড়া স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসী, উভয়েই নতুনতর সভ্যতার দাবী সহজে গ্রাহ্য করতে চাইবেন না সন্দেহ হয়।

প্রথম ভলুমে রাশিয়ার শাসন-পদ্ধতির বিবরণ ও আলোচনা আছে। কেন্দ্রিক, দেশীয় ও স্থানীয় রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা লেখকদ্বয়ের করায়ত্ত, অতএব ঐ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে বহু বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট। অধিক বলা আজ ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অশোভন। খবরের কাগজে প্রকাশ যে স্ট্যালিন রাশিয়ার শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে এক নতুন ইস্তাহার জারি করেছেন। তার প্রধান কথা নাকি পার্লামেণ্টারী ডিমক্রেসী, অর্থাৎ আপামর সাধারণের প্রত্যক্ষ স্বরাজ চালনার পরিবর্তে প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা সকলের জন্য আইনকানুন প্রবর্তন করা। স্ট্যালিনের মতসব কি জানা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাবটি বিশেষ সোভিয়েট পন্থায়, অর্থাৎ ওয়েব-বর্ণিত উপায়ে গৃহীত ও প্রকাশিত না হচ্ছে। ইতিমধ্যে খবরটি

সনাতনীদের আত্মরতির যত খোরাকই যোগাক না কেন, নিরপেক্ষ সমাজ-তাত্ত্বিকেরা বইখানি পড়বার পর স্ট্যালিনের নতুন ইস্তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিচলিত হবেন না। সোভিয়েট রাজ্যশাসনতন্ত্র আর যাই হোক সুইজারল্যাণ্ডের 'উর' নামক জেলার পুরাতন landsgemindeএর মতন প্রত্যক্ষ ব্যক্তিবাদী সাধারণতন্ত্র নয় এবং ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী ডিমক্রেসীও হবে না। রাশিয়ার রাজ্যব্যবস্থা বৃত্তিমূলক দল ও ব্যক্তিতান্ত্রিক ভোটের সমন্বয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্ট ও সোভিয়েট-তন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, স্ট্যালিন যা নামই দিন না কেন। দুটি দলের সংখ্যার পঞ্চবার্ষিক হ্রাসবৃদ্ধির ওপর যে রাজ্যপদ্ধতি নির্ভর করে মার্ক্সিস্ট অর্থ ও সামাজিক নির্দেশ সে-পদ্ধতি রাশিয়ায় কখনও আসতে পারে না, যতদিন 'পার্টি' কথাটির বিশেষ মার্ক্সিস্ট অর্থ ও সামাজিক নির্দেশ না পরিবর্তিত হয়। যদি ধরাও যায় যে রাশিয়ার বিপ্লব এখন শেষ হয়েছে, অতএব রাষ্ট্রাধিকারের উপায় অর্থাৎ পার্টির এই সংজ্ঞা এখন সেখানে নিষ্প্রয়োজন, তবু পার্টি কথাটির ওয়েব-নির্দিষ্ট সামাজিক ইঙ্গিত এখনও অর্থবাহী রয়েছে ও থাকবে। ওয়েব-দের মতে কম্যুনিস্ট পার্টি এক প্রকার শিক্ষানুষ্ঠান, যেখানে নেতৃত্ব সাধনার কঠোর পদ্ধতি রাশিয়ান যুবক-যুবতীকে শেখান হয়। কম্যুনিস্ট সমিতির সভ্য হওয়ায় পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা খুবই কঠিন। নির্বাচিত ব্যক্তি তাই 'vocation of leader-ship'-এ রীতিমত পোক্ত। আমার বিশ্বাস হয় না যে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, মাত্র এই ধারণার বশে নেতৃত্ববৃত্তির শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যক্ত হবে। পরিত্যাগের অর্থই হলো কম্যুনিস্ট পার্টি-অনুষ্ঠানকে মেরে ফেলা —অর্থাৎ আত্মহত্যা। যদি তাই হয় তবে নতুন সভ্যতার নতুনত্ব উঠে যাবে। অত সহজে ও অত শীঘ্র কোনো জাগ্রত জাতি আত্মনিধনে ব্রতী হয় না।

সেই জন্য আমার বিশ্বাস যে প্রতিনিধির নির্বাচন-প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটলেও বইখানির প্রথম ভলুমটির সাহায্য সোভিয়েটতন্ত্রের রাষ্ট্রনির্বাহ জানবার জন্য বহুদিন পর্যন্ত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। প্রথম ভলুমের পরিশেষে রাষ্ট্র ও শাসন-প্রক্রিয়ার নকশা দুটি অমূল্য। কেন্দ্রস্থ ও সীমাস্থিত সমিতির যোগ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভুল ধারণা চলে গেল। কেন্দ্রমুখ রাজ্যসভা ও কেন্দ্রবিমুখ গ্রাম ও কারখানার সমিতির মধ্যে সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন উভয়ই সত্যকারের সাধারণ-তন্ত্র, যখন দুটির মধ্যে জনগণের জীবনস্রোত অবাধে প্রবাহিত, যখন ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী কেন্দ্রস্থ সভার আশীর্বাদে, শুদ্ধস্বার্থ, যখন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার সুযোগ বর্তমান। এই সমন্বয় পার্লামেণ্টারী ডিমক্রেসীর decentra-lisation কিংবা devalution নয়, কিংবা সিণ্ডিক্যালিস্ট কল্পিত bourse du

travail-এর আভিজাত্য ও সাধারণতন্ত্রের জগাখিচুড়ি নয় নিশ্চিত। অবশ্য এই প্রকার ইমারৎ খাড়া করা যায়, কিন্তু তাতে সিঁড়ি থাকে না, নীচের তলার লোক নীচেই পচে মরে, ওপর তলার লোক মাটিতে না হাঁটতে পেরে বাতগ্রস্ত হয়। প্রথম ভলুমের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আমি তাই বহু মূল্যবান মনে করি। আমরা পার্টি, ডিক্‌টেটার, নেতা প্রভৃতি অনেক কথাই ব্যবহার করি কংগ্রেস সম্পর্কে। কিন্তু নেতৃত্বের পিছনে কত কৃচ্ছ্রসাধন থাকা উচিত, নেতৃত্ব যে ভগবানের কৃপা নয়, তার জন্য যে একটি ব্যাপক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, সেটি যে একপ্রকার নিষ্ঠা ও বৃত্তি (vocation), আমরা ভারতবাসীরা যেন ঠিক বুঝি না, অর্থাৎ মুখে স্বীকার করলেও কার্যে পরিণত করতে পারিনি। আমাদের দেশে কি উপায়ে নেতা তৈরি হয় জানা আছে। তাই আমাদের কর্মীদের অনুরোধ করছি অধ্যায় দুটি পড়তে। বি. এ. পাশ করে শ্বশুর কিংবা সম্প্রদায়ের জোরে চাকরী পেলে রাজকর্মচারী হওয়া যায় না, এমন কি কঠিনতম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষা পাশ করলেও যেমন গবর্নমেণ্টের শ্রীবৃদ্ধি হয় না তেমনই জয় জয় রবে ভিড় জমালে কিংবা ছুতোয়-নাতায় জেলে গেলে ও জেলে গিয়ে ধর্মপুস্তক পড়ে দেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেও নেতা তৈরি হয় না, দেশের কল্যাণও হয় না। নিষ্কাম ভাবে সমাজ-সেবা করতে করতে সেবক হয়, তাদের মধ্যে সুবিধা, প্রকৃতি ও ব্যবস্থা অনুযায়ী কেউ বা হয় নেতা, কেউ বা থাকে সেবক। সে-নেতা ও সে-সেবকের মধ্যে পার্থক্য ভিন্ন ধরনেরই। শাসনপদ্ধতির ব্যাখ্যা ভিন্ন এই vocational training of leadership-এর বিবরণের জন্যও ওয়েব-দম্পতির প্রথম ভলুমটি সকলের কাছে চির আদরণীয় থাকবে।

দ্বিতীয় ভলুমটাই আমি কিন্তু বেশী আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। কারণ তার মধ্যেই, প্রথমটি ছাড়া অন্য পাঁচটি অধ্যায়ে, আমার মত লোকের মনের খোরাক যথেষ্ট আছে। আজ গত কয়েক বৎসর ধরে অর্থনীতিজ্ঞ মহাপণ্ডিতদের রচনায় পড়ছি যে প্ল্যানিং পদার্থটি হয় অতি পুরাতন, না হয় নিতান্ত অসম্ভব। সেই মত প্রচারও করেছি ছাত্রদের কাছে। কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হোতো ; কারণ, সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট যেন মহারথীদের মতামত হেয় প্রতিপন্ন করতেই পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পকে সার্থক করে ফেললেন দেখলাম। ক্যান্নান্, গ্রেগরী থেকে হায়েক্, মিজেস্, পিয়ার্সন্ সকলেই বলেছেন ঐ ধরনের প্ল্যানিং সম্ভব নয়, অথচ নিরপেক্ষ সোভিয়েট-বিদ্বেষী দর্শকবৃন্দ দেখাচ্ছেন যে যতটা সঙ্কল্পিত হয়েছিল ততটা না হোক, প্ল্যানের অনেকাংশই পশ্চিমী য়ুরোপীয়ানের পক্ষে আশাতীত ভাবে সফল হয়েছে। আমরা ভারতবাসী অধ্যাপক তত্ত্ব ও তথ্যের দোটানায় হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। তাই যখন

বইখানির দ্বিতীয় ভলুমে পড়লাম যে পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের মূলকথা— অর্থাৎ মুনাফা-বর্জিত ব্যবসা, পণ্ডিতবর্গ ধরতে পারেন নি, অতএব তার নতুন রূপ ধারণা করতে তাঁরা অক্ষম, তখন সত্যই যেন কূল পেলাম। অবশ্য পূর্বেও একাধিক পুস্তকে পড়েছিলাম বটে, কিন্তু বারবারা ওয়টন্, মাইকেল্ ফার্ব্ম্যান্, গ্রীঙ্কো, ডব্, মিস্ ব্রোশ্যাম্প্ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করতে মন চায়নি। সে যাই হোক, এখন আমি বুঝেছি যে ক্রস্কুস্ প্রভৃতির আপত্তি অগ্রাহ্য, অর্থাৎ হিসাব-নিকাশে (costing & accounting-এ) সোভিয়েটপদ্ধতি পরিচিত পন্থায় না গেলেও সেই দোষের জন্য অন্য দেশে যেমন সর্বনাশ হয় সে সর্বনাশ রাশিয়ায় সাধিত হয় নি। সোভিয়েটের কর্তৃপক্ষ দিব্যি কাজ চালাচ্ছে— এমন ভালভাবে যে উদ্বৃত্ত পণ্য ঠেল মারছে অন্য দেশে, তাও শোনা গিয়েছে।

ব্যাপারখানা এই: ব্যক্তিগত লাভ যদি বাদ দেওয়া যায় হিসেব থেকে ও ব্যবসায়ীর মন থেকে তবে প্ল্যানিংএর বিপক্ষে আপত্তি টেঁকে না। বাস্তবিকপক্ষে, লাভ (profit) প্রত্যয়টির শিকড় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যতটা ব্যাপক হোক আর না হোক, তার মূলটা মনের গভীরতম কন্দরে পৌঁছায়, এই লোকের ধারণা এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই অর্থনীতিবিদ অর্থ নৈতিক জাব নামে একটি আজব চীজের কল্পনা করেন। কিন্তু লাভের এই আদিম, অকৃত্রিম ও অনাহত তাগিদ, কিংবা উদ্দীপনা কিংবা প্রবৃত্তি যদি অস্বীকার করা যায় তবে প্ল্যানিং সম্ভব হয়ে ওঠে। অতএব প্ল্যানিং-এর বিপক্ষে আপত্তিটা মানসিক, তার জবাব দেবে মানসবিজ্ঞান। পরীক্ষামূলক মানসবিজ্ঞানে লাভ নামে কোনো প্রাথমিক প্রবৃত্তির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সোভিয়েটতন্ত্র শিক্ষায় বিশ্বাসী, তাঁরা পারিপার্শ্বিককে উন্নত করে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন-সাধনে তৎপর। সুপ্রজনন বিদ্যার দোহাই পেড়ে যাঁরা প্রতিবেশের মূল্য দিতে চাননা এবং বীজের মধ্যে লাভের প্রবৃত্তি আবিষ্কার করতে যাঁরা তৎপর তাঁদের জন্য স্যার যোশিয়া স্টাম্প নামক চল্লিশটি কোম্পানীর ডিরেকটার বাহাদুরের মত উদ্ধৃত করছি। Philosphy নামে একটি পরিচিত পত্রিকায় 'Can present human motives work a planned society?' প্রবন্ধে ভদ্রলোক বলছেন :— My provisional answer is therefore over a major part of the field 'No'; over a certain smaller but important part possibly 'Yes'; and over yet a balance of the area probably 'Yes'. But I have exposed only a part of the mechanism to view and more attention ought to be devoted to the psychology of the plannees alongside of an elaborate study of

plans and planners। সাবধানী পথিক, বায়েক পথ ভুলে · ঠিক এই কাজগুলিই ওয়েবদ্বয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

প্ল্যানিংএর বিপক্ষে আপত্তি বাস্তবিক পক্ষে মানসিক স্তরের লিখেছি। কিন্তু অর্থনীতিবিদ ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নন। অর্থনীতিতে আজকাল বিশ্লেষণের যুগ চলছে, বিশেষত লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিনিকেতনে। তাঁদের পদ্ধতিটা নতুন নয়, ধ্রুব। অনুষ্ঠান ও প্রকৃত ব্যবহারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইকনমিক জীব, ইকনমিক রাষ্ট্র, optimum firm প্রভৃতি তাঁরা সৃষ্টি করেছেন ও তাদের কার্যাবলী বিচার করছেন। এই নব্য নৈয়ায়িকদের যুক্তি অকাট্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যে গাছে মাকড়সার জাল ঝোলে তার পাতায় শিহরণ লাগলে জাল যায় ছিঁড়ে। ধরা যাক, আবহাওয়া আজকের মতন স্পন্দনহীন, জালের প্রত্যেক তন্তুটি অন্যটির সঙ্গে জ্যামিতিক ছন্দে বাঁধা। তন্তুগুলি কি? প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আদান-প্রদান বাধাহীন, ফলে ক্রেতাসমষ্টির সর্বোচ্চ পরিমাণে সন্তোষ-বিধান; সুদের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করবার খরচের যোগ-ফলে বাজারের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ; ক্রেতার বিরতিহীন চাহিদার ফলে মূল্যের স্বাভাবিক সমীকরণ (automatic price adjustment by the continual referendum on what shall be produced and consumed) দেশের গড়পড়তা মূলধনের ব্যবসা-ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী বণ্টন (optimum allocation of capital between the different units)। সুতোগুলি অত্যন্ত মিহি এবং প্রত্যেকটির শিল্প অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে আশ্চর্য লাগে। মনে হয় মাকড়সার কি অদ্ভুত কৌশল! যেন ভগবানের হাত, স্বভাবের চেয়েও স্বাভাবিক! কিন্তু ওয়েবদ্বয়ের কৃত এই ধ্রুবপদ্ধতির ইকনমিকসের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পড়লে আমাদের মোহ দূর হয়। তখন মনে হয়, নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় ক্রেতার কোনো স্বাধীনতা নেই, তার চাহিদার প্রকৃত অর্থ হোলো effective demand, অর্থাৎ হাতে যা টাকা আছে তাই দিয়ে যা প্রস্তুত করছেন কর্তারা তাই কেনবার যৎসামান্য ক্ষমতা। আর মনে হয় মূল্যের স্বাভাবিক সমীকরণ নিরর্থক— ওসব ধরতাই বুলি, চলে কেবল নিরালম্ব নিরঙ্কুশ কাল্পনিক জগতে। ব্যক্তিবাদী, বিশ্লেষণ-প্রিয়, বিশ্বাসী ইকনমিস্টদের তাই আমি ৬৭১ পৃষ্ঠা থেকে ৬৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অন্তত পড়তে অনুরোধ করছি। ওয়েদ্বয়ের প্ল্যানিংএর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ অদ্ভুত, সমর্থনও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

আমি ভেবে চিন্তেই বিশ্লেষণ ও বিবরণ লিখলাম। কারণ তার বেশী বিশেষ কিছু আমি এই বইএ পাইনি। সমাজতাত্ত্বিকের কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, তার ব্যাখ্যা ও বিবরণ ভিন্ন অন্য আগ্রহ আছে ও থাকা উচিত, তা প্যারেটো

সাহেব অত বড় কেতাবে যত রসিকতাই করুন না কেন। এই ভিন্ন আগ্রহকে Values বলাই ভাল। সেগুলিও এক প্রকার তথ্য। সেই দিক থেকে আমার কিছু বক্তব্য আছে দ্বিতীয় ভলুম সম্বন্ধে। তার দ্বাদশ অধ্যায়, The Good Life এবং উপসংহার, A New Civilisation? আমি বারবার পড়লাম। কিন্তু সোভিয়েটতন্ত্রের নবতর ধর্ম (এথিক্স্) সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ও প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েই গেল। নিতান্ত মোটামুটি ভাবে ওয়েব-দম্পতির প্রতিপাদ্য হোলো এই: সোভিয়েট এথিক্সে খ্রীস্টান ধর্মের প্রাথমিক পাপের কোনো ছাপ নেই; চিরন্তন ঐকান্তিক নীতিতে কম্যুনিস্ট বিশ্বাসী নয়, তার কাছে স্বাধীনতার অর্থ ঐতিহাসিক রীতি (অবশ্য ডায়েলেক্টিক) বুঝে সেই জ্ঞানকে কর্মে প্রয়োগ করায়, অর্থাৎ চিন্তা ও কর্মের সমন্বয়ে, তার নীতি নিঃস্বার্থভাবে সমাজ-সেবা, সমাজের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, কারণ তার ধারণা যে প্রত্যেক মানুষ সামাজিক ঋণের বোঝা নিয়ে জন্মেছে এবং সেই বোঝা তাকে নামাতেই হবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ধনোৎপাদন যখন বৃদ্ধি পাবেই পাবে, এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে সেই বর্ধিত ধন ব্যক্তির প্রয়োজন-অনুযায়ী যথাযথ ভাবে বিভক্ত হতে যখন বাধ্য তখন নিষ্কাম জনসেবাই হবে মানুষের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। লেনিনের ভাষায় কম্যুনিস্ট এথিক্সের মূল কথা— social equality in plenty। Plenty শব্দটির প্রয়োগে সমাজধর্মের ব্যবস্থা ও প্রত্যয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি সূচিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ওয়েব-দম্পতির বিবরণে আরও একটি অঙ্গীকার রয়েছে; অবস্থান্তর-প্রাপ্তির অবসান ঘটেছে, রাষ্ট্রের জবরদস্তি ও শ্রেণীবিরোধ এখন লুপ্তপ্রায়, এবং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত। কম্যুনিস্ট এথিক্সের আলোচনা তখনই চলে যখন অন্তর্বিপ্লব শেষ হয়েছে। গতির ধর্ম ও আপেক্ষিক স্থিতিরও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে— অন্তত কর্তরা তাই বলে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্কোচনের সমর্থন করতেন।

কিন্তু এই সব কথাবার্তা শুনলে আমার সব আপত্তিগুলো সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে ওঠে। স্বর্গীয় ম্যাক্সিম গর্কী On Guard নামক রচনাসমষ্টির একটিতে বলেছেন সোভিয়েটতন্ত্রেই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্মেষ সম্ভব। তাঁর ভাষা maximisation of personality। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা উচিত, কারণ এটা পুরুষ-সিদ্ধির কথা। ধনিকতন্ত্রে ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির অবকাশ ছিল ফিউড্যালিজমের চেয়ে, এবং ম্যাক্স্ ওয়েবারের ভাষায় system of nationailstic ethics-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বেরই জোরে ধনিকতন্ত্র চাঙ্গা হোলো। (হেণ্ডারসনের আপত্তি সত্ত্বেও ওয়েবারের প্রধান প্রতিপাদ্য টিঁকে থাকে)। আজ কিন্তু দেখছি সেই শক্তিশালী ধনিকতন্ত্রই ব্যক্তিকে চেপে মারছে। ঠিক যেন হাইপীরিয়ান এপোলো,

বাপছেলের সম্বন্ধ। যা চোখে পড়ে তার ব্যাখ্যার রীতি হোলো ডায়েলেকটিক্। নব্য ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্বে তার বিশ্লেষণ হয়ত সম্ভব, কিন্তু সে বিশ্লেষণ ইতিহাসের প্রশস্ত ক্ষেত্রে কিংবা সমষ্টিতে প্রযোজ্য নয়, বিশেষত যখন ফ্রয়েড নিজেই সেদিন অনেক প্রত্যয়ের প্রত্যাহার করলেন। মানুষিক ব্যবহারে দুটি বিপরীত প্রবৃত্তি একত্র বসবাস করে, তাকে ambivalence বলে, কিন্তু সে ত নাম। নাম দিয়ে ইতিহাসের ব্যাখ্যা হয় না। নামে গতির রীতি বোঝা যায় না। অতএব অন্য ব্যাখ্যা চাই। যত ব্যাখ্যা পেয়েছি তার মধ্যে ডায়েলেকৃটিকৃই সন্তোষজনক। এতদূর পর্যন্ত আমি কম্যুনিস্ট এথিকসের মূল কথা গ্রহণ করি। কিন্তু তার পর? আমি কোন সাহসে বলি যে প্রগতির রীতিনীতি সোভিয়েটতন্ত্রের সীন্থেসিসে পর্যবসিত হয়েই নিঃশেষিত হবে? হয় ডায়েলেকৃটিক্ সত্য, না হয় সোভিয়েটতন্ত্রে ব্যক্তি পুরুষ হলো, সিদ্ধ হলো এই দাবীটা সত্য। দুটি বিরোধী তন্ত্রের মধ্যে আমাকে যদি নির্বাচন করতেই হয় তবে প্রথমটিকে অর্থাৎ ডায়েলেক্‌টিকেই করব। (যদিও আমি সম্পূর্ণভাবে তাও করিতে পারি না)। অর্থাৎ, আমি কিছুতেই মানব না যে সোভিয়েটরাজ্য এ যুগের শম্বুক-বর্জিত, মন্থরা, কৈকেয়ী, বিভীষণ বর্জিত, বশিষ্ঠ-চালিত রামরাজ্য, সেখানে সব বিরোধ, শ্রেণীবিরোধ, ব্যক্তিগত বিরোধ, ভাবগত বিরোধ সমন্বিত হয়েছে। আমি কি নির্বাচন করব? স্থাণু শিষ্ট স্বর্গ; না চলন্ত কম্পিত ঐতিহাসিক জীবন? আমি ঐতিহাসিক সত্তাকে ধারা ভাবি— গচ্ছতা কালেন— history is a glorious adventure— আমার তাই যথেষ্ট। কম্যুনিজমের মহাকাল ধর্মরাজ নন, যমদূত ভূত। আমি তাই বলি, যদি সোভিয়েট-তন্ত্রের এথিকস মানবজীবনের, অর্থাৎ জীবিত সমাজের ব্যবহারের উপর পরিকল্পিত হয় তবে তার মধ্যে নতুন রকমের বিরোধের ও সেই সঙ্গে তার সমন্বয়ের বীজ লুকানো থাকবেই থাকবে। ওয়েবদ্বয়ের ফিলজফিতে ঘাঁটতি পড়েছে। আর না হয়, কম্যুনিজমের দর্শনে কাল বস্তুটির খাতির নেই।

ওয়েবদ্বয় emergent morality কথাটি ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। হয়ত তাঁদের বিশ্বাস, যেকালে emergent তখন আজ অন্তত নীরব থাকাই ভাল। emergent কথাটি আজকাল জীবতত্ত্বে লয়েড মর্গ্যানের আশীর্বাদে চলছে। দর্শনেও আজকাল বিজ্ঞানের বকুনি না থাকলে চলে না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে কথাটি সাহিত্যের, বিজ্ঞানেরও নয়, দর্শনেরও নয়। ধরাই যাক ভাষার দৈন্যের জন্য নতুন values-এর সম্ভাব্যতা বোঝাতে গেলে ঐ কথাটির প্রয়োগ অনিবার্য। ধরাই যাক কোন সমাজতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস ক'রে জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্‌বক্তা হতে পারেন না। কিন্তু সঙ্কল্প করব, প্ল্যানিংএর সমর্থন

যোগাব, অথচ অন্তত দূরদর্শী হব না— এ কেমন ? না হয় কম্যুনিস্ট চিরন্তন ও ঐকান্তিক ধর্মনীতি মানেন না, কিন্তু তিনি নিশ্চয় একটি বিশেষ, বহিরাশ্রয়ী ও তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' নীতি গ্রহণ করছেন দেখছি, হয় ডায়েলেক্‌টিক্‌, না হয় ইতিহাস। তার আপেক্ষিক পরিবর্তন স্বীকার করলেও তার সতত-অস্তিত্বকে নাকোচ করতে তিনি পারেন না, এবং করেনও না। যে সত্তা নানারূপের মধ্যে প্রকাশিত তার ভবিষ্যৎ রূপের সম্বন্ধে নিরাগ্রহতা বুদ্ধির অপমান। উত্তর হয়ত আসবে—বুদ্ধির অগম্য ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াই সোভিয়েট নীতির প্রেরণা। আমি পাল্‌টা জবাব দেব— ঐ প্রকার বিভাগ মানি না। একবার বুদ্ধিকে পৃথক করলে বিজ্ঞানকে ছেঁটে ফেলতে হবে, প্রয়োগশিল্প বন্ধ হবে, এবং বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তির পার্থক্য থাকবে না। তখন রইল কি ? থাকে মাত্র বিশ্বাসটুকু। আমারও তাই সন্দেহ হয়, কম্যুনিস্ট ইচ্ছাশক্তি ও কর্মযোগের নামে জ্ঞানকে বর্জন করে বিশ্বাসকে বরণ করতে সদা ব্যগ্র। আমার বিপদ, বিশ্বাস আমার ধাতে বসে না। রাম-রাজ্যের কল্পনা বিশ্বাসের অন্তর্গত, বিরোধের অবসান বুদ্ধির অতীত। বিরোধ অন্তর্ধানে যে মুক্তি সে মুক্তি আমার নয়, যতই কেন স্বস্তিপ্রিয় হই না কেন।

কল্যাণ সম্বন্ধে লেখকদ্বয় যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তার মাত্র একটি অংশ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কম্যুনিস্টের কল্যাণ-সাধন এক প্রকার দীক্ষার সামিল। যতদূর স্মরণ হয় প্লেটোও initiation ইঙ্গিত করেছেন। কম্যুনিস্ট সমিতির সভ্য হবার পূর্বে যে প্রক্রিয়ার ইতিহাস বইখানিতে পাই তাইতে মনে হয় লেনিন কিংবা স্ট্যালিন ব্যাখ্যাত মার্ক্সিজম্‌ই হল এই নব্যতান্ত্রিক চক্রের বীজমন্ত্র। প্লেটোও সর্বসাধারণকে কল্যাণ-মন্ত্রের অধিকারী ভাবেন নি, ব্রাহ্মণ গুরুরাও নয় বোধ হয়, অন্তত একই মন্ত্র সব শিষ্যকে দেবার রীতি আমাদের দেশে নেই। প্লেটোর প্রভাবে গ্রীক সভ্যতার কল্যাণ-ধারণাটি এক প্রকার সার্বিকের সামিল ছিল। তান্ত্রিকদের মতে বীজমন্ত্রের সাধনা এক প্রকার ব্রহ্মবাদেরই সাধারণ সংস্করণ। আমার বক্তব্য এই, এমন কোন কল্যাণ-ধারণার সঙ্গে পরিচয় আমাদের নেই যার পিছনে কোন না কোন প্রকার পরম সত্য কিংবা সার্বিকের সমর্থন নেই। কেবল তাই নয়, কল্যাণ-ধারণা ও সাধনার মূলে সেই পরম সত্য বা সার্বিকের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। খ্রীস্টানী এথিক্‌সের মূলে রয়েছে আদিম ও অকৃত্রিম পাপের ধারণা। Original Sin ভিন্ন খ্রীস্টীয় মুক্তির (redemption) অর্থ থাকে না, অনুতাপ হয়ে ওঠে স্নায়বিক দৌর্বল্য ও ভাববিলাস এবং খ্রীস্টান সভ্যতা অন্য যে কোন সভ্যতার, বিশেষত বৌদ্ধধর্ম-প্রসূত সভ্যতার পুনরাবৃত্তি হয়ে ওঠে। তা নয় কিন্তু। অতএব কোন একটি অতিরিক্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে কল্যাণময় জীবনের

বিশ্বাসের যোগ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজন সর্বত্রই ঘোষিত হচ্ছে। নির্জলা মানবপ্রেম বড়ই পান্‌সে লাগে— নরের সেবায় নারায়ণের প্রয়োজন— শিলাটি পর্যন্ত। নচেৎ কোঁৎ থেকে আরভিং ব্যাবিট পর্যন্ত সকল হিউম্যানিস্টদের ষড়যন্ত্রে ও উপদেশে পৃথিবীর দুঃখ যেত, Good Lifeটা শেষ কথা নয়— তার পিছনে বিশ্বাস থেকেই থাকে, কম্যুনিস্টেরও আছে, ইতিহাসের ওপর যতটা না হোক, লেনিন-স্ট্যালিন-মার্ক্সের ওপর। অন্য বিশ্বাসীর সঙ্গে কম্যুনিস্ট নামধারী বিশ্বাসী জীবটির পার্থক্যটুকু পরিষ্কার করা হয় নি বইখানিতেই এই আমার প্রধান আপত্তি।

আমার মতে, কল্যাণময় জীবনের ধারণায় 'প্রাচুর্যে সামাজিক সাম্য' ভিন্ন অন্য একটি জিনিস আছে, যেটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়। ওয়েব-দম্পতি তার ইঙ্গিতও করেছেন। সেটি হলো— সমাজের কাছে আমাদের জন্মগত ঋণ সম্বন্ধে সচেতনতা। সচেতনতার অর্থ ঋণপরিশোধের ঐকান্তিক সাধনা। এই কথাটি ভারতবাসীরা, হিন্দু মুসলমান জৈন পারসীক শিখ সকল সম্প্রদায়ই সহজে বোঝে। মনুসংহিতা ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নানাপ্রকার জন্মগত ঋণের উল্লেখ আছে বলে নয়, সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে, যৌথপরিবারে, জাতিবিচারে, গ্রাম্য জীবনে, পুরাতন শাসন-পদ্ধতিতে এই জন্মগত ঋণের ধারণা সমাজকে একসূত্রে বেঁধেছিল। কোন সম্প্রদায়ই সে বন্ধন থেকে মুক্তি পায় নি, সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় নি। বিবেকানন্দ ও বিপিনচন্দ্রের ভাষায় অর্থাৎ ইংরাজী কথার বাংলা অনুবাদে, তার নাম সেবাধর্ম, যার মোদ্দা কথা অধিকার নয়, সামাজিক কর্তব্য। দেশ-প্রেমিকরা ক্ষুণ্ন হবেন, ঐতিহাসিকরাও শিলালিপি থেকে অপ্রমাণ করবেন, কিন্তু তবু সত্যি যে অধিকারের (right) ধারণা বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সভ্যতা, তার রাষ্ট্রবিষয়ক, ব্যবহার-নীতি-বিষয়ক চিন্তার ও কর্মের দান। তিলক মহারাজের বিখ্যাত মন্তব্য— স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার— ইংরেজ শাসনের পূর্বে কোন মনীষীর, না গোপালের না দিব্যের, কারুরই মুখ থেকে উচ্চারিত হতে পারত না। Natural right, brith right প্রভৃতি বুলি রোমান ব্যবহারনীতির সৃষ্টি, যার মূলে ছিল jus naturale এবং jus gentium-এর যোগ। ভারতবর্ষে state ছিল না, তার পরিবর্তে সমাজ ছিল, এও একটা অধিকার সম্বন্ধে নিরাগ্রহ-তার কারণ হতে পারে। যে কারণেই হোক না কেন, পলিটিক্যাল, ইকনমিক, ধার্মিক, (ethical) কোন ব্যবহারই বিচ্ছিন্নভাবে, খণ্ডিত রূপে কল্পিত হয় নি। সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যবহারে যোগ ছিল এটুকু ঐতিহাসিক সত্য। ঐ প্রকার ধারণায় ও আচরণে ব্যক্তিত্ববোধ জাগে না, ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র, ব্যক্তি বনাম সমাজ, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, এই প্রকার বৈপরীত্য-বোধ ফুটতে পায় না। হয়ত,

ফোটবার অবকাশ না পাওয়াই আদিমতার নিদর্শন। কিন্তু আদিম, বর্বর, অসভ্য যাই হোক না কেন, অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং ঋণ-পরিশোধ ও কর্তব্য (dutis) সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতনতা আমাদের বিশেষত্ব ছিল। এখনও আছে, তার প্রমাণ, যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চার অধ্যায়ে' লিখেছেন, মা-এর হাতে বৌ এর অত্যাচার ছেলে এখনও নীরবে সহ্য করে, এবং তাই সৎ ছেলে। সহ্য-গুণ মানে কাপুরুষতাও হতে পারে, কিন্তু ছেলে যখন স্ত্রীকে সহ্য করতে শেখায় তখন তার উপদেশের ভাষা (স্বর্গাদপী গরীয়সী···হাজার হোক, মা) শুনলে প্রমাণ হবে যে গোষ্ঠী ও সমাজ-ধর্মের মূলতত্ত্বটি এখনও স্মৃতিপট থেকে বিলুপ্ত হয়নি। ঋণ-পরিশোধের ধারণা যদি বর্বরতার লক্ষণ হয় তবে একজন কম্যুনিস্ট মহারথীর বাক্য উদ্ধৃত করে দিলে অনেকে আশ্বস্ত হবেন— 'There is such a thing as the privilege of backwardness'।

দাঁড়াল এই : কম্যুনিস্ট ও হিন্দু সমাজধর্মের মিলটুকু বাহ্যিক। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে মানুষের ব্যবহার ও মন বিভক্ত হচ্ছে। তার সমন্বয় চাই। সমন্বয়ের জন্য যোগসূত্রের প্রয়োজন। এতটুকু মিল। গরমিল হলো ঐ যোগসূত্রটির প্রসারণ ও বাঁধবার শক্তিতে। কেবল ঋণ-পরিশোধের সচেতনতায় চলে না, আরো কিছুর প্রয়োজন। কম্যুনিস্টের কাছে মার্ক্সিস্ট ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা —ধরা যাক, ইতিহাস, হিন্দুর কাছে কৈবল্য। মানবমনের ওপর ইতিহাসের জোর বেশী, না ঐ প্রকার অমানুষিক সার্বিকের জোর বেশী জানি না। কিন্তু এটুকু জানি পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশেষ এক টুকরো জমিতে জন্মে, সেই জমি থেকে উৎপন্ন বিশ্ব-ইতিহাসের একটি বিশেষ পরিশীলনের উত্তরাধিকারী হয়ে ওয়েব-বর্ণিত কল্যাণে আত্মসমর্পণ করা শক্ত।

পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৪৩

ঘরে বাইরে—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, ভারতী-ভবন, এক টাকা।

১৩২০ সালে উদয়ন পত্রিকার শেষভাগে দেশ-বিদেশের চলতি ঘটনা নিয়ে প্রমথবাবু যে-সব সমালোচনা করেন সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমরা ভারতী-ভবনের কাছে কৃতজ্ঞ। অনেকেরই কাছে উদয়নের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল ঐ ঝরঝরে তরতরে লেখাগুলো। বিষয়ের সাময়িক উপযোগিতা ছাড়া যে-গুণে সাংবাদিক-রচনা সাহিত্যের রূপ নেয়, সেই ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গির পরিচয়ে রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই ঘরে বাইরে পড়ে মুগ্ধ হতেন। আশা করি, রুচির পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটেনি।

ফ্যাশান যায় আসে, কিন্তু প্রকৃত রুচি কালাতীত। সর্বাঙ্গীণ মার্জিত শিক্ষার ফলে স্বভাবের তলায় যে-টুকু থিতোয় সেই তলাণ্ডিটুকুতেই রুচির বীজ লুকানো থাকে। মানুষে হয় ভদ্র হয়ে জন্মায়, না হয় ভদ্র রুচি অর্জন করে। সকলের ভাগ্য সমান নয়, তাই সময় লাগে রুচি তৈরি করতে। আমার স্থির বিশ্বাস প্রমথবাবুর 'ঘরে বাইরে' সমসাময়িকতার অপেক্ষা রাখে না, ও ফ্যাশানবিলাসী পণ্ডিতবর্গের, যাঁরা তাঁর রচনাকে 'অসার রসিকতা' বলে উপেক্ষা করেন তাঁদের, মতামতের অপেক্ষা করে না। জ্ঞানের অপর পারে যে শালীনতা তারই ওপর প্রমথবাবুর রচনা ও তার গুণগ্রাহিতা নির্ভর করে।

সাংবাদিক রচনা সম্বন্ধে বেশ জোর করেই বলা চলে যে তার সৎসাহিত্য হতে কোনো বাধা নেই। সংবাদপত্র ভিন্ন শ্রেণীর— দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক, প্রত্যেকেরই নিজস্ব আঙ্গিক আছে। দৈনিক খবর দেওয়া যেখানে প্রধান কর্তব্য সেখানকার লিখনভঙ্গি মাসিক-পত্রিকার লিখনভঙ্গি থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য, কারণ তখন সংবাদের জৌলস, তার নাটকত্ব আর নেই। তার স্বরূপ তখন আংশিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে, মানুষে ইতিমধ্যে একমাস ধরে ভেবেছে, ঘটনা-পরম্পরার প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝেছে। কেবল তাই নয়, পত্রের স্থান অনুসারেও আঙ্গিকের বদল হওয়া চাই। প্রথম প্রবন্ধে যেমন গাম্ভীর্য, শেষের টিপ্পনীতে তেমনই লঘুত্বই গুণ। তার ওপর সময় যদি যুগান্ত ও ঘটনা যদি সঙ্কটময় হয়, সেই সব ঘটনার বিবরণ ও টিপ্পনী লেখার আদেশ যদি আসে লেখকের ওপর, এবং সেই টিপ্পনী যদি মাসিক পত্রিকার শেষ ভাগে ছাপানো হবে লেখক জানেন তবে 'ঘরে বাইরে'র চেয়ে ১৩৪০ সালের সমসাময়িক সংবাদের সম্বন্ধে আর কি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা হতে পারে আমার কল্পনায় আসে না। 'ঘরে-বাইরে' আমাদের সাংবাদিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এক উপেনবাবু ছাড়া আমাদের সাহিত্যে এ-হাত আর কারুর নেই। খেলার ভাষায় এঁরা **light heavy weight** শ্রেণীর চাম্প্যান্।

১৩৪০ সালে সমগ্র পৃথিবী আর্থিক দুরবস্থার নিম্নতম স্তর থেকে উঠতে চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষও পৃথিবীর যে বাইরে নয় চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রেই তখন তা বুঝেছেন। যুবকরা ত বুঝবেনই, কারণ তাঁদের চাকরী আর জুটছে না। জমিদারবর্গও শস্যের দাম কমার জন্য রীতিমত ঘা খেয়েছেন, চাষারা তখন খাজনা দিতে পারছে না, মূলধন ভাঙিয়ে জমিদারদের ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, সংসার চালাতে হচ্ছে। ব্যবসা প্রায় বন্ধ, মুনাফা ভীষণ কমেছে। চিন্তার জগতে তাই সাড়া এল ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় এবং সেই ব্যাখ্যার সার্বজনীনতায়,

ভারতবর্ষের দারিদ্র্যে তার প্রযুজ্যতায়। এমন অবস্থায় পড়লে সকলের মত বদলায় না। বেঁচে থাক্ ধর্ম, আদর্শবাদ, আরো কত কি! যাদের মত বদলায় তারা বুদ্ধিমান। প্রমথবাবুর মতামত পরিবর্তনের কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তাঁর পুরাতন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যেই আদর্শবাদ কিংবা ধার্মিকতার খাদ না থাকার দরুণ ঘা সইবার শক্তি ছিল। প্রমাণ স্বরূপ 'রায়তের কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। তবু তিনি সোশিয়ালিস্ট ছিলেন না, এখনও নন। তিনি বরাবরই রিয়ালিস্ট। তাই এই সমসাময়িক 'ঘরে-বাইরে'র সংবাদের তিনি মোদ্দা কথাটাই ধরলেন,— সেটা হল আর্থিক সঙ্কট।

কেবল ধরা নয়, তার সহজ ব্যাখ্যাও তিনি করেছেন, সুচারুরূপে সাজিয়েওছেন। প্যারাগ্রাফগুলির স্বাতন্ত্র্যকে প্রবন্ধের একটি বড় ছকে পরিণত করা সত্যকারের বাহাদুরী। সমগ্র বইটা ঐ হিসেবে একটা চীনে স্ক্রোলের মতন অখণ্ড ও চলন্ত।

পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৪৩

Hindu Civilisation—By Dr Radha Kumud Mookherji

(Longmans), 15/-

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আলেকজাণ্ডারের আগমন পর্যন্ত ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লেখা হয় নি। জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সাধারণের অগম্য ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় ছড়ান রয়েছে। আমাদের এই যুগ সম্বন্ধে কৌতূহলেরও অবধি নেই। এই যুগেই আর্যপূর্ব সভ্যতার উত্থান ও পতন, হিন্দু সভ্যতার প্রসার, আর্যদের প্রবেশ, নতুন সভ্যতার সাথে পুরাতনের আদান-প্রদান, ঋগবেদের ভিত্তি, সর্বপ্রথম রাজ্যগঠনের প্রয়াস, সূত্র, পাণিনি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মশাস্ত্রের জন্মকাল, মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদের প্রাথমিক সমাজ পত্তন, কোশল, অবন্তী, বংশ, মগধ রাজ্যের অভ্যুদয়, সাধারণতন্ত্রের আভাস, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার, পারসিক প্রভাবের ছায়াপাত। এই যুগের পরে ভারতবর্ষের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল— যেটিকে বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিতবর্গ যত্ন সহকারে পুনরুদ্ধার করেছেন। কলেজ স্ট্রিটে পুরানো বই-এর মতন আমাদের ইতিহাস, প্রথম কয়টি পৃষ্ঠা হয় নেই, না হয় ছেঁড়া, তাও আবার অন্য মলাটে বাঁধাই, কখনও বা প্রচ্ছদপটে সিনেমা-সুন্দরীর ছবি দিয়ে মনোহারী করবার চেষ্টা। রাধাকুমুদবাবু ছেঁড়া পাতা কুড়িয়ে নতুন করে ছাপিয়ে আমাদের সামনে

রাখলেন বলে তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এতদিন পরে আমরা ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যের সন্ধান পেলাম।

ঐক্যের দুটি দিক, পর্যায়ক্রমের, এবং অনুপ্রস্থের। ঘটনা যদি বহুল ও সঙ্কটময় না হয় তবে পর্যায়ের আগ্রহ উদ্রেক করা কঠিন, যদিও অসম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনের ও পরিশীলনের অভিব্যক্তির সাহায্যে নাটকীয় ঘটনা-দৈন্যের খানিকটা ক্ষতিপূরণ করা যায়। সে জন্য অন্য জাতীয় কৃষ্টির সংঘাত, কিংবা আভ্যন্তরীণ কোন বিপ্লবসাধক জীবন-যাত্রা নির্বাহের উপায় আবিষ্কার ও প্রসারের বিবৃতির প্রয়োজন। ধীর অভিব্যক্তি পাঠকের মনকে সজাগ রাখতে পারে না, যদি তার পিছনকার সমাজ-শক্তি সম্বন্ধে কোন মনোজ্ঞ মতামত লেখক ধারণ না করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তারও কোন সুযোগ নেই। অতএব ইতিহাসের ঐক্যসন্ধান নির্জীব হতে বাধ্য। রাধাকুমুদবাবু পণ্ডিতজনোচিত পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন, তাই ইতিহাসের প্রেরণা সম্বন্ধে সাহসভরে কিছুই খোলাখুলি বলেন নি। ইঙ্গিত দিয়েছেন যথেষ্ট, সেটি হল একটি আদর্শ সমাজের। বোধ হয়, তাঁর মতে ঐ যুগের হিন্দুসমাজে ভারসাম্য এতই সুষ্ঠু ছিল যে তার পরিবর্তনের কারণই ছিল না। যদি কোন পাঠক প্রশ্ন করেন, তবে কি হিন্দুসমাজ বেদেরই মত অপৌরুষেয় ছিল, অনার্য-আর্য সভ্যতার দান-প্রতিদানে কিছুই ফল হয় নি, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু ও পাণিনির কল্পিত সমাজে কোন পার্থক্যই নেই? তা হলে রাধাকুমুদ বাবুর এই বইখানি থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না মনে হয়। রাধাকুমুদ বাবুর কৃতিত্ব স্থিতিশীল সমাজের বর্ণনায়, গতিপ্রাণ সমাজের শক্তি বিশ্লেষণে নয়। লেখক নিতান্ত সাবধানী ব্যক্তি। তবু মনে হয় তিনি আদর্শবাদী, অতএব পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন, নচেৎ ৩১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে কোথাও হিন্দুসভ্যতার সমালোচনার ও তার প্রতি সন্দেহের সাক্ষাৎ পেলাম না কেন? আমার বক্তব্য এই, ঐক্যের পিছনকার শক্তিপরম্পরা বিশ্লেষণের জন্য আমাকে অন্য বই পড়তে হবে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে রাধাকুমুদবাবু সভ্যতার ইতিহাস লেখেন নি, কালচার-এর উৎকৃষ্ট বিবরণী লিখেছেন।

হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, রাধাকুমুদবাবুর মতে, পরিশীলনে, তার সমগ্র দেশব্যাপী চিন্তা, ধর্ম ও সমাজের সমন্বয়ে। দেশের মধ্যে প্রাদেশিক, জাতিগত, আনুষ্ঠানিক বৈষম্য থাকলেও সেগুলির সাথে মাটির ও প্রাণের যোগ থাকার জন্য ভারতীয় সমন্বয়, একচ্ছত্র সাম্রাজ্যশাসনের সময়ও, যান্ত্রিক সমতায় পরিণত হয় নি। সমন্বয়ের সাধারণ গুণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা। বর্ণাশ্রম ধর্মে মানুষের প্রবৃত্তি, ও জাতি-বিভাগে অর্থনৈতিক বৃত্তি ক্ষুণ্ন হয় নি। সংস্কৃত ভাষার আধিপত্যের

অর্থই হল সমাজ-বন্ধন। গোষ্ঠী, গণ, পুগ, জাতি, গ্রাম্য-সভা, পৌর-সভা যেন হর, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের আধিপত্য যেন লব, দু'এর সমতায় হিন্দুসভ্যতা পূর্ণ সংখ্যা।

সহজেই এই ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু রাধাকুমুদবাবুর বইখানি আদ্যোপান্ত পড়লে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁর তথ্য-সমাবেশ এতই সুচারু, এতই বাহুল্য ও ভাববর্জিত যে তাঁর পদ্ধতিকে নিষ্ঠুর পর্যন্ত বলা যায়। কোন স্থানে তিনি নিজের মত খোলাখুলি প্রচার করেন নি। যেখানে ব্যাখ্যা করেছেন সেখানেও সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এক, দুই, তিন করে তাঁর বক্তব্য সাজান। তাঁর বাক্যে কোন মোহ নেই। গোপন মূলবাক্যে গলদ আছে কি না পণ্ডিতবর্গ বিচার করবেন। অ-কথিত বাক্যের ইঙ্গিত আছে নিশ্চয়, সেটি প্রথমে ধরা পড়লেও পুস্তক পাঠের শেষে চক্রবৃদ্ধির হারে মনকে অভিভূত করে। সে-জন্য রাধাকুমুদ বাবুকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না। দোষ পড়ে ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারের ওপর। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে রফা করতে গেলে এ-টুকু ঝোঁক থাকতে বাধ্য, নচেৎ ইতিহাস লেখা নিরর্থক।

রাধাকুমুদবাবুর শ্রেষ্ঠ গুণ কিন্তু অন্যত্র— হিন্দুসভ্যতার এক একটি অংশের অখণ্ডতা বর্ণনায়। এটি হল ঐক্যের প্রস্থবিচার। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই পদ্ধতি পরিশীলন বিচারের উপযোগী,সংস্কৃতি-বর্ণনার নয়। জীবতাত্ত্বিক যেমন কোন নমুনাকে আড়ভাবে কেটে তার গঠন-পদ্ধতি অণুবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ্য করেন, লেখক তেমনিই পর পর প্রাক্‌বৈদিক, বৈদিক, সংহিতা, পাণিনি প্রভৃতি যুগের যথাসম্ভব সর্বাঙ্গীণ বিবরণ দিয়েছেন। পূর্বে লিখেছি যে তাদের মধ্যে যোগসূত্র তিনি ধরিয়ে দেন নি। কিন্তু যোগ যে আছে তাঁর বর্ণনায় প্রমাণিত হয়। সে যাই হোক, ভারতের পুরাতন ইতিহাসের এক একটি বিশেষ অবস্থার অমন সম্পূর্ণ বিবৃতি আমি অন্তত অন্য কোন পুস্তকে পাইনি। ছাত্রবৃন্দ অবশ্য এ-বই পড়তে বাধ্য, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও আমি পড়তে অনুরোধ করি। রাধাকুমুদবাবু যে চমৎকার সাজাতে জানেন, এটুকু বলা আজ নিতান্ত অনাবশ্যক। তবু বলি তাঁর অন্যান্য বই-এর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা পর্যন্ত এই বই পড়ে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। হিন্দু বৈদগ্ধ্যের এমন নকশা তিনিও পূর্বে আঁকেন নি। আমি তাঁকে দ্বিতীয় সংস্করণে বই-এর দাম কমাতে ও মুখবন্ধটি অন্যভাবে লিখতে অনুরোধ করি।

পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪৪

The Legacy of India—Edited by G. T. Garrat—With an introduction by the Marquess Zetland. (Oxford, Clarendon Press.)
আজ নানা কারণে, ভারতের বিশেষ অবদান সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ ও তার প্রকৃতি বুঝতে অনেকেই ইচ্ছুক। তার নানা বিভাগ নিয়ে বিস্তর পণ্ডিত বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন। গত তিন মাসের মধ্যেই অন্তত তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, রাধাকুমুদবাবুর Hindu Civilisation, পরমহংসদেবের শত বার্ষিকী জন্মোৎসব সমিতির প্রকাশিত Cultural Hertiage of India এবং বিখ্যাত লেগাসী সিরীজের এই বইখানি। পুস্তকগুলির প্রত্যেকখানি এমন বিশেষজ্ঞের রচনা যাঁদের কারুরই সুনামের কোন অভাব নেই। লেগাসী অব ইণ্ডিয়ার লেখকবৃন্দ দেশী ও বিদেশী। তা ছাড়া, তার ভূমিকা লিখেছেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা, মন্ত্রী জেটল্যাণ্ড, এবং উপসংহারে লিখেছেন মিঃ গ্যারাট। দুজনেরই ভারবর্ষীয় সভ্যতায় অন্তর্দৃষ্টি আছে, ও উভয়েই অন্তত এক শ্রেণীর রাজনৈতিক চাহিদা সমর্থন করেন বলে গুজোব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাঠকবর্গের সব আশাই পূরণ হওয়া উচিত ছিল।

লেগাসী সিরীজের অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে এই বইখানির তুলনা করা বোধ হয় উচিত হবে না। গ্রীস, রোম, মধ্য যুগ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যের চেয়ে পুরাতন। হয়ত বর্তমান য়ুরোপে গ্রীক, রোম ও মধ্য যুগের দান ও সক্রিয়তা আধুনিক ভারতবর্ষে বৈদিক, বৌদ্ধ কিংবা মোগল পাঠান যুগের অপেক্ষা অনেক বেশী। অতএব, সন্দেহের বশে কিছু না লেখাই ভাল। তবু এক হিসাবে তুলনা এসেই পড়ে। লেগাসী— অর্থাৎ উত্তরাধিকার যখন পুস্তকের নাম, তখন তার একটি অন্তত সূত্র দেখান চাই, যার অবলম্বনে সব লেখক অগ্রসর হবেন, এবং সব চেয়ে দরকারী কথা— যার সাহায্যে পাঠক অধিকারের ভোগ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারবেন। কেবল তাই নয়, সেই সূত্রের সঙ্গে অন্য নতুন সূত্র কী ভাবে জুড়তে হবে, ও জুড়লে নতুন সমাজ বন্ধনী কী উপায়ে প্রস্তুত হবে তার আভাসও রচনায় প্রত্যাশা করাই সঙ্গত। গ্রীস, রোম, মধ্য যুগ, এমন কি ইজরেল-সভ্যতা সংক্রান্ত বইগুলিতে তার সন্ধান কিছু কিছু পেয়েছি। পাই নি লেগাসী অব্ ইসলামে, এবং লেগাসী অব ইণ্ডিয়াতে। এই অভাবের কারণ কি পলিটিক্যাল, না কেবল বিদ্যার অভাব, না দানেরই অক্ষমতা? অবশ্য জ্যোতিষ ঘোষের দেশী সাহিত্য আলোচনায় এই দায়বোধের আভাস পেয়েছি। কিন্তু বুদ্ধি, বস্তু ও জনসাধারণের জীবনের আশ্রয়েই দেশী সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব— এই মত লেখকের নিতান্ত

নিজস্ব ও ব্যক্তিগত। তাঁর সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করি, তবু সেটি তাঁর বেশী সাহিত্যের বিবরণ থেকে স্বতই নিশ্চিতভাবে উদ্ভূত হচ্ছে বলা যায় না। কারণ বোধ হয় এই যে তিনি বাংলা ভিন্ন অন্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন। বাকী অন্য লেখকের ভারতীয় পরিশীলনের ভবিষ্যত ও বর্তমান সম্বন্ধে মন্তব্য নিছক বাক্য মাত্র। অর্থাৎ, আজ পশ্চিমী সভ্যতার সাথে ভারতীয় সভ্যতার রফা করা চাই। খাঁটি কথা, কিন্তু কী ভাবে? এর বিজ্ঞানসম্মত সদুত্তর এ বইএ নেই। তাই আমার আকাঙ্ক্ষা মিটল না।

সকলেই প্রায় ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাইরে কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে আদান-প্রদান হয়েছে উল্লেখ করেছেন। রলিনসনের হিন্দুস্থান ও য়ুরোপের পুরাতন কালের আদান-প্রদান সম্বন্ধে রচনা এই হিসাবে সর্বোৎকৃষ্ট। আব্দুল কাদির ও ব্রীগসের মুসলমান সভ্যতা ও স্থাপত্যের বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট হলেও কিংবা তাতে নতুনত্ব না থাকলেও তাঁরা লেন-দেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। ফক্স স্ট্র্যাঙ্গওয়েজের সংগীত-বিবরণ নিতান্ত মামুলি, তবু তিনি লেগাসী কথাটির অর্থ খানিকটা ধরেছেন, যদিও সে অর্থগ্রহণ একপেশে। অর্থাৎ য়ুরোপীয় লোক-সংগীত ও 'প্লেন'-সংগীত কতটা হিন্দুস্থানী সংগীত থেকে গ্রহণ করতে পারে সেই দিকেই তাঁর আগ্রহ।

ভারতের সংস্কৃতি প্রসারিত হয়ে অন্যদেশের সংস্কৃতিকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তার বিবৃতিও এই বইএ কিছু কিছু আছে। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এফ. ডবলিউ. টমাসের পুরাতন ও মধ্য যুগের সাহিত্য ও পুসিনের বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত রচনাবলী।

তা ছাড়া বাকী রচনাগুলি প্রাচীন সভ্যতার ছবি মাত্র। সেই হিসেবে সুরেন দাশগুপ্তের দর্শন, ক্লার্কের বিজ্ঞান, কডরিংটনের আর্টের বিবরণ সত্যই চমৎকার। ছবি কিন্তু উত্তরাধিকার নয়। একটি অনুপ্রাস্থের বিবরণ, অন্যটি সাতত্যের বিচার। রাধাকৃষ্ণনের হিন্দুয়ানী ও মাসানীর 'জাতি (caste) ও সমাজ-গঠন' একটু অন্য ধরনের, অর্থাৎ হিন্দুয়ানী ও জাতি-বিভাগের ব্যাখ্যা ও জোর সমর্থন। রাধাকৃষ্ণনের লেখা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। নিতান্ত মামুলি, এমন কি, এক্ষেত্রে ভাষাও ভাবের জীর্ণতাকে ঢাকতে পারে নি। মাসানি জোর কলমে, এক অস্পৃশ্যতা ছাড়া, জাতি-বিচারের সব অংশই ভাল বলেছেন। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে জীবতত্ত্ব, সুপ্রজননবিদ্যা, সোভিয়েট-তন্ত্রের বৃত্তিবিভাগ (functionalism), নীটশে, ওয়েলসের কল্পনার সমর্থন, মায়, শ্রেণী-সমস্যার নিরা-করণের সন্ধান সব কিছুই পেয়েছেন। যদি তাঁর কথা সত্য হয় তবে জাতি-গঠনই (caste structure) ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। যদি ভুল হয়, যদি এম্পিরিসিজম

আর বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকে, যদি জীবতত্ত্ব কতটা এগিয়েছে আমরা জানি, যদি ধনিক-সভ্যতার জোরে শ্রেণী-বিভাগ নিতান্ত সুস্পষ্ট হয়েছে স্বীকৃত হয়, যদি কল্পনা ও বাস্তবতা পৃথক বলে মানি, তবে মাসানির রচনা ১৯০৫ সালের উপযুক্ত, এখনকার পক্ষে নয়।

অতএব লেগাসীর অর্থ অন্তত তিন ভাবে এই বইখানিতে বোঝান হয়েছে :—ঐতিহাসিক ছবি, ভৌগোলিক প্রসার ও আদান-প্রদান, এবং রক্ষা ও সমর্থনের সামগ্রিক হিসেবে। অবশ্য বিষয়ের ওপরও বিবরণের ভঙ্গী নির্ভর করে। যেমন ক্লার্কের রচনা — ভারতের বিজ্ঞানের সাথে বর্তমান বিজ্ঞানের আদান-প্রদান অসম্ভব, ফলিত বিদ্যায় অসম্ভব নাও হতে পারে। তাই ক্লার্কের কাছ থেকে আমরা বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের ও তার বিস্তারের বিবরণই প্রত্যাশা করি, ও তাই পেয়েছি। কিন্তু হিন্দুয়ানীর, হিন্দুদর্শনের কি কোন দানই নেই, তার জোরে কি আজও কোথাও কিছু চলছে না, কি চলতে পারে না? যদি আর না চলে, ক্ষোভ নেই, তবে গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে এখনও যে চলছে তার কারণ দেখাতে রাধাকৃষ্ণন, ও মাসানি বাধ্য।

জ্যোতিষ ঘোষের ও গ্যারাটের লেখায় দোষ থাকলেও (তাঁরা উভয়েই বিশেষজ্ঞ নন) লেগাসীর অর্থগ্রহণে তাঁদের ভুল হয় নি। জ্যোতিষ ঘোষের বিষয়টি এমনি যে তার বর্ণনায় জনসাধারণের জীবন ও অস্তিত্ব স্বীকৃত হবেই হবে। দেশী সাহিত্য ভক্তির বন্যায় জন্মায়, পালিত হয় গ্রামবাসীর আদরে হাটে মাঠে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কিংবা সভ্যতা নিতান্ত শহুরে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারায় ও তাদেরই মনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য বোধ হয় গ্যারাটের বিশ্লেষণ অত ভাসা-ভাসা, যদিও তিনি আদান-প্রদান হিসেবে ইন্দো-ইংরেজ সভ্যতার সুচারু পরিচয় দিয়েছেন।

গ্যারাটের উপসংহার এক চটকায় প্রত্যেক ভারতবাসীরই ভাল লাগা উচিৎ। ভারতে ইংরেজ শাসনের দোষ তিনি দেখিয়েছেন ইতিপূর্বে। এই প্রবন্ধেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। অতএব তাঁর রচনা নিশ্চয়ই মুখরোচক। কিন্তু এইখানেই আমার গোল বাধে। গ্যারাট ইঙ্গ-ভারতের সম্বন্ধের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বিশ্বাসী, সেটা নিয়তি-গ্রথিত বলেই মনে করেন, নচেৎ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস লিখতে fulfilment কথা ব্যবহার করতেন না। ইংরেজ শাসনকর্তা ভারতীয় সংস্কৃতি বুঝতে পারেন নি, ভারতের কারুশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞান অবহেলা করেছেন, এবং সেই জন্যই এ-দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজ-শাসনের শত্রু হয়েছেন, এই হল গ্যারাটের বর্তমান সমস্যার সুগভীর বিশ্লেষণ। এ-মত ছিল

হ্যাভেলের, জেটল্যাণ্ডেরও তাই উপসিদ্ধান্ত। আমার বিশ্বাস গ্যারাট সাহেব মূলসিদ্ধান্তটি স্বীকার ও প্রচার করতে ভয় পেয়েছেন, এবং সেই ভয় গোপন করতে আত্মনিন্দার বহর খুলেছেন। গ্যারাট নিজে ইংরাজ, ভারতবাসী নন, সত্য কথা জানবার, স্বীকার ও প্রকাশ করবার সুবিধা সুযোগ আমাদের অপেক্ষা তাঁর আছে। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার তিনি করেন নি। কারণ কি? ভারতীয় পরিশীলনের প্রতি প্রেম একশ্রেণীর শাসক ও লেখকদের নিতান্তই পলিটিক্যাল। গ্রাম্যভাষায় বলতে গেলে, এঁরা থুতু দিয়ে ছাতু ভেজাতে চান। চেষ্টা করুন তাঁরা, ছাতু কিন্তু ভিজবে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যই নিজেদের কথা বিশ্বাস করেন, এবং ভারতবর্ষে এমন বোকাও আছে যে সে-কথা বেদবাক্য মনে করে। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানপাপী তাঁদের মার্জনা করা যায় না। গ্যারাট জ্ঞানপাপী। যে-লেখক হিন্দুস্থানী কারুশিল্পের অবনতি ও অন্তর্ধানের কারণ দেখতে অষ্টাদশ শতাব্দীর mercantilism ও উনবিংশের laissez faire policyর উল্লেখ করেন তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত অমন টিমটিমে, অমন বাজে, অমন জোলো হওয়ার অন্য কী কারণ হতে পারে? গ্যারাট সাহেব ইংরেজ শাসনের নিন্দা করতে প্রস্তুত, কিন্তু ঐ mercantilism আর ঐ laissez faire policyর পরিণতি, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ উল্লেখ পর্যন্ত করতে রাজী নন। ইংরেজ মনের এই ফাঁকিটা স্বাভাবিক; ভারত-সমস্যা সম্বন্ধে সত্য কথা লিখতে তাঁদের জাতি ও শ্রেণীগত স্বার্থে ঘা লাগে, এমন কি গ্যারাটের মতন বুদ্ধিমান লোকেরও। তা ছাড়া শুনেছি মনকে চোখ ঠারা ইংরেজ জাতির বিস্তর সাধনার ফল। মানুষের স্বভাবও খানিকটা তাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণের ওপর জোর দিয়ে প্রাথমিক কারণ চেপে দেওয়া, আত্মনিন্দার দোহাইএ নিরপেক্ষ পরপ্রেমিক প্রমাণিত হওয়া একটি সুপরিচিত মানসিক প্রক্রিয়া। আমার মতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সমস্যা অন্য ধরনেরই। ইংরেজ-শাসনের প্রতি প্রীতির অভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও তার প্রকৃতি দুই দেশের জনসাধারণের স্বার্থবিরোধ নিয়ে। স্বার্থের মূলে আছে অন্ন— তার ডালপালার কালচার। অন্নের বাটোয়ারায় বৈষম্য, তাই ইন্দো-ব্রিটিশ পরিশীলন এত ফাঁকা। এখানে দোষগুণ, প্রেম-ঘৃণার কথা ওঠেইনা। ঐতিহাসিক নিয়তি, (গ্যারাটের ভাগ্যবিধাতা নয়) দোষগুণের অতিরিক্ত, ব্যক্তিসম্পর্ক রহিত। সেটা চিদাকাশে খোলে না জঠরে জ্বলে।

বইখানি সম্বন্ধে তাহলে আমার বক্তব্য এই দাঁড়ায়। এতে ভাল ভাল রচনা পেয়েছি, তবু এর মূলে ও মধ্যে ফাঁকি রয়েছে। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে লেখকদের ধারণা হয় অস্পষ্ট, না হয় ভুল, হয় জানিত, না হয় অজানিত ভাবে। উত্তরাধিকার

হয় স্থিতিশীল, গচ্ছিতধনের সামিল, আর না হয়, চলন্ত, গতিশীল, নতুন অধিকারের উৎপাদন প্রক্রিয়া। একটি পূর্ববঙ্গের জমিদারবাড়ির ঠাকুরঘরের ঘড়া ভরা তোলা গঙ্গাজল, অন্যটি স্রোতস্বিনী, আবর্ত সৃষ্টি করতে করতে, দুকূল ছাপিয়ে পাশের জমিতে পলিমাটি ফেলে উর্বর করতে করতে এগুচ্ছে। ইতিহাস সম্বন্ধে আমার ধারণা শেষেরটির মতন। সংস্কারকে স্রষ্টা ও ক্রিয়াশীল হিসেবে এই পুস্তকের অনেক লেখকই দেখেন নি, যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তলিয়ে দেখেন নি, আবার কেউ বা পরকলা পরে দেখেছেন।

ফলে, কেবলমাত্র, ব্রাহ্মণজাতি, বিদগ্ধ সমাজ ও শিক্ষিত সমাজের পরিশীলন, তাদের সাথে ও মধ্যে আদান-প্রদানের কথাই লেখা হয়েছে। জ্যোতিষ ঘোষের লেখা ভিন্ন অন্য কোথাও জনসাধারণের নামগন্ধ নেই, অথচ ইংরেজই বলেন ভারতের সভ্যতা গ্রাম্যপ্রধান। আমার মতে ভারতের এতই যখন ছিল, তার সভ্যতার বাঁধন এতই যদি শক্ত ছিল, তবে তার কতটা অংশ জনসাধারণ পেয়েছে, এবং সেই জনসাধারণ সেই অংশ কতখানি নতুন অধিকার অর্জনে, নতুন সৃষ্টিতে খাটাতে পারে, কত হারে, কতদিনে, কী উপায়ে না লিখলে প্রাচীন সভ্যতার চিত্রাঙ্কন ছাড়া তার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। এ সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে কিংবা অধ্যাপকের লাইব্রেরীতে লুকানো থাকলেও চলত।

ব্যাপারটা এই— সখের ধনে কারবার চলে না। নতুন পরিশীলনসৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে, এবং সেই অনুযায়ী পুরাতন সম্পত্তির অধিকারের ব্যাখ্যা ভিন্ন লেগাসীর অন্য উপাদেয়, 'বৈজ্ঞানিক' ও পণ্ডিতী ব্যাখ্যা আমি অগ্রাহ্য করি। অনুযায়ী অর্থে যুগোপযোগী, যে যুগের প্রাণ হল সাম্রাজ্যবাদ। ইন্দোব্রিটিশ কালচারের এই হল পরিবেশ। গ্যারাটের রচনায় দু'একটি ভুল খবর আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জ্যোতিষ ঘোষের মন্তব্য স্পষ্টবাদিতারই লক্ষণ, অন্তর্দৃষ্টির নয়। এ-সব কথা বাদ দিচ্ছি।

আশা করি আমার লেখা পড়ে পুস্তকখানির প্রতি কিংবা কোনো লেখকের প্রতি কারুর অশ্রদ্ধা আসবে না। সত্যই, পৃথক ভাবে পড়লে প্রায় সব রচনাই চমৎকার। শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবেন। তবে কর্তব্যের খাতিরে আমি বলছি, এ বইএর গোড়ায় গলদ। এ বই পড়ে কী ভাবে ইতিহাস গড়বে ও কোথায় কেমন করে উত্তরাধিকার খাটান সম্ভব কেউ পরিষ্কার বুঝবে না। কেবল জেটল্যাণ্ড, গ্যারাট সাহেবের মত ভারত-প্রেমিকের সাথে আলাপ করতে ইচ্ছে হবে। আমাদের কপালে অনেক প্রেমিক জুটেছে ও জুটবে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস এই প্রকার প্রেমের জোরে লেখা হয় নি, হবে না। থুতুতে চিঁড়ে ভেজেনা।

পরিচয়, আষাঢ়, ১৩৪৪

চোরাবালি— বিষ্ণু দে প্রণীত (ভারতীভবন)—মূল্য এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা। বিষ্ণু দের কবিতা, সুধীন্দ্র দত্তের ভূমিকা ও আমার সমালোচনা, এই ত্র্যহস্পর্শের ফল কখনও মঙ্গলময় হতে পারে না। আমার ও সুধীন্দ্র দত্তের শ্রমমঙ্গলের জন্য আমি ততটা চিন্তিত নই, যতটা বিষ্ণু দে'র জন্য। তাঁর ক্ষতি হলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে, অতএব তাঁর কবিতা সমালোচনার ভার অন্যের গ্রহণ করাই উচিত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মনে হয়, আমার নিজের বক্তব্য আমার কলম দিয়ে প্রকাশ হওয়াই শোভন। এবং বিষ্ণু দের কবিতার প্রধান গুণ এই যে ভিন্ন রুচির ওপর সেগুলি পৃথক ভাবেই আঘাত করে, কেবল ভাল-মন্দর ছকে পাঠকের মানসিক প্রক্রিয়াকে নির্বাচিত করা যায় না। চোরাবালি বইখানি সমগ্রভাবে আমার ভালও লাগেনি, মন্দও ঠেকেনি, মনে আমার ধাক্কা দিয়েছে। আমি তারই বৃত্তান্ত লিখছি। ধাক্কার স্বভাবই হল সান্তরতা। একটানা ও একজোরের আঘাত স্থিতিরই সামিল, তাই এই বিবরণ একটু খাপছাড়া হতে বাধ্য। আবার উক্ত কারণেই আমার সমালোচনা চিঠির আকার আপনা থেকেই গ্রহণ করছে। অর্থাৎ, চোরাবালি পড়ে যদি গ্রন্থকারকে চিঠি লিখতে হত তবে খানিকটা এই ধরনেই লিখতাম :—

"বন্ধুবরেষু,

চোরাবালি পেলাম। ধন্যবাদের কি প্রয়োজন আছে? যদি থাকে, দিলাম, গ্রহণ কর, যদি না থাকে, তবে সহ্য কর। বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছ ও মানুষ হয়েছ, সহনশীলতা তোমার সহজ। অন্তত, তাই ভেবে প্রথম পাঠে যা মনে উঠেছে তাই লিখলাম। আচ্ছা, এই সহনশীলতার ক্ষতিপূরণ করতেই কি তুমি পাঠকবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর হও? সে যাই হোক পাঠান্তরে একটু-আধটু মত পরিবর্তনের স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করবে কি?

এতদিনে বুঝি বা, এক হিসেবে, (কী রকম সাবধান লোক দেখেছ?) বাঙলা কবিতা মোহমুক্ত হল। তোমার চোখে মদিরাবেশ নেই, মনে আত্মরতির জড়তা নেই, ভাবে শৈথিল্য নেই। পড়তে পড়তে materiality কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেষ্টা করছি তাড়াতে, এই ভয়ে পাছে materialism-এর অর্থ গ্রহণ করে। বিষয়বস্তু থেকে তুমি নিজেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখেছ নিশ্চয়। ব্যক্তিসম্পর্কহীনতার চিহ্ন কবিতায় ছড়ান, তবু মনকে নাকোচ করনি। এই দ্বৈত-বোধের ফলে একটা দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ পেয়েছি যেটা আর একটু অতিরিক্ত হলেই pose হত। আত্মসচেতনতা আছে, কিন্তু সেটা মনের অস্তিত্বই জ্ঞাপন করে। তবু, তবু বলছি ঝোঁক তোমার রয়েছে ঐ ধারে, সতর্ক থেকো। যেখানে ঝোঁক নেই, সেখানে তুমি না সাব্‌জেকটিভ, না অব্‌জেকৃটিভ (লোকে ডেস্‌ক্রিপটিভ

কবিতাকেই অব্জেক্টিভ ভাবে); তুমি material— অর্থাৎ আমি যা চাই, তাই।

এই ধর 'ঘোড়সওয়ার'। প্রথম যখন পড়ি তখনই আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। এর গতি আমার মনকে উধাও করে নিয়ে যায় মধ্য এশিয়ার স্টেপ্-এ। এমন সংহত আবেগ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। অবশ্য এই কবিতাটির ব্যাখ্যা আছে— এর যৌন প্রতীক আমার কাছে অজ্ঞাত নেই, নৃতত্ত্বও আমি কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু সে-সব কথা অবান্তর— যেমন সুধীন্দ্র দত্তের 'উটপাখী' কবিতার অর্থ প্রথম ও শেষ পাঠে (শেষ কখন হবে জানি না) অপ্রয়োজনীয়।

তোমার শক্তি বিচিত্র বিষয়-নির্বাচনে এবং আঙ্গিকে। আত্মসর্বস্বেরাই প্রধানত একঘেয়ে লেখা লেখে। যদিও তোমার কবিতা দার্শনিক কবিতার শ্রেণীতে পড়ে না, তবু এই বৈচিত্র্যের কারণ খুঁজতে দার্শনিকেরই দ্বারস্থ হতে হয়। আমার বিশ্বাস তুমি জগৎকে মায়াময়ই বুঝেছ, কিন্তু সত্যের সাক্ষাৎ পাওনি, বোধ হয় পরোয়াও কর না। দুটি প্রমাণ দিচ্ছি— (১) তোমার বিষয়গুলি আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের অনুগামী। ঠুন্‌কো জিনিস নিয়ে খেলা করতে (যাকে লক্ষ্ণৌএ দো দো পয়সা কা চীজ, ইংরেজীতে যাকে haberdashery বলে), আজকাল কেউ ওদেশে ভয় পায় না, কি কবিতায়, কি চিত্রে। সেইটাই হল আজকালকার ফ্যাশান। ফ্যাশান খারাপ নয়, সেটা সাহিত্যের মায়া। তুমি বিদেশী বিষয়বস্তুগুলি নাওনি, সাহিত্যের ভারতীয় ও শহুরে মায়া নিয়ে 'নখাড়া' করেছ। 'নখাড়া'র মানে জান? এর একটি চমৎকার বাঙলা প্রতিশব্দ আছে— কিন্তু অব্যবহার্য। যে বড়র সন্ধান পেয়েছে সে কখনও এতে মজে না। অনেক তর্ক উঠতে পারে জানি, তবু topical, কিংবা Pretty কবিতা মহান কবিতার সমধর্মী নয়। মহান কবিতা সেই লিখতে পারে যে রিয়ালিটির সন্ধানে থাকে। ব্রাডলের ভদ্রজোনোচিত রিয়ালিটি নয় হে! সেটা অনেকটা রোলস্ রয়েসের রিয়ালিটি।

(২) তোমার শ্লেষযুক্ত কবিতায় একটু গলা খাঁকারীর আওয়াজ পাই। অথচ উইণ্ডহ্যাম লুইসের মতোপযোগী satirist তুমি নও। দূরে রাখার চেষ্টাতে যতটা বিদ্রূপ আসে ততটাই তোমার সামর্থ্য। বিদ্রূপের বিপদ কোথায় তোমাকে বলতে হবে না, বই বিক্রী হয় না ত' বটেই, কিন্তু অ-সাধারণত্ব-বোধের জন্য সমাজ-বোধ থেকে বিদ্রূপকারী নিজেই সরে যায়, এবং তাইতে, আমার মতে কবিত্ব-শক্তির হ্রাস হয়। প্রকৃত satire-এ একটা ঐতিহাসিক বোধ, অর্থাৎ tragic sense থাকা চাই। তা তোমার নেই। 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'য় তুমি আনতে চেষ্টা করেছ। চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়— কিন্তু ঐখানেই এক বড় কথা ওঠে। সমাজ-বোধ না থাকলে ঐতিহাসিক বোধ আসে না, আবার ঐতিহাসিক বোধ না থাকলে

tragic sense জন্মায় না। কি করে ওফেলিয়া ও ক্রেসিডা আমার প্রাণের বস্তু হতে পারে? তোমার মতন কে অত বিদেশী সাহিত্যে পণ্ডিত বল? কে তোমার মতন সাহিত্যে sophisticated হতে পারে? আমি স্বীকার করছি ঐ দুটি কবিতাগুচ্ছে একাধিক স্তর (strata) আছে, তাদের ভাবপরিবর্তন ও সেই অনুসারে আঙ্গিকের পরিবর্তন আছে, কিন্তু সেগুলি phase-এরই অদল-বদল, তার বেশী, যাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণে ডাইন্যামিক বলি তা নয়। তোমার দেশী মেয়ে আমার মনে ধাক্কা দেয় না কেন? কেন আমার মনে রঙ ধরে না, কেন মুখে তেতো স্বাদ থেকে যায়? (রসিকতা নয়)। মামুলী ব্যাখ্যা, তুমি বুর্জোয়া, গ্রহণ করি না। আদৎ কথা, অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যা, তোমার সমাজ-বোধ নেই। সমাজতত্ত্বের জ্ঞান হয়ত প্রচুর, কিন্তু সমাজ-বোধ অন্য কথা। সুধীন্দ্র দত্তেরও সমাজ-বোধ কম, কিন্তু তার পরিকল্পনা বৃহৎ, সে large terms-এ ভাবে, তাই খানিকটা রক্ষা পায়— খানিকটা, তবু পুরোপুরি নয়।

তোমার গদ্য কবিতার মুণ্ডিত রূপ আমার পছন্দসই। তার bleakness দার্জিলিঙের নয়, মধ্যভারতের— ঘাস নেই, গরু পর্যন্ত চরতে পারে না— (কী করে সুখ্যাতি আশা কর?)। অন্য ভাষায়— তোমার একাধিক কবিতা ক্রুস্ট্যালের মতন।

চিঠি বড় হয়ে গেল। দেশে অনেকে কবিতা লিখেছেন, তাঁদের কবিতা স্মরণীয় বাক্যের মালা গাঁথা। কবিতা কিন্তু স্বয়ম্ভু ও সম্পূর্ণ হলেই আমার ভাল লাগে। তারই আশ্রয়ে বাক্য, শব্দ ও ঝঙ্কারের মহিমা খোলা চাই। কবিতায় অর্গ্যানিক ইয়ুনিটি আমি প্রত্যাশা করি। সেটা অবশ্য ভাবের বেগেও আসতে পারে, অনেকের মতেই সেইটা একমাত্র ইয়ুনিটি। কিন্তু নাও হওয়া সম্ভব। সম্ভব, তুমি প্রমাণ করেছ। এইজন্য কৃতজ্ঞ। লোকে বুঝলে না বলে আফসোস কোরো না। যে যাই বলুক, আমার স্থিরবিশ্বাস তুমি কবি। আমার বিশ্বাসের মূল্য আমার কাছে আছে— অতএব বই লিখলেই খবর পাই যেন।

ভাল কথা— একটা সন্দেহ হয়, তোমার মনের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে যেটা ঠিক আমরা যাকে এতদিন কাব্য-ভঙ্গি বলে এসেছি তা নয়…বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকের। নয় কি? ঠিক জোর করে বলতে পারছি না। ইতি—

ভবদীয়

ধূর্জটি

এই ধরনের চিঠি শ্রীবিষ্ণু দে-কে লিখতে পারতাম। এটা সাহিত্যের D. O. কিন্তু তাইতে অফিশিয়াল চিঠির চেয়ে বেশী কাজ হয় দেখেছি। তাই রচনাটি 'পরিচয়ে' চোরাবালির সমালোচনা হিসেবে ছাপান অশোভন হবে না।

পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৫

Social and Cultural Dynamics—by Pitrim Sorokin (Allen & Unwin) 3 Vols.

বইখানির তিনটি ভল্যুম আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে গত বৎসর, চতুর্থটি এখনও হয়নি। প্রায় বছর খানেক ধরে বইখানি নাড়াচাড়া করছি; ইতিমধ্যে সমালোচনার তাগিদ ভারী হয়ে উঠেছে। ভেবেছিলাম চতুর্থ ভলুমে মূলতত্ত্ব ও আলোচনা-পদ্ধতির বিচার পড়ে আমার বক্তব্য লিখব। কিন্তু নানা কারণে তার সুযোগ হয়ত মিলবে না। তা ছাড়া, লেখকের পাণ্ডিত্যের ও স্থির সিদ্ধান্তের কবলে পুনরায় পড়তে মন নিতান্তই গররাজি হয়েছে। তাই বইখানির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশের উপলক্ষে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। সুবিধা হয় ত' চতুর্থ ভল্যুমটি পৃথকভাবে দেখা যাবে।

আলোচনার গোড়ায় বলে রাখি যে বইটির দৃশ্যপট এতই বিরাট, তার প্রতিপৃষ্ঠা পাণ্ডিত্যে এতই ভরাট যে তার যথার্থ মূল্য দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ও কল্পনাতীত। আমেরিকান সোশিয়োলজিকাল এসোসিয়েশনের সমিতি বসেছিল এই বইখানির জন্য। তাঁদের মতামত আমি পড়িনি, তবে একাধিক বিদেশী পত্রিকায় এবং ক্যালকাটা রিভিউএ বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের-উপযোগী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা আমি পড়েছি। তবে ব্যাপার এই যে তাঁরা কী লিখেছেন সাফ্ ভুলে গেছি। কারুর সাধ্য নেই যে সোরোকিনের বক্তব্য ও তার ওপর মন্তব্যের সব কথা মনে রাখে।

সোরোকিনের বিষয় হল সমাজ ও পরিশীলনের পরিবর্তন। এতদিন ধরে সমাজতত্ত্বে সমাজকে, পূর্ণভাবেই হোক আর খণ্ডভাবেই হোক, জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও গতিহীন জড়সমষ্টির মতন দেখা হত। বিবর্তনবাদের প্রভাবে সমাজকে জীব ভাবা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জৈব পরিণতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ঘাতপ্রতিঘাতেরই বর্ণনার সামিল ছিল। অর্থাৎ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে সে-সব দ্বিতীয় স্তরের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার কোনো প্রকার ন্যায়সঙ্গত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এতদিন সম্ভবপর হয়নি। প্রয়াস

যে হয়নি তা নয়, তবে সেগুলি আংশিক। সোরোকিন সেইসব আংশিক প্রয়াসকে সমন্বিত করেছেন।

তাঁর পদ্ধতি বিচার করতে গেলে হেগেল, কার্ল মার্কস্ প্রভৃতি ইতিহাসের দার্শনিকবৃন্দের কথা ওঠে। ঐতিহাসিক নিয়ম আবিষ্কারে হেগেল যে-সব দোষ করেছিলেন তার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবহেলাটাই বোধ হয় সর্বপ্রধান। কার্ল মার্কস তাই হেগেলের অ-বাস্তবিকতা দূর করতে তৎপর হন। তিনি তাঁর সময়কার অবস্থান বুঝে একটা ব্যাখ্যা বার করলেন যেটা সর্বব্যাপী না হলেও বর্তমান যুগের পক্ষে যথার্থ। কিন্তু যাঁদের কার্ল মার্কসের রচনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে তাঁরাই বলবেন যে তাঁর বিশ্লেষণ অদ্ভুত রকমের সূক্ষ্ম হলেও উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক গবেষণার অপূর্ণতার জন্য ও তখনও সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব হয়নি বলে সেটি বিচিত্র ঘটনার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান সমাজশক্তির জের এখনও মেটেনি, তাই মার্কসের ঐতিহাসিক নিয়ম এখনও খাটছে, এবং খুব সম্ভব এখনও খাটবে, কিন্তু তাই বলে তাঁর আবিষ্কৃত নিয়মের সাহায্যে পৃথিবীর আদিম, মধ্যযুগীয় এবং যাবতীয় সমাজ-সংস্থান ও বিবর্তনের ব্যাখ্যা করা সেণ্ট পিটারের চাবি দিয়ে স্বর্গের দ্বার খোলার মতন গোঁড়ামি মাত্র। অর্থাৎ মার্কসীয় ব্যাখ্যার সাহায্যে এই যুগের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব হলেও সর্বপ্রকার ও সর্বকালীন সামাজিক নকশার ধীর বিবর্তনের প্রকৃত ব্যাখ্যা তাতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সাধারণ লোকে ও অসাধারণ পণ্ডিতে একটা চাবি দিয়ে সব চাবি খুলতে চায়। ফলে অদ্ভুত রকমের মতামত তৈরি হয়, যার ফল সব সময় শুভ নয়, যদিও তাতে কাজ চলে। কিন্তু কাজ চালান যাদের কাছে বড় নয়, তারা বৈচিত্র্যকে খাতির করতে যায়। এইটাই সোরোকিনের পদ্ধতির মূল কথা। এক কথায় সোরোকিন সমাজতত্ত্বের প্লুরালিস্ট।

কিন্তু প্লুরালিজমের বিপদ কোন বিবাহিত পুরুষেরই কাছে অজ্ঞাত নয়। এর চিঠি ওর কাছে' চলে যায়, সব সময় কিছু পৃথক বাক্সে ভিন্ন ভিন্ন পত্র রাখা চলে না। ফলে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। টয়েনবী সাহেব প্লুরালিস্ট হতে গিয়ে ভীষণ অশান্তিতে পড়েছেন। তাঁর সামাজিক টাইপের-সংখ্যা ডজন খানেক। কেবল তাই নয়, বাধ্য হয়ে তিনিও চ্যালেঞ্জ-রেসপন্স্‌এর ফর্মুলা ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর বই কোটেশন-কণ্টকিতই হয়েছে। টয়েনবীর যে রচনা-মাধুর্য বিখ্যাত ছিল সেটি বহুর প্রলোভনে পড়ে আত্মঘাতী হয়েছে। প্লুরালিজমের বিপদ এই— বৈচিত্র্যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বিজ্ঞান হয়ে ওঠে অর্থহীন বর্ণনা।

সোরোকিনের সমস্যা হল পূর্বোক্ত দুটি পদ্ধতির দোষ বর্জন করে সামাজিক পরিবর্তনের মোটামুটি প্রধান প্রধান টাইপ আবিষ্কার করা। বিজ্ঞানে এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন আছে, তবে সেই সঙ্গে অক্যামের ক্ষুরও চালাতে হয়। ইদানীং প্যারেটো তাই করেছিলেন তাঁর Mind and Societyতে, তবে তিনিও বিপদে পড়েন নি যে তা নয়। বিপদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি— চিঠি গুলিয়ে যায়। এ-টাইপের সঙ্গে অন্য টাইপ সব সময় খাপ খায় না, অথচ গায়ের জোরে খাপ খাওয়াতে হয়। এই বিপদ কেবল সমাজতত্ত্বে নয়, মনোবিজ্ঞানে, দেহতত্ত্বে, প্রমাণ— ইয়ুং, ক্রেৎস্‌মার প্রভৃতির জবরদস্তিতে। কোনো বিজ্ঞানের প্রারম্ভে জাতিবিচার প্রয়োজনীয় হলেও একবার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই জাতিবিচার নিয়ে বাড়াবাড়ি করা দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরই শোভা পায়।

সোরোকিন সাত প্রকারের কালচার-মনোভাব ভাগ করেছেন। Ascetic ideational, Active sensate, Active ideational, Idealistic, Passive sensate, Cynical sensate, and Pseudo-ideational। মোটামুটি কালচার-মনোভাব তিন প্রকারের, ideational, sensate এবং mixed। মনোভাব বলতে যদি তত্ত্ববোধ, প্রধান প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য-সাধনের পন্থা, জীবন-সংজ্ঞা, শক্তির ব্যবহার, ক্রিয়া-পদ্ধতি, আত্মজ্ঞান, জ্ঞান, সত্য সম্বন্ধে ধারণা, ধর্মতাৎপর্য, সৌন্দর্যবোধ, এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কল্পনা ও আচার-ব্যবহার বোঝা যায় তবে সোরোকিনের মতে ideational টাইপের সঙ্গে sensate টাইপের সম্বন্ধে মূলগত পার্থক্যই ধরা পড়বে। কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজের পরিবর্তন লক্ষ করলে দেখা যায় যে এই দুটি প্রধান টাইপ অনেক ক্ষেত্রে মিশেছে। এই তিন ভল্যুমে কিভাবে তাদের মিশ্রণ ঘটেছে তারই বর্ণনা আছে। আর্ট, সত্যানুসন্ধান, ধর্মতত্ত্ব, ব্যবহার-নীতি, সামাজিক সম্বন্ধ, যুদ্ধ ও বিপ্লবের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আমি অন্তত ইতিপূর্বে কোথাও পড়িনি। সংগীতের রূপ পরিবর্তনেও যে সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োগ সম্ভব আমার জানা ছিল না। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার বিচার পাণ্ডিত্যেরই অভিমান মনে হয়, কিন্তু সংখ্যার সাহায্যে যে অনেক সাধারণ ধারণার ভুল ধরা পড়ে এ-কথা অনস্বীকার্য। তা ছাড়া, সমাজতত্ত্ব জানতে হলে সংগীতে জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ দুটিরই বিষয় রূপপরিবর্তন, এই সুসংবাদে আনন্দ পাওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

সোরোকিনের শেষ প্রতিপাদ্য হল এই : পশ্চিমী সভ্যতা লোপ পেতে বসেনি, যেমন স্পেংলার বলেছেন ; মাত্র, পশ্চিমী সভ্যতার sensate অধ্যায়টি শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছেছে। এর পর, তাঁর বিশ্বাস, নতুন অধ্যায় শুরু হবে। তাঁর ইচ্ছা পশ্চিমী

মানুষ এইবার বহির্জগতের অধিকার বিস্তার থেকে ক্ষান্ত হয়ে আত্মসংযমের নিযুক্ত হোক ; কিন্তু যেকালে আত্মসংযম absolute values ভিন্ন অসম্ভব, তখন তাঁর ভাষায় 'hence the logical necessity and practical urgency of the shift to a new Ideational Culture'।

চমৎকার কথা, হাজার বার হাজার লোকে তাই মানছে, লিখছে, বলছে, অনুভব করছে। আমরা নাকি আজ হাজার বছরের ওপর তাই বলে আসছি, তবু মজা এই— পশ্চিমী সভ্যতার কোনো উপকারই হচ্ছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিটলার ও মুসোলিনি সোরোকিনের এই তিন ভল্যুম পড়েন নি। কিন্তু, সন্দেহ হয় যে চেম্বারলেন বৃদ্ধ বয়সে উড়ো জাহাজে হিটলারের দরজার ধর্ণা দেওয়ার বদলে এই তিন ভল্যুম air-mail-এ পাঠালে বড় বেশী লাভ হত না। ব্যাপার হল এই : সামাজিক শক্তির সূক্ষ্মতম বর্ণনায় জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু জ্ঞানের বাজার দর এখন নেই বল্লেই চলে। সেটা স্বাভাবিক ; কারণ যে-জ্ঞান জেনেই নিঃশেষিত হয়, সেই জ্ঞানের গোড়াতেই গলদ রয়েছে— অর্থাৎ সেটা বিষয়-পরিবর্তনের সাহায্য করে না। এক কথায় সেটা জ্ঞানই নয়। এই দুহাজার পৃষ্ঠার বইখানিতে গরু হারালে গরু খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন ভিন্ন ভিন্ন টাইপ জন্মায়, কেন একটি টাইপ অন্য টাইপে মিশে যায় তার কোনো ব্যাখ্যাই নেই। এক কথায় সোরোকিন dynamics কথাটি ব্যবহার করেছেন হাল্‌কাভাবে, যেমন ঐতিহাসিকরা এতদিন করে এসেছেন। কিন্তু আমার মতে ইতিহাস কেবল ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্‌টান নয়। যে-মানুষ জলে ডুবে মারা যাচ্ছে তার সামনে শুনেছি এমনি পুরাতন জীবনের অনেক ছবি সারিসারি ভেসে আসে— বোধ হয় সোরোকিনের অবস্থা তাই ; কিন্তু অন্যধারে তিনি বিশ্বাসী পুরুষ, পশ্চিমী সভ্যতার ভবিষ্যতে তাঁর আস্থা অটল। তাঁর কাছে ইতিহাসের গূঢ় নিয়মের আবিষ্কারই প্রত্যাশা করেছিলাম। বলতে বাধ্য, হতাশ হয়েছি। সোরোকিন নিশ্চয়ই কার্ল মার্কস-এর চেয়ে বিদ্বান, কিন্তু তাঁর চেয়ে বোধ হয় একটু কম বুদ্ধি ধরেন। বল-শেভিকের দল ,এঁকে নির্বাসিত করে রুশিয়ার বিশেষ কিছু ক্ষতি করে নি, অধ্যাপকবহুল আমেরিকারই লাভ হয়েছে। পৃথিবী অবশ্য কখনও অধ্যাপকের কাছ থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করে না— এক কর্তৃপক্ষের কৃতিত্বের সমর্থন ও গুণ-গান ছাড়া।

তাই এই তিন ভল্যুম অধ্যাপকেরই ভাল লাগবে— জগতের পরিবর্তনে বিশেষ কাজে লাগবে না।

পরিচয়, কার্তিক, ১৩৪৫

Beware of Pity—by Stefan Zweig (Casell).

অবশ্য ভাল বই, লেখক নামজাদা, গল্প একটানা স্রোতের মতন বইছে, বাছা-বাছা সমালোচকবৃন্দ সুখ্যাতিতে শতমুখ, অবাধে প্রত্যেকেই আত্মচরিত বলে যাচ্ছে— অর্থাৎ উপভোগের উপকরণে কোনো ত্রুটি নেই। তবু যেন জিভে তিতো ঠেকছে।

বিষয় হল 'করুণা'। করুণা দুই প্রকার, সাঁচ্চা ও ঝুটা। ঝুটা করুণা স্বার্থপর ভাববিলাস, খাঁটি করুণায় অনন্তকালের জন্য সংযম ও সহ্যগুণের প্রয়োজন। যেটি ভাল সেটি অসহ্য এই তথ্যটি নতুন নয়। অবশ্য যেটি অসম্ভব রকমের ভাল তার বর্ণনাতেও যথেষ্ট পরিমাণে ভাবালুতা আশ্রয় করতে পারে, বিশেষত সেই জঘন্য ভাবালুতা যেটি আদর্শের ছায়ায় ঘেঁটুফুলের মতন ফুলতে থাকে। এ বিপদ কিন্তু সর্বত্রই বিরাজমান, তাই তাতে কিছু আসে যায় না, যদি লেখক বুদ্ধির সাহায্যে সতর্ক হন। এক্ষেত্রে লেখক খানিকটা সাবধান হয়েছেন, পুরোপুরি নয়, কারণ নায়কটিকে পয়লা নম্বরের প্রীগ্ মনে হল।

বাস্তবিক পক্ষে বইখানা সংকীর্ণ। তার প্রধান কারণ এই যে লেখকের উদ্দেশ্যই হল করুণাকে চারপাশের জ্ঞাতি-প্রবৃত্তি থেকে পৃথক করা। অতএব বইখানির পাতায় পাতায় গোঁড়ামি ধরা পড়ে। টনি হফ্‌মিলার, অস্ট্রিয়ান অশ্বারোহী দলের অফিসার, ছোট হলেও অফিসার, একটা পাড়াগেঁয়ে শহরের সেনানিবাসে থাকবার সময় একজন হঠাৎ-বড়লোক পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হলেন। সে ভদ্রলোকের অতীত খুব সাফ্ ছিল না, কিন্তু তাঁর খোঁড়া মেয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি যেন সর্বক্ষণই প্রায়শ্চিত্ত করছেন। টনি এই মেয়েটি, ঈডিথের সঙ্গে করুণাপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। ঈডিথ কিন্তু প্রেমে পড়ে গেল। টনি ওধারে করুণাকে শুদ্ধ অর্থাৎ প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেষ্টা করলেন। বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ খোঁড়া মেয়েটিরই তাগিদে টনি বিবাহ পর্যন্ত করতে মত দিলেন। কিন্তু, সামান্য ভুলচুকের জন্য মেয়েটি যখন বুঝলে যে টনি তাকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না, মাত্র তার প্রতি অনুকম্পান্বিত, তখন আত্মহত্যা করলে। টনির করুণা দুর্বল, ঝুটা।

অন্যধারে ডাক্তার কণ্ডরের করুণা বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ সাচ্চা। তিনি রোগীকে — ঈডিথকে অন্যায় আশ্বাস দিতে চান না, টনিকে লম্বা লম্বা সৎ পরামর্শ দেন, যথা Beware of Pity এবং বিশুদ্ধ করুণার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক অন্ধ নারীকে সহধর্মিণী করেছেন। প্রেমে পড়ে ঐ কার্য করেছিলেন কিনা প্রমাণ নেই, এমনকি তারপর অন্ধ নারীকে ভালবাসতেন কিনা তাও বোঝা যায় না। তবু দু ধরনের করুণার তুলনার জন্য কণ্ডর নিতান্ত উপকারী।

কেবল তাই নয়। টনি বেচারী অস্ট্রিয়ান অফিসার, তাই শ্রেণীর মর্যাদা রক্ষার জন্য সে নিজেই সংকীর্ণ। যুদ্ধে সে যেমন সাহসী, প্রেম-ব্যাপারে সে নিতান্ত ভীরু। চার-চার বার সে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে, শেষবারে মহাসমরে যোগদানের সাহায্যে। তখনই বুঝলে খোঁড়া মেয়েটিকে খুন করবার পাপ কোথায় ভেসে গিয়েছে সেই সার্বজনীন নরহত্যায়।

এই মহানিষ্ক্রমণ আমাদের সনাতন ও শাস্ত্রীয় পন্থা। করুণারই জন্য ভগবান বুদ্ধদেব থেকে চৈতন্য, রামানুজ, তুলসীদাস, ম্যয় আমার গল্পের নায়ক পর্যন্ত সংসারত্যাগী। অতএব এই প্রক্রিয়ায় আমার কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। খিচ্ মাত্র এই, পালাবার সময়টিতে মুখে কাপড় দিতে হয়, তাও আবার রাতভিতে পালাতে হয়, পরের দিন সকাল বেলা মুখ তিতো হয়ে ওঠে। যখন সূর্য ওঠে তখন মনে হয়, প্রবৃত্তিগুলো কি এতই পৃথক, এতই ভিন্নধর্মী?

পাঠক হয়তো ভাববেন আমি সাহিত্য-সমালোচনা করছি না। আমার বিশ্বাস আমি তা ছাড়া আর কিছুই করছি না। এই প্রকার সংকীর্ণ একমুখীনতায় গল্পের খুব সুবিধা। গল্প প্রবন্ধের মতন একটানা বইতে থাকে, পাঠক একদমে বই শেষ করতে পারে, ভাষা বেশ সতেজ হয়। পাঠকের মন বিক্ষিপ্ত না হওয়ার দরুণ লেখকের প্রতি, রচনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে। সাহিত্যের বৈঠকে একেই আর্ট বলা হয় অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কী উদ্দেশ্য! যেমন, এঞ্জিনের সৌন্দর্য রেল-লাইন থেকে বিচ্যুত না হয়ে প্যাসেঞ্জারকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাবার ক্ষমতার দরুণ। যেমন, সংগীতের আসরে মালিগৌরাকে পুরিয়া ধ্যানশ্রী থেকে এক মিনিটের জন্য বাঁচাতে পারার দরুণ গায়ক-বাদকের কৃতিত্ব অর্থায়। কিন্তু—ঐ এক মিনিটের জন্য। পরে মনে ওঠে পাল তুলে ভেসে যাওয়া মন্দ নয়,আধ-ঘণ্টা ধরে পুরিয়ার আলাপ চললে কী সর্বনাশ হত, তার মধ্যে কি মালিগৌরার আমেজ দেখান যেত না? সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বালজাকের কথা আসে। তিনিও একটি মাত্র 'প্যাশন' নিয়ে ব্যবসা করতেন। তাঁর 'প্যন্‌স্' নামে একটা নভেল আছে, যার বিষয় হল পরের বাড়ি খেয়ে বেড়ানর প্রবৃত্তি, passion for dining abroad। বইটা বালজাকের শ্রেষ্ঠ বই নয়, বিষয়টিও হয়ত সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কিন্তু এই নিম্নশ্রেণীর প্রবৃত্তির চারধারে কত না ছোট বড় প্রবৃত্তির খেলা চলছে। তাই মনটা প্রশস্ত হয়, চিত্ত ভরে ওঠে। Beware of Pity চমৎকার বই মানছি, কিন্তু ঐ শ্রেণীর নয়। যাঁরা বালজাক পড়ে রুচি তৈরি করেছেন তাঁদের প্রবৃত্তির সংকীর্ণতায় আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু সমধর্মী রচনার বিচারে তাঁরা খুঁৎখুঁতে হতে বাধ্য। আবার বলছি একটি কোনো প্রবৃত্তি

কিংবা ভাবকে আশ্রয় করাতে আমার কোনো প্রকার আপত্তি নেই, যদি সেটা ট্রাজেডীতে পরিণত হয়েছে দেখি! পাথরের নুড়ীকে নারায়ণ ভাববার সুযোগ মেলা চাই। মজা এই যে বইখানির দু'একটি স্থানে সঙ্কীর্ণতা খসে গেছে, সেখানেই করুণা লোপ পেয়েছে, সেখানেই বুঝেছি যে লেখক সাধারণ নন। তবু মোটের ওপর মনে হয়েছে যে টনির জীবনের ঘটনাসমাবেশ gaucherie মাত্র। এতে চমৎকার বই লেখা হয়, কিন্তু বড় বই-এর জন্য কিছুর অন্য প্রয়োজন।

পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৪৬

The Power and the Glory—Graham Greene (Heinemann)

To a God Unknown—John Steinbeck (Heinemann)

দশ পনের বৎসর পূর্বে ডি. এইচ্. লরেন্স য়ুরোপীয়ান সভ্যতার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে মেক্সিকোর এক অখ্যাত স্থানে কিছু কালের জন্য বসবাস করেন। খ্রীস্টান ধর্মের বে-দৌলতে য়ুরোপীয়ান মানুষ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে যে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ আজ ছিন্নভিন্ন, সচেতনতার মোহে সে অন্ধ, এবং স্বকৃত আবর্তে নিমজ্জিত ; এই ধারণার বশবর্তী হয়ে লরেন্স অ-খ্রীস্টান ধর্মের সন্ধানী হন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন-ধর্মের ছাত্র না হয়েও নিজের তাগিদে তিনি তাদের সাধনার অন্তত এক আধটি সত্য হৃদয়ঙ্গম করেন। অবচেতনা সংক্রান্ত তাঁর দু'খানি বই আছে যাতে অনেকে তান্ত্রিক সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছেন। অথচ তিনি মাত্র সীলন পর্যন্ত আসেন এবং সেখানকার অধিবাসীরা, যাঁদের তিনি ভারতবাসী ভেবেছিলেন তাঁর কাছে অশ্রদ্ধারই পাত্র হন। শেষে তিনি ঘুরতে ঘুরতে মেক্সি-কোয় পৌছান। মেক্সিকোর জীবনযাত্রার বর্ণনা থেকে টের পাই যে তিনি তথাকার ইণ্ডিয়ানদের ধর্মচার সম্বন্ধে অত্যন্ত কুতূহলী হন। Plumed Serpent নামক নভেলখানিতে তাদের গুহ্য ধর্মের আখ্যান আছে। লরেন্স-এর এই বিশ্বাস জন্মায় যে ঐ দেশে খ্রীস্টান-ধর্মের প্রলেপের নীচে একটি আদিম ঐতিহ্যের স্রোত বইছে যার অস্তিত্ব প্রকাশ না পেয়ে থাকতেই পারে না ব্যক্তিগত জীবনের সকল সঙ্কটময় মুহূর্তে, যার শক্তি আভিজাত্যের হেতু ও যার চিরন্তন কার্যকরিতা বীজের সনাতনত্বেরই তুলনীয়। যদিও লরেন্সের বিশ্বাস এবং নাৎসীদের race theory এক বস্তু নয়, তবুও এ-কথা ঠিক যে তাঁর 'রক্ত-প্রবাহের ধারা' মানুষের সমবেত প্রয়াসকে অমান্য ক'রে একটি অ-মানুষিক, বুদ্ধির অগম্য, বিকৃত বিশ্বাসের সহায়ক হতে পারে। সৌভাগ্যের কথা যে জনসাধারণ তাঁর নব্য ধর্ম গ্রহণ করে

নি, কারণ সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ঐ বিশ্বাসের এক আন্তরিক বিরোধ অনেকেই সন্দেহ করেছেন। কিন্তু সমাজের দিক থেকে লরেন্সীয় বিশ্বাসের অসার্থকতা থাকলেও, একাধিক লেখক তাঁর প্রতিবাদের, তাঁর সন্বিৎসুতায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগস্থাপনের আহ্বানের তীব্রতায়, প্রভাবান্বিত হন। ফলে অনেকে খ্রীস্টান ধর্মের মূল ঘটনায় অর্থাৎ যীশুর আত্মদানের মাহাত্ম্যে ও তাৎপর্যে আকৃষ্ট হন; কেউবা তারও পিছনকার সাধারণ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পেগান-সাহিত্য রচনা করতে থাকেন। সুবিধাও সৃষ্টি করেছিলেন ফ্রয়েড্ ও ফ্রেজার এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দ। জাতীয় অবচেতনার অস্তিত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পিতাপুত্রের বিরুদ্ধ সম্পর্ক, বলিদান প্রভৃতি প্রাথমিক ধারণা গদ্যে-পদ্যে ফুটে উঠল। মাইথলজির পুনরুত্থানে বর্তমান সাহিত্য সমৃদ্ধই হয়েছে। আজকালকার অনেক বিদেশী রচনার অর্থ বোঝাই যায় না ফ্রেজারেরর **Golden Bough** এবং ফ্রয়েড্, ইয়ুং-এর পুস্তক না পড়লে, তাঁদের মতামতের সঙ্গে না পরিচিত হলে। (বর্তমান বাংলা কবিতাতেও এই প্রভাব ধরা পড়ে।) গ্রেহাম গ্রীন ও স্টাইনবেকের নভেল দু'খানি কেবল মেক্সিকোর বর্ণনায় নয়, ঐ দেশের বর্তমান সভ্যতার নিম্নস্তরের ঘটনা-বিবরণে এবং জগৎজোড়া প্রাথমিক মীথ্-এর ব্যবহারেও লরেন্স-এর প্রভাবে পুষ্ট। গ্রীন ক্যাথলিক চার্চের স্তরেই সন্তুষ্ট, কিন্তু স্টাইনবেক্ তারও নীচে গেছেন যেখানে আত্ম বলিদানে মাটি উর্বর হয়।

Power and Gloryর গল্পটি এই : মেক্সিকোর একটি প্রদেশ কম্যুনিস্টদের হাতে এসেছে, তাই মদ কেনা-বেচা বন্ধ ও পাদ্রীরা পলাতক। যে-পাদ্রী বিবাহাদি ক'রে ধর্ম যাজনায় ইস্তফা দিয়েছেন তিনি আছেন ভাল, আর যিনি পালিতদের আত্মার কল্যাণের জন্য নিজেকে দায়ী ভাবেন তিনি বনে-জঙ্গলে পালিয়ে কর্তব্য সাধন করছেন। গল্পের নায়কের পিছনে রাষ্ট্রশক্তি উঠে পড়ে লেগেছে। তিনি ইচ্ছা করলে পালাতে পারেন, কিন্তু শুভ মুহূর্তে কোন না কোন গরীব গ্রামবাসী তাঁর কাছে কন্‌ফেশন ক'রে পাপের বোঝা খালি করতে চায়, কারা বা তাঁর কাছে ইনটারসেশন প্রত্যাশা করে। তিনি না বলতে পারেন না, তাই বিপদ তাঁর পদে পদে। অবশ্য পাদ্রী সাহেব নিজে ব্রাণ্ডি খান এবং তাঁর একটি জারজকন্যাও আছে। অর্থাৎ একটি ক্যাথলিক পাদ্রীর প্রায়শ্চিত্তের এবং তার নক্‌শাটি অনেকটা ভিক্টর হ্যুগোর লে মিজারেবল-এর মতন— এমন কি জ্যাভেয়ারেরও জুড়ি পর্যন্ত। শেষকালে পাদ্রী ধরা পড়লেন— এবং কম্যুনিস্টরা তাঁকে গুলি করে মারলে। শেষ-দৃশ্যটির বর্ণনা সোজাসুজি নয়, প্রতিবেশী ঘটনার পটভূমিতে তার মর্ম উদ্‌ঘাটিত। ঘটনার মধ্যে একটিতে একজন দর্শকের দাঁত কন্‌কনানি, আমার

পরিচিত মনে হল স্ট্রীণ্ডবার্গেরই বোধহয় একটি ছোট গল্প আছে— নাম Tooth-ache— সেখানে যীশুখ্রীস্টের বলিদানের মাহাত্ম্য একজন দর্শকের দাঁতের ব্যথায় নিরর্থক প্রতীয়মান হচ্ছে। যীশুখ্রীস্টের বদলে এখানে ক্যাথলিক পাদ্রী। সে যাই হোক— গ্রীনের হাতে পাদ্রীর মনুষ্যত্ব যেমন খুলেছে তেমনই সেই মনুষ্যত্বের অপূর্ণতা ও পূর্ণ হবার প্রক্রিয়া অর্থাৎ আত্মবলিদানের সাহায্যে প্রায়শ্চিত্ত, যেন একটু বেশী স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে। গল্পের গতিতে ধর্মকথা খুব বেশী ঢাকা পড়েনি। তবু মোটামুটি বইটা খুবই সুখপাঠ্য— যদিও মোড়কের উচ্ছ্বসিত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে একমত হতে পারা যায় না। স্টাইনবেকের এ বইখানি তাঁর Grapes of Wrath-এর পূর্বেকার রচনা। পরিচয়ের পাঠক নিশ্চয়ই Grapes of Wrath পড়েছেন— সত্যই এমন নভেল এ-যুগে লেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। যে লেখকের শক্তি এমন এপিক-ধরনের তাঁর অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখাও মূল্যবান। আমি অন্তত এইজন্যই বইখানির মন দিয়ে পড়লাম। গল্পটির ছক মোটামুটি Grapes of Wrath-এরই মতন খানিকটা। ওয়েন-গোষ্ঠী নতুন জমিতে বসবাস করেছেন লাভের আশায়, সেখানে আপাতত প্রচুর জল থাকলেও কখনও কখনও অজন্মা আসে। কিন্তু যোসেফ্ (নামটি সার্থক) কপাল ঠুকে ও নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাসের জোরে "ভ্যালি অব্ আওয়ার লেডী" নামক উপত্যকায় চাষবাস শুরু করলেন। তাঁর বিবাহ হল, ছোট ভাই মারা গেল, একটি ছেলে হল, গরু বাছুর বেড়ে চলল— এই ভাবে সংসার গড়ে উঠল। ওয়েন পরিবারের ডেরার মাঝখানে ছিল একটা মস্ত বড় ওক্ গাছ, তাকে যোসেফ পিতৃস্থানীয় বিবেচনা করত, তার ধারণা যে মৃত পিতার আত্মা ঐ গাছে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এই প্রকার অ-খ্রীস্টানী বিশ্বাস যোসেফের মেজ ভাইয়ের সহ্য হল না। সে— বার্টন্ —একদিন গাছটির মূল কেটে দিয়ে চলে গেল— সে ছিল গোঁড়া খ্রীস্টান। দূরের জঙ্গলে, পাইন বনের বুকের মধ্যে একটি ধারা বইত, তার উৎস ঢাকা থাকত একটি শেওলাঘেরা পাথরে, যার রূপ অনেকটা ছাগলের মতন। প্যানের উল্লেখ লেখক না করলেও, ইঙ্গিতটি বোঝা যায়। অবশ্য এই পাথর দেখলেই যোসেফ ও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথেরও আতঙ্ক আসত। মেক্সিক্যানরা পাথরটাকে বলি-দানের স্থান ভাবত। একদিন এলিজাবেথ একলা এখানে এসে মূর্ছা যায়, তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। জননী হবার পর সে যোসেফের সঙ্গে আবার সেখানে যেদিন এল, তখন তাচ্ছিল্যভরে তার ওপর চড়তে গিয়েই সে গেল পড়ে, এবং সেই পতনেই তখনই হল তার মৃত্যু। তারপর যোসেফ একদিন লক্ষ্য করলে যে ওক্ গাছটি শুকিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে অনাবৃষ্টি এল, গরু-বাছুর মরতে লাগল,

ঘাস পর্যন্ত জন্মাল না। যোসেফ ও তার ভাই টমাস, যার সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের একটি সহজ সম্বন্ধ ছিল, ভয় পেয়ে উপতক্যার ও-পিঠে যেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়, সেখানে নতুন জমি খুঁজতে গেল। সেখানে এক অদ্ভুত বুড়োর ঘরে তাদের রাত্রিবাস করতে হয়— সে বিশ বছর ধরে শেষ পাহাড়ের কিনারা থেকে সূর্যাস্ত দেখে আসছে, এবং ঠিক সূর্য যখন ডুবছে তখন একটা পাথরের ওপর প্রত্যহ পশুবলি দিয়ে আসছে। এই প্রকার আচার ড্রুইড্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দু'ভাই ফিরে এল বটে, কিন্তু যোসেফ ঠিক করলে যে সে নিজে পুরাতন উপত্যকাতেই থাকবে, কারণ তখনও পাইন বনের উৎস ধারা সমান জোরেই বইছে। সে ভাবলে যতদিন উপতক্যার ঐ প্রাণরূপী স্রোতটি বজায় আছে ততদিন আশা। টমাস্কে সবশুদ্ধ অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়ে সে উৎসের ধারে বসবাস করতে লাগল। এসে জুটল সেখানে এক পুরাতন ম্যাক্সিক্যান সঙ্গী। একদিন যোসেফের সন্দেহ হল ধারা কমছে শেওলা শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে জল সেঁচতে লাগল দুজনে। ফল হল না। একদিন উৎস গেল বন্ধ হয়ে। যোসেফ সেই পাথরের ওপর শুয়ে ছুরি দিয়ে কব্জীর শিরা কেটে দিলে। রক্ত এসে পড়ল উৎসের মুখে। বৃষ্টি এল আকাশ ছেপে।

আমার দুঃখ যে রচনার মর্যাদা রক্ষা হল না এই সংক্ষিপ্তসারে। স্টাইনবেকের ভাষা সত্যই অপূর্ব। যে-সব চিন্তা শব্দের ও ভাষার অতীত তারাই রূপ পেতে ব্যাকুল প্রত্যেক চরিত্রের মুখ দিয়ে। এবং রূপ পেয়েছে, বোধহয় যতটা সম্ভব ততটাই। তাই বইখানিতে ইমেজ ও সীম্বলের এত প্রাচুর্য। বলা বাহুল্য ইমেজগুলি চাক্ষুষ নয়, তারা সীম্বলধর্মী। সেইটাই স্বাভাবিক কারণ Golden Bough-এ বর্ণিত মীথ্গুলি প্রত্যয়মূলক। তাদের রূপায়িত করতে সেকালে একমাত্র গ্রীক, হিন্দু, ও মায়া জাতিরাই আংশিকভাবে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু বাকি অংশ সর্বত্রই ধর্মচার ও দর্শনের মধ্যে থেকেই আত্মরক্ষা করেছে। সর্বসাধারণের চেতনার স্তরে যখন মীথ্গুলির স্থান আজ আর নেই, তখন মূর্তি গড়া অসম্ভব, নব্য পুরাণ লেখাই চলতে পারে। নব্য-পুরাণের সন্ধ্যাভাষা স্টাইনবেকের করায়ত্ত। তিনি রীতিমত কবি হলে ইয়েট্সের সঙ্গে তার তুলনা সম্ভব হত, কিন্তু যেকালে গদ্যেই তিনি লেখেন তখন তাঁকে লরেন্স-এরই সমগোত্রের বলব। যেখান স্টাইন-বেকের ভাষাগত কৃতিত্ব সেটা তার ছন্দে। ছন্দ স্বভাবজ, যেন সেটি সমগ্র প্রকৃতির উত্থান-পতন, জীবন-মৃত্যু, ঋতু-বিবর্তনের লয়ে বাঁধা। লরেন্স-এর ভাষা এ-রকমের ছিল না। তাঁর শব্দ-চয়ন সব সময় evocative হত না, যদিও সব প্যারাগ্রাফটি পড়লে বর্ণিত বস্তুর প্রাণ পাওয়া যেত। সে যাই হোক—এই

বইখানিতে অন্তত লরেন্সের কাছে, স্টাইনবেকের ঋণ সর্বজনগ্রাহ্য। এ-প্রকার ঋণই productive। Grapes of Wrath-এ তিনি ধার শুধে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। আমি সাগ্রহে পরিচয়ের পাঠকবৃন্দকে বই দুখানি পড়তে অনুরোধ করছি। বাংলা সাহিত্যে এ প্রকার বই নেই, যদিও তাদের সম্ভাবনা কল্পনার অতিরিক্ত নয়, বরঞ্চ, হওয়া এক হিসেবে সহজ।

পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

Roger Fry — A biography — By Virginia Woolf. (Hogarth Press)

ঠাট্টার ছলে একদিন রজার ফ্রাই ভার্জিনিয়া উল্‌ফকে বলেছিলেন, "জীবনচরিত রচনা সম্বন্ধে তোমার ধারণাগুলি না হয় আমাকে নিয়েই পরীক্ষা কোরো।" তারই ফলে এই নিতান্ত সুখপাঠ্য বইখানি। আর্ট-সংক্রান্ত মতামত বাদ দিয়ে তাঁর মতন জগদ্‌বিখ্যাত কলাবিদের জীবনী যে লেখা সম্ভব সেইটাই আমাদের কল্পনাতীত; তার ওপর রজার ফ্রাই-এর জীবনে নাটকত্ব কিছুই নেই। ঘটনা বলতে পোস্ট-ইম্প্রেসনিস্টদের প্রদর্শনী সম্পর্কে জনসাধারণের এমন কি বন্ধুবান্ধবদের কাছে অপ্রিয় হওয়া, 'ওমেগা' কারখানা খোলা, এবং পিয়ারপণ্ট মর্গ্যানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মোটা মাইনের চাকরী ছাড়া, জীবনচরিত-লেখকদের পক্ষে এ-গুলি নিতান্তই সাধারন, এমনকি স্ত্রীর মাথা খারাপ হওয়া পর্যন্ত। অতএব, বাকী রইল রজার ফ্রাই-এর ইংরেজ জাতকে আর্ট-শিক্ষা দেবার প্রয়াস— বক্তৃতা, চিঠি ও কথাবার্তার মারফতে। যাঁরা রাস্‌কিন-মরিসের পরবর্তী ইংরেজ সমাজের রুচি কী ছিল জানেন, এবং সর্বত্র জনসাধারণের চারুকলার প্রতি বীতরাগ অনুভব ক'রে দুঃখ পেয়েছেন তাঁরা বুঝবেন রজার ফ্রাই-এর কৃতিত্ব কোথায় ও কতখানি। সে-কৃতিত্বের প্রেরণা ছিল না রজার ফ্রাই-এর সৃষ্টির দৃষ্টান্তে; ছিল তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে। এই আগ্রহ ও উৎসাহের পরশ লাগানই ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মুন্সিয়ানা। লেখিকার সর্বজনবিদিত রচনাভঙ্গী পূর্বোক্ত কাজের নিতান্ত অনুকূল। আদর্শেরই হোক আর রোগেরই হোক অজানিত যেমন ছোঁয়াচ লাগে তেমনই লেখিকার ভাষা ও ভঙ্গীর সাবলীল গতিতে আমরা রজার ফ্রাই-এর জীবন-ধর্মে উৎসাহিত হই। আশ্চর্য হতে হয় লেখিকার সংযমে, তাঁর নির্বাচন শক্তিতে বিষয়বস্তুর অন্তরে প্রবিষ্ট হবার সহজ ক্ষমতায়। স্ট্রেচীর পদ্ধতির তুলনায় এই কৌশল ভদ্র, লাড্‌ভিগের পদ্ধতি থেকে বেশী বুদ্ধিসম্মত ও সূক্ষ্ম।

রজার ফ্রাই-এর প্রতিবেশ কোয়েকার গোষ্ঠীর। সে-গোঁড়ামির তুলনা এ-দেশে একমাত্র সেকেলে ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে পাওয়া যায়। ফ্রাই-এর এক পূর্বপুরুষের

বিবেক-দংশন হত ওষুধের দাম নিতে, তাতে জল মেশান থাকে ব'লে। পিতা ছিলেন জবরদস্ত। চিরটা কাল ফ্রাই পিতার মনস্তুষ্টি সাধনে ব্যগ্র থাকতেন, পৃথক হবার পরেও। এই অদ্ভুত গোঁড়ামি ও পিতৃভক্তি রজার ফ্রাই-এর চরিত্রের যেন দুটি মোটা সুতো। দ্বিতীয়টির জন্য যেমন তিনি সহজে অন্যের মতামতে প্রভাবান্বিত হতেন, প্রথমটি তেমনিই ভিন্ন ভিন্ন মতামত বেছে নিয়ে নিজের একটি মত বেঁধে দিত। একধারে তাঁর যেমন খোলা মন অন্যধারে তেমনিই কঠিন তাঁর বিচারশক্তি। ভদ্রলোক কত ভাল লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, ম্যাকটাগার্ট, ম্যাকার্থি, ডিকিনসন, রটেনস্টাইন, ইয়েটস, চার্লস মর*, লিওনার্ড ও ভার্জিনিয়া উল্ফ, কত কথা শুনেছেন, কত তত্ত্বের যাচাই করেছেন, কত ছবি দেখেছেন তার ইয়ত্তা নেই, তৎসত্ত্বেও নিজের মতের জোরেই তিনি সমগ্র ইংরেজ-ভাষাভাষীর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আর্ট-সমালোচক। রাস্কিনের পর অমন খাতির ইংলণ্ডে কেউ পান নি। এমন কি প্রফেসার টঙ্ক্স্, যাঁর সঙ্গে রজার ফ্রাই-এর কোনো কালে বনে নি, তিনিও বলতে বাধ্য হন যে তাঁর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে আর্টের অবস্থা, জার্মানীতে হিটলার, রুশিয়ায় স্ট্যালিন ও ইটালিতে মুশোলিনির মৃত্যুর পরাবস্থার সামিল। খোঁচাটা নিষ্ঠুর হলেও ব্যাপারটা আংশিক ভাবে সত্য।

রজার ফ্রাই-এর সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যান এখানে অবান্তর—কারণ, পূর্বেই বলেছি, বইখানিতে তার নির্দেশ নেই। ধরাই যাক, তাঁর বক্তব্যে এমন কিছু ছিল না যার জোরে তিনি সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাসে স্থান পেতে পারেন। তবে এক হিসেবে যুগান্তকারী ছিল সেটা। আমার মতে তিনি যতই নিষ্কাম উপভোগের জয়গান করুন না কেন, কোয়েকার মনোভাবের তাগিদে তিনি অজানিতে অবশ্য, রাস্কিনেরই পদানুসরণ করেন। ভিনিস থেকে লেখা এক চিঠিতে রাস্কিনের প্রতি বক্রোক্তি এখানে অগ্রাহ্য। রাস্কিনের Political Economy of Art এবং রজার ফ্রাই-এর Art and Socialism এক সঙ্গে পড়লেই সমাজে আর্ট ও আর্টিস্টের স্থান সম্বন্ধে তাঁদের আন্তরিক মিল প্রকট হয়। অন্যদিকে ওমেগা-কারখানা খোলাতে তাঁর ওপর মরিস্-এর প্রভাব ধরা পড়ে। অবশ্য রজার ফ্রাই অস্কার ওয়াইল্ড এর পরবর্তী। তাই তিনি art for art's sake গ্রহণ করেন নি, সেই মতটিকে অদল বদল করে যুগোপযোগী দাঁড় করালেন। বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের 'মা ফলেষু কদাচন' ভাবটির সঙ্গে ব্যক্তির অনুরাগপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চর্চা মিশিয়ে রসোপভোগকে একাধারে ভদ্র ও কঠিন সাধনার স্তরে তিনি তোলেন। অর্থাৎ, আজকার ভাষায় বুর্জোয়া সভ্যতার বেনেপনা বাদ দিয়ে তার শ্রেষ্ঠাংশটুকু তিনি বজায় রাখলেন। বুদ্ধি-বিচারের সাহায্যেই তিনি কৃতকার্য হন। বিচারের

অংশ হয়ত একটু বেশী ছিল। সেই জন্য কে একজন বলেছেন যে রজার ফ্রাই-এর সৌন্দর্যজ্ঞান অনেকটা বুদ্ধিমতী অবিবাহিতা প্রৌঢ়ার কামশাস্ত্র পড়ে কামজ্ঞানেরই মতন। তবু আমার বিশ্বাস, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ঋজুতার মূল্য, তাঁর ব্যাখ্যায় আবিষ্কারের আনন্দ কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না।। বুর্জোয়া-সভ্যতার মহৎ গুণ এই বুদ্ধি-চর্চা— সীমার মধ্যে হলেও। এক এক সময় মনে হয়, বিশেষত তাঁর শেষ বক্তৃতাগুলির এক-আধটি পড়লে যে তাঁর মতের সমন্বয়সাধন হয়নি, তাঁর দৃষ্টি-পরিসরে ফাঁক, blind spots ছিল। সন্দেহ হয় বুঝি নিষ্কাম উপভোগ এ-যুগে অসম্ভব। তবু, ইংরেজ-জাতের সঙ্গে, এবং সেই সূত্রে আমাদের সঙ্গেও, সীজান ও তাঁর পরবর্তী ফরাসী চিত্রশিল্পী, চীনে ও ফার্সী ছবি প্রভৃতির পরিচয় ঘটাতে যে পেরেছিলেন এই জন্য তাঁর সমাজ-সাধনাকে এবং মহান অথচ অভিনব-কে গ্রহণ করার মতন বিচারবুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির স্থিতিস্থাপকতাকে সমাদর না করে থাকা যায় না। তাঁর মতের চিরন্তন মূল্য যাই হোক, না সেটি রুচি-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়েছিল এই যথেষ্ট।

কিন্তু বইখানি সম্বন্ধে আমার গোটা কয়েক বক্তব্য আছে। আমার বিশ্বাস রজার ফ্রাই-এর চরিত্রে যে আন্তরিক বিরোধ আছে তার ব্যাখ্যা কোয়েকার-রক্ত এবং পিতৃ-ভয়ে সম্পূর্ণ নয়। ভার্জিনিয়া উলফ অবশ্য ইঙ্গিত করেছেন যে রজার ফ্রাই-এর চিত্রাঙ্কন শক্তি দেরীতে খোলে। সে-ইঙ্গিতের সূত্র ধরে সত্য ব্যাখ্যায় আসা যেত। লেখিকার বন্ধুবাৎসল্যে বাধা পড়ে বলে বোধ হয় তিনি এ-বিষয়ে ততটা জোর দেন নি। রজার ফ্রাই একজন বড় চিত্রকর ছিলেন না মানতেই হবে। বড় আর্টিস্ট হওয়া শক্তি ও শিক্ষাসাপেক্ষ। তাঁর শিক্ষায় কোনো ত্রুটি ছিল না, বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী পাওয়া থেকে নামজাদা প্যারিসের স্টুডিও ও অনুকূল সুযোগ পাওয়া পর্যন্ত, কোনো কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর ভাগ্যে। স্ত্রীও এক পথের পথিক ছিলেন। অতএব, তাঁর সৃষ্টিতে আন্তরিক অভাবের ও আপেক্ষিক নিষ্ফলতার প্রকৃত নির্দেশ শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে মিলবে না। এমন কি কোয়েকার-রক্তেও পাওয়া যাবে না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ভীষণ জানি; কিন্তু ঐ-রকম অবদমনের প্রতিক্রিয়াই কি রজার ফ্রাই-এর চিত্রে ও প্রবন্ধে আশা করা যায় না? কিন্তু তা কই? বরঞ্চ অতি-সাবধানেরই ছড়াছড়ি। ভেতরের জোর থাকলে সমাজের তৈরি জটিলতা দুঃসাহসিক সরলতায় পরিণত হত। তা যখন হয়নি তখন রজার ফ্রাই-এর সারা জীবনব্যাপী চঞ্চলতার ও বহুমুখিতার সর্বগ্রাসী ঔৎসুক্যের মধ্যেই তাঁর জীবনধর্মের মূলমন্ত্র খুঁজতে হবে। সে বীজ হচ্ছে আমার

মতে তাঁর বিচার-বুদ্ধির ও সৃষ্টিশক্তির মধ্যে আন্তরিক বিরোধ। বৈপরীত্য নয়, গোড়ায় ব'লে দিচ্ছি।

অতি-শিক্ষিত ব্যক্তির রচনা কি সমালোচনায়, কি সৃষ্টিতে প্রাবন্ধিকই থেকে যায়। রজার ফ্রাই অবশ্য বেলিনি ও সীজান সম্বন্ধে দু'খানি বই লেখেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য বেশী ফুটেছে, বেশী কার্যকরী হয়েছে ঐ নেশন, এথিনিয়ম, বার্লিংটন ম্যাগাজিনের প্রবন্ধাবলীতে ও নানা জায়গার বক্তৃতায় যেগুলি জড় করে তাঁর **Vision and Design, Transformation,** এবং **Last Lectures**। তা ছাড়া কথোপকথনে, চিঠিপত্রে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন। যে তাঁর মুখের কথা শুনেছে সেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিশ্লেষণ, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ জাগাবার ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। অথচ কেন তাঁর হাত দিয়ে একটা ক্রান্তিকারী বই বেরুল না? উত্তর হবে, সময় ছিল না। ভুল— সময় অনেক ছিল, সময়ের অভাব বাজে কথা। লোকে বলবে, পয়সা ছিল না। ভুল— বাপের দোরে ধন্না দিলেই হত। আদত কারণ, ভয়, যার রূপ-পরিবর্তন বুদ্ধিগত সততা, যার পূর্বে রয়েছে সৃষ্টিশক্তিতে অবিশ্বাস, ঐ প্রাথমিক ও আদিম দ্বন্দ্বের আশীর্বাদে।

আরো প্রমাণ রজার ফ্রাই-এর নিজের আঁকা ছবিতে। আমি তাঁর বেশী ছবি দেখিনি, নামজাদা গোটাকয়েক পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ দেখেছি। প্রথমে তিনি পূর্বেকার ইংরেজ ওয়াটার-কলারিস্টের প্রভাবে পড়েন। ১৯১০ সালের পর সীজানের পদ্ধতি তিনি স্বীকার করেন। আমি তাঁর শেষ-জীবনের ছবির উল্লেখ করছি। সেগুলির সঙ্গে সীজানের আঁকা যে-কোনো ছবির তুলনা করলে হতাশ হতে হয়। রজার ফ্রাই-এর ছবি নির্দোষ— অঙ্কনপদ্ধতির দিক থেকে, যেমন অঙ্কের পদ্ধতি ঠিক হলে উত্তর হয় নির্দোষ; অর্থাৎ যেন, মাত্র নির্দোষ। এরও আনন্দ উঁচুদরের। কেবল তাই নয়, বুঝি বা এ-যুগে ঐ ধরনের আনন্দই যথাযথ। এমন কি, অনেক সময়, অরাজকতার প্রতিক্রিয়ায় জ্যামিতিক আনন্দকেই শ্রেষ্ঠ বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সীজানের পোর্ট্রেট দেখলেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়— ইয়াঃ কেয়া মাকুল, চুস্ত্, মাত্তর্জ ? মুসলমান ওস্তাদ মিয়াকি মল্লারের গান্ধারটি লাগালেন, জেনে, না-জেনে, কে কেয়ার করছে, অথবা, দু' চারটি মেয়ে মনের পটে ছায়া ফেলার গুণ ধরে, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, আকারে, বুদ্ধিতে, মেজাজে— কিন্তু তবু যেন ছবি ফুটল না, অথচ হয়ত একজন, নাকটা তার টিকল নয়, গালের হাড় উঁচু, একটু বা কথা রাখে না, চা-এ চার চামচ চিনি খায়— এমনটিকেও মনে হল— এই ঠিক। অথবা, কোনো নতুন বউ বিশ বছর সংসার করবার পরেও যেন নতুন বউই রইলেন, আর কেউ বা বিবাহের এক হপ্তা পরে আঁচলে চাবি বেঁধে আপন

অধিকারে গিন্নীপণায় আরূঢ়া হলেন। অর্থাৎ নিয়ম মেনে চললে ভাল লাগে, কিন্তু অনায়াসে কোনো স্থান অধিকৃত হচ্ছে দেখলে আরো ভাল লাগে। সীজানের ছবিতে বিষয়বস্তু স্বকীয়স্থানে অধিষ্ঠিত ব'লে তার মূল্য, এবং ফ্রাই-এর ছবিতে সেটি ডিজাইনের নিয়ম অনুবর্তনের জন্য। আবার বলছি, দু'এই আনন্দ পাই; কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করি সীজানের দৃষ্টি একাগ্র, কারণ, সেটি সমন্বিত, এবং রজার ফ্রাই-এর দৃষ্টির চেয়ে ডিজাইনের প্রতি কর্তব্য-বুদ্ধিটাই বেশী উন্নত, সমন্বয়ের অভাব দ্বন্দ্বের নিদর্শন। পাঠকবর্গ যদি যামিনী রায় ও অতুল বসুর প্রদর্শনী চোখ খুলে দেখে থাকেন তবে আমি যা বলছি তা সহজেই বুঝবেন।

আমার দ্বিতীয় মন্তব্য একটু ভয়ে ভয়ে লিখছি। রজার ফ্রাই-এর নির্বাচিত গুরু সীজান হলেও তাঁর প্রকৃতিগত গুরু ছিলেন, আমার মতে, আংরে (Ingres)। Vision এর চেয়ে Design এর দিকেই নজর ছিল রজার ফ্রাই-এর বেশী— হয়ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষারই কৃপায়। সাজান, ম্যানে, গগাঁ, মাতিস্, পিকাসো, সাইন্যাক, দেরেঁ, ফ্রীজ প্রভৃতি যে সব চিত্রকরের রচনা ১৯১০ ও ১৯১২ সালে গ্রাফ্‌টন্ গ্যালারীতে দেখান হয় তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বড় ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান। এঁদের পূর্ববর্তী আংরে, প্যুভিস্ দ' শ্যাভান, দেলাক্রোয়া, ক্লদ্ লোরেন, প্রভৃতিরও ড্রাফ্‌ট্‌-ম্যানশিপ জগদ্‌বিখ্যাত। দুটি পদ্ধতির তুলনা করলে বোঝা যায় যে আংরের নক্‌শা, চোখ দিয়ে বিষয়ের যে প্রাথমিক গড়ন ধরা পড়ে, তার রীতিনীতির ওপর ততটা নির্ভর ক'রে, নক্‌শা আঁকার সাধারণ নিয়ম-কানুনের আজ্ঞাবহ ছিল। এক হিসাবে আংরের পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর স্বকীয় গঠন ধরা পড়ত না। প্রথম যুগের সীজান ও ইম্প্রেসনিস্ট দল সে অভাব ঠিক পূরণ করতে পারেন নি। কারণ, তার Visualityতেই খতম হলেন। সেইজন্য, কথার ছলে ম্যানে প্রভৃতিকে রজার ফ্রাই পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট বলেন। এঁরা আরো এগিয়ে বিষয়বস্তুর পিছনে হাজির হলেন— অর্থাৎ বিষয়বস্তুর প্রাকৃতিক গঠনে। এই হিসেবে রজার ফ্রাই-এর মন্তব্য অত্যন্ত বিচারসম্মত— অর্থাৎ পোস্ট-ইম্প্রেসনিস্টরা পুরাতন ঐতিহ্যই বজায় রাখতে ব্যগ্র, তাঁদের প্রয়াস অভিনব নয়। কিন্তু, অন্যদিকও আছে। মানতেই হবে যে এঁদের যাত্রা শুরু হয়নি visual designএর পৃথক অস্তিত্বে, অতএব তার সাধারণ রীতির উপলব্ধি থেকে। যদি তাই হত, তবে সম্পূর্ণভাবে ধারা বজায় থাকত। থাকে নি, তাই পোস্ট-ইম্প্রেসনিস্ট ধুরন্ধরদের পরে ডাডা-ইজম্। থাকতে পারল না, তার কারণ এ নয় যে আংরের ডিজাইন আর্টের চরম পরিণতি, কারণ, ফ্রান্সের গোড়ায় পচ ধরেছিল, নচেৎ তার আজকার পতনকে ভগবানের অভিশাপ বলতে হয়। রজার ফ্রাই-এর শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল, উইলেনসকী যাকে

architechtural design বলেছেন তাইতে। তিনি বুদ্ধির দিক থেকে এর কাছ ঘেঁষে একবার যান— ইটালি ভ্রমণের এক বর্ণনায় তিনি যে র‍্যাফেলের মাহাত্ম্য উল্লেখ করেন সেটা র‍্যাফেলের ঐ architechtural design-এর জন্য, তাঁর আঁকা মিষ্টি মুখের জন্য নিশ্চয় নয়। রজার ফ্রাই-এর রুচি শিক্ষিত বাঙালীর চেয়ে উন্নত ছিল। অথচ, তিনি সেখানে পৌছতে পারলেন না, যা আমরা প্রত্যাশা করতে পারতাম তাঁর তর্কবুদ্ধি, তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষা, তাঁর কোয়েকার সুলভ নৈতিক বিধানে আস্থা, তাঁর সমসাময়িক সমাজের শান্তিময় শৃঙ্খলা স্মরণ রেখে। কেন তিনি পারলেন না? কারণ, ঐ বিচারবুদ্ধি ও সৃষ্টিশক্তির বিরোধ। সীজান, ম্যানে, গগ্যাঁর অদ্ভুত ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যেমন বিচারের শেষ-বেশ হল না, তেমনই তাঁর সৃষ্টি-শক্তি ঘুরে গেল সমাজসেবায়। অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি তাঁকে শেখালে যে ইংরেজী আর্টের অফিসিয়াল একাডেমীর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই বিষয়বস্তুর গঠনগত প্রকৃতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করলে। এটা মস্ত বড় কাজ; অনেকটা বাংলাদেশে হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ ১৯১০।১১ সালের চিত্রপ্রদর্শনীরই মতন। ১৯১০ সালের পূর্বে লেটন, পয়ণ্টার, আলমা-টাডেমা, কলিয়ার এবং রবিবর্মা; ১৯১০।১১ সালের পর অগাস্টস জন, ডানকান গ্রাণ্ট, স্পেন্সর, এরিক গিল, ভ্যানেসা বেল, লুইস এবং অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্র, বীরেশ্বর প্রভৃতি। ঐতিহাসিক অনুপাতটা এই, মায়, জনসাধারণের শ্রীমুখ থেকে অভদ্র গালাগালিটা পর্যন্ত। রজার ফ্রাই-এর কৃতিত্ব এই ভাবেই স্মরণীয় হবে। কিন্তু, আমরা যখন তাঁর জীবনের বিবরণই আলোচনা করছি, তখন ব্যক্তিগত ভাবে এই আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর অ-পরিণতিকে স্বীকার করতে হবে। তিনি আশা করছিলেন যে এইবার তাঁর নিজের চিত্রপ্রতিভা খুলবে। খুলল না। অতিবুদ্ধির হাতে দড়ি। তবু, কী ক্ষুরধার বুদ্ধি! ভদ্রলোক সত্যই সভ্য ছিলেন।

পরিচয়, পৌষ, ১৩৪৭

Twilight in Delhi— Ahmad Ali. (Hogarth Press).

বিদেশী ভাষায় দেশী রচনার সার্থকতা আছে কিনা সে প্রশ্নটির উত্তর এক রকম দেওয়া হয়ে গেছে। উত্তরটি যতটা দৃষ্টান্তমূলক, যুক্তিপ্রধান ততটা নয়। কিন্তু যে-জাত প্রায় দেড়শ বছর ধরে এবং পাঁচ বছর বয়স থেকে বিদেশী ভাষা গ্রহণ করেছে সে-জাত কেন বিদেশী ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবে না বুঝি না, এবং যদি না পারে তবে বুঝতে হবে বুদ্ধি বিদ্যায় গলদ আছে। পদ্যের কথা পৃথক, তবে গদ্যে উপযোগী ভাষা অর্জিত সংস্কার সাপেক্ষ। তা ছাড়া, যদি

মানাই যায় যে বিদেশী ভাষা আমাদের করায়ত্ত হয়নি ও হবে না তবে পাঠক-বৃন্দেরও অধিকার লোপ পায় তার উপযোগী ব্যবহার-বিচারে। এ-ক্ষেত্রে নীরব থাকাই ভাল, বিশেষত যখন ই. এম. ফস্টারের মতন লেখক ও বনামী ডব্রের মতন সমালোচক আহমদ আলির ভাষার তারিফ করছেন।

আহমদ আলি হচ্ছেন লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের প্রগতিশীল মুসলমান লেখক। মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্বে কয়েকজন তরুণ যুবক-যুবতীর সাহচর্যে তিনি 'আঙ্গারে' অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার নামে উর্দুতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে এমন কিছু মতামত ছিল না যেটি বাঙালী সাহিত্যিকের কাছে অতিশয় নতুন। অনেকটা 'কল্লোলে'র যে-কোন সংখ্যার মতন বল্লে অনেকে বুঝতে পারবেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের ও সাহিত্যের বাধা অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই সে-বাধা ভাঙতে দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়। শহরে শহরে মৌলানা-বৃন্দ বইখানি পোড়াতে শুরু করলেন, মারপিট হবার যোগাড় হল, সরকার-বাহাদুর বইখানি বাজেয়াপ্ত করলেন। কিন্তু ঐ আগুনে উর্দু সাহিত্যের নতুন রূপ খুলল। আজ উর্দু সাহিত্যে নবজীবন এসেছে। আহমদ আলি ও তাঁর দলের কাছে অনেক নতুন লেখকই ঋণী। তিনি সেই থেকে অনবরত উর্দু ও ইংরেজীতে লিখে যাচ্ছেন। New Writing-এর মারফৎ তাঁর গল্প ও নক্শার সঙ্গে অনেক ভারতবাসীই পরিচিত। কিন্তু নভেল লিখলেন তিনি এই প্রথম। নানা দোষ সত্ত্বেও বইখানি সুখপাঠ্য হয়েছে।

বিষয় হল দিল্লী শহরের একটি মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের ইতিহাস। কর্তা মীর সাহেব বিশেষ কিছু করেন না, এক ঘুড়ি ও পায়রা ওড়ান ছাড়া। তাঁর পরিবারটি বৃহৎ, বড় ছেলে জীবিত নেই, তবে নাতি আছেন, যিনি গল্পের সরকারী নায়ক। মধ্যম পুত্র অন্যত্র চাকরী করেন। তা ছাড়া স্ত্রী, কন্যা, চাকর-বাকর, আত্মীয়-স্বজন আছে। আসফাক অর্থাৎ নাতি একটি আজকালকার সাধারণ ছেলে— প্রতিবেশ তার পছন্দ হয় না, অথচ ছেড়ে যাবারও শক্তি নেই, তাই অসন্তুষ্ট হয়েই জীবনযাত্রা নির্ভর করে। অবশ্য প্রেমেও পড়ে, নিতান্ত মামুলিভাবে। বিল্‌কীসকে ভাবে অপ্সরী, ও তার সঙ্গে মানসিক সম্বন্ধটা অনেকটা লয়লা-মজনু ধরনের। আমার মতে আসফাক্ কিন্তু নায়ক নয়। সাধারণ মানুষ ফোটান অত্যন্ত শক্ত, তাই পাঠকের মন আকৃষ্ট হয় সহজে মীর সাহেবেরই দ্বারা। মীর সাহেবের দিনানুদৈনিক জীবনধারায় রস আছে। ফিউডাল যুগের অবসর আমাদের কাছে হেয় হলেও সেটা ভরা থাকত নানা রকমের ছোটখাট দায়িত্ব পালনে, আমোদ-প্রমোদে এবং আভিজাত্যের মর্যাদা রক্ষায়। আহমাদ আলি বিগত যুগের গুণে মুগ্ধ না হলেও তার প্রতি অবিচার করেন নি। মীরাহেসব

একজন 'খানদানী' পুরুষ, নবাবী আমলের রেশ পড়েছে তাঁর চরিত্রে, হাত তাঁর দরাজ, মেজাজ তাঁর বড়, এবং দিল্লী শহরের পচা-নোংরা গলির মধ্যেও তাঁর শির উঁচু। রক্ত এখনও তাঁর হিম হয়নি, তাই বাদশা বাহাদুর শাহের রচিত গান শুনে, দিল্লী দরবারে সমারোহ দেখে তাঁর রক্ত নেচে ওঠে। কিছুই করে উঠতে পারেন না, ঘুড়ি ওড়ান পায়রা-বাজী খেলেন, ফকিরের সঙ্গ করেন, কোরান শোনেন — কিন্তু লুকানো আফসোসটি বেরিয়ে পড়ে কখনও কখনও। ব্যস্, এই পর্যন্ত, এর বেশী কিছু নয়···ক্রমে তাঁর সংসারের ভাঙন ধরল, এক এক করে ছেলে মেয়েরা বিবাহ করলে, পৃথক হল, মারা গেল— তিনিও দেহপাত করলেন।

অতএব নভেলটি ঘটনাবহুল নয়, মাত্র একটি ভাঙনের ছবি। কেবল ভাঙন নয়, অ-সার্থকতারও। ভাঙনের দিক থেকে বইখানি কাব্য-ধর্মী কিন্তু অ-সার্থকতার প্রকাশে প্রগতিশীল। আমি প্রত্যেক বাঙালী পাঠককে বইখানি পড়তে অনুরোধ করছি। এ যুগের উপযোগী বই বলে কেবল নয়, অ-বাঙালী মুসলমান সমাজের চমৎকার নক্শা হিসেবেও। যে-সব নক্শার লেখক সমাবেশ করেছেন, বিবাহের, মৃত্যুর, খুঁটি-নাটি তুচ্ছ ঘটনার, সেগুলি কেবল মুসলমান সমাজের নয়, সমগ্র ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। বিফলতার দৃশ্য আঁকায় লেখক যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন সেটা অন্য দোষের ক্ষতিপূরণ করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। আধুনিক সাহিত্য মানে কেবল শ্রমিক-কৃষাণদের ভবিষ্যৎ কল্পনা নয়, বর্তমান সমাজের অকিঞ্চিৎকরতাও দেখান।

পরিচয়, চৈত্র, ১৩৪৭

My Boyhood Days—Rabindranath Tagore. Price Rs. 2/

গল্পসল্প—১ টাকা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী।

আরোগ্য—১ টাকা। ঐ

জন্মদিনে—১ টাকা। ঐ

প্রথম বইখানি 'ছেলেবেলার' ইংরেজী অনুবাদ। মূল বাংলায় তার অনেক প্রশস্তি বেরিয়েছে। রস ও শিশু-সাহিত্যের দিক থেকে সেটি অতুলনীয়। বাংলা ভাষারও যুগ প্রবর্তন হবে তার সাহায্যে। Basic বাংলা জন্মগ্রহণ ক'রেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন হল এটি কম সৌভাগ্যের কথা নয়। ইংরেজী অনুবাদে সেই সরলতা রাখবার চেষ্টা সফল হয়েছে। ফলে বইখানির মূল্য অন্যধারে বৃদ্ধি পেল। অ-বাঙালীরা আজ রবীন্দ্রনাথের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনায় তাঁর প্রতিভা-উন্মেষের প্রতিবেশে আগ্রহান্বিত। একটি ব্যাপারে বড়ই বিস্ময় লাগে। শিশু-শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে

বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। তার একটি মোটা সুর এই : কাম-দমনের ফলে বিস্তর ক্ষতি হয়, অতএব ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সে জৈব উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানদানই উচিত, বিশেষত যখন ছ বছর বয়সেই শিক্ষা অর্থাৎ অর্জিত অভ্যাসের ধারাগুলি ঠিক হয়ে যায়। এই মতবাদের কোনো সমর্থন পেলাম না বইটিতে। আমার বক্তব্য এই : পৃথিবীতে যে কজন যথাসম্ভব পূর্ণ মানুষ জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। কেবল তাই নয়, ভদ্র-রুচির সতত পরিচয়ে তিনি তাঁদের থেকে পৃথক, অতএব সভ্যতার ইতিহাসের অধিক পরিমাণে অনুগামী। এ-ক্ষেত্রে হয় আমাদের মানতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ফর্মুলার বাইরে, না হয় স্বীকার করব যে ফর্মুলাগুলি আংশিকভাবে সত্য— অর্থাৎ হাইপথেসীস মাত্র। খণ্ডকে পূর্ণ করে দেখার ফলে পূর্ণকে অপমান করা হয়। তাতে পূর্ণের ক্ষতি হোক বা না হোক আপন বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয় নিশ্চয়।

'গল্পসল্প' নিয়ে একটি পরীক্ষা করলাম। পড়বার পর আমার ভাইঝিকে পড়ে শোনালাম। উৎসাহ তার দেখে কে! সন্ধ্যায় দেখি সে খাটের নীচে লুকিয়ে বইখানি পড়ছে। "বড়ো খবর' পড়লি? বুঝেছিস?" "খুব মজা— এ যেন সেই মাথা ও হাত পায়ের ঝগড়া।" "ম্যানেজার বাবু'টা কেমন লাগল?" "খুব ভাল; কিন্তু লোকটা পাজি। দুধে স্নান করে ত' রাজকন্যে, ম্যানেজার বাবু করতে গেলেন কেন?" ভাইঝি আমার মার্ক্সিস্ট নয়, তার বয়স মাত্র আট বছর। আমি ভাবি রূপকের সাহায্যেই কি বামমার্গী সাহিত্য গড়ে উঠবে, যে রূপকের সূক্ষ্মতা ও কারুকার্য একাধারে সাহিত্যরসিককে আনন্দ দেবে, অন্যধারে যার সরল গতি শিশু-মনকে নতুন সমাজের দিকে আকৃষ্ট করবে?

'রোগশয্যা' প্রকাশিত হবার পর-পর এই দু'খানি কবিতার বই বেরুল। রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি নামকরণ না করতেন তা হলে বিশ্বাস হত না যে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়েছিলেন কিছুকাল পূর্বে। বলতে কি আমার সন্দেহ হয়েছিল যে রবীন্দ্র-নাথের অসুস্থতা সাংবাদিকের আবিষ্কার। তাঁদের দোষ দিই না, কারণ সত্যই যুদ্ধের খবরে নতুনত্ব কমে আসছিল। নিজের অবিশ্বাসকেও দোষ করি না; যাঁর হাত দিয়ে এই ধরনের কবিতা এখনও বেরুতে পারে তিনি যে অবিনশ্বর। আর বয়স একাশী! হয় ঠিকুজীতে না হয় পাঁজিতে কোথায় ভুল আছে। নচেৎ, "মোর চেতনায় আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়"— এটা সম্ভব হত না। সমগ্র বিশ্বের, সকল ইতিহাসের, অনাদি ও অনন্ত প্রাণলীলার, আধুনিক কল্পান্তের স্পন্দন ও কম্পন যাঁর জীবনে অনুরণিত হয় তিনি প্রৌঢ়ত্বের কেন, যৌবন-সীমাও অতিক্রম করেন নি। প্রাণের এই সদা জাগ্রত অবস্থা, শক্তির এই পূর্ণ স্ফুরণ জয়ন্তী-

উৎসবের অন্তত একটি উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কেননা, তিনি এখনও লিখতে পারেন :

'এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ,
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে আগোচর।' (জন্মদিনে ২)

কিংবা 'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।'

পূর্ণতার আহ্বানে যে শক্তি সঞ্চিত হয় সে মৃত্যুঞ্জয়ী। পৃথিবীর ইতিহাসের এতবড় বিস্ময়ের বস্তু বোধ হয় কখনও ঘটেনি যে ষাট বৎসর সাধনার পরও বিশ্ব-বোধের নতুন স্তর আবিষ্কৃত হচ্ছে এক কলম দিয়ে, এই পরাধীন দেশে সভ্যতার এই বিষম সংক্রান্তিতে। শুনুন আপনারা তিনি কী বলেছেন :

'এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।' (জন্মদিনে ২১)

সৃষ্টির আহ্বানে জাগ্রত হবে কে ?

'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।' জন্মদিনে (১০)

কারা তারা ?

'ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধ'রে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে

বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।' আরোগ্য (১০)

অথচ, অথচ কোলকাতায় এসে শুনলাম ও পড়লাম যে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি! এককালে ছিলেন তিনি শেলী ও বায়রণ, আজ অন্য নাম অর্জন করেছেন! আমাদের মনের দাসত্ব কি কখনও ঘুচবে না! আমি এইমাত্র বলি : ধরতাই বুলির নাগপাশে রবীন্দ্রনাথকে বাঁধতে গেলে নিজেদেরই অপমান করা হয়।

'তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হ'য়ে র'বে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।'

পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

The Background Of Art—By Talbot Rice, (Nelson), 2/6

আমাদের যুবা বয়সে কলাবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার মধ্যে ছিল না। যখন আশুবাবু প্রাচীন ভারতের বিভাগ খুললেন তখন ভারতীয় চারুকলার দিকে ছেলেদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সুযোগ এল। কিন্তু নানা কারণের মধ্যে বিষয়টি প্রত্নতত্ত্বের তাঁবেদারী করার দরুনই প্রধানত তার প্রতি বাঙালী ছাত্রের চোখ খোলে নি। অন্যধারে অবশ্য বাংলা দেশে হ্যাভেল, অবনীবাবু, গগনবাবু, অর্ধেন্দুবাবু এবং তাঁদের শিষ্য-সন্ততির প্রাণপণ চেষ্টায় চিত্রকলার প্রতি একাধিক শিক্ষিত ব্যক্তির যৎসামান্য অনুরাগ আসে। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' নব-উদ্যমের প্রচার কার্যে সহায়তা করে। 'রূপম' নামে একটি সত্যকারের উচ্চশ্রেণীর ত্রৈমাসিক বেরোয় এই সময়, কিন্তু সাধারণ রুচি ও জ্ঞানের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। কিছু পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত করেন অবনীবাবুকে। এখন অধ্যাপক সুরহ্বার্দি ও তাঁর সহকর্মীরা বিষয়টিকে শিক্ষার উপযোগী ক'রে তুলেছেন।

বলা বাহুল্য এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এখনও আর্টশিক্ষা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্তর্গত। আর্ট অধ্যয়নের জন্য ছাত্ররা দল বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ছুটছে না। আমাদের সমাজ শিক্ষাপদ্ধতিকে এমন কোনো বড় ধাক্কা দেয়নি যার কৃপায় ছাত্রদের মধ্যে চিত্র, স্থাপত্য কিংবা ভাস্কর্যের কদর বাড়তে পারে। আর্টের ডিগ্রীতে চাকরী জোটে না, আর্ট সমালোচনায় টাকা নেই, মাত্র মেয়ে

মহলে একটু খাতির হয় ; তাতে পেট ভরে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে চিত্র সম্বন্ধে সামান্য আগ্রহ দেখা দিয়েছে মনে হয়। প্রতি বছরই অন্তত তিন চারটে প্রদর্শনী হচ্ছে, খবরের কাগজে তার নোটিশও বেরুচ্ছে। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকার মারফৎ প্রবন্ধাদিও চোখে পড়ে। এই রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষেও রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে তিন চারটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, সত্য কথা এই, একটি ছাড়া এমন কোনো রচনা ভাগ্যে জোটে নি যা থেকে প্রমাণ হয় যে এতদিনে শিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে আর্ট শিক্ষা যথার্থ রীতিতে শুরু হল। যদি বলা যায় যে, কোনো শিক্ষাই আমাদের হয়নি, তবে আমি মন্তব্যটি স্বীকার করেও বলব যে সময় এসেছে এত দিনে। শিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁরা ইতিপূর্বে চাকরী করছেন কিংবা যাঁদের ডিগ্রীর উপর অন্ন সমস্যার নিরাকরণ নির্ভর করছে না তাঁরা কী ভাবে অগ্রসর হবেন সেটাও বিবেচ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ সমালোচনা করছি না। তবে পরোক্ষভাবে যদি এসে পড়ে তবে আমার সদুদ্দেশ্যই আমাকে যেন রক্ষা করে।

নিজের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ পেয়েছি যে একটা ছবি দেখলে, গান শুনলে, কবিতা পড়লে সে সম্বন্ধে ভাল কিংবা মন্দ একটা সাধারণ ধারণা সহজেই মনে ওঠে। এই অবস্থায় অনেকে ক্ষান্ত হন, হয় আলস্যের জন্য, না হয় অজ্ঞানতার জন্য। একাধিক লোক আছেন যাঁরা আলস্য ও অজ্ঞানতা ঢাকতে চান এই মতবাদের দ্বারা যে বাস্তবিক পক্ষে আর্টের বিচার ঐ ভাল লাগা ও না লাগাতেই শেষ হয়। মতটি আংশিকভাবে সত্য, কারণ, আনন্দদানের যে ক্ষমতা ঐ বিশেষ ও স্বাধীন গান, কবিতা কিংবা চিত্রটির মধ্যে আছে সেইটাই তার সম্বন্ধে এক্ষেত্রে বিচারের প্রধান বিষয়। কিন্তু মতের অন্যাংশটুকু গ্রহণ করা বিপজ্জনক। শৈশবকালে ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত কোকিল কবিতা পড়া ও বুড়ো বয়সে পড়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য আছে, সেটা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন। এখন যদি মানি যে উপভোগের জন্য কোনো জ্ঞানেরই প্রয়োজন নেই, তবে মানসিক প্রগতিকে বাতিল করা হয়, মনকে স্থাণু বস্তু হিসেবে দেখতে হয়, তার সঙ্গে জৈব প্রবৃত্তির সমীকরণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। এই প্রকার সিদ্ধান্ত মনের অস্তিত্ব স্বীকারেরই প্রতিকূল। তা ছাড়া, অভিজ্ঞতায় এ কথাও বলে যে আনন্দের মাত্রায় স্তর আছে। রাগের প্রকৃতি, ছবির গঠনচাতুর্য, কবিতার ছন্দ-কৌশল বুঝলে আনন্দের মাত্রা বাড়ে বই কমে না। আরো বলা চলে, এমন কোনো মানসিক প্রক্রিয়া জানা নেই যার ফলে চারুকলার

উপভোগকে অন্য প্রবৃত্তি ও মানসিক ক্রিয়া থেকে ছাড়িয়ে এনে একটা বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে পরিণত করা যায়। যদি তা সম্ভব হত, তবে ব্রহ্মজ্ঞানের পাশে অন্য প্রকার রস-সম্ভোগের প্রয়োজনই উঠত না।

মোদ্দা কথা এই : ছবি ও দ্রষ্টা, গান ও শ্রোতা, কবিতা ও পাঠকের মানসিক সম্পর্কে অন্তত পক্ষে দুটি স্তর আছে। প্রথমত ইন্দ্রিয়গত বোধ, দ্বিতীয়ত উপলব্ধি। সর্বশেষে অনুভব অবশ্য, কিন্তু সেটা সর্বশেষে, এইটা ভুললে চলবে না। আর্টশিক্ষার প্রধান প্রতিজ্ঞা হল স্তরের স্বীকার। তার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত করা। যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে অনুভূতি সময়সাপেক্ষ।

কী ভাবে উন্নয়ন সম্ভব? টলবট রাইস তাঁর বহু বৎসরের শিক্ষকত্বের অভিজ্ঞতা থেকে একটি ছোট বই লিখেছেন, যেটা আমি প্রত্যেক বাঙালী যুবককে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট শিক্ষার্থীদের পড়তে অনুরোধ করছি। উপক্রমণিকা হিসেবেই বইটার গুণ; নচেৎ প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য আরো পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে বলা বাহুল্য। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সত্যই ব্যাপক। সীদিয়ান থেকে আধুনিক কারুশিল্প, কোনো রূপের প্রতিই তাঁর তাচ্ছিল্য নেই। যেটা আমার সব চেয়ে মনে ধরেছে সেটা হল এই ভদ্রলোক আর্ট বস্তুটি এই জীবনেরই অঙ্গ ধরেছেন, এবং তার বিচারে আধ্যাত্মিকতার বুজরুকী চালান করেন নি। এটা যে কত মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গী তা বুঝবেন তাঁরা যাঁরা ভারতীয় কলার দার্শনিক ব্যাখ্যায় তিতিবিরক্ত। দেশাত্মবোধের অভিমান, পরাধীনতার অপমানের ক্ষতিপূরণ, অতীতের প্রতি মোহ— এদের ষড়যন্ত্রে ভারতীয় মন আজ নিষ্ক্রিয়। অবশ্য মার্ক্সিস্ট ব্যাখ্যা বইখানিতে নেই। আছে মোটামুটি যাকে বলে সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, যেটা আধ্যাত্মিক ও আদর্শবাদী ছাড়া অন্য সর্বপ্রকার জীবের প্রথম উপভোগের পক্ষে আপাতত যথেষ্ট।

লেখক বলছেন উপলব্ধির জন্য সভ্যজগতের আর্ট কলেজে দুটি ব্যবস্থা চোখে পড়ে। আর্টের ইতিহাস, ও জার্মান পণ্ডিত যাকে **Kunstforchung** বলেন, যার বাংলা কিংবা ইংরেজী প্রতিশব্দ ঠিক নেই, আর্টের ব্যাখ্যা বললে খানিকটা চলে। আর্টের ইতিহাস বিস্তর লেখা হয়েছে, নানা ধরনে, অতএব সে সম্বন্ধে এইটুকু মনে রাখা যথেষ্ট যে বিখ্যাত আর্টিস্টের জীবনকথা ইতিহাস নয়, আর্টের ধারাবাহিকতা দেখান ছাড়া তার অন্য সার্থকতা নেই। পূর্ব ও পরের পারম্পর্য দেখানোই আর্ট ইতিহাসের কাজ। ব্যাখ্যার পদ্ধতি নিয়েই যত গোলমাল। পদ্ধতি যেকালে প্রধানত বিষয়টির প্রকৃতি-সাপেক্ষ, এবং আর্ট যেকালে আকাশ

থেকে পড়ে না, পৃথিবীতেই উৎপন্ন হয় তখন তার ব্যাখ্যার মূল কথা এই যে একটি মাত্র ধারার পৃথক্করণ অ-স্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। অনেক শুদ্ধ সমালোচকের ধারণা যে আঙ্গিক বিচারের দ্বারাই কোন বিশেষ চিত্র, কিংবা কবিতা কিংবা গানের ধারা সুপ্রকট হয়।

আমি এই মতে সায় দিই না। ধরা যাক গত ত্রিশ বৎসরের বাংলা চিত্রের ধারাকে। সে সম্বন্ধে গোটা কয়েক মন্তব্য প্রকাশ করা চলে। সেটা ভুঁইফোড় ঠেকেছিল সাধারণের কাছে। কিন্তু ক্রমে তার সুখ্যাতি করা ফ্যাশানে দাঁড়ায়। পরিচিত বিদেশী চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি থেকে সেটা পৃথক ছিল, ক্রমে তার মধ্যে জাপানী ও বৌদ্ধযুগের অজন্তাদির প্রভাব চোখে পড়ে। বাংলা দেশের বিশেষ মানসিক বৃত্তি পরে তার মধ্যে আবিষ্কৃত হয় ও বাংলা পরিশীলনের অঙ্গ হিসেবে ধারাটি বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করে। চিত্রধারার ও আঙ্গিকের মধ্যে বাংলার জীবনযাত্রা ও ভৌগোলিক উপচয়ের প্রমাণও পাওয়া যায়। শেষে বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীর মধ্যেই এই ধারার সৌজন্যে রুচি পরিবর্তন ঘটে। গোটাকয়েক ছবি চিত্র হিসেবে উঁচু দরের হয়েছিল, এবং কলাবিদের প্রশংসা পায়। এই ধরনের আরো অনেক তথ্য নির্দেশ করা সম্ভব। কোনটাই এর মধ্যে তত্ত্ব নয়, মতও নয়, নির্জলা ফ্যাক্ট।

এখন প্রত্যেক তথ্যটি যদি বিচার করি, কিংবা সবগুলিকে একত্র করে তাদের তাৎপর্য খুঁজি তবে পূর্বলিখিত মতবাদের গলদ এবং আর্ট উপলব্ধির প্রকৃত উপায় বেরিয়ে আসে। কেন আমাদের চোখে ছবিগুলি ভুঁইফোড় ঠেকে? কারণ আমাদের শিক্ষার অভাব, আমাদের কুরুচি, আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি যাতে জীবনের সমগ্র শক্তি মাত্র বাঁচার কাজেই নিঃশেষিত হয়েছিল। অতএব বাংলার চিত্রধারা বোঝবার জন্য আমাদের সমাজ ও শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞানেরও প্রয়োজন। কিন্তু পরে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বল্লেন যে এটা ভুঁইফোড় নয়, এর সঙ্গে চীনে জাপানী ছবি ও অজন্তার যোগ রয়েছে। কেন ও কোথায় রয়েছে দেখবার সময় বোঝা গেল যে বাংলা দেশের কৃষ্টি ভারতীয় কৃষ্টিরই অঙ্গ, এবং ভারতীয় কৃষ্টি এশিয়াটিক কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আরো একটু এগুলে দেখা গেল যে এই ধারার সঙ্গে অন্য দেশের সমসাময়িক যেমন প্রথম যুগের খ্রীস্টানী ও মধ্য এশিয়ার যাযাবর কলাপদ্ধতির সঙ্গে অনেক মিল আছে। অতএব ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বিচার না করলে গত ত্রিশ বছরের বাংলাদেশের আন্দোলনের সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি অসম্ভব। তেমনই কেন গোড়ায় যেটা ফ্যাশান ছিল সেটা পরে রুচির উন্নতি কী ভাবে ও কতটা করলে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বোধ হয় দেখতে পাবো যে যদিও প্রকৃত

আনন্দ উপভোগ ফ্যাশান-সাপেক্ষ নয়, তবু বাঁধা সমাজে ফ্যাশানটা হেয় নয়, তার পরিবর্তন আছে, এবং সে পরিবর্তন গোটাকয়েক সামাজিক নিয়ম মেনে চলে। আবার আমরা যখন ছবি দেখে বাঙালী হিসেবে গর্ব অনুভব করেছিলাম, বাংলার জীবনযাপন বাংলার ঘর বাড়ি, পল্লীগ্রাম, মন্দির, এমন কি আমাদের দেশস্থ উপকরণের ব্যবহারের সুচারু বিকাশ হিসাবে তাকে দেখে আত্মপ্রসন্ন হয়েছিলাম, তখন নিশ্চয়ই আমাদের উপভোগে চিত্রধারা ভিন্ন বাঙালী জাতির মানসিক ধারা, তার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, তার বিশেষ রূপ, তার ভূগোল, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি এসে পড়েছিল। অতএব ইতিহাস ও সমাজ ছাড়াও জাতিবিচার ও ভূগোলবৃত্তান্ত চিত্রধারার উপলব্ধিতে সাহায্য করতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, এই সব জ্ঞানের সাহায্যেই আঙ্গিক বিচার সম্ভব।

তা হলে দাঁড়াল এই : আর্ট উপলব্ধির জন্য ইতিহাসের ক্রমবিকাশ, সমাজ-পরিণতি, জাতিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, ভৌগোলিক প্রভাব ও তুলনামূলক বিচার নিতান্ত আবশ্যিক।

অবশ্য একটি কোন চিত্রের সৌন্দর্য উপভোগটাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তার স্থান কোথায়? সর্বত্র নিশ্চয়, কিন্তু প্রধানত, সর্বপ্রথমে ও সর্বশেষে। অর্থাৎ পাঠ শুরু হবে যাকে প্র্যাকটিক্যাল এসথেটিকস্ বলে তাই থেকে। একটা ছবি সামনে রেখে কেন ভাল লাগল কেন ভাল লাগল না, ও কেন কোনো সাড়াই এল না এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রেরা প্রথমে দেবে, ও তারপর সেই সব প্রশ্নের বিচার চলবে। প্রবীণের মতামত না জানানই সমীচীন। রিচার্ডস্ কবিতা-অধ্যাপনায় এই আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটি শ্রমসাপেক্ষ, তাই একটু অদল বদল করলে ভাল হয়। মোটামুটি যদি রেখা, রঙ, ছক, ওজন সমাবেশের অর্থ বোঝাবার পর ছাত্রেরা তাদের মূলনীতিগুলো বিখ্যাত ছবির বিশ্লেষণের ফলে হৃদয়ঙ্গম করে তবে কাজ অনেক দূর এগিয়ে যায়। রঙ, রেখা ও ম্যাস ব্যাপারগুলো কি, দাঁড়ি, বাঁকা রেখা, বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রত্যেকের ভাব উদ্রেকের শক্তি ভিন্ন, আগুন, জলস্রোত, গাছ, ফুল, দাঁড়াবার ভঙ্গী প্রভৃতির গতিরূপ পৃথক— মাত্র এতটুকু বোঝবার পর ছাত্রেরা ওপরের স্তরে উঠতে পারে দেখেছি। তারপর 'এপ্রিশিয়েশন'। এই দিকে একটা ভুল বিশ্বাস জেনে শুনে খাড়া করতে হয়— 'যেন' সৌন্দর্যজ্ঞান একটি বিশুদ্ধ প্রবৃত্তি। অর্থাৎ এবার নেতিবিচারের পালা। সুন্দরী মেয়ে কিংবা মনোহর দৃশ্য ব'লেই চিত্রটি সুন্দর নয়, দামী ও বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কন ব'লেই শ্রদ্ধেয় নয়, গল্প কিংবা কোনপ্রকার আত্মগরিমার খোরাক যোগাচ্ছে ব'লেই সেটি চমৎকার নয়, সর্বোপরি, পরিচিত কিংবা অবদমিত মনোবৃত্তির স্ফুরণ বলেই সেটি

হৃদয়গ্রাহী নয়— এই ধরনের সাধনা চাই, নচেৎ, উপলব্ধি জৈব বোধেই থেকে যায়। এক কথায় willing suspension of beliefs and disbeliefs এই সময় নিতান্ত প্রয়োজন।

এই রকম অবস্থায় সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাস ও বিচার উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

তবু ব্যাপারটা শেষ হল না। ঐ 'যেন'টাকে কাটাবার ফন্দী শিক্ষ-পদ্ধতিতেই থাকা চাই, নচেৎ আর্ট ফর আর্টস্ সেক্-এর মতন ন্যাকামী ঢুকে পড়বে। এখনও পর্যন্ত যখন মনস্তত্ত্ববিদেরা প্রবৃত্তির ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে এক মত নন, যখন 'শুদ্ধ' প্রবৃত্তির চর্চায় মানুষ তার সাম্য হারাচ্ছে, তখন বিশুদ্ধ সংগীত, চিত্র ও কবিতা রসের উপভোগের সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তায় সন্দিহান হওয়াটাই স্বাভাবিক। সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, জাতি সম্পর্কে জ্ঞান 'শুদ্ধি'র মোহ কাটাতে অনেকটা পারে নিশ্চয়, যদি না তারা বিচারের সমগ্র ক্ষেত্রটাকে নিজেরা জুড়ে বসে। শিক্ষকের ওপর ওজন বিভাগ ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, কারণ তাঁরা নিজেরাই অনেকে সুশিক্ষিত নন। সেই জন্য শিক্ষাপদ্ধতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন আর্টের পারিপার্শ্বিক বিচারের সুযোগ থাকা চাই, তেমনিই তৃতীয় অধ্যায়ে এক একটি চিত্রে কি ভাবে সমগ্র চিত্রধারা ব্যক্ত হয়েছে, দেশের ও জাতির চাহিদা ও মনোবৃত্তির প্রকাশ হয়েছে তারই পুনরায় বিচার থাকবে। বলা বাহুল্য এই বিচারের স্তর ও গুরুত্ব সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হতে বাধ্য। তবেই আর্ট শিক্ষা আর্টের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারবে। এইটাই হল শিক্ষার প্রকৃত ফন্দি। আর্টের ইতিহাসে নব্য সৃষ্টির ইঙ্গিত থাকে না, কোন কিছুর ইতিহাসেই থাকে না। ইঙ্গিত ফোটে সেই শুভ্র মুহূর্তে যখন ইতিহাসের শায়িত দণ্ড চৈতন্যের উর্ধ্বলম্বকে অতিক্রম করে। পিকাসোর মতন অতবড় আর্টিস্টের উক্তি 'the artists' business is to produce the work and the observers' is either to be bowled over or not bowled over by it'—অতি-সারল্য-দোষে দুষ্ট। তাঁর নিজের কর্মধারাতেই তার অপ্রমাণ, জীবনের সমগ্রতার কাছে সেটি অগ্রাহ্য।

পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৪৮

রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—শ্রীরমাপতি দত্ত। মূল্য তিন টাকা।

আমাদের দেশে নাট্য সংক্রান্ত যত আলোচনা হয়েছে তার দৃষ্টিকোণ প্রধানত সাহিত্যের। একেই আমাদের লেখকরা রঙ্গালয়ের দর্শকমাত্র (তাও পাস্-এ), তার ওপর আমরা বাঙালী, অর্থাৎ আমাদের দেখবার ভঙ্গীটাই কথাগত, যেমন,

সংগীতে, চিত্রকলায়, পলিটিক্স ও ইকনমিক্স-এ ত' বটেই। ফলে কোনো বাঙালী নাট্যকারের ভাগ্যে গ্র্যানভিল বার্কার জোটে নি। আমাদের ধারণাই নেই যে সাজ-সরঞ্জাম যাকে stage-properties বলে আলো, পোষাক, মাখবার রঙ, মাথার চুল এবং দৃশ্য, বসবার স্থান ও আকার প্রভৃতি নিতান্ত অ-সাহিত্যিক সামগ্রী নাট্যের নাট্যত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। ঝোলা ও কাটা সীন্, লপেটা ও পম্প শু, জ্যাকেট কাঁচুলি, ঘাঘরা শাড়ি, ফুট-লাইট স্পট-লাইট ব্যবহারের মধ্যেকার পার্থক্যটুকু কেবল বাস্তব জগতের নয়, নাট্যরূপেরও বটে। সাহিত্যিক আধিপত্যের আরেক কুফল হয়েছে এই যে আমরা চাই যেন নাটকমাত্রই নায়ক-নায়িকাপ্রধান এবং অভিনয় দেখাবার সুযোগও তাই নায়ক-নায়িকার অংশেই হোক। অবশ্য নাটক বলতেই আমরা বিয়োগান্ত কিংবা ঐ ধরনের গুরু-গম্ভীর একটা কিছু বুঝি, বাকি সব অপেরা কিংবা লাইট কমেডি, যেগুলি বিচারের বাইরে রাখাই যেন ভদ্রতা। অথচ ঠিক এই সব হাল্কা জিনিসগুলোই আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের যথার্থ 'প্লে'। আলিবাবা, আবুহোসেন, চিরকুমার সভা, মানময়ী গার্লস্ স্কুল, বিবাহ-বিভ্রাট প্রভৃতিতে একটা চলন্ত ভাব আছে যেটা প্লে-র প্রাণবস্তু। ঐ সব নাটকের নায়ক-নায়িকা প্রাধান্য লাভ করেনা, সব ক'টি চরিত্রের সমাবেশে ও আদান-প্রদানে নায়ক-নায়িকা, তথা অভিনেতার স্বাতন্ত্র্য ভেসে যায়। রমাপতিবাবু নাট্যের এই মর্ম কথাটি বুঝেছেন বলেই আমি তাঁর বইখানিকে নাট্য-সাহিত্যে একটি মূল্যবান দান বিবেচনা করি। অবশ্য তাঁর বিষয় তাঁকে খুবই সাহায্য করেছে। অমরবাবু নায়কের অংশে প্রভূত যশ অর্জন করেন, তাঁর চেহারা, তাঁর ভঙ্গী, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপ সবই অনুকূল ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি প্লে-র সমবেত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন এইটাই ছিল তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। আমি কয়েকটি প্রমাণ দিচ্ছি। তাঁর রচিত অপেরা ও গান উচ্চ সাহিত্য পদবাচ্য না হয়েও অদ্ভুত রকমের সার্থক হত। তাঁর serio comic অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যা দেখলে মনেই হত না যে অভিনেতা একজন সহজাত নায়ক। তাঁর রঙ্গমঞ্চ, বিশেষত ক্লাসিকের রঙ্গমঞ্চ ও auditorium এমন ধরনের ছিল যেটা নট ও দর্শকের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করত। অধীন অভিনেতাদের সম্মান ও মাইনে বাড়াবার অর্থও তাই। তাঁর হ্যাণ্ড-বিল, তাঁর থিয়েটারে দর্শকের অনাড়ষ্টভাব (ফষ্টি-নষ্টি পর্যন্ত সেখানে হত) যাঁদের স্মরণ আছে তাঁরাই বলবেন যে তিনি দর্শকদের ঠিক দর্শক হিসেবে দেখতেন না। বয়োবৃদ্ধরা ভীষণ চটতেন, তাঁদের মতে অমরবাবু রঙ্গালয়ের গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা নষ্ট করছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে ঐ রুচি বৈলক্ষণ্যের যথার্থ হেতু ধরা পড়বে। একবার অমরবাবু হ্যাণ্ডবিলে লিখেছিলেন যে তিনি বনের মধ্যে থিয়েটার

করলেও লোকে কাতারে কাতারে আসবে। এর মধ্যে দম্ভ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেটা কেবল রক্তের নয়। তার মূলে ছিল দর্শকের মনের ওপর তাঁর সহজ অধিকার। সহজ অধিকার বড় অভিনেতা মাত্রেরই থাকে। এটা তার চেয়েও বেশী অহঙ্কার। সে অহঙ্কারের প্রেরণা এই যে তিনি জনসাধারণের মন জয় করেছিলেন। জনসাধারণ দর্শকের চেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা, দর্শক রঙ্গমঞ্চের মধ্যেকার সমষ্টি, জনসাধারণ দর্শকের পরেও থাকে। এই জনসাধারণ গোটাকয়েক জিনিস চায়, রঙ্গমঞ্চের কাছ থেকে সেই সব জিনিসের তীব্রতর অভিজ্ঞতা প্রত্যাশা করে, এবং এই সব প্রত্যাশা নিয়ে তারা রঙ্গালয়ে আসে। সাধারণের তীব্রতা আনে 'play'। লোকের play-sense থাকতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু তারা যখন দর্শক হয়, তখন তাঁরা play-ই প্রত্যাশা করে। যে নট কিংবা নাট্যকার সেটা পূরণ করে তাঁরই play-sense আছে। বড় অভিনেতাদেরও মধ্যে অনেকের এটি থাকে না। অমরবাবুর ছিল। রমাপতিবাবু অমর দত্তের অতুলনীয় সার্থকতা ও জনপ্রিয়তার মুখ্য কথাটি ধরেছেন। রমাপতিবাবুর জীবন চরিত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' অভিনেতা কিংবা নটরাজ অমরেন্দ্রনাথ নয়।

এমন কথা বলছি না যে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনায় লেখক কৃতিত্ব দেখান নি। সেটা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সব চেয়ে বাহাদুরী এই যে লেখক অমরবাবুর জীবনের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করেন নি, অনাত্মিক নিরপেক্ষতা ও সুবিচার সর্বপ্রকার জীবনচরিতেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রাণবান পুরুষের বেলা তার প্রয়োজন বেশী, কারণ প্রলোভনও বেশী,। অন্য আরেক রকমের পক্ষপাতিত্ব আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটা একটা কোনো বিশেষ সূত্র ধরে, যেমন মনোবিজ্ঞান কিংবা শ্রেণীবোধের সাহায্যে বিষয়কে আপন দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেবার প্রয়াস। তাও রমাপতিবাবু করেন নি। অথচ মেজদার হাতে মার খাওয়া কিংবা বড় মানুষের আদুরে ছেলের কুশিক্ষা দিয়ে অমরবাবুর দোষস্খালন যে খানিকটা চলত না তা নয়। অন্য ধারে বিপক্ষের দলকে দোষী সাব্যস্ত করে অমরবাবুর বিবেচনাহীনতাকে সহৃদয়তা প্রমাণ করবারও সুযোগ ছিল। তা না করে রমাপতিবাবু পুরো মানুষটিকে গ্রহণ করেছেন। আমার পূর্বেকার মন্তব্য ও এই মন্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ অমরবাবুর সমগ্র ব্যবহারে, অতএব রঙ্গালয়ে একটা প্রতিভার ছাপ ছিল। রঙ্গালয়ের অমরেন্দ্রনাথ ও বাইরের জগতের অমরেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি, তেজে, আত্মবিশ্বাসে, সরলতায়, উদারতায় যেমন অসংযম, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি অসদ্-গুণে। জীবনের ঐক্যটি রমাপতিবাবুর বই পড়বার পরে মনে গেঁথে যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অমরবাবুর খেদোক্তি, দু'জনের যুগল ছবি, তাঁর মাকে লেখা চিঠি,

প্লেগের সময় সেবা, অঘোর ও হরিরাজ অভিনয় একই জীবনের বিকাশ।

ঠিক এই ভাবে, খোলাখুলি, রমাপতিবাবু লেখেন নি। তার বদলে ঘটনাকে স্বাধীনোক্তির অধিকার দিয়েছেন। রচনার দিক থেকে বোধ হয় এই পদ্ধতিটাই ভাল। কিন্তু পড়বার সময় মনে হয়েছে হয়ত বা কথাটা স্পষ্টভাবে লিখলেই চলত। কারণ, তাঁর আবৃত্তির ভদ্র উচ্চারণে, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনায় যেমন তাঁর ব্যক্তিগত আভিজাত্য ধরা পড়ত, তেমনই নট-নটীদের প্রতি সক্রিয় ভালবাসায়, ঘোষণাপত্রের ভাষায়, রঙ্গালয়ের সাজ-সজ্জার আড়ম্বরে, তাঁর 'বাবু' নামে, তাঁর প্রতি অন্যের ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধায় যেটা ছিল সেটা তাঁর নিজস্ব, অর্থাৎ দিলদরিয়া মেজাজ। আরেকটি কথা— তার প্রমাণ আমার নিজের কাছে— তাঁর সমগ্র অভিনয় দেখে আমার মনে হত— একটা অতিরিক্ত শক্তি— ঐশী নয়, নিয়তি বোধ হয়, তাঁর ওপর কাজ করছে। একটা অন্ধভাব, স্বপ্নমাখা জড়তা তাঁর অভিনয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে জেগে উঠতেন, তখন কণ্ঠে হুঙ্কার আসত, সেটা বেশী হত একটু, কিন্তু ঝোঁকটা যেন স্বপ্ন ভাঙবার পরের, কোনো অদৃশ্য শক্তিকে যুদ্ধং দেহি আহ্বানের। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁর চ্যালেঞ্জ, defiance, অভিমান প্রভৃতি মনোভাবমূলক অভিনয় অত্যন্ত ভাল হত। জীবনেও ঠিক দেখি ··যেন একটা অদৃশ্য শক্তি তাঁকে নিয়ে চলেছে. তিনি কখনও সজ্ঞান, কখনও অজ্ঞান। সম্পূর্ণ জ্ঞানী নন, তাই তিনি মহান নন, আবার নিয়তি তাঁকেই বেছে নিলে এবং তিনিও বিদ্রোহ করছেন এই জন্যই অ-সাধারণ। সে যাই হোক, অমরবাবুর জীবনে ও কর্মে কোনো ভেদ ছিল না, তাই ভদ্র সংস্কার ভেঙেও তিনি ভদ্র, যদিও দুঃসাহসী। জীবিত থাকলে এই অসাবধানী পুরুষ অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতেন এবং পরে ওয়ার্দা কিংবা কাশীবাসী হতেন।

আমাদের বয়সী লোকেরা এক রকম অমরদত্তের যুগের লোক। মুস্তাফী মহাশয়, গিরীশবাবু, অমৃত মিত্তিরকে আমরা অভিনয় করতে দেখেছি বটে, কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহের পরিচয়ে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একটু দূরই ছিল। অমৃতলাল বসুকে আমরা প্রধানত নাট্যকারই জানতাম,' যদিও তাঁর নিমচাঁদ, ঠাকুর্দা প্রভৃতির অভিনয় খুবই ভাল লাগত। আমাদের সময় দু'জন মাত্র নট দর্শকের মন জয় করেছিলেন, দানিবাবু ও অমরবাবু। নটীদের মধ্যে প্রথমে তিনকড়ি, পরে তারাসুন্দরী, এঁরাই সত্যকারের প্রথম শ্রেণীর, অন্যের পটুত্ব ছিল বিশেষ অংশের। শহরের যুবক-সম্প্রদায়, গ্রামের লোক ও ডেলী প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে তর্ক উঠত দানিবাবু বড় না অমরবাবু বড়! সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে অনেক ভাল অভিনেতা ছিলেন, তাঁরাও হয় অমরবাবু না হয় দানিবাবুর ঢঙে

অভিনয় করতেন। আরেক জন নট ছিলেন সবার বাইরে— রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য খুব অল্পলোকের হত আমাদের ছেলে বয়সে। অতএব রঙ্গালয়ে মোটামুটি অভিনয়ের দুটি ধারাই চলে আসছে বলতে হয়। এতদিন, অন্তত, কারণ, শিশিরবাবুর পর অনেক কিছুই বদলেছে।

অভিনয়ের দুটি ধারার প্রথমটি আবৃত্তিমূলক, দ্বিতীয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা-প্রধান। আবৃত্তির প্রাণ সুর, যার সাংগীতিক অংশ কণ্ঠস্বরের এবং নাটকীয় অংশ ছন্দ, গতি ও বিরামের সাহায্যে ফোটে। একে একপ্রকার সাহিত্যিক অভিনয় বলা চলে। উপাদানের তারতম্য অবশ্য থাকে, যেমন অমৃত মিত্রের কণ্ঠস্বরে বেগ ছিল বেশী, অমর দত্তের ছিল জোয়ারী। অমৃত মিত্রের আবৃত্তি যেন অবিরাম শ্রাবণ ধারা, অমর দত্তের যেন শরতের প্লাবন। অর্থাৎ অমরবাবু আবৃত্তির বাহিকতা ভাঙতেন গমক ও বিরামের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের স্বর বাঁশির মতন, তাঁর অভিনয় আবৃত্তি-প্রধান, এবং সে-আবৃত্তি নানা কারণে লিরিক ধর্মী, অর্থাৎ সুর-ঘেঁষা বেশী। বাঁশির আওয়াজের ডিমেন্‌সন্‌ যেন দুটি, তারের যেন তিনটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের রেঞ্জ অত্যন্ত বেশী হওয়ার দরুন ক্ষতিপূরণ হত সহজে। অন্যদিকে গিরীশবাবু, দানিবাবুর অভিনয় দেহ ও মুখভঙ্গীর ওপর বেশী নির্ভর করত। গিরিশবাবুর স্বর বজ্রগম্ভীর, এবং উচ্চারণ পদ্ধতি যেন গৈরিশী ছন্দেই ঢালা। (সেটা কতটা হাঁপানির জন্য বলা যায় না)! দানিবাবুর আওয়াজ গম্ভীর, কিন্তু উচ্চারণ নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। সেইজন্য অভিনয়টাই তাঁর মূলধন হয়ে উঠত এবং সেটা তিনি খুব উঁচু হারেই খাটাতেন। আবৃত্তিতে অমরবাবুর বিশ্বাস ছিল অসীম, তাই স্থির শান্ত ভঙ্গিমা ও ধীর সঞ্চারণই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। হত অর্ধেন্দুবাবুর অভিনয় যা দেখেছি তাতে আবৃত্তি বেশী ছিল না, তাই বোধ হয় আমার মনে গোটা কয়েক মূর্তিই সাজান আছে। সেটা কি তাঁর প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী সূক্ষ্মতম ভাব পরিবর্তনের আদেশবাহী ছিল বলেই? যদি তাই হয় তবে তিনিই ছিলেন আমাদের 'শুদ্ধ' অভিনেতা এবং তাঁর অভিনয় নৃত্যাঙ্গের। সে যাই হোক, শিশিরবাবুর অভিনয় বিচার করলে মনে হয় যে তাতে পূর্বোক্ত ধারা কয়টি মিশেছে, তাই তাঁর আবেদন সমৃদ্ধতর। মেশবার ফলে ধারাগুলিও বদলেছে। আবৃত্তি সংযত, অথচ এমন সংযত নয় যে সেটি গদ্যছন্দ হয়ে উঠে। অনেকটা যেন পূরবী ও পুনশ্চ এর পার্থক্য। তাঁর কাটা-কাটা আবৃত্তিতে দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। ঘনতা, অর্থাৎ অবান্তর ও নিরর্থককে পরিত্যাগ, যেমন সুরের সাহায্য তিনি নেন না; এবং স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুষ্ঠু ব্যবহার, যার ফলে অর্থ ই যে কেবল স্পষ্টতর ও গভীরতর হয় তা নয়, সুর অন্তর্মুখী ও

ব্যাপক হয়, বাক্যের টেক্‌শ্চার খাপি হয়। আমি যা বলছি তার উপমা বীণায় (দক্ষিণী ঢঙে) ও বিদেশী সংগীতে এবং সাহিত্যে sprung rythm-এ পাওয়া যাবে। আবৃত্তির অভিনবত্বের সঙ্গে মিশে থাকে শিশিরবাবুর অভিনয় দক্ষতা। শিশিরবাবুর চেহারা ও মুখের মাংসপেশী তাঁকে গিরিশবাবুর অভিনয়ের দিকে টেনে আনে। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত এক প্রকার বিদগ্ধজন সুলভ পরিচ্ছন্নতার ও শুদ্ধতার জন্য তাঁর মানসিক আত্মীয়তা অর্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে। সবার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। আমি পুনশ্চের ছন্দের উল্লেখ করেছি, তাছাড়া শিশিরবাবুর হাতের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের দান। হাত নিয়ে আমরা কেন বড় অভিনেতারাও মুস্কিলে পড়েন। এই ধরনের দোটানার নিষ্পত্তি করেন শিশিরবাবু দুটি উপায়ে। প্রথম, চোখ ও ঠোঁটের দ্বারা। তাঁর চোখ ও ঠোঁটের গড়ন এমন যে তাতে একত্রে বিপরীতভাব এবং সূক্ষ্ম অস্পষ্ট fugitive ভাব সহজে খোলে, যেজন্য শ্লেষ বিদ্রূপ প্রভৃতিতে তাঁর সমকক্ষ আমাদের রঙ্গমঞ্চে কেউ নেই। আমি ছিবলে ঠাট্টা বলছি না, satire বলছি। দ্বিতীয় উপায়, movement ; তাঁর প্রবেশ, সঞ্চারণ ও প্রস্থান নাটুকে নয়, কেবল উপযোগী আবৃত্তির সময় তাঁর অবয়ব সঞ্চালন লক্ষ্য করা দর্শকের চরম আনন্দ, বিশেষত হাত ও চিবুক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অমর দত্তের অভিনয় বিচার করতে চাই। ফলে দেখি অমরবাবুর অভিনয় আবৃত্তিপ্রধান ছিল। তাঁর অঘোরের অভিনয় আমি একাধিকবার দেখেছি। অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাতেন সেখানে। তবু, সেখানেও, তাঁর মুখের মাংসপেশীতে আলো ছায়ার খেলা থাকত না, কেবল mood-এর ছায়াপাত হত। অর্থাৎ প্রাণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধিই, তার দিক পরিবর্তনই থাকত। অন্যদিকে হরিরাজ, প্রতাপে তাঁর গাম্ভীর্যের প্রকাশ পেতাম।

রমাপতিবাবু আমার স্মৃতি ও বিচারকে সমর্থন করেছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সেটা অবশ্য বড় ব্যাপার নয়। আদৎ কথা, রঙ্গালয়ের ওপর ঝোঁক দেওয়াটা, এবং তার পটভূমিতে অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথকে দেখা, যে অমরেন্দ্রনাথের প্রাণশক্তি সামাজিক বাধা-বিপত্তিকে ছাপিয়ে তাঁকে রঙ্গমঞ্চে টেনে এনেছিল। আমার বিশ্বাস এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই ঠিক হয়েছে বিষয়ের পক্ষে।

আমার অনুরোধ রমাপতি বাবু এইবার বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করুন। তাঁর হাতে রঙ্গালয়ের ইতিহাস সম্মান পাবে, সাহিত্যের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে না। এই কাজের জন্য যতগুলি গুণের প্রয়োজন সবগুলিই তাঁর প্রথম বইখানিতে পেয়েছি।

পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৯

বসুন্ধরা—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কবিতাভবন, বারো আনা)।

নানাকথা—সমর সেন (কবিতাভবন, এক টাকা বারো আনা)।

শিবির—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কবিতাভবন, দেড় টাকা)।

সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার (পুঁথিঘর, ২২, কর্ণোয়ালিশ স্ট্রীট, আড়াই টাকা)

World Revolution and the Future of the West—W. Friedman (Thinkers Library, 3/6)

Freedom. Its Meaning—R. N. Anschen (George Allen & Unwin.)

অন্তঃশীলা—রসময় দাশ।

চিত্রভানু—সুধীর কর।

গত কয়েকমাস যাবৎ একটা প্রশ্ন কেবলই মনে উঠছে। তিন চার বছর আগে 'প্রগতি' সাহিত্যের ধুয়ো শুনি। সে সম্বন্ধে কাণাঘুষোও চলেছিল কিছু, কেউ বলেছিলেন সাহিত্য সাহিত্য, তার আবার প্রগতি কি? কেউ উত্তর দিলেন জীবনের সহযোগেই সাহিত্যের সার্থকতা, এবং সে-জীবন যখন বদলাচ্ছে তখন সাহিত্যের বিষয় ও রূপও বদলাবে নিশ্চয়। প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা দলবদ্ধ হতে চেষ্টা করলেন, দু'একখানা পত্রিকাও বেরুল, তারপর যুদ্ধের হাঙ্গামা শুরু, ২২শে জুন হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করলে, কম্যুনিস্ট পার্টি আইনসঙ্গত হ'ল, (পার্টির কাজ অবশ্য বে-আইনী রইল) সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি গতি পেলে, খানিকটা মতিও এসে পড়ল বৈকি! মতি যোগাড় দিলে মার্কসিজম। খানিকটা, কারণের মধ্যে সোভিয়েট-প্রীতিটাই বেশী। এগুলো ঘটনা, অতএব তর্কাতীত। এখন প্রশ্নটা হল, আমাদের আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যে মার্কসিজম-এর প্রভাব কতটুকু? আমি এমন উত্তর চাই না যার সাহায্যে কোন বিশেষ রচনাকে প্রগতি (বিপ্লব) বিরোধী নাম দিয়ে অগ্রাহ্য করতে পারি। যাঁরা পার্টির সভ্য হয়ে কাজে নেবেছেন তাঁদের পক্ষে সূক্ষ্ম মতান্তরতার মূল্য অনেক। সাহিত্যে কিন্তু ততটা মূল্য যখন নেই তখন প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গীটাই বিচার্য, অর্থাৎ তারই দ্বারা প্রমাণ হবে প্রভাবটি বেশী না কম।

কবিতাতেই যেন মার্কসিজম প্রচারিত হচ্ছে বেশী। অন্তত সমর সেনের 'নানা কথা', চঞ্চলকুমারের 'বসুন্ধরা,' বিষ্ণু দে'র 'পূর্বলেখ' ও '২২শে জুন' প্রভৃতি আধুনিক কবিতার বই, 'কবিতা', 'নিরুক্তে'র ইদানীংকার সংখ্যা প্রভৃতি দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কামাক্ষীপ্রসাদের 'শিবির'কেও এই দলে ফেলা যায়।

অবশ্য রসময় দাশের 'অন্তঃশীলা' ও সুধীরবাবুর 'চিত্রভানু' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রচনা, যার মধ্যে মতবাদ নেই বলব না, তবে যা আছে তাতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে তার অস্তিত্বটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে খোঁচায় না। অর্থাৎ সেজন্য হয়ত দোষটা যত আমাদের চোখের কৃতিত্ব, ততটা তাঁদের রচনার নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে 'অন্তঃশীলা' ও 'চিত্রভানু'তে মার্কসিজ্‌ম্‌-এর নাম-গন্ধ নেই। বই দু'খানি এই হিসেবে 'পবিত্র'। 'পবিত্র' কবিতা ভাল কি মন্দ বলছি না। সাহিত্যিক গতির নির্দেশ হিসেবে যখন আলোচনা করছি তখন ভিন্ন মুখের চিহ্ন হবার জন্য পবিত্র কবিতা একটু অতিরিক্ত রকমের ভাল হলেই সুবিধে হয়। 'অন্তঃশীলা' ও 'চিত্রভানু'তে একাধিক উপভোগ্য কবিতা রয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তাদের কাব্য-গুণ এমনই অপূর্ব নয় যে আমাদের মনকে এই যুগপ্রবাহ থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। প্রগতিশীল কবিতায় অনেক বাজে লেখা চলেছে, তবু যেন সমষ্টিগত ভাবে এই সব দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাও জীবন্ত। ওরা যেন ঘাটের মন্দির পুরাতন বলেই সুন্দর, এরা যেন নদীর স্রোত, কাদাকুড়ো সত্ত্বেও স্রোত।

Anti-Fascist সোভিয়েট বন্ধুদের একাধিক পুস্তিকাও পড়লাম। তাঁরা ত মার্কসিস্ট হবেনই। মার্কসিস্ট না হলে ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর ধর্ম বোঝা যায় না এবং তার বিপক্ষে লড়াও যায় না। মাত্র 'উদার' মতাবলম্বীর কাজ নয় ওটা। ঔদার্যের ইতিহাস ধনিকতন্ত্রেরই সঙ্গ, যে-ধনিকতন্ত্রের বিকৃতি অথচ পূর্ণ রূপ ঐ ফ্যাশিজ্‌ম্‌। হাতের কাছে চমৎকার প্রমাণ পেলাম। 'World Revolution and the Future of the West' এবং 'Freedom—Its Meaning' নামে দু'খানা অত্যন্ত সুলিখিত বই পড়লাম। প্রথমটির লেখক W. Friedman, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক, এবং দ্বিতীয়টির সম্পাদিকা Ruth Nanda Anschen, যাঁর জন্য পৃথিবীর উনিশ জন দিগ্‌গজ প্রবন্ধ লিখেছেন কিংবা পুরানো প্রবন্ধ দিয়েছেন, স্বাধীনতা বিচার করে। এঁদের মধ্যে কেউই ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর ভক্ত নয়, এবং হগ্‌বেন ও হল্‌ডেন ভিন্ন আর কেউই মার্কসিস্ট নয়। ল্যাস্‌কীকে কোন্‌ দলে ধরব জানি না। কেবল তাই নয়, ঐ ফ্রীডল্যাণ্ড, আইনস্টাইন, টম্যাস মান্‌, সাল্‌ভেমিনি বার্নস্টাইন, প্রত্যেকেই ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর হাতে বিধ্বস্ত হয়েছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের স্বাধীনতা-প্রীতি কে না জানে! অথচ এঁদের এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখাও যেন ফাঁকা মনে হল। রাসেলের প্রবন্ধ ঝকমক করছে, কিন্তু তবু যেন কোথা থেকে গিল্‌টীর আওয়াজ কানে আসে। রাসেল লিখছেন :

"Karl Marx as a religious leader, is analogous to both Confucius and Bentham. His ethical doctrine, in a nutshell,

is this : that every man pursues the economic interest of the class, and therefore, if there is only one class, every man will pursue the general interest. This doctrine has failed to work out in practice as its adherents expected, both because men do not in fact pursue the interest of their class, and because no civilized community is possible in which there is only one class, since government and executive official are unavoidable"—অতএব রাসেলের সিদ্ধান্ত যে এই হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই : "But if government is not to be tyrannical, it must be democratic, and the democracy must feel that the common interests of mankind are more important than the conflicting of interests separate groups. To realize this state of affairs completely would be scarcely possible, but since the problem is quantitative a gradual approach may be hoped for." এই ধরনের লেখার চেয়ে হগবেন, হল্‌ডেন-এর লেখায় অনেক বক্তব্য আছে। এমন কি ম্যারিট্যা-র মতন লেখকের মধ্যযুগীয় মনোভাবও এর চেয়ে অনেক বেশী সারগর্ভ। যদিও তাঁর বিশ্লেষণ দেখলে ভট্টপল্লীর কথা মনে ওঠে…কলের ধোঁয়ার সঙ্গে যজ্ঞের ধূম্র, কলের বাঁশির সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র এবং গঙ্গার পবিত্র জলের ওপর কলের তেলের রঙ বাহার। ব্যাপারটা এই : মার্কসিস্ট না হলে ফ্যাশিজম্-এর আসল প্রকৃতি বোঝা যায় না।

কাব্য-সমালোচনা ও তাত্ত্বিক আলোচনাতেও মার্কসিস্ট দৃষ্টিকোণ-ধরা পড়েছে দেখলাম। প্রমাণ স্বরূপ পরিচয়, নিরুক্ত, কবিতা, চতুরঙ্গ, অরণি ও আনন্দ-বাজারের প্রবন্ধ দাখিল করছি। হুমায়ুন কবিরের 'বাঙলার কাব্যে' অন্যান্য বহু বক্তব্যের মধ্যে মার্কসিজমের দিকে ঝোঁক রয়েছে, যদিও সেটা অন্যান্য ঝোঁকের জোরে বেশী খুলতে পায়নি, বরঞ্চ এক এক জায়গায় কাটাকাটি হয়ে গেছে— যথা 'হিন্দু মানস', 'মুসলমান মানস'। মার্কসিস্ট এই ধরনের group mind কিংবা ethos মানতে পারে না। তবু তাঁর বইটাকে ধরতে হবে। সর্বোপরি মেয়েদের চালিত পত্রিকার রচনা। এই সবের মধ্যে কম লেখাই উচ্চাঙ্গের, কিন্তু সর্বত্রই সোশিয়ালিস্ট চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। অবশ্য যাঁরা মনস্থ করেছেন যে বিশুদ্ধ সাহিত্য-চর্চাতেই মগ্ন থাকবেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যিকদেরও স্খলন দেখেছি। যাঁরা ধর্ম ও দর্শন নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তাঁদেরও প্রাণপণ প্রচেষ্টা মার্কসিস্ট

জড়বাদকে কিভাবে খণ্ডন করা যায়। ছোট গল্প ও নভেলে কিন্তু ধারাটা খুব জোরাল নয়, যদিও সোমেন চন্দের 'ইঁদুর', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'ফসল' নামে গল্পগুচ্ছ, সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলীর ডাক' গল্প, সবই গণবোধের চেতনায় জীবন্ত। তা ছাড়া একটা মোটামুটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার চেষ্টা সর্বত্রই রয়েছে মনে হয়।

গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির-রূপান্তর'-এ সমাজ-বিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞান সুস্পষ্ট। তিনি পুরোপুরি মার্কসিস্ট। মার্কস-এর মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিবৃতি ও তার রূপান্তর তাঁর বিষয়। মোটামুটি যতটা জ্ঞানের প্রয়োজন মার্কস-এর মতামত সম্বন্ধে তার প্রায় সবই কিছু না কিছু বইখানিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলা ভাষায় একে **Intelligent Women's Guide to Socialism** কিংবা **Culture** বলব না। যাঁরা ইংরেজী বই-এর কৃপায় মার্কসিজম সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁরাই এই রচনাটি উপভোগ করবেন, অবশ্য রচনাভঙ্গীর দোষ ভুলে গিয়ে। অন্তত তাই ভাবাই সঙ্গত। কিন্তু খানিকটা পড়বার পর উপভোগের এক বাধা ওঠবার ভয় আছে। যাঁরা ইংরেজীতে মার্কসবাদ পড়েন তাঁরা সাধারণত ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, অথচ তাঁরা জানবার জন্য একটু উদ্‌গ্রীব হচ্ছেন, আজকাল। তাঁরা যখন দেখবেন যে গোপাল বাবু মার্কসিজম্‌ সম্বন্ধে এমন কোনো নতুন কথা বল্লেন না যা ইংরেজী বই-এ নেই, কিংবা আরো মনোজ্ঞ ভাবে নেই, তখন বইখানির কাছ থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা পূরণ করতে চান ও চাইবেন। সেখানে কিন্তু দেখা গেল যে গোপালবাবুর বর্ণনা খাপছাড়া ও নিতান্তই সুনীতিবাবুর একটিমাত্র প্রবন্ধের ওপর আশ্রিত। খাপছাড়া না হয় আমাদের মালমশলার অভাবে, কিন্তু মাত্র সুনীতিবাবুর ব্যাখ্যা কেন? সুনীতিবাবুর বক্তব্যের বিচার করছি না, কিন্তু এটুকু বলব যে সে-ব্যাখ্যার ওপর অত বড় সিদ্ধান্ত দাঁড় করান যায় না, এবং যায় নি। গোপালবাবুর নিজের **cultural interpretation** চাইলাম তাঁর মার্কসবাদের ব্যাখ্যার অপূর্ণতার পরিবর্তে, পেলাম অন্যের এমন একটি ব্যাখ্যা যেটা ভার সয় না মার্কসবাদের। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিক ও নিজস্ব ব্যাখ্যা বরঞ্চ ভূপেন দত্ত মশাই দিচ্ছেন 'পরিচয়ের' পৃষ্ঠায়। পূর্বে যা লিখলাম সে-সব মাত্র আমার একার মনোভাব নয়। গোপালবাবুর বইখানি আমি একাধিক সুশিক্ষিত ভদ্রলোককে দিয়েছি, তাঁদেরও বিপত্তি আমারই মতন। গোপালবাবুর অবস্থা আমি বেশ বুঝি। আমাদের কৃত্রিম সমাজে লেখকরা বুঝতে পারেন না কাদের জন্য তাঁরা লিখবেন। একধারে মাতৃভাষার ওপর প্রীতি ও জনশিক্ষার প্রতি কর্তব্য-বোধ, অন্যধারে মালমশলা অন্য ভাষায়, প্রত্যয়গুলিও তাই। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখক

তাঁরা বিরোধের সমন্বয় সাধতে পারেন বটে, কিন্তু বাকী লেখকরা ? তাঁদের লিখতে হবে না, তাঁদের ভাষা-প্রীতি ও জন-প্রীতি থাকবে না এমন কোনো নিয়ম নেই। অতএব এঁদের রচনায় পূর্বোক্ত দোষ থাকবেই থাকবে। গোপালবাবু একত্রে পণ্ডিত ও লেখক। সংবাদপত্রের সঙ্গেও তিনি যুক্ত, অতএব তাঁর কলম খুঁড়িয়ে চলে না আমি জানি। তাই বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায় প্রত্যাশা করেছিলাম। অন্যত্র ভাষার কৃতিত্ব যা দেখেছি সেটা এখানে একটু বিসদৃশ ঠেকল— যেমন বইখানির প্রারম্ভে ও সুনীতিবাবুর সঙ্গে কথোপকথন বর্ণনায়। এক এক সময় মনে হয় যদি আমাদের দেশের লোকেরা এমিল লাডভিগ্-এর ভক্ত না হতেন তবে ভালই হত। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আরো অনেক উপায় আছে। আরএকটি কথা : কলকাতার তথা বাঙলার সংস্কৃতির পরিচয় তিনি যা দিয়েছেন সেটা আমার কাছে যেন চেনা-চেনা মনে হল। এটি ছোট্ট ব্যাপার, ব্যক্তিগত সন্দেহ মাত্র। সে যাই হোক— বইখানি মূল্যবান। এখানকার অনেককে পড়িয়েছি, এবং প্রত্যেকের হাতে হাতে যেন ঘোরে কামনা করি। কোথায় মার্কসিজম-এর ব্যাখ্যায় আমার মতান্তর আছে তা বলবার মুখ মেরে দিয়েছেন গোপালবাবু। যেটা সব চেয়ে বড কথা এই বইখানি সম্বন্ধে সেটা হল এই · আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একত্রে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ও মার্কসিজম্ সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছেন। ঐ 'একত্রে'-টাই দরকারী ছিল, নচেৎ কেবল মার্কসিজম পড়া বুদ্ধির, ও কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া দেশভক্তির, বিলাস মাত্র। কোথায় কর্নেল উপেন মুখুজ্যে আর কোথায় গোপাল হালদার। আমি বলি এটা উন্নতি, কেবল দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন নয়।

সংখ্যা হিসেবে কবিতাতেই কিন্তু মার্কসিজমের ছাপ বেশী পড়েছে। গুণ হিসেবে নয়, কারণ, বিজন রায় ও গোপাল হালদারের সমাজচেতনা কবিদের মধ্যে পাচ্ছি না। প্রত্যাশা করব না কেন ? নিশ্চয় করব। রাগরূপের জন্য ঠাট, কাব্য-রূপেরও তেমনই দর্শন। তারপর আনন্দ, জানি কিন্তু তার অভাবে ফক্কিকারীত্বাও জানি। আনন্দের জন্য চেতনার সীমা নেই, ঠিক এই মাত্রার পর চেতনা আনন্দের বাধা হবে এমন কোনো পরিমাণও নেই। ইকনমিক্স-এ আজকাল optimum এবং law of proportion প্রত্যয় চলছে। তাও যদি সাহিত্যে খাটাই তবু আমার চাহিদা নিরর্থক নয়, কারণ, optimum হল একটা চলন্ত সৌরিজ্ঞ, একটা গতিশীল অনুপাত, চেতনা, ছন্দ, ভাবধারার অনুপাত। সেটা আবার একটা স্তর থেকে অন্য স্তরে ওঠে নাবে। তাতে ডায়েলেকটিস্ও দেখা যায়। অতএব আমি কবিদের কাছেও চেতনার বৃদ্ধি চাইবই চাইব।

'প্রেরণা' অজ্ঞানতারও নামান্তর হতে পারে। আমি অন্তত মার্কসিজম্-এর প্রভাব বিচারে ঐ চেতনারই দোষগুণ খুঁজব।

প্রায় বছর দশেক আগে আমাদের কবিতায় হতাশা ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুর ছিল অস্তি ও আনন্দের, যার সঙ্গে বিদেশী optimum-এর কোনো ঐক্য নেই। নতুন সুর, নাস্তিকতার, বা nihilism-এর নয়, মায়াবাদের দুঃসাহসিকতারও নয়, মাত্র সন্দেহের, অসন্তোষের, প্রশ্নের খুঁতখুতুনি। আনন্দের পরিবর্তে যে নিরানন্দ এল তার পিছনে এমন কোনো জীবন-দর্শন ছিল না যার জন্যে অসন্তোষকে সদর্থক ভাবা যায়। হার্ডির কবিতায় যা পাই তা যতীন সেনগুপ্তের কবিতায় নেই। অসন্তোষের দুটি অঙ্গ ছিল, জৈব ও আর্থিক। কোনো কোনো কবির হাতে দুটি মিশে গিয়ে একটা বিপ্লবী চঙ-যে আসে নি তা নয়। সাধারণত কিন্তু মিশল না, কেবল যৌন-ব্যাপারে সমাজের বিপক্ষে ব্যক্তি পরিপূর্ণতার নামে মাথা তুলে দাঁড়াল। তার প্রয়োজন ছিল অবশ্য, এবং কাম জিনিসটাই বিপ্লবী। কিন্তু সে-বিপ্লবের সূত্রপাতটা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমাদের সংস্কৃতিও ইংরেজ আমল থেকে ঐমুখো। অতএব এই ধরনের কবিতায় একটা anarchic element ছিল, যার অস্তিত্ব সন্দেহ ক'রে, না বুঝে, অনেকে তীব্র প্রতিবাদ শুরু করলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় নি, কারণ, অসন্তোষের অন্য অঙ্গটি জৈব অঙ্গকে সাহায্য করতে সদা তৎপর। ঠিক ঐ সময় আমাদের দেশের সামনে এল বেকার-সমস্যা তার দৈন্যের রূপ নিয়ে। 'দৈন্য'-কথাটির অর্থ আশা-শূন্যতা নয়, কারণ আমাদের দেশের বে-কার-সমস্যা একটু অন্য জাতির, সেটা প্রাণ-রক্ষা নয়, ভদ্রতা-রক্ষা, এবং যে ভদ্রতার মধ্যে ইংরেজী বুর্জোয়ার নিঃশঙ্ক নিশ্চয়তা নেই, ঐতিহ্যের যোগ কোথাও নেই, এবং যে রক্ষার কবচ অফিসের বড় বাবুর আশীর্বাদ ও মুরুব্বীর জোর এবং যার মূল্য মাসিক চল্লিশ টাকা ও কিছু উপরী। এর সঙ্গে জুটল ইংরেজী-সাহিত্যের পূর্বতন দশকের হতাশবাদ। 'প্রভাব' কথাটি ব্যবহার করতে চাই না, কারণ, সেটা একটু একপেশে, তাতে আমাদের দিকটা বাদ পড়ে। আমাদের ওপর নানা দিক থেকেই প্রভাব এসেছে, কিন্তু তার থেকে বেছে নেওয়াটাই কৃতিত্ব। এক হিসেবে টি. এস. এলিয়ট-এর Waste Land যে বাংলা আধুনিক কবিতার জন্মস্থান তার বহু প্রমাণ পেলে। ১৯৪২ সালের সাম্যবাদী পদ্য ও গদ্য-কবিতায় 'ফণি মনসা' প্রতীকটির, রঙের মধ্যে 'হলদে' এবং স্থানের মধ্যে 'বালুচরের' ছড়াছড়ি। সুধীন্দ্র দত্তের এলিয়ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রায় দশ বছর আগেকার, মধ্যে রবীন্দ্রনাথের Journey of the Magi-র বিখ্যাত অনুবাদ, এবং এখনও 'পূর্বলেখ'-এ বিষ্ণু দের "ফাঁপা মানুষ"। এলিয়ট-এর ব্যর্থতাবোধকে

পরিমিত মনে হওয়া স্বাভাবিক, তাঁর 'সুইনী' ও 'প্রুফ্রক' আমাদেরই মত ব্যবহার করে। তাদেরও ভবিষ্যৎ নেই, আমাদেরও নেই, কেন নেই তার কারণ তারাও সব, আমরাও তাই, তাদের প্রেম ও প্রাণ চড়ুই পাখির, আমাদেরও তাই। কিন্তু এলিয়ট-এর আরেকটি অন্তরের দুঃখ ছিল, যার খোঁজ আমরা করি নি, সেটি হল খ্রীস্টান সভ্যতার সর্বনাশে বিক্ষোভ। সেটা আবার সক্রিয় বিক্ষোভ, জাতে ভদ্রলোক আমেরিক্যান, তাই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। কতটা সক্রিয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর আজকালকার নাটক ও কবিতায়, এবং সর্বোপরি তাঁর একটা **Christian Sociology** দাঁড় করাবার প্রাণপণ চেষ্টায়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এলিয়টের সক্রিয়তা ধরিয়ে দেন, কিন্তু তাঁর নির্দেশ তাঁর অন্যান্য নির্দেশের মতনই আমরা অবহেলা করি। সে যাই হোক, এলিয়টের ব্যর্থতার (frustration) সঙ্গে আমাদের বড় চাকরী ও মাঝামাঝি রকমেরও চাকরী না পাওয়ার আফ্‌সোসটা জুড়ে দিলাম। প্রথম থেকেই সমাজের চাপে যৌন-নিষ্ফলতা ছিল। এখন মিলেজুলে একটা ছক্‌ হয়ে গেল। তাই আধুনিক কবিতার মনোভাবে একটা জোড়াতাড়া, একটি ফাঁকি রয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস যে আধুনিক কবিতার দোষ দক্ষতার অভাবে নয়, প্রধানত তার ভাবগুচ্ছের অসংলগ্নতায়। শেষে দাঁড়ায় ঐ সামাজিক-বিপ্লবের অপূর্ণতা। কিন্তু কার্যকারণভাবে নয়। তাই যদি হত তবে কম্যুনিস্ট সমাজেই সব কবিতা সর্বাঙ্গীন হত। যদি কারণ খুঁজতেই হয় তবে বলব, ঐ জোড়াতাড়ার জন্য দায়ী আমাদেরই অজ্ঞতা, নিজেদের পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে, সামাজিক অভিব্যক্তির নিয়ম ব্যাপারে। আমি চাই না যে আমার বক্তব্য ভুল বোঝা হয়। অসংলগ্নতা, অজ্ঞতা রয়েছে নিশ্চয়ই। তবু আধুনিক কবিতার থাপছাড়া নক্‌শাটাও নতুন, তার অন্তরে নতুনত্বের চাহিয়া আছে। আমাদের আধুনিক কবিতা কেবল শৌখিন ফ্যাসান নয়। দু একজনের পক্ষে এখানে-ওখানে ভাববিলাস, কিন্তু একত্রে ধরলে তার মধ্যে বিপ্লবের বীজ আছে। অবশ্য খানিকটা অজানা বলে তার বিপদও আছে, কিন্তু সম্ভাবনাও কম নয়। শক্তি উন্মুক্ত হবার পর এই রকম দ্বিধা বিভক্ত হবার সম্ভাবনা থাকবেই। মার্ক্‌সিস্ট কবিদের উদ্দেশ্যই হল যাতে শক্তিটা বাঞ্ছনীয় প্রণালীতে চলে। আমি তাই মার্কসিস্ট কবিতার বহুল প্রচার কামনা করি। পূর্বেকার হতাশা আজ আশায় পরিণত হতে চাইছে, এই হল মোট কথা। তারপর সাহিত্যিক বিচার।

পরিণতি চাইছে, কিন্তু পরিণত হয় নি। গোটাকয়েক চিহ্ন দেখেছি দুর্বলতার। বিষ্ণু দে, সমর সেন ও চঞ্চলকুমারের অধিকাংশ কবিতাতে অন্যান্য

কবিদের, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের পদের উদ্ধৃতি আছে, এবং সেগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পদের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্দেশ্য অবশ্য নতুন পুরাতনের বৈপরীত্য-বোধ জাগান। উদ্ধারটা স্মৃতির, এবং বোধ জাগান চেতনার কাজ। দুটি কাজের সমন্বয়-সাধন, দুই রাজ্যে অবাধ বিচরণ আজকালকার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, অতএব কাব্যপ্রয়াসের অধীন। আধুনিক কবিতাকে সমসাময়িক হতেই হবে। কিন্তু সমন্বয়ে এমন একটা কিছু থাকে যেটা নিছক দ্বন্দ্বের (contrariety), অতিরিক্ত। আধুনিক কবিতায় বেশীর ভাগ পাচ্ছি, একধারে স্মৃতি, অভ্যাস, অতীতের টান, অন্যধারে একটা বোধ, বুদ্ধি নয়, বোধ, যেটা বাষ্পীয় ব'লে আধারের আকার নেয়, (যে-জন্য রুশিয়ান সাহিত্যিক পরীক্ষার অনুকরণ সম্ভব) অথচ নিজের তাগিদে সুনির্দিষ্ট নয়। বিষ্ণু দে'র "জন্মাষ্টমী"তে সমন্বয়ের জমজমাট ভাব নেই, অথচ "পদধ্বনি"তে আছে। '২২শে জুনে'র রচনায় কাঠিন্য থাকার দরুন অনেকস্থলে উপভোগ্য, কিন্তু কোথাও এমন ভাবে জমেনি যে প্রতি পাঠে নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কারে চিত্ত ভরে ওঠে। কামাক্ষীপ্রসাদের 'শিবিরে' পূর্বোক্ত সমন্বয়ের কোনো চিহ্নই পাইনি। চঞ্চলের 'বসুন্ধরা'র একাধিক কবিতায় কিন্তু আছে। কেবল তাই নয়, সমগ্র বইখানি বিচার করলে একটা ধারারও প্রমাণ পাই। 'পলাতক' একধারে ও 'বসুন্ধরা' অন্যধারে, মধ্যে "অডিসিউস" ও "ক্যাসাণ্ড্রা" এই ভাবে কবিতাগুলি সাজালে লক্ষ করি কবির সমাজচেতনার অভিব্যক্তিকে। পলাতকের শোচনীয় অবস্থা পার হয়েও অডিসিউসের 'একনিষ্ঠস্থ ধর্মে প্রত্যয়ে' আসা উন্নতির একটি ধাপ। 'মিডিয়া' ও "ক্যাসাণ্ড্রা" নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় প্রতিক্রিয়ারই নিদর্শন। সর্বশেষে, 'বসুন্ধরা', যেখানে বর্তমান সমস্যার একটা পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন আমাদের কবি। সে-রূপ হয়ত বিকশিত হয়নি, কিংবা বিকাশে তেমন উজ্জ্বলতা নেই। তবু ধারাবাহিকতা রয়েছে অস্বীকার করা যায় না। চঞ্চলের কবিতা অন্য কবির তুলনায় হয়ত কম চমকদার, কিন্তু সেখানে ফাঁকি থাকে না।

সমর সেনের 'নানা কথা' নিয়ে লক্ষ্ণৌএর জনকয়েক সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক দু' তিন বার আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার সময় দেখা গেল যে সমরের ছোট কবিতাই সকলের প্রিয়। 'নানা কথা' কবিতাটি বার বার পড়বার পর মন্তব্য হয়েছিল 'খাপছাড়া, অন্য ছোট কবিতার মতন ঘন নয়।' এই মন্তব্য থেকে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। সমর সেন কি miniature poet হিসেবেই সফল? তাঁর কবিতা অবশ্য চিত্রানুগম। অন্যান্য দেশে যে সামাজিক অবস্থায় miniature painting-এর প্রচার হয়, আমাদের দেশের অবস্থা তা নয়। অবশ্য

সমর সেন খুব sensitive, কিন্তু sensitiveness থেকে sensibility তে আসার অন্তরায় কি তার পক্ষে? 'যার ধর্ম তারই সাজে অন্যের লাঠি বাজে' ভাবলে একজন কবিকে খোপের মধ্যে পুরে রাখাই ভাল, সেখানে সে বক্ বকম্ করুক গে! কবিরও কি পরিণতি নেই, তার কাব্যবোধ যদি প্রসারিত হয়ে সমাজ বোধের দিকে অগ্রসর হয় তবে কোন পাঠকের, কোনো সমালোচকেরই অধিকার নেই, ক্ষমতা নেই বাধা দেবার। সমর সেন এগিয়ে চলেছে ঐ দিকে এটা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে— তারপর অন্য কথা। কিন্তু এই অন্য কথার মধ্যে একটা দরকারী কথা এই অগ্রস্থতিটা জোর পায়ে, না খুঁড়িয়ে, তার পিছন-টান আছে কি নেই। যদি জোর কদমে হয়, যদি পিছন-টান না থাকে, তবেই সমন্বয় পাওয়া যাবে। কিন্তু খুব মন দিয়ে পড়েও তা পাইনি। আমি রসোত্তীর্ণতার উল্লেখ করছি না। এটা Smiles-এর Self-Help-এর success-এরই কাব্য সংস্করণ। আধুনিক কবিদের মতন আধুনিক পাঠকও status-এর চেয়ে process-এর ওপর জোর দিতে চান। তবু বলি ঐ process-এর জন্যও integration-এর প্রয়োজন। তবে সেটা চৈতন্যের। আমার বিশ্বাস যে সমর সেন এবং অন্য আধুনিক কবিরাও নিজেরাই বুঝেছেন নিজেদের অভাব— প্রমাণ, সকলে এপিগ্রাম, সনেট, অন্যান্য ছোট কবিতা লিখছেন। ভারী মজার এই ডায়েলিক্‌টিক্— চৈতন্য যত প্রসারিত হচ্ছে কবিতা আকারে ততই ছোট হচ্ছে। কেবল তাই নয়, সমাজবোধ যতই উদার, বিদ্রূপ ততই সঙ্কীর্ণ। আধুনিক কবিদের বিদ্রূপ, যেমন বিষ্ণু দের বিস্তর কবিতায়, সমরের "ব্রতচারী", চঞ্চলের 'পলাতকে' পাচ্ছি, সেটা নিতান্তই নিষ্ফলতা প্রসূত। এ-বিদ্রূপ মেয়েদের মাথার কাঁটার মতন বাঁকা, গোপন-প্রেমিকের মতন ভীরু, যার চাহনী হল চোরা, যার ফোটান হল খোঁচান, আর চলন হল ছেনালি মাখান। এর সঙ্গে উইণ্ডহ্যাম লিউস-কল্পিত 'স্যাটায়ার'-এর কোনো সম্বন্ধ নেই, গ্রীক এপিগ্রামেরও সঙ্গে নেই। মার্কসিস্ট কবিতায় হাতুড়ির মার ও কাস্তের কাটাই থাকাই স্বাভাবিক। তা নেই যখন, অথচ একাধিক কবিতা যখন ভাল লাগছে তখন সন্দেহ ওঠে যে হয়ত বা মার্কসিজম কবিদের মজ্জায় পৌঁছয় নি। ভাল কবিতা লিখতে গেলে মার্ক্‌সিজম ছাড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। প্লেটনিজম-এর আশ্রয়ে ত বহু ভাল কবিতা লেখা হয়েছে…ওয়ার্ডসওয়ার্থের Intimations of Immortality বাদ দেব? ব্লেক, রবীন্দ্রনাথের মতবাদ ছিল না? মার্কসিস্ট কবি কি অন্য দেশে জন্মায় নি? অথচ আমাদের কোনো কবি কাঁচা নন।

দুর্বলতার আর দুটি চিহ্ন না দেখিয়ে থাকতে পারছি না। এত গ্রীক

পৌরাণিক গল্পের ছড়াছড়ি কেন? আমি স্বীকার করি যে গ্রীক পুরাণের মধ্যে একটা সার্বজনীনতা আছে। এও জানি যে ঐ সব গল্প সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের কেন্দ্র কোথায় জানা না থাকলেও গ্রীসে তাদের পরিণতি হয়েছিল স্বীকার্য। আমরাও নিজেদের পুরাণ সম্বন্ধে একেবারে মূর্খ হয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা অনুকরণও নয়। গ্রীস কেন, নরওয়ে যেতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু legends, myths and symbols তিনটি পৃথক প্রত্যয়। যদি কেউ ওডিসিয়ুস সম্বন্ধে ছন্দে গল্প লেখেন আমার কোনো আপত্তি নেই, যদি কারুর solar myth ব্যবহার করতে হয় তিনি Apollo, Phoebus-এর নাম গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনার আমার ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক সমস্যাকে সার্বজনীন করবার জন্য কেবল myth আর legend-এর ব্যবহার যথেষ্ট নয়। তাদের symbol-এ দাঁড় করাতে হবে। সেই চেষ্টাই কবিরা করেছেন। কিন্তু এইখানেই বিপদ। myth আর symbol-এর পার্থক্য collective emotions-এ, যাদের শেকড় সমগ্র জাতির অবচেতনায়। এখনো আমাদের অবচেতনায় প্রোসারপাইন বাসা বাঁধেন নি, আমাদের মস্তিষ্কের কোনো নিভৃত কোণে ডিয়োটিমা একটি ক্ষণের জন্যও বসেন নি, ক্যাসাণ্ড্রা নয় ইলেকট্রাও নয়। এখন যদি কবির এমন শক্তি থাকে যেটা ঐ collective emotions-এর শক্তির অভাবের পূরণ করতে পারে, তবে অবশ্য অন্য কথা। সে-ক্ষমতা এঁদের কি আছে? তাই মনে হয় symbol-এর সন্ধানটা একটা নিদর্শন মাত্র, কবিতার 'পরোয়ানা' নয়। অন্য দুর্বলতা আরো মারাত্মক—সেটা বিদেশী সংগীতের allusion। বিদেশী সংগীতের বিপক্ষে আমার কোনো আপত্তি নেই, থাকতে পারে না, কারণ, বহু চেষ্টার পর মনে হয় যেন আজকাল ভাল লাগছে। কিন্তু যখন বিষ্ণু দে "জন্মাষ্টমী" কবিতার মাথায় বিদেশী সংগীতের জার্মান ভাষায় উল্লেখ করেন, ও কেবল তাই নয়, যখন অন্যত্র, অন্য কবির লেখায় আমাদের নিজেদের সংগীতের উল্লেখ ভুল দেখি, এবং আরো যখন দেখি যে কবিতাতেও বিষ্ণু দের মতন হুঁসিয়ার কবির musical sense-এর স্খলন হচ্ছে, তখন তাঁর ও তাঁর সহধর্মীর এই অভ্যাসকে snobbishness ছাড়া কী বলব! মোদ্দা কথা এই যে এঁদের বিশেষত, বিষ্ণুর প্রতিভা সাংগীতিকই নয়, কোনো সংগীতের সঙ্গেই, এঁদের প্রতিভার যোগ নেই। আমি গানবাজনা জানা কি ভালবাসার কথা বলছি না, না জেনে খুব না ভালবেসেও কাব্য-প্রতিভা স্বর-প্রধান হয় দেখেছি। আমি কেবল মূলগত ঐক্যের নির্দেশ করছি। তা ছাড়া, পাঠকপাঠিকার মধ্যে ক'জন বেটহোফেন-এর ইঙ্গিত ধরতে পারে! যদি প্রশ্ন করি বিষ্ণু কেন এই কাজ করলেন তখন কি তাঁর সার্বভৌমিকতায় আমার প্রশ্নের

উত্তর মিলবে, না মিলবে মানুষের সেই প্রবৃত্তিতে যেটা ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হবার পর এমন একটা কোনো আশ্রয় খোঁজে যার কৃপায় অত্মসম্মানকে আত্মসম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা দুইই পাওয়া যায়।

এ মনোভাব ব্যক্তিগতভাবে খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু মার্কসিস্ট নয়, নিশ্চয় নয়। মার্কসিস্ট মনোভাবের দায়িত্ব ভীষণ। অন্তত সেখানে একটা intellectual honesty-র চাহিদা সর্বদাই থাকে। কিন্তু কবি যখন নিজের নৈরাশ্যকে বড় ভাবেন তখন তিনি মাত্র আত্মকেন্দ্রিক, কেবল একটিমাত্র fact নিয়ে ব্যস্ত। মার্কসিস্ট-এর মনোভাব বিপরীত, তার কাছে factগুলো data। মার্কসিস্ট কবিদের কেন্দ্র ব্যক্তি নয়, পুরুষ, সমষ্টি-বোধে জাগ্রত পুরুষ। আমাদের কবিতায় সমষ্টিবোধ আসে নি, পুরুষ আর ব্যক্তির পার্থক্য এখনও ধরা পড়েনি। তাই যে-বাস্তবতার চর্চা চলছে সেটা জোর populist realism, social realism নয়। জনগণের উল্লেখ আর গণবোধের মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য ঘুচতে পারে, আপাতত, চেতনার উন্নতিতে। যতটা সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর উন্নতি নির্ভর করে ততটার প্রসার আমি মার্কসিস্ট কবিতার জন্য চাই। আমার বক্তব্য এই : দুর্বলতা সত্ত্বেও ১৯৪২ সালের 'আধুনিক' কবিতা পূর্বেকার 'আধুনিক' কবিতার চেয়ে উন্নত। এ গুলো মধ্যবিত্তের চাকরী না পাওয়ার দুঃখ থেকে জন্মায় নি, অমুকাদেবীর মুখ চেয়েও লেখা নয়। যে-লেখক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন, আমাদের ভবিষ্যৎ নেই কেন ভাবেন, যে-কবি প্রেমে পাগল নয়, বন্ধুত্বের সন্ধানী, যে ব্যক্তি সমাজ অভিব্যক্তির নিয়ম খুঁজতে ব্যস্ত, তিনিই ১৯৪২ সালের আধুনিক, অতএব আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার্হ। অবশ্য লেখক হওয়া চাই, বলাই বাহুল্য। এবং রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পর আমাদের কবিরা লিখতে জানেন না কে বলে?

পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৪৯

স্মৃতির অতলে—শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল। মিত্রালয়। মূল্য সাড়ে চার টাকা

পুরাতন প্রসঙ্গ মানুষ কখন লেখে কখন পড়ে, এই দুটি প্রশ্ন অবশ্য এক জাতের নয়। মানুষে পুরানো কাহিনী বলতে ও লিখতে চায় বার্ধক্যের আগমনে; এবং পড়তে ও শুনতে চায় প্রধানত শৈশবাবস্থায়, কিংবা যৌবনের প্রায় শেষে যেখানে সৃষ্টির অথবা মান সৃষ্টির একটা পরিমাণের প্রয়োজন ওঠে, যখন মূলসন্ধানের আবেগ তীব্র হয়। কিন্তু দুটি প্রশ্নের সহজ মিলন ঘটে যখন শিশুসুলভ কৌতূহল অতীত সম্বন্ধে আগ্রহকে অনুপ্রাণিত করে। সহজ মিলনের প্রক্রিয়া নিছক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নয়, ঠিক জ্ঞানস্পৃহাও নয়, মাত্র বিস্ময়। মিলনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আর প্রশ্নাকারে

থাকে না, রূপান্তরিত হয়ে যায় সচকিত অনুভূতিতে, যার ফলে ক্ষেত্রটাও পরিণত হয় আবহাওয়াতে। ব্যাপারটা একটু রোম্যান্টিক ধরনের, কারণ রোম্যান্টিক মনোভাবের মূল কথাই হল বিস্ময়। এবং জার্মানিতে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে ইতিহাসের পত্তন হয়েছিল তার প্রেরণা ছিল ঐ রোম্যান্টিক আদর্শেরই। অতএব পুরাতন কাহিনী কওয়া, লেখা, শোনা ও পড়ার মধ্যে ঐতিহাসিক আগ্রহেরই পরিচয় রয়েছে। এবং সেই জন্যই শ্রীঅমিয়নাথ সান্ন্যাল যখন 'স্মৃতির অতলে' বইখানির ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে তিনি ইতিহাস লিখতে বসেন নি তখন মনে হয় যে তিনি অধ্যাপকীয় ইতিহাসকেই ইতিহাস বিবেচনা করেছেন। যে শৈলী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ, এবং যে বাতাবরণ আমাদের অজানিতে পরম্পরা ও ঐতিহ্যের মূল্যকে সহজে অনুভূতিতে পরিবর্তিত করে, এই দুয়ের সমাবেশে যে কাহিনী তৈরি হয়, তাই হয় জনসাধারণের ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসই অমিয়নাথ লিখেছেন। সংগীত সম্বন্ধে এমন অপূর্ব কাহিনী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

অতটা, ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও অমিয়নাথ-বর্ণিত পুরানো কাহিনীর সঙ্গে আমিও যুক্ত। অমিয়বাবু যে সব গায়ক-গায়িকার সম্বন্ধে লিখেছেন আমিও তাঁদের গানবাজনা শুনেছি, এবং প্রায়ই একই সময়ে প্রায় একই আসরে। ঐ ভেইয়া সাহেব, মৈজুদ্দিন, বসির, মৌর্জা, বাদল খাঁ, গিরিজাবাবু, বিশ্বনাথ রাও, গহর, মল্‌কা, আবেদ আলি, ঐ ১০১ হ্যারিসন রোড, ঐ নাটোরের বাড়ি, সবই আমার পরিচিত। ফৈয়াজ খাঁকে প্রাণভরে শুনতে আরম্ভ করি ১৯২৩ সাল থেকে, এবং কালে খাঁর গান ঐ বছরেই মাত্র দুদিন শুনি লক্ষ্ণৌ-এ। অমিয় ছিলেন করিৎকর্মা। তাঁর গলায় ঠুংরির সূক্ষ্ম রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠত, আর এসরাজে তাঁর হাত ছিল অতি মধুর। নাচাও ঠুংরিতে অমিয় ছিলেন পোক্ত, আর আমার ঝোঁক ছিল ধ্রুপদ ধামারের ওপর। তা ছাড়া, আমার অনুরাগ অন্যান্য বিষয়ে বিভক্ত হয়ে যায়; অমিয়র কেবল ডাক্তারিতে। সে যাই হোক, আমরা ছিলাম সমসাময়িক এবং সংগীতানুরাগী। উপভোগের ক্ষেত্রে যৎসামান্য পার্থক্য থাকলেও আমাদের মিলটাই ছিল প্রধান। আমরা উভয়েই একই যুগের লোক, একই পরিবেশে লালিত-পালিত। সেই জন্যই বোধহয় 'স্মৃতির অতলে' আমাকে যতটা নাড়া দিয়েছে ততটা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে দেবে না।

আমার ব্যক্তিগত উপভোগের কথা ছেড়ে বইখানির কৃতিত্ব সম্বন্ধে গোটা কয়েক সাধারণ মন্তব্য করছি।

'স্মৃতির অতল' থেকে উদ্ধার করার বিপদ অনেক। সব সময় মোতি ওঠে না।

মোতির বিচার হয় ডাঙায় ব'সে। অতএব অবচেতনার মধ্যেই তার বসবাস এ-কথা ভুল। স্মৃতি-উদ্ধারের মধ্যে নির্বাচনবুদ্ধি সক্রিয়। এইখানেই সুরুচির কথা ওঠে। বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর শ্যামলালবাবু ও তাঁর গোষ্ঠীর রুচি মার্জিত হয়েছিল, সে-রুচির অংশীদার ছিলেন অমিয়। এই অর্জিত রুচিই অমিয়কে সাহায্য করেছে স্মৃতির অতল থেকে মৈজুদ্দিন, ফৈয়াজ, কালে খাঁ প্রভৃতির মতন মহাগুণীকে উদ্ধার করতে। হয়তো ফৈয়াজ খাঁর বেলায় উদ্ধার কথাটি প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি মাত্র সেদিন গত হয়েছেন, এবং এখনও আমাদের কানে তাঁর সুকণ্ঠের দরবারী আওয়াজ, তাঁর বোল-তানের কেরামতি, তাঁর ছন্দের দোলা অনুরণিত হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমরা এখনও মুহ্যমান। কিন্তু মৈজুদ্দিন, কালে খাঁ এখন নাম মাত্র। অতএব তাঁদেরই বেলা উদ্ধার কথাটি খাটে। কিন্তু অমিয় মৈজুদ্দিন ও কালে খাঁর সম্বন্ধে অত উচ্ছ্বসিত কেন? তার কারণই হল অমিয়র রুচি। এই রুচির সাহায্যেই মৈজুদ্দিনের অশিক্ষিতপটুত্বকে প্রতিভা বলতে অমিয় দ্বিধা করেন নি। আমার যতদূর মনে পড়ে, ভাতখণ্ডেজী মাত্র দুজন গায়ক সম্বন্ধে বলতেন, 'ওঁদের কথা আলাদা'— এক মৈজুদ্দিন আর আবদুল করিম খাঁ। মৈজুদ্দিন (এবং আবদুল করিম খাঁ) ছিলেন নিয়মবহির্ভূত। তাঁদের সম্বন্ধে নিয়মসঙ্গত বিচার চলত না। তাঁরা কখন কী করে বসবেন, কখন আস্থায়ী ছেড়ে অন্তরা ধরবেন, কখন কোন্ স্বর প্রয়োগ করবেন, কখন কোন্ অদ্ভুত তান তুলবেন, কখন কী লয়কারি দেখাবেন, আগে থাকতে বিশেষজ্ঞ শ্রোতাও বলতে পারত না। অথচ তাঁদের গায়ন অরাজকতার নামান্তর ছিল না। রাগরূপকে লণ্ডভণ্ড তাঁরা নিশ্চয়ই করতেন না; রাগের নতুন রূপই দিতেন। মৈজুদ্দিনের ভৈরবী, টোড়ি, পুরিয়া-ধানশ্রী, তাঁর নিজের সৃষ্টি। এই নিজস্বতা আমাদের চমক লাগাত; এবং অনেক সময়, বিস্ময়ের বশে গঠনপদ্ধতির ব্যতিক্রম মার্জনা করা অতি সহজেই সম্ভব হত। নসীরুদ্দিন খাঁ, রামকৃষ্ণ ওয়াজে, আলাদিয়া খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, মোস্তাক হোসেন, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকার, বিলায়েৎ খাঁ, দলীপকুমার বেদী প্রভৃতির গায়ন-পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে পর-পর গড়ে তোলার চিহ্ন স্পষ্ট। যেন ধীরে ধীরে একটি প্রাসাদ গড়ে উঠছে। মৈজুদ্দিনের মধ্যে এই প্রকার architechtonic ছিল না। মনে হত জাদুবলে সে গন্ধর্বপুরী থেকে সে এক অপূর্ব হর্ম্য তুলে এনে সামনে রাখলে। আবদুল করিম খাঁর অ-নিয়ম একটু ভিন্ন প্রকারের ছিল। তিনি ধ্যানের সাহায্যে রূপ ফোটাতেন। যে নাটকীয় গুণ মৈজুদ্দিনের ছিল সেটি আবদুল করিমের ছিল না। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব মঞ্চের নয়, বেদীর। তবু দুজনেই মহাগুণী। এই মহাগুণের আবিষ্কারে যে-রুচির প্রয়োজন সেটি শাস্ত্রসম্মত রুচি না হতে পারে,

তবু সেটি মার্জিত ও অভ্রান্ত রুচি।

প্রমাণ বইখানির ছত্রে ছত্রে। অমিয় রাগরূপের বিচার করছেন না, সৃষ্টির অপূর্বতা, মনোহারিত্বেরই সমাদর সর্বদা করছেন। এটা তাঁর একপ্রকার আর্টিস্ট-মনের নিদর্শন। সে-প্রকারটিকে মোটামুটি রোম্যান্টিক বলা যায়। এবং এইটেই অমিয়র পক্ষে স্বাভাবিক। ঠুংরির প্রকৃতিই তাই। আমি তিলমাত্র নিন্দা করছি না, বরঞ্চ সুখ্যাতিই করছি। ঠুংরি শিক্ষা ও উপভোগের মধ্যে বিশেষ করে সৃষ্টির সাবলীলতার উপরই বেশি ঝোঁক পড়ে, যেটা ধ্রুপদ, ধামার এবং ধ্রুপদ-ঘেঁষা বিলম্বিত খেয়ালের মধ্যে পড়ে না। আর নজর পড়ে ব্যক্তিত্বের উপর। অবশ্য জাকরুদ্দিন, আলাবন্দে, নসীরুদ্দিন, রাধিকা গোঁসাই-এর আলাপ-ধ্রুপদ-ধামারেও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। কিন্তু সেটা নিতান্ত পরোক্ষভাবে। মৈজুদ্দিন ও ফৈয়াজ খাঁর ঠুংরি গানে ব্যক্তিত্ব ছিল নিতান্ত সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। সেইজন্য 'স্মৃতির অতলে' রাগরূপের অপেক্ষা রূপস্রষ্টাদেরই প্রতিকৃতি জাজ্বল্যমান। ভাতখণ্ডেজীর মুখেও পুরানো ওস্তাদের অনেক গল্প শুনেছি। একদিনের কথা মনে হচ্ছে। শেষ বয়সে তিনি প্রায় পুরোপুরি বধির হয়েছিলেন। বড় দুঃখ হত। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভালো গান শুনতে পান না বলে আফসোস হয় না?' তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'মোটেই না। রোজ রাতে একটা-না-একটা রাগ আমার সামনে উপস্থিত হয়। কাল এল মঙ্গল রাগ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একজন মুসলমান ওস্তাদের মুখে শুনেছিলাম। তারপর জোর দু-একবার। কাল মঙ্গল রাগ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিমার মতন নিদ্রার মধ্যে আবির্ভূত হল।' এই বলে গম্ভীর কণ্ঠে মঙ্গল রাগটি গাইলেন। কথা ছিল না, সারগম ছিল না, ছিল মাত্র রাগের স্বরূপ। স্মৃতির আশ্রয়ে এই formal রূপ খোলে অন্য-ধর্মী আর্টিস্টের মনে। সে-মন অমিয়র নয় বোধ হয়। তাতে দুঃখ নেই মোটেই। যে-মন যে-রুচির পরিচয় তিনি দিয়েছেন সে-মন সে-রুচি এখন দুর্লভ। তার মতন গুণগ্রাহী শ্রোতা আমার বন্ধুদের মধ্যে নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর রুচির উদারতায় আমি চিরমুগ্ধ। তাঁর জ্ঞানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অমিয়নাথের সুরুচির আর-একটি প্রমাণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। যাঁরা evocative রচনা করেন তাঁদের মন্তব্যের মধ্যে একটা রায়-বিচার গোপন থাকে। (বার্নাড শ'র বেলা সেটা নিতান্তই খোলাখুলি। তাঁর সংগীত ও অভিনয় সংক্রান্ত রচনা একই সঙ্গে evocative ও didactic)। অমিয় যখন কালে খাঁ, মৈজুদ্দিন সম্বন্ধে লিখেছেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের মনে ধারণা জন্মাচ্ছে যে এমনটি আর হয় নি, হবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নিজে এমন কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছেন

না যে ঠুংরি মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়েছে, এবং আর যেন কেউ ঠুংরি না গায়। এ প্রকার ইঙ্গিত দিলে অস্বাভাবিক হত না, আমাদের বয়সী লোকেরা হয়তো খুশীই হতেন। কিন্তু এ ইঙ্গিত তিনি দেন নি। না দেওয়াটা কেবল ভদ্ররুচির পরিচয় নয়, ঐতিহাসিক জ্ঞানেরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি ইতিহাস লিখছেন না বললে কি হবে— তিনি যথার্থ ঐতিহাসিকের মতনই অভিব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করেছেন। সংগীত, এমন কি ভারতীয় সংগীতও চলছে তিনি জানেন। তাঁর না জেনে উপায় ছিল না, কারণ তিনি নিজে ১০১ নম্বর হ্যারিসন রোডের সংগীত-বিপ্লবাদেরই একজন। ১৯১০ সাল থেকে বাংলাদেশে সংগীতে বিপ্লব এসেছিল ঠুংরি খেয়াল (ও রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন প্রভৃতির রচনার) মাধ্যমে। অমিয়নাথ এই বিপ্লবের অংশীদার। (তাই তিনি রবীন্দ্র-সংগীতেরও ভক্ত)। অতএব স্মৃতির অতলে nostalga থাকলেও ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার ও ঔদার্যের চিহ্ন বর্তমান। তাঁর কাছে অতীত বর্তমানের বুকে বাসা বেঁধেছে — কলিংউডের ভাষায় incapsulated হয়েছে।

যে বাসা সৃষ্টি হল সেটি আবহাওয়া। সৃষ্টির প্রক্রিয়া দুটি। এক আবেগময়, ভাবসম্পন্ন ভাষা। আমার এ-ভাষা পছন্দ নয়। সে ভাষার মধ্যে যে সব উর্দু বুখ্‌নি আছে সেগুলো আমার লক্ষ্ণৌ-কানে লাগে। তবে ঐ প্রকার উর্দু জবানই ঐ গোষ্ঠীতে প্রচলিত ছিল। গায়ন-পদ্ধতির উপভাষার বেলাও তাই। এই সব দোষ সত্ত্বেও, এমন কি আমার মনে হয় অনেকটা এই সব দোষের জন্যই, আব-হাওয়াটা অমিয়নাথ জমাতে পেরেছেন। ওস্তাদসমাজে অতিরঞ্জন ও ঠাট্টাতামাসা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, উর্দুর সঙ্গে, এমন কি ভুল উর্দুর সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের যোগ প্রায় অচ্ছেদ্য। আজকাল সে যোগ ছিন্ন হচ্ছে। আজকের দরবার মধ্যবিত্তের, অতএব দরবারী সংগীতের আসরে আজকাল উর্দু না বললেও চলে। উর্দুর এই feudal exclusiveness আবহাওয়া-সৃষ্টির পরিপন্থী। কিন্তু আজকালকার শ্রোতা ও পাঠকদের মনের উপর এই ধরনের প্রক্রিয়াটি কতটা সার্থক হবে জানি না। আমার কাছে যে হয়েছে তার কারণ অমিয়নাথের ও আমার স্মৃতির ভাণ্ডার প্রায় একই। দুই, ওস্তাদের ব্যক্তিগত স্বরূপ বর্ণনা, তাঁদের সম্পর্কে নানাপ্রকার খুঁটিনাটি ব্যাপারের উল্লেখ। এই প্রক্রিয়া সব দিক দিয়ে যথাযথ। অবশ্য নিছক রাগরূপের আবহাওয়া সৃষ্টি করা তর্কের ক্ষেত্রে সম্ভব ; কিন্তু যখন আমাদের notation নেই, তখন প্রায় অসম্ভব। মৈজুদ্দিনের গাওয়া ভৈরবীর রূপ মৈজুদ্দিনের মাথার সাফা ও চোখের কাজল বাদ দিয়ে কেবল রে গা ধা নি-র আশ্রয়ে কি ভাবে ধরে দেওয়া যায় বুঝি না। মৈজুদ্দিনের প্রতিভা

রহমত খাঁর পাগলামিতে ও জগদীশের জন্য ব্যাকুলতায় অতি সুন্দর ভাবেই ধরা পড়েছে। তেমনি ফৈয়াজ খাঁর বেলাতেও। গহরজানের সঙ্গে ব্যবহারে ফৈয়াজ খাঁর যে-ব্যক্তিত্ব প্রকট হয়েছে সেই রাজকীয় আত্মপ্রতিষ্ঠাই ফৈয়াজ খাঁর টোড়ি, নটবেহাগ, দরবারীর প্রাণবস্ত ছিল। গহরের সঙ্গে 'নখাড়া' তাঁর পরজে, হোলিতে, গজলে পরিস্ফুট। এঁদের ছিল বিরাট ব্যক্তিত্ব। মৈজুদ্দিনের সামনে কোনো খেয়াল-ধ্রুপদী গলা খুলতে সাহসী হতেন না আমি জানি। এক তানেতেই সে পাকা গানের আসর ভেঙে দিতে পারত। আর ফৈয়াজের পার্সন্যালিটির কথা তো সকলেই জানেন। (কালে খাঁর গান আমি দুবার শুনেছি— অতএব তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে পারি না। তবে এখন সন্দেহ হয় যে ওস্তাদ একটু নেগেটিভ ধরনের লোক ছিলেন)। মোদ্দা কথা এই, অমিয়নাথ সংগীতের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন প্রধানত ব্যক্তিত্ব-বর্ণনার মাধ্যমে। ব্যক্তিত্ব কেবল ওস্তাদবর্গের নয়, শ্যামলালবাবু, তনুবাবু, রাজাবাবু, দুনিচাঁদ, ননীবাবু প্রভৃতির মতন সংগীতানুরাগীদেরও। শ্যামলালবাবুর মধুর ও পবিত্র চরিত্রটি এই গোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন ছিল। অমিয়নাথ এই তথ্যকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন। গহরজানের চটুলতা, মালকাজানের গাম্ভীর্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। গহরজানের সম্বন্ধে আরো কিছু লিখলে আমি খুশী হতাম। তাঁর মতন প্রতিভা গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোনো বাইএর মধ্যে দেখি নি।

অমিয়নাথের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে অনেক পুরানো কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে সব কথা অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের তলায় চাপা পড়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল এই যে, তিনি সংগীতের মতন কলার, যাঁর স্মৃতি রেকর্ড ভিন্ন ধরে রাখা যায় না, সেই কলার একটি সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। তারিখের ভুল হয়তো দু-একটা আছে। কিন্তু তাতে আসে যায় না। অমিয়নাথ থিসিস্ লেখেন নি। 'স্মৃতির অতলে' যে সব মোতি পড়ে আছে সেগুলিকে উদ্ধার করে এবং নির্বাচন করে আমাদের সামনে রেখেছেন। বর্তমান যুগের পাঠক যদি সেগুলিকে মোতি বলে স্বীকার করেন তা হলেই অমিয়নাথ সার্থক হবেন, এবং আমিও কৃতজ্ঞ হব। আমার কৃতজ্ঞতার কারণ সহজ। আজকালকার সংগীত উপভোগের মান নেই মনে হয়। মৈজুদ্দিনের ফৈয়াজ, কালে খাঁর গায়ন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানলে একটা মান পাওয়া যাবে আমার বিশ্বাস। যে-ব্যক্তি, যে-রচনা আমাকে স্ট্যাণ্ডার্ড স্মরণ করিয়ে দেয় তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকতে পারি না।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩